সুপ্রভাত

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন

শ্রীকুমুদিনী বসু বি-এ

সম্পাদিত।

সপ্তম বর্ষ

১৩২০ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩২১ সালের
আষাঢ় পর্য্যন্ত।

সুপ্রভাত-কার্য্যালয়
৬নং কলেজ-স্কোয়ার
কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ২।৵০ আনা।

Tight Binding

BRITTLE PAGES.

৫৫৩৮

বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অন্তহীন (কবিতা)	
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	১৯২
অনলে আহুতি	
শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র	
অক্ষম (কবিতা)	
শ্রীমতী চারুহাসিনী দেবী	৯৬
আহ্বান (কবিতা)	
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	৬৪
আবাহন (কবিতা)	
শ্রীমতী সরলাসুন্দরী নাগ	১০৬
আশ্বাস (কবিতা)	
শ্রীযুক্ত অবনীনাথ চট্টোপাধ্যায়	১১০
আধুনিক জাপান	
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বক্সী	১৩৮
আধুনিক উচ্চ শিক্ষা ও প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা	
শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস	৫৩৩
আবাহন (কবিতা)	
শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	১৮১
আলেকজান্দারের অভিযান সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য (সচিত্র)	
অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	১৯৮
আমাদের ভুল	
শ্রীমতী চপলা দেবী	৪৫৩
আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও সংস্কারের আবশ্যকতা	
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী	৩৫৫
আমাদের কর্ত্তব্য	
শ্রীমতী চপলা দেবী	৩৭২
আগমনী (কবিতা)	
শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র	৪২৯
ইতর প্রাণীর সন্তান-স্নেহ	
শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন	৩৪৭
ইচ্ছাকুমারী (উপাখ্যান)	
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন	৩৪৭
একটি জলকণার কাহিনী	
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এস-সি	৬৫
ঐতিহাসিক প্রসাদ পদাবলী	
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৫০৫
ওমরাহের কন্যা	৫১৭
ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেক	
শ্রীযুক্ত গুরুদাস আদক	১৫৭
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (সচিত্র)	
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী	১৩২
কাশীমবাজারের ব্রাহ্মণ রাজবংশ	
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন	৩০৬
কেন (কবিতা)	
শ্রীমতী চারুহাসিনী দেবী	৪২৫
গৌতম (কবিতা)	
শ্রীযুক্ত হরিকৃপা চৌধুরী	২৬৩
গুজরাত কৃষক পল্লীচিত্র	
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন	৫৫৬
ঘরের কথা	
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	২৩৭
চট্টগ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাচীন কথা (সচিত্র)	
শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী	১২, ৫৩, ৯৭
চিরন্তন (কবিতা)	
শ্রীমতী হেমলতা দেবী	৯২
চাঁদরায় কেদাররায়ের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা (সচিত্র)	
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৬০
জন্মভূমি (কবিতা) সিরাজী	১৭০
জন্মদিনে (কবিতা)	
শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র	৩৪৬
জালিম মাঠ	
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	৪১২
টেরাকন্যা—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	১৮২
ঠাকুর কাশীনাথ	
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল	৫[illegible]
তর্পণ (কবিতা)	
শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	[illegible]
তর্পণে (কবিতা (শ্রীমতী [illegible]	[illegible]

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
তুর্কীনারী-জীবন (সচিত্র) সিরাজী	১৪৫, ১৯৩
তুর্কী বিদ্যালয় পরিদর্শন—সিরাজী	২৮৯
দক্ষিণ আফ্রিকায় লাঞ্ছিত ভারতবাসী (সচিত্র)	২২৮
দ্বিপত্নীক (উপন্যাস)	
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।	৪২, ৬৯, ১১৪
দিব্যদেবী (পৌরাণিক কাহিনী)	
শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস	২৪৬, ২৯৩
দেবভাঙ্গা (কবিতা)	৪৯৮
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি, এল	
দেশী ও বিদেশী সমাজ	৫২৫
শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায়	৪৯৩
দেশনায়ক (গল্প) শ্রী——	
ধর্ম্মের জয় (উপন্যাস)	
শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	২৭, ৮২, ১২৫,
১৭১, ২১৬, ৩০১, ৩৬৫, ৪০২, ৪৬৩, ৪৯৯, ৫৪৯	
ধ্রুবলক্ষ্য (কবিতা)	৪৪২
শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	১৬০
নরক—শ্রীমতী যামিনী সেন	
নারীর কার্য্য	
শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ,	
শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস প্রভৃতি	৯৫, ১৪৩,
	৩৮০, ৪৩০, ৪৭৬, ৫২৭
নিবেদন (কবিতা)	৪৬০
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু	৪৭৩
নিবেদন—শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	৫৪১
পদ্মাতীরে (গল্প) শ্রী——	
পৈতৃক সম্পত্তি (গল্প)	৪১
শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
পুণ্য কাহিনী—আতুরাশ্রম (সচিত্র)	৩৫
শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার	
পূর্ব্বকথা—শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী	২:, ৮৯, ১:১, ১৫৪
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান	
অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	২৪১, ৩৯৩
প্রাণারাম (কবিতা)	৩২
শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	
প্রার্থনা (কবিতা)	১২৪
শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।	
প্রাণের মুক্তি (কবিতা)	২৪৫
[illegible] কালিদাস বসু	
কবিতা)	৩৯২

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিকগণ	২১
শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	
প্রাচীন কুশানবংশীয়ের সময় নিরূপণ	
শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী গুপ্ত, বি-এ, বি-এস-সি	৫৪৬
প্রেম-পরিণামে (কবিতা)	৪৪২
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মজুমদার	
প্রেমের ধর্ম্ম	৫২৯
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল	
পুরাতন পল্লী	৪৪২, ৪৮৮
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন	
পণ-প্রথার পরিণাম—কুমারীর আত্মোৎসর্গ	৩৫৯
শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ	
পরলোকগত ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী রমাসুন্দরী	৩৬৮
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	
প্রীতিদা (কবিতা)	৪০১
শ্রীযুক্ত হরিকৃপা চৌধুরী	
বল্কান প্রদর্শনী (সচিত্র)	৩৩
ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক	
বঙ্গে পাঠান-বিপ্লব শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	৬৭
বঙ্গসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ	
বিকানীরে মহোৎসব	২৫৮
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়	
বিশ্বাস (কবিতা)	২৫৯
শ্রীযুক্ত সুব্রত নন্দী	
বাবরের জীবনী—শ্রীযুক্ত শচীপ্রসাদ বসু	৭, ৫৯,
	:০৭, ২৩১
বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ	২৫৪
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন	
বেতাল পঞ্চবিংশতি	২১৫
শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ	৪৬১
বিবাহ-গাথা—শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস	৪৭৫
বরপণ—শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	
বসন্তনিশা (কবিতা)	২০
শ্রীমতী মানকুমারী বসু	
ব্রাদার লরেন্সের পত্রাবলী	
শ্রীযুক্ত হিমাংশুপ্রকাশ রায়	২৮৪, ৩১৬, ৩৬২
বিদ্যাসাগর—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত	৭৭
বর্ত্তমান যুগে স্ত্রীজাতীর উন্নতির উপায়	৪০৫
শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	৫২২
বশিষ্ঠাশ্রম শ্রী——	

বিষয়	পৃষ্ঠা
বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন (সচিত্র)	
শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৫১০
বসন্ত-আহ্বান (কবিতা)	
শ্রীমতী সরলা দত্ত	৪৩২
ভক্তের পূজা (গল্প)	
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ	১৩৫
ভাগ্যচক্র (গল্প)	
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়	২৭২
ভাবনার দেশ (গল্প)	
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬৭
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (কবিতা)	
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত	২৩৬
ভয়ের আক্ষেপ (কবিতা)	
শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায়চৌধুরী	৫২৬
ভারতের প্রাচীন অধিবাসী ও ভাষা	
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৫৩৭
মহানদী (কবিতা)	
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	১৪৪
মাতৃ দর্শনে—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় বি, এ	২৮২
মাতৃ আহ্বান (কবিতা)	
শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায়	৩১৫
মোসলেম রাজনীতি—মৌলবী আবদুল করিম	২০৫
মুস্কিল আসান (গল্প)	
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৯
মৃত্যু-শয্যায় (কবিতা)	
স্বর্গীয়া কুমারী প্রতিভা দত্ত	৮৮
মহৎ চিন্তা ও মহত্ব লাভ	৪৩৩
মক্কাযাত্রী— শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী	৫৬৫
মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের জন্মকথা	
শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী গুপ্ত, বি, এ, বি-এ স-সি,	৩৩৭
মা ও ছেলে (কবিতা) শ্রী——	৪১৮
মধুসূদন দত্ত (কবিতা)	
শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ	৫২৪
মধু-প্রশস্তি (কবিতা	
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষাল	৫২৮
রাজামন্দ্রী (সচিত্র)	
শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৩
রাজপুতানী (কবিতা) শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায়	৫১৪
রাখীবন্ধন	৫৬৭
লাইবেরিয়া	
শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়চৌধুরী	৩৩৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
লোকান্তরিতা লেডি হার্ডিং (সচিত্র)	
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু	৫৭০
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা (সচিত্র)	
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এস, সি	২২৯
শুশ্রূষা-নিবাস—শ্রীমতী যামিনী সেন	১৫০
শশিকলা-স্বয়ম্বর	
শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস	৩৯৭, ৪৪৯
সমাজের অত্যাচারে নিপীড়িত বালিকার আত্মোৎসর্গ	—৩৩২
সম্মিলন (কবিতা)	
শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৪৭২
সমালোচনা	১৯২, ৪৭৭,
সেখ ফরিদ	
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ	২, ৪৯
সেখ সাদি	
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৪৫৯
সুপ্রভাত (কবিতা)	
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	১
সুপ্রভাত (কবিতা)	
শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র	১
সার্থক (কবিতা) শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	১৫৯
সুলতান বায়েজিদ বস্তানীর দরগাহ (সচিত্র)	
শ্রীমতী শৈলবালা রায়চৌধুরী	২৫২
সোমবংশীয় নৃপতিগণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা	
শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী গুপ্ত বি, এস-সি	২৬৭
স্বর্গীয় আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায়	৯৩
স্বামী বিবেকানন্দ ও নারীজাতি	
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়	১৮০
স্বজাতি বৎসল শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি	
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র	২৭৬, ৩০৮,
স্বপ্ন—শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী	৩২৬
স্ত্রীশিক্ষা সমস্যা	
শ্রীমতী মনোরমা দেবী	২৬৪
স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	
শ্রীমতী স্বর্ণলতা মল্লিক	৫২৪
স্নেহলতার আত্মত্যাগ (কবিতা	
শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায়	৪৫৮
সময় (কবিতা) শ্রীযুক্ত হরিকৃপা চৌধুরী	৩৫৪
স্নেহলতার আত্মবলি (কবিতা)	
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার রায় এবং শ্রী	৬০

বিষয়	পৃষ্ঠা
সৌন্দর্য্যের বিকাশ — শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল	৩৮৫
সহৃদয় গুজরাত (সচিত্র) — শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন	৪১৫
স্ত্রীশিক্ষা সমস্তার আলোচনা — শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ	৪২৪
সিরিয়ার পরিভ্রমণ—সিরাজী	৪৮১
হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	৭৯৬

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীযুক্ত অবনীনাথ চট্টোপাধ্যায়	
আশ্বাস (কবিতা)	১১০
শ্রীমতী অনুরূপা দেবী	
দ্বিপত্নিক (উপন্যাস)	৪২, ৬৯, ১১৪
শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	
ভারতের প্রাচীন অধিবাসী ও ভাষা	৫৩৭
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন	
কাশীমবাজারের ব্রাহ্মণ রাজবংশ	৩০৬
বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ	২৫৪
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ	
পরলোকগত ডাক্তার ঢুকড়ি ঘোষ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী রমান্দসুন্দরী	৩৬৮
মৌলবী আবদুল করিম	
মোগল রাজত্বে পর রাষ্ট্রনীতি	২০৫
শ্রীযুক্ত অতুলবিহারী গুপ্ত বি-এ, বি-এস্-সি,	
মাদ্রাজ ও বোম্বাইএর জন্মকথা	৩৩৭
সোমবংশীয় নৃপতিগণ সম্বন্ধে দুই একটি কথা	২৬৭
প্রাচীন কুশানবংশীয়ের সময় নিরূপন	৫৪৬
ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, এম, ডি	
বলকান প্রদর্শনী (সচিত্র)	৩৩
শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	
রাজামন্ত্রী (সচিত্র)	১০৩
শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল	
সৌন্দর্য্যের বিকাশ	৩৮৫
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ	
সেখ ফরিদ	২, ৪৯
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়	
বিকানীরে মহোৎসব	২৫৮
ভাগ্যচক্র (গল্প)	২৭২
শ্রীযুক্ত কালিদাস বসু	
প্রাণের মুক্তি (কবিতা)	২৪৫
শ্রীযুক্ত গুরুদাস আদক	
ঔরংজেবের রাজ্যাভিষেক	১৫৭
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	
টেরাকয়া	১৮
শ্রীমতী চপলা দেবী	
আমাদের কর্ত্তব্য	৩৭২
আমাদের ভুল	৪৫৩
শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	
প্রভেদ বিস্তর (কবিতা)	২৯২
শ্রীমতী চারুহাসিনী দেবী	
অক্ষম (কবিতা)	৯৬
কেন (কবিতা)	৪৯৫
শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি, এল	
সেখ সাদি	৪৫৯
হেমচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষা	৪৯৬
প্রেমের ধর্ম্ম	৫২৯
শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	
ধ্রুবলক্ষ্য (কবিতা)	৪৪২
বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন (সচিত্র)	৫১০
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল	
ঠাকুর কাশীনাথ	৫৪৪
শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন	
ইতর প্রাণীর সন্তান-স্নেহ	১৬৩
শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী	
চট্টগ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাচীন কথা (সচিত্র)	১২, ৫৩, ৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায়	
দেশী ও বিদেশী সমাজ	৫২৫
মাতৃ আহ্বান (কবিতা)	৫৩১
রাজপুতানি (কবিতা)	৫১৪
স্নেহলতার আত্মত্যাগে (কবিতা	৪৫৮
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ	
ভক্তের পূজা (গল্প)	১৩৫
শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ	
মধুসূদন দত্ত (কবিতা)	৫২৪
শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী	
লাইবেরিয়া	৩৩৪
মক্কা-যাত্রী	৫৬৫
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	
জালিম মাঠ	৪১২
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি, এস-সি	
একটি জলকণার কাহিনী	৬৫
শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	
ঐতিহাসিক প্রসাদ পদাবলী	৫০৫
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার গুহরায়	
স্বামী বিবেকানন্দ ও নারী জাতি	১৮০
শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ	
অন্তহীন (কবিতা)	১৯২
আহ্বান (কবিতা)	৪৬
ঘরের কথা	২৩৭
সুপ্রভাত (কবিতা)	১
সার্থক (কবিতা)	১৫৯
শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী	
পূর্ব্ব কথা	৮৯, ১১১, ১৫৪
স্বর্গীয়া কুমারী প্রতিভা দত্ত	
মৃত্যু শয্যায় (কবিতা)	৮৮
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় বি, এ	
মাতৃ-দর্শনে	২৮২
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী	
আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও সংস্কারের আবশ্যকতা	৫৩৩
	৩৫৫
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মজুমদার	
প্রেম পরিণামে	৪৪২
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ঘোষাল	
মধু প্রশস্তি (কবিতা)	৫২৮
শ্রীমতী বিরাজমোহিনীরায়	
স্বর্গীয় আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯৩
শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী	
স্বপ্ন	৩২৬
শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত	
বিদ্যাসাগর	৭৭
শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ কে চাঁদ	
মোসলেম রাজনীতি	১৮৯
শ্রীমতী মনোরমা দেবী	
স্ত্রী শিক্ষা সমস্যা	২৬৪
শ্রীমতী মানকুমারী বসু	
বসন্ত নিশা (কবিতা)	২০
শ্রীমতী যামিনী সেন	
নরক	১৬০
শুশ্রূষা-নিবাস	১৫০
শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার	
পুণ্য-কাহিনী—আতুরাশ্রম (সচিত্র)	৩৫
শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু	
নিবেদন (কবিতা)	৪৬০
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দ'র	
আলেকজান্দারের চাঁদ রায় কেদার রায়ের অভিযান সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য (সচিত্র)	১৯৮
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান	২১৪, ৩৩৯
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	
সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা	৬২০
শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী	
পণ প্রথার পরিণাম, কুমারীর আত্মোৎসর্গ	৩৫৯
বেতাল পঞ্চ বিংশতি	২৫৫
স্ত্রী শিক্ষা সমস্যার আলোচনা	৪২৪
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ সেন	
ইচ্ছা কুমারী (উপাখ্যান)	৩৪৮
পুরাতন পল্লী চিত্র	৪৪৩, ৪৪৮
সহৃদয় গুজরাত (সচিত্র)	৪১৫
গুজরাত কৃষক পল্লীচিত্র	৫৫৬
শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত	
বঙ্গে পাঠান বিপ্লব	১৬৭
শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র	
অনলে আহুতি	৫৬২

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আগমনী (কবিতা)	৪২৯
জন্মদিনে (কবিতা)	৩৪৬
তর্পণে (কবিতা)	২৭৭
সুপ্রভাত (কবিতা)	৯
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু	
লোকান্তরিতা লেডি হার্ডিং (সচিত্র)	৫৭০
বাবরের জীবনী	৭, ৫৯, ১০৭, ২৩৪
শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী	
প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক	৩২১
শ্রীমতী শৈলবালা চৌধুরানী	
সুলতান বায়েজিদ বস্তানীর দরগাহ (সচিত্র)	২৫২
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি-এল	
দেব ডাঙ্গা (কবিতা)	৪৯৮
শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী	
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (সচিত্র)	১৩২
শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	
মহানদী (কবিতা)	১৪৪
শ্রীমতী সরলাসুন্দরী নাগ	
আবাহন (কবিতা)	১০৬
শ্রীমতী সরলা দত্ত	
বসন্ত আহ্বান (কবিতা)	৪৩
মৌলবী ইসমাইল সিরাজি	
জন্মভূমি (কবিতা)	১৭১
তুর্কি নারীজীবন (সচিত্র)	১৪৫ ১৯৩
তুর্কি বিদ্যালয় পরিদর্শন	২৮৯
সিরিয়া পরিভ্রমণ	৪৮১
শ্রীযুক্ত সত্যবন্ধু দাস	
আধুনিক উচ্চশিক্ষা ও ভারতে স্ত্রী শিক্ষা	৮৬
দিব্যদেবী (পৌরাণিক কাহিনী)	২৪৬, ২৯৩
বিবাহ-গাথা	৪৬১
শশিকলা-স্বয়ম্বর	৩৯৭, ৪৪
ভারতে স্ত্রীশিক্ষা	৫৩৩
শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী	
ধর্ম্মের জয় (উপন্যাস)	২৭, ৮২, ১২৫, ৩০২, ৩৩৬, ৪০২ ৪৬৩—৪৯৯ ৫৪৯
বরপণ,	৪৭৫
বর্ত্তমান যুগে স্ত্রীজাতির উন্নতির উপায়	৪০৫
শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—৪৭৫
পৈতৃক সম্পত্তি (গল্প)	৪১
শ্রীযুক্ত সুব্রত নন্দী	
বিশ্বাস (কবিতা)	২৫৯
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত	
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (কবিতা)	২৩৯
শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী	
ভয়ের আক্ষেপ (কবিতা)	৫২৬
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	
শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা (সচিত্র)	—২২৯
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথমিত্র	
স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত মোহন চাঁদ করমচাঁদ গান্ধি	—২৭৬, ৩০৮
শ্রীমতী স্বর্ণলতা মল্লিক	
স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা	৩২৪
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	
ভাবনার দেশ (গল্প)	৪৬৭
মুস্কিল আসান (গল্প)	২০৯
শ্রীযুক্ত হরিকৃপা চৌধুরী	
গৌতম (কবিতা)	২৬৩
প্রীতিদা (কবিতা)	৪০
সময় (কবিতা)	৩২৪
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বক্সী	
আধুনিক জাপান	২৩৮
শ্রীমতী হেমলতা দেবী	
চিরন্তন (কবিতা)	৯২
শ্রীযুক্ত হিমাংশুপ্রকাশ রায়	
ব্রাদার লরেন্সের পত্রাবলী	২৮৪, ৩১৬, ৩৬২
শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ	
আবাহন (কবিতা)	২
তর্পণ (কবিতা)	২৪৪
নিবেদন	৪৭৩
প্রাণারাম (কবিতা)	২২৪
প্রার্থনা (কবি	

সুপ্রভাত।

রাগিণী ভৈরবী

COLOUR ILLUSTRATION

Presented to the K P L
by Shiva Prashad Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের
জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { শ্রাবণ, ১৩২০। } ১ম সংখ্যা।

সুপ্রভাত।

শ্রাবণ গগন ঘেরা বাদলের মাঝে।
সরায়ে সম্বিৎ হারা মেঘের আঁধার,
নিঃশব্দে প্রভাত জাগে, জাগরণ সাজে;
নিরস্ত ঝর্ঝর, জ্বলে আলোক অপার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সুপ্রভাত।

লভিতে তোমার স্নেহ আশীর্ব্বাদ সুপ্রভাত আজি দুয়ারে,
নন্দন শিশুরে নির্ম্মল রাখ মা, ধরার ধূলির মাঝারে।
হেরুক তোমার অপার্থিব জ্যোতিঃ কাননে সাগরে প্রান্তরে,
হেরুক তোমার সুমঙ্গল রূপ বিঘ্ন বিপদ ভিতরে।
মাতৃ মহিমা নাহি তার সীমা, হে মাতঃ জগত জননী,
দণ্ড মধ্যেতে হেরুক তোমার অনন্ত মঙ্গল রাগিণী।
রুদ্র রাগেতে দীপকের তানে জনম যাহার মরতে,
অশনি নির্ঘোষ শতেক ঝঞ্ঝা কত খেল শিশু ভালেতে।
তবু যে সে আজ সারস্বত কুঞ্জে বীণা বেনু বাঁশী লইয়া,
সপ্তম বরষে উপনীত আজি সে তোমারি কৃপা লভিয়া।
বিশ্বাস অনলে তব প্রেম দীপ উজলি উঠুক ভুবনে,
তাতে লক্ষ্য রাখি এ শিশু খেলুক বিশ্বভূমির প্রাঙ্গণে।
বুদ্ধের মত নির্ব্বাণ মন্ত্রে জাগাক মোহান্ধ মানবে,
চৈতন্যের মত বিভু প্রেম দিয়ে তাপিতে জুড়াক ভবে।
গার্গীর জ্ঞান ঘরে ঘরে দিক, মৈত্রেয়ীর অমৃত কামনা,
খনা লীলাবতী সীতা অরুন্ধতী করুক মায়ের বন্দনা।
ধ্রুবের তপ শিখাও বালকে আবার বঙ্গ কাননে,
পিতৃপদ ওগো এ ব্রহ্মপদ লভুক এ শিশু জীবনে।

শ্রীলীলা।

সেখ ফরিদ।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেখ সাইব নামক এক জন সাধুপুরুষ কাবুল নগরে বাস করিতেছিলেন। অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, যোগ ও সাধন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। যে চাঙ্গেজ খাঁর উৎপাতে সমস্ত মধ্য এসিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহারই একজন বংশধর সে সময়ে কাবুল আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজবংশ নির্ম্মূল ও বিদ্বন্মণ্ডলীর প্রাণবধ করিয়াছিলেন। বিজয়ীদলের অস্ত্রাঘাতে পিতার দেহ দ্বিখণ্ড হইয়া গেল, সেখ সাইব তাহা সহিতে পারিলেন না। তিনি তিন পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সহ স্বদেশের মায়া বিসর্জ্জন করিয়া ৫১৯ হিজরী ও ১১২৫ খৃষ্ট অব্দে পঞ্জাবে আগমন করেন। তখনও ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই; কিন্তু নিত্য জ্ঞাতি বিরোধ, রক্তপাত ও অসংযত সৈন্যকুলের উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার জন্য মধ্য এসিয়া ও আফগানিস্থানের শত শত মুসলমান হিন্দুরাজ্যে আশ্রয় লইত। কসুর নামক স্থানে একজন কাজী বাস করিতেন তিনি বিদ্যার্জ্জনের জন্য বহুদিন কাবুলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখ সাইবের নির্ম্মল চরিত্র, ভগবদ্ভক্তি ও মহাপাণ্ডিত্যের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিদিত ছিল। কাজী পরম সমাদরে তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। কসুরের মত লোককোলাহলপূর্ণ স্থানে তাঁহার সাধনার ব্যাঘাত হইতে দেখিয়া স্বজন সহ তিনি মুলতানে প্রস্থান করেন। কিন্তু এখানেও তিনি ভগবানে আত্মোৎসর্গ করিবার সুবিধা পাইলেন না। তাঁহার সাধুতার যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হওয়াতে প্রতিদিন বহুলোক তাঁহার দর্শনাভিলাষে আগমন করিত। তিনি অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া দিপাল-পুরের নিকটবর্ত্তী কোঠিওয়াল নামক গ্রামে আপনার বাসস্থান নির্ণয় করিলেন। এই গ্রাম এখন চাওয়ালি নামে প্রসিদ্ধ। সেখ সাইব এই নির্জ্জন স্থানে ধর্ম্ম সাধন ও ধর্ম্মশিক্ষা দান করিয়া শান্তিতে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

পুষ্পের সৌরভে যেমন অলিকুল দূরস্থান হইতে পাগল হইয়া আইসে, সেখ সাইবের পুণ্যের সুগন্ধে নরনারীগণ আকুল হইয়া কোঠিয়াল গ্রামে আসিতে লাগিল। ধর্ম্মের তৃষ্ণা যেমন প্রবল, এমন আর কিছুই নয়। সেখ সাইব মানব প্রাণের পিপাসা তৃপ্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, সৎপ্রসঙ্গ ও সৎসঙ্গে তাঁহার দিন যাইতে লাগিল।

মৌলবী ওয়াজউদ্দীন নামক একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি কাবুলে রাষ্ট্রবিপ্লব হওয়াতে জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুলতান জেলার অন্তর্গত কারোর নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। তিনি মহম্মদের জ্যেষ্ঠ-তাত আব্বাসের বংশধর। তাঁহার পালিতা কন্যা বিবি মিরিয়ামের সহিত সেখ সাইবের জ্যেষ্ঠপুত্র জামাল উদ্দীনের বিবাহ হয়। মিরিয়াম অতি ধার্ম্মিকা নারী ছিলেন। তিনি প্রতিদিন বহুক্ষণ ঈশ্বরারাধনায় যাপন করিতেন। যখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা হন, তখন ঈশ্বর কথা শ্রবণে ও ঈশ্বর মননে তাঁহার আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়। ১১৭৩ খৃষ্টাব্দের রমজান মাসের প্রথম দিবসে তাঁহার এক পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। পিতা ইহাঁর নাম রাখিয়াছিলেন ফরিদ।

ফরিদ যখন অতি শিশু, মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারিতেন না, মাতা মিরিয়াম তাঁহাকে কোলে করিয়া প্রার্থনা করিতেন। যখন পুত্র নিদ্রিত হইত, মাতা তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করিতেন। প্রার্থনা ও ধ্যানের হাওয়ায় সন্তান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অতি শৈশবেই মাতা ফরিদকে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছিলেন। ফরিদ জিজ্ঞাসা করিতেন "মা, প্রার্থনা করিলে কি হয়?" মা বলিতেন প্রার্থনা অতি মিষ্ট। মিরিয়াম প্রতিদিন আসনের তলে চিনি রাখিয়া দিতেন। প্রার্থনার পর সেই চিনি বাহির করিয়া পুত্রের হস্তে অর্পণ করিতেন। উত্তর কালে ফরিদ বলিয়াছিলেন, "প্রার্থনা করিলে চিনি পাওয়া যায়, শৈশবে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এখন

দেখি চিনি কোন্ ছার, প্রার্থনার মত অমৃত জগতে নাই।" বাল্যকালেই তিনি প্রার্থনার মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন এইজন্য মাতা তাঁহাকে সকরগঞ্জ বলিয়া ডাকিতেন।

ফরিদ চারি বৎসর বয়সে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অল্প দিনেই তিনি সমস্ত কোরাণ মুখস্ত করেন। অতঃপর তাঁহাকে অপরা বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য মুলতানে প্রেরণ করা হয়। এই স্থান হইতে তিনি পিতা মাতার সহিত মক্কা গমন করেন। তখন নানাদেশের অনেক সাধু সন্ত মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাগদাদের আবদুল কাদির জিলানি ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি সহরের মধ্যে অবস্থিতি না করিয়া মক্কার নিকটবর্ত্তী এক পর্ব্বত গুহায় বাস করিয়া দিবারাত্রি ধ্যান ও প্রার্থনায় যাপন করিতেন। তাঁহার গভীর সাধনার কথা শ্রবণ করিয়া ফরিদ প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। এইরূপে বৃদ্ধ আবদুল কাদিরের সহিত বালক ফরিদের প্রাণের যোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

ফরিদ যে দিন মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, সে দিন আবদুল কাদির স্নেহে বিগলিত হইয়া ফরিদকে একটী বাক্স উপহার দিলেন। সেই বাক্সে মহম্মদের ব্যবহৃত নানাবিধ দ্রব্য ছিল। যুদ্ধ যাত্রা কালে মহম্মদের অগ্রে যে পতাকা উড্ডীন হইত, আবদুল কাদির অতি প্রেমের সহিত তাহা ফরিদের হস্তে অর্পণ করিলেন। সে পতাকা হস্তে লইয়া ফরিদের প্রাণে কত ভাবের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে! আবদুল কাদির ফরিদকে কাষ্ঠপাত্র, এক জোড়া চর্ম্মপাদুকা, উষ্ণীষ ও কণ্ঠাবরণ প্রদান করিলেন। ফরিদ শ্রদ্ধার সহিত তাহা মস্তকে লইয়া মাতৃসদনে উপনীত হইলেন। মক্কা হইতে মদিনা সন্দর্শন করিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার কিয়ৎকাল পরে ফরিদ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাবুল গমন করেন। তথায় অধ্যয়ন সমাপন করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পথে মুলতান নগরে কুতুবউদ্দীন নামক এক সাধুর দর্শনে এমন মুগ্ধ হন যে, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ না করিয়া তিনি কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

এই স্থান হইতে তাঁহার কতিপয় অন্তঃরঙ্গ বন্ধুর সহিত তিনি দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। তাঁহারা সিন্ধুনদী পার হইয়া এক সাধুর গৃহে কয়েক দিন অবস্থিতি করেন, তথা হইতে বোখারায় প্রসিদ্ধ পীর সাহাবুদ্দীন সহরবার্দির নিকট ধর্ম্মশিক্ষার্থ যাত্রা করেন।

দেশ দর্শনজাত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ফরিদ মুলতানে কুতুবউদ্দীনের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থী হওয়াতে কুতুবউদ্দীন কহিলেন "অল্প নিদ্রা, অল্পাহার, অল্প বাক্য, অল্প লোক সংসর্গ, এই সাধন চতুষ্টয় অবলম্বন কর— অবশিষ্ট ক্রমে প্রাপ্ত হইবে।" ফরিদ বলিয়াছেন, "যদি আমার সমস্ত গাত্র রোম রসনা হয়, তবু আমি কুতুবউদ্দীনের মহিমা বর্ণন করিতে পারিব না।" ফরিদকে জ্ঞান দরিদ্র দেখিয়া কুতুবউদ্দীন তাঁহাকে সরসার আবদুল শকরের নিকট বিদ্যা অর্জ্জন করিতে প্রেরণ করেন। ফরিদের প্রাণে ভক্তির উৎস খুলিয়া গিয়াছিল কিন্তু জ্ঞান পথে তিনি বালকবৎ ছিলেন। আপনার অজ্ঞতার জন্যই এতদিন ঈশ্বরের দর্শন পান নাই, সেই খেদে তিনি বলিয়াছিলেন, "হে ফরিদ! তুমি এতকাল ঈশ্বরের পথে যাও নাই, কাযেই তিনি তোমার চক্ষুগোচর হন নাই। এমন লোকত কেহই নাই, যাঁহারা ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য দ্বারে আঘাত করিয়াছেন অথচ দ্বার উন্মুক্ত হয় নাই। যদি তুমি সেই সকল পুণ্যাত্মাদের মতই হইতে চাও, তবে সুহৃদের ভ্রমণ পথে আত্মবিসর্জ্জন কর।"

আপনার অজ্ঞানতায় লজ্জিত হইয়া ফরিদ আবদুল শকরের নিকট জ্ঞান শিক্ষার জন্য গমন করেন। তাঁহার নিকট কিয়দ্দিন অধ্যয়নের পর জ্ঞান ও ভক্তিতে সমুজ্জ্বল হইয়া তিনি দিল্লী নগরে গমন করেন। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সুবিমল জ্ঞান ও ঈশ্বরারাধনায় তাঁহার উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভক্তি দেখিয়া দিল্লীর ধর্ম্মপিপাসু নরনারীগণ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে

বাস করিত। ইহাতে ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত হওয়াতে তিনি প্রথমতঃ হাঁসি নামক নির্জ্জন পল্লীবাসে এবং অবশেষে আযোধান নামক স্থানে গমন করেন। এই আযোধানেই তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিলেন—তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি এই স্থানেই বাস করিতেছেন। বর্ত্তমানকালে এই গ্রাম পাকপত্তন নামে পরিচিত। আযোধানের নিম্ন দিয়া এক জল প্রণালী প্রবাহিত হইয়া যাইত। যাঁহারা ফরিদের দর্শনের জন্য আসিতেন, তাঁহারা এই প্রবাহে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধদেহে আগমন করিতেন এই জন্য আযোধান "বাবা সাহিবকা পাকপত্তন" বা মলিনতাপহারী তরণস্থান নামে পরিচিত হইয়াছিল।

সেখ ফরিদ ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন এবং দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় আরাধনা ও প্রমত্ত কীর্ত্তনে যাপন করিতেন। পাকপত্তনের কাজি আবু মুসাল্লা ফরিদের কীর্ত্তন শুনিয়া তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সুলতানের শাসনকর্ত্তার নিকট গমন করিয়া এই, অভিযোগ করিয়াছিলেন যে ফরিদ কখনও পাগলের ন্যায় গান করে, কখনও নাচে। তাহার উৎপাতে কেহ আর শান্তির সহিত বাস করিতে পারে না। অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত তাহার সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শাসনকর্ত্তা এই হুকুম পাঠাইলেন "আনরা আজ সহর বা দার কুলেদ" তাহাকে সহর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। কিন্তু স্থানীয় রাজ-প্রতিনিধি পাঠ করিলেন "কাজিরা আজ সহর বা দার কুলেদ" কাজিকে সহর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও। বিষয়ী লোকের যেমন দশা হয়, এস্থলেও তাহারই অভিনয় হইল। কাজি ফরিদের শরণাপন্ন হইয়া রাজদণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। কাজি আবু মুসাল্লা লোকমুখে ফরিদের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন কিন্তু ২।১ দিন স্বয়ং তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ফরিদের পুত্র মকতুম বদর উদ্দীনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন।

ফরিদের মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা নারী ছিলেন। ফরিদের যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে, শিষ্য সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, পঞ্জাবের নানাস্থানের ধনীলোকেরা ফরিদের বাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন, মাতা ইহা দেখিয়া বড় বেদনা অনুভব করিলেন। পুত্রের জ্ঞান ও ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ঈশ্বর দর্শন হয় নাই, অনুরাগী শিষ্যদের দ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত থাকিলে ঈশ্বরের দর্শন লাভের সম্ভাবনাও নাই, তাই তিনি ফরিদকে একদিন নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "সকলের অজ্ঞাতসারে একাকী গভীর বনে গমন করিয়া প্রার্থনায় দিন যাপন কর। যতদিন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরকে প্রাণরূপে দেখিতে না পাইবে, ততদিন গৃহে ফিরিয়া আসিও না।" মা সন্তানকে বনে পাঠাইলেন।

ফরিদ দ্বাদশ বর্ষকাল বৃক্ষপত্র খাইয়া মহা সাধন করিলেন। যখন সর্ব্বভূতে ঈশ্বর সত্তা সমুজ্জ্বল হইল, তখন মাতৃসদনে ফিরিয়া আসিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দ্বাদশ বৎসরকাল কি খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলে?" পুত্র বলিলেন, "বৃক্ষপত্র ভিন্ন আর কিছু আহার করি নাই।" দ্বাদশ বৎসরে ফরিদের মাথায় জটা হইয়াছিল। মাতা চিরুণী লইয়া তাঁহার কেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। ফরিদ বলিলেন, "মাথায় বড় লাগিতেছে।" মা বলিলেন, "একগাছি কেশ ছিন্ন হইলে যেমন তোমার ক্লেশ হয়, বৃক্ষের একটী পত্র ছিন্ন করিলেও বৃক্ষের তেমনই ক্লেশ হইয়া থাকে। তুমি কি শোন নাই, বৃক্ষেরও জীবন আছে। কোরাণে লিখিত আছে সমস্ত পদার্থই ঈশ্বরের স্তব করে। বৃক্ষের মধ্যে কি তুমি ভগবানকে দেখিতে পাও নাই?" ফরিদ পুনরায় তপস্যার জন্য বনে গমন করিলেন। এবার মহা কঠোর সাধনা আরম্ভ হইল। তিনি বৃক্ষ হইতে পতিত পত্র, শুষ্ক কাষ্ঠ ও মৃত্তিকা ভিন্ন কিছু আহার করিতেন না। যখন ক্ষুধার যাতনায় ক্লিষ্ট হইতেন, তখন একখণ্ড কাষ্ঠ উদরের উপর বান্ধিয়া মনে করিতেন, প্রচুর আহার করিয়াছেন। এইরূপে প্রায় অনশনে তিনি এক মহাপ্রাণকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেদীপ্যমান দেখিবার জন্য ব্যাকুল চিত্তে সাধনায় মগ্ন হইয়াছিলেন।

পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী সাধনার পর ফরিদ মাতৃচরণ তলে উপনীত হইলেন। মাতা দেখিলেন, তাঁহার আমিত্ব বুদ্ধি ধ্বংস হয় নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এখনও কি মনে হয়, আমি খাই, আমি পরি, আমি করি।" ফরিদ বলিলেন, "সে বুদ্ধি এখনও লুপ্ত হয় নাই।" মাতা বলিলেন, "ঈশ্বর যেখানে সেখানে আমি থাকিতে পারে না। সর্ব্বভূতে এখনও তোমার ঈশ্বর দর্শন হয় নাই।"

ফরিদ এবার আমিত্বের বিলোপ করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। তিনি বনের মধ্যে কূপ খনন করিয়া পদদ্বয় রজ্জুদ্বারা উর্দ্ধ দিকে বন্ধনপূর্ব্বক নিম্ন মুখে কূপের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যখন উৎকট তপস্যায় চৈতন্য লুপ্তপ্রায় হইত, তখন উপরে উঠিয়া ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুল চিত্তে প্রার্থনা করিতেন এবং ঈশ্বরের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। দ্বাদশ বৎসর কাল এইরূপ সাধনায় ব্যাপৃত থাকাতে তাঁহার দেহ নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছিল—পক্ষী আসিয়া তাঁহার জটার মধ্যে কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছিল, হিংস্র জন্তু তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছিল। যখন তাঁহার এমন দশা উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তিনি কাতর স্বরে বলিয়াছিলেন,

ফরীদা তন শুকা পিংজরুথীআ তলীআঁ খুণ্ডহি কাগ। অজৈ সু রবু ন বাহুড়িও দেখু বন্দে কে ভাগ।

আমার শুষ্ক দেহ অস্থিসার হইয়াছে; কাক আসিয়া আমার হস্তপদ দংশন করিতেছে। আজও ঈশ্বর আমার নিকট বাহির হইলেন না। তাঁহার দাসের দশা দেখ।

কাগা করংগ ঢঢোলিআ সগলা খাইআ মাসু। এ দুই নৈনা মতি ছুহউ পির দেখন কী আশ।

হে কাক সকল তোমরা আমার দেহ কঙ্কাল অন্বেষণ করিয়া মাংস খাইতেছ, তাই কর। কিন্তু আমার নয়ন দুটি ছুঁইওনা, এখনও আমার প্রিয়তমকে দেখিবার আশা আছে।

কাগা চূণ্ডি ন পিঞ্জরা বসৈ ত উডরি জাহি। জিতু পিঞ্জরৈ মেরা সহু বসৈ মাসু ন তিদু খাহি।

হে কাক সকল আর এ কঙ্কালে চঞ্চুর আঘাত করিও না। যদি ইহার উপর কখনও আসিয়া বসো, তবে উড়িয়া যাইও। আমার কঙ্কালের যেখানে আমার প্রিয়তম আছেন, সেখানকার মাংস খাইও-না।

ফরীদা গোর নিমানীস ডুকর নিঘরিআ ঘরি আউ। সর পর মৈ থৈ আবনা মরন হু না ডরিআহু।

গোরের মধ্য হইতে তিনি ডাকিয়া বলিতেছেন "হে গৃহশূন্য, ঘরে এসো। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। ভয় করিওনা।"

ফরিদ এবার সত্য সত্যই গৃহশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার আমি চলিয়া গিয়াছে। তিনি ঈশ্বর সত্তা সাগরে ডুবিয়া রহিলেন। একদিন তিনি এই অনাহত বাণী শুনিতে পাইলেন "তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে।" ফরিদ কহিলেন "মুক্তি ভিন্ন আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।"

ইহার কিয়দ্দিন পরে ফরিদ মাতার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বহু লোক সমাগম হইল। একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছত্রিশ বৎসর ব্যাপী এমন উৎকট সাধনা কেন করিলেন?" ফরিদ কহিলেন "নিজে ঈশ্বরের অনুগত হইয়া জগৎকে মসলেম করিবার জন্যই সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" অতঃপর তিনি প্রেম বাহু বিস্তার করিয়া ব্রহ্মময় জগৎকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

পাকপত্তনে প্রেমের মেলা বসিয়া গেল। আবাল বৃদ্ধ নরনারী আপনাদিগকে প্রেমসিন্ধুর এক এক উচ্ছাস বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। ধরাতলে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইতেছে, ইহা দেখিয়া দুইজন সর্ব্বত্যাগী দরবেশ ঈর্ষান্বিত হইলেন। স্বর্গের প্রেম স্রোত দরবেশদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, কেহই সে কথা বলিতেছে না। সকলেই বলিতেছে, ফরিদের

ভক্তির আকর্ষণে ভগবান প্রকাশিত হইয়াছেন। দরবেশদ্বয় ফরিদের প্রাণ সংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার কুটীরে উপনীত হইল। ফরিদের বদন মণ্ডলে প্রেমের প্রভা, তাঁহার বচনে শীতলতা, ও তাহার সংস্পর্শে পুণ্যের সুগন্ধ—দরবেশগণ সে অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল—তাহারা প্রাণ লইতে আসিয়া প্রাণ অর্পণ করিল।

ফরিদের সাধুতার বার্ত্তা পঞ্জাবের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। নিজামউদ্দীন নামক এক মহা পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। নিজাম উদ্দীনের পিতা আহাম্মদ দানিয়েল মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে বোখারা হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া লাহোরে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে লাহোর হইতে বদৌন নগরে গমন করেন। বদৌন নগর সে সময়ে বিদ্বজ্জনমণ্ডলী দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। এই স্থানে ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে নিজাম উদ্দীনের জন্ম হয়। যখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর, তখন তিনি পিতৃহীন হন। মাতা জুলেখা প্রখর বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণ নারী ছিলেন। তিনি পুত্রকে সযত্নে জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন। নিজাম উদ্দীন অল্প বয়সেই এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন যে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "বাহাস" অর্থাৎ তর্ক রত্ন এবং মহফিল শিকন অর্থাৎ দিগ্বিজয়ী উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনন্যসাধারণ মনীষার পরিচয় পাইয়া সম্রাট তাঁহাকে দিল্লীর কাজির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর এই সম্মানাস্পদ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার চিত্তের তৃপ্তি হইল না। তিনি উচ্চ রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের দাসত্ব করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং ভক্তির ভিখারী হইয়া দিল্লী হইতে ফরিদের দ্বারে আগমন করিলেন। জ্ঞান ও ভক্তির মিলনে পাকপত্তনে মহোৎসব আরম্ভ হইল। দিল্লীর কাজি ভারতের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ফরিদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, ইহাতে অবিশ্বাসী বিশ্বাসী হইল, পাপী পুণ্যলাভের জন্য ব্যাকুল হইল, অভক্তের প্রাণ ভক্তিতে দ্রবীভূত হইল। কিয়দ্দিন ফরিদের সঙ্গে যাপন করাতে নিজামউদ্দীনের মধ্যে অপূর্ব্ব ভক্তির সঞ্চার হইল, দিগ্বিজয়ী তর্করত্নকে লোকে আউলিয়া বা উদাসী উপাধি প্রদান করিল। নিজামউদ্দীন আউলিয়া ভক্তিধন জগৎময় ছড়াইবার জন্য পাকপত্তন হইতে বহির্গত হইলেন। যে দিন তিনি পাকপত্তন হইতে প্রস্থান করেন, সে দিন ফরিদ তাঁহাকে নিজের খিল্কা ও খড়ম প্রদান করিলেন। বিদায়কালে ফরিদ বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিলেন তোমার বিচ্ছেদ হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, তোমার প্রেম স্রোতে আমার স্বতন্ত্র সত্বা বিলুপ্ত হইয়াছে।

সম্রাট নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালে আফসাল উদ্দীন দিল্লীর প্রসিদ্ধ শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তিনি ফরিদকে তর্কে পরাস্ত করিবার জন্য একবার পাকপত্তন গমন করিয়াছিলেন। ফরিদ তর্ক বিতর্ক বড় ভাল বাসিতেন না। তিনি নিজাম-উদ্দিনকে আফসাল উদ্দীনের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আফসাল উদ্দীন তর্কে পরাজিত হইয়া বলিয়াছিলেন "যাঁহার শিষ্য এমন, তিনি স্বয়ং না জানি কিরূপ?" আফসাল উদ্দীনের জ্ঞান গর্ব্ব তিরোহিত হইয়াছিল। তিনি বিকলচিত্তে ফরিদের গৃহে উপনীত হইয়াই পুণ্যের সুগন্ধ অনুভব করিলেন। ফরিদের সন্নিকটে যাইয়া দেখিলেন, তাঁহার বদন মণ্ডল হইতে ভক্তির অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে। আফসাল উদ্দীন নীরবে সে সুধা পান করিতে লাগিলেন। সপ্তাহকাল অতীত হইয়া গেল, ফরিদের সঙ্গে বাক্যালাপ হইলনা, আফসাল উদ্দীন ফরিদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

বাবরের জীবনী।

একাদশ অধ্যায়।

বাবর এইরূপে বাকীর ষড়যন্ত্রজাল হইতে মুক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত মনে কাবুলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন বিশ্রাম সুখ ছিল না, কোনদিক না কোনদিক হইতে বিপদ লাগিয়াই ছিল সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি কোথায়ও শান্তিতে রাজত্ব করিতে পান নাই। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে সেবানী খাঁ দিন দিন বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতেছিলেন; সমগ্র মধ্য-এশিয়ায় একাধিপত্য বিস্তার করিবার পর চারিদিকে তিনি আপনার প্রভুত্ব এবং অধিকার বাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে হিসার এবং কুন্দুজ রাজ্য খসরু সাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার দক্ষিণে অধিকার বাড়াইবার জন্য তিনি জাল বিস্তার আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই সময় তাঁহার সৈন্যদিগের মধ্যে হঠাৎ বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় সেবানী দিগ্বিজয়ের সঙ্কল্প আপাততঃ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। ফারগণা, তাসখন্দ, সমরখন্দ, হিসার প্রভৃতি সমুদয় রাজ্যই সেবানী খাঁ তাইমুরের বংশধরদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই সকল রাজ্যে বিস্তর মোগল বাস করিত এবং ইহাদিগের অনেকেই সেবানী খাঁর সৈন্য দলভুক্ত হইয়াছিল; কালে সেবানির রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল মোগল সৈন্যের সংখ্যাও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল। ইহারা স্বভাবতঃই অসভ্য উজবেগদিগকে মনে মনে ঘৃণা করিত এবং কিরূপে পুনরায় তাইমুরের বংশকে এই সকল রাজ্যের শূন্য সিংহাসনে বসাইবে দিনরাত কেবল তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করিত। সেবানী খাঁ যখন তাহাদিগের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন তখন সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতীকার করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য কোনও প্রকার নিষ্ঠুরতাতেই তিনি পশ্চাদপদ হইতেন না। মোগলেরা এই বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছে, সুতরাং মোগলদিগের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন; সঙ্কল্প যখন স্থির হইল তখন সেবানি খাঁ কোনও প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। অশ্রুতপূর্ব্ব বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা তিনি আপনার মোগল সৈন্যদিগকে হত্যা করিলেন এবং যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহাদিগকে চিরজীবনের জন্য সুদূর কারাগারে প্রেরণ করিলেন। সেবানী খাঁর অত্যাচার এইখানেই শেষ হইল না। বেগমমহলে যে সকল হতভাগ্য রমণী সম্ভ্রান্ত মোগল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ দুর্দ্দান্ত সেবানী খাঁর করতলগত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগেরও লাঞ্ছনার সীমা রহিলনা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সেবানী খাঁ বাবরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী খানজাদা বেগমকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এই বিবাহের একটু ইতিহাস আছে। খানজাদা বেগমের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া সেবানী তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে সেবানী খাঁ প্রথমবার যখন সমরখন্দ আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন মেহের নিজারখানুম নামক বাবরের এক মাতৃষ্বসাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।* এক্ষণে খানজাদা বেগমকে বিবাহ করিবার জন্য নিষ্ঠুর সেবানী অবলীলাক্রমে মেহের নিজারখানুমকে পরিত্যাগ করিলেন। নিজারখানুম, খানজাদা বেগমের আপনার মাতৃষ্বসা; এই ঘটনা হইতেই সেবানী খাঁর

* এই মেহের নিজার খানুম জুনিস্ খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা; আবু সৈয়দের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান আহম্মদ মির্জ্জার সহিত ইঁহার প্রথমে বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহার মৃত্যুর পর সেবানী খাঁ যখন প্রথম সমরখন্দ আক্রমণ করেন তখন আবু সৈয়দের এই বিধবা স্ত্রীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বাবরের মাতা কতলুক নিজার খানুমের সহোদরা।

মতিগতি এবং আভ্যন্তরীণ চরিত্রের বিলক্ষণ আভাষ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য খানজাদা বেগম প্রথম হইতেই সেবানী খাঁকে দেখিতে পারিতেন না; তাহার উপর আবার অমানুষিক নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। সেবানীরও কিছুদিন পরে রূপের নেশা কাটিয়া গেল; কারণ মোগলদিগের অন্তঃপুরে হৃদয়ের অভাব থাকিলেও সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না। উপেক্ষিতা খানজাদা বেগম বন্দিনীর ন্যায় অসভ্য উজবেগ দলপতির অন্তঃপুরে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সেবানী খাঁ এক অদ্ভুত তথ্য আবিষ্কার করিলেন। কেমন করিয়া বলা যায় না সেবানী খাঁর সন্দেহ হইল যে খানজাদা বেগম গোপনে বাবরের নিকট সেবানীর সৈন্যবল, গতিবিধি সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন এবং ইঁহারই প্ররোচনায় মোগল সৈন্যদিগের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। এইরূপ সন্দেহ করিবার একেবারেই যে কোন কারণ ছিল না তাহা নহে। সেবানী খাঁ যখনই বাবরের বিষয় লইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেন, তেজস্বিনী খানজাদা বেগম তখনই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন এবং বাবরের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির কথা সকলের নিকট প্রকাশ্য ভাবে বলিতে, তিনি বিন্দুমাত্রও ভীত হইতেন না। এমন কি সেবানী খাঁর সম্মুখেই তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন যে তাঁহার সমগ্র হৃদয় রাজ্যচ্যুত, আশ্রয়-হীন, অসহায় বালক বাবরের জন্য রোদন করিতেছে। মোগল সৈন্যদিগের বিদ্রোহ ব্যাপার প্রকাশ হইবার পর যখন সেবানী খাঁ অন্তঃপুরের মধ্যেও অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন তখন বেগম মহল হইতে মোগল রমণীগণ ছদ্মবেশে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। এই গোলযোগের সূত্রপাত হইবামাত্র সেবানী খাঁ খানজাদা বেগমকেও পরিত্যাগ করি-লেন।

এইখানে বাবরের আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে একটু বিশেষ পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন। বাবরের মাতামহ জুনিস্ খাঁ প্রথমে আইস দৌলত বেগমকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রমণীর তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। আবু সৈয়দের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান আহম্মদ মির্জ্জার সহিত জুনিস্ খাঁ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেহের নিজার খানুমের বিবাহ দিয়ছিলেন। আহম্মদ মির্জ্জার মৃত্যুর পর সেবানী খাঁ যখন সমরখন্দ আক্রমণ করেন, তখন মেহের নিজার খানুমকে তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুকাল পরে বাবরের সহোদরা খানজাদা বেগমকে বিবাহ করাতে সেবানী খাঁ মেহের নিজার খানুমকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। জুনিস্ খাঁর দ্বিতীয়া কন্যা কত্‌লুক্ নিজার খানুমের সহিত বাবরের পিতা ওমর সেখ মির্জ্জার বিবাহ হইয়াছিল। ওমর সেখের মৃত্যুর পর কত্‌লুক্ নিজার পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন নাই। জুনিস্ খাঁর সন্তানদিগের মধ্যে ইনিই পিতামাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিলেন। জুনিস খাঁ যতদিন জীবিত ছিলেন প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আপ-নার প্রিয়তমা কন্যার নিকট আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়া যাইতেন। অতঃপর জুনিস্ খাঁ এবং ওমর সেখ উভয়ে পরলোকগত হইলে আইস দৌলত বেগম নিজে বহুদিন পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত বয়স বালক বাবরের অভিভাবকতা করিয়াছিলেন। জুনিস্ খাঁর তৃতীয় কন্যা খুব নিজার খানুমের সহিত উরাটীপার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ হুসেন ডগ্‌লাতের বিবাহ হইয়াছিল। কা… ইনি সেবানী খাঁর মোগল সৈন্যদিগের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। জুনিস্ খাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর না… শাহা বেগম। ইঁহার দুই পুত্র এবং দুই কন্যা জন্মগ্রহ… করিয়াছিল; পুত্রদ্বয়ের বিশেষ পরিচয় পূর্ব্বে দেও… হইয়াছে; ইঁহারাই বাবরের মাতুল মামুদ খাঁ … আহম্মদ খাঁ। জুনিস্ খাঁর মৃত্যুর পর শাহা বেগম তদী… জ্যেষ্ঠপুত্র মামুদ খাঁর রাজধানী তাসখন্দ নগরে অব… স্থান করিতেছিলেন; আহম্মদ খাঁ মোগলিস্থানের মরু… ভূমির মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া শাহা বেগম তাঁহা… নিকট বড় একটা যাইতেন না। ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন… সুলতানা নিজার খানুমের সহিত আবু সৈয়দের তৃতী… পুত্র সুলতান মামুদ মির্জ্জার বিবাহ হয়; এই বিবাহে… ফলে সুলতান নিজারের খাঁন মির্জ্জা নামক এক পু… জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শাহা বেগমের অত্যন্ত প্রিয়পা…

ছিলেন এবং শৈশব হইতেই মাতুলালয় তাসখন্দ নগরে মাতামহীর নিকট লালিত পালিত হইতে-ছিলেন। ইঁহার জন্য বাবর ভবিষ্যতে বিপন্ন হইয়া-ছিলেন এবং তাঁহার সিংহাসন যায় যায় হইয়াছিল। শাহা বেগমের কনিষ্ঠা কন্যা সেবানী খাঁর কবলে পতিত হইয়াছিলেন; সেবানী যখন তাসখন্দ নগর অধিকার করেন তখন তিনি নিজে মামুদ খাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শাহা বেগমের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত আপনার পুত্র তাইমুর সুল-তানের বিবাহ দিয়াছিলেন।

বাবরের আত্মীয় স্বজনের সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হইল। ইহা হইতে সকলে দেখিতে পাইবেন যে শাহা বেগম সম্পর্কে বাবরের মাতামহী হইলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জুনিস খাঁর প্রথমা পত্নী আইস দৌলত বেগমই তাঁহার নিজের মাতামহী ছিলেন এবং মামুদ খাঁ প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা আপনার মাতুল নহেন। সেবানী খাঁ ইহাঁদিগের নিকট হইতে শুধু রাজ সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই; তাইমুরের বংশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে তিনি আপনার অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মোগল সৈন্যদিগের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সেবানী খাঁর চক্ষু সর্ব্ব প্রথমেই আপনার অন্তঃপুরের দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি মোগল রমণীদিগের প্রতি কঠোর অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই অত্যাচারের ফলে অনেকে সমরখন্দের বেগম মহল হইতে নানা দিকে পলায়ন করিয়াছিলেন; এই সকল পলায়িতা রমণীদিগের মধ্যে অনেকেই বাবরের নিকট আত্মীয় ছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মোগল সৈন্যদিগের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই সেবানী খাঁ বাবরের জ্যেষ্ঠা সহোদরা খানজাদা বেগমকে পরিত্যাগ করেন। খাঁনজাদা বেগম সেবানীখাঁর অন্তপুর হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। রাজ্যের মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত হইবামাত্র তিনি সৈয়দ হাদি নামক জনৈক ধর্ম্মোপদেষ্টার সহযোগে খোরাসান অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে ইহাকেই পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বাবরের মাতৃষ্বসা মেহের নিজার খানুম, মাতামহী শাহা বেগম এবং তদীয় দৌহিত্র খাঁন মির্জ্জা এবং আরও অনেকে বাবরের নূতন রাজ্য লাভের সংবাদ অবগত হইয়া নানাবিধ ক্লেশভোগ করিবার পর কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে উরাটীপার শাসন-কর্ত্তা মহম্মদ হুসেন মির্জ্জা ডগলাতের সহিত আইস-দৌলত বেগমের তৃতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, এইজন্য মহম্মদ হুসেন মির্জ্জা সম্পর্কে বাবরের মাতৃ-ষ্বসা ছিলেন। বাবরের মাতা কত্‌লুক্ নিজার খানুম এবং জ্যেষ্ঠা মাতৃষ্বসা মেহের নিজের খানুম হুসেন মির্জ্জাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ইনি কালে সেবানী খাঁর মোগল সৈন্যদলের অধিনায়ক পদ লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু মোগলদিগের মধ্যে বিদ্রো-হের সূচনা আরম্ভ হইবামাত্র সেবানী খাঁ হুসেন মির্জ্জার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। মির্জ্জা সেবানী-খাঁর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে সমরখন্দ হইতে পলায়ন করিলেন এবং পথিমধ্যে মেহের নিজার খানুম, শাহাবেগ প্রভৃতির সহিত মিলিত হওয়ায় সকলে একসঙ্গে কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইঁহারা কাবুলে পৌঁছিবার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বেই বাবরের মাতা কতলুক নিজার খানুম মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তারিখ—ই—রেসিদি গ্রন্থের প্রণেতা হায়দর মির্জ্জা * লিখিয়াছেন যে আমরা এই দুর্ঘটনার সংবাদ অবগত হইয়া শোকে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম, কারণ কতলুক নিজার খানুমের আত্মীয়তার বলেই আমরা কাবুল অভিমুখে যাইতেছিলাম। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ অবগত হওয়ায় আমরা যারপর নাই দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তথাপি বাবর আমাদিগকে এরূপ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন যে আমরা একেবারে

* ইনি উরাটীপার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ হুসেন মির্জ্জা ডগলাতের পুত্র এবং বিখ্যাত তারিখ-ই-রেসিদি গ্রন্থের লেখক; সুতরাং হায়দর মির্জ্জাও বাবরের সম্পর্কে মাসতুতো ভাই ছিলেন।

অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। রাজধানীর সন্নিকটে তিনি আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং আমরা উপস্থিত হইবা মাত্র বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বাবরের সৌজন্যতায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহারা নিশ্চিন্ত মনে কাবুলে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে সেবানীখাঁ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অশান্তি দমন করিয়া পুনরায় দ্বিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। এবার খোরাসান অধিকার করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তথাকার শাসনকর্ত্তা সুলতান হুসেন মির্জ্জা অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এজন্য তিনি নিকটবর্ত্তী সমুদয় রাজন্যবর্গকে সাহায্যার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। সেবানী খাঁকে তদানীন্তন কালের নৃপতিগণ সর্ব্বদাই বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন এবং তিনিও আপনার দিগ্বিজয়ের দ্বারা সকলকেই শত্রু করিয়া তুলিয়াছিলেন ; এজন্য খোরাসানের সুলতানের বিপদে সকলেই আপনার বিপদ বলিয়া বিবেচনা করিলেন এবং সকলেই আপন আপন দলবলসহ খোরাসান অভিমুখে রওনা হইলেন। কাবুল হইতে বাবরও সেবানী খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইলেন। সেবানী বাবরের প্রধান শত্রু, সুতরাং সুবিধা পাইলে যে কোন অবস্থাতেই তিনি সেবানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বাবর অল্পদিন মাত্র কাবুল অধিকার করিয়াছিলেন। এমতা বস্থায় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করা যদিও সুবিবেচনার কার্য্য নহে তথাপি চিরশত্রু সেবানীখাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার প্রলোভন কিছুতেই তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। আত্মীয় স্বজনের প্রতি রাজ্যরক্ষা করিবার ভার অর্পণ করিয়া আপনার দলবলসহ বাবর অবিলম্বে খোরাসান অভিমুখে রওনা হইলেন। কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন যে খোরাসানের বৃদ্ধ নৃপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং সেবানী খাঁ ত্বরিত গতিতে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য আসিতেছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া বাবরও যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে খোরাসান অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং ক্রমাগত অশ্বারোহণে আটশত মাইল অতিক্রম করিয়া অক্টোবর মাসের শেষে মারঘাব নদীর তীরে খোরাসানী সৈন্যদলের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন।

কিন্তু এখানে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে বৃদ্ধ নৃপতি সুলতান হুসেন মির্জার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সিংহাসন লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে। মুসলমান জাতির প্রথানুসারে হুসেন মির্জ্জার বেগম মহলে রমণীর অভাব ছিলনা ; ইহাদিগের মধ্যে একজনের গর্ভে হুসেন মির্জ্জার জ্যেষ্ঠপুত্র বাদিএজ্জমা মির্জ্জা জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু অন্য পুত্র তাঁহার প্রিয়তমা বেগমের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; ইঁহার নাম মজাফর হুসেন মির্জ্জা। ইনি প্রিয়তমা মহিষীর পুত্র বলিয়া রাজ্যস্থ আমীর এবং ওমরাহগণ অনেকেই ইঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং ন্যায়ানুসারে জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেও মজাফর হুসেন আপনার দলবল লইয়া জ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ভাই ভাইয়ের মধ্যে সিংহাসন লইয়া এরূপ গুরুতর সংগ্রাম বাধিয়া গেল যে অদূরে সেবানীখাঁর আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়াও ইঁহারা কেহই আত্মকলহ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। খোরাসানের যখন এইরূ আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন বাবর সদলবলে মারঘা নদীর তীরে আসিয়া খোরাসানী সৈন্যদিগের সহি মিলিত হইলেন। এখানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে তি উভয় ভ্রাতার মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য সচে হইলেন। সকলের মধ্যস্থতায় এই স্থির হইল উভয়েই আপন আপন দলবল সহ খোরাসানে রাজ করিবেন এবং উভয়েই পালাক্রমে সিংহাসনে আরো হণ করিবেন। বাবর তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছে এই অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় ন গুলিস্তানের বিখ্যাত কবি সেখ সাদি যথার্থই বলি ছেন, এক কম্বলের উপর দশজন ফকীর মনের সু নিদ্রা যাইতে পারেন কিন্তু এই বিশাল পৃথিবীও নরপতির বাসের পক্ষে যথেষ্ট নহে, কিছুতেই তাহারা মিলিয়া মিশিয়া একত্র বাস করিতে পারে না।

উভয় ভ্রাতার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের সাজসজ্জা এবং আড়ম্বরাদি দেখিয়া বাবর হতাশ হইয়া পড়িলেন। বাদিএজ্জমান ও মজাফর হুসেন বাল্যকাল হইতেই বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন ; যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবল শত্রুর সম্মুখে কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহা কোন দিন শিক্ষা করেন নাই। বাল্য এবং কৈশোরকাল বেগম মহলে অতিবাহিত করায় ইঁহারা শুধু বাদশাহী আদবকায়দাই শিক্ষা করিয়াছিলেন—রাজনীতির কঠোরতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। বাবর তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন—আমি যখন মারঘাব নদীতীরে মির্জ্জাদিগের শিবিরে উপস্থিত হইলাম তখন তাঁহাদিগের বাসস্থানের আড়ম্বর দেখিয়া মনে হইল যে এরূপ আয়োজন এবং সাজসজ্জা কখনও যুদ্ধক্ষেত্রের উপযোগী নহে—ইহা উৎসবের দিনেই সাজে। স্বর্ণ এবং রৌপ্যের ঝালর যুক্ত সুবিশাল তাম্বুর মধ্যে মির্জ্জাদ্বয় সুসজ্জিত হইয়া বসিয়াছিলেন। পারস্য দেশীয় বহুমুল্য গালিচা এবং কার্পেটের উপর অন্যান্য সভাসদগণের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাম্বুর মধ্যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্ম্মিত রাশি রাশি পানাধার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং চারিদিকই অনাবশ্যক আড়ম্বরের আতিশয্যে ঝল্‌মল্ করিতেছিল। বাবর যথার্থই লিখিয়াছেন এরূপ আয়োজনের দ্বারা দুর্দ্ধর্ষ সেবানীখাঁর গতিরোধ করিতে যাওয়া বাতুলতার লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সোণারূপার পেয়ালা দ্বারা যুদ্ধ করা যায় না বরং এই সকল মূল্যবান দ্রব্যের লোভে সেবানীখাঁর লুণ্ঠনলোলুপ উজবেগগণ আরও মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিবে। কিন্তু এসকল উপদেশ কে শুনিবে ? মির্জ্জাদ্বয় আলাপ ব্যবহার এবং সৌজন্যতায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধকালে কিরূপ করিয়া সৈন্যপরিচালনা করিতে হয় তাহার কিছুই জানিতেন না। যে সকল বহুদর্শী সৈনিক এ সকল বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, তাহারা মির্জ্জা ভ্রাতৃদ্বয়ের শৈথিল্য দর্শন করিয়া নীরব হইয়া থাকিত এবং অপমানের ভয়ে ইঁহারাও অন্য কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। বাবর লিখিয়াছেন যে, হিরাট হইতে মারঘাব নদীর তীরে পৌছিতেই ইহাদিগের চারি মাস সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। ইতিমধ্যে সেবানী খাঁ খোরাসান রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলখ দুর্গ অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। সেখানকার দুর্গরক্ষক আপনার অধীন সৈন্যদিগকে লইয়া প্রাণপণে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং সাহায্যের জন্য মির্জ্জাদ্বয়ের নিকট লোকের উপর লোক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কে সাহায্য করিতে যাইবে এবং কত সৈন্য তাঁহার সহিত প্রেরণ করা হইবে, এই মীমাংসা করিতেই কয়েক মাস কাটিয়া গেল এবং ইতিমধ্যে বলখ দুর্গ সেবানী খাঁর করতলগত হইল। বাবর বলখ দুর্গ পুনরাধিকার করিতে যাইবার জন্য মির্জ্জাদিগের নিকট বার বার অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ এবং সম্মান হানির ভয়ে মির্জ্জাদ্বয় বাবরকে যাইতে দিলেন না। ইতিমধ্যে শীতের প্রাচুর্য্যবশতঃ বরফ পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় সেবানী খাঁ আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, নিকটস্থ জনপদসমূহ লুণ্ঠন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সেবানী খাঁই যখন চলিয়া গেলেন, তখন মির্জ্জাদ্বয় যুদ্ধের অভিনয় আপাততঃ স্থগিত রাখিবার মনস্থ করিলেন। সম্মুখে দারুণ শীত ; সুতরাং সকলে মিলিয়া পরামর্শ হইল যে, শীতের অবসানে পুনরায় সকলে সমবেত হইয়া সেবানী খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করা যাইবে ; সমাগত মিত্ররাজগণ শীত কাটাইবার জন্য আপন আপন সুবিধানুযায়ী স্থানে প্রস্থান করিলেন। বাবর কাবুলে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। মির্জ্জাদ্বয় তাঁহাকে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তুষ্টি সাধনের জন্য প্রতিদিন নানারূপ উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন কিন্তু বাবরের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সবেমাত্র তিনি বিদেশ হইতে আসিয়া কাবুল অধিকার করিয়াছিলেন, তখনও রাজ্য মধ্যে ভালরূপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং চারিদিকে স্বাধীনতা-

প্রিয় দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণ কাবুলের সিংহাসন পুনরধিকার করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। এরূপ অবস্থায় দীর্ঘকাল রাজধানীতে অনুপস্থিত থাকিলে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাতে আবার কাবুল খোরাসান হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ক্রমাগত তিন মাস ধরিয়া অশ্বারোহণে আট শত মাইল গমন করিবার পর তিনি কাবুল হইতে খোরাসান রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তাহাতে আবার দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলে, বিপদের আর পরিসীমা থাকে না। এরূপ অবস্থায় কাবুল হইতে অধিক দিন অনুপস্থিত থাকা কোনও-ক্রমে বাবরের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। তিনি মির্জ্জাদ্বয়ের সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ডিসেম্বর মাসের শেষে কাবুল অভিমুখে রওনা হইলেন।

শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাচীন কথা।

(চট্টগ্রাম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত)

নিসর্গ লক্ষ্মীর লীলা নিকেতন চট্টগ্রাম অতীব মনোহর স্থান এবং অতি প্রাচীন সহর। এই চট্টগ্রাম অতি প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন নামে পরিচিত। কিন্তু চাটিগ্রাম, চাটিগাঁও, চাটিগাঁ ও চট্টল চট্টগ্রাম নামেরই রূপান্তর মাত্র।

চট্টগ্রাম।

১। চট্টগ্রাম—চট্টগ্রামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (১) চট্ট চাটি অর্থাৎ প্রদীপ, গ্রাম স্থান, প্রদীপের স্থান (Land of light) এরূপ কিম্বদন্তী আছে, অতি প্রাচীনকালে এদেশে ভূত, পরী প্রভৃতি বাস করিত। কতকগুলি পাহাড়, দ্বীপ ও পুষ্করিণীর নাম পরীর নামে পরিচিত। যথা—পরী পাহাড় (Fairy Hill) পরীর দ্বীপ (Sanvip) পরীতলাও (Fairy Tank) ইত্যাদি। এমন কি পরীর রাজা আরথঙ্গের নামানুসারে আরাকানের নাম হইয়াছে। আরাকানকে ইতঃপূর্ব্বে "রেথাম" বলা হইত। যখন বারজন আউলিয়া অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্মযাজক ভ্রমণ করিতে করিতে এদেশে আসেন, তাঁহারা এ সমস্ত অপদেবতা ভূত ও পরীদিগকে তাড়াইবার জন্য একটি প্রদীপ জ্বালিলেন, এই প্রদীপটি একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে স্থাপন করিয়া সমুজ্জ্বল করিলেন। এই প্রদীপটির এমনি গুণ ছিল যে, ভূত, পরী প্রভৃতি অপদেবতারা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইল। সেই অবধি এই দেশ চট্টগ্রাম অর্থাৎ প্রদীপ রাখিবার স্থান নামে অভিহিত হইল।

সপ্তগ্রাম।

২। আবার কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম বঙ্গের সপ্তগ্রাম হইতে আমরা এদেশে আসিয়াছিলাম বলিয়া তদানীন্তন এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা আমাদিগকে সপ্তগ্রামের লোক বলিত এবং এই সপ্তগ্রামই তাহাদের মুখে বিকৃতরূপে উচ্চারিত হইয়া চট্টগ্রাম নামে পরিচিত হইয়াছে।

ছাতগাম।

৩। আরবী ও পারস্য ভাষায় কৃতবিদ্য মৌলবী হামিদুল্লা খাঁ বাহাদুর বলেন, তিনি অতি কোন প্রাচীন পারস্য গ্রন্থে চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম "ছাতগাম" পাইয়া ছেন। উর্দ্দূ ভাষায় ছাত অর্থে সাত এবং গাম অর্থে গাঁও বুঝাইতেছে, অর্থাৎ ছাতগাম অর্থ সপ্তগ্রা (Land of seven villages) সাতটি গ্রাম এক হইয়া এই নামে পরিচিত হইয়াছে। তৎপরে অ লোকেরা ইহাকে নামে মাত্র শুদ্ধ করিতে গি চট্টগ্রামে অভিহিত করিয়াছে।

চৈত্য গ্রাম।

৪। কোন কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে পালি ভাষায় এই স্থানকে "চৈত্য গ্রাম" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। চৈত্য অর্থে বিহার (Pagoda) গ্রাম অর্থ সমূহ অর্থাৎ চৈত্য গ্রাম অর্থে বিহার সমূহের স্থান (Land of Pagodas) বুঝাইতেছে। এই চৈত্য গ্রামই উচ্চারণ ভেদে চট্টগ্রাম নামে অভিহিত হইয়াছে।

ইস্‌লাম আবাদ।

৫। চট্টগ্রামের অপর নাম ইস্‌লাম আবাদ (City of God)। সম্রাট আরঙ্গজেবের অনুমতিক্রমে নবাব সায়েস্তা খাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে চট্টগ্রামের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা উমেদ খাঁ এই চট্টগ্রামের নাম ইস্‌লাম আবাদ রাখেন। ইস্‌লাম শান্তি (ঈশ্বরের অপর নাম) আবাদ নগর অর্থাৎ ইস্‌লাম আবাদ অর্থে "ঈশ্বরের শান্তিময় নগর" বুঝাইতেছে।

রম্যভূমি বা রম্যবতী।

৬। কেহ কেহ বলেন, চট্টগ্রাম অতি পূর্ব্বকালে রম্যভূমি (Beautiful land) নামে অভিহিত ছিল। রম্য, রমণীয়, ভূমি স্থান রম্যভূমি অর্থে মনোহর স্থানকে বুঝাইতেছে। প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ ঐ দেশকে রম্যবতী, আরাকানকে ধান্যবতী, রেঙ্গুনকে হংসবতী এবং মান্দালাকে অমরাবতী আখ্যা দিয়াছিলেন। রম্যবতী ও রম্যভূমি একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

সহরে সব্‌জে।

৭। কথিত আছে, দ্বাদশ শতাব্দীতে আরবেরা বাণিজ্য ব্যপদেশে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহারা এই সহরের নাম "সহরে সব্‌জে" রাখিলেন। এদেশের অনেক শিক্ষিত মৌলবী বলেন তাঁহারা পুরুষ পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছেন চট্টগ্রাম সহরকে অতি প্রাচীন কালে "সহরে সব্‌জে" (Green City) বলা হইত। সহরে সব্‌জে অর্থে সবুজবর্ণ সহরকে বুঝাইতেছে। ইসলাম আবাদের পুরাতন শাসনকর্ত্তা নবাব সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা খাঁ মোজফরজঙ্গ বলিয়াছেন এই নগরের নাম অতিপূর্ব্বে "সহরে সব্‌জে" ছিল।

শ্যামল নগর।

৮। কুমার নামে একজন ত্রিপুরারাজ শ্যামল নগরে শিবলিঙ্গ দর্শনে গিয়াছিলেন। এই শ্যামল নগর চট্টগ্রাম নগর বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন। শ্যামল—সবুজবর্ণ নগর—নগ অর্থাৎ বৃক্ষ বা পর্ব্বত আছে যে স্থানে; কিন্তু বর্ত্তমানে নগর অর্থে বিপরীত বুঝাইয়া থাকে।

বার আউলিয়ার দেশ।

৯। চট্টগ্রাম সাধু ফকিরের দেশ। এ দেশকে সাধারণতঃ সাধু ফকিরের "বার আউলিয়ার দেশ" বলিয়া থাকেন। কথিত আছে বারজন আউলিয়া বা মুসলমান ধর্ম্ম যাজক এখানে সিদ্ধি লাভ করেন।

তট্টগ্রাম।

১০। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে এই স্থানকে তট্টগ্রাম বলা হইয়াছে। তট্টগ্রাম—তট্ট তট্ বা তীরবর্ত্তী গ্রাম অর্থাৎ সমুদ্রতটবর্ত্তী গ্রাম বুঝাইতেছে।

পোর্টো গ্রাণ্ডো।

১১। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা এই সহরে বাণিজ্য করিতে আসন। তাঁহারা এই বন্দর দেখিয়া অতীব আনন্দিত হন এবং চট্টগ্রাম বন্দরের নাম "পোর্টো গ্রাণ্ডো" (Porto Grando) অর্থাৎ প্রধান বন্দর রাখেন।

সমালোচনা।

চট্টগ্রামের এই অষ্টবিধ নামের মধ্যে সহরে সব্‌জে অর্থাৎ সবুজবর্ণ সহর, শ্যামল নগর এবং রম্যভূমি বা রম্যবতী এই তিনটী নামের মূলে অতীব গূঢ় সত্য নিহিত আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক শোভা যেরূপ রমণীয় এবং ইহার শস্য শ্যামল লতাপাতা শষ্পদল শোভিত অঙ্গাভরণ যেরূপ নয়নাভিরাম, সবুজ সহর বা শ্যামল নগর এবং রম্যভূমি বা রম্যবতী নামে এই স্থানকে অভিহিত করিলে প্রকৃত নামের সার্থকতা হয়। একদা কলিকাতা প্রবাসী আমার কোন প্রিয়তম ছাত্র যখন আমার সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে পরী পাহাড়ের শীর্ষ দেশে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল

তখনই সে আমাকে অতীব সন্তোষের সহিত বলিয়া উঠিল, কলিকাতা নগরীর ধূমায়মান ধুলিপটল সমাচ্ছাদিত সৌধ শ্রেণী দেখিতে দেখিতে আমার চক্ষে যে একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করিতাম অদ্য আমার জন্মভূমির শস্য শ্যামল অঙ্গাভরণ সন্দর্শনে চক্ষু সুশীতল হইল, কতই না আরাম বোধ করিলাম। এইরূপ বলিতে বলিতে সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল কলিকাতার ম্যাকনিল্ মেকেঞ্জি আফিসের একটী বাবু চট্টগ্রামে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে রঙ্গমহাল পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "আহা কি চমৎকার শোভা, চোখ যেন জুড়াইয়া গেল। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক শোভা যে এতই মধুর স্বপ্নেও ত ভাবি নাই।" অতঃপর তিনি উক্ত পাহাড়ের শীর্ষ দেশে অবস্থানপূর্ব্বক বলিলেন "বলুন দেখি মহাশয় চট্টগ্রামের হাওয়ার ভরি কি দরে বিকায়? আমি এখানে বসিয়া যেরূপ মৃদু মধুর হাওয়া পাইলাম আমার জীবনে এরূপ সুখ ভোগ কখনও ঘটে নাই।"

অনেক দিন হইল জর্ম্মণ দেশীয় একজন সাহেব আকিয়াব হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া আমাদের অতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহাকে আমাদের টম্ টম্ গাড়ী করিয়া এই সহর প্রদক্ষিণ করান হয়। তিন এই সহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া বলেন "বিলাতে এইরূপ সুন্দর স্থান দেখা যায় না। তোমরা স্বর্গে বাস করিতেছ।"

চট্টগ্রামকে পর্ত্তুগীজেরা যে পোর্টোগ্রাণ্ডো অর্থাৎ প্রধান বন্দর আখ্যা দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছিল। কারণ এই বন্দর অতি প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নবম শতাব্দীতে আরবগণ এ বন্দরে বাণিজ্য করিতে আসেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন রাজদূতগণ ৩০ খানি জাহাজে আরোহণ করিয়া এই বন্দর পরিদর্শন করেন। কনষ্টান্টিনোপলের সুলতান আলেক্জান্দ্রিয়া অপেক্ষা চট্টগ্রামে অল্প ব্যয়ে জাহাজ তৈয়ারি হইতে পারে অবগত হইয়া চট্টগ্রাম বন্দরে ও সন্দীপে জাহাজ নির্ম্মাণ করাইতে থাকেন।

চট্টগ্রামে জাহাজ নির্ম্মাণ ও নৌ-বিদ্যা।

সে আজ অনেক বৎসরের কথা যখন আমরা এই উচ্চ ইংরাজী স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম। আমার বেশ মনে পড়ে ইংরাজী ভূগোলে পড়িয়াছিলাম Chittagong is famous for ship building অর্থাৎ চট্টগ্রাম জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ। এই বন্দরে জাহাজ তৈয়ারি হইতেছিল দেখিয়া পুস্তকের ভাষা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তাহার বেশ প্রমাণ পাইতাম। তখন একদিন এখানকার বর্দ্ধিষ্ণু কোন মুসলমান ব্যবসায়ীর একখানা নূতন জাহাজ মহাসমারোহে কর্ণফুলী নদীতে ভাসান হইবে সংবাদ পাইলাম। কাছারি ও অন্যান্য সদাগরি আফিস ছুটী হইতেছে এ খবর পাইতেও আমাদের বিলম্ব হইল না। তখনকার স্কুলের নিয়মানুসারে দ্বিতীয়শ্রেণীর ছাত্রগণকে সমস্ত স্কুলের ছাত্রের পক্ষে ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিতে হইত। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষার বৎসর বলিয়া কোন ছুটী প্রার্থনা করা তাহাদের পক্ষে অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত, যদিও ছুটী পাইলে তাহারা আগে ছুটিত। আমাদের ছুটীর বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া আমরা কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম নদীতে জাহাজ ভাসাইবার ইংরাজী দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ জানে না, তাই প্রধান শিক্ষকের নিকট আবেদন পৌছাইতে বিলম্ব হইতেছে। অবশেষে কোন একজন শিক্ষকের সাহায্যে "Launch" শব্দটী জানিতে পারিয়া দরখাস্ত দাখিল করা হইল। অনতিবিলম্বেই আমাদের স্কুল ছুটী হইল। আমরা খুব আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে জাহাজঘাটে উপনীত হইলাম। নানারূপ বাজনা বাজিতেছে—ঢাক, ঢোল, কাড়া ও ইংরাজী বাজনায় দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত হইতেছে; মধ্যে মধ্যে বৃহৎ কামানের সুগভীর শব্দে সমবেত দর্শক মণ্ডলী চমকিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে মেলা বসিয়া গিয়াছে। লোক

সমাগমে স্থানটী মুখরিত হইয়াছে। একটী সুবৃহৎ চন্দ্রাতপের নিম্নে সাহেবদের প্রীতিভোজ হইতেছে। দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছেন। জাহাজখানি পতাকা ও পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হইয়াছে। ডোমদের কুলবধূগণ কুলাতে আম্র পল্লব সমন্বিত জলপূর্ণ ঘট সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রদীপ জ্বালাইয়া জাহাজের উভয়পার্শ্বে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ঘন ঘন হুলুধ্বনি দ্বারা জাহাজ অবতরণের শুভ কামনা জ্ঞাপন করিতেছে। জাহাজস্বামী তাহাদের প্রত্যেকের কুলাতে এক এক খণ্ড সিকি বক্সিস প্রদান করিলে তাহারা জাহজের মঙ্গল কামনা করিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে স্বস্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। অতঃপর হঠাৎ শুনা গেল জাহাজ ভাসাইবার সময় উপস্থিত। আমরা অতি কষ্টে জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইলাম। জাহাজ ভাসাইবার যে একটা সুন্দর পদ্ধতি দেখিলাম তাহা চিরদিনের জন্য হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিল। প্রথমতঃ ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া কাঠের হাতুড়ির আঘাতে জাহাজের নীচের একটী কাষ্ঠ ব্যতীত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমস্ত কাষ্ঠ সরাইয়া নেওয়া হইল। তদনন্তর জাহাজের কর্ত্তা আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রধান সারঙ্গ এবং বড়মিস্ত্রী কাষ্ঠের হাতুড়ি হস্তে দাঁড়াইলেন। কতকগুলি বালক এবং কয়েকজন যুবক ও বৃদ্ধ (সম্ভবতঃ তাঁহারা জাহাজ স্বামীরই আত্মীয় হইবেন) জাহাজের ডেকের উপর বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইলেন। একজন পূর্ণবয়স্কা ইংরাজ রমণী একটী দুগ্ধপূর্ণ বোতল হস্তে ধারণ করিয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জাহাজের মাস্তুলের অগ্রভাগ হইতে উক্ত বোতলের কণ্ঠদেশ রজ্জুদ্বারা লম্বিত ছিল। সমবেত দর্শকমণ্ডলী নীরব নিস্পন্দ অবস্থায় রহিলেন। এমতাবস্থায় জাহাজের কর্ত্তা সারঙ্গকে ইঙ্গিতে আদেশ দিলেন, জাহাজ নামাও। সারঙ্গ গুরুগম্ভীর স্বরে মিস্ত্রীকে আদেশ দিলেন, "তৈয়ার, তৈয়ার, তৈয়ার, ছাড়" বলিবামাত্রই মিস্ত্রী হাতুড়ির দ্বারা শেষ অবশিষ্ট কাষ্ঠ অর্থাৎ চাবিতে এক আঘাত ছিল। জাহাজ অতি দ্রুতবেগে তীর হইতে নদীবক্ষে ভাসিয়া পড়িল। এদিকে জাহাজ নামিবার সময় মেমসাহেবের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া দুগ্ধপূর্ণ বোতলটী জাহাজের পার্শ্বদেশে জোরে ঠক্কর লাগিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। জাহাজখানির একদেশ দুগ্ধের দ্বারা ধৌত হইয়া গেল। এত দ্রুতগতিতে জাহাজ তীরের উপর হইতে জলে নামিয়া গেল কেন জানিবার জন্য মন একান্ত কৌতুহল হইয়া উঠিল। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম জাহাজের নীচে কাষ্ঠপাত ছিল এবং তাহাতে বহুল পরিমাণে চর্ব্বি দেওয়া হইয়াছিল। জাহাজ জলে নামিয়া পড়িল, নদীবক্ষে জাহাজ ভাসিতে দেখিয়া বিশেষতঃ পতাকাগুলির পত্ পত্ শব্দে অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। অতঃপর আরও একবার এই চিত্র চট্টগ্রাম বন্দরে দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আর সে চিত্র নাই। এখন আর সেইরূপ জাহাজ এখানে তৈয়ারি হয় না। ভূগোলেও চট্টগ্রাম জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য প্রসিদ্ধ একথা লিখেনা। বাষ্পীয়পোত ও রেলওয়ের প্রভাবে জাহাজ নির্ম্মাণের কার্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে। তখনকার দিনে আমাদের এই কর্ণফুলী নদীতে কত বৈদেশিক জাহাজ আসিত, আর আমরা স্কুলের ছুটীর দিনে দলবদ্ধ হইয়া ঐ সমস্ত জাহাজ দেখিতে যাইতাম। কাপ্তান ও ষ্টুয়ার্ট সাহেব আমাদের প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিতেন কখনও বা কোন পুস্তক কখনও বা ছবি ইত্যাদি দিয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমাদিগকে সমস্ত জাহাজ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতেন। এখন আর সেইরূপ বড় বড় জাহাজ এখানে আসে না, নদীবক্ষও তদ্রূপ অলঙ্কৃত হয় না।

হালিসহর, গোসাইডেঙ্গা পতেঙ্গা প্রভৃতি স্থানে এখনও জাহাজের জন্য বৃহৎ বৃহৎ রজ্জু তৈয়ারি হয়। এখনও এখানকার প্রস্তুত দু একখানা পুরাতন জাহাজ নদীবক্ষে ভাসিতে দেখা যায়। এদেশের অনেক সারঙ্গ, লস্কর, পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দরে জাহাজের কার্য্য করিতে এখনও যাইয়া থাকে। এদেশের মুসলমান লস্করেরা নৌবিদ্যায় যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইতে সমর্থ হয় আর কোন দেশবাসীকে তদ্রূপ দেখা যায়

না। তখন আমাদের দেশের নৌবিদ্যা পারদর্শী মুসলমানগণ জাহাজের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিত। প্রথমতঃ মালুম—চার্ট, দিক নিরূপণ যন্ত্র ও দূরবীণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা স্থান, সময় ও দিক নিরূপণ করিত। দ্বিতীয় সারঙ্গ—জাহাজ চালাইবার সম্পূর্ণ-ভার তাহাদের উপর থাকিত। তৃতীয় ছুয়ানি—হাইল ধরিয়া মাঝির কার্য্য তাহারা করিত। চতুর্থ লস্কর বা খালাসী—জাহাজ সম্বন্ধীয় অপরাপর কার্য্যের ভার ইহাদের উপর ছিল। এই চতুর্ব্বিধ শ্রেণীতে নিযুক্ত হইয়া এখানকার মুসলমান নাবিকগণ দেশদেশান্তরে চলিয়া যাইত। এখনও তাহারা ঐ সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, এখনও হালিসহরে বড় বড় জাহাজ নির্ম্মিতা মিস্ত্রী বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তদনুরূপ কার্য্যে তাহারা লিপ্ত নাই। এ বন্দরে জাহাজ নির্ম্মাণের কার্য্য না হওয়াতে তাহারা বিষয়ান্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। চট্টগ্রামের অনেক স্থানের নাম হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় এদেশ এক সময় বাণিজ্য প্রধান স্থান ছিল। বংশান, সুলভবহর, কাপাসগোলা, চাকতাই, সদরঘাট, নমুনা বাজার ইত্যাদি।

চট্টগ্রামের নৌকার গঠন প্রণালী বঙ্গের অন্যান্য দেশ হইতে ভিন্ন। এখানকার পাসিন্দারী নৌকা একখণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠের দ্বারা নির্ম্মিত। এখানে এক প্রকার জলযান আছে তাহাকে সাম্পান বলে। একজন মাঝি দুইহস্তে দুইটী দাঁড় একই সঙ্গে বাহিতে থাকে, এবং ঢেউয়ের সঙ্গে তালে তালে সাম্পানটী নাচিতে থাকে। উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রেও এই সাম্পানের গতিবিধি আছে। এই সাম্পানের গঠন প্রণালী আশ্চর্য্য রকমের; ইহা এতই হাল্কা যে একজন লোক অনায়াসে মাথায় করিয়া ইহার একখানা একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারে। চট্টগ্রামে প্রভূত পরিমাণে নৌকা ও সাম্পান প্রস্তুত হইয়া থাকে। চট্টগ্রামের উৎপন্ন কাষ্ঠের দ্বারাই এই নৌকা ও সাম্পান তৈয়ারী হয়।

চট্টগ্রামের প্রাচীন শাসনকর্ত্তাগণ।

নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অধীনে ছিল। ১২২৩ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ এস্থান অধিকার করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে আরবগণ চট্টগ্রামে বাণিজ্য করিতে আসেন। এই সময়ে বোগদাদ নগরের আল্লাহোসেনী নামে কোন একজন মুসলমান সদাগর ১৪ খানা জাহাজ লইয়া চট্টগ্রাম বন্দরে বাণিজ্য করিতে আসেন। চট্টগ্রামের শোভাও সম্পদ দেখিয়া তিনি এতই প্রলুব্ধ হন যে তদানীন্তন প্রবল পরাক্রান্ত নছরৎ সাহ বাদসাহকে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবার জন্য উত্তেজিত করেন। বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়নগরী তখন নদীতে ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইলে, কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমানকে সঙ্গে করিয়া নছরৎ বাদসাহ ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। প্রসিদ্ধ বণিক আল্পা হোসেনী বোগদাদ বাদসাহকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। নছরৎ বাদশাহ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া সহরের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান আবাদ করেন এবং ঐ স্থান ফতেয়াবাদ (Conquered city) নামে অভিহিত করেন।

ফতে—জয়, এবং আবাদ—নগর, ফতেয়াবাদ অর্থে জীতনগর বুঝাইতেছে। নছরত বাদসাহ আল্পা হোসেনীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ফতেয়াবাদে নছরত বাদসাহের সুবৃহৎ দীঘি এখনও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই দীঘি সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তী আছে,—বাদসাহের অতিবৃদ্ধা মাতা পথে বিশ্রাম না করিয়া যতদূর চলিয়া যাইতে পারিবেন বাদসাহ ততদূর দীর্ঘ একটী দীঘিকা খনন করাইয়া দিবেন এইরূপ অঙ্গীকার করেন। তদনুসারেই এই সুপ্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড দীঘি খনন করা হয়। এই দিঘির ভিতরে এখন লোকের ঘর বাড়ী এমন কি পুকুর পর্য্যন্ত খনিত হইয়াছে। শুধু মধ্যস্থলে পুরাতন দীঘির বিশাল জলরাশি বিদ্যমান রহিয়াছে। নছরৎ বাদশাহ ফতেয়াবাদে চীনা ইটের দ্বারা একটী মসজিদ প্রস্তুত করান। উক্ত মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমি উক্ত ইটের তিনখণ্ড তথা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। উক্ত বাদ-সাহের নির্ম্মিত আরও একটী মসজিদ হাটহাজারীতে এখনও বর্ত্তমান আছে। এই মসজীদের একটী স্তম্ভ এতই সুশীতল যে উষ্ণ বাতাস ইহার সংস্পর্শে শীতল হইয়া জলকণারূপে পরিণত হয়। সেই জন্য স্তম্ভটী সর্ব্বদা জলে সিক্ত থাকে। চট্টগ্রামের প্রথিতনামা মিরএহার আল্লাহোসেনীর বংশধর বলিয়া পরিচিত। মির এহায়ার মসজিদ, দীঘি, মাদ্রাসা এখনও বর্ত্তমান আছে। নাছীরাবাদের নাম খুব সম্ভবতঃ নছরৎ বাদসাহের নামানুসারেই হইয়া থাকিবে। ফতেয়াবাদে আরও একটী বড় দীঘি আছে, ইহার নাম মজলিস বিবির দীঘি। মুসলমান নবাব আকবর জমানের সহধর্ম্মিনী মজলিস বিবির নামানুসারেই এ দীঘির নাম হইয়াছে।

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী আরাকান রাজ পুনরায় এদেশ আক্রমণ করিয়া নছরৎ বাদসাহের পরবর্ত্তী মুসলমান রাজগণকে পরাজিত করেন এবং চট্টগ্রাম হস্তগত করেন। মুসলমানেরা পুনরায় এই স্থান ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে উদ্ধার করেন। আবার চট্টগ্রাম আরাকান রাজের অধীনে আইসে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর অধিকাংশ সময় পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে আরাকান রাজের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে মাংসায়ামওয়ালের ভ্রাতা মাংসরে প্রথমতঃ চট্টগ্রামের সবডিবিসন কাকৃস বাজারের নিকটবর্ত্তী রাযু অধিকার করেন এবং তথায় ২৫ বৎসর নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করেন। তৎপুত্র বসোয়াপো চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। তিনি সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন বলিয়া প্রজাগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। তদীয় পুত্র দোয়ালা এক বিদ্রোহ উত্থাপন করিলে বসোয়াপো নিহত হন। দোয়ালা ও তাঁহার পুত্রগণ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অতঃপর মঙ্গবেঙ্গ নামে একজন তেজস্বী পুরুষ রাজ সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়েই ত্রিপুরারাজ একবার রাযু আক্রমণ করেন। কিন্তু মঙ্গবেঙ্গ ত্রিপুরা রাজকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম নগরীতে তাঁহার নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ার পর্ত্তুগীজ গবর্ণরের রাজদূত চট্টগ্রামে আসেন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ভ্রমণকারী মিঃ ফিস্ চট্টগ্রাম পরিদর্শন করেন। তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—"It is oftentimes under the King of Roang." অর্থাৎ রোয়াঙ্গ রাজের অধীনে ইহা বরাবর আছে। ১৫৯৩ খৃঃ অঃ আরাকান রাজ মংফেলায়ং সমগ্র চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার কতক অংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। ইনি সেকেন্দর সাহ এই মুসলমান খেতাব গ্রহণ করেন। ১৬০৭ খৃঃ অঃ আরাকান রাজ চট্টগ্রাম সহরের দক্ষিণে কর্ণফুলী নদীর মোহনাবর্ত্তী পর্ত্তুগীজদের তদানীন্তন প্রধান বাণিজ্য স্থান দেবাঙ্গনগর স্থলপথে আক্রমণ করেন। আরাকান রাজের সৈন্যগণ অতি নৃশংস-ভাবে পর্ত্তুগীজ অধিবাসীদিগকে হত্যা করিতে থাকে। সিবাস্তিয়ান গঞ্জালিস্ সহ অতি অল্প সংখ্যক পর্ত্তুগীজ অতি কষ্টে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। পর্ত্তুগীজদের বংশধরগণ এখন চট্টগ্রাম সহরে ফিরিঙ্গী বাজার ও জামাল খাঁ এই দুই স্থানে বাস করিতেছেন। ১৬৬৬ খৃঃ অঃ উমেদখাঁ মোগল সৈন্যের অধিনায়করূপে চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরাকান রাজের সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে। তাহাদের অনেক বাণিজ্যপোত এবং ১২০০ কামান মুসলমানগণের হস্তগত হয়। প্রায় ২০০০ সৈন্য বন্দী ও দাসরূপে বিক্রীত হয়।

চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার ফজরআলী খাঁ বাহাদুরের জমিদারীর অতি প্রাচীন দপ্তর হইতে ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে মৌলবী হামিদউল্লা খাঁ বাহাদুর কর্ত্তৃক সংগৃহীত মুসলমান রাজত্বে চট্টগ্রামের মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের ক্রমিক নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়।

কোন প্রসিদ্ধ আরাকান রাজের সময় হইতে এদেশে মগী সন প্রচলিত হইয়া থাকিবে এরূপ অনুমান করা যায়। চট্টগ্রামের প্রাচীন দলিল ও জমীদারী কাগজপত্রে মগী সনের প্রচলন ছিল, এখনও জমীদারী কাগজ ও দলিলে প্রায়ই মগী সন দৃষ্ট হয়। মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও মগী সনের উল্লেখ আছে, আমি এস্থলে তদনুরূপ মগী সন রাখিয়া দিলাম।

১। চট্টগ্রামস্থ আকিয়াবের মগরাজগণ পরাজিত হইলে নবাব সায়েস্তাখাঁর পুত্র নবাব খাজা উমেদ খাঁ বাহাদুর চট্টগ্রামের প্রথম ও প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার অধীনে ৩৫০০ সৈন্য ছিল, তিনি ১০২৭ মগী হইতে ১০৩০ মগী পর্য্যন্ত এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মিরজা খলিফ তাঁহার বক্সী এবং নরসিং রায় তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। আন্দর কিল্লাস্থ পাহাড়ের উপর প্রস্তর নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ জামে মস্‌জিদটী তাঁহার সময়ে প্রস্তুত করা হইয়াছিল! এই মসজিদটীর পশ্চিমের দেওয়াল ইষ্টক নির্ম্মিত, পূর্ব্ব

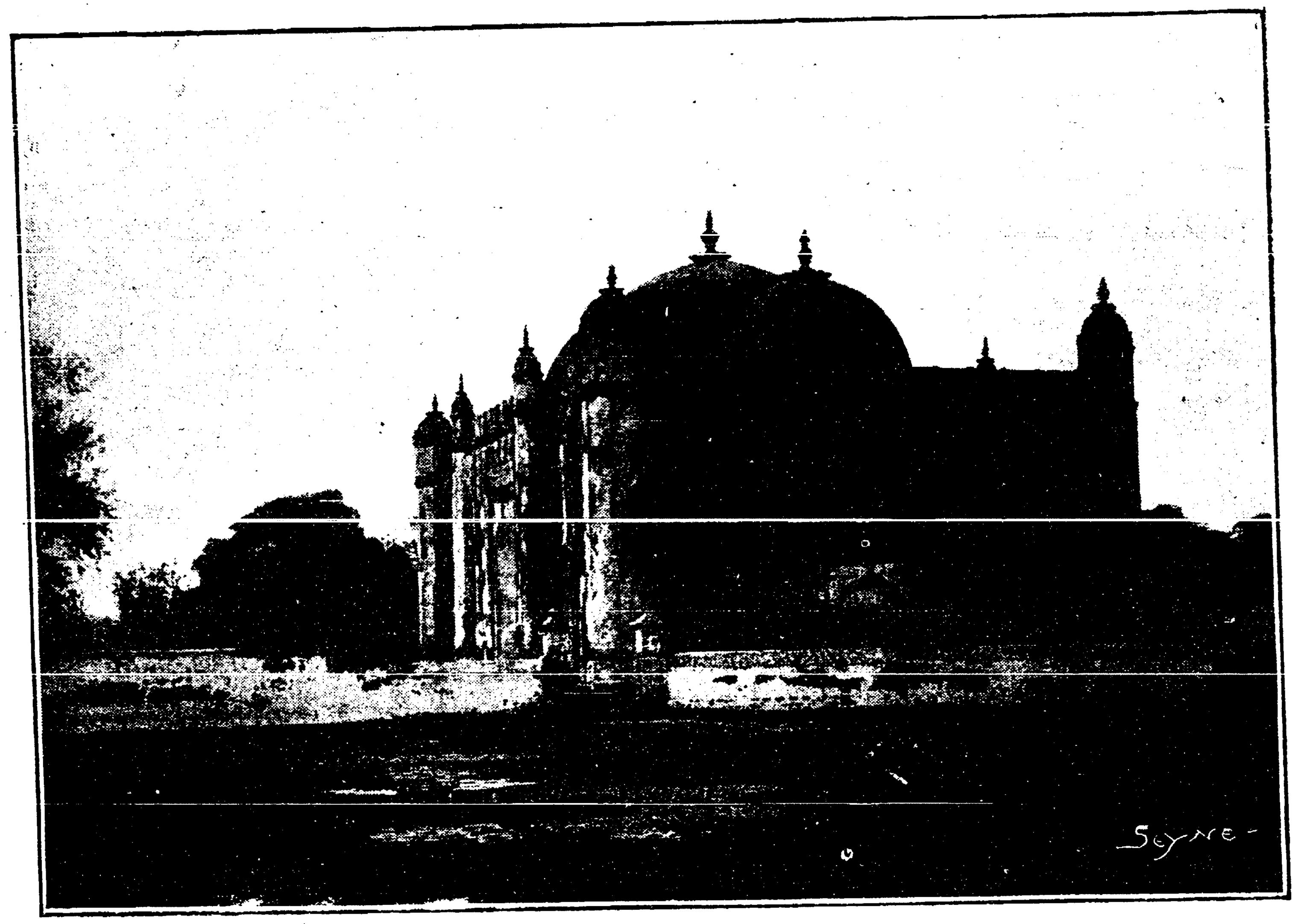

জামে মস্‌জিদ।

উত্তর ও দক্ষিণ এই তিনদিকের দেওয়াল প্রস্তর নির্ম্মিত। মসজিদের দেওয়ালে পারস্য কবিতায় লিখিত আছে ১০৭৮ হিজরিতে এই মসজিদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। উক্ত মস্‌জিদের একখণ্ড প্রতিকৃতি পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দেওয়া গেল।

২। নবাব আস্কর খাঁ—নবাব উমেদ খাঁর পরে নবাব আস্কর খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি ৩০০০ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ১০৩১ মগী হইতে ১০৩৩ মগী পর্য্যন্ত এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত স্বচ্ছ পানীয়পূর্ণ আস্কর খাঁর দীঘি এখনও তদীয় যশঃ ঘোষণা করিতেছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে সাহেবেরা জলকেলি করিবার জন্য এই দীঘির ভিতরে জলের উপর একটী ঘর প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

৩। নবাব রসিদ খাঁ—ইনি ৩০০০ সৈন্যের অধিপতি ছিলেন এবং ১০৩৪ মগী হইতে ১০৩৫ মগী পর্য্যন্ত এক বৎসর কাল এই দেশ শাসন করিয়াছিলেন। মির মহাম্মদ হোসেন তাঁহার বক্সি এবং ভগবান দাস তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

৪। নবাব উমেদ খাঁ বাহাদুর—ইনি পুনরায় চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা হইলেন। তিনি এইবা ১০৩৬ মগী হইতে ১০৩৯ মগী পর্য্যন্ত এদেশে ছিলেন মির ফজলর হোসেন তাঁহার বক্সি এবং ভগবান দা তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

৫। নবাব ফরহাদ খাঁ—ইনি ১০৪০ মগী হই ১০৪১ মগী পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম শাসন করেন। তাঁহা অধীনে ৩০০০ সৈন্য ছিল। মিরজাফর তাঁহার ব এবং হাছন আলি খাঁ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

৬। জাফর খাঁ—সায়েস্তা খাঁর পুত্র জাফর ১৫০০ সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন, তিনি ১০৪২ ম

হইতে ১০৪৯ মগী পর্য্যন্ত এদেশ শাসন করেন। মিরজাফর ও মাহাংহোসেন তাঁহার বক্সি ও জয়নোল আবেদিনা তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

৭। নবাব মোজাফফর খাঁ বাহাদুর—ইনি ১৫০০ সৈন্যের অধিপতি ছিলেন। ১০৫০ মগীর প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক বৎসর কাল এদেশ শাসন করিয়াছিলেন, মাহাং হোসেন তাঁহার বক্সি এবং মাহাং খাঁ তাহার দেওয়ান ছিলেন।

৮। নবাব ফেদাই খাঁ—ইনি ২০০০ সৈন্যের অধিপতি হইয়া এদেশে আসেন এবং ১ ৫১ মগী হইতে ১০৫৫ মগী পর্য্যন্ত এ দেশ শাসন করেন। মাহাং খাঁ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন এবং মাহাং নইম্ তাঁহার বক্সি ছিলেন।

৯। নবাব নুরউল্লা খাঁ—ইনি ১৫০০ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। ১০৫৬ মগী প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক বৎসর কাল তিনি এদেশ শাসন করেন। মাহাং নইম্ তাঁহার বক্সি এবং মাহাং খাঁ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

১০। নবাব ইয়াকুপ খাঁ—ইনি ১৫০০ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ১০৫৭ মগী হইতে ১০৫৯ পর্য্যন্ত এদেশ শাসন করেন। মাহাং নইম্ তাঁহার বক্সি এবং মাহাং খাঁ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

১১। নবাব রহমৎউল্লা খাঁ—ইনি ৯০০ সৈন্যের সর্দ্দার হইয়া এদেশে আসেন এবং ১০৬০ মগীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক বৎসর এদেশ শাসন করেন। মাহাং নইম্ তাঁহার বক্সি ও মাহাং খাঁ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

১২। নবাব আকিদত খাঁ—ইনি ১৫০০ সৈন্যের অধিপতি হইয়া ১০৬১ মগীতে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। মাহাং নইম্ তাঁহার বক্সি ও মাহাং খাঁ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

১৩। নবাব রহমৎউল্লা খাঁ—ইনি পুনরায় এদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। ১০৬২ মগী হইতে ১০৬৮ মগী পর্য্যন্ত ৯০০ সৈন্য সহ তিনি এদেশে ছিলেন। আকা সাহেব তাঁহার নায়েব, নুরুদ্দিন তাঁহার বক্সি এবং সোলতান মাহাং তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। এই শাসনকর্ত্তার সময়েই নায়েবের পদ সৃষ্টি হয়।

১৪। নবাব বেশারত খাঁ—ইনি ১৫০০ সৈন্যের অধিপতি হইয়া ১০৬৯ মগী হইতে ১০৭০ মগী পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে ছিলেন। আবুতালেক তাঁহার নায়েব, নূরদ্দিন তাঁহার বক্সি এবং মির আহাম্মদ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

১৫। নবাব ছরবালাদ খাঁ—ইনি ১০০০ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া ১০৭১ মগী হইতে ১০৭২ মগী পর্য্যন্ত এদেশ শাসন করেন। নূর খাঁ তাঁহার নায়েব, খতি খাঁ বক্সি এবং নুরউদ্দিন মাহাং দেওয়ান ছিলেন।

১৬। নবাব মুরশি কুলি খাঁ—এইবার বঙ্গদেশের যোগ্যতম শাসনকর্ত্তা নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ ৪০০০ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া চট্টগ্রামে আসিলেন। ১০৭৩ মগী হইতে ১০৭৪ মগী পর্য্যন্ত তিনি এদেশ শাসন করেন। সাহামর্দ্দি খাঁ তাঁহার নায়েব, নূরউদ্দিন তাঁহার বক্সি এবং মণিরাম তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। (আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ ভায়া মণিরাম সম্ভবতঃ এই মণিরামই হইবেন।) তিনি পুনরায় জাফর খাঁ নাম ধারণ পূর্ব্বক ১০৭৫ মগী হইতে ১০৮৯ মগী পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে থাকিয়া শাসন সংস্কার করিয়াছিলেন।

১৭। আলিবেগ খাঁ—অতঃপর আলিবেগ খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন। চকবাজারের পশ্চিম দিকে ছয় গম্বুজ পরিশোভিত যে একটী প্রকাণ্ড মস্‌জিদ আছে ইহা তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদটী আলি খাঁ মসজিদ নামে চট্টগ্রামে বিশেষভাবে পরিচিত।

১৮। নবাব সুজাউদ্দিন—ইঁহার অধীনে (১) হোসেন খাঁ নায়েব নিযুক্ত হন। এই নায়েব ১০৯০ মগী হইতে ১০৯৭ মগী পর্য্যন্ত এ দেশ শাসন করেন। এই সময়ে নবাবেরা তাঁহাদের অধীন নায়েব দ্বারা দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করেন।

(২) হোসেন মাহাং খাঁ—দ্বিতীয় নায়েব—ইনি ১০৯৭ মগীর ১৬ই ভাদ্র হইতে ১০৯৮ মগীর আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে ছিলেন।

(৬) জুলকদর খাঁ—তৃতীয় নায়েব—ইনি ১০৯৮ মগীর কার্ত্তিক মাসের প্রথম হইতে ১১০০ মগী পর্য্যন্ত এদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

(৪) মির মাহাং রেজা খাঁ—চতুর্থ নায়েব—ইনি ১১০০ মগীর প্রথম হইতে ১১০১ মগীর চৈত্র পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে ছিলেন।

১৯। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ—ইহার অধীনে (১) সিরাজউদ্দিন মাহাং খাঁ নায়েব ছিলেন। ইনি ১১০২ মগীর ৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১১০৩ মগী পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার দেওয়ান ছিলেন।

(২) মির আফজল—দ্বিতীয় নায়েব—ইনি ১১০৩ মগীর জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে ১১০৫ মগী পর্য্যন্ত এদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

(৩) হোসেন কুলি খাঁ—তৃতীয় নায়েব—ইনি ১১০৫ মগীর প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ৮ বৎসর ৩ মাস ১২ দিন এদেশ শাসন করেন।

(৪) হদাকত খাঁ—৪র্থ নায়েব—ইনি ১১১৩ মগী হইতে ১১১৫ মগী পর্য্যন্ত শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

(৫) মহাসিংহ—পঞ্চম নায়েব—ইনি ১১১৫ মগীর আশ্বিন মাস হইতে ৪ বৎসর ১০ মাস এদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

২০। আকা মাহাং খাঁ—১১২০ মগীতে এদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন।

২১। মির মাহাং রেজা খাঁ—পুনরায় চট্টগ্রামের শাসন কর্ত্তা হইয়া আসিলেন। ইনি অল্পদিন শাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া চট্টগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নবাব মির কাসিমের অনুমতি প্রাপ্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বড় সাহেব হারি ভেরেলেষ্ট ১১২২ মগীতে চট্টগ্রামে আসেন। এই বড় সাহেবের সঙ্গে একজন ছোট সাহেবও আসেন, তাঁহার নাম মিঃ মারিট্। মিঃ রেনাল্ড সাহেব এই বড় সাহেবের বক্সি ছিলেন এবং গোকুলচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার দেওয়ান ছিলেন। এই সময় হইতেই চট্টগ্রামে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়।

শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী।

বসন্ত-নিশা।

এমনি সোণার শশী
  আকাশে মধুর হাসে,
এমনি স্বরগ সুধা
  মলয়-সমীরে ভাসে,
এমনি সাধিছে পাখী
  "বউ কথা কও" রবে,
এমনি বাগানে ফোটে
  যূথী বেলা ফুল সবে,
এমনি গুঞ্জরে অলি
  এমনি কোকিল গায়,
এমনি অজানা গীতি
  পরাণ পরশি যায়,
এমনি সময়ে তাঁরে—
  অশরীরি সশরীরে,
দেখি যদি একবার
  শ্যামলা তটিনী তীরে,
সকল অভাব দৈন্য
  হাহাকার যায় ঘুচি,
মরমের যত ব্যথা
  একেবারে যায় মুছি,

আনন্দ উদ্যম জাগে
  চির ম্লান ধরাতলে,
মানবের বুকে বুকে
  প্রীতির প্রবাহ চলে,
জগতের পাপ তাপ
  জরা মৃত্যু চলি যায়,
শঙ্করে কুমারী উমা
  লভে শুভ তপস্যায়,
জুড়ায় ত্রিতাপ জ্বালা
  পরশি সে শ্রীচরণ,
জীবনের যত ভ্রম
  হয় সব সংশোধন!—

* * * *

এ কি কথা, তিনি কোথা
  : আমি কোথা দীন হীন,
স্বর্ণময়ী নিশা আসে
  বসন্তে তো চিরদিন!

শ্রীমানকুমারী বসু।

পূর্ব্বকথা।

কৃষ্ণনগর আসিয়া আমাদিগের ভাগ্যে যথার্থ বন্ধুলাভ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের স্নেহ প্রীতি ভালবাসায় জীবনকে সর্ব্ববিষয়ে কেমন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। পিতৃসুহৃদ পূজ্যতম দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, কালীচরণ লাহিড়ী ও ঋষিপ্রতিম রামতনু বাবু আদর্শ চরিত্রবান মহাপুরুষ। দেওয়ানজী মহাশয় এক দিকে যেমন কাব্যানুরাগী ও সুগায়ক অন্যদিকে আবার তেমনি রাজদরবারে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিতেন। তাঁহার সব সুন্দর ছিল, তাঁহার গৃহ, পুষ্পোদ্যান আম্রকানন ও লতাকুঞ্জ একটী দর্শনীয় বস্তু। তাঁহার বাড়ীতে যাইয়া প্রথমেই তাঁহার সহাস্য প্রীতিপূর্ণ মুখ দেখিয়া দিনটা সার্থক হইয়া যাইত। তাঁহার অন্য সব পুত্রগণের সৌজন্য এবং সুকণ্ঠ "কুমার যুগল" "হরু" (শ্রীমান হরেন্দ্রলাল রায়) "দ্বিজুর"* মধুর সঙ্গীত শ্রবণ ও তাঁহাদিগের সরলা স্নেহময়ী জননীর অজস্র স্নেহের প্রিয়বাক্য, সেই সঙ্গে অকৃত্রিম আতিথ্য ইহজীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহাদের সাত ভ্রাতার একমাত্র ভগিনী, সুন্দরী সুশীলা মালতী পিতৃগৃহ আলো করিয়া থাকিত। তাহার সেই বাল্যের ধূলিখেলা, কৈশোর সমাগমে সুখ পরিণয় ও যৌবনের মহাযাত্রা এই তিন অঙ্কই চক্ষের সম্মুখে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। মালতী পিত্রালয়ের শ্রী সৌষ্ঠব বিলুপ্ত প্রায় করিয়াছে। দেওয়ানজী মহাশয়ের লোকান্তর গমনের সহিত তাঁহার সাধের পুষ্পবীথিকায় তেমন বসোরা গোলাপ আর প্রস্ফুটিত হয় না, পল্লবিত দেবদারু বৃক্ষের শাখায় প্রচ্ছন্ন বসিয়া কোকিল দয়েল পাপিয়া ও বৌকথাকও ললিত ভৈরবী গাহিয়া চিত্ত মুগ্ধ করে না। তাঁহার স্বহস্ত রোপিত আম্রবৃক্ষে তেমন উপাদেয় মধুফল আর যেন ফলে না। আছে সবই, কিন্তু তাঁহার অভাবে কিছুই আর তেমনটী নাই।

"কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান
সুন্দর সুশীল শান্ত বদান্য বিদ্বান,
সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী।"

"সুরধুনী কাব্যের" ভাগীরথী পতিতপাবনী হইয়াও তাঁহার গীত শুনিবার জন্য আবার "উজান বাহিনী" হইতে চাহিয়াছিলেন। আমরাত দুর্ব্বল মনুষ্য, তাঁহার সুপ্রসন্ন মুখের সেই অমর সঙ্গীত কিরূপে বিস্মৃত হইব? যিনি একবার মাত্র সে সুধাগীতি শ্রবণ করিয়াছেন তিনি ইহজন্মে তাহা কখন আর ভুলিতে পারিবেন না। এই কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠপুত্র, শ্রীমান দ্বিজেন্দ্র লাল রায়। ভ্রাতাগণের সহপাঠী শৈশব সহচর এবং অন্তকার বন্ধু। "দ্বিজু" এক্ষণে কবি, নাট্যকার, ব্যঙ্গরসিক, হাসির গান রচয়িতা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান্ বড় লোক, তবু আমাদিগের নিকটে আজও পূর্ব্বের সেই "দ্বিজু"। তাহার বাল্য রচিত,

"জানি না জননা কেন এত ভাল বাসি?
দুঃখের তাড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে
জানি না তোমার (হে) কাছে কেন ধেয়ে আসি?"

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গান। তাহার পুণ্যবতী মাতৃদেবী এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া স্নেহ বিগলিত প্রাণে প্রিয়তম পুত্রের গাত্রে কল্যাণ হস্ত বুলাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। সেই মাতৃ আশীর্ব্বাদের অক্ষয় ফলস্বরূপ আজিকার "আমার দেশ" ও "জন্মভূমি" জীবন্তকলেবর ধারণ করিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দান করিতেছে।

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,
সারল্যের পুত্তলিকা পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সমজ্ঞান ঋষিদের মত,

---

* দ্বিজুর জীবিতকালে তাহার বিষয় লিখিয়াছিলাম। অদ্য তাহা শোকের গভীর চিহ্নস্বরূপ হইয়াছে। তিনি একদিন তাহা শুনিতে আসিবেন কথা ছিল, কিন্তু অসময়ে অকালে তিনি চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার ও আমার সাধ পূর্ণ হয় নাই, এই আরো গভীর দুঃখ

জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞমত বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ,
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশদিন ভাল থাকে দুর্ব্বিনীত মন,
বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
নাম তাঁর "রামতনু" সকলে বিদিত।"

এই জগৎ বিখ্যাত মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা কণ্ব দুহিতা শকুন্তলারূপিনী ইন্দুমতী পিতৃদেবের তপোবনের জীবন স্বরূপা ছিলেন। সেই সলজ্জ শান্ত মূর্ত্তি, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বনলতা, উদ্যানলতাকে ম্লান করিয়া আশ্রমের শোভা সম্পাদন করিতেন। শাপভ্রষ্ট দেববালা পারিবারিক ও অশ্রান্ত ভ্রাতৃসেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া অকালে দিব্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যজীবন ভোগের জন্য নহে, সুধু ত্যাগের জন্য, পরার্থপরতায় যৌবনের সমস্ত সুখাশা প্রণয় প্রীতি বিসর্জ্জন দিয়া জগতকে কেবল কর্ত্তব্যকার্য্যে উচ্চতর ভালবাসা শিক্ষা দিবার নিমিত্তই তাঁহার মহিমাময়ী নারীজন্ম গ্রহণ। সেই ঋষিতনয়া কুমারী ইন্দুমতীর সহিত প্রথম সন্দর্শনে আমার তরুণ হৃদয়ের যেন শুভদৃষ্টি হইয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে অপরিস্ফুট মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশ কিছু ছিল না, বিনিময়ের মাধুরী বুঝিতাম না, ভালবাসার প্রতিদানে আবার যে তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দিতে হয় তাহাও জানিতাম না। আত্মার বাস্তবিক পূর্ণতা দানে, গ্রহণে নহে। পিতৃ স্নেহজীবিত ও ভ্রাতাগণের বন্ধুত্ব যে জীবনের সম্বল ছিল, পরিজন মধ্যে কেন্দ্রীভূত সীমাবদ্ধ ভালবাসায় নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব না থাকায় এই নবীন বন্ধুর প্রতি প্রেমানুরাগের স্রোতে চিত্ত একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। সে যে কি অপূর্ব্ব আত্মবিস্মৃতি এখন তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। প্রভাত হইতে সায়াহ্নে এবং দ্বিতীয় প্রহর রজনী কথায় কথায় এই দীর্ঘ সময় কোথায় দিয়া যে চলিয়া যাইত বুঝিতেও পারিতাম না। সে কোন রাজনৈতিক গুপ্ত পরামর্শ, কিম্বা বৈজ্ঞানিক নূতন আবিষ্কার চেষ্টার আলোচনা নহে, ইহাতে কেবল সংসার অনভিজ্ঞ উভয় জীবনের অতৃপ্ত আশার,—নৈরাশ্য কাতরতা, কল্পনার মোহস্বপ্ন, সেই অভিনব সৃষ্ট রাজ্যের সমগ্রভাবসমূহ ও নব দৃশ্যপট সব মানসজাত, বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ বিরহিত। যৌবন বসন্তের সমাবেশে প্রত্যেক মনুষ্যজীবনের এইরূপ টলমল অবস্থা ঘটিয়া থাকে। আশায় নৈরাশ্য, দানে প্রত্যাখ্যান, ও ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমশঃ যে জ্ঞানোদয় হয় তাহাতেই হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিণতি হইয়া আমরা সত্যকার মনুষ্য নামের যোগ্য হই।

ভগবদ্ভক্ত "রামতনু" ইহলোকে প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠ পুত্র, আদর্শ কন্যার অকাল মৃত্যুশোক গভীর বিশ্বাস বলে পরাজয় করিয়া এক্ষণে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীমান্ শরৎকুমার লাহিড়ী (Mr. S. K. Lahiri) অধুনা পিতৃ বংশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। এই লাহিড়ী মহাশয়েরই সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী, একাধারে কবি এবং কবিরাজ, সুদক্ষ চিকিৎসক, তিনি পরোপকারী ও অতিশয় বন্ধুপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এ কবিতার প্রত্যেক বাক্য জাজ্জ্বল্যমান সত্য।

"করিলাম তারপরে সুখে দরশন,
আনন্দ প্রফুল্ল মুখ ভিষক রতন,
সুশীতল সরলতা মাখা কলেবরে,
ভাসিতেছে চিত্ত তাঁর দয়ার সাগরে,
অকপট পিরাতের পবিত্র আধার,
সুললিত রসনায় সুধা অনিবার।
দীন দুঃখী তাঁর কাছে আদর ভাজন,
দেখেন তাদের সদা করিয়ে যতন,
বিনা মূল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ,
বিকশিত যাতে তাঁর হৃদয় পঙ্কজ ;
ধনীতে কাঞ্চন দেয়, দীনে আশীর্ব্বাদ,
তাতেই তাঁহার মনে বিমল আহ্লাদ,
কেমন স্বভাব তাঁর, মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন,
ছেলেদের কালী বাবু, ছেলেরা কালীর,
উভয়েতে মিলে যায় যেন নারক্ষীর।

(সুরধুনী কাব্য)

কৃষ্ণনগর দীর্ঘ প্রবাসের দৈনিক ইতিহাসও প্রত্যেক বন্ধুর অকপট স্নেহ ভালবাসা এক এক করিয়া বলিতে গেলে জীবন নাট্যের দশম অঙ্কেও তাহা পরিসমাপ্ত হইবার নহে, আবার কিছু না বলিয়া নীরব থাকিলেও ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়, উভয়সঙ্কট, সুতরাং যথাসাধ্য চেষ্টার কোন প্রকার ত্রুটি হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

সেখানে বাসকালীন নদীয়া রাজ অন্তঃপুরিকাদিগের সহিত চাক্ষুষ আলাপের সৌভাগ্য কখন অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তবে মহারাজা ৺শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের কন্যা কালীকুমারী দেবীর সঙ্গে দৈবাৎ পরিচয় হইয়া এমন একটা ঘনিষ্ট আত্মীয়তা হইয়াছিল যে তিনি আমাদিগকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ মমতা করিতেন। আমাকে "মেয়ে" সম্বোধনে কত আদর যত্ন দেখাইতেন, নাম ধরিয়া ডাকিতেন না সেটা তাঁহার নিকট অসম্মান সূচক মনে হইত। মাতা কালীকুমারী দেবী অতি সরলা, স্বজন বৎসলা ও অনাথ দুঃখীর মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। তাঁহার দ্বারে নিত্য সদাব্রত চলিত। কত কত নিরাশ্রয়া বিধবা তাঁহারই স্নেহাশ্রয়ে থাকিয়া নিরাপদে ধর্ম্মকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে, একটী দিনের জন্য কোন রূঢ় বাক্য তাঁহার মুখে শুনিতে হয় নাই। রাজকুমারীর ধনগর্ব্ব, বৃথা বংশ মর্য্যাদার চিহ্ন ভিতর বাহিরে ছিল না, মানসিক উচ্চতায় তিনি যথার্থ রাজ্ঞীবৎ থাকিয়া বংশ গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তর্ধ্যানে কুলীন ব্রাহ্মণ রাজজামাতার সর্ব্বস্ব, ধন মান বিষয় বৈভব কোথায় দিয়া যে উড়িয়াপুড়িয়া গেল তাহার তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহারই একমাত্র পুত্র লোকরঞ্জন শ্যামাধব "রায়বাবু" * বড় অমায়িক পরোপকারী ও সুরসিক ছিলেন। তাঁহার রহস্যজনক এক একটা কথায় ও গল্পে মজলিসে হাস্যের তরঙ্গ বহিয়া যাইত। কোন সময় রেলগাড়ীতে কৌতুহলাক্রান্ত এক ব্যক্তি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন "নাম শ্যামাধব রায়, পিতৃনাম অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়"। তাহাতে ভদ্রলোকটী পরিতুষ্ট না হইয়া আবার বলেন "এ কিরূপ মহাশয়, মুখয্যার ছেলে, রায় ?" উত্তর, "অমন হয়ে থাকে, কি করা হয় ?" "কিছু না," "চলে কিসে ?" "চুরী ব্যবসায়।" তখন গাড়ীর মধ্যের অন্য সব ভদ্রলোক লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল এবং কৌতূহলী ভদ্র সন্তান, সতীশচন্দ্র মহারাজের ভাগিনেয় "রায়বাবু" বুঝিতে পারিয়া করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। "রায়বাবু" একটী বি,এ উপাধিধারিণী মহিলার ইংরাজী বলার গর্ব্বিত ভাব ও প্রগল্ভতায় আমোদিত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়া পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন "অমুক খুব শিক্ষিতা ও ইংরাজী "Bosh" বস্ বলিতেছে, এই ত শিক্ষা, আপনারা কেহই তাঁহার কাছে লাগেন না।"

ইল্‌বার্টবিলের দেশব্যাপী আন্দোলনের সময় অনেক রাজা মহারাজাগণের পৃথক পৃথক মত লওয়া হয়। তখন রাজ ভাগিনেয় রায়বাবুকেও ছোটলাট সদনে লইয়া মতামত জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি নিতান্ত নিরুপায় অবস্থাপন্ন ভাবে প্রকৃত মত গোপন রাখিয়া বলিয়াছিলেন "আমি চির বোকা তাহাও আপনি জানেন, কলেজে অতি পরিশ্রমেও এফের উপরে উঠিতে পারি নাই, আপনাদের দয়ায় এখন ডিপুটী, তবুও প্রমোসনের আশা নাই। শুধু আমারই বুদ্ধি কম তাহা নহে, মাতুল বুদ্ধিহীন, মাও তেমনি, এমন বংশের আবার মত লইয়া কি হইবে ?" তাঁহার এই কথায় ছোটলাট অতিশয় হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন "হাঁ ঠিক কথা, তুমি সুশীলা রাজকন্যা কালীকুমারীর নির্ব্বোধ ছেলে শ্যামাধব। কলেজে কখন প্রাইজ পাইতে দেখি নাই। রাজ মাতার আদুরে বোকা নাতি।" এই মাতা পুত্র উভয়েই অন্য লোকান্তরে। তাঁহাদের বংশ লোপ হইয়া গিয়াছে। নিঃসন্তান রায় বাবুর দুঃখিনী বিধবা জীবিত আছেন মাত্র। লোকে কথায় বলে "সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, আছে কেবল হায় হায়" ; এও তেমনি আজ কাল।

* নদীয়া রাজবংশের ভাগিনার উপাধি "রায়বাবু," তিনিও সেইজন্য সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত রায়বাবু নামেই খ্যাত ছিলেন। শ্যামাধব কেহ বলিত না।

এই কৃষ্ণনগরেই খ্যাতনামা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পরিবারের সঙ্গে আমাদিগের হৃদ্যতা হইয়াছিল, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই আমাদের পরমাত্মীয়। ঘোষ মহাশয়দিগের মাতৃদেবী সুগৃহিণী এবং সর্ব্বাংশে আদর্শ নারী ছিলেন। বুদ্ধি বিবেচনা সামাজিক লোক লৌকিকতা আদান প্রদান যথাযোগ্যরূপে নির্ব্বাহ করিতেন, কোন কার্য্যে ত্রুটি দেখা যাইত না। দয়াবতী পরদুঃখকাতরা মাতা দানে মুক্তহস্ত থাকায় তাঁহার আশ্রয়ে কত দরিদ্র বালক প্রতিপালিত হইয়া কালেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে জীবিকা উপার্জ্জনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কত নিরন্ন অনাথাকে অন্নবস্ত্র দিতেন, অতিথির জন্য তাঁহার সৌধদ্বার সতত বিমুক্ত থাকিত। সেকালের দিনেও বৃদ্ধ সদরওয়ালা রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর রীতিমত মাষ্টার পণ্ডিত চিত্রকর রাখিয়া দ্বিতীয় পক্ষের বালিকা পত্নীকে সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। সময়োচিত লেখা পড়া দিব্য জানিতেন। হস্তাক্ষর ছাপার ন্যায় সুন্দর ছিল, শিল্পকার্য্যে চিত্রাঙ্কণে, নারিকেলের বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। এমন গুণবতী মাতার গুণগ্রামেই ঘোষ ভ্রাতাদ্বয় চিরস্মরণীয়। মাতৃভক্তি মাতৃসেবা মাতৃসঙ্গ সুখ লাভই তাঁহার পুত্রগণের সার ধর্ম্ম ও নিত্য আরাধনা স্বরূপ ছিল। তাঁহাদের মাতা পুত্রের স্নেহের সম্মিলন যেন যমুনা জাহ্নবীর সঙ্গমের তুল্য পবিত্র ও সে দৃশ্য দেখিয়া নয়ন মন জুড়াইয়া যাইত।

ঘোষ জননী অতীব মমতার চক্ষে আমার সবই সুন্দরতর দেখিতেন এবং আমাকে বড় ভালও বাসিতেন। তাঁহাতে ও আমাতে হৃদয়ের এমন একটা গভীর বন্ধন ছিল যে উভয়ে উভয়ের ভালবাসার মর্য্যাদা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিতাম। তাঁহার কন্যা ও বধূগণের সহিত আমার চিরবন্ধুতা, সেই প্রথম যৌবনে যে সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে আজি পর্য্যন্ত তাহার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহার মধ্যম পুত্রবধূ ৺ লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের সাধ্বী পত্নী স্বর্গীয়া বরদাসুন্দরী সর্ব্বদিকে অতুলনীয়া, তাঁহার অসীম পতিভক্তি, স্বজন স্নেহ, বন্ধুপ্রীতি, সুনিপুণ গৃহিনীপণা ও দেবভোগ্য উপাদেয় রন্ধন অনুকরণীয়। সদানন্দ হাস্যময়ী সোদরা প্রতিম "মেজ বৌএর" অকাল মৃত্যুর বিচ্ছেদ ব্যথা ইহজন্মে আর ভুলিতে পারিব না। পতিব্রতা সতী এক্ষণে পরলোকে স্বামীর পার্শ্বে শান্তি লাভ করিয়াছেন। আমরাই কয়জন, সুহৃদ্বরা "বড় বধূ" শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ (Mrs. M. Ghose) স্নেহময়ী সহৃদয়া "ললিতমণি দিদি" ও প্রিয় ভগ্নী লালমণি শোক দুঃখে বাঁচিয়া আছি।

অপ্রাপ্ত বয়সের জন্য আশুর প্রবেশিকা পরীক্ষার কাল বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সেই কয়েক বৎসর কালেজ লাইব্রেরীর কাগজপত্র গ্রন্থ সব তাহাকে অমনি পড়িতে দিত ও দয়ালু প্রিন্সিপাল মিঃ রো বালকের প্রতিভার মর্য্যাদা বুঝিয়া সাপ্তাহিক ছাত্র সভার অধিবেশনে তাহাকে প্রবন্ধ লিখিতে দিতেন, তাহা অদ্যাপি কালেজ ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত রহিয়াছে। সেই সভার শাখা সমিতি প্রতি রবিবারে আমাদিগের গৃহে বসিত। বঙ্গ সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তক সেখানে পাঠ আলোচনা ও সেই সব গ্রন্থের সমালোচনা প্রবন্ধাকারে লিখিত হইত। সভার সকল সভ্যই ছাত্র এবং আমিই একমাত্র মহিলা সভ্য ছিলাম। "মাইকেল", "হেমচন্দ্র," "রঙ্গলাল" (স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়, কবিতার রচয়িতা) শেলী বাইরেণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কবিগণের কবিতা মুখস্থ, তাহার অনুকরণ বা কথায় কথায় অনুবাদ করা হইত, "ভারত সঙ্গীত" "ভারত বিলাপ" আবৃত্তি চলিত। পিতৃদেব আমাদিগকে সমবেত আত্মীয়গণের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া তাহা বলাইতেন এবং তাঁহারাও এক বাক্যে প্রশংসা করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এই পারিবারিক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় উপন্যাস, সঞ্জীব বাবুর "কণ্ঠমালা" ও পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র গ্রন্থাবলী এবং জ্ঞানী অক্ষয়কুমার দত্তজার "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" প্রভৃতির চর্চ্চা, ও দুরূহ শব্দের অর্থ করিয়া অধ্যয়নে আশাতীত ফল পাইয়াছিলাম। সেই পূজায়, বাগ্দেবী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন বোধ হয় এবং তাঁহারই বরে সেই বয়সে যে

সব কাব্য ইতিহাস উপন্যাস, গদ্য পদ্য পড়িয়াছিলাম তাহাতে জীবন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে ও তাহাই অদ্যকার মানস সম্বল।

আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ পিতৃদেবকে আবার মেহেরপুর সবডিভিসানে বদলী করা হইল ও আমার পাঠের সাহায্যার্থে মিসনারী মেম নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদিগের ইংরাজী পাঠ অধিকাংশই বাইবেল হইতে ও যিশু ভজনার নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা। এবার পাঠের সঙ্গে পিয়ানো শিখিতে আরম্ভ করিয়া ঢং ঢং বাদ্য অভ্যাসের গভীর নিনাদে গৃহবাসীগণের দিবা নিদ্রার বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিলাম। এত পরিশ্রমের সঙ্গীত বিদ্যার সফলতা, নিষ্ফল স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে।

মিশসনরী রমণীর নিকট আমার ইংরাজীপাঠের মন্থর গতি দৃষ্টে স্বইচ্ছা প্রণোদিত জনৈক আত্মীয় আমাকে পড়াইবার ভার গ্রহণ করিলেন। প্রৌঢ় গুরুজী সুগন্ধ আতর বিশেষ। মস্তকের মধ্যস্থল একেবারে কেশ শূন্য, চারিপাশের যে কয়েকটী ছিল তাহা অতি যত্নে সুগন্ধ তৈল রঞ্জিত করিয়া চোগা চাপকানে সজ্জীভূত শিক্ষক মহাশয় নিয়মমত আমাকে পড়াইতে আসিতেন। তাঁহার চেষ্টা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করান, আমারও যত্নের ত্রুটি ছিল না, ঘটনায় অন্যরূপ হইয়া গেল। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোত্র দোষঃ।" শৈশবে কতকগুলি কবিতা লিখি, "তাহার গদ্য পদ্য কেবল চৌদ্দে জানা" গিয়াছিল কিন্তু পিতৃস্নেহের আধিক্যে তাহা আবার পুস্তকাকার ধারণ করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের কাছে আদর পাইয়াছিল, তাহার নাম "আধ আধ ভাষিণী।" পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন "অমৃতং বালভাষিতং," সে যতই অমৃত হউক, অস্তিত্ব সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। মাতা বীণাপানির মধুর বীণা-যন্ত্র হস্তে কিম্বা কণ্ঠে কখন বাজে নাই তবে তাঁহার আশীর্ব্বাদ অনুরক্ত ভক্তের উপর বর্ষিত হইয়াছিল, তাহারই নিদর্শন "বনলতা" ও "নীহারিকা," প্রথম, দ্বিতীয়ভাগ, "আর্য্যাবর্ত্ত" এবং "অশোকা"। সেকালে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচার না থাকায় শিক্ষিত সমাজের ভিতর আমাদিগের খুব মান সম্ভ্রম ছিল। প্রবীণ সাহিত্যকার শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় উপযাচক হইয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিতে কৃষ্ণনগর আসিয়াছিলেন।

তখন আশু কিশোর বয়স্ক, আমিও ছোট। তাঁহার সেই আগমনে আমরা অপার আনন্দানুভব করিয়াছিলাম। তিনি বহু সম্মান দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "বিদূষী বঙ্গমহিলাকে আমার সাধারণীর সংবাদদাত্রী হইতে অনুরোধ করিতে আসিয়াছি।" তাঁহারই যত্নে আমার কবিতা প্রতি সপ্তাহে "সাধারণীতে" স্থান প্রাপ্ত হইয়া গুণগ্রাহী পাঠকগণের সুদৃষ্টি আকর্ষণ ও সুখ্যাতি লাভ করে। সিমলা শৈলবাসী একজন অজ্ঞাত বন্ধু কবিতা পাঠে আমার প্রতি মান্য প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"প্রসীদ প্রসন্নময়ী ভারত তনয়ে,
হের মা নয়নে তুমি,
দুঃখিনী জনম ভুমি,
তুমি কন্যা মাতৃসেবা করো অনিবার।"

"সাধারণী"র কল্যাণে আমার রচনা সাহিত্যিকদিগের নিকট প্রশংসা পাইয়া "নীহারিকায়" পরিস্ফুট হয়। তাহার অনেক প্রীতিকর * সমালোচনাও বাহির হইয়া বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর দ্বারা আদৃত হইয়াছিল ও তাহাতে আর কিছু হউক না হউক, মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় ভার বহন করিতে হয় নাই, সৌভাগ্য বশতঃ পুস্তকগুলি বিক্রয় হইয়াছে। যে দেশে চাহিয়া লইয়া পড়া রীতি, কখন বা "আত্মবৎ পরদ্রব্যেষু" করিয়া "বসুধৈব কুটুম্বকং" জ্ঞানে তাহা প্রত্যর্পণ করিবার ইচ্ছাও থাকে না, সে দেশের বিড়ম্বিত গ্রন্থকারগণের প্রতি কমলার কৃপাদৃষ্টিপাত সময় সাপেক্ষ।

মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের রণভেরী শ্রবণে সমবেত রাজন্যগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভীমার্জ্জুন, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির অপ্রতিহত বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলে যেমন নবযুগের অবতারণা

* সরকার মহাশয় "নীহারিকার" সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন, "চর্ম্মচক্ষে দেখিতে গেলে "নীহারিকা" ছায়াময়ী, দূরবীক্ষণের মর্ম্ম চক্ষে দেখিতে গেলে "নীহারিকা" কায়াময়ী।"

হইয়াছিল এও সেইরূপ সাহিত্যের সত্য যুগোৎপত্তি। এ সংগ্রাম নহে, এ সন্ধি, বিদ্বজ্জন সমাগম মাতৃপূজার মহোৎসব, বাণীর বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সারথ্যে বঙ্গজয়, বঙ্গদর্শনের শুভাগমন। প্রতিভাশালী এতগুলি মাতৃসেবকের একত্র সম্মিলন সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। মায়াপুরীর অপূর্ব্ব কাহিনী "বিষবৃক্ষ," "কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "কমলাকান্তের দপ্তর", রাজকৃষ্ণের অরুণকিরণময়ী "ঊষা", ফুরফুরে বসন্ত বায়ুর ন্যায় দীনবন্ধুর "রাত পোহাল, ফর্সা হলো, ফুটলো কত ফুল", চন্দ্রশেখরের বৈরাগ্যোদ্দীপক "শ্মশান", হেমচন্দ্রের কোমলা "বঙ্গনারী," অক্ষয়ের বিচিত্র "গ্রাবু", এবং চন্দ্রনাথের "শকুন্তলা তত্ত্ব" বাগ্দেবীর পূজোপচার পাদ্য, অর্ঘ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য বিশেষ, পুষ্প চন্দনের সৌরভিত অপার্থিব উপকরণ সব মাতা সরস্বতীর পাদপদ্ম সমুজ্জল করিয়া এমনি রহিবে, কালের চঞ্চল গতির সহিত কখন ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। "বঙ্গদর্শন" গিয়াছে, তাহার শক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় লেখকগণের অধিকাংশ অন্য লোকান্তরে, কিন্তু তাঁহাদিগের অলৌকিক অমর-প্রতিভা চির-জীবন্ত, কখন বিলুপ্ত হইবে না।

"বঙ্গদর্শনের" যুগে পরস্ব অপহারক গ্রন্থকারগণের সমূহ বিপদ ছিল। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমের তীব্র বিদ্রূপাত্মক সমালোচনায় কে কোথায় যে অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে তাহাদের প্রেতাত্মারও আর দর্শন পাওয়া যায় না। গাত্রজ্বালায় জনৈক রসিক গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া পুস্তকের নাম দিয়াছিলেন "ডিপুটী বিভূতি যোগ।" তিনিও তাহার এক ছত্রে দিব্য সমালোচনা করিয়াছিলেন; "পুস্তিকা হস্তিকা রোগ"। মাইকেল দত্ত তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে কোন এক পুস্তকের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন "চণ্ডালের হাড় দিয়া পোড়াও পুস্তকে, করি ভস্মরাশি, ফেল কর্ম্মনাশা জলে," ইহাতে তাঁহার অনেকখানি ক্রোধের ব্যয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্থির গম্ভীর অটল বঙ্কিমচন্দ্র শরীরও মনের কোনখানে কিছু স্পর্শ করিতে না দিয়া এমন মর্ম্মভেদী সমালোচনা করিতেন যে বঙ্গ ভাষায় তাহার দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। "মৃন্ময়ী" পাঠান্তে লিখিয়াছিলেন, "অদূরে দামোদর দণ্ডায়মান, উপন্যাস লিখিব কি? লিখিলেই উপসংহার লিখিয়া ফেলিবে।" এই মিছরীর ছুরিকাঘাতে অর্ব্বাচীন লেখকগণের "কলাপাতা না এড়াতে গ্রন্থ লেখার সাধ" মিটিয়া যাইত।

আমরা প্রতি মাসের প্রথমে বঙ্গদর্শনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতাম ও পত্রিকা আসিবামাত্র আগে লইবার জন্য ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে কাড়াকাড়ি টানাটানি পড়িয়া যাইত। অধ্যয়ন আলোচনা এবং আমাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষমতানুসারে গদ্য পদ্য উপন্যাসের দোষগুণের বিচার হইয়া সমালোচনা পর্য্যন্ত লেখা হইয়া যাইত, সেটা আমাদের পক্ষে হিতকর ছিল। আমরা সেই হইতে মাতৃভাষাকে আরো প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিয়াছিলাম। সে ভক্তি প্রীতি মৌখিক নহে অন্তরের প্রগাঢ় অনুরাগ। পল্লীগ্রামে যে সকল আত্মীয় বন্ধু "বঙ্গদর্শন" দেখিতে পাইতেন না আমি অদম্য উৎসাহে তাঁহাদিগের জন্য সমগ্র পত্রিকা প্রতিলিপি করিয়া পাঠাইয়া দিতাম তাহাতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বা আলস্য বোধ হইত না। সাহিত্যক্ষেত্রের সেইসব মহারথীগণের শিরচ্যুত মন্দাকিনীর পুতবারিধারে আমাদিগের তরুণ জীবন সুধাসিক্ত হইয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

ধর্ম্মের জয়।

(১)

একদিন অতি প্রত্যুষে গঙ্গাধর শর্ম্মার বাটীর অঙ্গনে একটি বালিকা কয়েকটি মল্লিকা বৃক্ষ হইতে পুষ্প তুলিতেছিল। প্রভাত কাল, অতি স্নিগ্ধ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। চারিদিকের বৃক্ষনীড় হইতে সুপ্ত বিহঙ্গম জাগ্রত হইয়া কলধ্বনি করিতেছিল। বালিকা আপন মনে আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিতেছিল, দুএক গুচ্ছ কেশ আসিয়া ললাটে কপোলে পড়িতেছিল, হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দিতেছিল। এমন সময় দুয়ারের নিকট হইতে কে ডাকিয়া বলিলেন—

"গঙ্গাধর বাবু বাড়ী আছেন?"

বালিকা চমকিত হইয়া সম্মুখে এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিল। লজ্জায় তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, সে দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল। অপরিচিতের মনে হইল যেন একখানি কুসুম নির্ম্মিত প্রতিমা বিদ্যুতের মত চমকিয়া চলিয়া গেল।

গৃহের ভিতর হইতে গঙ্গাধর শর্ম্মা বাহিরে আসিয়া অপরিচিত পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মহাশয় ডাকিতেছেন?"

যুবক নমস্কার করিয়া বলিলেন—

"আমার নাম সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আমি আপনাদের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক। কল্য এখানে আসিয়াছি, এখনও বাসা স্থির হয় নাই। আপনার পুত্র নির্ম্মল আমায় বলিয়াছিলেন, সকালে আসিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ও আপনি আমার যা হয় ব্যবস্থা করিবেন।"

গঙ্গাধর শর্ম্মা বয়সে প্রাচীন, তিনি হুগলির কলেজিয়েট স্কুলে পণ্ডিতের কার্য্য করেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক ধীর ও পরোপকারী। তাঁহার পরিবারে তাঁহার স্ত্রী আনন্দময়ী, একটি পুত্র দুইটি কন্যা। বড় কন্যাটি বিবাহিতা হইয়া স্বামীর সহিত পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছেন। কনিষ্ঠা কন্যা সুশীলা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া, বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছে। পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়িতেছেন।

গঙ্গাধর বাবু সুরেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বাহিরের ঘরে তক্তাপোষের উপর বসাইয়া ভিতরে গমন করিলেন।

আনন্দময়ী অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া পূজার উদ্যোগ করিতেছেন। একখানি লালপেড়ে তসর পরিধান করিয়াছেন, কোশা কুশি পঞ্চপাত্র রহিয়াছে, একখানি তাম্রপাত্রে কয়েকটি ফুল বিল্লপত্র চন্দন রহিয়াছে, তিনি গলবস্ত্রে বসিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গাধর বাবু ডাকিয়া বলিলেন—

"কোথায় গো গিন্নী, একবার এদিকে এসো, বড় দরকার আছে।"

আনন্দময়ী কক্ষের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "কি কথা গা? সুশীলা বলছিল বাহিরে কে এসেছে, কে?"

গঙ্গাধর।—"আমাদের স্কুলের একজন মাষ্টার, তার এখানে অন্যত্র থাকবার স্থান নাই, কাল থেকে এসেছে, বাসা ঠিক হয় নাই।"

আনন্দময়ী।—"তা আজ এখানেই খেতে বলনা কেন?"

গঙ্গাধর।—"তাত বলবই কিন্তু তবু তোমার মত জিজ্ঞেস কচ্ছি, বলছিলুম যদি বাসা না পায় তাহলে আমাদের বাইরের ঘরে থাকনা কেন?"

আনন্দময়ী।—"তা বেশত ওখানে ত কতবার কতজনে এসে থেকেছে। যাতে ভাল হয়, যা ভাল বোঝ তাই কর।"

গঙ্গাধর।—"আচ্ছা আজ ত থাক, তার পর যা হয় বিবেচনা করা যাবে।"

গঙ্গাধর শর্ম্মা বাহিরে আসিয়া সুরেশকে বলিলেন "আপনি আজ এখানেই থাকুন, তারপর দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা হইবে।"

সুরেশচন্দ্র সেই দিন হইতে তাঁহাদের পরিবার-ভুক্ত হইয়া রহিলেন। বাহিরের সেই ঘরটিতেই রহিলেন। আহারের সময় গঙ্গাধর বাবু সঙ্গে করিয়া লইয়া আপনার সঙ্গে একত্রে বসাইয়া আহার করাইতেন। কিছুদিনের পর আর এ সঙ্কোচও রহিল না। সুরেশচন্দ্রের ভদ্র ব্যবহারে আনন্দময়ীরও হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনিও সম্মুখে আসিয়া আহারাদি দিয়া যাইতেন। ক্রমে ক্রমে সুরেশচন্দ্র তাঁহাদের আপনার লোকের মত হইয়া গেলেন।

গঙ্গাধর শর্ম্মার অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে, সংসারে বেশী কেহ নাই তাই কোনও প্রকারে দিন চলে, স্কুলে পড়াইয়া এখন ত্রিশ টাকা বেতন পান। সামান্ত ক্ষুদ্র গৃহখানি করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহাতেই এ পর্য্যন্ত বিব্রত আছেন, সুশীলার বিবাহ না দিলে আর চলে না। সুরেশচন্দ্রকে দেখিয়া পর্য্যন্ত কর্ত্তা ও গৃহিণীর উভয়েরই মন হইয়াছে যে ইঁহাকেই জামাতা করিলে তাঁহাদের কন্যা পরম সুখী হইবে। কথায় কথায় গঙ্গাধর বাবু সুরেশচন্দ্রের সকল অবস্থা জানিয়াছেন। সুরেশচন্দ্রের পিতা মাতা নাই, শৈশব হইতেই মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। মাতুল বোম্বাই নগরীতে বাস করেন। মাতুলের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি কার্য্যান্বেষণে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সেইখান হইতে এই কার্য্যের সন্ধান পাইয়া এই কার্য্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা কলিকাতায় শিক্ষকতা করিতেন।

সুরেশচন্দ্র আসিবার পর কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়াছে। সুশীলাও আর সুরেশচন্দ্রকে অত সঙ্কোচ করে না। আহারের সময় জলের গ্লাস বা অন্য কিছু আসিয়া দিয়া যায়। সুশীলা সুন্দরী বা অতুল লাবণ্যময়ী নহে। তবে তাহার শান্ত সুকুমার মুখে কেমন একটি সুন্দর শ্রী ছিল, সেই আয়ত দুটি স্নিগ্ধ চোখে মধুরতা ছিল, তাহাতে সুরেশচন্দ্রের মন প্রথম হইতেই মুগ্ধ হইয়াছিল। তাই সুশীলার সহিত যখন তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপিত হইল তখন সুরেশচন্দ্রের মনে কোন প্রকার দ্বিধা উত্থিত হইল না।

ইহা স্থির হইল যে বিবাহের পরও সুরেশচন্দ্র গঙ্গাধর শর্ম্মার গৃহে বাস করিবেন। তাঁহার বেতন পঞ্চাশ মুদ্রা তাহাতে তাঁহাদের বেশ স্বচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত হইবে।

যত শীঘ্র সম্ভব শুভদিন দেখিয়া, শুভক্ষণে সুরেশচন্দ্র সুশীলার পাণিগ্রহণ করিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতী এমন জামাতা লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

(২)

সুশীলা বিবাহের পরও পিতৃগৃহে বাস করিতেছে। তাহাকে দেখিলে সে যে বিবাহিতা তাহা মনে হয় না, মাথায় কাপড় উঠে নাই শুধু সিমন্তদেশে সিন্দুর শোভা পাইতেছে। সুরেশচন্দ্রকে দেখিয়া শুধু ঈষৎ হাসিয়া একটু ঘোমটা টানিয়া দেওয়া হয়, তাও সর্ব্বদা মনে থাকে না। গঙ্গাধর বাবুর বাড়ী ক্ষুদ্র, দুইটীমাত্র শয়ন কক্ষ। একটিতে তাঁহারা নিজে থাকেন, অন্যটিতে সুরেশ ও সুশীলা থাকেন। পার্শ্বে একটি চালা ঘর তাহাতে দুইটি ক্ষুদ্র গৃহ, একটিতে রন্ধনাদি হয়, অন্যটি ভাণ্ডার ঘর। বহির্ব্বাটীতে একটি ঘর, সেই ঘরে এখন নির্ম্মলচন্দ্র থাকেন, পূর্ব্বে সুরেশচন্দ্র থাকিতেন।

সুশীলার প্রায় এক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। পিতামাতার স্নেহে আদরে, স্বামীর অকৃত্রিম প্রণয়ে অত্যন্ত সুখী হইয়াছে। সে পূর্ব্বের মতই সারাদিন মায়ের গৃহকার্য্যে সাহায্য করে, পিতার আহারাদির তত্ত্বাবধান করে। স্বামীর মনের মত হইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করে ও রাত্রে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করে, তাহাতে তাহার লেখাপড়ার যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে।

একদিন বৈকালে আনন্দময়ী আপনার গৃহের দাওয়ায় বসিয়া আছেন। সুশীলা পিতার বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা করিবে বলিয়া মাতার নিকট আসিয়া বলিল—

"মা, বাবা আজ বিকেলে কি খাবেন ?"

আনন্দময়ী।—"তাত বুঝছি নে বাছা, কদিন থেকে কর্ত্তার শরীর আদতে ভাল নাই, কাল ত সারা রাত ঘুমান নাই।"

সুশীলা।—"কেন ঘুমান নাই ? তাঁর সেই বুকের ব্যথাটা কি বেড়েছিল ?"

আনন্দময়ী।—"তাত আমায় ঠিক করে বলেন না, নিজে কত কষ্ট পান তবু বলেন না, জান ত তাঁর স্বভাব, রাতে কাকেও ডাকতে ভালবাসেন না, রাত জাগাতে ভালবাসেন না।"

সুশীলা।—"আজ তা হলে মা তাঁর বাইরে যাওয়া ভাল হয় নাই। কোথায় গেছেন ? স্কুলে নাকি ? স্কুলের ছুটীত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তবে আসছেন না কেন ? আমি যাই সুজিটা করে রাখি, বাবার যখন শরীর ভাল ছিল না, তখন তাঁকে একটু সুজি করে দেব, কি বল ?"

আনন্দময়ী।—"তাই করে রাখ মা, ঐ যে তিনি আসছেন।"

গঙ্গাধর বাবু গৃহের অঙ্গনে প্রবেশ করিবামাত্র সুশীলা দ্রুতপদে গিয়া তাঁহার হস্তস্থিত ছাতা ও উড়ানী হাতে লইল। তার পর সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?"

গঙ্গাধর।—"আমি স্কুল থেকে এসে এতক্ষণ ঘোষেদের বাড়ী ছিলুম, ঘোষেদের ছোট ছেলেটির বড় ব্যারাম, বাঁচে কি না জানি না। সেই বাক্সটার মধ্যে মকরধ্বজ আছে, নিয়ে আয়ত মা, সবাই বলছিল একবার দিয়ে দেখতে।"

সুশীলা।—"সেটা তুমি পরে নিয়ে যেও, তোমার জন্য একটু সুজি চড়িয়েছি মুখ হাত ধুয়ে সেইটে আগে খাও, একটু স্থির হয়ে বোসো তার পর যেও।"

গঙ্গাধর।—"তাকি হয় পাগলী মেয়ে, যা, ঔষধের বাক্সটা আন দেখি।" সুশীলা ঔষধের বাক্স আনিতে গেল। আনন্দময়ী বসিয়াছিলেন, উঠিয়া আসিয়া বলিলেন—

"সুজি হয় নাই একটু মিছরী ভিজিয়ে রেখেছি সেইটে এখন খাও। মুখ যে শুকিয়ে গেছে, কাল সারারাত ঘুমোও নি, সকালে ত নামমাত্র খেতে বসেছিলে, কিছুই খাও নি।"

গঙ্গাধর।—"তোমরা মায়ে ঝিয়ে যে দেখছি আমায় না খাইয়ে ছাড়বে না, আচ্ছা তাহলে সরবতটা আন। আমি আগে ওষুধটা দিয়ে আসি, এসে মুখ হাত ধোব।"

আনন্দময়ী একটি কাল পাথরের বাটীতে মিছরীর সরবত আনিয়া দিলেন।

গঙ্গাধর বাবু অতিশয় আগ্রহের সহিত পান করিয়া বলিলেন, "আঃ কি মিষ্ট লাগল, গিন্নী তোমার স্বভাবটি যেমন মিছরীর মত, তোমার পানাও তেমনি মিষ্টি।"

আনন্দময়ী হাসিয়া বলিলেন, "যাও আর অত ঠাট্টা কর্ত্তে হবে না।"

গঙ্গাধর।—"একি ঠাট্টা, এ খুব সত্যি কথা, আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।"

সুশীলা ইতিমধ্যে ওষুধের বাক্স লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহা হইতে দুই একটী ঔষধ বাছিয়া লইয়া গঙ্গাধর বাবু উঠিয়া যাইবার সময় বলিলেন, "গিন্নী চল্লুম গো।"

আনন্দময়ীর সেই কথায় মনটা কেমন করিয়া উঠিল। সুশীলা পিতার সহিত দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া বলিল, "বাবা ঘোষেদের ছোট ছেলের জন্য যদি কিছু দরকার হয় ত বলে পাঠিও, আমি করে দেব। আর তুমি সাবধানে যেও বাবা, মা বলছিলেন কাল আবার তোমার ব্যথা উঠেছিল।"

গঙ্গাধর সস্নেহে আপনার কন্যার প্রতি চাহিয়া তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—

"না মা কিছু হয় নি, আমি এখনি আসছি। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" এই কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সুশীলা ও তাহার জননী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত আছেন, এমন সময় বাহির হইতে দ্রুত পদশব্দ শ্রুত হইল। সুশীলা বুঝিতে পারিল কে, লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। সুরেশচন্দ্র দ্রুতপদে আপনার শয়ন কক্ষে চলিয়া গেলেন।

আনন্দময়ী সুশীলাকে বলিলেন—

"যাও মা ঘরে যাও, সুরেশ এত শীঘ্র আজ যে এলেন ?" এই বলিয়া তিনি আপনার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুশীলা পিতৃগৃহে থাকায়, তাহার সুবিধামত সর্ব্বদাই স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইত ও সে তাহাতে সঙ্কুচিত হইত না। আর হিন্দুর ঘরের মায়েরা সর্ব্বদাই চান যে মেয়েরা জামায়ের আদরের হয়, এভাব তাঁরা পুত্রবধুর প্রতি রাখিতে সক্ষম হন না। জামাতা ও কন্যার মধ্যে সদ্ভাব দেখিলে আনন্দ হয়, পুত্র ও বধূরা যদি সে ভাব দেখায় তাহা হইলেই বেহায়াপনার আদর্শ হইয়া উঠে। কাজেই সুশীলা মায়ের আদরে স্বামীর নিকট তত লজ্জা করিতে শিক্ষা পায় নাই।

সুশীলা উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সুরেশ-চন্দ্রের বিষাদ ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল, মনে দারুণ সন্দেহ ও ভয় জাগিয়া উঠিল। সুরেশ সুশীলাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিলেন, সুশীলা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ?"

সুরেশ মৃদুকণ্ঠে বলিলেন "সুশীলা একটা কথা আছে, আশা করি তুমি ধৈর্য্য ধরে শুনবে।"

সুশীলা। "কি কথা ? কোনও বিপদের কথা নাকি ?"

সুরেশ। "মনে কর কোনও বিপদের কথা," এই বলিয়া তিনি সুশীলার দুইটি হস্ত নিজের হস্তে ধারণ করিলেন।

সুশীলা। "কার বিপদ ? দাদা কোথায় ?"

সুরেশ। "তোমার দাদা আসিতেছেন, দাদা নয় তাঁর চেয়ে আমাদের যিনি অধিক আপ-নার—"

সুশীলা ব্যস্তভাবে বলিল, "বাবা ? কোথায় তিনি ? তাঁর কি হয়েছে ?"

সুরেশ বলিলেন, "সুশীলা তুমি যদি শান্ত হয়ে না শোন, যদি একেবারে অধৈর্য্য হয়ে পড়, তাহলে আমরা মাকে কি প্রকারে শান্ত করব ?"

সুশীলার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল, হস্ত শীতল হইল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল—

"বাবার কি হয়েছে, অসুখ করেছে ?" সুরেশ সুশীলাকে আপনার বক্ষে টানিয়া বলিলেন,

"সুশীলা শান্ত হও, তিনি আমাদের মায়া ত্যাগ করেছেন।"

সুশীলা যন্ত্রণা ব্যথিত কণ্ঠে "বাবা নাই" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিবা মাত্র সুরেশচন্দ্র তাহাকে যথাসাধ্য প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় আনন্দ-ময়ী ডাকিলেন—

"সুশীলা একবার এদিকে এসে শুনে যা।" সুরেশ তখন অতি সংক্ষেপে সুশীলাকে বলিলেন যে গঙ্গাধর বাবু ঘোষেদের বাটীর নিকট গিয়া পথে সহসা অচেতন হইয়া পড়েন। সুরেশ ও নির্ম্মল তখন স্কুলে ছিলেন। পথের লোকেরা গঙ্গাধর বাবুকে লইয়া ঘোষেদের বাটীতে লইয়া যায়, সেখানে ডাক্তার ছিলেন, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন হৃদয়ের দুর্ব্বলতার জন্য মৃত্যু হইয়াছে। সকলে গঙ্গাধর বাবুকে লইয়া গৃহে আনিতেছে, এখনি আসিবে তাই সুরেশ পূর্ব্বে আসিয়া সংবাদ দিলেন।

সুশীলা অতি সাবধানে অশ্রুজল রুদ্ধ করিয়া মায়ের নিকট আসিয়া মাতাকে দেখিবা মাত্র কাঁদিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—

"মাগো বাবা"—

তাহার সেই ক্রন্দনে ও সেই কথায় আনন্দময়ীর হৃদয় ফাটিয়া যাইবার মত হইল। তিনি হৃদয়ভেদী স্বরে "ওঃ" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

(৩)

সময় আর নদীর স্রোত স্থির হইয়া থাকিবার নয়। জীবনে যত দুঃখ, যত বিপদ আসুক না কেন, সময় কাটিবেই, এবং সময়েই সকল দুঃখ ক্লেশের অবসান ও সান্ত্বনা পাওয়া যাইবে। যে দিন গঙ্গাধর শর্ম্মার সহসা মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আনন্দময়ী অচেতন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়াছিলেন, সে দিন কাটিয়া গিয়াছে। আনন্দময়ী প্রায় মাসাবধি শয্যাগতা

ছিলেন, তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় সুশীলাও পিতৃবিয়োগ শোকে অধীর হইবার সময় পায় নাই। তারপর যখন ধীরে ধীরে মাতাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিল, তখন তাহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। আনন্দময়ীর সেই শুষ্ক ম্লান মুখ দেখিয়া তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত। সেই সদা হাস্যময়ী প্রতিমা এখন যেন বিষাদময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

পৃথিবীর নিয়ম এই, এক যায় আর আসে। আজ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, ফল, সব জ্বলিয়া গেল, আবার বর্ষায়, নবীন পত্রে, পুষ্পে সজ্জিত হইয়া নবীন শোভা ধারণ করিল। সুশীলার পিতৃ বিয়োগের, কয়েক মাস পরেই তাহাদের গৃহে, এক নূতন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। সুশীলার পুত্রটিকে বক্ষে করিয়া, আনন্দময়ী হৃদয়ে অসীম সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

সুশীলা এখন মাতাকে কিছুই করিতে দেয় না, আপনিই সকল গৃহকর্ম্ম করে। আনন্দময়ী সুশীলার পুত্রটিকে লইয়া সময় অতিবাহিত করেন। নির্ম্মল-চন্দ্র এখন অন্যত্র কার্য্য পাইয়াছেন, তিনি আপনার কার্য্যস্থানে গমন করিয়াছেন। গঙ্গাধর বাবু কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, আনন্দময়ী জামাতার নিকট থাকিতে প্রথমে একটু কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু হুগলি পরিত্যাগ করিয়া যাইবার বাসনা তিনি মনেও স্থান দিতে পারেন নাই। যে স্থানে তাঁহার প্রিয়তম স্বামী চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া, অনন্ত শান্তিলাভ করিয়াছেন, সেই স্থানে তাঁহার চিরশান্তি লাভ করিবার বাসনা হৃদয়ে প্রবল হইয়াছে।

একদিন বৈকালে সুশীলা গৃহকার্য্য সমাপ্ত করিয়া আপনার শয়ন কক্ষে বসিয়া আছে। আনন্দময়ী গৃহের অঙ্গনে একটি বৃহৎ আম্রবৃক্ষতলের ছায়ায় সুশীলার পুত্রটি লইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময় সুরেশচন্দ্র স্কুল হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুশীলা তাঁহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। সুরেশচন্দ্র হাসিয়া সুশীলাকে বলিলেন—

"একটা সুখবর আছে কি দেবে বল ?"

সুশীলা।—"কি খবর শুনি, আমার আর দেবার মত কি আছে ? কি চাও ?"

সুরেশ।—"ওকথায় ভুল্‌ব না, কি দেবে বল ?"

সুশীলা।—"যা চাও তাই দেব, এখন কি সুখবর বল শুনি।"

সুরেশ।—"আমার মাহিনা বেড়েছে। এ মাস থেকে ৭০ টাকা পাব। আর আমি একস্থানে রাত্রে মাষ্টারী কর্‌ব, ঠিক করেছি।"

সুশীলা।—"আর তাতে কাজ নাই, এতেই এত পরিশ্রম হয় বল, আবার মাষ্টারী কেন ?"

সুরেশ।—"তুমিত জাননা, এখন শুধু কি আমা-দের ভাবনা ভাবলে হবে ? আরও একজন এসে-ছেন, এখন হয়ত তাঁর মত আরও কত ভাববার লোক আসবে, কি বল ?"

সুশীলা।—"তার ভাবনা এখন থেকেই তোমায় ভাবতে হবে না, সেত বড় মানুষ।"

সুরেশ।—"এখনত সে বড় মানুষ নয়, তাকেত মানুষ কর্ত্তেই হবে।"

সুশীলা।—"তোমার নিজের শরীর ভাল না রেখে কি করে তুমি অন্যের ভাবনা ভাব্‌বে ?"

সুরেশ।—"আমার নিজের কিছু নাই, আর অন্যই সর্ব্বস্ব তাকি জান না ?"

সুশীলা হাসিয়া বলিলেন, "থাক, আর অত সর্ব্বস্বর কথায় কাজ নাই, এখন মুখ হাত ধুয়ে একটু জল খাও দেখি।"

সুরেশ বলিলেন—"তোমার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, আর এখন তাহা আবশ্যক।" সুরেশচন্দ্র মুখ হাত ধুইয়া আসিলে সুশীলা তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত সামান্য যাহা মিষ্টান্ন ছিল, সযত্নে আনিয়া দিল। ঘরে ক্ষুদ্র মৃৎকলসীতে সুশীতল জল ছিল, গ্লাসে ঢালিয়া দিল। সুরেশচন্দ্র তৃপ্তিপূর্ব্বক তাহা আহার করিলে, হাতে একটি স্বহস্ত রচিত তাম্বুল দিল।

সুরেশ বলিলেন, "সে দুষ্টুটা আজ কোথায় ?"

সুশীলা।—"মার কাছে তুমি যাওনা দেখবে।"

সুরেশ বাহিরে গিয়া আনন্দময়ীকে বলিলেন—

বল্কান গ্রাম।

বল্কান গ্রাম্য অভিনয়।

বুলগেরিয়ার চাষী নরনারী।

বাণিজ্যের যন্ত্রগুলির ছবি আঁকা। এক স্থানে সুরঙ্গ দিয়া হাতে লণ্ঠন লইয়া একটি খনিতে নামিতে হয়। তার তলায় যাইবার মত সব রাস্তা ঘাট আছে।

তারপর জাপানী কোর্ট দেখিতে গেলাম। সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা অপরূপ ও সুন্দর। ছোট ছো পুরুষ ও রমণী, ছেলে ও মেয়েগুলি দেখিতে বড় বিস্ময়কর। রমণীদের ও ছেলেদের রং চং কর পোষাকে কত ফুল, লতাপাতা ছবি আছে। তাদে

খুব আনন্দমাখা বাঁকা ছোট চোখে হাসিভরা মুখ। এই কোর্টটি জাপানী এম্প্রেস্ বা রাণীর বাগানবাড়ীর প্রতিকৃতি। তেমনি আজগুবি মজার মজার আস্‌বাব দিয়া সাজান।

সে সব দেশের সকল প্রদর্শনীতেই গাইড বই পাওয়া যায়। তাতে অতি সুন্দরভাবে সব জিনিষ পরে পরে বর্ণনা করা। সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়া ভরা। সেই এক একখানিতে সে বিষয়ের সকল কথা লিখা আছে। তাতে শিক্ষাও হয় ও চক্ষু কর্ণের তৃপ্তিও হয়। যেখানে গিয়াছি, সেই পুস্তক এক একখানি কিনিয়া আনিয়াছি ও তাহা হইতে দেখিয়া পূর্ব্ব স্মৃতি জাগাইয়া প্রবন্ধগুলি লিখি।

রাত্রি নয়টা অবধি সেখানে থাকিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী পৌঁছাইতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল।

এই সোণার বল্কান দেশেই এখন এমন দারুণ যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, এলবানিয়া, মন্টিনিগ্রো, এ সব দেশগুলিই একত্র হইয়া একা তুর্কির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে। Illustrated London News, Sketch প্রভৃতি কাগজে সেই যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ চিত্র দেখিলে মনে কতই কষ্ট হয়। সংসারের অন্নদাতা যুদ্ধে যাইয়া মরে—আর রাশি রাশি বিধবা ও অপগণ্ড শিশু অন্নাভাবে ও মনস্তাপে কতই যন্ত্রণা পায়। যুদ্ধের হার জিতের পরিণাম যে কত ভীষণ, সেই হাসিমাখা বল্কান প্রদর্শনীর কথা স্মরণ করিয়া আমি এখন বিশেষরূপে তাহা উপলব্ধি করিতেছি।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

আতুরাশ্রম।

দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যাধিগ্রস্থ, "বাদলচাঁদ" যেন ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া খৃষ্ট বিশ্বাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাসের সম্মুখে উপনীত হয়। শ্রীযুক্ত আনন্দ বাবু, তাহার দুঃখ নিবারণকল্পে দয়ার্দ্রহৃদয়ে বাদলকে স্কন্ধে লইয়া, সহরের হাঁস্পাতালে তাহাকে রাখিবার জন্য, তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু ডাক্তারগণ তাহার ব্যাধি দুরারোগ্য বলিয়া, তাহাকে তথায় স্থান দিলেন না। চিকিৎসালয়ের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তাহাকে লইয়া বেদনা পূর্ণ হৃদয়ে, প্রশস্ত রাজপথে দণ্ডায়মান রহিলেন। উপরে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে কত গাড়ী ঘোড়া অট্টালিকা পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী রাজধানী কলিকাতা নগর। এমন সহরে দুঃস্থ, আতুর, নিরাশ্রয়ের স্থান নাই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। কিৎকাল তিনি নীরব হইয়া রহিলেন তাহার পর ভক্তের মুখমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখা দিল। তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে গভীরনাদে এই বাক্য শুনিতে পাইলেন—"অন্ধ খঞ্জ পীড়িত কুষ্ঠগ্রস্থ পিতৃ-মাতৃ-হীন বালক বালিকা অনাথ অনাথারূপে আমিই তোমার সম্মুখে—তুমি সেবক। পারত অহেতুকী স্নেহে স্নেহময়ী মা যেমন নিজ সন্তানের যত্ন ও সেবা করেন এইরূপ ভাবে সেবা কর। পুতিগন্ধযুক্ত নাম যশের জন্য সেবা করিও না।"

এই প্রত্যাদেশে ভক্তের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি বাদলের সেবার জন্য ২২৲ টাকায় একটী বাড়ী ভাড়া করিলেন তারপর ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করিলেন। রাস্তাঘাটে গলিতে গলিতে অনুসন্ধান করিয়া রুগ্ন পীড়িত যাহাকে পাইলেন, তাঁহারই সেবা করিতে লাগিলেন। রোগীদিগের ভিতর যাহাদিগকে হাঁস্পাতালে রাখা

যায়, তাহাদিগকে সেই স্থানে পাঠাইয়া সেবার বন্দোবস্ত করিতেন এবং সকল হাঁস্পাতাল ও আশ্রমের পরিত্যক্তদিগকে লইয়া আশ্রম বাটীতে সেবা করিতে লাগিলেন। নিজেই পীড়িতের অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে আশ্রমে আনিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা, রন্ধনাদি গৃহকার্য্য প্রভৃতি এবং অর্থের জন্য ভিক্ষা করিতেন। ভগবৎ কৃপায় যখনকার যেমন অভাব তাহা পূর্ণ হইতে লাগিল।

এই সময়ে স্বর্গীয় স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কিছু কিছু সহায়তা করেন। অনাথ ও আতুরের সেবার জন্য দাসাশ্রম নামে যে পুণ্য অনুষ্ঠানটি ছিল তাহা ইহার সহিত একীভূত হইয়া যায়। কার্য্যের বিস্তৃতি, আবশ্যকতা ও উপযোগীতা দেখিয়া সহৃদয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটি সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের সাহায্য ও সহায়তা পাইয়া, আশ্রমের জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

১৯০৮ সালের জুলাই মাসে সরকারী আইনানুযায়ী আশ্রম রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। আশ্রমটি দুঃস্থ, অনাথ, পীড়িতের আশ্রয় স্থান হইয়া মানব-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে বলিয়া ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিং মহোদয় ইহার পেট্রন হইয়াছেন। কলিকাতার পুলিস কমিশনার আশ্রমের কার্য্যকলাপ, রীতি-পদ্ধতি সন্দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া, অভিভাবকশূন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালবালিকগণকে আশ্রমে পাঠাইবার জন্য গত বর্ষে ১৯১২ ফেব্রুয়ারী মাসে পুলিশ য়্যাক্ট পাশ করাইয়াছেন। এই আতুরাশ্রমে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বঙ্গীয় গভর্ণর আমাদের সহিত একমত হইয়া সাহায্য ও সহায়তা করিতেছেন, ইহা আমাদের একটী জাতীয় সম্মান ও গৌরবের বিষয়। এই গৌরব যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে।

অনেক স্থানে দেখিতে পাই—ব্যক্তি বিশেষ বা আশ্রম বিশেষ বড় হইলে তাঁহারা উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান; কর্ত্তব্যে শিথিলতা আইসে। কিন্তু আতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর আনন্দ বাবু অদ্যাবধি তত্ত্বাবধায়করূপে জননীর ন্যায় বালকবালিকাগণের ও পীড়িতের সেবা করিয়া আশ্রমের উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের দৈনিক কার্য্য দর্শন করিয়া কত তমভাবাপন্ন যুবকের জীবনে কর্ম্ম স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আফিস গৃহে শ্রীযুক্ত আনন্দ বাবু লিখিতেছেন।

আশ্রমে বর্ত্তমানে প্রায় ৪০০ চারি শত আতুর সেব গ্রহণ করিতেছেন। তন্মধ্যে পুরুষ ৩০০, স্ত্রী ১০০। আশ্রম বর্ত্তমানে ১২৫নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত। এই আশ্রমে একমুষ্ঠি তণ্ডুলকণা, ছিন্ন বস্ত্রাদি হইতে জীবন ব্যাপী আয় অর্পিত হইলেও তাহাই ভগবানে সেবায় লাগিবে। আশ্রমে প্রদত্ত একটী সামা তৃণেরও অপব্যয় হইবে না।

১৯০১ সালে আশ্রমের প্রতিষ্ঠার পর ভারতে (এমন কি সমগ্র পৃথিবীর) সর্ব্বস্থান হইতে ১২৩ জন আতুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নেপাল, ত্রিপুরা পঞ্জাব, পৃথ্বিনাথ, আসাম, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, যোধপু বর্ম্মা, লঙ্কা, বোগদাদ, (পারস্য) হলন্দ, দেনমার্ক ব্রিটিশ গাইনা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীও এখানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। দিমারার জনৈক শ্রমজীবি তথায় পঞ্চবিংশতি বৎসর যাপনান্তে আজ এই আশ্রমে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। আন্দামান হইতে প্রত্যাগত সমাজ পরিত্যক্ত জনৈক ঘৃণিত ব্যক্তি এই আশ্রমের শীতল ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি অপনোদন করিতেছে। বাতুলাগার হইতে জনৈক ইউরেশীয়ান, পশ্চিম দেশবাসী ক্ষত বিক্ষত কলেবর মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি, প্রাচ্য প্রতীচ্য শাস্ত্রাভিজ্ঞ দীর্ঘজটাধারী বিখ্যাত হিন্দু সন্ন্যাসী, নেপাল বাসিনী কিঞ্চিদধিক চতুর্হস্ত দীর্ঘাকৃতি ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূতা বহুসন্তান প্রসবিনী এক রমণী ও বিদ্যাসাগর ততোধিক দয়ার সাগর পণ্ডিত ঈশ্বর-

বিদ্যালয়ের বালকগণ প্রার্থনা করিতেছে।

চন্দ্রের সমসাময়িক জনৈক অধ্যাপকও এই আশ্রমের সুশীতল ছায়ায় জীবনের অবশিষ্ট কতিপয় দিবস ক্ষেপণ করিয়াছেন। এইরূপ কত নরনারী, বালক, বালিকা, এই আশ্রমে প্রতিপালিত হইতেছে।

এই আশ্রমের কর্ম্মিগণ দুঃস্থ, সহায়সম্পদ, বন্ধু-বান্ধবহীন গৃহে গিয়া উপকার করিয়া আসিতেছেন। প্রায় ৪০০০ গৃহে এইরূপ অযাচিতভাবে উপকার করা হইয়াছে। এই আশ্রমের উদ্দেশ্য সাধন কল্পে কর্ম্মিগণ রোগীর সন্ধানে সদাই ব্যস্ত।

সম্প্রতি বালক বালিকার সংখ্যাধিক্য বশতঃ আশ্রম মধ্যে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৩০ জন বালক এবং ১০।১২টি বালক বালিকা আশ্রমে থাকিয়া উপযুক্ত শিক্ষকগণের দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। কতকগুলি বালকের জন্য শিল্প ও কার্য্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষার বন্দোবস্ত হইতেছে। সরকারী শিক্ষাবিভাগও বিদ্যালয়ের সাহায্য করিতেছেন। রোগীদিগের হইতে বিদ্যালয় এবং বালকগণকে সত্বরই পৃথক করা হইবে। বালক বালিকাদিগকে প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য করাই আশ্রমের উদ্দেশ্য। আশ্রমবাসী প্রত্যেককেই লিখন পঠন অঙ্ক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ও পরে স্ব স্ব কর্ম্মনিরত বালকবালিকার হর্ষোৎফুল্ল বদনমণ্ডল দর্শনে মনে যেন আনন্দহিল্লোল উত্থিত হয়। সায়ংকালে সুকুমার কণ্ঠের সুললিত সঙ্গীতস্রোত স্রোতামাত্রেরই শ্রবণবিবরে অমৃতধ্বনি করে। পথিকের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং আশ্রমটী কোন নৈশ বিদ্যালয় বা কোন শান্তিময় সংসারের পরিবারবর্গের মিলন-কুটির ভ্রমে নির্ম্মল আমোদ আহ্লাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে পথিকগণ স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে গমন করেন। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষনীয় সমুদয় বিষয় ব্যতিরেকেও এখানে জীবে প্রেম শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাণ দিয়াও দুঃস্থের সেবা

কর্ত্তব্য এই সার সত্যটি তাহারা অল্পবয়স হইতেই শিক্ষালাভ করে।

এই আশ্রমের একটী সহায় ছিলেন একজন হিন্দু বিধবা। এই হিন্দু বিধবাই এই আশ্রমবাসীদের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পরার্থে আত্মোৎসর্গে মানুষের মনুষ্যত্ব। ভারতবর্ষের দুঃখিনী হিন্দু বিধবা পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য আপনার জীবন সমর্পণ করিয়া, পরের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া মানবজন্ম সফল করিতে পারেন। আশ্রমের শৈশবাবস্থায় এই রমণী, প্রতিষ্ঠাতার সহিত একযোগে

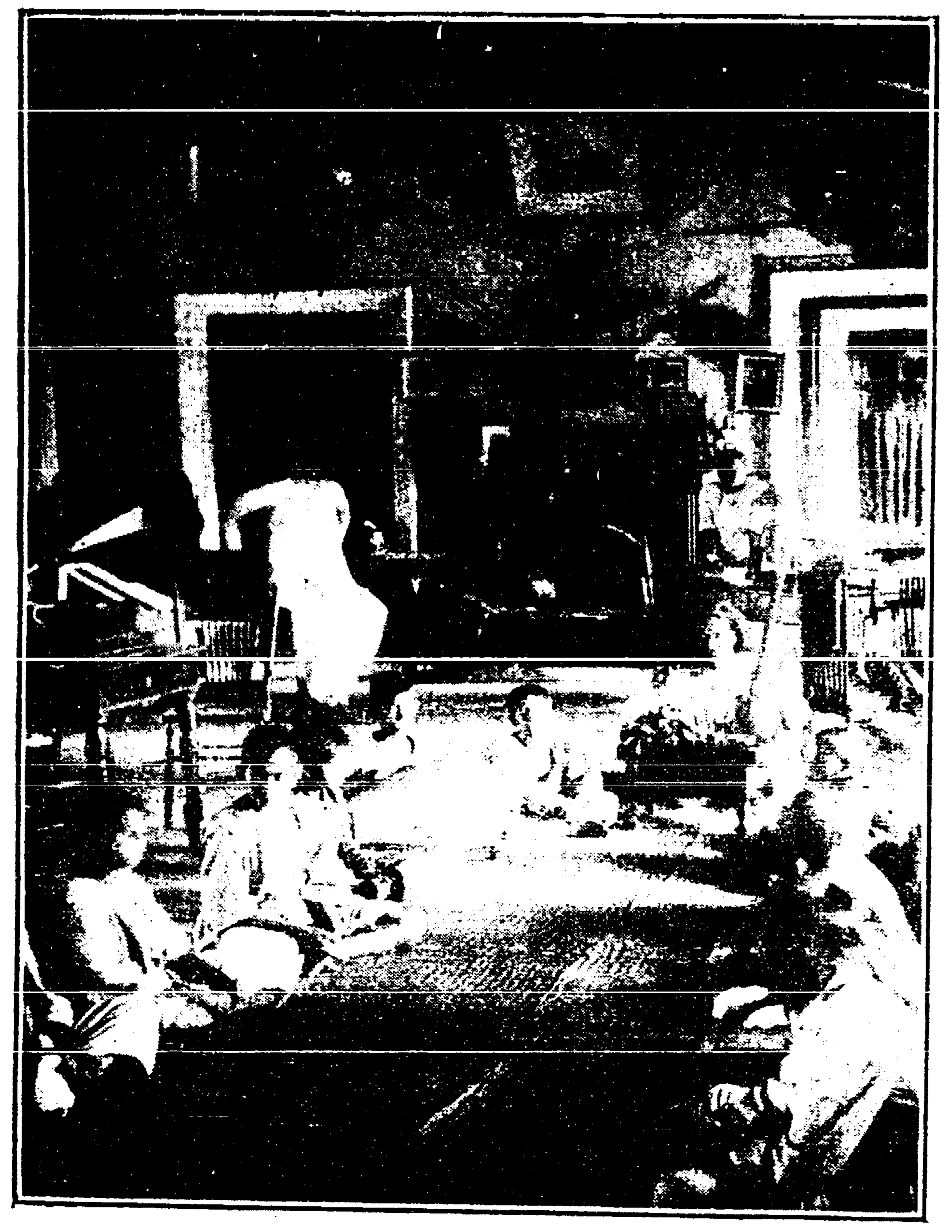

বিদ্যালয় গৃহে কীর্ত্তন হইতেছে।

কর্ম্ম করিয়া আশ্রমটীকে বর্ত্তমান উন্নতাবস্থায় পরিণত করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রাতঃস্মরণীয়া হিন্দু বিধবা রমণীর স্থান বহুকালের মধ্যে পূরণ হয় কিনা সন্দেহ ; তাঁহার মৃত্যুতে আশ্রম প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। স্বর্গীয় কালীচরণ বানার্জ্জীর ভাগিনেয় মিঃ এল্ এম্ চাটার্জ্জী, মিঃ জে এন্ বক্সী, মিঃ এন্ এন্ ঘোষ, মিঃ কে সি নৌন, প্রোঃ জে আর বানার্জ্জী স্বর্গীয় ডাঃ হেমচন্দ্র সেন, প্রোঃ বি সি দত্ত, মিঃ ডি, সি, মল্লিক, মিঃ জে, সিঃ হোয়াইট (ওয়াই এম, সিএর প্রতিষ্ঠাতা), তদীয় ভ্রাতা মিঃ ডবলিউ হোয়াইট, স্বর্গীয় ডাঃ কে, এস্ ম্যাকডোনাল্ড, ময়ূরভঞ্জের স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর, কাবকুলপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার এণ্ড্র ফ্রেজার এবং আরও অনেকে এই আশ্রমের উন্নতিকল্পে বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমানে কার্য্যকারক শ্রেণীভুক্ত আছেন ঃ—মিঃ বি, বিশ্বাস ; মি পাল (রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার) এবং ইঁহার দুইজন সহকারী ও পাঁচজন শিক্ষক ; একজন মেট্রন দুইজন সহকারী মেট্রণ এবং ভৃত্যগণ ব্যতীত আরও কয়েকজন সাধারণ সহকারী কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। একটী স্ত্রীলোক পুর্ব্বে এই আশ্রমেই প্রতিপালিত হন। তিনি এখন আশ্রমের কার্য্যে দেহমন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। নিজের একটী শিশুসন্তান ব্যতীত আরও দুইটী ক্ষুদ্র শিশুর লালন পালনের ভার ইঁহার উপর অর্পিত। ইনিই তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। মিঃ বি, সি, বিশ্বাস আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার সহোদর। ইনিও নিঃস্বার্থভাবে আশ্রমের সেবায় রত আছেন।

এই মহৎ কর্ম্মের সমুদায় অভাব অভিযোগ ভগবানের কৃপায় পূর্ণ হইতেছে। সাধারণ ব্যয় বাহুল্যের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠাতা ন্যূনকল্পে এক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন একজোড়া ঘোড়া,১২ গাভী, একটী হরিণ, মূল্যবান বসন সমেত একটী ট্রাঙ্ক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এগুলি একটা সম্মানার্হ হিন্দু বালবিধবার দ্রব্যসম্ভার। তিনি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এগুলি আশ্রমে দান করিয়াছেন।

এই আশ্রমে জন প্রতি মাসিক দশ টাকা ব্যয় করা হয়। সাধারণের নিকট এই ব্যয়ভারটী যথোচিতের চেয়েও কিঞ্চিদধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু এই শ্রেণীর অপরাপর স্থানের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এই দশটী মুদ্রা অত্যন্ত অল্প।

আশ্রমের কর্ম্মের আধিক্যবশতঃ তাহা দিন দিন জটিলতা প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া অধুনা সেগুলির সৌকর্য্য

সাধনার্থ একটী বোর্ড অব্ ম্যানেজ্‌মেণ্ট্ নিযুক্ত করা হইয়াছে।

এই আশ্রমে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অনাথ অনাথার

অনাথা রমণীগণের শয়নাগার।

মর্ম্মান্তিক অশ্রুধারা অপনয়ন পূর্ব্বক সেবা শুশ্রূষা করা হয়। ঈদৃশ আশ্রমের উন্নতি ও সহায়তা কল্পে কোন্ ভাগ্যবান্ পশ্চাৎপদ হইবেন? ভগবান ভাগ্যবানের উপরই গুরুভার কর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছেন। প্রয়োজন অপেক্ষাও যে ভগবান্ কোন ব্যক্তিকে তাঁহার কৃপাকণা অধিক পরিমাণে প্রদান করিয়াছেন তাহার একমাত্র কারণ পরম কারুণিক পরমেশ্বর মানবের হস্ত দিয়াই তাঁহার দানের বিতরণ কার্য্য সম্পাদন করেন। অতএব ভাগ্যহীনের দৈন্য অপনয়নই ভাগ্যবানের প্রধান কর্ত্তব্য। আশ্রমের সাধারণ ভাণ্ডার হইতে বার্ষিক অন্যূন ২৫০০০৲ মুদ্রা ব্যয় করা হয়। গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারে এবং উক্ত ভাণ্ডারে অর্থের স্বল্পতা নিবন্ধন ব্যয় সঙ্কুলান কষ্টসাধ্য হইয়াছে। ভাগ্যবানের সহায়তা ব্যতীত এ কার্য্য সুসম্পাদনের আশা সুদূরপরাহত। আমাদের মহান্ ও উদার স্বদেশবাসী শ্রীযুক্ত রায় বিহারীলাল মিত্র বাহাদুর আশ্রম গৃহ নির্ম্মাণকল্পে ৭৫০০০৲ ও আমাদের মহামহিমান্বিত প্রবল প্রতাপ করুণ হৃদয় মহারাজাধিরাজ পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরী ইহার জন্য ৫০০০৲ টাকা অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু এই কার্য্য সম্পাদনার্থে তিন লক্ষেরও অধিক মুদ্রার প্রয়োজন। যাঁহারা সাধারণের হিতসাধনে সমুৎসুক, আজ তাঁহাদের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। আজ তাঁহারা পরোপকারার্থে অকাতরে অর্থ দান করিয়া মানবের নিকট যশস্বী ও ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হইতে পারেন। একার্য্যে কেবল যে ধনী সহায়তা করিবেন তাহা নহে, ধনী দরিদ্র সকলেই তাঁহাদের যথাসাধ্য দান করিয়া এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন সহজসাধ্য করিতে পারেন।

শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার।

পৈতৃক সম্পত্তি।

(গল্প)

পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি ভোগদখল পাইবার পূর্ব্বেই লক্ষ্মীপুরের জমিদারপুত্র নরেশচন্দ্র পৈতৃক অধিকার-সূত্রে বালকভৃত্য হরিদাসকে লাভ করিয়াছিল।

হরিদাস নরেশচন্দ্রের প্রায় সমবয়স্ক ছিল। হরিদাসের বৃদ্ধা মাতা যখন জমিদারবাড়ী কাজ করিতে করিতে চক্ষু হারাইয়া কাজের বা'র হইয়া পড়িল, তখন জমিদারগৃহিণী কৃপাপরবশ হইয়া তাহার দশমবর্ষীয় পুত্রকে আপনার পুত্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন। সেই হইতে আজ চারিবৎসর ধরিয়া হরিদাস নরেশের সঙ্গী, সহচর, ভৃত্য। হরিদাসের মাতামহও এই জমিদারবাড়িতে প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহারা তিনপুরুষে এই বাড়ীতে চাকর।

কাজে নিযুক্ত হইয়া এমন কাজ ছিল না যাহা হরিদাস তাহার বালকপ্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য না করিতে লাগিল। রাত দুপুরে হরিদাস বনের ভিতর গিয়া পাখীর ছানা চুরি করিয়া আনিত, বড় বড় গাছে উঠিয়া ডাব নারিকেল পড়িয়া দিত, ইঁট ধরিয়া ধরিয়া চিলেকোটায় উঠিয়া প্রভুর পোষা পায়রা উড়াইয়া দিত, প্রবল নদীর স্রোতে সাঁতরাইয়া গিয়া ভেলা ভাসাইয়া দিত। নরেশ একবার হুকুম করিলেই হইল।

হরিদাসের একটি কাঠের গাড়ি ছিল। সে নরেশকে তাহাতে চড়াইয়া, নিজে ঘোড়া হইয়া গ্রামের পথে পথে ঘুরাইয়া আনিত। নরেশ হরিদাসের বাহনযোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য একটি লক্‌লকে সরু বেত মাঝেমাঝে তাহার পৃষ্ঠদেশে প্রয়োগ করিত; হরিদাসের পৃষ্ঠদেশ সে আঘাতে ফুলিয়া উঠিত, তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইত, তবু সে ঘোড়া হইয়া ছুটিতে থাকিত। হরিদাসের মা পুত্রের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে শিহরিয়া বলিয়া উঠিত, হরি, বাবা, তোকে কেউ কি মেরেছে?—হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিত, মা, তোর সবই পাগলামি—আমাকে আবার মারবে কে?

হরিদাস নরেশকে 'দাদাবাবু' বলিয়া ডাকিত
একবার কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নরে
হরিদাসকে বলিল, রমানাথ কাকার বাড়ীর চাক
বাকর কাকাকে কেমন 'হুজুর' বলে' ডাকে;—তোে
এবার যখন ডাক্‌ব, তুইও আমাকে হুজুর বলে' উত্ত
দিবি। হরিদাস বলিল, সে কি রকম দাদাবাবু
নরেশ রাগিয়া বলিল, ফের দাদাবাবু! হরিদা
বলিল, তুমি ত এখনও আমায় ডাকনি। নরে
বলিল, নাই বা ডাক্‌লুম, সব সময় হুজুর বল
নইলে মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব। হরিদা
বলিল, আচ্ছা দাদাবাবু, তাই বল্‌ব। ফের দাদ
বাবু!—নরেশ হরিদাসের পৃষ্ঠে সজোরে এক বে
ঘাত করিল। হরিদাস হাসিতে লাগিল।

হরিদাসের কিন্তু কিছুতেই নূতন পাঠ আ
হইল না। যখনই নরেশ তাহাকে ডাকে, সে ভু
করিয়া বসে। নরেশ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তাহার মা
গিয়া বলিল, মা, আমাকে একটা ভাল চাকর দাও
হরিদাসটা ভারি বোকা, ওকে তাড়িয়ে দাও।
বলিলেন, কেন রে হরিদাস বোকা হ'তে গে
কেন,—তাড়িয়ে দিলে বেচারা কোথায় যাবে; ও
আমাদের বাড়ী তিনপুরুষে চাকরী করচে। হরি
তাড়াতাড়ি নরেশের মা'র পা জড়াইয়া ধরিয়া বলি
পায়ে পড়ি মা, আমাকে তাড়িয়ে দিও না, আ
আর কখনও ভুল করব না। নরেশ বলিল, এব
কিন্তু ভুল করলে আমি তোকে আর আমাদের বা
কখনই রাখব না। সহর থেকে কাল সেই হাকি
ছেলে এসেছিল, সে আমাকে কত ঠাট্টা করলে, বল
তুমি কি হরিদাসের দাদা? চাকর মনিবকে হু
বলবে। হরিদাস বলিল, এবার আমি ঠিক ব
দেখো দাদাবাবু, আমি ঠিক বলব। নরেশ চীৎ
স্বরে কহিল, ফের্, ফের্ দাদাবাবু!—হরিদাস থতমত খাইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় বলিয়া উঠিল, দাদা—দাদাবাবু—হুজুর,—আমি ত এবার ঠিক বলেছি, ভুল করি নি। নরেশ বলিল, নাঃ, আর আমি তোকে কখনই রাখব না, তুই এখনি চলে যা! নরেশ অন্য একজন চাকরকে ডাকিয়া কাজের ফরমাস্ করিল। হরিদাস কাঁদিয়া ফেলিল।

হরিদাস তাহার প্রভুর মন ফিরাইয়া পাইবার জন্য রাতদিন তাহার কাছেকাছে ঘুরিতে লাগিল। নরেশ যখন পড়ে, সে চুপটি করিয়া দরজার কাছে বসিয়া থাকে, যদি নরেশ তাহাকে একবার ডাকে; নরেশ যখন বেড়াইতে যায়, সে পিছু পিছু যায়, যদি নরেশ কোন একটা কিছু কাজের ফরমাস্ করে। সে মনে মনে রাতদিন 'হুজুর' 'হুজুর' আবৃত্তি করিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন নরেশ ডাকিল, হরিদাস! হরিদাস তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, হুজুর! নরেশ বলিল, যদি একটা কাজ করতে পারিস, তবে তোকে এবার আমি রাখবো। হরিদাস বলিল, পারব, দা—হুজুর, আমি ঠিক পারব।

নরেশ বলিল, শোন্। কাঁঠালপাড়া গাঁয়ে হরে ময়রার একযোড়া লক্কা পায়রা আছে, সে সে-যোড়া বিক্রি করবে। আমি তোকে ষোল টাকা দিচ্চি, তুই আজই রাতে সেখানে গিয়ে পায়রা নিয়ে চলে' আসবি। সুরেন কাকার ছেলেও সেই পায়রার জন্যে কাল ভোরে লোক পাঠাবে। তোকে তার আগে গিয়ে পায়রা নিয়ে আস্‌তে হবে।

হরিদাস বলিল, পারব আমি খুব পারব হুজুর,—মায়ের রাতের খাবারটা তৈরি করে দিয়েই আমি চলে যাব। নরেশ বলিল, দেখিস ঠিক যেন!

হরিদাসের মা হরিদাসকে ছাড়িয়া দিতে কোন মতে রাজি হইল না। হরিদাস বলিল, বাঃ দাদাবাবু বল্‌লে, আর তুই বল্‌চিস্ 'না'! আমি যাবই; নইলে দাদাবাবু আমাকে কাজে আর রাখবে না। বৃদ্ধা অগত্যা হরিদাসকে বিদায় দিয়া যাইবার সময় বারবার বলিয়া দিল, তাহাকে দেখা দিয়া তবে সে যেন মনিববাড়ী যায়,—তাহার পর একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া কুটীরদ্বারে পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

হরিদাস পায়রা কিনিয়া সেই রাত্রেই আবার বাড়ির দিকে ফিরিল। অন্ধকার রাত্রি;—দুই হাতে দুইটা পায়রা লইয়া হরিদাস বনের পর বন পার হইয়া আসিতে লাগিল।

*   *   *   *

প্রাতে নরেশ হরিদাসকে খুঁজিয়া না পাইয়া হরিদাসের মা'র নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও বৃদ্ধা দরজার কাছে চুপটি করিয়া বসিয়া আছে।

শব্দ শুনিয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, হরে, বাবা, এলি রে! নরেশ কহিল, না বুড়ি, আমি। হরিদাস এখনও আসে নি?

বৃদ্ধা কহিল, কই বাবা, এখনও ত এল না! আমি তারই জন্যে সারারাত জেগে বসে আছি! বড় ভাবনা হচ্চে—রেতে ছেলেমানুষ একলাটি গেল।

নরেশ চলিয়া গেল।

শাখান্তরাল হইতে দাঁড়কাক ডাকিল, কা—কা—কা; বৃদ্ধা লাঠি ঠক্‌ঠক্ করিয়া বলিয়া উঠিল, আ মরণ আর কি! দূর! দূর! দূর!

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিপত্নীক।

[সিবিলিয়ান জজ অচলকৃষ্ণ দত্ত পেন্সন পাইয়া তাঁহার শিক্ষিতা ও সুন্দরী কন্যা অনিমাকে লইয়া পৈতৃক গৃহ হুগলীতে আসিয়া বসিলে সেখানকার লোকে জানিল যে,·সেই কন্যা স্থানীয় উকীল ভূতপূর্ব্ব মুন্সেফ কান্তি বাবুর একমাত্র পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র যামিনীপ্রকাশের সহিত বিবাহ পণে আবদ্ধা। খুলনায় অবস্থিতিকালে যামিনী ও অনিমা পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিল। এই বিবাহ সম্বন্ধ উভয়কেই উভয়ের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রীতি সম্পন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। ইহা নিজেদের এবং অপর পাঁচজনেরও অবিদিত রহিল না।

অচলকৃষ্ণ ঢিলা লোক, বিবাহ দিন স্থির করিয়া উদ্যোগী হইয়া কাজ সারিবার তাঁহার চাড় নাই, কান্তি বাবু পুত্রবধূ ঘরে আনিবার জন্য কিছু ব্যস্ত হইয়াছিলেন। নিজেই একদিন দিন স্থির করিতে গিয়া শুনিতে পাইলেন, সেন্সস কর্ম্মচারীকে অচলকৃষ্ণ বলিতেছেন, লিখিয়া লও 'এথিষ্ট' অর্থাৎ নাস্তিক ; কান্তি বাবু নিজে ব্রহ্মোপাসক হিন্দু এবং নিজের ধর্ম্মে একান্ত আস্থাসম্পন্ন। ভাবী বৈবাহিকের সহিত কথায় উভয়ের আভ্যন্তরিন্ প্রভেদ ফুটিয়া পড়িল। অচলকৃষ্ণ বলিলেন, সিবিল মতে বিবাহ হইবে, কান্তি বাবু রাগ করিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "তবে এ বিবাহ হইবে না।" পথে সিঁড়িতে অনিমার সহিত সাক্ষাতে মন ফিরিয়া গেল, ভাবিলেন মেয়েটি যদি ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়, তবে যেরূপে হোক ঘরে আনিয়া শিখাইয়া লইব, ছেলের জন্য ইহাও স্বীকার করিলাম্। কিন্তু তাহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইলেন, তাহা তাঁহার মনে নিরাশার ক্রোধ জাগাইয়া তুলিল, তাহার সদর্থ বিচার না করিয়াই চলিয়া গেলেন। বিবাহ ভাঙ্গিয়া গেল। অচলকৃষ্ণ কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'যাহা নই তাহা কেমন করিয়া ভাণ করিব ?' কন্যা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা কেমন করিয়া হইবে !'

যামিনীর মন ভাঙ্গিয়া গেল। সে বড় আশায় মালা গাঁথিয়াছিল, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পিতার আদেশ মত পাছে তাঁহার মনে আঘাত লাগে, এই ভয়ে নিজের সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় কলিকাতার এক ধনী কন্যা বিবাহ করিয়া ঘরে আনিল। কিন্তু এ বিবাহে তাহার স্ত্রী সুসঙ্গতার প্রেমশূন্য হৃদয়ের গর্ব্বিত আচরণে সে উচ্চহৃদয়া অনিমার প্রতি আকর্ষণ ভুলিতে পারিল না। ফলে বিবাহ বন্ধনের সুদৃঢ় গ্রন্থি বদ্ধ হইয়াও উভয়ের মিলন অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল। স্নেহ পুত্তলি কন্যা নলিনী যামিনীপ্রকাশের ভগ্ন হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি প্রদান করিল বটে, কিন্তু তাহার প্রতি তাহার স্ত্রীর ঔদাসীন্য তাহাকে অধিকতর ব্যথিত করিয়া তুলিল।

ইতিমধ্যে দুরন্ত ক্যান্সার রোগে অচলকৃষ্ণ দত্ত মৃত্যুকালে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সহায়হীনা কন্যার রক্ষণ ভার যামিনীকে ডাকাইয়া তাহারই হস্তে ন্যস্ত করিয়া গেলেন। নিজের কর্ম্মে অনুতপ্ত হইয়া কন্যাকে যে চির দুঃখিনী করিয়া ফেলিয়াছেন এবং সে যে মনে মনে যামিনীর প্রতি অনুরক্তা এ আভাসও তাঁহার মুখ হইতে ব্যক্ত হইলে যামিনী বিবর্ণ মুখে বাধা দিল। মিঃ দত্তর মৃত্যুর পর তাঁহার এক ভাগিনেয়ী মৃণালিনীও তাহার স্বামী ব্যারিষ্টার রমেন্দ্রনাথ তাঁহার ইচ্ছানুসারে অনিমার অভিভাবিকারূপে তাহার সহিত বাস করিতে লাগিল। পুত্র মিহির তখন বিদ্যা শিক্ষার্থ ইংলণ্ড প্রবাসী। যামিনীকে সর্ব্বদা অনিমার খোঁজ খবর লইতে হয়। তাহার ইচ্ছা সুসঙ্গতা তাহার সহিত সখীত্ব বন্ধনে বদ্ধ হইয়া তাহার মহৎ চরিত্রের অনুকরণে নিজের বিলাস তৃষ্ণা ডুবাইয়া দেয়, কিন্তু সুসঙ্গতা সে প্রস্তাব হাসিয়া উড়াইয়া দিল। স্বামী স্ত্রীতে কোন এক বিষয়েও মতের মিল ছিল না।

কান্তি বাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। যামিনী প্রথমে সংসার ঘাড়ে করিয়া বিপন্ন বোধ করিয়াছিল, কিন্তু ইদানীং তাহার একটু পসার জমিয়া আসিতেছে। হুগলি কোর্টে সে ওকালতী করিতেছে, হাইকোর্টে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। প্রধান বাধা সুসঙ্গতার বিলাস বাসনার বাধার ভয়।

অনিমার জীবন তৃপ্তিহীন। সে যেন কোন একটা অবলম্বন না পাইয়া জীবন ধরিতে পারিতেছিল না ; পিতা শিখাইয়াছেন কর্ম্মই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, নিজের কর্ম্ম জীবনই নিজের পরিচালক, ঈশ্বর নাই। কিন্তু কর্ম্মে সঙ্গী চাই, সে যামিনীপ্রকাশের সাহায্যে মেয়ে স্কুল ও অন্তঃপুর শিক্ষা সমিতি গঠনের চেষ্টা করিতে লাগিল। সে চেষ্টা প্রথমতঃ সফল হয় নাই, প্রথমতঃ এদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই বুঝিয়াছেন, কিন্তু সে বোধকে কর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করিতে প্রায় সকলেই নিশ্চেষ্ট; দ্বিতীয়তঃ অনিমার সঙ্গে তাহার স্বামী মেশামেশি করিয়া নিজের কার্য্যকাল খর্ব্ব করিতেছেন, এই অনুযোগ সুসঙ্গতার মুখে শুনিয়া যামিনী স্ত্রীর প্রতি অভিমানে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল।

একদিন অনিমা বৈশাখ অপরাহ্নে ছাদে দাঁড়াইয়া নিজের কর্ম্মহীন, আকর্ষণহীন জীবনের ভার অসহ্য বোধ করিতেছে, এমন সময় কাল বৈশাখীর ঝড় প্রবলবেগে উত্থিত হইল। সেই বৃষ্টির সময় নীচে জানলার নিকট দাঁড়াইয়া তাহার স্মরণ হইল নিকটস্থ গঙ্গাতীরে একটি নাগা সন্ন্যাসী ধুনী জ্বালাইয়া বসিয়া থাকেন, বৃষ্টিতে তাঁহার নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে। সে খিড়কির দ্বার খুলিয়া সন্ন্যাসীকে ভিতরে ডাকিয়া লইল। সন্ন্যাসী তাহার আচরণে ও সৌন্দর্য্যে প্রীত হইয়া তাহাকে রাধারাণীর সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া প্রশংসা করিলেন। শেষে একখানি ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি তাহাকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ প্রদান করিতে গেলে অনিমা বাধা দিয়া বলিল, "তোমার পূজার ঠাকুর, তুমিই রাখিয়া দাও, আমি ঠাকুর দেবতা এমন কি ঈশ্বরও মানি না।"

তখন সেই নিরক্ষর কৌপিনধারী ঘোর অবজ্ঞায় "শিমূরকা ফুল" বলিয়া তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ইহার পরদিন প্রভাতে সংবাদ পাওয়া গেল, সুসঙ্গতা নৌকাডুবিতে মারা গিয়াছে। ঝড়ের পূর্ব্বেই স্বামী স্ত্রীতে মনোমালিন্য ঘটে, রাগ করিয়া স্বামীর মনে কষ্ট দিবার ইচ্ছায় কন্যাকে প্রহার করিয়া সুসঙ্গতা নৌকারোহণে বেড়াইতে গিয়াছিল, ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল।

শোকের মধ্যে আবার অনিমা যামিনীর পার্শ্বে তাহার সহানুভূতিপূর্ণ নারী হৃদয় লইয়া দাঁড়াইল।

চেষ্টাক্রমে কর্ম্ম সফলতারূপে দেখা দিল। সামান্য অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ভদ্রলোক বৃদ্ধ ইন্দ্রনাথ বাবুর সহায়তায় তাহারা নৈহাটিতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সেইখানে নিজেদের শক্তি নিয়োগ করিল। আরও বিভিন্ন সদনুষ্ঠানেরও চেষ্টা চলিতেছিল। এই সময় একদিন ঘাটের পথে একদল আমোদমত্ত যুবকের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। সে দলের কর্ত্তা পূর্ব্ববঙ্গের একটি তরুণ জমিদার নাম কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ, 'কমে' দেখিতে বন্ধু ও পরামর্শদাতা ভূষণচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় ইঁহাদের শুভাগমন হইয়াছিল, এখন হুগলি দর্শনে যাত্রা করিয়াছেন। সেই দিন গোধূলি আলোকে অনিমার অনন্যসাধারণ মূর্ত্তি অকস্মাৎ বরেন্দ্রকৃষ্ণের পঙ্কিল জীবনে ভিন্ন স্রোত বহাইয়া দিল। প্রথমে হুগলীতে গঙ্গাতীরে সুসজ্জিত ঘরে বসিয়া সে নিজের ঐশ্বর্য্য ফাঁদে তাহার চিত্তাকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল এবং অনিমার মনের ভাব বুঝিয়া অনাথাশ্রম স্থাপনের প্রস্তাব সহ তাহার প্রতি বিশেষ স্নেহসম্পন্না ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নীর সাহায্যে তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন করিল।

এদিকে ক্রমশঃ অনিমার সঙ্গ যামিনীকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিতেছিল। সহসা একদিন তাহার প্রতি নিজের মনের মধ্যে কি গভীর ভালবাসা লুক্কায়িত রহিয়াছে, এই রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া গেলে ভীত ও দুঃখিত হইয়া তাহার নিকট হইতে দূরে সরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু অনিমার মনে সন্দেহ বা সঙ্কোচ ছিল না, সে নিজে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আবার নিজের কর্ম্ম সঙ্গ গ্রহণ করাইল। জানাইয়া দিল, সে নহিলে তাহার চলে না।

এদিকে বরেন্দ্রকৃষ্ণ দিন দিন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, যামিনীকে না সরাইতে পারিলে সুবিধা নাই দেখিয়া ভূষণের সাহায্য চাহিলে সে এই কার্য্যের পুরস্কার দশ সহস্র টাকা ধার্য্য করাইল। বরেন্দ্র বিশেষ করিয়া কহিয়া দিল, তিনি তাহার সাংঘাতিক ক্ষতি করিতে চাহেন না, অনিমার মনে তাহার প্রতি একটা অশ্রদ্ধা জন্মান পর্য্যন্তই তাঁহার প্রয়োজন। অনিমাকে বরেন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা স্থির করিয়া যামিনী অত্যন্ত আহত হইয়া ঘরে ফিরিয়া অনেক চিন্তা করিল। নিজেকে বুঝাইতে চাহিল সে অভিভাবক তাহার এ অনুদারতা থাকা উচিত নয়। তা' ভিন্ন সে যেদিন সুসঙ্গতাকে বিবাহ করিয়াছিল, সেই দিনই তো তাহার পরে তাহার দাবী ফুরাইয়াছে, তবে এতদিন পরে তাহাকে তাহার ঈপ্সিত পথে যাইতে দেখিয়া এ শোকানুভব কেন ? কিন্তু মন সে নিষেধ না মানিয়া হা হা করিতে লাগিল, বলিল "তখন যা হয় হইত, তা যখন না হইয়াছিল, তবে এখন কেন এমন হইল ?"

সে মনের এই ভাব লইয়া সেখানে যাইতে পারিল না, কিন্তু তাহার সকল সন্দেহ দূর করিয়া অনিমা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

রমেন্দ্র বরেন্দ্রকৃষ্ণের ভাবভক্তি দেখিয়া শঙ্কিত হইতেছিল। এইবার সে প্রস্তাব করিল যামিনীর অনিমাকে বিবাহ করা উচিত। যামিনী শুনিয়া অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া গেল, একদিকে নিজের আজীবনের সাধনার বস্তু, অপর দিকে সুসঙ্গতার শেষ চিহ্ন কন্যা নলিনী। সে পাছে বড় হইয়া মনে করে তাহার পিতা তাহার মার প্রতি অবিচার করিয়াছেন। নিজের সন্তানের কাছে অপরাধী হওয়া বড় লজ্জার বিষয়. যদি সে দুঃখ পায় ? কিন্তু শেষে রমেন্দ্র ও পিসিমার যুক্তিরই জয় হইল। অনিমা তাহারই জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছে, তাহার প্রতি কি কোন কর্ত্তব্য নাই ? এই কথায় তাহার মিঃ দত্তের শেষকালের কথা মনে পড়িল। তখন অনেক বিচার বিতর্কের পর স্থির হইল সে মিহিরের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিবে, উত্তর পাইলে তখন অনিমাকে বলা হইবে।

তাহাই হইল, যামিনী উত্তর প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতে লাগিল, অনিমা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহার নিকট 'উপনিষদ ব্যাখ্যা' শুনিয়া নিজের দৃঢ় নাস্তিক মত খণ্ডন চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেক দিন হইতেই যামিনী তাহাকে ঈশ্বর বিশ্বাসী করিতে যত্নও চেষ্টার ত্রুটি করিতেছিল না। মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ী যামিনীর নিমন্ত্রণ হয় সেখানে জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা অমলা তাহাকে ভ্রাতৃস্নেহে সম্বর্দ্ধিত করে, গৃহিণী যোগমায়াও খুব স্নেহ যত্ন করেন, কিন্তু ছোট মেয়ে জ্যোৎস্নাবালা তাহার সম্মুখে সহজে বাহির হইতেই চাহে না, মেয়েটি যেমনি জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যশালিনী, তেমনি লাজুক।

বরেন্দ্রকৃষ্ণ অনিমাকে যামিনীর প্রতি তাহাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা সম্পন্ন দেখিয়া দিন দিন ভয় পাইতেছিল। যামিনীর প্রতি তাহার বিদ্বেষেরও সীমা ছিল না। একদিন বালিকা বিদ্যালয়ে তাহাকে একা দেখিয়া সে একটি বহুমূল্য হীরকালঙ্কার উপহার দিবার উপলক্ষে নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া কহিল 'তাহার জন্যই সে এত সব করিতেছে, সে অনুমতি করিলে তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য গরীবকে বিলাইয়া দিয়া পথের ভিখারী হইতে প্রস্তুত আছে ; নহিলে গরীব তাহার কে ?'

শুনিয়া অনিমা তাহাকে তাহার প্রার্থনার অসঙ্গতি জানাইয়া দিয়া কহিল "আমি তোমায় যেরূপ ভাল ভাবিয়া তোমার সঙ্গে কথা কই তুমি যদি তা' না হও আমাকেও বাধ্য হইয়া দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস তা' নয় তুমি ভাল উদ্দেশ্যেই ভাল কাজ করিতেছ, বুঝিতেই যা' ভুল হইয়াছে !

সে যখন ঘরে ফিরিয়া ভাবিতেছে হয়ত সে আজ তাহার একজন কর্ম্মের সহায় হারাইল এমন সময় মৃণালিনী আসিয়া কথাচ্ছলে যামিনীর সহিত তাহার বিবাহের কথা তুলিয়া জানাইল যামিনী প্রথমে তাহার অসম্মতির ভয় করিয়াছিল কিন্তু তাহারা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে। সে ভয় অমূলক শুনিয়া সে উত্তর করিল, অসম্ভব !

মিহিরের পত্র আসিলে যামিনী, তাহার আগ্রহপূর্ণ সম্মতি লইয়া নিজেও অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, কিন্তু রমেন্দ্র সেদিন ও তার পরদিন ও তাহার সহিত দেখা না করায় সে বিস্মিত হইল। ইন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ না গেলে নয়। সেখানে প্রার্থনার কালে নলিনীকে একটি অপরিচিতা কিশোরীর স্নেহপাশবদ্ধ দেখিয়া সে বড় তৃপ্তি ও কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছিল, এমন সময় অমলার কথায় জানা গেল, সে মেয়েটি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার হাতে লেখা মাসিক 'কিশলয়ে'র গোপন সংবাদ যামিনীকে প্রদান করিয়া তাহার দিদি তাহাকে লেখা দিতে অনুরোধ করায় লজ্জায় ক্রোধে জ্যোৎস্না পলাইয়া যায়, কিন্তু তৎপরে তাহারই রন্ধনের সুখ্যাতিকালে সে পরিবেশন করিতে আসিয়া আবার তেমনি বিজড়িত লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, যামিনী তাহাকে

পূর্ব্বে বড় একটা লক্ষ্য করে নাই, আজ তাহার এই প্রথম পরিচয়ে স্নেহে হাসিয়া ভাবিল "কিশলয়ের সম্পাদিকা কচি কিশলয়ের মতই সুন্দর!"

গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে কাছারীতে রমেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। সংবাদ সুসংবাদ নয়, সঙ্কোচের সহিত রমেন্দ্র প্রকাশ করিল, তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল। অনিমা তাহাকে ভালবাসে না, সে এ বিবাহে অসম্মত। মুহূর্ত্তে বিমান বিচ্যুত অট্টালিকার সহিত যামিনীও অন্ধকার অতলে তলাইয়া গেল। অনেক ভাঙ্গা গড়ার পর অনেক সঙ্কোচ সন্দেহ সরাইয়া সে এবার বড় আশায় নন্দন কানন রচনা করিয়াছিল। হতাশার প্রথম বেগে সে সব শূন্য দেখিল তারপর ক্রমে সবই সহিয়া যায়। নির্জ্জন ঘাটের সোপানে রমেন্দ্র তাহার মেয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে সে ঘরে ফিরিল।

দু চারি দিন গেলে রমেন্দ্র প্রস্তাব করিল তাহার নিজে একবার বলা উচিত, একবার তাহাদের পক্ষ হইতেই অনিমা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। সেই অভিমান হয়ত সে আজও ভুলিতে পারে নাই। প্রথমে যামিনী কিছুতেই এ প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই। শেষে তাহার পীড়াপীড়িতেও বটে আর হয়ত আশারও কুহকে পড়িয়া সম্মত হইল। রমেন্দ্র বুঝাইল তাহার অভিভাবকগণ তাহার সহিত পূর্ব্বে এবং এখনও বিবাহে সম্মত, সে পূর্ব্বে নিজেও সম্মত ছিল। তবে এখন অভিমান ব্যতীত আর এ অসম্মতির অন্য কি কারণ থাকা সম্ভব?

কিন্তু সেবারও তাহার ভুল হইয়াছিল, এবারও তাই হইল। যামিনী একদিন অনিমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মৃণালিনীর সাহায্যে প্রথমকার দ্বিধা কাটাইয়া ফেলিল; তারপর অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল "রমেন বলে হয়ত তাহাদের বুঝিবার ভুল, সত্য কি তাই?"

অনিমা অকস্মাৎ ব্যথা কাতর কণ্ঠে "আপনি আমার জন্য অনেক করেচেন, কিন্তু এমনি অকৃতজ্ঞ 'আমি যে—" বলিয়াই বিবর্ণ মুখে চলিয়া গেল।

পিসিমা যামিনীকে বিমর্ষ দেখিয়া বিবাহের কি হইল জিজ্ঞাসা করিলে সে বাধা দিয়া বলিল "ও কথা আর এ জন্মে নয় পিসিমা।" কারণ শুনিয়া পিসিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মানে কি?" "বোধ হয় আমরা ব্রাহ্ম তাই!" রাগ করিয়া পিসিমা কহিলেন, "উনি কি মস্ত হিন্দুর মেয়ে!" কিন্তু যামিনী এ আলোচনা আর চলিতে দিল না। সে বিধাতার উদ্দেশে করযোড়ে বলিল "তুমি যা দিবে আমার সেই অনেক নিরাশার সুখই বড় সুখ।"

ইতিমধ্যে একদিন বরেন্দ্রকৃষ্ণ যামিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট অনিমার প্রতি তাহার গভীর ভালবাসার কথা জ্ঞাপন করিয়া তাহার নিকট হইতে তাহাকে ইহা-জ্ঞাপন করিবার অধিকার প্রার্থনা করিয়া বলিল, আমি মাটি হইয়া গিয়াছিলাম তিনিই আমায় উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাকে না পাইলে আমি জানি না আবার কি হইব, আপনি আমার সহায় হোন।"

যামিনীর মন উদার উচ্চ, সে সামান্য লোকের মত নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইল না। মনের সহিত কহিল, আমার সাহায্য করিবার কোনই অধিকার নাই, তবে আপনার এখনকার স্বভাবে আমি আপনাকে বাধা দিতে চাহিব না ইহা নিশ্চিত আপনি মনুষ্যত্ব দেখাইতেছেন। কৃতজ্ঞতার অশ্রু জলে ভাসিয়া বরেন্দ্র বিদায় লইল।

ইহার মাঝখানে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। হরিদয়াল নাগের সহিত তাহার নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র রাধাশ্যাম দৌহিত্রের সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমায় নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রের তরফে যামিনী একাকী সেই বহু উকিল ব্যারিষ্টারগণের চেষ্টা সত্ত্বেও উইল জাল ইহা প্রমাণ কয়িয়া দিয়াছিল। হরিদয়াল ইহার ফলে উইল জালের মোকদ্দমায় দীর্ঘ নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়। ভূষণ হরিদয়ালের অর্থ লইয়া তাহার শত্রু নিপাতের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। তাহার মতলব এক ঢিলে দুই পাখী মারিবে।]

(৩০)

সেদিন জনবিরল রাজপথ দিয়া যামিনী যখন ভারাক্রান্ত চিত্তে, নিজের বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন পাড়া প্রতিবেশীর গৃহে রুদ্ধ দ্বার জানালার অন্তরাল হইতে সন্ধ্যা প্রদীপের প্রথম কিরণরশ্মি গৃহচ্ছায়ান্ধকার সঙ্কীর্ণ পথের পরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কোন গৃহের গৃহ দেবতাকে কাঁশর ঘণ্টা বাজাইয়া আরতি করা হইতেছে, সেই সঙ্গে গৃহান্তর হইতে নববধূর সুকোমল সলজ্জ ওষ্ঠ পূত, শঙ্খধ্বনি মিলিত হইল।

বাড়ী ফিরিতেই নলিনী আসিয়া দুই হাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কোথা গেছলে বলো দেখি বাবা! সব জায়গায় যাও আর জ্যোতি মাসীমাদের বাড়ী একটি দিনও যেতে হবে না বুঝি?"

পিতা কন্যার পুষ্পপুটতুল্য অধরে চুম্বন করি তাহার ক্ষুদ্র দুখানি দুর্ব্বল হাতের আলিঙ্গনে নিজে ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "তা না হয় নাই গেলুম তুইতো যাচ্চিস্।"

নলিনী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া তৎক্ষণা বলিয়া উঠিল "তা বই কি, তা হবে না তোমা যেতে—ই হবে একদিন, জ্যোতি মাসী রোজ জিজ্ঞে করেন, হাঁ তুমি যাবে না বই কি।"

যামিনী তাহাকে টানিয়া ঘরের ভিতরে অগ্রস হইতে হইতে জিজ্ঞাসা করিল "কি জিজ্ঞেস করেন? "আবার কি, এই বলেন কই নেল্ তোমার বা কই এলেন না? আসবেন না বুঝি? আমি ব আসবেন গো আসবেন দেখো আসবেন।" "তি

কি বলেন? "বলেন রোজই তো বলো, এলেন কই? "আবার কি বলেন জানো?" "কি?" "এই বলেন তুমি আমার কথা যেন তাঁকে কিছু বলোনা দেখো ভুলে যেও না যেন। আমি বল্লুম "তোমার কি কথা? তা তিনি বল্লেন এই কোনকথাই না, আমি তোমায় তাঁর কথা যা জিজ্ঞেস করি টরি, কিচ্ছু বলো না, লক্ষ্মীটি।' তা বল্লুম তিনি যদি জিজ্ঞেস করেন? তিনি বল্লেন কি করে জান্‌বেন, জিজ্ঞেস করবেন না, আমার কথা কেনইবা জিজ্ঞেস করবেন? তুমি যাও-ও না কিছুই না তবু কিন্তু মাসিমা তোমায় খুব ভালবাসেন। তোমার কথা রোজ জিজ্ঞেস করেন।"

যামিনীর মুখ গম্ভীর হইয়া আসিতেছিল, সে সহসা কন্যার হাত ছাড়িয়া সম্মুখস্থ টেবিলটার উপর হইতে একটা শ্বেতপাথরের কাগজ চাপা তুলিয়া তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিযুক্ত হইল। শিশুর মুখের সরল ভাষাতেও সংবাদটার জটিলত্ব বেশ একটু সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল না।

নলিনী তাহারই মেয়ে, সে খুব মেধাবী। সে কিছুতেই নিজের কাজ ভোলে না। আদরে আবদারে পিতাকে স্বীকার করাইয়া লইল যে এবার যেদিন সময় থাকিবে, সেই দিনই তিনি মাসিমার বাড়ি না গিয়া জ্যোৎস্না মাসিমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন। তাহার জেদে যামিনী ইহা স্বীকার করিল বটে কিন্তু নিজের মনের ভিতর একটা যে অস্ফুট সংশয়, বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল সেটুকু সে সহসা উড়াইয়া দিতে পারে নাই। তাহা এই যে, যদি শ্রদ্ধাই হইল, ভক্তিই হইল, তবে এত গোপনের চেষ্টা কেন? বারেবারে শিশুর নিকট এত নিষেধ করার কি আবশ্যক আছে? স্পষ্টইতো সে তাহার কুশল বা সাক্ষাতেচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিত?

নিজের চিত্তভারের উপরে নূতন চিন্তাটা আর একটু ভার হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তারপর সে হঠাৎ নিজের মনকে ধমক দিয়া বুঝাইল তাহার ভয় ভিত্তিহীন, কারণ সে নিজে যেমন তাহাকে দু একটি দিনই মাত্র দেখিয়াছে সেই বালিকা তাহাকে তাহার বেশী দেখেন নাই। তার পর এই আগ্রহ, ইহা শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ভিন্ন আর কি? সেই স্বল্প পরিচয়ে মেয়েটি—! সে ক্ষেপিয়া গিয়াছে নাকি?

প্রভাত অরুণের উদয়াচলে প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কর্ম্মোদ্দীপক শক্তি রশ্মিরূপে সমস্ত জগতের উপর হইতে যে মুহূর্ত্তে মোহান্ধকার ও অসত্য-জড়তার নিদ্রাবরণ তুলিয়া লইল, সেই মুহূর্ত্তেই কর্ম্মোদ্দীপনা আসিয়া তাহারও গত রাত্রের চিন্তা-বেদনা ও সংশয়কে উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে কর্ম্মস্রোতের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। পরদিন সে আবার অনিমার উদ্দেশে গেল। সেদিন হাতে কাজের অভাব ছিল না, তথাপি না গিয়া সে পারিল না। আদি বিদ্বান মহর্ষি কপিল, তাঁহার পুরুষ-প্রকৃতির বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার আর কতটুকু উন্নতি-সাধন করিয়া উঠিতে সক্ষম হইলেন, তাহা জানিবার কৌতুহল অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সেখানে গিয়া কৌতুহল নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে সেটা আরও কিছু বর্দ্ধিত করিয়া অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। অনিমা বাড়ী ছিল না, রমেন্দ্ররাও কেহ নাই। চন্দর দাসী আসিয়া বলিল "তারা সব দাদা মশায়ের কাছে গেছেন যেগো, আপনি তা জানেন্‌নি?"

যামিনী বিস্মিত হইল, দাদা মহাশয়! কে তিনি? অনিমার পিতামহে তো নয়ই মাতামহ, তাও না। তবে আর কে? দাসী কহিল "আপনি তাঁকে চেনোনি বুঝি? তা কেমন করেই বা চিন্‌বেন, দিদিমণি নিজেই কখনও তাঁকে দেখেনি, তাঁর সঙ্গে সায়েবের সঙ্গে তো বনিবনা ছিল না, তিনি মস্ত ধার্ম্মিকলোক এ সব মেলোচ্ছ কাণ্ডর মধ্যে কি তিনি থাকেন। কাশীপুরে একটা বাগানে তিনি বরাবর থাকতেন, মধ্যে তীথি করতে যান, আবার এই এসেচেন।" যামিনী প্রশ্ন করিয়া পুরাতন দাসীর নিকট হইতে জানিতে পারিল এই দাদা মহাশয় লোকটি অনিমার পিতার খুল্লতাত, তাঁহার নাম সে বলিতে পারিল না, বাটির গৃহিণী—অনিমার মাতার মৃত্যুকালে একবার

তিনি ইঁহাদের কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন মাত্র। এতদ্ভিন্ন চন্দর তাহার বিশ বৎসর চাকরীর ভিতরে ইঁহাকে আর দ্বিতীয়বার দেখে নাই, নামও শুনে নাই। অনিমার মার মনে তাঁহার এই খুল্লতাত শ্বশুরের প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, তিনিই মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া স্বামীর অজ্ঞাতে ইঁহাকে সংবাদ দিয়া আনাইয়াছিলেন এবং মৃত্যু মুহূর্ত্তে জীবনব্যাপি ভুলের জন্য অনুশোচনা করিয়া ইঁহারই নিকট হইতে মৃত্যুর পরবর্ত্তী লোকের জন্য পাথেয় ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিলেন। শুনা যায় তাঁহার স্বামী তাঁহার সেই শেষ অপরাধও ক্ষমা করিতে পারেন নাই এবং খুড়াকেও না।

হঠাৎ এতদিন পরে এই নিঃসম্পর্ক খুড়া—অনিমার দাদা মহাশয়ের সংবাদ সে কোথা হইতে পাইল এবং তাঁহার কাছে সে হঠাৎ ছুটি লইবা কেন? যামিনীর এই কৌতুহল চন্দ্র ভাল করিয়া মিটাইতে পারিল না। সে এই পর্য্যন্ত জানে যে দাদামহাশয় মিহিরের মেম বিবাহের সংবাদ কাগজে পড়িয়া অবধি দত্ত সাহেবের কন্যার সংবাদ লইতে উৎসুক হইয়াছিলেন। সম্প্রতি কাশীপুরে আসিয়া তাহার সংবাদ লহতে কাহাকে পাঠাইয়াছিলেন। অনিমার অকস্মাৎ এই আত্মীয়টিকে দেখিবার সাধ হইল।

এই নূতন সংবাদটা যামিনীকে একটু বিস্মিত করিলেও একটুখানি খুসীও করিল। নিরাত্মীয়া অনিমার একজন এমন কেহ তবে এখনও বিদ্যমান আছেন যাঁহার কাছে সে প্রয়োজন হইলে দুদিন গিয়াও দাঁড়াইতে পারে? রমেন্দ্রনাথের মুন্সেফি লওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩১)

কাশীপুরে সর্ব্বমঙ্গলাকালীর অল্পদূরে একখানি ছোট বাগান বাড়ীতে সিদ্ধেশ্বর দত্ত মহাশয় বহুদিন যাবৎ বাস করিবার পর যখন হঠাৎ একদিন তাহার ফটকে তালা বন্ধ করাইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া যান, এবং তাহার পর এই ছয় সাত বৎসর অতীত হইয়া গেল তাঁহার কোন সংবাদও কেহ শুনিতে পাইল না, তখন তাঁহার ভক্তমণ্ডলী ও অনুগত প্রতিবাসীবর্গ তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন সম্বন্ধে সম্পূ হতাশ্বাস হইয়া অরক্ষিত উদ্যান বাটিকাতে, একজ মালি রাখিয়া ও তাহার জীর্ণ সংস্কার করাইয়া তা ভাড়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এম সময় একদিন শরতের নির্ম্মল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে স তাঁহাদের অভীপ্সিত ব্যক্তির পুনরভ্যুদয় হইল, স ছিল একটি ছাত্র—তাঁহার পিতৃমাতৃহীন দৌহি সুকুমার। অনিমা যেদিন অকস্মাৎ এই ঋষ্যশ্রমে মতই প্রশান্ত, নির্জ্জন উদ্যানের জনহীন গৃহদ্বা আসিয়া দাঁড়াইল, সেদিন তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে একটা সূচনা লইয়া কৌতুহলী প্রকৃতির সস্মিত দৃ পাতে বড় উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিয়াছিল। রাশি রা সেফালির গন্ধে বাগানের সমুদয় ভ্রমরগুলা মাতি উঠিয়াছে, পাখীর কলতানে কাণ পাতা যেন ভা বোধ হইতেছিল।

দত্তজা মহাশয় তাঁহার অনতিপ্রশস্ত ঘরখানি কম্বল পাতা বিছানায় বসিয়া সবেমাত্র একখা পুরাতন পুঁথি লইয়া চশমার মধ্য হইতে তাহা উপরে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন অমনি মুক্ত দ্বারের ম দিয়া অগ্রসর হইয়া অনিমা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হই প্রণাম করিল। বৃদ্ধ একবার তাহার দিকে চাহিয়া পুঁথিখানি নামাইয়া রাখিলেন, তারপর তাহার দি চাহিয়া থাকিয়াই প্রশংসার সহিত কহিলেন "ঋগ্বেদযু কুমারী কি আজ প্রত্যক্ষরূপে আমার সাম আবির্ভূতা হলেন? কে'মা তুমি?" লজ্জায় সঙ্কো রাঙ্গা হইয়া নতমুখে সে উত্তর করিল "অচলকৃ দত্তের মেয়ে, আমি অনিমা।"

"অচলের মেয়ে তুমি? নাত্‌নি আমার! এ এসো দিদি এসো, উনি বুঝি আমার নাত্‌জামাই আর ওটি কে?"

রমেন্দ্র ও মৃণালিনীকে লক্ষ্য করিয়া দত্তজ মহাশয় এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অনিমা সলজ্জ মুখে কহিল "হাঁ উনি আপনার নাতজামাই হন পিসিমার জামাই আর এই তাঁর মেয়ে মৃণালিনী।"

"বেশ্‌ বেশ্‌ খুব আনন্দ হলো দেখে, তোমা স্বামী কই?"

অনিমা লজ্জায় মরিয়া গিয়া নাথা নত করিয়া রহিল। মিলি তাহার হইয়া উত্তর দিল, "ওকে আপনি প্রথমেই যে কুমারী বলে সম্বোধন করেছিলেন, সেটা আপনার ভুল হয়নি দাদামহাশই, ও কুমারীই সত্য।" দাদা মহাশয় সরিয়া আসিয়া অনিমার নত মুখ দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহনেত্রে তাহাকে দেখিতে দেখিতে স্বাভাবিক মধুর হাসিটুকু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন "সেযে ওর চেহারাতে মাখান রয়েচে। দেখচো না, এ যে হংসবাহিনী, বীণাপানীর চেহারা, একেতো কোন মতেই স্থিতিকারিণী শক্তিরূপে দেখ্‌তে পারিনে? উহুঁ, মোটে তা মানায় না।"

অনিমা মুগ্ধচিত্তে আবার তাঁহার পদতলে প্রণত হইয়া দুই হস্তে তাঁহার পদধূলী তুলিয়া লইয়া মাথায় দিল। হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল, "এতদিন আমায় ডাকনি কেন দাদামশাই? তোমার এমন স্নেহদৃষ্টির বাইরে ফেলে রেখে কি বঞ্চিত করেছিলে বলো দেখি।"

সেদিন গৃহে ফিরিয়া সে যেন আরও অতৃপ্তি বোধ করিতে লাগিল। ক্রমাগত সেই চিরাত্মীয়, অথচ চির-অপরিচিত পর, দাদামশায়ের সৌম্যমূর্ত্তি ও মধুর ব্যবহারের কথা মনের ভিতরে তোলাপাড়া হইতেছিল। এমন স্নেহ, এমন সরলতা এমন অনাড়ম্বর পাণ্ডিত্য সে যেন আর কোথাও কখনও দেখে নাই।

যামিনীকে সে একদিন তাহার দাদামহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিল "তাঁকে না দেখ্‌লে আপনি তাঁকে বুঝতেই পারবেন না। কি রকম সরল শিশুর মতন মন আর কি জ্ঞান তার সঙ্গে। এমন আত্মীয় থেকেও আমরা চিরকাল বিযুক্ত ছিলুম, একি কম দুর্ভাগ্য।"

কাশীপুরে যামিনীর ভগ্নিপতির বাড়ী, যাওয়া কিছু কঠিনও নয় মধ্যে মধ্যে সে নন্দিনীকে দেখিতে গিয়াই থাকে। এবার যেদিন ভাইফোঁটা উপলক্ষে তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে গেল, অমনি সে দাদা মহাশয়ের সহিত ও সাক্ষাৎ করিল। গরদের জোড় পড়িয়া খড়ম পায়ে, সেই মাত্র তিনি পূজাগৃহের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিলেন। শুভ্র সুপ্রচুর গৌরবর্ণ হরিৎ বৃক্ষপত্রের ভিতর হইতে গৌরতর দেখাইতেছিল। মুখের স্বাভাবিক মিষ্ট হাসিটুকু দর্শনার্থী যুবকটিকে দেখিয়া মধুরতমরূপে ফুটিয়া উঠিল। যামিনী অল্পদূরে থাকিয়াই প্রণাম করিল। দাদামহাশয় কহিলেন "তুমি কেগো? মুখখানিতে যে বড় উদার ভাব মাখান রয়েছে, আর বিদ্যাবুদ্ধিতেও তেমনিতর উজ্জ্বল। তুমি তো বড় সামান্য ছেলে হবে না!"

একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়ে মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। আকাশের পূর্ব্ব ললাট তখন সেইমাত্র স্বর্ণকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিরণ কেশ পাশ এলাইয়া দিয়া হেমন্তের শিশিরার্দ্রপ্রকৃতি, উপবনে শ্যামাঞ্চল বিছাইয়া তাহা শত পুষ্পে খচিত করিতেছিল। গাছের উপর হইতে বোঁটাখসা সেফালির সহিত শিশিরের বিন্দুগুলি টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া ঘাসের উপরে ঝরিয়া পড়িতেছিল। নির্ম্মল নীল আকাশে একটি প্রশান্ত রাগিণীর অবিচ্ছিন্ন সুর নীরব শব্দহীন ভাষায় স্পন্দিত হইতেছিল। তাহা কিরণকুন্তলা, গন্ধ নন্দিতা মহা প্রকৃতির স্বর্ণ-বীণার বিচিত্র ছন্দের সুর।

যামিনী নম্রশিরে কহিল "আমি আপনার একজন দর্শনার্থী, নাম যামিনীপ্রকাশ রায়।"

ক্রমশঃ।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

চিত্র পরিচয়।

রজতা চল কে তুঙ্গ শৃঙ্গ রাজিত সুষমা ঘর।
পীঠা সুদ্ধ স্ফটিক বনী বৈঠী হৈ তেহি পর ॥
প্রফুল্লিত পঙ্কজ কুসুম নিএঁ পূজতি গিরিজা বর।
পরম প্রবীনা অহৈ গহেং বীণা বাজা কর ॥
তন ছটা তপ্ত কুন্দন বরণ বরণত ছবি কবিবর কব ন।
এহ ভৈরব রাগকে রাগিণী নাম ভৈরবী গুণ ভবন ॥

দোঁহা।

নাম ভৈরবী রাগিণী ভৈরব রাগকে বাম।
গান করত সজ্ঞানজন দিবস বঠেং এক জাম ॥

পর্ব্বতের রজত বর্ণ উচ্চ শৃঙ্গের উপর একটী সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত।
তথায় সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ভৈরব রাগিণী আসনে উপবিষ্ট।
তিনি প্রফুল্লিত পদ্ম লইয়া মহাদেবের পূজা করিতেছেন।
তিনি পরম প্রবীণা ; হস্তে তাঁহার বীণা যন্ত্র।
তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায়, কোন্ কবি তাহার বর্ণন করিতে পারে ?
ইনিই ভৈরব রাগের রাগিণী, ইঁহারই নাম ভৈরবী।

দোঁহা।

ইঁহার নাম ভৈরবী রাগিণী, ইনি ভৈরব রাগের স্ত্রী।
ইনি গান করিলে জ্ঞানবান ব্যক্তি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন।

প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে হাজারিবাগে লক্ষ্মীনাথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজস[illegible] চিত্রকর দ্বারা তিনি ৭৮টি রাগ-রাগিণীর চিত্র অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। চিত্রকর রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি ক[illegible] করিয়া আঁকিয়াছিলেন। এই সংখ্যায় ভৈরবী রাগিণীর চিত্র প্রকাশিত হইল। সুপ্রভাতের পঞ্চম ব[illegible] প্রথম সংখ্যায় ইঁহার অঙ্কিত টোড়ী রাগিণীর চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ম্য-প্রেস, ৬নং কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা।

Presented to the U-P-L-
by Shiva Prasad Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের
জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { ভাদ্র, ১৩২০। } ২য় সংখ্যা।

সেখ ফরিদ।

অন্ন বস্ত্র সকল বিষয়ের জন্যই ফরিদ ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেন। একদিন সম্রাট দুই থালা স্বর্ণ মুদ্রা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। পাছে সম্রাটের অসম্মান হয়, তাই তিনি দুইটি মুদ্রা গ্রহণ করিয়া একটী অতিথিশালায় পাঠাইয়াছিলেন, অন্যটী দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একজন শিষ্য সেই থালা হইতে কয়েকটী মুদ্রা রাখিয়াছিলেন। ফরিদ তাহা অবগত হইয়া শিষ্যকে তৎক্ষণাৎ সেই মুদ্রা দূরে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

ঋণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করা ফরিদ মহা পাপ বলিয়া বলিয়া মনে করিতেন। একদা নিজামউদ্দীন আউলিয়া কোন প্রতিবেশীর নিকট হইতে লবণ ধার করিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা ডাইল রন্ধন করিয়াছিলেন। ফরিদের এই রীতি ছিল, উপস্থিত কাহাকেও অভুক্ত রাখিয়া নিজে কখনও আহার করিতেন না। তিনি সকলকে সেই ডাইল বিভাগ করিয়া নিজে এক অংশ গ্রহণ করিলেন। তিনি ডাল মুখে দিয়া বলিলেন, "ডাইলে লবণ মিশ্রিত করাতে উহার উত্তম স্বাদ হইয়াছে বটে কিন্তু লবণের মূল্য গরীবদিগকে দান করিলে খাদ্য সামগ্রীর স্বাদ আরও বর্দ্ধিত হইত।" নিজামউদ্দীন বলিলেন "লবণ ক্রয়ের জন্য পয়সা ব্যয় করি নাই, কোন প্রতিবেশীর নিকট হইতে উহা ঋণ করিয়া আনিয়াছি।" ফরিদ কহিলেন "ঋণের দ্রব্য খাওয়া মহা পাপ।" তিনি ডাইল আহার করিলেন না।

আর এক সময়ে সম্রাট নাসিরউদ্দীন ফরিদের ভরণপোষণের জন্য অনেক স্বর্ণ মুদ্রা ও চারিখানি গ্রামের দানপত্রসহ নবাব আলিফ খাঁকে পাকপত্তনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফরিদ সম্রাটের দান প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, ধনে যাহাদের প্রয়োজন, ধন তাহাদিগকে দিন; তাহাদের উপকার হইতে পারে। আমার দাতা স্বয়ং পরমেশ্বর; তিনি আমাকে এত

ধন দান করিতেছেন, যে আমার আর কোন অভাব নাই। ধনীর নিকট দান গ্রহণ করা আমাদের বংশেরও রীতি নয়। আমার গুরু কুতুবউদ্দীনকে সম্রাট আলতমাস অনেক স্বর্ণ রৌপ্য ও জায়গীর দিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু গুরু বলিয়াছিলেন "জগতের কোন সাধু ধনীর দ্বারে কখনও ভিখারী হন নাই। যদি সম্রাটের দান গ্রহণ করি, তবে সাধুদের শিষ্যত্বের দাবী করিতে পারিব না!"

সম্রাট নাসিরউদ্দীন নিঃসন্তান ছিলেন। নবাব আলিফ খাঁর বড় ইচ্ছা ছিল যে, তিনি নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহন করেন। একদা আলিফ খাঁ ফরিদের নিকট আসিয়া কহিলেন "সাধুর আশীর্ব্বাদে অসম্ভব সম্ভব হয়। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন দিল্লীর সম্রাট হইতে পারি।" ফরিদ কহিলেন, "গুণের উপর পার্থিব উন্নতি নির্ভর করে। ফরিদের সাধ্য কি তোমাকে সম্রাটের সিংহাসনে উপবিষ্ট করে। ফরিদ দেবদূত নহে। সে গোলাপ জল বা সুগন্ধ অম্বরের দ্বারাও নির্ম্মিত হয় নাই। ন্যায় ও উদারতাই মানুষকে মহত্ত্ব দান করে। ন্যায়পরায়ণ ও উদারচিত্ত হও, তুমি মহত্ত্ব লাভ করিবে।"

ফরিদের উপদেশে নবাব আলিফ খাঁ বাক্য, মন ও কার্য্যে ন্যায়নিষ্ঠা ও উদারতার সম্মান রক্ষা করাতে অচিরকাল মধ্যে প্রকৃতিপুঞ্জের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর তিনিই গিয়াসউদ্দীন বলবন নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সম্রাট নাসিরুদ্দীনের নিমন্ত্রণে একদা ফরিদ দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া মহিষীদিগের ধর্ম্মশিক্ষার ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। সম্রাটের হাজাব্রা নাম্নী এক দুহিতা ছিল। ফরিদের সহিত হাজাব্রার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য সম্রাট এক মন্ত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফরিদ বিবাহের কথা শুনিয়া জোড় হস্তে ঈশ্বরকে বলিলেন "আমার প্রাণ একমাত্র তোমার প্রেমের ভিখারী, এক প্রাণ কয়-জনকে দিব?" ফরিদ এই বাণী শুনিতে পাইলেন "তোমার সন্তানদের দ্বারা এদেশের কল্যাণ হইবে।" ফরিদ বলিলেন "যদি সন্তানগণ ধর্ম্মহীন হয়?" ঈশ্বর বাণী বলিল "আমি তাহাদের ভার বহন করিব।"

ফরিদের সহিত সম্রাট নন্দিনীর বিবাহ হইল। বিবাহান্তে হাজাব্রা ৩ শত ভৃত্য লইয়া ফরিদের কুটীরে আগমন করিলেন। ফরিদ দুইজন পরিচারক ও দুইজন পরিচারিকা ব্যতীত আর সকলকে সম্রাট সদনে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। সম্রাট কন্য বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শয্যায় রাত্রি যাপন করিতেন; ফরিদ রাত্রির অধি-কাংশ সময় ভগবানের আরাধনায় যাপন করিয়া শেষ রাত্রিতে পত্নীর পালঙ্কের তলে মাদুরের উপ নিদ্রা যাইতেন; স্বামীর অবহেলা দর্শন করিয়া স্ত্রী চিত্ত অপ্রসন্ন হইল। দাসী আসিয়া একদিন ফরিদকে বলিল, "স্ত্রীকে অবহেলা করা কি ধার্ম্মিকের লক্ষণ?" ফরিদ বলিলেন "রত্ন মণিভূষিতা স্ত্রী কি ফকিরে ঘরে শোভা পায়? তিনি বস্ত্রালঙ্কার বিক্রয় করি তাহা ঈশ্বর সেবায় ব্যয় করুন, দরবেশের বে পরিধান করুন, আমার সহধর্ম্মিণীর তাহাই শো পাইবে।" স্বামীর চিত্তরঞ্জনের জন্য সম্রাট কন্য আপনার মণি মুক্তাখচিত বসন বিক্রয় করিলেন এবং তাহার অর্থ দরিদ্রের দুঃখ নিবারণের জন্য অর্প করিলেন। ফরিদ ধূসর বর্ণ মোটা বস্ত্র দ্বারা স্ত্রী অঙ্গাবরা ও কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে পাজামা প্রস্তুত করি দিলেন। হাজাব্রা হীরার বালা বিক্রয় করি কাচের বালা পরিলেন; নাসিকা হইতে মুক্তার ভূ ফেলিয়া দিয়া কাঁসার অলঙ্কার পরিধান করিলেন একদিন এই বেশে তিনি পিতৃসদনে গমন করি ছিলেন। কন্যার সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পিতা চক্ষে জল আসিল। তিনি কন্যাকে পুনরায় হী মণি মুক্তায় সজ্জিত করিয়া স্বামীর কুটীরে পাঠাই দিলেন। বিলাস দেখিলে ফরিদের প্রাণে বড় ক্লে হইত, তাই হাজাব্রা সমস্ত ধনরত্ন বিক্রয় করিয়া তা সৎকার্য্যে ব্যয় করিলেন। যতবার তিনি স্বামী

প্রীতির জন্য অলঙ্কার বিক্রয় করিতেন, ততবারই সম্রাট তাঁহাকে নূতন বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিতেন। ইহা লইয়া স্বামী স্ত্রীতে মনোবাদের সূত্রপাত হইল। অবশেষে তাঁহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া পাকপত্তনে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। এই বিবাহের ফলে ফরিদের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিয়াছিল।

একবার ফরিদ পীড়িত হইয়াছিলেন। নিজাম-উদ্দীন আউলিয়া কতিপয় দরবেশসহ তাঁহার রোগ শান্তির জন্য কোন সমাধিক্ষেত্রে প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সে প্রার্থনায় ব্যাধির উপশম হইল না। নিজামউদ্দীন আসিয়া ফরিদকে কহিলেন, "শুনিয়াছি প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হয় না, আমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল কেন?" ফরিদ কহিলেন "মুখের প্রার্থনা ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিতে পারে না।"

সেখ বদরুদ্দীন গজনীর কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তিনি ফরিদের গুরু কুতুবউদ্দীনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দিল্লী নগরে বাস করিতেছিলেন। নিজামউদ্দীন নামক একজন ধনী, তাঁহার বাসের জন্য এক দরগা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন; প্রতিদিন নানা প্রকার আহার সামগ্রী নিজামউদ্দীনের গৃহ হইতে দরগায় প্রেরিত হইত। বদরুদ্দীন তাহা ষ্পর্শ না করিয়া অতিথি ও দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। নিজে পরিশ্রম করিয়া যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা কোন রূপে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ও বৈরাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া একদা ফরিদ তাঁহাকে দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহার হে কোন খাদ্য সামগ্রী ছিল না, আহার দ্রব্য ক্রয় রিতে পারেন, এমন কপর্দ্দকও ছিল না। তিনি রাতন কম্বল খানি বিক্রয় করিয়া, বাজার হইতে রিদের জন্য আহার্য্য পদার্থ লইয়া আসিয়াছিলেন। হার দরগায় আসিয়া প্রতিদিন শত লোক ভোজন রিত, তাঁহার নিজের ভোজনের জন্য একটী ক্ষুদও ক্ষত হইত না। কোন কারণে সম্রাট অসন্তুষ্ট হইয়া জামউদ্দীনকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। সেখ রুদ্দীন ফরিদকে তাঁহার কারামুক্তির জন্য ঈশ্বরের কট প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন। ফরিদ তদু-ত্তরে বলিয়াছিলেন "নিজামউদ্দীন নাম কিনিবার জন্য দরগা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন ও নিরাশ্রয়ের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিলে কোন ফল হইবে না।"

ফরিদ রাত্রির অধিকাংশ সময় ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। একদিন ধ্যানাবসানে বলিতে-ছিলেন, "যে চক্ষু ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করে না, সে চক্ষু অন্ধ হওয়াই ভাল। যে রসনা তাঁহার নাম কীর্ত্তন করে না, তাহা মূক হওয়াই ভাল। যে কর্ণ তাঁহার গুণ শ্রবণ করে না, তাহা বধির হওয়াই ভাল। যে দেহ তাঁহার সেবা করে না, তাহার মৃত্যু হওয়াই ভাল।"

একবার পাকপত্তনে সাত শত সাধু সমবেত হইয়াছিলেন। একজন জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী কে? ফরিদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, যিনি পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। কে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান?—যে কিছুতেই বিচলিত হয় না। কে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী স্বাধীন—যাহার চিত্ত সন্তুষ্ট। কে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দরিদ্র। যাহার সন্তোষ নাই। ইহার পর ফরিদ সাধুমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবের বিরুদ্ধে সহজে হস্তোত্তলন করেন না। পার্থিব সম্পদ পাইয়া অতি হৃষ্ট হইও না; যদি কোন সম্পদের অধিকারী না হও, তবু অবসন্ন হইও না। মহম্মদের পরলোক গমনের দিন যেমন পৃথিবীতে আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠে, যে দিন আমাদের বাসনা পূর্ণ না হয়, সেদিনও যেন সেইরূপ আনন্দোৎ-সব হয়। পৃথিবীর নিরাশ বাক্যে তোমার উৎসাহ যেন খর্ব্ব না হয়। ফকিরের সুন্দর বেশভূষা, তাহার মৃত দেহের আবরণ। পৃথিবীর অনেক পদার্থ প্রাণকে মুগ্ধ করে, কিন্তু আরাধনা যেমন প্রাণকে মুগ্ধ করে, এমন আর কিছুই নয়। যে নিজের দোষ দর্শন করে, তাহার কল্যাণ হয়, কিন্তু যে অন্যের দোষ আলোচনা করে, তাহার মঙ্গল হয় না। যে নিজে পবিত্র তাহার নিকট সকলই পবিত্র; কোন পদার্থই তাহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না। যদি

তোমরা প্রাচীন সাধুদিগের মত হইতে চাও, তবে সম্রাটদের নিকট মস্তক অবনত করিও না। বিদ্বজ্জনই মানুষের মধ্যে পূজনীয় ব্যক্তি; সাধুলোকই পূজনীয় ব্যক্তিদের মধ্যে পূজনীয়। তারাগণের মধ্যে যেমন পূর্ণচন্দ্র, বিদ্বজ্জনের মধ্যে তেমনই সাধু। যে কেবল আহার ও পরিচ্ছদ লইয়া ব্যস্ত, মানুষের মধ্যে সেই অতি অধম।

ফরিদ বলিয়াছেন "দুর্ভাবনায় আমার চিত্ত যখন অস্থির হয়, তখন আমি আমার পরম সুন্দর প্রিয়তমের চিন্তায় প্রবৃত্ত হই। তখন আমার হৃদয় বলে আমার প্রিয়তমের জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি। তখনই আমার হৃদয় বিগলিত হয়, আমার অশ্রুধারা বহিতে আরম্ভ করে, আমার প্রিয়তম প্রকাশিত হইয়া আমার হস্তধারণ করেন।"

নিজামউদ্দীন আউলিয়া বলিয়াছেন, একদিন তিনি ফরিদের দর্শনের জন্য তাঁহার কুটীর দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন, ফরিদ উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, আর গাহিতেছেন, "হে প্রিয়! আমি সর্ব্বদা তোমার প্রেমে বাঁচিয়া থাকিতে চাই। যদি তোমার চরণতলের ধূলি হইতে পারি, তবেই আমি বাঁচিব। আমি তোমার দাস, ইহলোক ও পরলোকে তোমা ভিন্ন আমার আর কোন বাঞ্ছিত বিষয় নাই। তোমার জন্য আমি বাঁচিব, তোমার জন্য আমি মরিব।"

ফরিদ সর্ব্বদাই বলিতেন "প্রত্যেক লোকই যে ঈশ্বর প্রেমের রহস্য উপলব্ধি করিতে পারে তাহা নহে; সকল সমুদ্রে মুক্তা নাই, সকল আকরে স্বর্ণ নাই।"

বৃদ্ধকালে ফরিদ বলিতেন, "ঈশ্বরের অন্বেষণে আমার জীবনের প্রথম ৪০ বৎসরকাল কাটিয়া গিয়াছে। তারপর ৪০ বৎসরকাল ঈশ্বরের আদেশ পালনে অতিবাহিত হইয়াছে। শেষ ৪০ বৎসর ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাকে বলিতেন, তুমি আমার আদেশ পালন করিয়াছ। এখন আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।" ফরিদ বলিতেন, অপরের দোষ দর্শনে যাহার চক্ষু অন্ধ, অপরের নিন্দা শ্রবণে যাহার কর্ণ বধির, মন্দ কথা বলিতে যাহার রসনা মূক, মন্দ স্থানে যাইতে যাহার পদদ্বয় পঙ্গু, সেই যথার্থ ফকির।

এক দিন ফরিদের গৃহে কয়েক জন সাধু আসিয়া সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছিলেন। একজন এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন "পাপের মূল কোথায়?" ফরিদ বলিয়াছিলেন বিষয় তৃষ্ণাই পাপের মূল। সেখ আবদুল্ল বলিয়াছিলেন মানুষ ঈশ্বরের অংশ মাত্র। বিষ তৃষ্ণার অধীন হওয়াতেই মানুষ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছি হইয়াছে। ফরিদ কহিলেন ঠিক কথা। হৃদ দর্পণের ন্যায়, বিষয় তৃষ্ণা সে দর্পণকে মলিন করে ঈশ্বরপ্রেমে বিষয় তৃষ্ণাকে দূর করিতে হয়। (ভূমিতে কণ্টক বৃক্ষ জন্মে, তাহাতে শস্য হয় না অতএব কণ্টক সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে।

১২৬৬ খৃষ্টাব্দের মহরম মাসের পঞ্চম দিনে ফা ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন। "ইয়া হা ইয়া কায়েম," হে অবিনাশী, হে নিত্য এই ক বলিতে বলিতে তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা দেহ হই বহির্গত হয়।

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটী প্রাচীন কথা।

চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ মস্‌জিদ ও দরগা।

১। সুলতান বাজীৎ বোস্তানী—এরূপ কিম্বদন্তী আছে, একদা বোঁস্তানের সুলতান বাহাদুর তদীয় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় একজন পরিচারিকাকে শয়ন করিতে দেখিয়া উক্ত পরিচারিকার পৃষ্ঠদেশে চাবুক দ্বারা সজোরে তিনটি আঘাত করেন। পরিচারিকাকে খিল খিল করিয়া হাসিতে দেখিয়া সুলতান বাহাদুর জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার হাসিবার কারণ কি?" তদুত্তরে সে বলিল, "হুজুর, আপনার অভয় পাইলে আমি প্রকৃত কথা আপনার নিকট বিবৃত করিতে পারি।" সুলতান বাহাদুরের সম্মতি পাইয়া পরিচারিকা বলিল, "এক মুহূর্ত্তকাল এই শয্যায় শয়ন করিয়া আমার পৃষ্ঠে তিনটি চাবুকের আঘাত পড়িল, না জানি এই বিছানায় দীর্ঘকাল শয়নের ফলে আপনার জন্য কি পরিমাণ চাবুকের ব্যবস্থা হইবে।" সামান্যা দাসীর কথায় সুলতানের মহা চিন্তার উদয় হইল। ভাবিতে ভাবিতে তিনি আত্মহারা হইলেন। ক্রমেই তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে লাগিল। তিনি ঈশ্বরোপাসনায় বহির্গত হইলেন। ফকির বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী নাছিরাবাদ পাহাড়ে সাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কথিত আছে, এই পাহাড়ে অনেক ভূত পরী ইত্যাদি অপদেবতা তাঁহার যোগের বিঘ্ন জন্মাইতে চেষ্টা করায় তিনি ঐ সমস্ত অপদেবতাকে যোগবলে বৃহদাকার কচ্ছপে পরিণত করিয়া পাহাড়ের সমীপবর্ত্তী পুষ্করিণীতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সুলতান বাজীৎ বোস্তানীর পুকুরে অসংখ্য কচ্ছপ বিচরণ করিতে এখনও দেখা যায়। যাত্রিগণ খৈ, মুড়ি, কলা ইত্যাদি পুকুরে ছড়াইয়া দেয় এবং ঐ সকল কচ্ছপ আনন্দে ভক্ষণ করিতে থাকে। এই সমস্ত কচ্ছপকে কেহ হিংসা করে না বা হিংসা করিতে সাহস পায় না, তজ্জন্য কচ্ছপগুলিও নির্ভয়ে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর হস্ত হইতে আনন্দে ভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। সুলতান বাজীৎ বোস্তানীর পাকা মস্‌জিদ ও পুকুরের পাকা ঘাট চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার করম আলী মিঞার পূর্ব্বপুরুষের নির্ম্মিত। উক্ত জমিদার সাহেবের পিতা ফতে আলী নাজিরের প্রাচীন ওক্কনামা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই ওক্কনামা ১২২০ মগীতে সম্পাদিত হয়। তাহাতে তিন লিখিয়াছেন, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষের নির্ম্মিত সুলতান বাজীৎ বোস্তানীর মস্‌জিদ ও পাকাঘাট ইত্যাদি সংরক্ষণ জন্য আমার নিম্নলিখিত কতেক সম্পত্তি উৎসর্গীকৃত হইল।" এই সুলতান বাজীৎ বোস্তানীতে হিন্দু মুসলমান সর্ব্বদা মানত করিয়া সিন্নি প্রদান করিয়া থাকে। স্থানীয় মুসলমানগণ ব্যতীত দূরদেশ হইতেও অনেক মুসলমান এই পবিত্র স্থান দর্শন করিবার জন্য প্রতিদিন সমবেত হইতে দেখা যায়। এই সুলতান বাজীৎ বোস্তানীর মস্‌জিদের এক খণ্ড প্রতিকৃতি সাদরে পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া গেল।

২। ফকিরের চসমা।—সুলতান বাজীৎ বোস্তানীতে যাইবার পথে এই চসমা পাওয়া যায়। এখানে সর্ব্বদা মুসলমানগণ সিন্নি দিয়া থাকেন। এই স্থান সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তী আছে, কোন প্রসিদ্ধ ফকির কঠোর যোগ সাধনা করিয়া এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন। উক্ত ফকির তাঁহার পা দুখানি আকাশের দিকে রাখিয়া মস্তক ভূমির উপর ন্যস্ত করেন এবং যোগ করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে ভক্তির অশ্রু নির্গত হইতে থাকে। তাঁহার এই দুই চক্ষুতে দুইটী কুণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই দুই কুণ্ড দিয়া অবিরাম ধারে জল বাহির হইতেছে। ইহা দেখিতে ঠিক যেন দুইটী চক্ষু সুতরাং চস্‌মার ন্যায় দেখাইতেছে।

৩।৪। জামে মস্‌জিদ ও অলিখাঁ মস্‌জিদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

৫। কদম মোবারেক, কদম পদচিহ্ন, মোবারেক শুভ। কদম মোবারেক অর্থে শুভ পদচিহ্নকে বুঝাইতেছে। এই মস্‌জিদের এক পার্শ্বে এখনও পদচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই শুভ পদচিহ্ন হজরত মহম্মদেরই পাদুকা পরিহিত পদচিহ্ন বলিয়া মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন এবং এই পদচিহ্ন মক্কা হইতে আনীত হইয়াছে বলিয়া অনেকেরই ধারণা। এই পদচিহ্নে মুসলমানগণ জল সেচন করিয়া থাকেন এবং

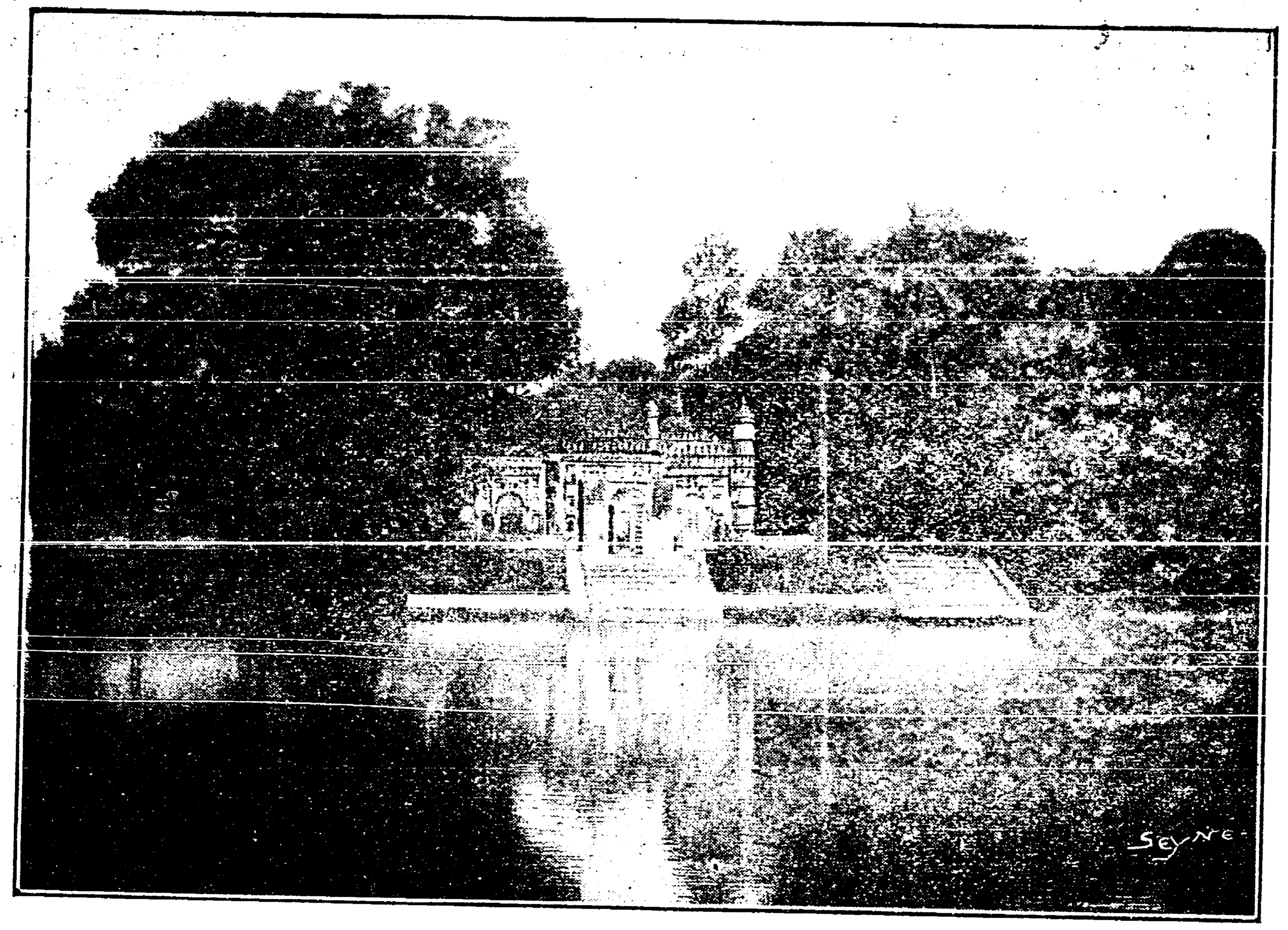

সুলতান বাজিৎ বোস্তানি।

সেই পবিত্র পদচিহ্নের জল ধার্ম্মিক মুসলমানগণ অত্যন্ত ভক্তি সহকারে চক্ষে প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। উক্ত মস্‌জিদের এক খণ্ড প্রতিকৃতি সাদরে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

৬। পীর বদর সাহেবের দরগা—কথিত আছে, পীর বদর সাহেব প্রকাণ্ড এক খণ্ড প্রস্তরের উপর যোগাসনে বসিয়া কর্ণফুলী নদীতে ভাসিতে ভাসিতে আন্তিমামুদের ঘাটে উপনীত হন। তথায় প্রস্তর খণ্ড রাখিয়া তিনি সহরে প্রবেশ পূর্ব্বক বক্‌সিহাটের বর্ত্তমান দরগা স্থানে যোগাসনে অনেক দিবস অতিবাহিত করেন। উক্ত প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড বহু বর্ষ ব্যাপিয়া আন্তিমামুদের ঘাটে পড়িয়া থাকে। ঐ প্রস্তর খণ্ডের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম পাথরঘাটা হয়। কালক্রমে সহরের দিকে নদী ভরাট হওয়ায় উক্ত প্রস্তর খণ্ড ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পীর বদর সাহেবের দরগাতে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই প্রথম সহরে প্রবেশ করিয়া মিঠাই সিন্নি প্রদান করিয়া থাকে। সকলেই নিজ নিজ মঙ্গলোদ্দেশ্যে বদর সাহেবের প্রীতির জন্য সন্ধ্যার সময় মোমের বাতি জ্বালাইয়া থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শত শত মোমবাতি এই দরগায় জ্বলিতে দেখা যায়। চট্টগ্রাম সহরকে পীর বদর সাহেবের স্থান বলা হয়। নৌকার মাঝিগণ বিপদের সময় উচ্চৈঃস্বরে 'পীর বদর' 'পীর বদর' ডাকিয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান বালকগণ গ্রামে 'পরখেলা' কিম্বা 'হাডুডুডু' খেলার সময় আনন্দে সমস্বরে পীর বদর পীর বদর রবে ক্রীড়াস্থান মুখরিত করিয়া তোলে। (পরখেলা এদেশের একটী সুন্দর খেলা, ইহাতে সর্ব্বশরীরের চালনা অতি পরিপাটীরূপে হইয়া থাকে। ক্রীড়া প্রণালীও অতীব সুন্দর।)

৭। সাহেনসা ফকিরের দরগা। এখানেও একটা সুবৃহৎ মসজিদ আছে। এখানেও হিন্দু মুসলমানগণ মানত করিয়া মিঠাই সিন্নি প্রদান ও মোমবাতি জ্বালাইয়া থাকে। এইরূপ সিন্নি প্রদানও বাতি জ্বালাইবার সুবিধার জন্য এই দরগার নিকটে বহুসংখ্যক মিঠাই ও মোমবাতির দোকান আছে।

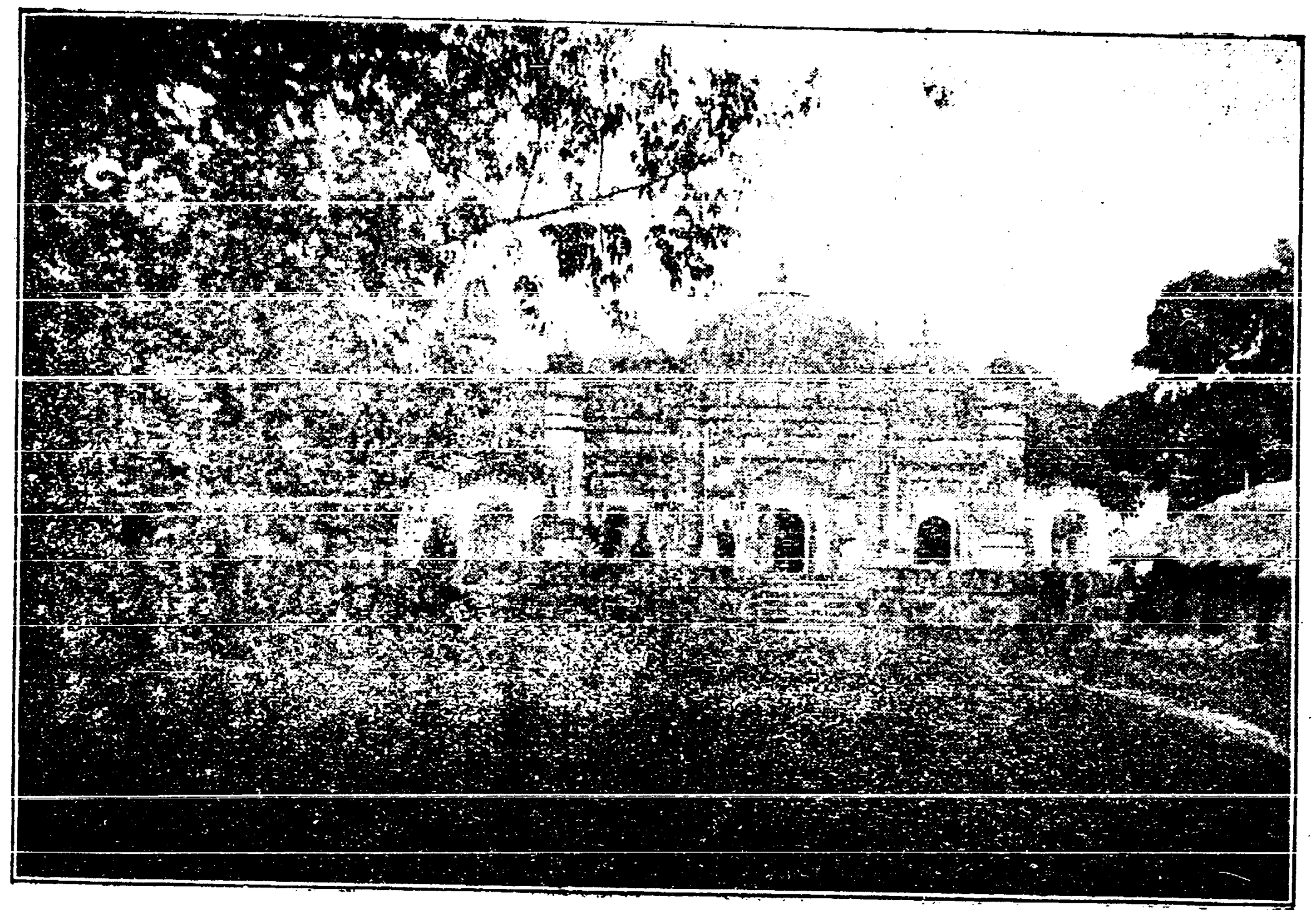

কদম মোবারেক মস্‌জিদ।

চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামেও অনেক মসজিদ ও রগা আছে। তন্মধ্যে নয়াপাড়ার সন্নিকটে ভাঙ্গা ড়দীঘির নিকটে বড় পীর সাহেবের দরগা সমধিক প্রসিদ্ধ।

চট্টগ্রামে হিন্দু মুসলমানের প্রীতিভাব।

বহুবর্ষ ব্যাপিয়া এই দুই মহাজাতি চট্টগ্রামে দুই হোদরের মত পাশাপাশি বসবাস করিয়া আসিতেন। হিন্দুগণ মুসলমানের বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষে তিভোজ গ্রহণ করিতেন এবং মুসলমানগণও ন্দুদের বাড়ীর উৎসবাদিতে আনন্দে যোগদান রিয়া প্রীতিভোজ গ্রহণ করিতেন। উভয়েই য়ের বাড়ীতে পৃথকভাবে নিজ নিজ ধর্ম্ম ও আচার ষ্ঠা বজায় রাখিয়া আহারাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। হিন্দু জমিদারের বাড়ীতে মুসলমান অমাত্য ও মুসলমান জমিদারে বাড়ীতে হিন্দু অমাত্য নিযুক্ত হইত। এখনও চট্টগ্রামে উক্তরূপ প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা এবং উক্তরূপ অমাত্য নিয়োগের প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহ সভাদিতে নাচগানের সময় হিন্দু ও মুসলমানগণের পৃথক পৃথক ভাবে বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ থাকিত, এই উভয় জাতির প্রত্যেকে প্রত্যেককে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন এবং যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন ও আদর অভ্যর্থনা করিতেন। চট্টগ্রামে হিন্দুমুসলমানের যথেষ্ট প্রীতি এবং সদ্ভাব এখনও বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমাদের বংশে ৺দুর্গাদাস খাঁ নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, এইরূপ অন্যান্য হিন্দু বংশেও খাঁ উপাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। খুব সম্ভবতঃ মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে প্রধান অমাত্যকে খাঁ উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হইত। এই মুসলমান প্রভাব চিহ্নিত উপাধি হিন্দুগণ গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতেন। পক্ষান্তরে বিশিষ্ট মুসলমানগণ হিন্দুরাজের অধীনে পণ্ডিত ও ঠাকুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হইতেন। আরাকান রাজের প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের নাম বোধ

হয় অনেকেই অবগত আছেন। কবি আলওয়ান ইঁহারই আদেশে বিখ্যাত পদ্মাবতী কাব্যের অনুবাদ করেন। মাগন ঠাকুর জাতিতে মুসলমান ছিলেন।

চট্টগ্রামের হিন্দু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান।

চাঁদ সদাগরের দীঘি। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের লোকেরা চাঁদসদাগরকে নিজস্ব মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু চট্টগ্রামে বহু প্রাচীনকাল হইতে চাঁদ সদাগরের দীঘি বর্ত্তমান রহিয়াছে। চাঁদ সদাগরের বালুকাময় ভিটা, ডিঙ্গাভাঙ্গা, নেতার ঘাট ইত্যাদি চট্টগ্রামে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এদেশে মনসার পুঁথি বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। শ্রাবণ মাসে প্রতি গৃহে মনসাদেবীর পূজা হইয়া থাকে এবং মনসা পুঁথি সুর ধরিয়া প্রতি গৃহে পাঠ করা হয়। চাঁদ সদাগরের দীঘির একখণ্ড প্রতিকৃতি পাঠকবর্গকে সাদরে প্রীতি-উপহার দেওয়া গেল।

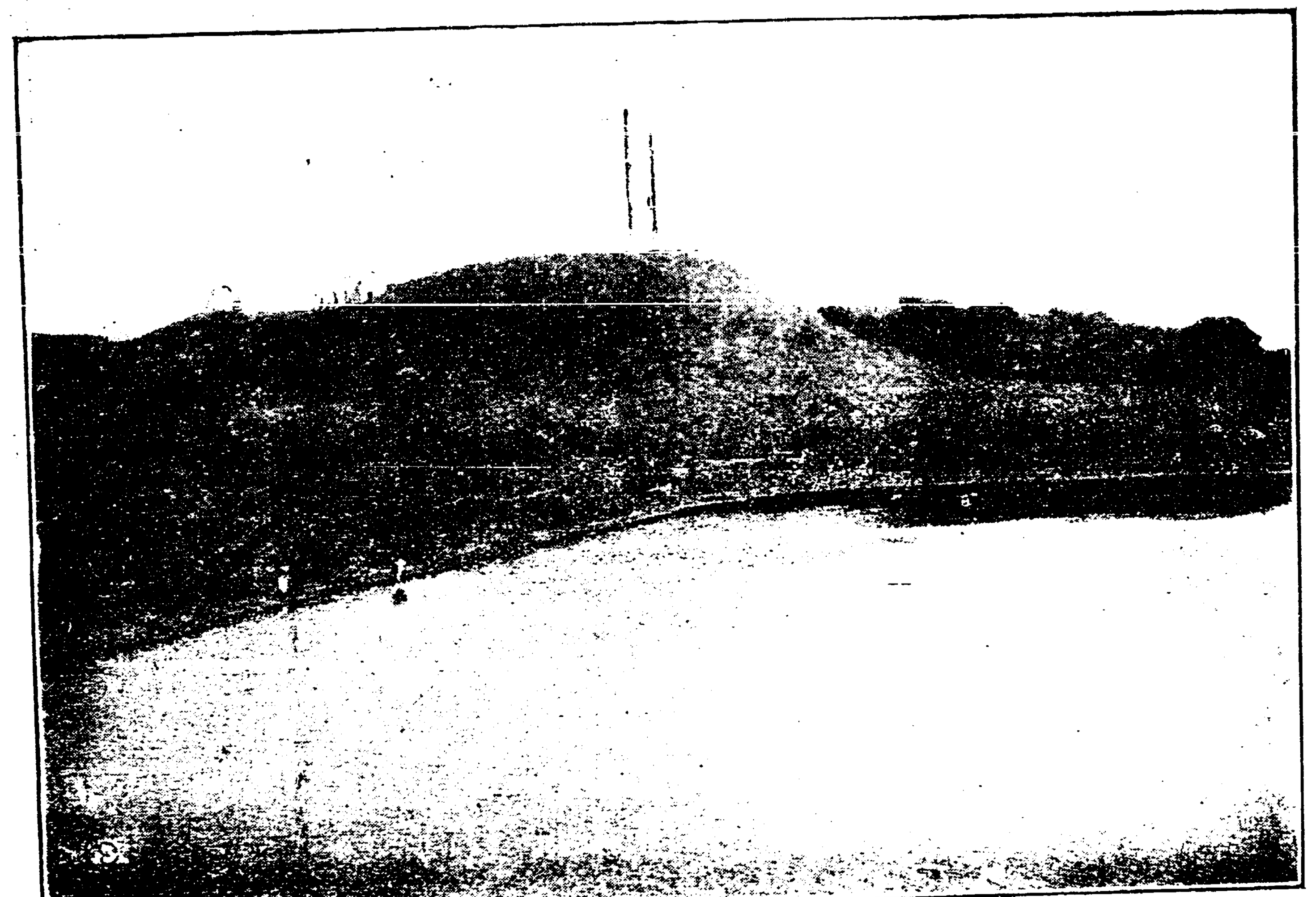

চাঁদ সদাগরের দীঘি।

রাম সীতা যে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। রাঙ্গামাটীতে সীতা পাহাড় নামে একটী সুন্দর পাহাড় আছে। রামকোটে রামসীতা ও লক্ষ্মণের প্রতিমূর্ত্তি আছে। চট্টগ্রামের অনেক স্থানের নাম রামের নামেই হই-য়াছে। যথা রামু, রামকোট, রামগড়, রামনগ[র] রামসাগর ইত্যাদি। চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ তী[র্থ] সীতাকুণ্ডের স্থানে স্থানে রাম সীতার এদেশে আগ[মন] ও অবস্থানের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

চট্টগ্রামে বিভিন্ন জাতির প্রসিদ্ধ মেলা

সীতাকুণ্ডে শিবরাত্রি উপলক্ষে খুব বড় মে[লা] হয়। এই সময়ে প্রায় ২৫।৩০ হাজার যাত্রীর স[মা]গম হইয়া থাকে। সীতাকুণ্ডের প্রাকৃতিক [দৃশ্য] অতীব মনোরম। প্রকৃতি দেবী এই সৃষ্টির য[াহা] কিছু সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ তাহা দিয়াই যেন ইহা র[চনা] করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক মনোরম স্থান এই পৃথিবীতে নিশ্চয়ই নাই। ই[হা] দেবতাগণের উপযুক্ত আবাস ভূমি। যিনি এক[বার] মাত্রও এস্থানে আসিয়াছেন তিনি কখনও ই[হা] উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শ্রেণী (চন্দ্রনাথ, বিরূপাহার), মনো[রম] জলপ্রপাত (সহস্রধারা), আগ্নেয় প্রস্রবণ (বাড়[বা]নল—জল ও অগ্নির একত্রে ক্রীড়া), স্বচ্ছ নির্ঝ[রিণী] (মন্দাকিনী), নৈশালোক মণ্ডিত নিবিড় অর[ণ্য] (জ্যোতির্ম্ময়), অগণন সুগন্ধ পুষ্প, সদ্‌গন্ধযুক্ত মন্দ সমীরণ এবং বিহঙ্গমের মধুর কুজন ভু[লিতে] পারিবেন না।

চন্দ্রশেখর চট্টগ্রামের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত, উচ্চতা ১১৫৫ ফিট। চন্দ্রশেখর পর্ব্বতকে সপ্তকুল পর্ব্বত অর্থাৎ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে, যথা—নির্ব্বাণতন্ত্রে।

"নীলাচলং মন্দরঞ্চ পর্ব্বতং চন্দ্রশেখরম্।
হিমালয়ং সুবেলঞ্চ মলয়ং ভস্ম পর্ব্বতম্।
চতুষ্কোণে বসেদ্দেবী এতৎ সপ্তকুলাচলম্॥"

ত্রিপুরা রাজগণের বিশেষ সাহায্যে সীতাকুণ্ডের অধিকাংশ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহাদেরই সাহায্যে চন্দ্রনাথের ৫৭৫ ধাপ সিঁড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। তীর্থযাত্রীগণ এই সিঁড়ির সাহায্যেই দুরারোহ চন্দ্র-শেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। পর্ব্বত শিখরে চন্দ্রনাথের মন্দির ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল ঝটিকায় এই মন্দির ভগ্ন হয়। স্থানীয় জমিদার ও সদাগর স্বর্গীয় রামসুন্দর সেন মহাশয় (১) ইহার পুনরায় সংস্কার করেন।

সীতাকুণ্ড নামে কোন কুণ্ড সম্প্রতি এই তীর্থ স্থানে দৃষ্ট হয় না। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে এখান-কার সীতাকুণ্ড নামে কোন একটী কুণ্ড লইয়া শৈবও বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিবাদ হয়। এই বিবাদ মীমাংসার ভার তদানীন্তন কালেক্টরীর দেওয়ান আমাদের বংশের কুলপ্রদীপ স্বর্গীয় ৺কালীচরণ রায় জমীদার মহোদয়ের (২) উপর অর্পিত হয়। এই বিবাদ মীমাংসার পর কুণ্ডটী যে কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

সীতাকুণ্ড নামে অনেক তীর্থ ভারতবর্ষ ও তৎ-সমীপবর্ত্তী দেশে দৃষ্ট হয়। যথা—মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড, খিলাতের সীতাকুণ্ড, লঙ্কার সীতাকুণ্ড, ত্রিহুতের সীতাকুণ্ড। এ স্থান সীতাকুণ্ড নামে অভিহিত হইলেও এইখানকার চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের চন্দ্রনাথ তীর্থ ই সমধিক প্রসিদ্ধ। সীতাকুণ্ডের পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে নানাবিধ তীর্থ আছে, তাহাদের বিশেষ বিবরণ চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্যে কিম্বা চন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ পাঠে জ্ঞাতব্য।

মেধসাশ্রম।

মেধসাশ্রম—কয়েক বৎসর অতীত হইল, শ্রীমৎ

(১) ইঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন (মিঃ পি, সি, সেন বার-এট্-ল) মহাশয় বঙ্গদেশে ও ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত।
(২) ইঁহারই প্রপৌত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় চট্টগ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জমিদার।

বেদানন্দ স্বামী চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত করলডেঙ্গা পাহাড়ে মেধসাশ্রম আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আশ্রমটি অতীব মনোরম। বিল্ব ধাত্রী বৃক্ষে সুশোভিত পর্ব্বতোপরি দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতটীর চতুর্দ্দিকে দশমহাবিদ্যার দশটী পাহাড় বর্ত্তমান আছে। পাহাড়ের নিম্নদেশে মার্কণ্ডেয় কুণ্ড, মার্কণ্ডেয় মুনির পদচিহ্ন, সুরথ কুণ্ড, বৈশ্যকুণ্ড, নাভিকুণ্ড ইত্যাদি সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৌষ মাসের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে এই আশ্রমে প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে। এই

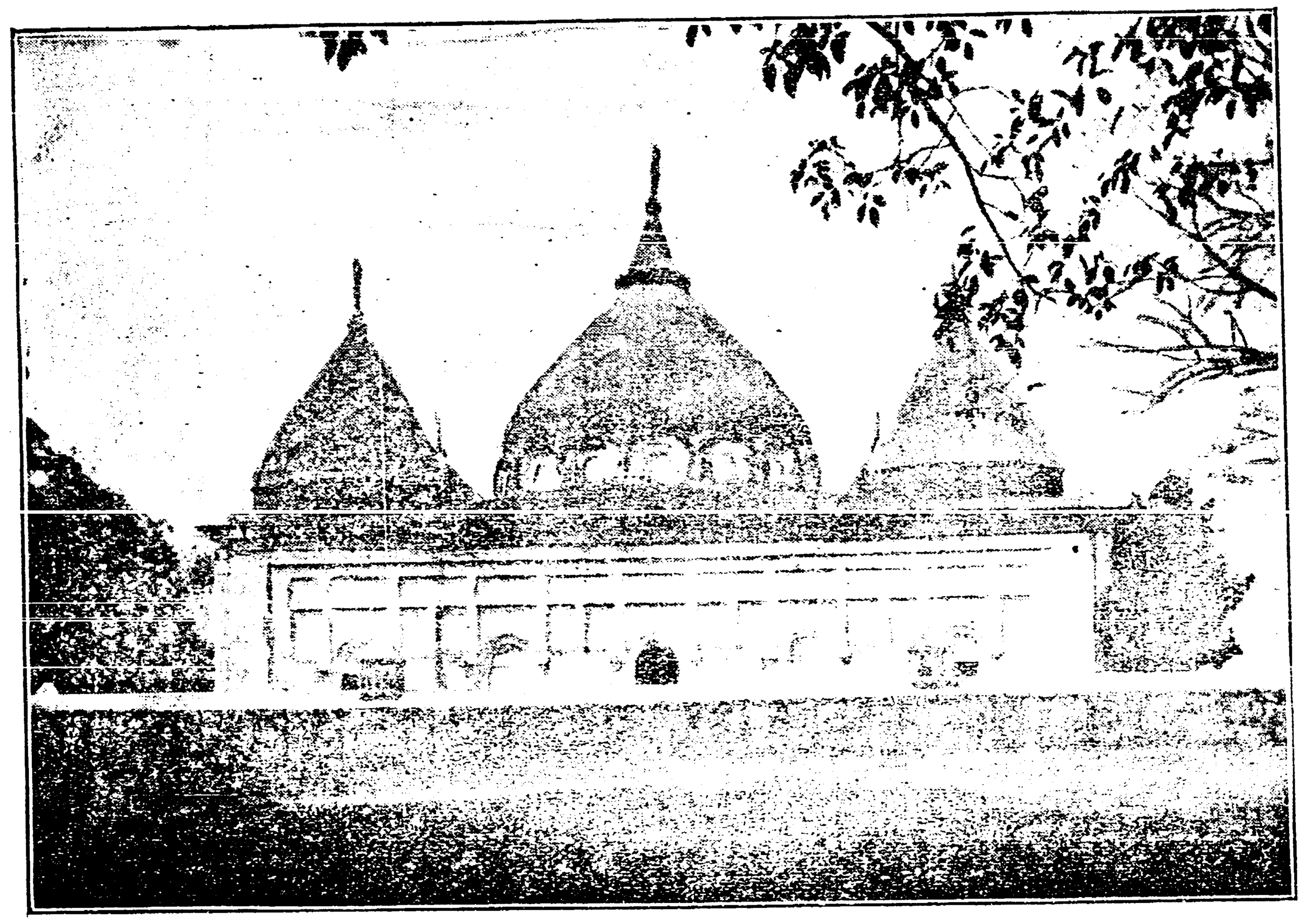

মহামুনি বিহার।

আশ্রমটীর একটী প্রতিকৃতি পাঠকবর্গকে সাদরে প্রীতি উপহার প্রদত্ত হইল।

হিন্দুতীর্থ।

সীতাকুণ্ড ও মেধসাশ্রম ব্যতীত আদিনাথ ও কাঞ্চননাথ, রামকোটে (রাম সীতার মূর্ত্তি), চট্টলে (চট্টেশ্বরী), হাওলায় (কালাচাঁদ ঠাকুর) এবং ইচ্ছামতী ইত্যাদি পবিত্র তীর্থজ্ঞানে হিন্দুগণ ঐ সকল স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

বারুণী ত্রয়োদশীতে মন্দাকিনী এবং কর্ণফুলী নদীর উভয় তীরের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ সমুদ্রের বেলাভূমিতে মেলা হইয়া থাকে। মহিরায় হিন্দুদের ক্ষেত্রপালের মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূর্য্য ব্রতো-পলক্ষে জ্যৈষ্ঠপুরায় অতি পূর্ব্বে প্রকাণ্ড মেলা বসিত। এইক্ষণে বিভিন্ন স্থানে এই সূর্য্য মেলা বসিয়া থাকে, তজ্জন্য উক্ত মেলার অঙ্গহানি হইয়াছে। অশোক অষ্টমীতে শ্রীমতী খালের পাড়ে বৃহৎ মেলা হয়। এখানকার চড়ক মেলা সমধিক প্রসিদ্ধ। এই চড়ক মেলায় কুস্তী খেলা হয়। কুস্তী খেলাকে এদেশে বলি খেলা বলে।

কারবাল্লা মেলা—এই দেশের মুসলমানগণ ম-য়ম উপলক্ষে সহরের প্রত্যেক সম্পন্ন হিন্দু মুসলমানে বাড়ীতে লাঠি খেলা, তলোয়ার খেলা প্রদর্শন করাই গোয়ারা মঞ্জিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এবং মহরমে নবম রাত্রে সুবিস্তীর্ণ পেরেড ময়দানে সমস্ত গোয়ার মঞ্জিলের মিছিল হয় এবং নানারূপ উৎসব ও আমো করা হয়। এই মিছিলের পরদিন কারবেলা মে হইয়া থাকে।

কাঁটা বারুণীর মেলা—ইষ্টারের ছুটীতে প্র বৎসর দেশীয় খ্রীষ্টানদের ফিরিঙ্গি বাজার গির্জ্জা নিকটে একটী মেলা বসে। হিন্দু মুসলমান এই মেলাকে কাঁটা বারুণী নামে অভিহিত করিয়াছেন। বারুণী ত্রয়োদশীতে যেমন সমুদ্র ও কর্ণফুলী নদীর তটবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে মেলা হয়, ঠিক সেই সময়ের কিছু অগ্র পশ্চাৎ এই মেলা বসে বলিয়া খৃষ্টানদের এই মেলাকেও বারুণী আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে, যীশুখৃষ্ট এই সময় কাঁটা অর্থাৎ ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া বারুণীর পূর্ব্বে 'কাঁটা' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকিবে।

মহামুনি মেলা—বৌদ্ধদের মহামুনি মেলা এই দেশে সমধিক প্রসিদ্ধ। নাগকেশর সুবাসিত পাহাড়তলীতে, চৈত্র সংক্রান্তিতে এক সপ্তাহ কিম্বা তদূর্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত এই মেলা বসিয়া থাকে। এ স্থানে বুদ্ধদেবের ত্রিরত্ন মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ফোড়া, তারা ও শাঙ্খ এই ত্রিমূর্ত্তি ইষ্টক নির্ম্মিত। মান রাজাই এই মূর্ত্তিগুলি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। পার্ব্বতীয় বৌদ্ধগণ মহা সমারোহে এই মেলায় যোগদান করিয়া থাকেন। মহামুনি মন্দিরের এক খণ্ড প্রতিকৃতি পাঠকগণকে সাদরে উপহার দিলাম।

বৌদ্ধ তীর্থ।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মবংশ ভিক্ষু মহোদয় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ তীর্থ স্থানের নাম সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

১। চক্রশালা—পটীয়ার অন্তর্গত হাইদ গাঁ গ্রামে।

২। চূড়া গোঁসাই—ঠেগরপুণি (ঠাকুরপুনি গ্রামে।)

৩। মহামুনি (১)—পাহাড়তলী।

৪। শাক্যমুনি—রাঙ্গুনিয়া (রাজনগর)

৫। চিং ম্রং—পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে।

৬। ফরাচিন—রাউজানের অন্তর্গত বাগোয়ান গ্রামে।

৭। কুশীনগর—সীতাকুণ্ডে।

৮। কশ্যপ গুহা—রামুতে।

৯। রামনগর—রামুতে।

১০। মহামুনি (২)—সাতবাড়িয়ায়।

১১। বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন—উনাইনপুরা গ্রামে।

১২। বোধিবৃক্ষ—আল্লাগ্রামে।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী।

বাবরের জীবনী।

খোরাসানের সীমা পরিত্যাগ করিয়া আফগানিস্থানের সীমান্ত প্রদেশের পর্ব্বতমালার মধ্যে প্রবেশ করিবার দুই একদিন পরে বাবরের পথ প্রদর্শক বরফ স্তূপের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিল। গ্রীষ্মকালে যখন বরফ গলিয়া যায় তখনও এই সকল পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য গিরিপথ দিয়া যাতায়াত করা বিশেষ কষ্টকর সুতরাং শীতকালে যখন বরফের চাপে সমুদয় পথ ঘাট বন্ধ হইয়া যায় তখন এই সকল স্থান দিয়া চলাফেরা করা অধিকতর বিপজ্জনক। বাবর কাবুলের জন্য এতদূর চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে এ সকল বিষয়ে কোনরূপ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীতে বরফাকীর্ণ পথে রওনা হইলেন। মধ্যপথে আসিয়া যখন তাঁহারা পথ হারাইয়া ফেলিলেন, তখন দলস্থ প্রায় সকলেই হতাশ হইয়া পড়িল; বাবরের প্রিয় সুহৃদ এবং সহচর কাশিম বেগ তখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অস্ত্রের দ্বারা দুই হস্তে বরফ কাটিয়া আগে আগে পথ করিয়া দিতে লাগিলেন এবং পশ্চাতে অন্যান্য সকলে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাবর নিজেও অপরাপর অনুচরদিগের সহিত বরফ ঠেলিয়া পথ

করিতে লাগিলেন এবং এইরূপে প্রথম দিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমেও ইঁহারা ২।৩ মাইলের অধিক অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এদিকে দিন রাত অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছিল এবং পরদিন প্রাতে সকলে দেখিলেন যে তাঁহাদিগের চারি পার্শ্বে বুক সমান বরফ পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে মৃত্যু নিশ্চিত। এজন্য হতাশ না হইয়া বাবর পুনরায় সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ একে একে হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। ইহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য কুড়িজন সাহসী অনুচরের সহিত বাবর স্বয়ং আগে আগে বরফ ঠেলিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য সকলে তাঁহাদিগের পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। সম্মুখের দল পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে পশ্চাত হইতে আর একদল অনুচর আসিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। এইরূপে এক সপ্তাহ অবিশ্রান্ত ক্লেশ ভোগ করিবার পর ইঁহারা জিরিন গিরিপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ভাগ্যক্রমে এইখানে আসিয়া যদিও তাঁহারা পথের সন্ধান পাইলেন কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের দুর্গতি শেষ হইল না। জিরিন গিরিপথে উপস্থিত হইবার পর বরফপাতের সহিত প্রবল ঝড় আরম্ভ হইল। দিগন্ত বিস্তৃত তুষার রাশির উপর ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে আরম্ভ হওয়ায় অনেকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং অনেকের হাত এবং পা বরফে পচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। একে বরফ জনিত ঠাণ্ডা তাহাতে আবার কন্‌কনে হাওয়া সুতরাং বাবরের অনুচরগণ আর অগ্রসর হইতে পারিল না, অবসন্ন হইয়া বরফের উপর বসিয়া পড়িল এবং ধীরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপ ভীষণ বিপদের মধ্যেও বাবর আপনার উপস্থিত বুদ্ধি হারান নাই, কয়েকজন দৃঢ়চিত্ত অনুচরকে সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতের চারিদিকে তিনি গুহার অনুসন্ধানে ফিরিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিবার পর সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে জনৈক অনুচর এক গুহার সন্ধান পাইল; যাহারা নিকটে ছিল তাহারা তৎক্ষণাৎ গুহার মধ্যে প্রবেশ

করিয়া আপন আপন প্রাণরক্ষা করিল এবং বাবরকে
আনিবার জন্য একজন সৈনিককে প্রেরণ করিল।
এই ব্যক্তি আসিয়া দেখিল যে বাবর বরফের মধ্যে
আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া বাহিরের প্রবল হাওয়া
হইতে আত্মরক্ষা করিতেছেন। বাবর তাঁহার জীব
নীতে লিখিয়াছেন, এই স্থানে এত অধিক বরফ
পড়িয়াছিল যে যদিও আমি গলা পর্য্যন্ত বরফের মধ্যে
ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম, তথাপি মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে
পারি নাই। বাবরকে এইরূপ দুরবস্থার মধ্যে
দেখিতে পাইয়া অনুচর শীঘ্র তাঁহাকে গুহার মধ্যে
প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। বাবর তাহাকে
ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "আমার পশ্চাতে অনেকে
হতাশ হইয়া বরফের উপর পড়িয়া রহিয়াছে; তুমি
শীঘ্র যাইয়া তাহাদিগকে এই সুসংবাদ দাও এবং
সকলকে গুহার মধ্যে লইয়া যাও।" অনুচর অভি
বাদন করিয়া বলিল "আমি এখনই যাইতেছি কিন্তু
এরূপ অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলে আপনি নিশ্চয়ই
মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, আপনি গুহার মধ্যে যাইয়া
বিশ্রাম করুন আমি অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে লইয়া
আসিতেছি।" বাবর পুনরায় তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া
বলিলেন "আমার একজন অনুচরও বাহিরে থাকিতে
আমি গুহার মধ্যে প্রবেশ করিব না; ইহারা সকলে
আমার জন্য মরিতে বসিয়াছে—সুতরাং ইহাদিগকে
ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইব না।" অতঃপ
সকলে একে একে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলে বাবর
সর্ব্বশেষে আপনার স্থান পরিত্যাগ করিলেন। অনু
চরদিগকে এইরূপ অকৃত্রিম ভাবে ভালবাসিতেন
বলিয়া কোনরূপ ভাগ্য বিপর্য্যয়েই বাবর বন্ধুহারা
হন নাই।

এইরূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেলে পরদিন পুনরায়
তাঁহারা পথের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। ভাগ
ক্রমে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর তাঁহারা এক পরি
চিত স্থানের নিদর্শন দেখিতে পাইলেন এবং সেই সূত্র
অবলম্বন করিয়া আরও কয়েক দিন ক্রমাগত ভ্র
করিবার পর দুরে পর্ব্বতের সানুদেশে মনুষ্যের বস
দেখিতে পাইলেন। বহুদিন যাবত বরফাকীর্ণ প

দিশাহারা হইয়া ভ্রমণ করিবার পর মনুষ্যের আবাস স্থান দেখিতে পাইয়া বাবরের অনুচরগণ দুই হাত তুলিয়া ঈশ্বরের দোহাই দিতে লাগিল এবং বাবর স্বয়ং উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে আসিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও লোকালয় প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। এই দুরন্ত শীতে বরফমণ্ডিত পর্ব্বতমালার মধ্য হইতে এক দল অশ্বারোহী সৈন্যকে নির্গত হইতে দেখিয়া পার্ব্বত্যবাসীগণ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। ইহারা শীতের প্রারম্ভে পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া সমতল প্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছিল, শীতের অবসানে পুনরায় আপনাদিগের পার্ব্বত্য গৃহে প্রস্থান করিবে। অসময়ে এইরূপ এক দল সৈন্যকে পর্ব্বত গাত্র হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া ইহারা বিস্মিত হইল এবং অবশেষে বাবরের ক্ষুধার্ত্ত এবং পরিশ্রান্ত অনুচরদিগের জন্য খাদ্যাদির আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পার্ব্বত্য নিবাসী এই সকল শ্রমসহিষ্ণু জাতি কাবুলের বাদশাহের জন্য আপনাদিগের মেষপাল হইতে বাছিয়া বাছিয়া চর্ব্বিযুক্ত মোটা কয়েকটী মেষ হত্যা করিল এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত রাজ-অতিথির পরিচর্য্যা করিল।

এই স্থান হইতে কাবুল যাইবার রাস্তা বিশেষরূপে জানিয়া লইয়া পুনরায় ইঁহারা আপনাদিগের রাজধানী অভিমুখে রওনা হইলেন। এইরূপে কয়েক দিন যাবত দিবারাত্রি ভ্রমণ করিবার পর বাবর কাবুলের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু এইখানে আসিয়া তিনি অবগত হইলেন যে, কাবুলের সিংহাসন পরহস্তগত হইয়াছে এবং রাজ্যের অনেকেই দ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিয়াছে। বাবর যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এইখানে আসিয়া অবগত হইলেন যে তাহাই হইয়াছে।

বাবর যখন সেবানী খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার জন্য খোরাসান অভিমুখে রওনা হন, তখন রাজকার্য্য চালাইবার জন্য কাবুলে এক কাউন্সিল গঠন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, উরাটীপার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ হুসেন মির্জ্জা ডগলাত্ এবং শাহা বেগমের দৌহিত্র খাঁন মির্জ্জা উভয়েই সেবানী খাঁর অত্যাচারের ভয়ে কাবুলে আসিয়া বাবরের নিকট আশ্রয় লইয়াছিলেন। মির্জ্জা ডগ্‌লাত বাবরের মাতা কতলুক্ নিজার খানুমের কনিষ্ঠা সহোদরাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, ইঁহার মৃত্যুর পর ডগলাত্ পুনরায় দারপরিগ্রহ না করায় এবং বিপত্নীক অবস্থায় কালযাপন করিতে থাকায় মেহের নিজার খানুম এবং পরিবারস্থ অন্যান্য সকলেই ডগলাত্‌কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, বাবরও মাতৃস্বসা জ্ঞানে মির্জ্জাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সুতরাং খোরাসানে যাইবার পূর্ব্বে তিনি কাবুল রক্ষার সমুদয় ভার ডগলাতের প্রতি অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন; প্রথমে মির্জ্জা কিছুতেই এ দায়ীত্ব লইতে স্বীকার করেন নাই, কিন্তু বাবরের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বাধ্য হইয়া অগত্যা তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে স্বীকৃত হইলেন। যাইবার সময় বাবর মির্জ্জাকে বলিয়া গিয়াছিলেন—"আপনি আমার পিতৃস্থানীয়, আপনার উপর নির্ভর করিয়াই আমি আমাদিগের চিরশত্রু সেবানী খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতে অগ্রসর হইতেছি। আপনি এক্ষণে প্রাচীন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং কোনরূপ গুরুতর রাজকার্য্যের ভার দিয়া আপনাকে পীড়া দিতে ইচ্ছা করি না। দৈনিক রাজকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমি যে কাউন্সিল গঠন করিয়া গেলাম তাহাই যথেষ্ট; ইঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন কার্য্য বিশ্বস্তভাবে সম্পন্ন করিবেন, আপনি শুধু ইঁহাদিগের সকলের উপর তত্ত্বাবধান করিবেন এবং পিতা যেমন যত্নের সহিত পুত্রের ধনসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন আপনিও সেইরূপ শত্রুদিগের ষড়যন্ত্র হইতে আমার নবাধিকৃত রাজ্য এবং স্বার্থাদি রক্ষা করিবেন।"

অতঃপর পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করতঃ বাবর খোরাসান অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমে কিছুকাল বেশ শৃঙ্খলার সহিত সমুদয় কার্য্যাদি চলিতে লাগিল এবং রাজ্য

মধ্যে কোনরূপ গোলযোগের চিহ্নমাত্র রহিল না। খোরাসান হইতে নিয়মমত বাবরের সংবাদবাহক দূতগণ কাবুলে যাতায়াত করিতে লাগিল এবং চারিদিকেই শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু শীতের প্রারম্ভে পথঘাট সমুদয় বরফ স্তূপে আবৃত হওয়ায় খোরাসান হইতে কাবুলে সংবাদ প্রেরণ করিবার কোনও উপায় রহিল না। এইরূপ অবস্থায় কিছুকাল অতীত হইলে রাজ্যমধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত আরম্ভ হইল; এবং প্রতিদিন কাবুলের রাজপথে নানারূপ জটলা হইতে লাগিল। কখনও গুজব উঠিতে লাগিল যে বাবর সেবানী খাঁর সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, আবার কখনও বা রাষ্ট্র হইতে লাগিল যে বাবর নিহত হন নাই, যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সেবানী খাঁর নিকট বন্দী হইয়াছেন এবং সেবানী বহুদিনের আক্রোশ চরিতার্থ করিবার জন্য বাবরকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় সুদূর মরুভূমির মধ্যে কোন এক নির্জ্জন কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন। সেখান হইতে কখনও তিনি নিরাপদে কাবুলে আসিতে পারিবেন না। এইরূপ প্রতিদিন নূতন নূতন গুজব উঠিতে থাকায়, জনসাধারণের মন সহজেই চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং এই সুযোগে শাহা বেগম আপনার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে শাহা বেগম বাবরের আপনার মাতামহী নহেন; সুতরাং তিনি যে এই সুযোগে কাবুলের রাজসিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। রাজ্যমধ্যে গোলযোগ যখন পাকিয়া উঠিল তখন তাঁহার দৌহিত্র খাঁন মির্জ্জা যাহাতে সিংহাসন লাভ করিতে পারেন সেজন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে শাহা বেগমই বাবরের সম্বন্ধে এই সকল গুজব কৌশল করিয়া রটাইতেছিলেন এবং মহম্মদ হুসেন মির্জ্জা ডগলাত গোপনে গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। ডগলাতের সাহায্য না পাইলে শাহা বেগম কখনও এইরূপ বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু

তারিখ-ই-রসিদি গ্রন্থের প্রণেতা তাঁহার পুত্র হায়
মির্জ্জা এ সম্বন্ধে অন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। তি
লিখিয়াছেন—বাবরের মৃত্যু সম্বন্ধে কাবুলে য
জনরব উঠিল তখন খাঁন মির্জ্জা যাহাতে সিংহা
প্রাপ্ত হন সে সম্বন্ধে শাহা বেগম বিশেষ চেষ্টা করি
লাগিলেন এবং মির্জ্জা ডগলাতকে তাঁহার পক্ষাবল
করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতে স্বীকৃত
হওয়ায় শাহা বেগম, মেহের নিজার খানুম এ
পরিবারস্থ অন্যান্য রমণীগণ সকলেই ক্রন্দন করি
লাগিলেন এবং কেহ কেহ আহার নিদ্রা পরিত্য
করতঃ হুসেন মির্জ্জাকে নানারূপে বুঝাইতে আ
করিলেন। মির্জ্জা এই সকল পারিবারিক অশা
সহ্য করিতে না পারায় অগত্যা রাজপ্রাসাদ পরিত্য
করিয়া রাজধানীর অনতিদূরে এক নির্জ্জন প্রাস
যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শাহা বে
হুসেন মির্জ্জাকে নীরব দেখিয়া মৌনসম্মতি জ্ঞ
আপনার দলপুষ্টি করিতে লাগিলেন এবং সুযো
বুঝিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। হু
মির্জ্জা এই সকল গোলযোগ আরম্ভ হইবার প
বাবরের কাউন্সিলস্থ সভ্যদিগকে সতর্ক ক
দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে আপন আপন স্বার্থ
করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। সুতরাং
বেগম যখন প্রকাশ্য ভাবে সিংহাসন অধিকার কর
আসিলেন তখন ইঁহারা সকলেই বাধা প্রদান ক
লাগিলেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক খাঁন মি
পক্ষাবলম্বন করায় বাবরের অনুচরগণ সহজেই প
হইলেন এবং বালাহিসার নামক দুর্গে যাইয়া আ
গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বাবরের বিশ্বস্ত অনুচ
কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার না করায় উভয় পক্ষে রী
মত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে কাবুলের প্র
মস্‌জিদে খাঁন মির্জ্জার নামে খত্‌বা পাঠ আরম্ভ
এবং যথারীতি তিনি কাবুলের সিংহাসনে অধি
হইলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন এই
তখন বাবর সবেমাত্র বিপদসঙ্কুল পর্ব্বতমালা হই
সমতল প্রদেশে অবতরণ করিয়াছেন।

রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সমুদয় অবস্থা অবগত

বার পর বাবর উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।
এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে নূতন নহে। বহুবার
তিনি ইহাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্য হইতে পরি-
ত্রাণ পাইয়াছেন; সুতরাং কিছুমাত্রও বিচলিত না
না হইয়া তিনি অবিলম্বে কাবুলে এক বিশ্বস্ত অনুচর
প্রেরণ করিলেন। ইহার প্রতি এই আদেশ প্রদত্ত
হইল যে, সে গোপনে যাইয়া বাবরের পক্ষভুক্ত
অমাত্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তাঁহার
আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া সকলকে উৎসাহিত
করিবে। বাবর নিজে আপনার দলবল সহ হঠাৎ
কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং সেই সময়
সকলে বালাহিসার দুর্গ হইতে বাহির হইয়া শত্রু-
পক্ষীয়দিগকে একযোগে আক্রমণ করিবেন। বাবর
ইহাও বলিয়া দিলেন যে, অতি প্রত্যূষে আমরা কাবু-
লের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইব এবং আমার
আগমনের নিদর্শনস্বরূপ পূর্ব্ব রাত্রিতে পাহাড়ের
উপর আগুণ জ্বালাইব। শীতকাল বলিয়া কেহই
এরূপ আগুণ দেখিয়া সন্দেহ করিবে না। কাবুলের
অদূরে রাত্রিকালে এইরূপ আগুন জ্বলিতে দেখিলে
বুঝিতে হইবে যে আমরা সঙ্কেতানুযায়ী উপযুক্ত স্থানে
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং প্রত্যূষেই রাজধানী
আক্রমণ করিব। দুর্গমধ্যস্থ সৈন্যগণও যেন প্রভাতেই
দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুদিগকে সম্মুখ হইতে
আক্রমণ করে।

এই যুক্তি অনুসারে একদিন প্রত্যূষে খাঁন মির্জ্জা
পশ্চাৎ উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইলেন। বালাহি-
সারের অবরুদ্ধ সৈন্যগণ রাত্রি শেষে দুর্গ দ্বার
পরিত্যাগ করিয়া ভীমবেগে খাঁন মির্জ্জার সৈন্যদিগকে
সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিল এবং বাবর নিজে
পশ্চাৎ দিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন।
সুপ্তোত্থিত খাঁন মির্জ্জা শয্যা পরিত্যাগ করিয়া
শুনিলেন যে তাঁহার সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয় দিক
হইতেই বাবরের নামে জয়ধ্বনি হইতেছে এবং
চারিদিকেই তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে। প্রকৃত
অবস্থা অবগত হইতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না;
মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার

দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, অধিক বিলম্ব করিলে ষড়যন্ত্রের ফল হাতে হাতেই ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং যুদ্ধকোলাহলের মধ্যে ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া অবিলম্বে তিনি কাবুল হইতে পলায়ন করিলেন। খাঁন মির্জ্জার পক্ষভুক্তগণ যখন বুঝিতে পারিল যে যাহার জন্য তাহারা লড়াই করিতেছে সেই খাঁন মির্জ্জাই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন তখন সহজেই তাহারা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল এবং বাবর অনায়াসেই রাজধানী পুনরাধিকার করিলেন। যুদ্ধ স্থগিত হইবার পর বাবর সর্ব্বপ্রথমে খাঁন মির্জ্জা এবং ডগলাতের অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন। একদল দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্য খাঁন মির্জ্জাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রওণা হইল এবং অপর একদল ডগলাতকে ধরিবার জন্য চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এইরূপে চারিদিকের বিলিবন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেলে বাবর এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়িকা শাহা বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। পূর্ব্বেই আপনার আগমন সংবাদ অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি শাহা বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া পরিবারস্থ সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। রাজ-প্রাসাদের এক নির্জ্জন কক্ষে পারস্যদেশীয় গালিচার উপর উপবেশন করিয়া শাহা বেগম আপনার কৃতকার্য্যের ফল গ্রহণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভয়ে তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। চিরজীবন সুখে কালযাপন করিবার পর বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্যসম্পদ সকল হারাইয়া যৎপরোনাস্তি মনঃকষ্টে তিনি কাল কাটাইতেছিলেন। জুনিস্ খাঁর আমলে সকলে তাঁহাকে ষড়যন্ত্রকারিণী রমণী বলিয়া বিশেষ ভয় করিত; তাঁহার মৃত্যুর পর তাসখন্দের সিংহাসনে মহম্মদ খাঁ নাম মাত্র উপবিষ্ট ছিলেন; প্রকৃত পক্ষে সমুদয় রাজকার্য্য শাহা বেগমের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত, কেহই তাঁহার আদেশ অবহেলা করিতে সাহসী হইত না। পরদার অন্তরালে বাস করিলেও শাহা বেগম চিরকাল এইরূপ কর্তৃত্ব করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন; এক্ষণে

সকল সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া এক প্রকার পরাধীন ভাবে বাস করিতে বাধ্য হওয়ায় সহজেই তাঁহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বাবরের অনুপস্থিতি কালে সুচতুরা শাহা বেগম খাঁন মির্জ্জাকে উপলক্ষ করিয়া কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই বুদ্ধিমতী রমণীর অদ্ভুত কৌশলে কাবুলের সিংহাসন বাবরের নিকট হইতে হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল; যদি ভাগ্যক্রমে বাবর এই সময়ে কাবুলে উপস্থিত না হইতেন তাহা হইলে শাহা বেগমের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইত। কিন্তু বিধাতা বাবরের সহায় হওয়ায় শাহা বেগমের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। লজ্জায়, ঘৃণায় মৃতপ্রায় হইয়া তিনি রাজপ্রাসাদের এক নির্জ্জন কক্ষে বাবরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাবর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই শাহা বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। জনৈক পরিচারিকা দূর হইতে তাঁহাকে বেগমের কক্ষ দেখাইয়া দিল। বাবর ত্বরিতগতিতে তাঁহার কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, অন্যান্য রমণীগণ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া ফলাফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নির্জ্জন কক্ষের মধ্যে পারস্য দেশীয় মূল্যবান গালিচার উপর বসিয়া শাহা বেগম বাবরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। লজ্জায়, ঘৃণায় এবং ক্ষোভে তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল এ পলকহীন বিশাল নয়নে শুধু হতাশা বিরাজ করি ছিল। বাবর আপনার চিরপরিচিত প্রথানুসা কক্ষদ্বার হইতেই সম্ভ্রমের সহিত শাহা বেগম অভিবাদন করিলেন, কিন্তু শাহা বেগম কোন প্রত্যভিবাদন করিতে পারিলেন না; শুধু প্র মূর্ত্তির ন্যায় গালিচার উপর বসিয়া রহিলেন। হায় মির্জ্জা তারিখ-ই-রসিদি গ্রন্থে লিখিয়াছেন— বলিয়া বাবরকে অভিবাদন করিবেন এবং কো করিয়াই বা তাঁহার নিকট মুখ দেখাইবেন এ চিন্তায় শাহা বেগম নির্ব্বাক এবং হতবুদ্ধি হ গিয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহাকে এইরূপ নিরু দেখিয়া বাবর হাস্যমুখে কক্ষের অভ্যন্তরে প্র করিলেন এবং শৈশবে যেরূপ আগ্রহের স মাতামহীর ক্রোড়ে উপবেশন করিতেন সেই ব্যগ্রতার সহিত শাহা বেগমের নিকট যাইয়া প্র তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার পরিশ্রান্ত শিশুর ন্যায় শাহা বেগমের ক্রোড়ে ম রক্ষা করিয়া গালিচার উপর শুইয়া পড়িলেন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নানী সাহে আমি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া বড় ক্লান্ত হ পড়িয়াছি; আপনার কোলে শুইয়া কিছুক্ষণ বি করিব।"

শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু

আহ্বান।

মসজিদে ঐ আজান হাঁকে
  সন্ধ্যা হয়ে আসে,
আমীর ফকীর উঠে যায় ডাকে
  প্রভুর পূজার আশে!

দিনের আলোক ছাড়িল ভুবন
  অস্ত শিখর পায়,
সহস্র কিরণ সমাহিত মন
  নিবেদিল আপনায়!

মন্দিরে কাঁসর উঠিল বাজিয়া
  গেল দিন একেবারে
নামাবলি গায়ে দাঁড়াল সাজিয়া
  পূজারি দেবতা দ্বারে!

চন্দন সুবাস বাতাসে মিলায়
  ধরণী তিমির তলে,
দগ্ধ ধূপের ধূম্র ছায়ায়
  আরতি প্রদীপ জ্বলে!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

একটী জলকণার কাহিনী।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন পৃথিবী ঘেরিয়াছে। ছাদের উপর, কতকগুলি ফুলের গাছের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমি তখন চিন্তামগ্ন। ধীরে ধীরে কাল কাল মেঘগুলি যে নক্ষত্রগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল তাহা লক্ষ্য করি নাই।

হঠাৎ এক ফোঁটা জল নাসিকার উপর পতিত হইয়া আমার তন্দ্রার ঘোর ঘুচাইয়া দিল। এমন সময় একটা চামচিকা পাশ দিয়া কিচ কিচ করিয়া ডাকিয়া গেল। ভাবিলাম বুঝি এই চামচিকার দ্বারাই আমার দেহ অপবিত্র হইয়াছে।

ভাবনাটা দৃঢ়ীভূত হইবার পূর্ব্বেই আমার মনে হইল সেই ক্ষুদ্র জলকণার ভিতরের এক অশরীরী আত্মা যেন শরীর পরিগ্রহ করিয়া সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল। মনে হইল, যেন এ পৃথিবীতে সে আর আমি ছাড়া আর কেহ নাই। আমার ভাবনাটা তাহার হৃদয়ে কেমন কয়িয়া প্রবেশ করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "পঙ্কিল পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানব তুমি—তুমি কি না আমাকে অপবিত্র ভাবিতেছ? কতটুকু তোমার জ্ঞান, কতটুকুই বা তোমার অভিজ্ঞতা, কতটুকুই বা তোমার বুদ্ধি—তুমি ইহারই গর্ব্বে আমাকে ঘৃণা করিতেছ?"

তাহার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া আমার রাগ হইল, বলিলাম "তুমিও ত দেখিতেছি একটী ক্ষুদ্র জলকণা; তোমারই বা এমন কি অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান আছে যাহার ফলে এত গর্ব্বিত হইয়া উঠিতেছ?"

সে বলিল "তুমি কি আমার অভিজ্ঞতার কথা জানিতে চাও?"

আমি বলিলাম "হাঁ"।

সে বলিল "একটা কথা বলি, আমার সময়ের হিসাব লইয়া বেশী গোলমাল করিও না। তুমি সামান্য মানব, তোমার অভিজ্ঞতা বড় জোর দুই এক হাজার বৎসরের কিন্তু আমার অমন দু দশ কোটী বৎসরের লইয়া। কাজেই সময়ের হিসাব লইয়া একটা কাহিনী লিখিতে গেলে আমি কোন কালেই আমার কথা শেষ করিতে পারিব না এবং তাহাতে যে প্রকাণ্ড পুস্তক হইবে সমগ্র বসুন্ধরাও তাহার ভার বহন করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া সে তাহার কাহিনী আরম্ভ করিল।

(১)

আজ প্রায় এক মাসের কথা; বহুকাল পরে একবার ভাবিয়াছিলাম কিছুকাল বিশ্রাম করিব; সে সুযোগও জুটিয়াছিল। ভূগর্ভে একটু বেশ স্থান পাইয়াছিলাম; বেশ অন্ধকার, নির্জ্জন স্থান; প্রতিবেশী ছিল অগণ্য মৃত্তিকা ও বালুকার কণা। আমারই মত আরও অনেক জলকণা সেখানে আশ্রয় লইয়াছিল। আমার উপরের কণাগুলি আমাকে ঠেলিতেছিল, আমিও আবার আমার নীচের কণাগুলিকে ঠেলিতেছিলাম। এরূপ ঠেলাঠেলির পর শেষে এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ভাবিলাম এইখানেই কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিব। নিকটে একটী বালুকণা ও একটী লবণকণা ছিল; তাহারা বলিল, এস ভাই আমরা তিনজনে এক সঙ্গে বাস করি। সম্মত হইলাম। লবণকণা ও আমাতে মিলিয়া এক হইয়া গেলাম। আমরা দুজনে বালুকণাটীকে ঘিরিয়া বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু অদৃষ্টে বিশ্রামসুখ ছিল না।

পরদিন ভয়ে ও বিস্ময়ে দেখিলাম একটী তীরের মত পদার্থ আমাদের দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ দ্রব্যের সহিত আরও অনেকবার পরিচয় হইয়াছিল কাজেই ভরসার কিছু রহিল না। সেটী একটী গাছের মূল; শিকারের সন্ধানে ভ্রমণ করিতেছে, যেন একটী টোপর (১) মাথায়

(1) Root cap.

দিয়া বিবাহ করিতে চলিয়াছে। প্রথমে টোপরটী আমার পাশ ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল ; ভাবিলাম এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। ও মা, দুষ্ট মুলটী তার পরই একটী হাত (১) বাড়াইয়া আমাকে চাপিয়া ধরিল। আমি প্রাণ পণে বালুকণাটীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। জানিতাম মুল বালুকণাকে লইতে পারে না। কিন্তু কোন ফল ফলিল না। সে আমাকে বালুকণার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া নিজদেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দিল। তিন বন্ধু ছিলাম এখন দুইজন হইলাম—লবণকণা ও আমি।

উদ্ভিদের মুলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে তাক লাগিয়া গেল। যেন অগণ্য কোষযুক্ত (২) একটা মধুচক্র। আমি একটা কোষের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তাহার ভিতর যে বিচিত্র ব্যাপার সন্দর্শন করিলাম তাহা আরও বিচিত্র। কিন্তু তাহা বুঝাইব কাহাকে আর বুঝিবেই বা কে ? অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তোমরা সেই কোষের মধ্যের আকারের ও ক্রিয়ার কিয়দংশ মাত্র দেখিতে পাও। তাহাতেই তোমরা কত আশ্চর্য্য হইয়া যাও। তোমাদের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি যদি এখনকার অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক হইত তাহা হইলে যাহা দেখিতে তাহাতে তোমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকিত না। একটী ক্ষুদ্র কোষ, যাহাকে তোমরা অতি সামান্য বলিয়া পরিত্যাগ কর তাহার ভিতরে যেন একটা নূতন জগৎ চলিতেছে—কত নূতন শক্তি কার্য্য করিতেছে, কত সংযোজন বিযোজন প্রভৃতি চলিতেছে। আমি এসকলই দেখিতে লাগিলাম।

এমন সময় আমার মনে হইল নিম্নদিক হইতে কে আমাকে ঠেলা দিতেছে ও ঠিক সেই সময়ে উপরের দিক হইতে কে আমাকে জোরে টানিতে লাগিল। আমি ঐ দুই শক্তির (৩) বলে বাধ্য হইয়া কোষ পরিত্যাগ করতঃ মূলের মধ্যদিকে অগ্রসর হইলাম। সেখানে দেখিলাম সারি সারি বিচিত্র নল (৪) সমুহ সাজান রহিয়াছে। আমি একটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। নলগুলির ভিতরের কারিক্ু দেখিয়া ত আমি অবাক। কতকগুলির দেওয়া যেন কতকগুলি মই লাগান রহিয়াছে। কাহার ভিতরে মনুমেণ্টের মত পাকান পাকান (৫) সিঁড়ি কোনটীর দেওয়ালের এক এক স্থান পাতলা হই গিয়াছে, উহার (৬) তিতর দিয়া অন্য নলের মধ্যে সহজেই গমন করা যায়।

যে শক্তিদ্বয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আমি নলে মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহারই বলে আ এক্ষণে বৃক্ষের উর্দ্ধদিকে চলিতে লাগিলাম। বৃক্ষে মধ্যে আরও যে সকল ক্রিয়া সন্দর্শন করিলাম তা সবিস্তারে বলিতে গেলে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি। উঠিয়া উঠিয়া ক্রমশ আমি এক পত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। পত্রে মধ্যে ইটের মত চৌকা চৌকা বহুসংখ্যক কোষ (সারি সারি সাজান রহিয়াছে। তাহাদের একটী মধ্যে আমি প্রবেশ করিলাম। নিম্নের যে কো দেখিয়াছিলাম এটীর ভিতরের গঠন, তাহাদের ম নহে। এই কোষগুলির ভিতরে কতকগুলি সবু কণা (৮) রহিয়াছে। কণাগুলি শুনিলাম সূর্য্যকি ধরিবার ফাঁদ। সূর্য্যকিরণ উহার মধ্যে ঢুকিলে আটকা পড়িয়া যায়, তাহাকে অনেক কাল—সম সময়ে যুগযুগান্ত ধরিয়া মর্ত্তলোকে বাস করিতে হয়।

আমার একসঙ্গী জলকণা ঐরূপ একটী কণা মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাকে খানিক সূর্য্যকিরণ এবং বাতাস হইতে গৃহীত কয়লা সহিত মিশ্রিত করিয়া, সবুজ কণাটী খানিকটা চি তৈয়ারী করিয়া ফেলিল। কি অদ্ভুত! শুনিলা সেই চিনি হইতে উহা শ্বেতসার নামক পদার্থ নির্ম করিয়া গাছের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে তবেইত, সঙ্গীমহাশয়কে বহুকাল বৃক্ষজীবন যাপ করিতে হইতে পারে।

ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি আমার নিকটে খানিকটা চিনি আসিয়া উপস্থিত। আর

(১) Root hair. (২) Ce'ls. (৩) Root pressure and Transpiration. (৪) Vessels (৫) Spiral vesse
(৬) Pits. (৭) Pallisade cells. (৮) chlorophyl.

কোষের জীবনীর আধার পরম পদার্থ,—ইংরাজীতে যাহাকে Protoplasm বলে—সে, লবণ কোথায়, লবণ কোথায় বলিয়া বড়ই সোরগোল লাগাইয়াছে। "এতটা চিনি বৃথা যায় আমি খানিকটা লবণ পাইলে চিনির সহিত ভিয়ান করিয়া খানিকটা Proten (ডিম্বশ্বেতাংশ সদৃশ খাদ্য) প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি।" আমার অভিন্নদেহ সঙ্গী লবণের উপরই তাহার আক্রোশ বুঝিলাম। আমাকে এক চড় মারিয়া আমার নিকট হইতে লবণকে ছিনাইয়া লইল।

সঙ্গীহীন হইয়া দুঃখিত মনে আমি এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়াই একটু ফাঁক পাইলাম। তাহা দিয়া বাহির হইয়া একটী ছোট ফাঁকা স্থানে উপনীত হইলাম। সেই স্থানটীর প্রায় চারিদিকেই কোষ। একটু খুঁজিয়াই দেখিলাম উহাতে একটী ফুটা (১) আছে। সেই ফুটা দিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বাহিরে আসিয়াই বুঝিলাম বৃক্ষজীবন হইতে মুক্ত হইয়াছি।

উপরে অনন্ত নীল আকাশ। সূর্য্য তীব্র কিরণ দিতেছে। নিম্নে শ্যামল প্রান্তর, উদ্যান ও উপবন। সেখানে তালগাছ রহিয়াছে, কুলগাছ রহিয়াছে অন্যান্য গাছ রহিয়াছে, বেল গাছ রহিয়াছে, আমড়া গাছ রহিয়াছে, চালতে গাছ রহিয়াছে, শ্যাওড়া গাছ রহিয়াছে, কুষ্মাণ্ড গাছ রহিয়াছে, ঘেটু গাছ রহিয়াছে, আরও কত কি গাছ রহিয়াছে। সেই জড়ভড়তের দলকে দেখিয়া আমার বড়ই ঘৃণা বোধ হইল। আর একটু হইলেই ত আমাকেও ঐ স্থবিরদের মত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত! আমার ভাব দেখিয়া বৃক্ষগণ হাসিয়া উঠিল, বলিল তোমার ভ্রমণের সুখ এই বার মিটিবে।" অহঙ্কারে ত্ত হইয়া আমি তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপও করিলাম না।

আমি চলিতে লাগিলাম। আহা কি আরাম! বায়ুর স্কন্ধে ভর করিয়া, অশ্বত্থবৃক্ষের পাতাগুলিকে সর্ সর্ করিয়া কাঁপাইয়া দিয়া, ঝাউগাছের পাতাগুলিকে ঝর ঝর করিয়া নাচাইয়া দিয়া আমরা আকাশ পথে চলিতে লাগিলাম। কবুতরের দল আমাদের পার্শ্ব দিয়া আমাদিগকে নাচাইয়া চলিয়া গেল। শুভ্রবকের শ্রেণী ঢেউ খেলাইয়া খেলাইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মালার আকারে আমাদের ঘেরিয়া চলিতে লাগিল। একটা কোকিল আমারই একটু নীচু দিয়া কুহুতানে মন মজাইয়া চলিয়া গেল। একটী চিল আমাদের নিকটে আসিয়া আমাদের চারিদিকে ঘুরপাক খাইয়া নিম্নগামী হইল। একটী শালিক প্রাণ ভয়ে আমাদের পাশ দিয়া উড়িয়া গেল আর একটী বাজ পক্ষী কিছু দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

চলিতে চলিতে আমরা এক বিশাল উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা জামরুল গাছ সাদা জামরুলে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। একটা জামগাছ হইতে কাল বেগুণি ও সবুজ রঙ্গের থলো থলো জাম ঝুলিতেছে। একটা বিশাল আম গাছ, আমে ছাইয়া গিয়াছে। কত বানর সেখানে লাফালাফি করিয়া আম খাইতেছে। দূর হতে একটা গাছকে সোণা দিয়া মোড়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল, নিকটে গিয়া দেখি সেটা একটী—সোঁদাল। নিবিড় সবুজ পত্রাবলীর মধ্যে লাল লাল সুপ্রচুর ফুলের গোছা পরা একটী কৃষ্ণ চূড়া গাছকে বড় মানাইয়াছিল। দূর হইতে মনে হইল যেন একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া চুলো ডাকাত অজস্র সোণার মাদুলী গলায় পরিয়াছে, কাছে গিয়া দেখি সে একটা খেজুর গাছ। কাঁদি কাঁদি হল্‌দে খেজুরে তাহার স্কন্ধ ভরিয়া গিয়াছে।

একটী গাছে দেখি দল দল পাপিয়া নাচিতেছে। একটী কাঠবিড়ালী ক্ষুদ্র শাখা নির্ম্মিত সেতু দিয়া একগাছ হইতে অন্য গাছে গমনাগমন করিতেছে। আর একটী কাঠবিড়ালী নিম্নে আহার অন্বেষণ করিতেছিল। একটী কাক তাহাকে তাড়া করিল।

(১) stomata.

সে পলাইয়া পলাইয়া উহার হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, হঠাৎ দেখি কাকটা তাহার অতি নিকটে উপস্থিত আর তাহার পলাইবার উপায় নাই; ভাবিলাম এইবার তাহার কাঠবিড়ালী জন্ম ঘুচিবে। তার পরেই এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম। কোণঠাসা কাঠবিড়ালীটা হঠাৎ ফিরিয়াই কাকের গালে এক চড় বসাইয়া দিল। কাঠবিড়ালীর এই অপ্রত্যাশিত আচরণে কাকটার এমনই ভেবাচেকা লাগিয়া গেল, যে সে আর কাঠবিড়ালীকে দ্বিতীয়বার উত্যক্ত করিবার চেষ্টা করিল না। একটী তাল গাছে অনেকগুলি বাবুইয়ের বাসা ঝুলিতেছিল। কেমন সুন্দর বাসাগুলি! আরও অনেক গাছে অনেক পাখির বাসা দেখিলাম। কোনটীতে পাখি ডিমে তা দিতেছে। কোনটীতে ক্ষুদ্র শাবকগুলির মুখে আহার দিতেছে। একটীর দৃশ্য দেখিয়া চোখে জল আসিল—একটী বড় পাখী একটী ক্ষুদ্র পাখীর বাসা আক্রমণ করিয়াছে। ক্ষুদ্র পাখীটী নিজের শাবকগুলিকে ডানা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া চঞ্চু দ্বারা বড় পাখীটীর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে, তাহার ক্ষত বিক্ষত মুখ হইতে রক্ত ঝরিতেছে!

বাগান হইতে বাহির হইয়া আমরা ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। সমস্ত দেশটা যেন একটা মানচিত্রের মত আমাদের সম্মুখে পতিত রহিল। আমরা একই স্থানে অবস্থিত হইয়া কত দেশ, অরণ্য, গ্রাম, নগর, নদী ও জলাশয় দেখিতে লাগিলাম। তোমাদের এ বিশাল নগরটী আমার কাছে ছেলেদের তাসের নগরের মত বোধ হইতে লাগিল। আমাদের তখনকার চোখে একটী পর্ব্বতকে তোমাদের একটী বড় বাড়ীর মত বলিয়া বোধ হইত।

আরও কত ঘুরিলাম তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া তোমাকে শ্রান্ত করিব না। কিন্তু সম্প্রতি এক সপ্তাহ ধরিয়া যে কষ্ট পাইয়াছি, তাহাতে ভ্রমণের সব সুখ দূর হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের বাতাস আসিয়া হুকুম দিল এখনই পশ্চিম দিকে ছুটিতে হইবে। ছুট্ ছুট্ ছুট, কি প্রচণ্ড বেগ। সেখানে নিশ্চিন্ত হইবার পূর্ব্বে এক পশ্চিমে বাতাস আসিয়া বলিল, এদিকে যাইতে পারিবে না, শীঘ্র বেরোও। আমরা আবার পূর্ব্বদিকে ছুটিলাম। মাঝখানে এক নীচের বাতাস আসিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া আরও উপরে তুলিয়া দিল। সেখানে কি ভয়ঙ্কর শীত। শীতে আমরা জমিয়া বরফ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম এইবার পৃথিবীতে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিব। আমরা হিমশিলা হইয়া প্রচণ্ড বেগে নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম।

অনেক নামিয়াছি এমন সময়ে এক তীব্র উষ্ণ বায়ু আসিয়া আমাদিগকে গলাইয়া দিল ও পরে বাষ্পীভূত করিয়া দিল। এই অবস্থায় আমরা এদিক ওদিক একটু চলিতে না চলিতেই এক দক্ষিণা বায়ু আসিয়া আমাদিগকে উত্তর দিকে লইয়া চলিল। আমরা হিমালয়ের তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গ সকল দেখিয়া পুলকিত হইলাম। অকস্মাৎ উত্তুরে বায়ু বহিতে লাগিল আমরা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলাম। যাইতে যাইতে আমি জমিয়া অন্য জলকণার সহিত মিশিয়া এক প্রকাণ্ড মেঘ প্রস্তুত করিলাম। আমাদের মে আবার আর একটা বড় মেঘের সহিত যোগ দিল দেখিতে দেখিতে আমরা একটা প্রদেশকে ঢাকি ফেলিলাম। আমাদের মধ্য দিয়া কত তড়িৎ প্রবাহ বহিতে লাগিল, বিদ্যুৎ চমকিত হইল, বজ্রনাদ হইতে লাগিল। আমরা মেঘরাশির সকলের নিম্নে ছিলাম একটা শীতল বায়ুর ঝাপ্টা আসিয়া আমাদিগকে বৃষ্টিতে পরিণত করিল। আজ আমি তাই এখন তোমার সম্মুখে উপস্থিত।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দ্বিপত্নীক।

(৩১)

দাদা মহাশয় কহিয়া উঠিলেন "তুমিই যামিনী প্রকাশ? বেশ। হ্যাঁ, আমি ভেবেছিলুম বটে যে তুমি একদিন এখানে আসবে।" যামিনী অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল, বিস্ময়পূর্ণ হাস্যের সহিত কহিল "আপনি যে দেখ্‌ছি অন্তর্য্যামী!"

দাদা মহাশয় তাঁহার মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ওগো না, না, এসেই একেবারে অতো করে বাড়িয়ে বসোনা, শেষ কালে অনর্থক হতাশ হয়ে ফির্‌তে হবে! দেখো এর জন্যে অন্তর্য্যামী হতে হয় না। সে দিন ওরা সবাই এসেছিল জানোতো? অবশ্যই কথায় কথায় তোমার কথাও উঠেছিল, রমেন আমাকে সবই বলেছে। তা সেই সব শুনে টুনে কেমন একটা কৌতুহল হয়েছিল যে একদিন সে আসেতো তাকে দেখি, বুঝলে? চিন্তা শক্তির একটা আকর্ষণ আছে এটা মানো তো? তাছাড়া আর কিছুই নয়।"

"একেই যোগবল বলে?"

"একেই যোগবল বলে না বলে। যোগবল এই শক্তির ই পূর্ণ প্রকাশ আর কি! দেখ যোগ ভিন্ন কোন কাজই হতে পারে না। কুলিরা এই যোগের দ্বারাই মাল তোলে, বেদেরা বাজি দেখায়। আবার মনে প্রাণে যোগ করে সাধক তার সাধ্যকে লাভ করে। যোগ না করতে জান্‌লে কি তোমার নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন্, রণ্টজন, এঁরা সব প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য এসকল আবিষ্কার করতে পারতেন? আদি বিধাতা থেকে বর্ত্তমান তুমি আমি পর্য্যন্ত যে কেউ কিছু করি, যোগের দ্বারাই করি। যখন যোগকে ত্যাগ করি, তখনি ব্যর্থ হই, নাচের দড়ি থেকে পা ফস্কে যায়।"

যামিনী চুপ করিয়া শুনিতে শুনিতে বিস্মিত হইতেছিল, কহিল "যোগ বলতে আমরা বুঝি প্রাণায়াম করে শ্বাস রোধ করা—"

দাদা মহাশয় হাসিয়া বাধা দিলেন "বুঝি বল্‌চো কেন? আসলেই তো তাই হলো গো! মনে করো যখন তুমি গণিতের একটা কঠিন তত্ত্ব সামঞ্জস্য করচো কিম্বা আইনের একটা সূক্ষ্ম খুঁটকে খুঁজে বার করচো তখন তোমার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি কখন যে রুদ্ধ হয়ে গেছে তুমি কি তা বুঝতে পারো? সার্কাসে যখন পালোয়ান বুকের উপর হাতি তোলে কি সুতোর উপর একটা ছোট বাচ্চাকে খেলে বেড়াতে দেয় তখন যে এক সঙ্গে হাজার লোকের হাজার প্রাণায়ম হতে থাকে আর যে সেই দড়িতে ঝুল্‌চে বা বাঘের পিঁজরেয় ঢুকেচে তারি বুঝি হয় না? সে তখন কুম্ভকে না থাক্‌লে ওই দৈবী বল পায় কোথা? সবার ভেতরেই এই প্রকৃতি জয় করে নিজের সর্ব্বক্ষম শক্তিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা রয়েচে। লোকে না বুঝে সেটা বৃথা নষ্ট করে ফেলে। কেউবা তাদের এই হঠ যোগকেই চরম লক্ষ্য ভেবে এটা কে একটা ব্যবসা করে তুলে বেচে খায়। কেউবা এই দিয়ে প্রকৃতিকে জয় করে তাঁরই ঐশ্বর্য্য ভোগ করাতেই সিদ্ধি বোধ করে। ওগো, কাপালিক যোগীদের অষ্ট সিদ্ধি লাভের কথা কিছু শোন নি? ওইটেকেই তারা সাধনার লক্ষ্য করেছিল বলে, অতো কঠোর তপকেও স্বার্থের পায়ে অঞ্জলি দান করে ফেলেছিল। নইলে তন্ত্রশাস্ত্রর যা উপদেশ সে কি সামান্য জিনিষ। এই জন্যেই তো শাস্ত্রে যোগৈশ্বর্য্যের পরীক্ষা করতে সাধকদের পুনঃ পুনঃ নিষেধ করা হয়েচে। নিজের ক্ষমতা জান্‌তে পারলে মত্ত হস্তি আর শেকল বাঁধা থাকতে চায়না, শেকল ছিঁড়ে লোক ধ্বংস করে নিজেকেও নষ্ট করে ফেলে। ওগো বাবু, অমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। তোমার এখন যুবা বয়েস, তা ছাড়া তোমার জজের কাছে দাঁড়িয়ে বহস্ করা অভ্যাস

আছে। আমি বুড়ো মানুষ কাঠ গড়ার আসামীর মতন দাঁড়িয়ে কাঁহাতক্ থাকি বলো? এসো বসে-পড়া যাগ্ গে।"

যামিনী ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া গোটাকত পৈঠা উঠিয়া একটা বারান্দার সম্মুখে সেই অনিমার পরিচিত ঘরটার ভিতরে প্রবেশ করিল। ঘরের জানালা দরজা সব খোলা। ভিতরে আসিতেই ধূপ ও গুগ্ গুলের গন্ধ, পূজা গৃহের পুণ্য সুরভির মত নিকট দিয়া বহিয়া গেল। ঘরের চারিদিকে কাচের আলমারি ভরা অনেক পুস্তক। যামিনী দেখিল অনেক বিষয়েরই সংগ্রহ রহিয়াছে; মেজেয় গালিচার উপর কম্বলের বিছানা, দাদা মহাশয় নিজে বসিয়া তাহাকেও বসিতে বলিলেন।

যামিনী একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিল "আমি ব্রাহ্ম, আপনার বিছানায় বস্‌বো?"

দাদা মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন। হাসির সুর শুনিয়া যামিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া গেল, তাহা যেন শিশু কণ্ঠের হাসি, তেমনি তরল আর সরল। তিনি কহিলেন "হ্যাঁগা তুমি যে নিজেকে ব্রাহ্ম বল্‌চো তা ব্রহ্মকে কি জানতে পেরেছ? তা যদি পেরে থাক তাহলে তুমিতো আমার নমস্য, আমিতো তা পারিনি।"

জিজ্ঞাসিত লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিয়া রহিল। দাদা মহাশয় কহিতে লাগিলেন "দেখো দাদা, ব্রাহ্ম হওয়া অপরাধের কথা নয়, ব্রহ্মোপাসনা ভিন্ন মানুষের মুক্তির আর পথ কই? সম্পদুপাসনা বা প্রতীক উপাসনা, যা কিছু করা যায়, তা সেই নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনার উদ্দেশেই তো করা হয়ে থাকে। ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বা বিরাট পুরুষকে ধ্যান করবার অক্ষমতার জন্যই আমরা শালগ্রাম শিলা বা দশভূজা মূর্ত্তি, না হয় গুরুরূপ কিম্বা নিজের নিজের অভিষ্ট মূর্ত্তিতে চিত্ত স্থাপন করে থাকি। আমাদের উদ্দেশ্যতো আর এ নয় যে সেই নুড়ি পাথরটুকুর কৃষ্ণ-চিক্কণতাই ধ্যাননেত্রে দেখতে থাকবো! অনন্ত বিস্তৃতি রূপ শঙ্খ, অনন্ত কাল চক্র স্বরূপ চক্র, শ্রেয়ঃ রূপ গদা, ও প্রেয় রূপ পদ্ম, আর অবিদ্যাময়ী প্রকৃতি রূপ তাঁর শ্যাম বর্ণ, চিন্ময় আত্মা তাঁর বক্ষস্থলে উজ্জ্বল কৌস্তুভ মণিরূপে বর্ত্তমান! সেই সচ্চিদানন্দ আত্মার জগৎসৃষ্টি সঙ্কল্প ভগবানের বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস নামক রোমাবর্ত্ত রূপে বিরাজিত। সত্ত্বরজস্তমোময়ী ব্যক্ত প্রকৃতি ভগবানের কণ্ঠ বিলম্বিত বনমালা রূপে অবস্থিত। ছন্দ সকল ভগবানের পীতবাস। অকার, উকার মকারময় ত্রিমাত্র প্রণব ভগবানের ত্রিসূত্রী ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য এবং যোগ ভগবানের মকর এবং কুণ্ডল নামক কর্ণাভরণ, ব্রহ্মপদই সর্ব্বলোকের অভয়প্রদ ভগবানের মৌলীরূপ শিরোভূষণ,। অব্যাকৃত প্রকৃতি ভগবানের অনন্ত রূপ আসন। ভয়শূন্য আত্মার কৈবল্য পদই ইঁহার ভয়হারী বৈকুণ্ঠ ধাম। ত্রৈগুণ্য বিষয় ঋক্, যজু ও সামরূপ বেদ সকল ইঁহার বাহন; গরুড় ও ইঁহার পুরুষ মূর্ত্তিই যজ্ঞ। ব্রহ্মের অক্ষয় অব্যয় ঐশ্বরিক শক্তিই ভগবানের লক্ষ্মী। এই যে সর্ব্বাত্ম সর্ব্বময়কে আমরা সম্পদুপাসনা-কালে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি তিনি কি ব্রহ্মের বাইরে? যখন ব্রহ্মভিন্ন জগতের আর দ্বিতীয় সত্তা নেই তখন যে রূপে যে নামে যেমন করেই তুমি পূ[...] করোনা, গঙ্গায় জলাঞ্জলী ফেল্‌লে জলেই না মিশবে? তাছাড়া আর যাবে কোথা? তবে আলাদা ক[...] ব্রাহ্ম বল্‌তে গেলে কি বোঝায় এখন ব[...] দেখি? তুমি তাহলে অবাঙ্‌মনসগোচর পরব্রহ্ম[...] বেশ বুঝেছ? হাঁহে, 'সদেবাহমস্মি, সোঽহমস্মি' [...] রকম জ্ঞানটা পেয়েছ না?"

লজ্জায় মরিয়া গিয়া যামিনী উত্তর করিল "আ[...] তা আর কই পেয়েছি। আমি এই বল্‌ছিলুম যে [...] ব্রাহ্মসমাজের লোক, আপনার এ আসনটায় [...] যদি ঠিক না হয়।" এই বলিয়াই সে তাঁহার [...] মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার পদতলের দিকে [...] গ্রহণ করিল।

দাদা মহাশয় কহিলেন "ব্রহ্মকে নিয়ে তো[...] একটা আলাদা সমাজ করেছ বটে। তা আ[...] অত মনে ছিল না। দেখো নিজেদের ম[...] পরস্পরের সঙ্গে ভেদ করে একটা বড় বেড়া [...]

যেমন মানুষের ভেদ বুদ্ধির খেলা তাদের উপাস্যকেও তেমনি অন্যের উপাস্যের সঙ্গে ভেদভাবে দেখা, তাদের বৈষম্য দ্বারা গঠিত প্রকৃতিরই একটা বিশেষ গুণ। তা বলে তোমরা নিজেদের সগুণ ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভোপাসক হিন্দু-এই নামটা প্রচার না করে নিজেদের হিন্দু সমাজের বাইরের লোক করে তুলে, এত বড় একটা নাম নিয়ে সরে রয়েছ কেন? ব্রহ্মোপাসনাই হলো মানুষের চরম লক্ষ্য। জ্ঞানে অজ্ঞানে সবাই-ই বিশ্বস্রষ্টা মোক্ষপুরুষকেই পেতে চায়; তাঁকেই ডাকে। ডাকের সাজ পরা ঠাকুরপ্রতিমাকে কেউ মুখ্যভাবে চাইতে পারে না, সবারি জ্ঞান সমান নয়, বুদ্ধি সমান নয়, তাইতেই যা ডাকবার ভেদ এসে পড়েছে। রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কি সবাই? প্রতীকভাবে হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বরের উপাসনা না করে কেউ কি নির্গুণ অব্যয়কে ধরতে সক্ষম হয়? আকাশ বা বিষ্ণুমূর্ত্তি যাঁহার আধিভৌতিক রূপ, আধিদৈবিকভাবে তিনি পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, এবং আধ্যাত্মিকভাবে তিনিই পরমাত্মা। তুমিও বিষ্ণু উপাসক বৈষ্ণব, যদি ভাবসমাধিতে কখনও ব্রহ্ম দর্শন লাভ করে, জন্ম সফল করে থাক তুমি ব্রাহ্ম। তুমি অশুচি কিসে দাদা?"

যামিনী কহিল "আচ্ছা প্রতীক বা সম্পদুপাসনার কথা যা বল্‌চেন, কিন্তু প্রতিমাদি সহায় করে প্রতীক উপাসনার অভ্যাস কি ভাল? এর যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ জগৎ থেকে মনকে সরিয়ে এনে একটা জায়গায় [...]দ্ধ করা-তা-কি সাধক মনে রাখ্‌তে পারেন? তাঁর আপনই ইষ্ট মূর্ত্তিই কি শেষকালে ব্রহ্মের স্থান জুড়ে [...]আসেন না? এবং প্রতিমা পূজক মাত্রই তিনি থেকে-[...] বালে তাঁর উদ্দেশ্য কি ব্যর্থ হয় না? ক্ষুদ্রের পূজা সহায়তে কর্‌তে দেশটা একেবারে সঙ্কীর্ণচেতা, হীন [...] আয় গেছে।"

"ওহে ভায়া, তোমায় আমায় নাম ধরে ডাকলে [...]মরা সাড়া দিইনে বলে কি তিনিও তাই করবেন? [...] যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" এই [...]তাঁর কথা? মোদ্দা একটু ডাকা চাই। আর [...] দেখো না, এই যে এই ঘরে আমার সামনে কেবল মাত্র তুমি বসে রয়েছ এখন আমি তোমায় কখন যদি যামিনী বলে ডাকি, কখনও যদি অবনী বলে ডাকি কখনও বা বলি ওরে, কখনও বা বলি হ্যাঁগা শুন্‌চো, তাহলেও তুমিতো বুঝিবে ডাকবার যখন একজন বই দুজন কেউ নেই, তখন আমার বুদ্ধি বৈলক্ষণ্যের জন্য আমি যা-ই কেন বলি না, ডাকার লক্ষ্য সেই তুমি যামিনীই।"

"তাহলে আপনি ব্রাহ্মদের পক্ষপাতী নন?"

"ঐ দেখ ঐটে তুমি ভুল বললে। যে রকম আছে এরকম একটা স্বতন্ত্র সমাজের আমি পক্ষপাতী নই বটে। শাস্ত্রকাররা অনেক ভেবে বুঝেই ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঐশ্বরিক গুণ ও ভাবযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনার নিয়ম করে গেছেন সেই নিয়মই উচিত নিয়ম। কিন্তু উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে উপায় নিয়ে থাক্‌লে শাস্ত্রের শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিদ্যা সম্বন্ধেও যেমন, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তেমনি, আহার সম্বন্ধেও ঠিক তাই। ধাত বুঝে ব্যবস্থা করতে হয় কি না? প্রকৃতির উপযোগী খোরাক দিতে না পারলে তাথেকে সু ছেড়ে কুফলই পাওয়া যায়। তাই আমার মত, যেমন বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি বিপুল হিন্দু সমাজে মিশে তার সঙ্গে এক হয়ে গেছে ব্রহ্মোপাসক সম্প্রদায়েরও এইবার তাদের দুচারটে রীতিনীতি ছাঁট্ কাট করে সমাজ অঙ্গে মিলিয়া যাওয়াই উচিত। তার যা কাজ ছিল তা একরকম হয়ে গেছে। উপনিষদ প্রচার করে অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞাপন ও খৃশ্চানিটি থেকে সমাজের শিক্ষিতগণকে রক্ষা কর্ব্বার জন্যই ভগবানের অবতার হয়েছিল। এখন বুদ্‌বুদ্ জলে না মিলিয়ে গিয়ে বৃথা জলাবর্ত্ত করে তোলায় ফল কি?"

যামিনী সর্ব্বান্তঃকরণে কহিল "আমারও এই কথা মনে হয়, কিন্তু তাকি মিশতে পারে? এখনও দেশময় প্রতিমা পূজা ছেয়ে রয়েছে, এখনও কত কুসংস্কার, ভেদ-বুদ্ধি বর্ত্তমান আমার মনে হয় আরো শত শত বৎসর ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রচার কর্‌লে তবে যদি ভারতের ঋষিদের সেই ব্রহ্মবাদ আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বের চেয়ে অনেক কমে গেলেও এখনও এই দুই সমাজের মধ্যে এমন একটা

বিরুদ্ধ ভাব বর্ত্তমান রয়েছে যে দুজনকার চোখেই তাদের পরস্পর রীতি, নীতি আচার ব্যবহার অনেক হেয় এবং অবজ্ঞেয়। সুযোগ পেলে কেউ কাউকে আক্রমণ করতে ছাড়ে না।"

দাদা মহাশয় কহিলেন "এক দিনে কিছুই হয় না, দু দিক থেকে এই ইচ্ছা ও চেষ্টা হতে আরম্ভ হলে ও দুপক্ষই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করতে রাজী থাকলে কিছুই বাধা থাকবে না। শাক্ত বৈষ্ণবেও কিছুদিন ভেদ চলেছিল।" যামিনীর চিত্ত এই স্বল্প পরিচিত লোকটীর প্রতি ক্রমেই অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাঁহার কথাগুলি বেশ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়া তারপর সহসা জিজ্ঞাসা করিল "জাতিভেদ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

দাদা মহাশয় তাকিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্দ্ধ শায়িত ভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "হ্যাঁঃ আমি আবার একটা মস্ত লোক কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছো আমার কি মত? আমি বাপু আদার ব্যাপারি আমার ওসব খবর কেন?"

যামিনী কহিল "আপনি মস্তলোকই বটে।"

"দেখ জহুরীতেই জহর চেনে, এসেই একবারে চিনে ফেলেছ! জানোনাতো এ বুড়োটা একটা আস্ত পাগল তাই তোমাদের মতন ছোক্‌রা পেলেও মুখ ছোটাতে ছাড়ে না। খুব বক্‌তে পারে বলে এনয়'যে সে খুব বাগ্মী।"

যামিনী হাসিয়া বলিল, "জহুরী জহর চিনেচে, আপনি এখন আর ঢাকতে তো পারচেন না, এখন নিত্য উপদ্রব সইতে হবে যে। আচ্ছা, আমাদের একথাটা এর পর তখন আলোচনা করা যাবে। এখন তবে উঠি, আজ ভাই-ফোঁটা কিনা, আমার বোনের ওখানে একবার যেতে হচ্চে। কখন এলে দর্শন পাবো?" দাদামহাশয় হাসিমুখে প্রণত যামিনীর মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া সস্নেহে কহিলেন "ঈশ্বর তোমার ভাল করুন। বেশ ছেলে তুমি, বাঙ্গালির ঘরের রত্ন তুমি, বেঁচে থাকো। দুটোর পর যখন আসবে দেখা হবে। এখন এসো তবে, বোনটি পথ চেয়ে বসে আছে।"

যামিনী উঠিয়া বাহিরে আসিতেই কেহ তড়িং গতিতে সরিয়া গেল। পরক্ষণেই সে দেখিল অনিমা সরিয়া যাইতেছিল, তাহাকে চিনিতে পারিয়া ফিরি আসিতেছে। অনিমা সবিস্ময়ে কহিয়া উঠিল " আপনি; আমি আর কেউ ভেবেছিলেম। আপ এখানে!"

"আমি নন্দিনীর ওখানে এসেছিলুম।"

"ওঃ, আমার দাদামশাইকে কেমন দেখলেন?"

যামিনী সস্মিত মুখে তাহার দিকে চাহিল, মু একটা রহস্যের কথা আসিয়াছিল তাহা সম্বরণ করি বলিল "আপনি যেমন গুরু খুজঁছিলেন ঠিক তেমনি "কেমন, তাই'না?" বলিয়া অনিমাও উৎফুল্লনে চাহিয়া বলিল "কিন্তু তবুও আমার স্বীকার ক দরকার আপনিই আমার গুরু চেনবার ক্ষ দেবার গুরু!"

অনিমার হাতে একখানি পদ্মকাটা রূপার রেক সুগন্ধ ফুলও বাটিতে সাদা চন্দন ছিল, দাসীর হ একটি চাঙ্গারিতে দ্রব্য সম্ভার। সে ঘরে ঢুকি থালাখানি নামাইয়া মাটিতে মাথা রাখিয়া প্র করিল, সসঙ্কোচে পায়ের ধূলা লইতে গিয়া এ কি ভাবিয়া হাত সরাইয়া লইল। তাহার সঙ্কো কারণ দাদামহাশয়ের অবিদিত ছিল না। তাহার হাতখানা ধরিয়া তাহাকে নিকটে টা লইয়া বলিলেন "অনিমা, লঘিমা, মহিমা, গ এসো, এসো, আমার যোগৈশ্বর্য্য এসো! আবার হঠাৎ যে এলি?"

অনিমা চোখ নামাইয়া কহিল "আজ আ জীবনের একটা ভয়ঙ্কর দিন, দাদামশাই, আজ ফোঁটা।" এই বলিয়া হঠাৎ সে একবারের থামিয়া গেল, তারপর রুদ্ধকণ্ঠে পুনশ্চ কহিল দিন আমার কত সুখের দিন ছিল। প্রতি বছরে দিনে আমি নিজের হাতে মালা গেঁথে চন্দন জামা কাপড় সাজিয়ে নিজের হাতে পার্শেল করে তাকে পাঠাতুম। কিন্তু এবার আমার নেই—আমার কাছে সে নেই, তাই তার পা তোমার পায়ে দিতে এনেছি আজ তুমিই

সব! তাকে হারিয়ে তবেতো তোমায় পেয়েছি। তুমি আমার সব যত্ন ভক্তির সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করো! তোমার মধ্যে যেন আমি জ্ঞান পাই সফলতা পাই, এইটুকু সুধু তুমি এই শান্তিহীনাকে ভিক্ষা দাও!"

এই বলিয়া অনিমা তাঁহার পায়ের উপরে নিজের মাথা রাখিয়া বলিল "আমি আপনার বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবো, আপনার সেবা করবো আমায় এইখানে একটু খানি স্থান দিন আর আমি সেখানে ফিরে যাবো না। আমার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে নেই, সংসার আমার শূন্য হয়ে গেছে।"

৩২

যামিনী ফিরিবার পূর্ব্বে কথামত আর একবার অনিমার দাদামহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিল। তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল।

যামিনী কহিল "যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন তাঁরই ব্রাহ্মণ হওয়া উচিত কি না?"

দাদামহাশয় কহিলেন "ওরে তোরা দুটো বিদ্বান বিদুষীতে যদি আমার দুই কাণ ধরে এমন করে পাক দিতে থাকিস্ তাহলে আমার যাও-বা একটু আধটু বুদ্ধি সুদ্ধি ছিল তাও যে লোপ পেয়ে যায়। দেখ দিদি, প্রকৃতিমাতা নিজে যাকে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম দিয়েছেন সে যত অধম হোক, তার সেই উত্তরাধিকার কেউ কি কেড়ে নিতে পারে? তাকে' জাতি ব্রাহ্মণ'তো বলতে হবেই। ব্রাহ্মণতো এক রকম নয়। আর সেই জ্ঞানী ব্যক্তি যাঁকে মহাপুরুষ মহাজন বলে জগত পূজো করছে তাঁরও এমন একটা কোনো সূক্ষ্ম অভাব থেকে গেছে যাতে তাঁকে অন্য কুলে জন্ম নিইয়েছে। এই পর্য্যন্ত গেল প্রাকৃতিক অধিকার। তারপর সেই জাতি ব্রাহ্মণ তার কর্ম্মের দ্বারা হয়ত লোকের ভাতের হাঁড়ির ভার পেলে, আর ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ জাতি বৈশ্য বা আর কেহ তিনি নিলেন শত ব্রাহ্মণের জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবি খোলবার ভার কিন্তু তবু ঐ জন্ম-সূত্রে পাওয়া অধিকারে সে সেইটুকুই দাবী না করবে কেন? সেটাতো তাকে আমরা দিই নি!" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যামিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তোমার প্রশ্নের এই থেকে উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়? যদি তোমার ব্রহ্মজ্ঞ বাস্তবিকই তাই হয়ে থাকেন তবে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তিনি লক্ষ জাতি ব্রাহ্মণেরও প্রণম্য এবং সে উচ্চ সম্মান তিনি পৈতে না পরেও পেয়ে থাকেন। যিনি ব্রহ্মকে লাভ করেছেন, তার কাছে ব্রাহ্মণ্য ক্ষুদ্রতর ও তার অধিকার তুচ্ছতম হয়ে গেছে। যে বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে গেলো, আ-ব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যার কাছে এক সত্য মঙ্গলের বিকাশ রূপে ব্যক্ত হল তার আবার জাতি, মান, গর্ব্ব কোথায় স্থান পাবে? সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মাদের দেশ কাল পাত্র কিছুই নাই, তাঁরা তাঁদের সেই প্রকৃতিদত্ত অধিকারকে ও ভোগায়তন দেহকে প্রারব্ধ খণ্ডনের উপাধীরূপেই গ্রহণ করে বিদেহমুক্তির প্রতিক্ষা করে থাকেন মাত্র। বিধিবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না জাগিয়ে তুলেও তাঁরা প্রকৃত ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করেছেন। কোন্ ব্রাহ্মণ এই সকল মহাপুরুষদের ভক্তি ও সম্মান দান না করছেন? আর নিঃসন্দেহে জেনে রেখো যে নিজেকে ব্রাহ্মণ করতে চায় সে আমার তোমারই মত ভ্রান্ত। তার সিদ্ধি মরু মরীচিকার মতই অলীক; সে ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে নি, যেমন তেমনি অজ্ঞই আছে। কারণ ব্রহ্মকে জানতে হলে যে নিজেকেই জানতে হবে। নিজেকে সে তখন তো আর তাঁথেকে অভিন্ন দেখতে পারবে না। বাস্তবিক তো জগতে মানুষে মানুষে কোন ভেদই নাই, ভেদতো মানুষের হাতে গড়া। যে যতখানি ভেতরে পৌঁছেচে সেই সাম্যকে ধরতে পেরেছে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালে সমজ্ঞান করেছে, সে মানুষের দেওয়া ব্রাহ্মণ্যের জন্য লালায়িত হতে পারে না, স্বয়ং ব্রহ্মণ্য দেব যে নিজের হাতে তার গলার যজ্ঞসূত্র পরিয়ে দিয়ে গেছেন।"

যামিনী ও অনিমা পরস্পরের দিকে এক সঙ্গেই চাহিয়া দেখিল। অনিমা আগ্রহের সহিত কহিয়া উঠিল "জটিল বিষয় গুলো এক মুহূর্ত্তে আপনার কাছে এমন সহজ হয়ে আসে। সত্যি, আমার এখন মনে হচ্চে আপনাকে কিম্বা ধরুন বিবেকানন্দ স্বামীকে যদি সমাজ থেকে 'ব্রাহ্মণ' বলবার অধিকার দিত, তাহলে এর চেয়ে কিছু বেশী দিত পারতো না।"

দাদা মহাশয় হাসিয়া নাতিনীর পিঠ চাপড়াইয়া

কহিয়া উঠিলেন "ওরে আমাকে তোরা অত করে নাই দিস্‌নেরে দিস্‌নে, মাথায় তুল্‌বি দেখছি।"

যামিনী হাসিয়া কহিল "আপনি যেমাথায় রাখবার যোগ্য দাদা মশাই।" দাদামহাশয় হাসিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, "থাম্ খোসামুদেরা থাম্। দেখ্, দিদি সন্ধ্যে হয়ে এসেছে বাড়ী টাড়ি কি যাবিনে ঠিক করেচিস নাকি?"

যামিনী চকিত হইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল। বাস্তবিকই সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। বাগানে পাখীর সাড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং হৈমন্তিক হিমবর্ষণে সন্ধ্যাতেই চারিদিকের দৃশ্য ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে। সে উঠিয়া আসিয়া দাদা মহাশয়ের পদ বন্দনা করিল। দাদা মহাশয় কহিলেন "কিগো চল্লে নাকি?"

যামিনী কুণ্ঠিত স্বরে উত্তর দিল "আজকের মতন যাই আবার সুবিধে হলেই আসবো।"

"হ্যা এসো, বেশ ছেলে তুমি, আমার খুব ভাল লেগেছে, নাতনি তুমি কি ওঁর সঙ্গেই যাচ্চো?"

যামিনী জিজ্ঞাসুভাবে অনিমার মুখের দিকে চাহিল। সে চোখ নত করিয়া কহিল "না, আমি আজ এখানে থাক্‌বো।"

"থাকবি, বলিস কি? এখানে কোথায় থাকবি? ও বেলাতো সেই দুটো আলোচালের ভাত খেয়ে আছিস্। না না এখানে তোর কষ্ট হবে যে, যা বাড়া য, আবার আসিস।"

অনিমা দৃঢ়তার সহিত সংক্ষেপে কহিল "না"। যামিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার মনে হইল তাহার সহিত যাইতে হয় ত সে সঙ্কোচ বোধ করিতেছে।

কিন্তু অনিমার জীবনের এই পরিবর্ত্তন ও ইহার অভ্যন্তরের যে কি অনির্ব্বচনীয় শান্তি তাহা সে অনুমান করিয়া উঠিতেও পারে নাই। সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া দিলে দাদা মহাশয় স্নান করিয়া আহ্নিক করিতে চলিয়া গেলেন। অনিমা এক খানি আসন লইয়া পুবের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্নিগ্ধ অন্ধকার সস্নেহে তাহার ললাটে অঙ্গুলী বুলাইয়া দিতে লাগিল, উদার আকাশে অসীমের যে বন্দ গান বিবিধ তালে অনাদিকাল অনন্ত সুরে প্র দণ্ডে পলে গীত হইয়া চলিয়াছে, তাহারি ছন্দ তাহারই ভাষাহীন ধ্বনি তাহার কাণের মধ্যদেশ তথা হইতে তাহার অন্তরাকাশে প্রতিধ্বনিত হই লাগিল।

দাদা মহাশয়ের গৃহে ফিরিতে অনেক রাত হইল অন্ধকারে জলের কল্লোল স্বর, বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর এবং নিকট ও দূর হইতে বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে শব্দ থাকিয়া থাকিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। উ অনন্ত আকাশ ছাইয়া কোটি কোটি তারকা তা দের অভেদ্য রহস্যপূর্ণ মৌন দৃষ্টি পরস্পর বিনি করিয়া প্রাণপণে জ্বলিতেছে। অনিমা স্তব্ধ হই নিজের আসন খানির উপরে বসিয়া স্তম্ভিত বি এই স্তব্ধতার নারব বাণী শুনিতেছিল। দিবসে কোলাহলে যাহা শ্রবণের নিকট হইতে ব্যর্থ হই ফিরিয়া যায়, এমনি নিঃসঙ্গ অন্ধকারে তাহা সুস্পষ্ট সুবোধ্য রূপে অন্তরের মধ্যে স্থান লাভ করিতে বা পায় না।

দাদা মহাশয় কাছে আসিয়া ডাকিলেন "অনিমা" "আপনি এসেছেন," বলিয়াই অনিমা দাঁড়াই উঠিল। "এসো, ঘরে গিয়ে বসি, ঠাণ্ডায় অসুখ করবে" অনিমা তাঁহার অনুসরণ করিয়া বলিল "আমার অ করে না। আচ্ছা দাদা মশাই, আপনি এত ধরে কি রোজই পূজো করেন? চার ঘণ্টা প্রা "চব্বিশ ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা বাদ দিলে ক বাকি থাকে, দাদ? শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ডাকা উচিত। অণুতে অণুতে যিনি আমা তাঁকে চারটে ঘণ্টা দিলেতো বড় বেশী দেওয়া হ না, সবটাই যে দেবার কথা।"

অনিমা কহিল "আচ্ছা দাদা মশাই কতক গু ফুল চন্দন নিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাঁধা গোঁ কতক মন্ত্র পাঠ করে, তাঁকে এতটা জাঁক জ দেখিয়ে না ডাকলে ক্ষতিটা কি? এটা শুধু বাহ্যি আড়ম্বর নয় কি?"

দাদা মশাই গলার তুলসী মালাটি নাড়িতে মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কতোকটা দেখানই তো বটেরে ভাই, ভান করতে করতেও যে কতোকতো পাপিষ্ঠ লোক সাধু হয়ে উঠেছে। নিয়ম জিনিষটির এমনি মজা যে হাজারও তোমার কাজ থাক, দুঃখ থাক্, অসুস্থ থাকো সেই সময়টিতে ঠিক কে যেন তোমাকে টেনে তুলে দিয়ে মনে করিয়ে দেবে, ওরে এখন তোর পূজোর সময় হয়েছে যা। আরও একটা কথা হচ্চে ঐ উপকরণ গুলো সম্বন্ধে। দেখ, একটি শুদ্ধ কাপড় পরে ধূপটি জ্বালিয়ে, মাজা তামার থালা খানিতে সুগন্ধ ফুল ক'টি সাজিয়ে একটি কুশের আসন বিছিয়ে বস্‌লে জিনিষ গুলির সংস্পর্শে তোমার মনের মধ্যেও তাদের মধ্যস্থ সত্ত্বগুণ সংক্রমন করে তোমার মনকে পবিত্র ও সুস্থির করবেই। দ্রব্য গুণ তোমরা মানতো? একটি অণুপরিমাণ হোমিওপ্যাথি ওষুধ যদি একটা প্রকাণ্ড তমকে পরাজয় করতে সক্ষম হয় তাহলে সত্ত্ব প্রধান শুভ্র বস্ত্র, তুলসী বা রুদ্রাক্ষ মালা, গন্ধ পুষ্প আর ধুপ অগুরুর গন্ধে রজটাকে তাড়িয়ে দিতে নাই বা পারবে কেন? ইষ্ট মন্তর অর্থ ওই নিয়ম পালনের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছু নয়। একটি জিনিষ—জিনিষটি ক্ষুদ্র কিন্তু তার ভিতরে সৃষ্টি স্থিতি লয় এবং তারও পরের সংবাদ ব্যক্ত হচ্চে। সেই ভাষা দিয়ে ক্রমে ক্রমে অর্থ এবং ভাবকে মনের মধ্যে আয়ত্ব করতে পারলে, আর কি, সেই—ই তখন তার অভয় মন্ত্র, হয়ে দাঁড়ায়। নিত্য নূতন কথার মালা গেঁথে দিলে, তা শুধু যে কথাই থেকে যাবে, প্রাণ প্রতিষ্ঠ হবে না তো তাতে।"

দাদা মহাশয় রাত্রে একটু দুধ ও ফল মাত্র গ্রহণ করিলেন। সুকুমার আসিয়া ডাকিল, "মাসিমা খেতে আসুন।" আহারের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন ইহা অনিমার মনেও ছিল না। অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি করে রান্না হলো সুকুমার?" সুকুমার হাসিয়া কহিল "যেমন করে রোজ হয়। আমি লুচি ভেজেচি আর বেগুন ভাজা করেচি, আর কিছু বড় দানিনে।"

অনিমা লজ্জায় মরিয়া গেল, ছি, ছি, সে কি আত্মবিস্মৃত। মাসী হইয়া কোথায় বালককে একটু স্নেহ যত্ন করিবে তা' নয় সে রাঁধিয়া তাহাকেই খাওয়াইতেছে। এই ব্যর্থ নারীত্ব লইয়া কোন অভিশপ্ত কর্ম্মের ফলে সে এই রমণী দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে!

ভোরের বেলা কাক কোকিল না ডাকিতে সদ্য-স্নাতা অনিমা পট্টবস্ত্র পরিয়া কতকগুলি শেফালিকা ও গোলাপ একখানি পাত্রে লইয়া নিঃশব্দে পূজা গৃহে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে ধূপ ও অগুরুর গন্ধে বাসি ফুলের গন্ধ মিশিয়া ভাসিতেছিল। দাদা মহাশয় তখনও গঙ্গাতীর হইতে ফিরিয়া আসেন নাই। দেব গৃহে কোন দেবতা ছিলেন না, কেবল একখানি পাথরের চৌকির উপরে অপর্য্যাপ্ত গন্ধপুষ্প সম্মুখে সাজান এবং দেওয়ালের গায়ে বার্ণিস করা চওড়া ফ্রেমে আঁটা যে মহা পুরুষের বৃহৎ তৈল চিত্র রহিয়াছিল আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এখনও তাঁহার অমৃত নিস্যন্দিনী বাণী ভৈরব মন্ত্রে নির্ঘোষিত হইতে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সে ধূলায় লুটাইয়া সেই শূন্য মন্দিরের অদৃশ্য দেবতাকে অন্তরের সহিত প্রণাম করিল।

ছায়ার মত অনুসরণ করার একটা বড় আনন্দ আছে, সেই আনন্দ সে তাহার বৃদ্ধ দাদা মহাশয়ের নিকট হইতে আদায় করিতেছিল। অনভ্যস্থ রন্ধনের ভার লইতে গিয়া যখন সে সঙ্কুচিত পদে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দত্তজা মহাশয় চোখে চশমা আঁটিয়া গীতা পাঠ করিতেছিলেন। চশমার কাচে ছায়া পড়িতেই মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিগো রাঁধতে গিয়ে ফিরে এলি যে? যা না আজ একটু ক্ষিধে পেয়েছে যে। আর কি, বুড়ো হচ্চি, এখন ভাল করে রেঁধে বেড়ে খাওয়া দাওয়া, কোন দিন টপ্ করে মরে যাবো।"

সে যাহা জানিতে চাহিতেছিল, তাহা প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই মীমাংসিত হইয়া গেল। হৃষ্ট চিত্তে সুকুমারের সাহায্য লইয়া সে রন্ধনে মন দিল। কান্তি বাবু ও যামিনীকে সে শুধু এক সময় রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল আর আজ আবার এই আয়োজন।

কথায় কথায় সেদিন ও কোথা দিয়া চলিয়া গেল

জানিতেও পারা গেল না। এক সময় অনিমা কহিল "একটা আমার বড় খারাপ লাগে, শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের ও শূদ্রের অধিকার নাই কেন? এ পক্ষপাত অহে-তুক।"

দাদা মহাশয় স্নেহের সহিত নাতিনিকে দেখিতে দেখিতে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না অহেতুক নয়। কজন স্ত্রীলোক ঘরসংসার স্বামীপুত্রের সুখ ত্যাগ করে শাস্ত্র তত্ত্বালোচনা কর্‌তে যাচ্চে, বল্‌তো দিদি? নারী বল্‌তে এখানে যার মধ্যে প্রকৃতির অংশ বেশি কাজ কর্‌ছে এইটে বুঝতে হবে কি না। প্রকৃতিকে যে যতটা পরাভব কর্‌তে সক্ষম হয়েচে, তার মধ্যে পুরুষের ততখানি প্রকাশ হয়েচে। সে সেই পরি-মাণে পুরুষ। এই রকম নারীদেহধারিণীদের তো কোনও শাস্ত্রে অনধিকার নেই। গার্গী মৈত্রেয়ী লীলাবতী আবার আধুনিক কালেরও কেউ কেউ আছেন—এই মনে করো যেমন তুমি, তোমায় কে অধিকার দেবেনা? শূদ্র সম্বন্ধেও তাই, তখনকার অনার্য্য শূদ্ররা এখনকার চেয়ে অনেক ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। এসব সূক্ষ্ম জিনিষ তারা না বুঝে উল্টা পথে যাবে বলেই তাদের জন্য সহজ জিনিষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যোগ্যকে কেউ তার উপযুক্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। মা তাকে নিজে ভার দেন। আচ্ছা দিদিমণি, তুমি তো আমাকে অনেক জেরা কর্‌লে, এখন আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করি উত্তর দাও তো, ঠিক বল্‌বে?"

অনিমা বিস্ময় অনুভব করিল, কি সে প্রশ্ন! প্রকাশ্যে কহিল "সাধ্য হলে নিশ্চয়ই বল্‌বো।"

"যামিনী প্রকাশকে তুমি বিবাহ করতে অনিচ্ছুক কেন?"

অনিমার চারিদিকের আলো ছায়ায় মিলাইয়া গেল। দত্তজা কহিলেন "সে তোমার অযোগ্য তো নয়? তবে কি সেই পূর্ব্বের প্রত্যাখ্যানের অভিমান?"

অনিমা মুখ নত করিয়া রহিল, বহুক্ষণ পরে সেইরূ[illegible] থাকিয়াই উত্তর করিল "দুইএর একটাও নয়।"

"কি তবে? তুমি তাকে ভালবাস না যদি মনে ক[illegible] থাকো সে তোমার ভুল, অনিমা। নিজেকে নিজে [illegible] দ্বারা প্রতারিত করে ফেলো না। আমি বুঝে[illegible] তুমিই—" অনিমা আর্ত্তস্বরে ডাকিল, 'দাদামশাই [illegible] "দিদি?" "আমায় কিছু বল্‌বেন না, আপনি [illegible] অমন গম্ভীর মুখ করে বকবেন না আমায়। আ[illegible] নারা জানেন না আমি কত সহ্য করেছি—আজ[illegible] করছি।"

"কেন করছো দিদি, দেশের কাজে যার সা[illegible] যোর হাত তোমার সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সেই হা[illegible] কেন আঘাত করে ঠেলে দিচ্চো? প্রকৃতি য[illegible] ম্রিয়মাণা তখন পুরুষচৈতন্য ভিন্ন তো তার [illegible] সফল হতে পার্ব্বে না?"

"তোমার ব্রহ্মকে চিনিনি দাদামশাই—আ[illegible] চিনেছিলুম সত্যকে, কিন্তু সেতো তোমারি সেই [illegible] স্বরূপ যাঁর আনন্দরূপ আমি ক্ষণেকের জন্য [illegible] একবার উপলব্ধি কর্‌তে পেরেছিলুম। আমি [illegible] অপরাধে মিহিরকে ক্ষমা কর্‌তে পারিনি, সেই এ[illegible] অপরাধের দণ্ড থেকে কি নিজেকে মুক্তি দি[illegible] পারবো? কখনও না। বাবার আদেশ আমার অ[illegible] ঈশ্বরাদেশ। তাই যেদিন তাঁর ইচ্ছায় এ জীব[illegible] সুখসাধে জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম, সেই দিনই যে ক[illegible] প্রতিজ্ঞা নিয়েছি নিজেকে বাঁচাবার জন্যই—[illegible] দাদামশাই, মৃত্যুর পরোয়ানা পুনঃ পুনঃ পাঠ [illegible] আর কি হবে? দুটো ভাল কথা বলো, আমি [illegible] আর তোমাকে পাওয়ার সুখের মধ্যে সকল দুঃখ [illegible] সমুদয় ক্ষতিকে নিমগ্ন করে দিই।"

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

বিদ্যাসাগর।

প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সুনীল অনন্ত গগনমণ্ডলের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে জগতের শোভা ও গাম্ভীর্য্য দেখিয়া ভারতের তপোবনে ঋষি যেদিন মহা বিরাট পুরুষের পরিচয় [illegible]লাভ করিয়াছিলেন এবং পুলকিত হইয়া আনন্দের সহিত প্রাণের স্বাভাবিক ভাষাতে বলিয়া উঠিয়া-ছিলেন, "ওঁ পিতা নোঽসি" সেদিন ভারতের পক্ষে এক গৌরবের দিন! তাহার প্রায় দুই সহস্র বৎসর [illegible]রে যেদিন বোধিদ্রুম তলে দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার অব-তার, পুরুষসিংহ, অলোকসামান্য প্রতিভাশালী শাক্য-মুনি সংসারের অতুল ধনসম্পদ, পদমর্য্যাদা, রাজ্য ঐশ্বর্য্য পদদলন করিয়া কঠোর তপস্যাতে নিযুক্ত হইলেন এবং সফল মনোরথ হইয়া জগতের সমক্ষে প্রেম ও পুণ্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া শান্তিরাজ্যের গূঢ় রহস্য মানবসমাজে প্রচার করিতে করিতে আপ-নার সুদীর্ঘ, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিলেন, সেদিন ভারতবাসীর আর এক গৌরবের দিন। এত প্রাচীন-কালের কথা। আবার বর্ত্তমান যুগে যেদিন ষোড়শ বৎসরের বাঙ্গালী বালক, সত্যধর্ম্ম লাভের জন্য ভীষণ [illegible]বন্যজন্তুসঙ্কুল, সাধারণ মানবের অগম্য, অভ্রভেদী হিমাচল উত্তীর্ণ হইয়া বিদেশে, বন্ধুবান্ধববিহীন অব-[illegible]স্থাতে অবস্থান করিয়াও সতেজে, সগৌরবে একমেবা-দ্বিতীয়মের বিজয় বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আপনার জীবনকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই—যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সত্যরত্ন উদ্ধারের জন্য সভ্যজাতিদিগের শাস্ত্রসিন্ধুসমূহের মধ্যে মগ্ন [illegible]ইয়াছিলেন এবং অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া সেই [illegible]সমূহ জগতের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য আপনার [illegible]বন, যৌবন, শক্তি, সামর্থ্য সকলই সমর্পণ করিয়া-[illegible]লেন এবং অবশেষে ভীষণ সমুদ্র পার হইয়া সুসভ্য [illegible]রাজদিগকে আপনার অসাধারণ জ্ঞান, প্রতিভা ও [illegible]র্থত্যাগে মুগ্ধ করিয়া স্বদেশের সেবা করিতে করিতে [illegible]গৌরবমণ্ডিত সান্ধ্য সূর্য্যের ন্যায় পশ্চিম প্রদেশে চির-দিনের জন্য অস্তমিত হইলেন, সেদিন ভারতের আর একদিন! পুনরায় কয়েক বৎসর পরে যেদিন মেদিনী-পুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান আপনার প্রতিভা, সহিষ্ণুতা ও হৃদয়ের গভীরতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং সমস্ত জীবন অপ্রেম, অনুদারতা ও সামাজিক কঠোর শাসনে নিষ্পেষিতার বিরুদ্ধে একাকী বীর পরাক্রমে দণ্ডায়-মান হইয়া সকলের নিকট হইতে মনুষ্যত্বের জয়মাল্য গ্রহণ করিলেন, সেদিন ভারতের আর এক গৌরবের দিন! যদিও বিধাতার অজ্ঞাত নিয়মানুসারে ভারতের উপর মহাকাল ভৈরবরূপে দণ্ডায়মান হইয়া শাণিত তরবারীর দ্বারা ইহাকে কঠোর ভাবে শাসন করি-তেছে এবং প্রকৃত মনুষ্যের অভ্যুত্থানের পক্ষে নানা প্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান সময়ের সভ্য-জগতের নিকট উপযুক্তরূপে ইহাকে সমাদৃত হইতে দিতেছে না, তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবেই যে, সমস্ত জগতের নিকটে ভারতের যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সে স্থান অধিকার করিবার জন্য এখনও যুগে যুগে বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতিকে গৌরবান্বিত করিতেছেন।

মানবসমাজে সাধারণতঃ জ্ঞান ও প্রেমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ও প্রেমিক মনুষ্য সমাজকে শাসন করিয়া থাকেন। দুইয়ের একত্র মিলন হইলে মণি কাঞ্চনের যোগ হয় এবং তদ্দ্বারা অনেক শুভকার্য্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু এই দুইয়ের মিলন সাধারণতঃ এখানে বড় দেখা যায় না। জ্ঞানী, ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান চিন্তা করিয়া আপনার সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানদৃষ্টির সাহায্যে মানবসমাজের গভীর স্থলে প্রবেশ করেন এবং তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সমাজের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, তাহার ব্যবস্থা প্রদান করেন। এই শ্রেণীর লোক রাজনৈতিক কার্য্য পরিচালনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া থাকেন এবং লোকরক্ষার জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ইঁহারা

মানবজগতের বাহিরের কার্য্যাবলীর শাসনকর্ত্তা। ইঁহাদের সঙ্গে মানবমণ্ডলীর বাহিরের যোগ। ভিতরের যোগ থাকিলেও তাহা বড় অধিক নয়। কিন্তু প্রেমিকদিগের কার্য্য অন্তরের মধ্যে। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণজালের ন্যায় ইঁহাদের জীবন ও কার্য্য উজ্জ্বল নহে। কিন্তু ইঁহারা পূর্ণচন্দ্রের সুস্নিগ্ধ, সুকোমল ও শীতল রশ্মিসমূহের ন্যায় মানব অন্তরকে পুলকিত ও পবিত্র করেন। ইঁহারা মানব অন্তরে রাজত্ব করিয়া থাকেন, সুতরাং ইঁহাদের শাসন প্রীতিকর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। ইঁহারাই জীবন পরিবর্ত্তন করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। নিত্যানন্দ প্রেমিক না হইলে জগাই মাধাইয়ের নাম জগতে অন্যভাবে পরিচিত হইত। মহর্ষি ঈশা প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে তাঁহার প্রচারিত মহাধর্ম্ম মহাকাল সাগরে বুদ্বুদের ন্যায় যে বিলীন হইত না, তাহা কে বলিতে পারে?

বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তিসমূহ শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই জানেন—ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সে সমস্ত কথা আজ উত্থাপন করিব না, করিবার বিশেষ প্রয়োজনও বোধ হইতেছে না। কিন্তু তাঁহার জীবনের সার কথা ও রহস্য, খাঁটি নিখুঁত প্রেম। যে প্রেমের উৎপত্তি ও পরিণতি বাক্যেতে, ইহা সে প্রেম নয়। যে প্রেম বক্তার অগ্নিময়ী ভাষাতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহার বাগাড়ম্বর, হস্তপদ সঞ্চালন ও ঘনঘন করতালিধ্বনিতে শ্রুতিসুখ এবং হৃদয়ের উৎকট আন্দোলনজনিত এক প্রকার বিকৃত আনন্দ উৎপাদন করিয়া পর্য্যবসিত হয়, ইহা সে প্রেম নয়। যে প্রেম ভাবপ্রধান পাঠককে চিরদুঃখিনী আয়েষার দুঃখে মর্ম্মাহত করিয়া শয্যাশায়ী করে, কিন্তু আপনার নিরন্ন, জীর্ণ শীর্ণ, দুঃখী প্রতিবেশীর অনাহারে মৃত্যু যন্ত্রণার চীৎকারে ব্যথিত করিতে পারে না, ইহা সে প্রেম নয়। বিদ্যাসাগরের প্রেম হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই প্রেম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ জানিত না। স্বার্থের দুর্গন্ধ এই প্রেমকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই প্রেম-ধারা এমনি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল যে,

তাঁহার নিজের সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতির গণনা তাঁহা
নিকট উপস্থিত হইতে পারে নাই। পথপার্শ্বে নি
তিত, অপরিচিত, দরিদ্র, ভীষণ বিসূচিকা রোগগ্র
ব্যক্তিকে যে প্রেম আপনার স্কন্ধে তুলিয়া লইতে
পারে, সে প্রেম কি জগতে অতি বিরল নহে?
প্রেমের সুগন্ধ কি স্বর্গের পারিজাত অপেক্ষা অধি
তর সুগন্ধযুক্ত নহে? সে প্রেমের দৃশ্য কি আমাদে
ন্যায় সাধারণ মানবমণ্ডলীর কল্পনার অতীত নহে?

বিদ্যাসাগরের বাল্য-জীবন দারিদ্র্যের মধ্যে অতি
বাহিত হইয়াছিল। কতকাল পর্য্যন্ত তিনি উদর পূ
করিয়া আহার করিতে পান নাই। প্রায়ই অর্দ্ধাশ
কখন বা অনশনে ভবিষ্যতের মনুষ্যরত্নকে বাল
জীবনের কত সময় কাটাইতে হইয়াছে! তাহার উপ
পিতার কঠোর শাসন! দশ বার বৎসরের বাল
কোথায় স্নেহময়ী মাতার অঞ্চলের নিধি হইয়া তাঁহা
ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া রাত্রি যাপন করিবে, না, ঐ
বয়সে মাতার স্নেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া বিদেশে অপ
চিত ব্যক্তির দয়ার দানের উপর নির্ভর করিয়া এক
ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পিতার নিদারুণ শাসন ও তিরস্কারে
মধ্যে অবস্থান করিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত পাঠ অভ্যা
করিতে হইয়াছে! যিনি ভবিষ্যতে আত্মসম্মান রক্ষা
জন্য বীরের ন্যায় অকুতোভয়ে ও অসীম সাহসে উচ্চ
এবং বিপুল অর্থকরী কর্ম্মকে পদাঘাতে দূরে ঠেলি
ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইবেন এবং এই চিরলাঞ্ছি
পদদলিত বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে আপনার উজ্জ্ব
গৌরবমণ্ডিত দৃষ্টান্ত রাখিয়া তাহাদিগকে মানবত্ব
পথে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবেন, তিনি য
বাল্যকালে ঐ প্রকার অবস্থায় লোমহর্ষণকারী ক
রতার মধ্যে মানুষ না হইতেন তাহা হইলে বুঝি
বিধাতার অভিপ্রায় তাঁহার জীবন দ্বারা পূর্ণ হই
না। এই জন্যই উক্ত প্রকার ব্যবস্থার প্রয়োজন হই
ছিল! যাহাহউক দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, পিতার ক
শাসন অথবা কলিকাতার দুর্গন্ধময় গলির মধ্যে অব
বায়ু ও আলোকবর্জ্জিত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে
করিয়া জীবন ধারণ ইঁহার কোনও ক্ষতি ক
পারে নাই। বরং ইঁহার হৃদয়স্থিত সাহস,

সহিষ্ণুতা ও বীরত্বকে জাগ্রত করিয়া ইঁহাকে জীবন-পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবার পক্ষেই সহায়তা করিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের জীবনে অন্যান্য মহাপুরুষদিগের ন্যায় একটি রহস্য এই দেখা যায় যে তাঁহার জননী ভগবতী দেবীর সরলতা, দৃঢ়তা ও হৃদয়ের গভীরতার উত্তরাধিকারী হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর জননীর দয়া, জাতি ও বর্ণের ভেদ স্বীকার করে নাই। চিরাগত প্রথার স্থান তাঁহার হৃদয় স্বীকার করিতে পারে নাই। সেই জন্য হিন্দু সমাজের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াও নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত একত্রে বসিয়া ভোজন করিতে তিনি সঙ্কুচিত হয়েন নাই। তাঁহার ভিতরে এমন একটি স্বাভাবিক, সবল, সরল ভাব ছিল, যাহা সংস্কার প্রথা বা কৃত্রিম সামাজিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হ্যারিসন সাহেব যখন বীরসিংহে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং যতক্ষণ তিনি আহার করিয়াছিলেন, ততক্ষণ নিকটে বসিয়া দেশের সম্বন্ধে নানা প্রকার আলাপ করিয়াছিলেন। অবশ্য হ্যারিসন সাহেবের নিকট এটি অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রতীয়মান হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনিও তাঁহাকে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। কৃত্রিম ভেদ্ বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক বন্ধনের শৃঙ্খলকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়া হৃদয় নিহিত বিশ্ব প্রেমের প্রভাবে পরিচালিত হইয়া তিনি এই সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সতেজ প্রেম বিদ্যাসাগরের মধ্যে পূর্ণ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই জন্য তাঁহার মধ্যে যেমন এক দিকে পুরুষকার বীরত্ব প্রভৃতি পুরুযোচিত গুণসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য দিকে তেমনি পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সমূহের বিকাশও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত এবং যখন তিনি আপনার গ্রামে টোল স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রের ভরণ পোষণ ও অধ্যয়নের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত মতবিরোধ উপস্থিত হইল। তিনি ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা আর সম্মানের কার্য্য বলিয়া মনে করিলেন না। তখন নানা প্রকার ব্যয়ভার নিজ স্কন্ধে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ সাংসারিক জীবনে আসন্ন দারিদ্র্য স্বীকার করিয়া, কেবল আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ঐ কর্ম্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। ভবিষ্যতের ক্ষুদ্র লাভ লোকসানের নিকট যাহারা আত্ম বলিদান করে, তাহারা আর যাহাই হউক না কেন, মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য, কারণ ক্ষুদ্রতা ও মনুষ্যত্ব কখন একত্রে বাস করিতে পারে না। বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবার সার্থকতা এই স্থানে, যে তিনি আত্মসম্মান জ্ঞানের জলন্ত বর্ত্তিকা দৃঢ় হস্তে ধারণ করিয়া সমস্ত বঙ্গবাসীকে গৌরবের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। এই সাহস ও পরাক্রম লইয়া তিনি আজীবন সংসার পথে বিচরণ করিয়াছিলেন। জাতীয় ভাবের প্রতি তাঁহার যে সম্মান ও প্রেম, তাহাও এইরূপ দৃঢ়তা ও কাঠিন্যের সহিত মিশ্রিত ছিল। থানের ধুতি চাদর পরিহিত বিদ্যাসাগর ঠনঠনিয়ার স্বনামখ্যাত চটি জুতা পায় দিয়া সর্ব্বত্র গমন করিতে কোন দিন সঙ্কুচিত হয়েন নাই। তাঁহার নিকটে এই পোষাক বর্ত্তমান বাঙ্গালী বাবুর বহুমূল্য সাহেবী পোষাক অপেক্ষা অধিকতর আদরের বস্তু ছিল।

স্বাভাবিক, সহজ ও সরল যাহা কিছু, তাহারই রাজত্ব বিদ্যাসাগরের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কৃত্রিমতার ধার দিয়া তিনি কখন গমন করেন নাই। আহার পরিচ্ছদ ও ব্যবহারে তিনি একেবারে খাঁটি সহজ ও সরল লোক ছিলেন। সেই জন্য কখন কখন তাঁহার মুখ হইতে সভ্য সমাজের নিন্দনীয় ভাষা প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহাতে তাঁহার হৃদয় কখন কলঙ্কিত বা কঠোর হয় নাই। গোপনে অন্তরের মধ্যে বিষ রাখিয়া, বাহিরে সভ্যতার পরিচ্ছদে শরীর আবৃত করিয়া, সুমিষ্ট বাক্যে লোককে আপ্যায়িত করা অপেক্ষা অন্তরে অমৃত রাখিয়া অসভ্যোচিত

বস্ত্র পরিধান করিয়া, একটু তিক্ত বাক্য যদি উচ্চারণ করা যায় তবে কি ইহা সহস্র গুণে ভাল নহে? বিদ্যাসাগর কৃত্রিমতা ও কপটতা একেবারে বুঝিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক নির্ম্মল ও স্বচ্ছ জ্ঞানে যাহা তিনি ভাল বুঝিতেন, তাহা তিনি চিরকালই করিয়া গিয়াছেন। তোমার ভাল মন্দ লাগা বা বলার উপর তাঁহার কোন কার্য্য নির্ভর করিত না। এই মহৎ গুণ ছিল বলিয়া তিনি বিধবার অশ্রুজল মোচন করিবার জন্য একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনে এইটি সর্ব্ব প্রধান কীর্ত্তি। ইহার জন্য তিনি সহৃদয় মানব সমাজের নিকট চিরপূজ্য হইয়া থাকিবেন। মানুষ হইলেই যেমন সকল সময়ে তাহার হৃদয় নাও থাকিতে পারে, তেমনি মানব সমাজ হইলেই যে সকল সময়ে তাহার মধ্যে প্রকৃত হৃদয়ের কার্য্য বর্ত্তমান থাকিবে, তা নাও হইতে পারে। স্বার্থপরতা মানব মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলে যেমন তাহার নিকট অন্যের দুঃখ ক্লেশ প্রতিভাত হয় না, তেমনি যখন এই ব্যাধি সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সমাজের অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি বিশেষের দুঃখ কষ্ট দৃষ্টির মধ্যে আসেই না। এতদ্ব্যতীত সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের এমনি প্রবল শক্তি যে মানুষ যখন বহুকাল হইতে তাহাদের অধীন হইয়া বাস করে, তখন বিশ্বব্যাপিনী মঙ্গলময়ী শক্তিকে আপনার মধ্যে অন্তর্নিহিত দেখিয়াও তাহাকে পদে পদে বাধা দেয় এবং পরিণামে তাহার কুফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে কোন কোন জীবনে ইহার ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লোকেরা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ নামে জগতের ইতিহাসে অভিহিত হইয়া থাকেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবীর নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণ গৃহের বর্ষীয়সী গৃহিনী হইলেও তাঁহার হৃদয় এমনি সংস্কারের প্রবল প্রভাবকে অতিক্রম করিয়াছিল যে যাহা মঙ্গল ও শ্রেয়ঃ তাহাকে তিনি সহজেই ধরিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে বলিলেন "তুই এত শাস্ত্র পাঠ করলি, বিধবার কোন উপায় দেখতে পেলি না।" কি শুভক্ষণে তিনি এই কয়টি কথা উচ্চারণ করি- ছিলেন, তাই আজ দেখিতেছি বঙ্গের শিক্ষিত সম্ভ্রা- ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আপন আপন বিধ- কন্যা অথবা ভগ্নীর জীবনব্যাপী দুঃখের প্রজ্বলি- অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে- মাতার আদেশে মাতৃভক্ত পুত্র শাস্ত্র সিন্ধু ম- করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সন্তান মাতার আদে- প্রতিপালনের জন্য দামোদর নদের প্রবল তরঙ্গ- ভীষণ বন্যাকে অগ্রাহ্য করিয়া সন্তরণ দ্বারা অ- জলরাশি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি মাতার ম- বেদনা ঘুচাইবার জন্য যে এইরূপ করিয়া পরি- করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হই- কিছুই নাই। বহু দিনের সামাজিক প্রথা অ- সংস্কারের বাঁধ তাঁহার উৎসাহের প্রবল স্রোত- প্রতিহত করিতে পারেন নাই। তিনি যেমন সরল সহজ মানুষ ছিলেন তেমনি তিনি সকল ঘটনাও- স্থাকে সহজ ভাবে দেখিতে পাইতেন। মানুষ বি- বুদ্ধির সাহায্যে বস্তু সকলকে দেখিতে চাহিলে দেখা হয় না। তাহাতে তত্ত্বের প্রকৃত দর্শন হয় সুতরাং তত্ত্বসমূহকে বিকৃত ভাবে দর্শন করার নিজের অনিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য জগতে সরল মানুষ হওয়ার এত প্রয়োজন। অশীতিবর্ষ- বৃদ্ধের যতবার ইচ্ছা ততবার দারপরিগ্রহের প্রয়ো- ও দাবী আছে এবং সমাজও সে দাবী স্বীকার ক- তাহার পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দেন, কিন্তু বর্ষীয়া বালিকার পতি বিয়োগ হইলে, তাহার সকল প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্যের বিধান আমাদের সমাজ আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন ক- সমাজের প্রকৃত অবস্থা বিদ্যাসাগর আপনার সূক্ষ্ম- দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বাস্তব যাহা, তিনি দেখিয়াছিলেন এবং সেই জন্য কল্পনার সৃষ্টি করিয়া কেবল স্বার্থপর ভাবুকতার মধ্যে হইয়া প্রকৃত ঘটনা সমূহকে অস্বীকার করা অ- বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা একাদশীর উপবাস করিয়া পিপাসাতে হইয়া "একটু জল একটু জল" বলিতে বলিতে

বিদীর্ণ করিতেছে দেখিয়া কুপ্রথার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ পিতা সেই নিরাশ্রয়া বালিকাকে কঠিন পাষাণের মত নির্দ্দয় হইয়া একটা নির্জ্জন কুটীরে আবদ্ধ করিয়া রাখিল, আর এদিকে বালিকার বীরত্ব, ধর্ম্মপ্রাণতা ও সতীত্বের প্রশংসা ধ্বনিতে গগন মেদিনী পূর্ণ করিয়া স্বদেশের গৌরব জগতের সমক্ষে প্রচার করিল, এ প্রকার স্বদেশপ্রিয়তা বা জাতীয় গৌরবের অভিমানকে বিদ্যাসাগর ঘৃণা করিতেন। বিদ্যাসাগরের পরিশ্রম সফল হইল, তাঁহার হৃদয়ের গভীরতা সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই সকল নিরাশ্রয়া, সামাজিক কঠোর শাসনে নিষ্পেষিতা অবলাগণের জীবনব্যাপী ক্লেশ নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিল। তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া এই অসহায়া রমণীগণের দুরবস্থা স্মরণ করাইয়া যাহা বলিতেছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চির শুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন। * * * * * * * * * * তোমার প্রাণতুল্যা কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; * * * * * * ধর্ম্মলোপ ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জা ভয়ে, * * * স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলে স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ—এ সকল নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে, সংসার তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ!"

বিদ্যাসাগর খাঁটি সহজ ও সরল মানুষ ছিলেন। তিনি সহজ দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পাইতেন সুদূরদর্শী, মহাজ্ঞানী, বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহা দেখিতে পাইতেন না! তাঁহারা বিদ্যাসাগরের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের অভিলষিত ফল লাভে নিরাশ হইয়া অবশেষে কুযুক্তি ও কুভাষার তীক্ষ্ণ তরবারির সাহায্য লইয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ প্রেমের দুর্ভেদ্য কবচে সুরক্ষিত হইয়া, দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার বলে বলীয়ান্ হইয়া একাকী আপনার কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার জীবনের এই মহাব্রত উদ্‌যাপনে কেহ তাঁহাকে সাহায্য করে নাই। যদিও দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের স্রোত তাঁহার বিরুদ্ধে ভীষণ ভাবে উত্থিত হইয়াছিল, তথাপি "গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীন্ কঠিন শক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস শাখা পল্লবসম্পন্ন সরল মহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে তেম্‌নি এই ব্রাহ্মণ তনয় জন্ম-দারিদ্র্য এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্য্যাপ্ত বল বুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্ব্ব সম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন" এবং অবশেষে আপনার মহৎ জীবনের কার্য্য সমাপন করিয়া, সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে ও এই পুণ্যভূমি ভারত ক্ষেত্রকে গৌরবান্বিত করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিলেন!

শ্রীভবসিন্ধু দত্ত।

ধর্ম্মের জয়।

৪

গঙ্গাধর বাবুর মৃত্যুর পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আনন্দময়ী আপনার দুঃখ ব্যথা ভুলিয়াছেন, তাঁহার ইহলোকের যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে। স্বামীর স্বর্গ গমনের পর তিনি এক বৎসর মাত্র ইহজগতের দুঃখ সহিয়াছিলেন। তাহার পর মৃত্যুর অমৃত স্পর্শ তাঁহার সব শোক দুঃখ শান্ত হইয়াছে। অমরধামে পতির আত্মার সহিত তাঁহার আত্মার মিলন হইয়াছে।

নির্ম্মলচন্দ্র কলিকাতায় চাকরী পাইয়া, সেই স্থানেই বাস করিতেছেন। সুরেশচন্দ্র সেই স্কুলেই কার্য্য করিতেছেন, তদ্ভিন্ন সকালে এক স্থানে ও সন্ধ্যায় অন্য স্থানে শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহার অতিরিক্ত পরিশ্রম হইয়া শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ হইতেছে, তবু তিনি সুশীলাকে এ কথা বলেন না। তাঁহাদের এখন তিন পুত্র, এক কন্যা। বড় পুত্র অজিত দশ বৎসরের, মধ্যম ললিত নয় বৎসরের, কন্যা ইন্দুমতী সাত বৎসরের ও কনিষ্ঠ পুত্র সুহৃদ পঞ্চম বৎসরের। সুশীলা সংসারের কাজ কর্ম্মে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাঁহার অর্থবল নাই যে, তিনি দাসী চাকরের দ্বারা সংসারের কার্য্য করাইতে পারেন। একজন মাত্র পরিচারিকা আছে, সে শুধু বাসন কয়খানি মাজিয়া দেয় ও জল আনিয়া দেয়, যখন বাজারে যায়, সুশীলাকেই সব করিতে হয়।

অজিত ও ললিত তাহাদের পিতা যে স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করেন, সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। সুহৃদ বাটীতে মাতার নিকট ক, খ, শিখিতেছে। ইন্দুমতী বালিকা বিদ্যালয়ে যাইতেছে। সুশীলার সমস্ত সন্তানদিগের মধ্যে ইন্দুমতী ক্ষীণাঙ্গী ও স্বাভাবিক বড় দুর্ব্বল ছিল। সুশীলার পুত্র কন্যার জগতের ঐশ্বর্য্য অতি অল্পই ছিল, কিন্তু তাহারা ঈশ্বর দত্ত সৌন্দর্য্যে বিভূষিত ছিল, তাহাদের মুখের সৌন্দর্য্য অতিশয় লাবণ্যময় ছিল। সে মুখগুলির নম্র শান্ত ভাব দেখিয়া ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না। মাতার স্বভাবের গুণে, তাহাদের স্বভাব অতি মধুর ছিল। তাহারা সকলেই মাতার বাধ্য ছিল সর্ব্বদা মায়ের কাজে সাহায্য করিতে ব্যস্ত হইত।

আজ ইন্দুর জন্মদিন। সুশীলা স্বহস্তে তা[...] জন্য দু একটি মিষ্টান্ন ও পরমান্ন রন্ধন করিয়াছে[...] বালকদিগকে পরিষ্কার ধৌত বস্ত্র পরিধান ক[...] দিয়াছেন ও ইন্দুকে একখানি নূতন বস্ত্র পর[...] কপালে একটি টিপ দিয়া দিয়াছেন। তাহার [...] দু গাছি সরু বালা, গলায় একগাছি ফুলের মা[...] পরিয়াছে। তাহাতেই তাহাকে কত সুন্দর দে[...]তেছে। সকাল বেলা হইতে বালকেরা ও [...] সাধ্যমত মায়ের কার্য্যের সাহায্য করিয়াছে। [...] বৈকালেই তাহাদের আহারাদি শেষ করাই[...] তাহারা গৃহের বারান্দায় বসিয়া খেলিতে লাগি[...] এমন সময় সুরেশচন্দ্র সন্ধ্যার শিক্ষকতা কার্য্য [...] করিয়া গৃহে আসিলেন। তাঁহার মুখ অতিশয় [...] দেখাইতেছিল। সুশীলা স্বামীর নিকট আ[...] জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার শরীর কি আজ ভাল নাই? [...] অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?"

সুরেশচন্দ্র ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,

"না বিশেষ কিছু হয় নাই, বড় মাথা [...] করিতেছিল," এই বলিয়া নিকটস্থ একখানি আ[...] বসিয়া পড়িলেন। তাহার পরে সম্মুখে পুত্র কন্যা[...] দেখিয়া বলিলেন—

"আজ ইন্দুর জন্মদিন বুঝি? আয় ইন্দু, [...] আয়।"

ইন্দু হাসিতে হাসিতে আসিয়া পিতার কণ্ঠ [...]ইয়া ধরিল, সুরেশচন্দ্র তাহাকে চুম্বন করিয়া মা[...] করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "বেঁচে থাক, ভাল [...] হও।"

তারপর ছেলেদের এবং ইন্দুর সহিত কত গল্প করিলেন।

সুশীলা স্বামীর অন্ন ব্যঞ্জন সাজাইয়া আহার করিতে ডাকিলেন।

রাত্রে পুত্র কন্যা নিদ্রিত হইলে সুরেশ সুশীলাকে ডাকিয়া বলিলেন—

"সুশীলা একটা কথা তোমায় বলি শোন।"

সুশীলা স্বামীর সেই গম্ভীর কণ্ঠে চমকিত হইয়া বলিলেন—

"কি কথা? আজ তোমার মুখ দেখে আমার কেবল মনে হচ্ছে, কোনও অশুভ কথা হবে, জানিবার জন্য যেন ব্যস্ত হয়ে রয়েছি।"

সুরেশ সুশীলার দুই হস্ত নিজের হস্তে ধরিয়া নিকটে টানিয়া বলিলেন—

"সুশীলা আমি যে কেন তোমায় দুঃখ দিবার জন্য বিবাহ করিয়াছিলাম, তাই কেবল ভাবছি। তোমাদের ত কিছুই উপায় করি নাই, ছেলেদেরও মানুষ করিবার এখনো ঢের দেরি। যদি এর মধ্যে আমি যাই—"

সুশীলা স্বামীর মুখে হাত দিয়া বলিলেন—

"ও কি কথা, এই কথা বুঝি শোনবার জন্য ডাকা হ'ল, ও সব কথা আমি শুনব না।"

সুরেশ—"তা নয়, আজ আমার শরীর বড়ই কেমন করিতেছে, আজ আমি হঠাৎ স্কুলে অজ্ঞান হয়ে গিয়াছিলাম—"

সুশীলা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "এতক্ষণ আমায় বলনি, সেকি? কেন অজ্ঞান হয়েছিলে? মাথায় খুব রোদ লেগেছিল বুঝি?"

সুরেশ—"তা ত জানি না, সেই পর্য্যন্ত আমার কেবল মনে হচ্ছে, হঠাৎ যদি আমার কিছু হয়, তুমি ছেলেদের নিয়ে কি কর্ব্বে, কোথায় দাঁড়াবে, কে তোমাদের ভরণ পোষণের ভার নেবে। আমার যা আয় তা থেকে ত কিছুই প্রায় বাঁচে না। আমি কি শেষে তোমায় পথে দাঁড় করিয়ে যাব? এখন উপায় কি সুশীলা, তাই তোমায় জিজ্ঞাসা কচ্ছি। আমার সোণার পুতুলের মত ছেলে মেয়েদের কি দশা হবে?" বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া গেল।

চক্ষুর জলে সুশীলার মুখ ভাসিয়া গেল, তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া বলিলেন, "ছি, অমন কথা কেন ভাবছ? জগদীশ্বর আমায় যখন এত সুখী করেছেন, তোমার মত স্বামী দিয়েছেন, আমি ত আর কিছু চাহি না। পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্যে আমাদের কাজ নাই, তুমি কেন ভয় পাচ্ছ, তুমিই ছেলেদের মানুষ করে যাবে। দয়াময় জগদীশ্বর তিনি দয়া কর্ব্বেন।"

সুশীলার বাক্যে সুরেশচন্দ্রের হতাশাপূর্ণ মনে একটু যেন আশার সঞ্চার হইল। আশা বিহনে কে বাঁচিতে পারে? আবার দুইজনে কতক্ষণ বসিয়া কত আশার কথা কহিলেন। অবশেষে সুশীলার সহিত পরামর্শ করিয়া সুরেশচন্দ্র তাহার পরদিন কোনও জীবন বীমা কোম্পানীর নিকট জীবন বীমা করিবেন, এই স্থির হইল।

সে রাত্রে আর তাঁহাদের সুনিদ্রা হইল না স্বামী স্ত্রী নানা ভাবনায় রাত্রি যাপন করিলেন।

৫

সুরেশচন্দ্র তাহার পরদিন এক জীবন বীমা কোম্পানীর নিকট জীবন বীমা করিবেন স্থির করিয়া সেই কোম্পানীর নিয়োজিত ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষিত হইলেন। ডাক্তার তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন। যখন ফুসফুস পরীক্ষা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখে নানা প্রকার অসন্তোষের চিহ্ন দেখা গেল। পরীক্ষা শেষ করিয়া তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—

"আমি আপনাকে ভাল সার্টিফিকেট দিতে পারিলাম না।"

সুরেশচন্দ্রের হৃদয় কম্পিত হইল, বলিলেন—

"কি কারণে পারিলেন না, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন কি?"

ডাক্তার—"আপনার ফুসফুসে দোষ জন্মিয়াছে, আপনার জীবন বীমা হওয়া একেবারে অসম্ভব।"

সুরেশচন্দ্র হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার

মুখের সেই অসহায় ভাব দেখিয়া ডাক্তার দয়ার্দ্র চিত্তে বলিলেন—

“উপস্থিত কোনও ভয় নাই। তবে আপনার বায়ু পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। সমুদ্রের নিকট-বর্ত্তী স্থানে বাস করিলে আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, নতুবা এই স্থানে থাকিলে আপনি নিশ্চয়ই শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পড়িবেন। তখন আর আরোগ্যের আশা থাকিবে না। আপনার জন্মস্থান কোথায়? বাল্যকালে কোথায় থাকিতেন?”

সুরেশচন্দ্র—“বোম্বাই প্রদেশে সমুদ্র তীরেই আমার বাল্য-জীবন কাটিয়াছে। আমি আজ কয়েক বৎসর মাত্র বঙ্গদেশে আসিয়াছি।”

ডাক্তার—“আপনি যত শীঘ্র সম্ভব বোম্বাই অথবা সমুদ্রকূলবর্ত্তী কোনও স্থানে গমন করিবেন। আপনার পক্ষে বায়ু পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক।”

সুরেশচন্দ্র ডাক্তারকে অভিবাদন করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। সুরেশচন্দ্র যখন পথে চলিতেছিলেন, শত চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ছিন্ন হইতে লাগিল। এই সংসার—এই স্নেহ মমতা পূর্ণ সংসার আজ তাঁহার কি মধুর লাগিতেছে। সুশীলার সেই শান্ত নম্র মুখের ছবি, সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা, একাগ্র যত্ন। সন্তানদের সেই নির্ম্মল স্নেহের মুখ গুলি মানসপটে জাগ্রত হইয়া উঠিল। যদি শীঘ্রই জীবন লীলা শেষ হয়, সুশীলার ও সন্তানদিগের কি দশা হইবে, ভাবিতে গেলে সুরেশচন্দ্রের মস্তিষ্কে যেন বিপ্লব উপস্থিত হয়। সুরেশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন, ও দেখিলেন সুশীলা উৎসুক নেত্রে তাঁহার পথ চাহিয়া, দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি যাইবা মাত্র সুশীলা তাঁহার যাতনাক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া বুঝিলেন সংবাদ শুভ নয়। উভয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সুশীলা কোন প্রশ্ন না করিয়া স্বামীর নিত্য ব্যবহারের বস্ত্রাদি আনিয়া দিলেন। সুরেশচন্দ্র তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—

“সুশীলা জীবন বীমা হইল না।”

সুশীলা কম্পিত হৃদয়ে বলিলেন “কেন?”

সুরেশচন্দ্র “ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে আমার ফুসফুসে দোষ জন্মিয়াছে, সেই জন্য আমা[র] জীবন বীমা হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন ইহাও বলিয়া[…] ছেন যে এস্থানে থাকিলে আমার পীড়া শীঘ্রই বৃদ্ধি পাইবে, আমায় শীঘ্রই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সমু[দ্র] তীরবর্ত্তী কোনও স্থানে যাইতে বলিয়াছেন।”

সুশীলা সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহা[র] হৃদয়ে যেন তুমুল ঝটিকা বহিয়া গেল। সম্মুখে বি[…] ভীষণ পরীক্ষা! জগদীশ্বর কি করিয়া তাঁহার স্বামী[র] জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিবেন, সেই কথাই শু[…] মনে হইল। এই ভাবে মুহূর্ত্ত মাত্র থাকিয়া প্রকৃতি[স্থ] হইয়া সুশীলা বলিলেন—

“তা তোমার অত ভাবনা কেন? কাল আমাদে[র] ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়ে দেখাও। কি বলেন জে[…] তোমার একটু বায়ু পরিবর্ত্তন করতেই হবে।”

সুরেশচন্দ্র ম্লান ভাবে হাসিয়া বলিলেন—

“বায়ু পরিবর্ত্তন মুখের কথা নহে, কোথায় যাচ্[…] বল? এক বোম্বাই, তা সেখানে এখন মামা নাই[…] শুনেছি আজ কয়েক বৎসর হল তাঁর মৃত্যু হয়েছে[…] তাঁর অত সম্পত্তি, তবু তিনি যে আমায় কেন এ[…] বার মনে কল্লেন না তাত বুঝলাম না। আমার বি[…] অপরাধ? আমার মামা নিঃসন্তান ছিলেন, মা[…] মাসীমা দুই বোন। মাসীমা ও অল্প বয়সেই ইহলো[ক] থেকে চলে যান। নীরজ দিদি আমার চেয়ে দুই[…] বছরের বড়। আমরা দুই ভাই বোনেই মামা[র] বাড়ীতে থাকিতাম। নীরজ দিদির বিবাহ হয়ে গেলে[…] তিনি শ্বশুর বাড়ীই বেশী থাকিতেন, তারপর তাঁ[র] স্বামী বিলেত গিয়া ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছেন, তি[নি] খুব সাহেব। নীরজ দিদি কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর ঘ[রে] গিয়ে যেন কেমন হয়ে গেলেন, কই আরত আমা[র] খোঁজ খবরও লন নাই। আমি এদেশে এসে ক[…] চিঠি দিয়েছিলাম, জবাব ও দেন নাই। এমন কি[…] মামার মৃত্যু সংবাদও দেন নাই। যাই হো[ক] তিনিত আমার দিদি হন, আমরা বোম্বাই যাই, কি[…] বল? বোম্বাই সমুদ্রের ধারে হবে। আর তার[…] সুবিধে হলে নীরজ দিদির স্বামী নিখিল বাবু আমা[র] কিছু চাকরীরও সুবিধা করে দিবেন।”

সুশীলা—“তাই ভাল। আমাদের সাধ্য মত আমরা গুছিয়ে নি। তুমি আগে ৬ মাসের ছুটী নাও। এই ৬ মাসের মধ্যে সেখানে নিশ্চয় একটা চাকরীর ব্যবস্থা হবে, না হয় আবার ফিরে আসব। বোম্বাই তোমার জন্মভূমির মত, কিন্তু এই বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে যেতে আমার কি কষ্ট হবে, কিন্তু সে সব কথা ভাববার এখন সময় নাই। তোমার শরীর আগে তারপর অন্য কথা। তুমি কালই ছুটীর জন্য দরখাস্ত কল্লো ও আমাদের ঠিক করে নিতে কত দেরি হবে?”

সুরেশচন্দ্র—“টাকা কড়ির কি হবে সুশীলা? আমাদের সেভিংস ব্যাঙ্কে কতই বা আছে, সব শুদ্ধ পাঁচশত টাকা। তাতে কি হবে? যদি শীঘ্র চাকরী না হয়, যদি অসুখে পড়ি তা হলে কি হবে?

সুশীলা—“আমারও গহনা আছে তাই বা কোন সাত শ না হবে, আর তোমার নগদ টাকা কত চাই?”

সুরেশচন্দ্র—“তোমার গহনা গুলো এখনি বিক্রয় করতে হবে? সুশীলা আমি তোমাদের কি করলাম? আমার হাতে না পড়ে তুমি যদি অন্যের হাতে পড়তে কত সুখী হতে।

সুশীলা—“কি যে সব কথা বল তা বুঝিনা। যখনি তোমার বিপদ বা অসুখ হবে, তখনি আমার বুঝি অন্যের হাতে পড়িলে সুখ হত? আমার মত সুখী কয় জন হয়েছে? কে এমন স্বামীর সুখে সৌভাগ্যবতী হয়েছে?”

সুরেশ হাসিয়া বলিলেন—“তুমি ভাগ্যবতী তাহলে। তারপর বাড়ীত বাবার সময় থেকে বন্দক আছে, ভেবেছিলাম ক্রমে ক্রমে মুক্ত কর্ব। তা আর কই হল, এদিকে সুদও বেড়ে চলেছে, আমার মতে বিক্রয় করে ফেলাই ভাল। বাড়ীটাত তোমার মা তোমায় দিয়ে গেছেন। সুদ কোথা থেকে দেব, তা না [হ]লে রাখতাম।”

সুশীলার মন একটু কেমন করিয়া উঠিল, যদিও সামান্য গৃহ, কয়েক শত টাকা মাত্র মূল্য, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সেই গৃহে তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ জড়িত রহিয়াছে। ধীরে ধীরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীলা বলিলেন—

“যাতে ভাল হয় তাই কর, তোমার শরীর ভাল থাকলে আমার আবার সব হবে।”

সুরেশচন্দ্র ম্লান ভাবে বলিলেন—

“মামা যদি আমায় সামান্য ও কিছু দিয়ে যেতেন, তাহলে আমায় এত ভাবতে হত না। আমার অপরাধ কিছুই ছিল না তবু আমায় তিনি ক্রোধের বশে জ্ঞান হারা হয়ে বাড়ী থেকে চলে যেতে বলেন। আমার অপরাধ যে আমি এক জন নিগৃহীত ব্যক্তির প্রতি একটু দয়া দেখিয়েছিলাম। তাঁর ব্যবসা বাণিজ্যে আমার মন লাগত না, সর্ব্বদা লেখা পড়া করতে ভালবাসতাম, সেই জন্য সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকতেন। অবশেষে এক দিন আমার স্বর্গীয় পিতাকে লক্ষ্য করে অপমান সূচক কথা বলায় আমি বলেছিলাম ‘আমি আর সহ্য করিতে:পারি না।’ তাই শুনে বললেন ‘এখনি আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাও নতুবা চাকর দিয়ে তাড়িয়ে দেব!’ সেই কথা শুনে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করলাম। কলিকাতায় এসে এক বন্ধুর নিকট ছিলাম পরে সেই স্থান থেকে চাকরী নিয়ে এখানে আসি। তারপর কি হয়েছে তাহাত জান, সুশীলা।”

সুশীলা নতমুখে বসিয়া রহিলেন। সুরেশচন্দ্র সাদরে সুশীলার হস্ত ধরিয়া বলিলেন—

“তারপর যাহা হয়েছে এমন কয় জনের ভাগ্যে হয়? আমি পিতা মাতার স্নেহে আশৈশব বঞ্চিত, জগদীশ্বর আমায় পিতৃ মাতৃ স্নেহ দিয়েছিলেন। তারপর জগতে যা অমূল্য, আমায় সেই অমূল্য স্ত্রী রত্ন দিয়েছেন। অমন সুসন্তান দিয়েছেন এমন কার ভাগ্যে হয়?” সহসা পার্শ্বের গৃহ হইতে ইন্দু ছুটিয়া আসিয়া পিতার কণ্ঠলগ্না হইয়া বলিল—

“বাবা, বাবা দেখ, দাদা কেমন ছবি এঁকেছে।” অজিত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল, লজ্জায় অস্থির হইয়া বলিল—

“না বাবা ভাল হয় নি।” ললিত সুহৃদ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করিল। পিতা পুত্র কন্যাদের

মুখের দিকে চাহিলেন, অজ্ঞানিত বিষাদে হৃদয় পূর্ণ হইল। চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়া লই-লেন। সুশীলা স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়াছিলেন, এই ভাবান্তরে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

৬

মিঃ নিখিলনাথ ব্যানার্জ্জি বোম্বাই নগরের এক জন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। তাঁহার চাল চলন সমস্ত সাহেবদের মত হইয়াছে। অর্থাৎ ইংরাজদিগের বাহিরের চাল চলন টুকু শিক্ষা করিয়া ইংরাজী কায়-দায় অভ্যস্থ হইয়াছেন। পুত্র কন্যাদের ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। তাহারা একেবারে বাঙ্গলা ভাষা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ভাই বোনে বা বাপ মায়ের সঙ্গে অধিকাংশ সময়েই ইংরাজী ভাষায় কথাবার্ত্তা হয়। নীরজা নিখিলনাথের স্ত্রী। তাঁহার বাল্য কাল সুখৈশ্বর্য্যেই কাটিয়াছে। বিবা-হের পরই স্বামীর নিকট আসিয়া দিনকত অল্প দুঃখ কষ্টে কাটাইয়া এখন সুখের সাগরেই ভাসিতেছেন। তাঁহার চারিটি পুত্র, ও চারিটি কন্যা। পুত্র কন্যাদের সমস্ত ভার দাসী চাকরের হস্তে। দুই পুত্রকে নিখিল-নাথ বিলাত পাঠাইয়াছেন, তাহারা এদেশে এণ্ট্রান্স পাস দিয়াই ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গিয়াছে। নিখিলনাথের সে জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হয়। তদ্ভিন্ন সর্ব্বদাই তিনি তাহাদের ঋণ মুক্ত করিতে গিয়া উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিলাতে তাহারা নবাবের মত ব্যয় করিয়া চলিয়াছে, পিতার প্রতি একটুকু ও দৃক-পাত নাই। বড় দুইটি কন্যা বিবাহিতা হইয়া স্বামীর নিকট স্থানান্তরে বাস করিতেছে। গৃহে এখন দুইটি পুত্র, সলিলকুমার ও অনিলকুমার এক জন চতুর্দ্দশ বর্ষীয়, অন্যটি দ্বাদশ বর্ষীয় বালক। কন্যা দুটির নাম চপলা ও রমলা; তাহারা দশম ও অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা।

প্রাতঃকাল। মিঃ ও মিসেস্ ব্যানার্জী চা-পান করিবার জন্য ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটি সাহেবী ফ্যাসানে সজ্জিত। মাঝখানে বৃহৎ টেবিল, তাহার চারি পাশে সুন্দর বার্ণিস করা চেয়ারগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। এক পার্শ্বে সাইড বোর্ড তাহার উপর নানা আকৃতির নানাবিধ কাচ ও রৌপ্যপাত্র সজ্জিত রহিয়াছে, অপর পার্শ্বে আর এক টেবিলে ডিস, প্লেট, নানা প্রকার জ্যাম ও চাটনীর শিশি রহি-য়াছে। চায়ের টেবিল সুসজ্জিত, মাখন, রুটি, ডিম, কলা ও অন্যান্য ফল রহিয়াছে। মিঃ ও মিসেস্ ব্যানার্জী আসিয়া আসন গ্রহণ করিবার পর একে একে পুত্র কন্যা আসিতে লাগিল। মিসেস্ ব্যানার্জী পেয়ালাতে চা ঢালিতে ঢালিতে বেহারাকে বলি-লেন—

"সলিল বাবাকে সেলাম দেও।" বেহারা "যো হুজুর" বলিয়া চলিয়া গেল ও তৎক্ষণাৎ আসিয়া বলিল—

"বাবা আতা হায়, আভি ভি পালঙ্গ মে লেটা হায়।"

মিঃ ব্যানার্জী বিরক্ত ভাবে বলিলেন—

"জল্‌দি আনে বোলো।" তৎপরে স্ত্রীকে বলি-লেন, "সলিলের কি সময় জ্ঞান নাই?"

নীরজা—"রোজই ত বলে দি, আজ বকে দাও।"

নিখিলনাথ চা-পান করিতে করিতে অনিলকে বলিলেন "তোমার টাইটা অমন হয়ে আছে কেন? বেহারাকে দিয়ে ঠিক করে নাও।"

অনিল বলিল, "বেহারাটা লক্ষ্মীছাড়া, সে কিছু জানে না।"

এমন সময় সলিলকুমার দিব্য কেশের পারিপাট্য সাধন করিয়া সুসজ্জিত বেশে আসিয়া চেয়ারে বসিয়া "বেহারা চা দেও" বলিয়া হুকুম করিলেন।

নিখিলনাথ—"তোমায় অনেকবার বলিয়াছি কাল হতে ঠিক সময়ে উঠবে, না হ'লে চা পাবে না।" পিতার তিরস্কারে বিরক্ত হইয়া সলিলকুমার চায়ের টেবিলে নানা প্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিল, কোন দ্রব্যই আর তাহার মনঃপূত হয় না। চা এ চামচ খাইয়া বলিল, "ছিঃ, এ কি মানুষ খায়, কি ঠাণ্ডা।"

নীরজা আবার এক পেয়ালা গরম চা করি দিলেন। রুটি ও মাখন দেখিয়া জ্বলিয়া উঠি বলিল—

"আমি না বলেছিলাম, ষ্ট্রবেরী জ্যাম আনিতে, কই আজও দেখছিনে কেন?"

নীরজা—"ওই ত গোয়াভা জেলি আছে, খাও না।"

সলিলকুমার—"গোয়াভা জেলি আবার মানুষে খায়, তা আবার ঐ তোমার খানসামা করেছে, আমি ও খাব না।"

চপলা—"খাও না ভাই, ঐ টেঁপারীর জ্যাম ত বেশ ভাল।"

সলিলকুমার—"চুপ কর, কে তোকে কথা বল্‌তে বল্‌ছে। মা, তুমি আমায় খেতে দিলে না।" তারপর একটা ডিম ভাঙ্গিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল "আবার এই হার্ড বয়েল করেছে, আমি না বার বার বলেছি, হয় হাফ বয়েল, নয় পোচ দিবে।"

নীরজা—"বেহারা সলিল বাবাকে, এক হাফ বয়েল এগ্ লা দেও।"

বেহারা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। অন্য বালক বালিকারা ইচ্ছামত আহার করিতে লাগিল। এই প্রকারে তাঁহাদের চা-পান শেষ হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় ডাকের চিঠি লইয়া একটি রৌপ্যাধারে একজন বেহারা মিঃ ব্যানার্জীর সম্মুখে ধরিল। মিঃ ব্যানার্জী আপনার পত্রগুলি লইয়া একখানি পত্র তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া বলিলেন—

"নীরজ এ চিঠি কোথা থেকে এলো দেখো দেখি।"

নীরজা পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। তাঁহার মুখ কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল। পত্রে এই লিখিত ছিল—

শ্রীচরণেষু,

নীরজ দিদি, বহুদিন তোমার কোনও সংবাদ পাই নাই। আজ বার বৎসর হইল, তোমাদের কোনও সংবাদ পাই নাই। মামার মৃত্যু সংবাদ আজ দুই বৎসর হইল পাইয়াছি, সে সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত আছি। তিনি কি আমায় শেষকালেও ক্ষমা করেন নাই? একবারও আমার নাম পর্য্যন্ত স্মরণ করেন নাই? তোমরা সকলে কে কেমন আছ? নিখিল বাবু কেমন আছেন? তাঁহাকে প্রণাম দিও। আমার শরীর বড় অসুস্থ, সেই জন্য ডাক্তার চেঞ্জে যাইতে বলিয়াছেন। আমি শীঘ্রই বোম্বাই যাইব। আশা করি, তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং সেই কথা মনে করিয়া আনন্দিত হইতেছি। আমার প্রণাম জানিও।

স্নেহাভিলাষী সুরেশ।

পুঃ—আমার স্ত্রী ও তিনটি পুত্র ও কন্যাটি আমার সহিত যাইবে। যদি পারত একটি ছোট বাড়ী আমাদের জন্য ঠিক করিয়া দিও, তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হইব। তোমাদের ভরসাতেই সেখানে যাইতেছি।

সু—

পত্র পাঠ করিয়া মিঃ ব্যানার্জীর মুখও শুষ্ক হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়ে উঠিয়া আপনাদের বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তারপর মিঃ ব্যানার্জী বলি-লেন—

"আবার এই এক জ্বালা। যাক্ সব ঠিক করে নিতে হবে।"

নীরজা "যদি কোনও উপায়ে মামার টাকার কথা জানতে পারে?"

নিখিলনাথ—"তা আর জান্‌বে কোথা থেকে? উইল ত আর করে যেতে পারেন নাই। মুখে আমায় যা বলেছিলেন। বিষয় থেকে কুড়ি হাজার তোমার আর কুড়ি হাজার সুরেশের বাকি ত সব তিনি উইল করে দান করে গেছেন। এই চল্লিশ হাজার টাকা তোমাদের জন্য রেখেছিলেন। দানের কথা সবাই জানে, কিন্তু এ টাকার কথা কেহই জানে না। আমিও ত এতদিন সুরেশের টাকায় হাতও দি নাই। সুরেশ বার বছর এখান থেকে গেছে, সে বেঁচে আছে কি না তাও জানতাম না। হঠাৎ এখন এক চিঠি এলো। ছেলে দুজনের বিলেতের সর্ব্বনেশে খরচেত আমায় সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হয়েছে, তা ছাড়া কারবারে ত সব টাকা দিয়েছি, তাতেও ত কম লোকসান হ'ল না। যাই হোক সুরেশ এলে তার সঙ্গে মেলা মেশা

কর্ব্বার তোমার কি দরকার? এ টাকার কথাও মুখে এনো না, সম্পর্কও স্বীকার কোরো না।”

নীরজা—“তাই হবে, এলে আর কোনরূপ ঘনিষ্টতা করে কাজ নাই। এ চিঠিরও জবাব দিয়ে কাজ নাই, কি বল? ভাল এক জ্বালা হল।”

সুরেশচন্দ্রের মাতুল মৃত্যু কালে সুরেশচন্দ্রকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগ্নির জামাতা মিঃ ব্যানার্জ্জি ব্যারিষ্টার হইয়া বোম্বাইতে আসিয়া প্র্যাক্‌টিস করিতে লাগিলেন। নীরজা ও সুরেশ একই মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়া ভাই বোনের মত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। সুরেশের মাতুল মৃত্যুর পূর্ব্বে মিঃ ব্যানার্জ্জিকে দিয়া দান পত্র প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাতে সুরেশ ও নীরজা ২০ হাজার করিয়া সমান ভাগ পাইবেন লিখিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জির আলস্যের জন্য সে দান পত্রে সহি করা হয় নাই, তিনি ঠিক সময়ে ইহা আনিয়া উপস্থিত করিতে পারেন নাই। মৃত্যু কালে তিনি নীরজাকে সম্বোধন করিয়া এই শেষ কথা বলিয়া যান—

“নীরজা সাবধান, সুরেশ কোথায় আছে জেনে তার টাকা তাকে বা তার বংশধরকে দিও, নিশ্চয়ই দিও, যদি না দাও তাহলে কারো ভাল হবে না বলে যাচ্ছি, সে টাকা তোমাদের ভোগে আসবে না। তার টাকা তাকে দিও। আর দেখা হলে সুরেশ[...] আমার আশীর্ব্বাদ দিয়ে বলো আমি ক্ষমা করেছি[...] আঃ সুরেশ আমার—” তাঁহার প্রাণ সুরেশের না[...] সহিত ইহলোকের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চলি[...] গেল।

মিঃ ব্যানার্জ্জি বছর খানেক সে টাকায় হাত [...] নাই। ভাবিয়াছিলেন সুরেশ আসিলে সুরে[...] টাকাটা তাহাকে দিবেন। তাঁহারা সুরেশের [...] ও সংবাদ লন নাই বা সংবাদ দেন নাই। ভাবি[...] ছিলেন মাতুলের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া সুরেশচন্দ্র নি[...] সংবাদ লইবে। সুরেশচন্দ্র নীরজাকে পত্র দিয়াছিলে[...] তাঁহারা সে পত্র পান নাই। এদিকে মিঃ ব্যানার্জ্জি[...] একটি কারবারে অত্যন্ত ক্ষতি হইল, পুত্রদ্বয় শিক্ষা[...] বিলাত গমন করিল, সে সময় নিজের মূলধন [...] থাকায় বাধ্য হইয়া সুরেশের অর্থে হস্ত নিক্ষেপ [...] লেন। ক্রমে পরিশোধের আর কোনও উপায় র[...] না। তিনিও ভাবিলেন, আর কেন, যখন অন্য [...] লইল না, সুরেশ আসিল না, তখন এ টাকা নীরজা[...] সুরেশ পৃথিবীতে আছে কি না তাহাও তাঁহারা জা[...] তেন না। এমন সময় সুরেশচন্দ্রের পত্র বজ্রাঘা[...] মত তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তাঁহারা উ[...] কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

মৃত্যুশয্যায়।

হে অনন্ত নীলাকাশ হে তারকা শশী রবি,
অনন্ত যৌবনা অয়ি শ্যাম শোভা বিশ্বছবি।
বাসন্তী জ্যোছনা স্নিগ্ধ হে বসন্ত সমীরণ,
কি আনন্দে তোমাদের করিয়াছি আলিঙ্গন।

প্রস্ফুট কুসুম বধূ বাঁশরীর মৃদু তান,
বসন্তের চির সাথি, কলকণ্ঠ তোর গান।
স্থাপিয়া দেবতা মত হৃদয় নিকুঞ্জ বনে,
সতের বরষ ধরি পূজিয়াছি সযতনে

চির জনমের মত বিদায় লবার আশে
আসিয়াছি ভগ্ন-হৃদে আজিকে তোদের পাশে।
মুদিবার আগে মোর পরিশ্রান্ত আঁখি দুটি,
সকল সৌন্দর্য্য লয়ে একবার ওঠ ফুটি।

তোদের স্মিরিতি লয়ে বেদনা আকুল বুকে,
যাব আজি অন্য রাজ্যে আনমনে হাসিমুখে।
এখনি নয়ন হতে মুছিয়া যাইবে সবি,
মনে রেখ তোমাদের ভালবাসে দীনা কবি।

স্বর্গীয়া কুমারী প্রতিভা দত্ত

পূর্ব্বকথা।

পুত্রগণের পাঠের সুবিধার নিমিত্ত পিতৃদেব কৃষ্ণনগরের প্রান্ত ভাগের একটী বাড়ী ক্রয় করিয়া মাকে [...]সন্তানদিগের সহ সেইখানে রাখিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া [...]যান। নিজের সুখ কিম্বা আরাম কখন ভাবিতেন [...]না, একাই সুদূর প্রবাসে থাকিয়া স্নেহের নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য পালনে সুখী বোধ করিতেন। সন্তানগত প্রাণ, তথাপি দূর দেশে একা থাকিয়া একদিনের জন্যও কঠোর কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। বিদেশে কত রোগ, দুর্দ্দৈব ভোগ করিয়াছেন, অথ[...] [...]হইতে পড়িয়া দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকিয়াও ছেলে[...]দিগের পাঠের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া মাকে সেবা শুশ্রূষার কারণ নিকটে লইয়া যান নাই। তাঁহার এই [...]আত্মত্যাগের মহান্ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে আমরাও ধন্য হইব।

আমাদিগের কৃষ্ণনগরের ছোট খাট গৃহখানি ভাবুক চিত্তবিনোদন প্রকৃতির মুক্ত ভাবে আলেখ্যবৎ সুন্দর ছিল। চারিদিকের দৃশ্য এমন চিত্ত মুগ্ধকর, শ্যামল লতা-পল্লবে, গগনস্পর্শী দেবদারু বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত নির্জ্জন শোভায় তাহা কল্পনায় রচিত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। চির বসন্ত বিরাজিত তরুকুঞ্জে অবিশ্রান্ত পাপিয়ার মধুর সঙ্গীত শুনিয়া শুনিয়া আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হইত। পূর্ণিমা রজনীর কৌমুদী প্রপাতে যখন সমুদয় প্রান্তর, আম্র কানন, ক্ষুদ্র সৌধ এবং সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান একাকার হইয়া যাইত, তখন স্বর্গ মর্ত্ত্য সব যেন এক দ্রবীভূত চন্দ্রকর ভিন্ন কিছুই আর প্রতীয়মান হইত না। জীবনের উত্তমাংশ যৌবন যেথানে অতিবাহিত হয়, সেই স্থানই বিশ্ব সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রীভূত আবাসভূমি বলিয়া মনে হইয়া থাকে। তাহাতে আবার সেই গৃহে সর্ব্ব কনিষ্ঠা [...]গ্নী “সৌদামিনী,” ভাই সুহৃদ ও অমির জন্ম হয়। [...]তাই সেই গৃহের সহিত কত সুখের, কত উৎসবের এবং কত আনন্দের স্মৃতি বিজড়িত।

শ্রীমান সুহৃদনাথ চৌধুরীর জন্ম পরেই আমার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গারোহণ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্রকে চক্ষে দেখিয়া যান নাই, জন্ম সমাচার পাইয়াই সেই মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াও শিশুর ভাগ্য গণনা করাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, কালক্রমে বালক সৌভাগ্যবান, পণ্ডিত ও তাঁহার আশানুরূপ হইবে। আচার্য্যকে কোষ্ঠীর শুভফল দৃষ্টে যথেষ্ট পুরস্কারও দিয়াছিলেন। অমিয়নাথের শুভাগমন তাঁহার মৃত্যু পরে। অমির জন্ম রাত্রিকালে, দিব্যশ্রী শিশুর সদ্যঃপ্রসূত রমণীয় কান্তি দেখিয়া তখনি জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, অমিয়নাথ নামকরণ করিয়াছিল। সেই রাত্রি হইতে অমিয় চির অমিয়, কথায় বলে, “শেষ যার দেশ তার;” অমির সম্বন্ধে এ কথা খাটিয়াছিল আদরে, ধনরত্ন লাভে নহে। সর্ব্ব কনিষ্ঠ, মাতৃক্রোড় বহুকাল অধিকার করিয়া সাত বর্ষেও স্কুলে যায় নাই। তাহার পর “বর্ণপরিচয়ের” সঙ্গে সঙ্গে বড় উৎপাত আরম্ভ হয়, ভ্রাতাগণের মূল্যবান নূতন পুস্তক দেখিলেই উল্টা অক্ষরে নাম লিখিয়া ফেলিত ও তাহা বলিলে নিঃসঙ্কোচে বলিত, “আমাকে কিছু বলো না, আমি মায়ের কোলের ছেলে।” তখনও আমাদের গৃহে অনেক আত্মীয় কুটুম্ব বালক থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিত, অমিয় তাহাদের সঙ্গে সমান ভাবে চলিত। তাহাদিগের যেদিন যে সাজে স্কুলে যাইতে দেখিত, সে-ও সেদিন সেই সাজে যাইত, তাহাতে কোন দিন জামা শূন্য উত্তরীয় মাত্র পরিয়া প্রখর রৌদ্রে রিক্ত পদে তাহাদের সঙ্গী হইত। ভৃত্যবাক্য কিছুতেই মানিত না। বাৎসরিক পরীক্ষায় অমিয় একবার অতিশয় গর্ব্ব সহকারে কলেজ হইতে আসিয়া বলে সে “সর্ব্ব প্রথম হইয়াছে।” কত নম্বর পাইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে উৎসাহে বলিয়াছিল, “কেবলই গোল্লা, কেবলই গোল্লা।” সে গোল্লা যে রসগোল্লা কি কাঁচাগোল্লা নহে, শূন্য মাত্র যখন বুঝাইয়া দেওয়া হইল, তখন নীরবে কাঁদিয়া জ্বর আনিল। পরদিন প্রাতে অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে আর বাড়ীতে

পাওয়া গেল না, কাহাকে কিছু না বলিয়া কলেজে যাইয়া আবার নূতন পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ হইয়া লজ্জা দূর করিয়াছিল। আশৈশব সরল স্নেহশীল ও পরদুঃখকাতর হৃদয় অমিয়, সহপাঠীগণের অভাব মোচনে মুক্তহস্ত।

নাটকাচার্য্য অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয় সদলে একবার কৃষ্ণনগর গিয়াছিলেন ও পিতৃদেবের সহিত বন্ধুত্ব থাকায় তিনি আমাদিগের গৃহে ৺উপেন্দ্র দাসের "শরৎ সরোজিনী" নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। দৃশ্যপট ও অন্য সব সরঞ্জাম রীতিমত না থাকা সত্ত্বেও তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভায় অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সেই অভিনয় দর্শনে আমরা ত সকলে মুগ্ধ হইবই, আমাদের ছোট বোন "সৌদামিনী" অতি ক্ষুদ্র বালিকা হইয়াও নির্ব্বাক্ ভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহা দেখিয়া শুনিয়া পরদিন নিজ নাম "সৌদামিনী" খারিজ করিয়া "শরৎ সরোজিনী" নাম লইয়াছিল। সে অতি বুদ্ধিমতী সুচতুরা বালিকা ছিল, তাহাকে কেহ কথায় কিম্বা কার্য্যে ঠকাইতে পারিত না। পিতৃদেব একদিন তাহাকে পাঠ বলিয়া দিতেছিলেন, সে অন্যমনস্ক হইয়া সব ভুলিয়া যাইতেছিল, তাহাতে তিনি বড় বিরক্ত ভাবে বলিয়াছিলেন, "তুমি লেখা পড়া ভালরূপে না শিখিলে বিবাহকালীন যোগ্যতর পাত্র পাইবে না।" তাহাতে সে অমনি বলিয়া উঠিয়াছিল, "মা ত ভাল লেখা পড়া জানেন না, তবে কেমন করিয়া আপনার মত সুপাত্র পাইয়াছেন।" তাহার এই উত্তরে তিনিও অত্যন্ত হাসিয়া তাহাকে খেলার ছুটী দিয়াছিলেন ও সেখানে অন্য যাঁহারা সব বসিয়াছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত কৌতুকানুভব করিয়াছিলেন।

পিতৃদেবের সময় হইতেই আমাদিগের গৃহে শিল্প সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চ্চা এমনি হইয়া আসিতেছে। তিনি অতিশয় গুণগ্রাহী এবং বন্ধুপ্রিয় ছিলেন। একবার কৃষ্ণনগরের যুবকগণের উৎসাহে সেখানে "বসন্ত মেলা" হয়। ৺নবগোপাল মিত্র মহাশয় তখনকার স্বদেশী দলের ব্যায়ামের নেতা ছিলেন। তিনি বহুতর ছাত্র সমভিব্যাহারে মেলায় উপস্থিত হইয়া ব্যায়াম প্রভৃতি দর্শনান্তর কন্‌সার্টপার্টির গান বাদ্য শুনাই কলেজের ছাত্রগণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। বৃ গণ "ছেলে ধরার ভয়ে" ভীত হইয়া উঠেন, যুবকে সব চাঁদা তুলিয়া আরো দিন কতক তাঁহাকে সদ রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যখন এইরূপ অব তখন আমাদের গৃহে তিনি সর্ব্বসহ একদিন আসি কন্‌সার্টপার্টির ঐক্যতানিক বাদনে সকলকে আমো দিত করিতে ব্যগ্র হন। কন্যা প্রিয়ম্বদা শৈশবে অত্য দুরন্ত এবং মাতামহের যথা অযথা আদরে কাহারে কথা মানিত না। কন্‌সার্ট উপলক্ষে সেদিন সকা হইতে বন্ধুবান্ধবে বাড়ী পরিপূর্ণ, দুষ্ট ছেলে মেয়ে ঐরূপ দিনে আরো বাড়িয়া উঠে ও যত প্রকা দৌরাত্ম্য করিয়া গৃহের শান্তিভঙ্গ করে। সময় বুঝি প্রিয়ম্বদার উপদ্রবটা সেদিন আরো বাড়িয়া যায় কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ক্রমাগ পিতৃদেবের নিকট অভিযোগ করিতে থাকে, তি তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। তাহাকে ঠাণ্ডা করি না পারিয়া মা বলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিত ভাগে পড়ো নাই, কদাপি পিতামাতার অবাধ্য হই না।" তৎক্ষণাৎ সেও চট্ পট্ উত্তর দেয়, "পি মাতার অবাধ্য হইতে মানা, বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতামহ মাতামহীর কথা কিছু বলেন নাই—" ক্ষু ক্ষুদ্র বালিকার মুখে এই উত্তর শ্রবণে সেই সমাগ বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে উচ্চহাস্য পড়িয়া যায় ও গায় বাদকদিগের ভিতর হইতে উঠিয়া মিত্র মহা তাহাকে সুন্দর সুন্দর খেলানা উপহার দিয়া তা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অশেষ সুখ্যাতি করিতে থাকেন।

পিতৃদেবের সুদীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের সম্যক ইতি সুখপ্রদ ছিল না। স্বাধীনচেতা, উদারনৈতিক ব্যক্তি দৃঢ় কর্ম্ম-বন্ধনে যেরূপ কষ্ট ভোগ ভাগ্যে ঘটিয়া থা তাঁহারও অদৃষ্টে সেইরূপ হইয়াছিল। নদীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশের নানাস্থান ঘু পরিশেষে বেহার ত্রিহুত প্রভৃতির শেষ সীমায় যাই হইয়াছিল। কোথায় মেহেরপুর, আর কোথায় হারী চম্পারণ কিছুই তাঁহার কপালে বাদ যায় সাপ্তাহিক বিধিলিপিতে স্থানান্তরিত আজ্ঞা যখন লিখিত হইয়া যাইত এবং সেই অখণ্ডনীয় বিধান মস্তক পাতিয়া লইতে হইত। সাবডিভিসানে এক একজন হাকিম ছোটখাট লাট বিশেষ, পিতৃদেব এ লাটপদের মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া কয়েদীর দ্বারা গৃহকার্য্যের জল বহন করিয়া আনাইতেন না, চৌকীদার দিয়া প্রাঙ্গণ ঝাঁট দেওয়াইয়া ভুঁইমালীর বেতন কাটাইতেন না ও নাজিরকে বাজার সরকার পদে বরণ করিয়া অর্দ্ধমূল্যে হাট বাজার করাইতে ঘৃণা বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার চাপরাশী বহু পুরাতন হাকিম চালক, পরামাণিক পুত্র, ক্ষুদ্র লাটত্ব পদ গ্রহণে তাঁহার চক্ষু কর্ণের অগোচরে সেরেস্তাদারদিগের সহিত সমান ভাবে চলিয়া সর্ব্ব জীবের ভীতি উৎপাদন করিত। এক সময় কার্য্যগতিকে কয়েক মাসের নিমিত্ত আমরাও চুয়াডাঙ্গা সাবডিভিসানে গিয়াছিলাম ও অমিকে অল্প দিনের জন্য সেখানে স্কুলে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাকে চৌকিতে পৃথক বসিতে দেওয়া হইবে কিম্বা সাধারণ বালকগণের সঙ্গে একত্র বেঞ্চে বসিবে জানিবার প্রয়োজন হওয়াতে হেডমাষ্টার মহাশয়ের নিকট হইতে পত্র আইসে। চাপরাশী প্রবর তাহার উত্তর লইয়া স্কুলে যাইয়া হেডমাষ্টারের সহিত একাসনে বসিয়া অনেক উপদেশ দিয়া অমির অন্য সব বালকের সহিত একত্র উপবেশন অনুচিত হইলেও প্রভুর আদেশ জানাইয়া আইসে। অমিয় তাহার এই অভদ্র ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত ও কুপিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া সব বলিয়া দেয়। পিতাঠাকুর তাহাতে নরসুন্দরকে অনেক ভর্ৎসনা করিলে সে সহাস্য মুখে বলিয়াছিল, "অগ্রবর্ত্তী হাকিমদিগের সময় সাব ডিপুটী বাবুগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিত, পিনাল কোর্টের ধারা শিক্ষা দিয়া নবাগত সিভিল সার্ভিসের শ্বেতাঙ্গ যুবক কত তরাইয়া গিয়াছে, বাহ্যজ্ঞানবর্জ্জিত স্কুল মাষ্টার তাহার নিকট মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত নহে।"

এইখানেই এক বৃদ্ধ চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়া পিতৃদেবের নিকট আনীত হইলে বিচারে সাত দিনের কারাদণ্ড হইয়া যায়। অপরাধী পূর্ব্ব বঙ্গীয় পল্লীবাসী দুর্ব্বল ব্যক্তি। আড়কাঠির হাতে পড়িয়া অর্থ লোভে গৃহত্যাগী হইয়া আইসে পরে কুলীর সর্দ্দারের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া পলাইয়া পদব্রজে চুয়াডাঙ্গা আসিয়া উপস্থিত হয় ও নিকটে কোন প্রকার সম্বল না থাকায় তিন দিবস একাদিক্রমে উপবাসী থাকিয়া এক কাঁঠালগাছ তলে বসিয়া ঐ গাছের একটি পতিত পক্ক কাঁঠাল কুড়াইয়া খাইয়া জীবন রক্ষা করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জনৈক কার্য্যদক্ষ চৌকীদারের চক্ষে তাহা পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ সে সদরে চালান হইয়া আইসে ও ভারতীয় পিনালকোর্টের সূক্ষ্ম নৈতিক দণ্ডবিধির ধারানুসারে দোষী প্রমাণ হইয়া সপ্তাহ কারাদণ্ড কিম্বা জরিমানার আদেশ দিতে পিতৃঠাকুরও বাধ্য হন। তখন সে তাহার আনুপূর্ব্বিক অবস্থা সত্যভাবে বিবৃত করিয়া জেলে যাইতে চাহে ও সেখানে যত কষ্টই হউক না কেন, অর্দ্ধাহারে কতকটা ক্ষুধা শান্তি হইবে ভাবিয়া জেলেই যাওয়া ইচ্ছনীয় মনে করিয়াছিল। সপ্তাহ পরে কারামুক্ত হইলে পিতৃদেব তাহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া দেশে যাইবার পাথেয়, নূতন ধুতি চাদর ও বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। সেই দীন হীন বৃদ্ধ গৃহযাত্রাকালীন পিতাকে দুই হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিল, "দাদা ঠাকুর, তোর বড় ব্যাটা উপর আদালতে বসিবে। ধনে পুত্রে লক্ষীশ্বর হইয়া থাক্‌বি ও জীবনে তুই যেন কোন শোক না পাস্।"

পিতৃদেবের দ্বারভাঙ্গা গমনের প্রথম বৎসর আমরাও সব সঙ্গে গিয়াছিলাম। দ্বারভাঙ্গাধিপতি তৎকালে অপ্রাপ্ত বয়স প্রযুক্ত ম্যানেজারের হস্তে রাজত্বের ভার থাকায় সহরটা বড় অপরিচ্ছন্ন এবং ধূলি ধূসরিত ছিল, রাজপথ ও বাজার বিপণীতে রাজশ্রীর কোন নিদর্শন পরিলক্ষিত হইত না। সমস্ত সহর খুঁজিয়া বাসোপযোগী একটীও বাড়ী আমরা না পাইয়া পরিশেষে পূর্ব্বতন হাকিমের পরিত্যক্ত গৃহে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলাম। একে ত্রিহুতের সঞ্চিত ধূলিরাশি তাহার উপর দারুণ গ্রীষ্ম আমাদিগকে নিতান্তই উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। এক পক্ষ কাল অতীত হইতে না হইতে ভয়ানক

সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে সহরে হাহাকার পড়িয়া গেল এবং অসংখ্য নরনারী মৃত্যুগ্রাসে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল। দিবারাত্রি শববাহকের "রাম নাম সত্য হ্যায়" শুনিতে শুনিতে আমাদিগেরও আহার নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে একজন ধনী মহাজনের কৃপায় তাঁহার নগরীর প্রান্ত গৃহে আমরা সকলে উঠিয়া গেলাম এবং সেই নিশীথেই মৃত্যুরূপী করাল কাল আসিয়া অতিশয় স্নেহপাত্রী সৌদামিনীকে অকালে অসময়ে অপহরণ করিল এবং সুহৃদও জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমাদিগকে একেবারে শোকাভিভূত করিয়া ফেলিল। সান্ত্বনা দিবার কেহ নিকটে ছিল না এমনি অবস্থা, ভগবানের অসীম দয়া ও মাতার প্রাণপণ সেবায় বালক সুহৃদের জীবন রক্ষা হইবামাত্র আমরা সেথান হই চলিয়া আসিলাম, আর কখন দ্বারভাঙ্গা যাই নাই পরে জনশ্রুতি এইরূপ শুনিয়াছিলাম যে, মহারাজ রাজ্যাভিষেকের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই রাশী আবর্জ্জনা গো-শকটে চড়িয়া রাজনগরীর সুদূর প্রা ভাগে চলিয়া গিয়াছিল এবং লক্ষ লক্ষ রজত মু তাহার স্থান অধিকার করিয়া ধনাগারের শো বর্দ্ধন করিয়াছিল। তথনকার ছোটলাট বাহাদু সেই সঞ্চিত ধনের কিয়দংশ ব্যয় করাইয়া সহ দ্বারবঙ্গাধিপের রাজধানী নামের যোগ্যতর ক দিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

চিরন্তন।

ওহে অনাদি কালের প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

ছিনু যবে আমি মাটির উদরে
আলোকে চাহিনি ফিরে!
চরণের রেণু আবরিয়া তনু
রেখেছিল মোরে ঘিরে।

সে আদি যুগের নিগম বারতা
একা তুমি জান প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

অবারিত সুখে জলধির বুকে
ভাসিতেছিনু হে যবে,
শীতল পরশে অঙ্গ আমার
জুড়াইয়া ছিলে তবে।

সে আদি যুগের নিগম বারতা
একা তুমি জান প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

অনল শিখায় বজ্র লিখায়
ছিনু হে যখন আঁকা,
জড়ের চিহ্ন মুছেছিলে মোর
অঙ্গে যা ছিল মাখা।

সে আদি যুগের নিগম বারতা
একা তুমি জান প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

যবে বায়ু সনে ভুবনে ভুবনে
ফিরিতেছিলাম আমি,
প্রিয়তম প্রাণ দিলে মোরে দান
চেতনা দাঁড়াল থামি।

সে আদি যুগের নিগম বারতা
একা তুমি জান প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

শূন্য আকাশে প্রকাশের আশে
ছিনু হে যেদিন ভোর,
অঙ্গে মাখালে নিবিড় নিলীমা
নয়নে স্বপন ঘোর।

সে আদি যুগের নিগম বারতা
একা তুমি জান প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত থাক
আমারে ভোল না কভু।

এবে জাগে প্রাণ ফুটিয়াছে জ্ঞান
আলোকে মেলেছি আঁখি,
ভয়ে ভয়ে সারা কেমনে তোমার
নয়নে নয়ন রাখি।

অনাদি যুগের হে আদি দেবতা
এবে জানাইলে প্রভু,
কালে কালে তুমি জাগ্রত ছিলে
আমারে ভোলনি কভু।

শ্রীহেমলতা দেবী।

স্বর্গীয় আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বলিতে গেলে নগেন্দ্র নাথ বাঙ্গালার পুরাতন ইতিহাসের কোনও এক অধ্যায়ের নায়ক স্বরূপ। পীড়া ও বার্দ্ধক্য বর্ত্তমান কর্ম্মস্রোত হইতে তাঁহাকে অপসৃত করিয়া, যেন আশ্রমোপযোগী নিভৃততার গহ্বরে তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার সেই তেজপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ যুক্তি, অগ্নিবৎ বাগ্মীতা আজ কয়েক বৎসর সুষুপ্ত আগ্নেয়গিরির ন্যায় নির্ব্বাপিত ছিল। বর্ত্তমান বংশীয়দিগের নিকট তিনি অপরিচিত হইলেও পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা কুত্রাপি অবিদিত ছিল না। সাধক নগেন্দ্রনাথ যাহা বাক্যের দ্বারা প্রচার করিতেন, গত কয়েক বৎসর ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় জীবন ও কার্য্যের দ্বারা তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যে প্রচার ব্রত অবলম্বন করিয়া গভীর অনুরাগ ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন দৈহিক বল বীর্য্যের হ্রাস সহকারে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল প্রয়োগ করিরা তাহার পালন ও সম্পূর্ণতা সাধনে লোকান্তরে যাত্রার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ধ্যান নিরত যোগীর ন্যায় অহর্নিশি ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল কামনা করিতেন এবং কেমন করিয়া ইহা সমগ্র ভারতে গৃহীত হইবে সেই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। যন্ত্রণাদায়ক পীড়ার মধ্যে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলে, তিনি কোনও না কোন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোপযোগী গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। নিজের অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় সঙ্কুচিত করিয়া ঐ সকল মুদ্রিত করিতে অর্থ প্রদান করিতেন। নগেন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা করিলে কয়েকটি বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। প্রথম, তাঁহার সত্যানুরাগ, দ্বিতীয়, প্রচার স্পৃহা, তৃতীয়, প্রচারে যৌক্তিকতা, চতুর্থ, তাঁহার দারিদ্র্য ব্রত, পঞ্চম, ব্রহ্মসত্ত্বা উপলব্ধি ও ব্রহ্ম দর্শনার্থ সাধনা।

যখন তিনি শিক্ষার্থী—বয়স বিংশতি বর্ষেরও নিম্নে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্বলন্ত সত্য তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে যেরূপ উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি অকুতোভয়ে তদানীন্তন ধর্ম্মবীরদিগের ন্যায় অকাতরে স্বীয় দেহ অগ্নি স্তূপে বিসর্জ্জন দিতে পারিতেন। তাঁহার সময়ে ঐরূপ কোনও নির্য্যাতন ছিল না, কিন্তু ঐরূপ নির্য্যাতন সহ্য করিবার দৃঢ়তা ও শক্তি নিশ্চয়ই নগেন্দ্রনাথের মধ্যে নিহিত ছিল। পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হৃদয় উক্ত ধর্ম্মের সত্যসমূহ প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। কিরূপে সেই সত্য প্রচার করিবেন, অহরহঃ এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় মন গ্রাস করিয়া ফেলিল। তিনি সুযোগ ও সময় পাইলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে বহু স্থানে তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। ইদানীং তিনি বলিতেন যে, যিনি প্রচারক হয়েন, স্বভাবতঃ প্রচার স্পৃহা তাঁহার প্রাণকে আপনা আপনি অধিকার করিয়া বসে, যিনি প্রকৃতিগত প্রচারক, তাঁহার লজ্জা থাকে না, ভয় থাকে না। তিনি কাহারও আদেশ বা নিয়ম প্রতীক্ষা করেন না, তিনি প্রচার না করিয়া থাকিতে পারেন না, নগেন্দ্রনাথ বাস্তবিকই স্বভাব কবি ও স্বভাব বক্তার ন্যায় একজন স্বভাব প্রচারক ছিলেন। তিনি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির মত ও যুক্তি সকল খণ্ডন করিবার জন্য তিনি যে সকল যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্কলন করিলে যে কোনও যুক্তিমূলক ধর্ম্ম ইতিহাসের এক অত্যাবশ্যকীয় অত্যুজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হইবে। তাঁহার যুক্তি ও গবেষণাপূর্ণ পুস্তক "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" শত শত যুবককে ব্রাহ্মধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মধর্ম্মে

দীক্ষা প্রদানে তিনি যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে তাঁহাকে যেরূপ দরিদ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, বর্ত্তমান ভারতে এমন আর কেহ করিয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়। যেদিন হইতে প্রচারকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন সেদিন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি দরিদ্রতার কশাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন। একদিনও স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন নাই, সময়ে সময়ে সপরিবারে অনশন তাঁহার জীবনের একটা সাধারণ ও অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত। এই দরিদ্রতার মধ্যেও তাঁহার হৃদয়ের সরলতা ও ধর্ম্মভাব একদিনের তরেও ম্লান হয় নাই। শুনিয়াছি কোনও এক সময়ে তাঁহার গৃহে দুই দিন কাহারও আহার হয় নাই, এমত অবস্থায় এক বিবাহ সভায় তাঁহাকে আচার্য্যের কার্য্য করিতে হইয়াছিল। অনুষ্ঠানান্তে গৃহস্থ তাঁহাকে একখানি গাড়ী করিয়া বিদায় দিবার প্রস্তাব করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে গাড়ীর পরিবর্ত্তে উক্ত গাড়ীর যাহা ভাড়া হইতে পারে, তাহা তাঁহার হস্তে প্রদান করিতে বলিলেন। নগেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল ঐ সামান্য অর্থ গৃহে লইয়া গিয়া অনশনক্লিষ্ট পরিবারবর্গের যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যাদির ব্যবস্থা করিবেন কিন্তু পথিমধ্যে এক অতি দুস্থ দরিদ্র ব্যক্তির আর্ত্তনাদে অধীর হইয়া, প্রাপ্ত অর্থ তাহাকে দান করিলেন এবং সেই ব্যক্তি শীতে কষ্ট পাইতেছিল দেখিয়া স্বীয় গাত্রাবরণ একখানি "বালাপোষ" দরিদ্রের অনাবৃত গাত্রে পরাইয়া দিলেন। যদি মানবে দেবতা দেখিতে চাও, যদি মানবপ্রেম কেমন তাহা দেখিতে চাও, তবে ত্যাগী নগেন্দ্রনাথের এই অসাধারণ চিত্র একবার মানস ফলকে অঙ্কিত করিয়া লও। তাঁহার জীবনে এইরূপ ঘটনা একটি নহে—বহু ঘটনা আছে। কিন্তু সাধকের হৃদয়ে তাহা লুক্কায়িত থাকিত। প্রেমের আহ্বানে নগেন্দ্রনাথ যাহা করিয়াছেন, কাহারও নিকট কখনও তাহা ব্যক্ত করেন নাই, তিনি সংগোপনে ধর্ম্ম ও প্রেম সাধন করিতেন, আত্ম বিজ্ঞাপনে কখনও ব্যা ছিলেন না, সাধনার কঠোর নিয়মাবলীর অধীন হইয়া দীনভাবে জীবন যাপন করিতেন। যাঁহারা তাঁহা নিকটে থাকিতেন ও অনবরত তাঁহার জীবন লক্ষ করিতেন, তাঁহারা তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মসাধনে কঠোর তপস্যা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন।

তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে সচেতন অবস্থায় থাকিতে একটি কথা বলিতে গিয়াও সত্যের ব্যতিক্রম হই কি না তাহা চিন্তা করিতেন, দৈনন্দিন সামা সাংসারিক কার্য্যেও তাহা ধর্ম্মানুগত হইল কি তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতেন। ধ্যান প্রার্থনা, পা রচনা ও উচ্চ বিষয় ভিন্ন আর কিছুই আলোচ করিতেন না। পীড়ায় যখন অধীর হইয়া পড়িতে রোগ যন্ত্রণা যখন তাঁহার রক্তমাংসকে অস্থির করি তুলিত, তখন "ঈশ্বরের বিধান সহ্য করিতে হইবে এই বলিয়া করজোড়ে ধ্যানস্থ হইতেন। সেই দৃ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, তা ভুলিবার নহে। তাহার স্মৃতি আজীবন তাঁহাদের স্ব প্রাণ জাগরিত করিয়া রাখিবে ও অবসন্ন আত্মা বল প্রদান করিবে। তিনি সাধনার দ্বারা ব্রহ্মলা করিতে সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পরকালে এক বিশ্বাসী ছিলেন ও কিরূপ সাধন করিলে তথাকা বিমল সুখ শান্তি অনুভব করা যায় তাহা এক জানিতেন যে, প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহাকে তজ্জন্য প্রস্ত হইতে দেখা যাইত। যে সকল অনিয়ম করিলে পা লৌকিক জীবনে বিঘ্ন ঘটে তাহা বর্জ্জন করি এত যত্নবান থাকিতেন যে তাহা দেখিয়া হৃদয় বি ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইত। তিনি প্রচারের দ্বারা যে শি দিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন দ্বারা তাহার সহস্র অধিক শিক্ষা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। প তাপের বিষয়, তিনি আত্মচরিত এত অল্পই বি করিয়াছেন ও এত অধিক আত্মগোপন করিয়া যে, আজ তাঁহার জীবনী রচনা বা সঙ্কলন করি অতি অল্পই উপাদান বিদ্যমান আছে। এক স তিনি দৈনন্দিন লিপি নিয়মিতরূপে লিখিতেন, সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে উদাসীনতার জন্য তাহা

পাওয়া যায় না। তাঁহার লিখিত জীবনী থাকুক বা নাই থাকুক, তাঁহার রচিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত এবং ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা—যাহা মৌলিকতায় ইউরোপীয় কোন গ্রন্থ অপেক্ষা হীন নহে—তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীবিরাজমোহিনী রায়।

নারীর কার্য্য।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

গত ৪ঠা শ্রাবণ ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের ষান্মাষিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় শ্রীমতী হেমলতা দেবী নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন :—

যাঁর নিষ্কাম জীবনকে আশ্রয় করে ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য্যটুকু আজ লোকচক্ষে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠতে পেরেছে, যাঁকে আশ্রয় করা ব্যতীত এই কার্য্য পরিচালনা এক প্রকার অসম্ভব হ'ত বলেই মনে হয়, মহামণ্ডলের শিক্ষয়িত্রীগণের মাতৃস্বরূপিণী সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস, আজকের এই সম্মিলনী ক্ষেত্রে ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু বলবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন। তাঁর ঐকান্তিক অনুরোধে, অন্য কথায়, তাঁর আজ্ঞা পালন আমার অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মকে ধর্ম্মের ভিত্তিতে স্থাপন করা সম্বন্ধে দু একটি কথা বলবার জন্যে আজ আমি আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি। যোগ্যতা হিসাবে এই ভার গ্রহণ আমার পক্ষে ধৃষ্টতা বই আর কিছুই নহে, কিন্তু নারী শক্তির এই নব-উন্মেষ কালে অতি অযোগ্যের পক্ষেও যোগ্যের স্থান অধিকার করা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কারণ যিনি যথার্থ যোগ্য তিনি হয় ত কার্য্যক্ষেত্র থেকে বহুদূরে অবস্থিতি করছেন, অথবা এইখানে উপস্থিত থেকেও আত্মগোপন করে রয়েছেন। কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হ'য়ে স্থায়ী হ'লে এই সকল যোগ্য ব্যক্তিগণ যে আপনাপনিই কার্য্যক্ষেত্রে এসে অবতীর্ণ হবেন এবং অযোগ্য ব্যক্তিগণকে আপনাপনিই যে এ ক্ষেত্র থেকে অপসারিত হ'তে হ'বে তাতে আর সন্দেহ নাই।

আমার কথা কয়টি বলবার পূর্ব্বে নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করে উপস্থিত ভগিনীমণ্ডলীর নিকটে আমি অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি, তাঁরা যেন আমার ত্রুটি সকল আজ মার্জ্জনা করেন, আমার অক্ষমতাকে ক্ষমার চক্ষে দেখেন।

মাননীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসের ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকলেরই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা যে স্ত্রী-মহামণ্ডলরূপ নারীশক্তির এই কার্য্যটি কিরূপে স্থায়ী হয়।

আমরা মরণধর্ম্মশীল মনুষ্য, আমরা আজ আছি কাল নাই। আমাদের শক্তি ও সাধ্যের সীমা কতটুকু? কেবল আমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করলে এর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে নিরাশ হ'তে হবে। আমাদের দুই হাতের সমস্ত শক্তি, সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম দিয়ে, এখন যদিও একে আমরা ধরে রাখতে পারি, তথাপি সেটি দু দিনের, তৃতীয় দিনে আমাদের দৃঢ় হস্ত শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মটিও ভূমিসাৎ হবে। অতএব কেবল নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করে থাকলে হবে না, আমাদের অপেক্ষা কোন বৃহত্তর ও মহত্তর শক্তির উপরে এর প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই।

সর্ব্বশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতায় লিখিত আছে যে ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণই কর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গতি। সেই গতি লাভ করতে পারলেই কর্ম্মের

ফল জগতে চিরস্থায়ী হয়। এই মহাবাক্য অনুসরণ করে আমাদের এই ক্ষুদ্র কর্ম্মচেষ্টাটুকুকে যদি আমরা ভগবানে সমর্পণ করতে পারি তবেই ইহার স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারব।

কর্ম্ম কিরূপে ভগবানে অর্পণ করা যায়? আমরা সকলেই জানি যে ইচ্ছা হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি। যিনি যেরূপ ইচ্ছায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন পরিণামে তাঁর কর্ম্ম সেইরূপ ফলই প্রদান করে। আমাদের ইচ্ছা যদি বিশুদ্ধ হয় তবে আমাদের কর্ম্মও কল্যাণকর হবে। আর আমাদের ইচ্ছা যদি অপবিত্র মলিন ও স্বার্থযুক্ত হয় তবে আমাদের কর্ম্ম কলুষিত হয়ে আপনিও বিনষ্ট হবে এবং আমাদিগকেও দুর্গতিতে নিয়ে যাবে। অতএব আমাদের ইচ্ছাকে বিশুদ্ধ করাই আমাদের কর্ম্মের ফলকে স্থায়ী করবার একমাত্র উপায়।

আপনার ইচ্ছাকে নিজের নিজের সুখ স্বার্থে বদ্ধ না রেখে যদি সর্ব্বজনহিত চেষ্টায় নিজের ইচ্ছাকে আমরা জাগ্রত করে তুলতে পারি তবে আমাদের কর্ম্ম স্বভাবতঃই ভগবানে অর্পিত হবে, তার জন্যে আর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন হবে না। কর্ম্মের জন্মদাতা ইচ্ছাকেই যদি আমরা ভগবানে অর্থাৎ সমষ্টি[...] হিতে সমর্পণ করতে পারি তবে আর কর্ম্ম সমর্পণে[...] অবশিষ্ট কি থাকে?

নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছাকে খর্ব্ব করে সমষ্টির হিতে[...]চ্ছাকে আপনার মধ্যে প্রবল করে তোলাই মনুষ্যত্বে[...] সর্ব্বোচ্চ সাধনা। বর্ত্তমানে এই ক্ষুদ্র কর্ম্মটুকু[...] আশ্রয় করে আমরা সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হতে পা[...] এবং এই কর্ম্মচেষ্টার মধ্যে ভগবানের ইচ্ছাকে প্রত্য[...] করে পরমগতি লাভের জন্য ও প্রস্তুত হতে পারি।

মহাপুরুষগণ বলেন ভগবানের ইচ্ছা সর্ব্ব[...] প্রকাশমান, কোন একটী তুচ্ছ কর্ম্মকেও আম[...] নিষ্কাম ভাবে সম্পন্ন করতে পারলে সেইখানেই ভ[...]বানের ইচ্ছা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে[...] মহাপুরুষগণের এ বাক্য নিষ্ফল হবার নয়। জগ[...] পূজ্য মহাপুরুষগণের এই মহাবাক্য শিরোধার্য্য ক[...] বর্ত্তমান নারীশক্তির এই কর্ম্ম চেষ্টাটুকুকে সম[...] অন্তরের সহিত আমরা ভগবানে সমর্পণ করবার জ[...] প্রস্তুত হই এই আমার অন্তরের প্রার্থনা! ভগবা[...] কর্ম্ম সমর্পণ ব্যতীত কর্ম্মের ফলকে জগতে স্থা[...] করবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

অক্ষম।

হে জননি! কর আশীর্ব্বাদ!
প্রসন্ন কল্যাণ নেত্রে চাহ একবার
ঘুচে যাক সর্ব্ব পরমাদ!
নির্ম্মল প্রভাতে আজ, শূন্য প্রাণে
অবনত শিরে,
সর্ব্বস্ব হারায়ে আসি' দাঁড়ায়েছি তব
পদতীর্থ তীরে!
অক্ষম অধম আমি সবচেয়ে তব
বিশ্ব পরিবারে।
রয়েছি মা লাজে ভয়ে দুয়ারে তোমার
তাই এক ধারে।
ডেকে লও অভাগারে শিরে রাখ তব
স্নেহ ভরা হাত,
ঘুচে যাক সর্ব্ব অবসাদ।

হে জননি! যুগ যুগান্তর!
কতই করেছি ভুল, কাটায়েছি বেলা
মিথ্যা খেলা করি' নিরন্তর।
কঠিন হয়োনা তুমি, দাও গো অভয়
ক্ষমা ভরা আঁখি,
মার্জ্জনা ভিখারী মোর অশ্রু আবিল
নয়নেতে রাখি।
যত কাজ দিয়েছিলে, পারিনি কিছুই
সব আছে বাকী,—
সেরে আসি; সারাপ্রাণ অভয় কিরণে
চিরদীপ্ত রাখি।
ফিরে আসি সন্ধ্যা বেলা, লভিবে আশ্রয়
তব পদে অবশ অন্তর!
সেই আশে, রহি নিরন্তর।

শ্রীচারুহাসিনী দেবী

Presented to the U.P.L.
By Shiva P. Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের
জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { আশ্বিন, ১৩২০। } ৩য় সংখ্যা।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাচীন কথা।

চট্টগ্রামের একটী বৌদ্ধ পল্লীর ইতিবৃত্ত।

আমাদের গ্রামের সন্নিকটে আল্লামৌজায় বৈদ্যপাড়া নামে একটী গণ্ডগ্রাম আছে। এই পাড়ায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বড়ুয়াগণ বহুকাল হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। এই স্থানের বড়ুয়াগণ মগধ অর্থাৎ দক্ষিণ বিহার হইতে এইখানে আসিয়াছেন বলিয়া থাকেন। শালেশ্বর চৌধুরী নামে একজন প্রসিদ্ধ বড়ুয়া এস্থানে সর্ব্বপ্রথম আসেন, ইনি শালেশ্বর বৈদ্য নামে পরিচিত। ইনি শিশু চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ সকলেই শিশু চিকিৎসার ব্যবসা করিতেন বলিয়া এই গ্রামের নাম বৈদ্যপাড়া হইয়াছে। শালেশ্বর চৌধুরীর একটী বিহার বা কেয়াঙ্গ অতি প্রাচীনকাল হইতে চৌধুরীর বিহার নামে পরিচিত। এই গ্রামের অপর একটী বিহারের নাম বৈদ্যানীর বিহার। দুর্গা নাম্নী একজন প্রাচীনা বড়ুয়া রমণী চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন। ইনি দুর্গা বৈদ্যানী নামে বিখ্যাত। কথিত আছে, দুর্গা বৈদ্যানী কোন দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য করায় পরৈকোড়া নিবাসী একজন বড় জমীদার বৈদ্যানীকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। দুর্গা বৈদ্যানী নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি একজন বড়ুয়া ও একজন মুসলমান বালককে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন এবং তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তি দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া উক্ত দুই পালক পুত্রকে দান করেন। উক্ত পালক পুত্রদের বংশধরগণ এখনও বৈদ্যপাড়ায় বৈদ্যানী প্রদত্ত সম্পত্তি সুখে ভোগ দখল করিতেছে। এই দুর্গা বৈদ্যানীর নামে এস্থানে অনেক জায়গা জমীনের নাম আছে। বৈদ্যানীর কতক সম্পত্তি

কেয়াংএর দান খয়রাতের জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ বৈদ্যানীর খাল, বৈদ্যানীর পোল, বৈদ্যানীর রাস্তা, বৈদ্যানীর দীঘি, বৈদ্যানীর বিহার এবং বৈদ্যানীর প্রকাণ্ড বাড়ী এখনও তদীয় সুযশঃ ঘোষণা করিতেছে। দুর্গা বৈদ্যানীর বড়ুয়া পালক পুত্রের বংশে নবরাজ বড়ুয়া নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধ পরিচয় নামে একখানি বাঙ্গলা পদ্য পুস্তক রচনা করেন। পালি ভাষায় ও বঙ্গভাষায় তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। এই বৈদ্যপাড়ায় দুইজন বৌদ্ধধর্ম্ম যাজকের নাম উল্লেখযোগ্য। রাধাচরণ ঠাকুর প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধ গয়া হইতে বোধিবৃক্ষের বীজ হইতে উৎপন্ন একটী চারা আনিয়া বৈদ্যপাড়ায় রোপন করেন। সেই রোপিত বৃক্ষ এখনও বৈদ্যপাড়ায় বর্ত্তমান আছে। বৈদ্যানীর কেয়াংএর ত্রিপুরা ঠাকুর বর্ষাকালে তিন মাস মাত্র বিহারে থাকিতেন। অবশিষ্ট নয় মাস বৈদ্যপাড়ার নিকটবর্ত্তী করলডেঙ্গা পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কথিত আছে, তিনি ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিয়া জঙ্গল পরিভ্রমণ করিতেন। শ্রীমৎ বেদানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক আবিস্কৃত মেধসাশ্রমের পাহাড়ে ইনি অতি পূর্ব্বে একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কিছুদিন বাস করেন। কিন্তু একদিন স্বপ্নে কোন মহাপুরুষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ পাহাড় পরিত্যাগ করেন। তৎসমীপবর্ত্তী অপর একটী পাহাড়ে তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। তদবধি মেধসাশ্রমের সংলগ্ন একটী সমুচ্চ পর্ব্বত উক্ত ঠাকুরের আশ্রম নামে খ্যাতিলাভ করে। এক্ষণে সেই পাহাড়ে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। হিন্দুগণ মেধসাশ্রম দর্শনে উপস্থিত হইলে এই বুদ্ধমূর্ত্তিও দর্শন করিয়া থাকেন।

বৈদ্যপাড়ায় বৈদ্যগণের শিশু চিকিৎসার একটা বেশ সুনাম আছে। চট্টগ্রামের যে কোন স্থানে শিশুদের উৎকট পীড়ায় এই বৈদ্যপাড়ার শিশু চিকিৎসকগণ চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া থাকেন। এই স্থানের পুরুষ চিকিৎসক ব্যতীত স্ত্রী চিকিৎসকেরও যথেষ্ট সুনাম আছে। আমরা বাল্যকালে রাজপতি মগিনী নামে একজন বর্ষীয়সী বড়ুয়া রম-ণীকে শিশু চিকিৎসা করিতে দেখিয়াছি। ইনি শিশু চিকিৎসা ও ক্ষত চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শি ছিলেন। পুরুষ চিকিৎসকদের মধ্যে এখানকার কুলচন্দ্র বৈদ্য ও তৎপুত্র ধর্ম্মচরণ বৈদ্যের বিশে খ্যাতি আছে। প্রসিদ্ধ আমিরচাঁদ বৈদ্যের বংশের কৃষ্ণচন্দ্র বৈদ্য এখন বেশ সুখ্যাতির সহিত চিকিৎসা করিতেছেন।

চট্টগ্রামে আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা।

পটীয়ার অন্তর্গত চক্রশালা গ্রামে বৈদ্য বিশার নামে একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার বংশে শ্রীযুক্ত নীলকমল দাস কবিরাজ মহাশয়ের জ হইয়াছে। ইনি বর্ত্তমানে চট্টগ্রামের শ্রেষ্ঠ কবিরাজ। তাঁহার বয়স ১১০ বৎসর। চট্টগ্রামের শিবচন্দ্র কবি রাজ ও তৎপুত্র তারাচরণ কবিরাজ সংস্কৃত ভাষা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। চিকিৎসা ব্যবসায়ে তাঁহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। শ্রীপুর গ্রামে বৈদ্যবংশ চট্টগ্রামে বিশেষ পরিচিত। এই বং মৃত্যুঞ্জয় বৈদ্য (মিতু বৈদ্য) নামে একজন প্র চিকিৎসক ছিলেন। ধলঘাট গ্রামের কাশীন কানুনগোএর চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে অদ্ভুত অ গল্প এখনও চট্টগ্রামের লোকমুখে প্রচলিত আছে। চট্টগ্রামের গোবিন্দদাস কবিরাজ সংস্কৃত ভাষা বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার চিকিৎসা প্রণা বড়ই সুন্দর ছিল। তিনি চট্টগ্রামের একজন প্র চিকিৎসক ছিলেন। বঙ্গভাষায়ও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞ ছিল। তাঁহার রচিত অনেক সঙ্গীত আছে। স্বন খ্যাত স্বর্গীয় রামকিনু ডাক্তার * ও ডাক্তার অ চরণ খাস্তগীর এ দেশের সর্ব্ব প্রথম এলোপ্যা ডাক্তার। তাঁহারা উভয়েই স্বদেশবৎসল ও স্বা চেতা ছিলেন।

* ইঁহারই পৌত্র কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত।

চট্টগ্রামে সঙ্গীত চর্চ্চা।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীরের ভ্রাতা স্বর্গীয় শ্যামাচরণ খাস্তগীর সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। তাঁহার রচিত অনেক গান আছে। তিনি খুব ভাল গাহিতে পারিতেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতা নগরীতেও এক সময়ে তাঁহার রচিত সঙ্গীত খুব আদরের সহিত গীত হইত। কানুনগোপাড়া নিবাসী ৺ রামচন্দ্র কানুনগো সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। সঙ্গীত রচনায় নয়াপাড়া নিবাসী ৺ ত্রিপুরাচরণ রায় মহাশয় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভোলানাথ মুন্সী, ষষ্ঠীচরণ কবিরাজ, দুর্গাচরণ পাঠক, ঈশানচন্দ্র কুণ্ডু, জগচ্চন্দ্র দাস গুপ্ত ও পণ্ডিত জগচ্চন্দ্র শর্ম্মার রচিত অনেক সঙ্গীত এখনও চট্টগ্রামের স্থানে স্থানে সাদরে গীত হইয়া থাকে।

চট্টগ্রামের প্রাচীন পণ্ডিতগণ!

৺ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন চট্টগ্রামের একজন তেজস্বী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপ সভায় বিশেষরূপে সম্মানিত হন। কথিত আছে, দ্রাবিড়ী পণ্ডিতগণকেও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ৺ কেবলরাম ন্যায়পঞ্চানন, কৃষ্ণকান্ত তর্কপঞ্চানন, কালীকান্ত বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চট্টগ্রামের গৌরবস্থল ছিলেন। পণ্ডিত ভৈরবচন্দ্র ন্যায়ভূষণ চট্টগ্রাম সহরে একটী বড় লাইব্রেরী ও একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। অনেক সাহেব ও ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী ন্যায়ভূষণ মহাশয়কে গৃহ শিক্ষক রাখিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। ৺ রামগোবিন্দ ন্যায়বাগীশ পুরাণ পাঠে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ৺ রামগোবিন্দ ন্যায়রত্ন জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

চট্টগ্রামের প্রাচীন জ্যোতিষী।

হাবিলাস দ্বীপনিবাসী বিদ্যাবিশারদ একজন প্রবীণ জ্যোতিষী ছিলেন। ১৬৬৬ শকাব্দে কৃষ্ণাচার্য্যের পাণ্ডুলিপি তিনি স্বহস্তে তালপাতায় লিখিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা বিদ্যাবিশারদ শাকপুরা নিবাসী জমিদার লালা রাম রায় মহাশয়ের সভায় ফলিত জ্যোতিষ গণনায় সভাস্থ সমস্ত লোককে বিমোহিত করিতেন। প্রাচীন লোকের মুখে বিদ্যাবিশারদের টিকটিকী বিবাহ গণনার কথা শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হই। একদিন রায় মহাশয়ের সভায় একটী টিকটিকী লেজ নাড়িতে নাড়িতে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করতঃ দালানের থামে উঠিতে এবং নামিতে দেখা যায়। তদ্দর্শনে রায় মহাশয় বিদ্যাবিশারদকে প্রশ্ন করেন আপনাকে এই টিকটিকীর বিষয় গণনা করিয়া দিতে হইবে। বিশারদ গণনা করিয়া বলিলেন "অদ্য এই টিকটিকীর বিবাহ হইবে এবং পাত্র দক্ষিণ দিক হইতে আসিতেছে; এ নিমিত্ত টিকটিকী আনন্দে নৃত্য করিতেছে।" কিছুক্ষণ পরে সাতকানিয়ানিবাসী দুইজন প্রজা কয়েকটী উত্তম পাটী রায় মহাশয়কে উপঢৌকন দিতে আসিলে সেই পাটীর বোঝার ভিতর হইতে একটী টিকটিকি বাহির হইয়া ঐ টিকটিকির সহিত নাচিতে নাচিতে উভয়ে দালানের উপর চলিয়া গেল। তদ্দর্শনে রায় মহাশয় ও তদীয় অমাত্যবর্গ জ্যোতিষীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় পুরস্কারস্বরূপ বোয়ালখালীর দুইখানা জালের ফাঁড়ি এবং পাঁচখানি জমি নিষ্কর করিয়া জ্যোতিষীকে দান করেন। সেই নিষ্কর ভূমি ও ফাঁড়ি হাবিলাস দ্বীপনিবাসী বিশারদের বংশধরগণ এখনও ভোগ করিতেছেন। বিদ্যাবিশারদ জ্যোতিষ শাস্ত্রের কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছেন।

কেলীসহর গ্রামনিবাসী বিদ্যাবৃহস্পতি পরৈকোড়ার জমিদার ৺ বৈদ্যনাথ রায়ের বাড়ীতে সভাপণ্ডিত ছিলেন তিনি একদিন সভার কার্য্য সম্পাদন করিয়া নিজ বাড়ীতে আসিবার সময় রায় মহাশয় বলিলেন "আগামী মাসের শেষে আপনি একবার সভাস্থ হইবেন।" তদুত্তরে বিদ্যাবৃহস্পতি বলিলেন "এবার আমার জীবনের আশঙ্কা আছে, আমি আগামী মাসের মধ্যে কোন বন্যপশু—ব্যাঘ্র কিম্বা বরাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারি। যদি ভগবানের কৃপায় বাঁচিয়া থাকি তবে পুনঃ সভাস্থ হইব, নতুবা

এই শেষ দেখা।" এই বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। অতঃপর একদিন প্রাতঃকালে তিনি পুরীষ পরিত্যাগের জন্য পুকুর পাড়ের বহির্ভাগে বসিলে একটি ব্যাঘ্র লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি ভীষণ চীৎকার করিলে পাড়াস্থ সমস্ত লোক আসিয়া উপস্থিত হয়, ব্যাঘ্রটী পলাইয়া যায়। তাঁহার জীবন রক্ষা হইল। প্রায় তিন মাস ভুগিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন। রায় মহাশয় বিদ্যাবৃহস্পতিকে ডাকাইয়া পাঠান। বিদ্যাবৃহস্পতি সভাস্থ হইলে রায় মহাশয় তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করেন এবং কতক ভূসম্পত্তি দান করেন। কেলীসহরনিবাসী আচার্য্যগণ এক্ষণে তাঁহার বংশধররূপে ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আচার্য্যগণ ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যেও অনেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। স্বর্গীয় গুণালঙ্কার ভিক্ষু (গুণমিহি) জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মহাকবি ৺নবীনচন্দ্রের জন্মভূমি চট্টগ্রামে বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরাগল খাঁ গৌড়াধিপতি হুসেন সাহের সেনাপতি ছিলেন। হুসেন সাহের আদেশক্রমে ইনি চট্টগ্রামে আসিয়া মগদিগকে বিতাড়িত করেন। চট্টগ্রাম জেলায় জোয়ারগঞ্জ থানার অধীনে পরাগলপুরে পরাগল খাঁর কবি পরমেশ্বরের ও পরাগল খাঁর পুত্র ছুটীখাঁর নির্দ্দেশক্রমে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অনুবাদ করেন। মুসলমান কবি আলওয়াল তাঁহার প্রসিদ্ধ পদ্মাবতী কাব্যের জন্য সর্ব্বত্র পরিচিত আছেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন; তাঁহার জন্মস্থান সম্ভবতঃ চট্টগ্রামে। চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাটহাজারির নিকটে আলপয়ালের দীঘি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই দীঘির পাড়ে মসজিদ ও কবর বিদ্যমান আছে। বন্ধুবর মৌলবী আবদুল করিম অনেক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। সমস্ত সংগৃহীত পুঁথির সাহায্যে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, চট্টগ্রাম প্রাচীন কালে প্রায় ৪০০ শত হিন্দু ও মুসলমান কবির লীলাক্ষেত্র ছিল। এজন্য আমরা চট্টগ্রামকে কবির দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। এদেশে অনেক দিন হইতে বহু সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। নিম্নে সংবাদপত্রের তালিকা প্রদত্ত হইল।

সাপ্তাহিক পত্রিকা—	মাসিক পত্রিকা—
পূর্ব্ব প্রতিধ্বনি—	অঞ্জলি—
পূর্ব্ব দর্পণ—	বৌদ্ধ বন্ধু—
চট্টল গেজেট—	সাহিত্য—
সংশোধিনী—	আলো—
পাঞ্চজন্য—	প্রভাত—
জ্যোতিঃ—	
হিতবার্ত্তা—	

আমার প্রিয়বন্ধু "আলো" সম্পাদক ৺নলিনীকান্ত সেনের চেষ্টায় আমরা বহুবর্ষ পূর্ব্বে অধ্যয়ন সাম্মলনী নামে একটা সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বি, এল, এই সভার সম্পাদক ছিলেন। এই সাহিত্য সভা এক্ষণে পরিষদের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

চট্টগ্রামে বৈষ্ণব প্রভাব।

মেখলের বৈষ্ণব চূড়ামণি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নাম বিদ্বৎসমাজে বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাঁহার বংশে অনেক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। এখনও তাঁহার বংশে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আছেন। নাছিরাবাদের মহাপ্রভুর আখেরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত বৈষ্ণবগণ এখানে বাস করিয়া থাকেন। সপ্তাহে একদিন মাত্র বৈষ্ণবগণ ভিক্ষা করেন। চট্টগ্রামের তুলসীদাস মহন্তের আখেরা, হরিদাস মহন্তের আখেরা, বালক দাস মহন্তের আখেরা ইত্যাদি অনেক প্রাচীন আখেরা বৈষ্ণব কীর্ত্তির পরিচায়ক। সীতাকুণ্ডের মেলা উপলক্ষে সমাগত বৈষ্ণব মণ্ডলীর প্রেমতলায় সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া প্রাণোন্মাদ নাম সঙ্কীর্ত্তন একট মহৎ ব্যাপার বলিতে হইবে। বৈষ্ণব চূড়ামণি সুকণ্ঠ শ্রীমুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

দেবের প্রধান ভক্ত ছিলেন, তিনি মহাপ্রভুর আনন্দ বিধানার্থ মধুর কণ্ঠে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। চট্টগ্রামেই এই ভক্ত চূড়ামণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদীয় প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, মুকুন্দরামের শালগ্রাম-শিলার একখণ্ড প্রতিকৃতি পাঠকবর্গকে সাদরে উপহার দিলাম। জগৎ গোঁসাই অর্থাৎ জগচ্চন্দ্র গোস্বামী সর্ব্ববিদ্যার সমাধি স্থানে (চট্টগ্রাম বিনাজুরী গ্রামে) প্রতি বৎসর তদীয় ভক্তগণের মহোৎসব ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। গোস্বামী মহাশয় আকিয়াবের চট্টলপ্রবাসী ব্যবসায়ীগণের সাহায্যে তথায় গৌরাঙ্গ ভাণ্ডারের

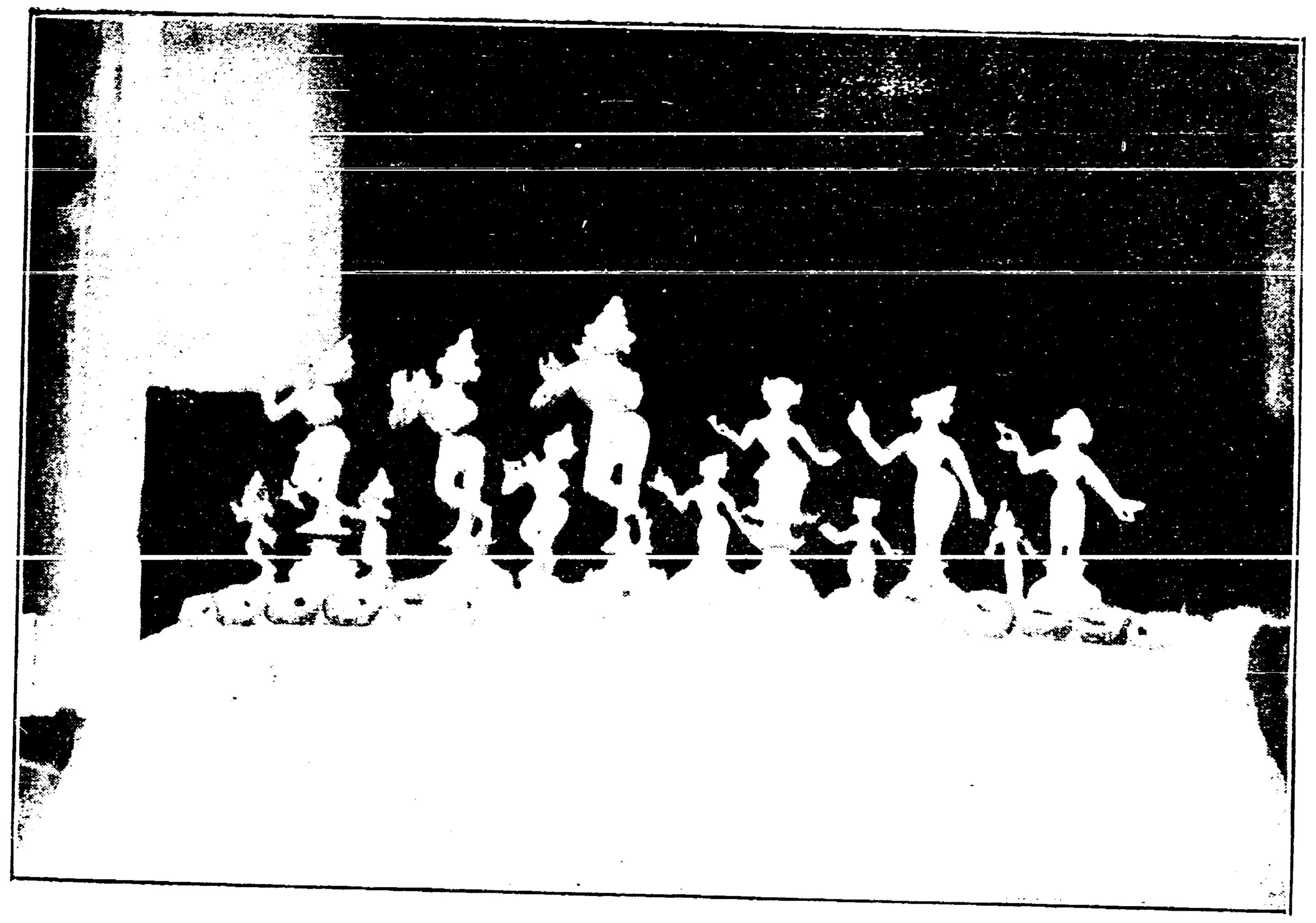

মুকুন্দরামের শালগ্রাম শিলা।

প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গোস্বামী মহাশয় বঙ্গভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি 'ভরতবংশ', 'ভারত বিপ্লব', 'অজ্ঞাতবাস' কাব্য রচনা করেন। তাঁহার "গীতামৃতরস' গীতার সরল পদ্যানুবাদ তদীয় ভক্তগণের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

চট্টগ্রামের জলবায়ু।

এখানকার আবহাওয়া অতি পূর্ব্বে খুব ভাল ছিল। এদেশে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক লোক দূরদেশ হইতে আসিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুপণ্ডিত স্যার উইলিয়ম জোন্স পাহাড়তলীর একটী পাহাড়ে বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। এক্ষণে ঐ বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। সাধারণ লোকে উহাকে জোন্স্ সাহেবের বাঙ্গলা বলিয়া থাকে। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে এদেশে এক ভীষণ ঝটিকা (cyclone) হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর রাত্রে পুনরায় এক ভীষণ ঝটিকা হয়, ইহাতে সন্দ্বীপ ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রায় ১,৭০,০০০ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা "৩৮ মগীর তুফান" নামে এখানে পরিচিত, অর্থাৎ ১১৩৮ মগীতে এই ভীষণ ঝটিকা হইয়াছিল। এই ঝটিকার পর হইতেই চট্টগ্রামের জলবায়ুর অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়, এই সময় সমুদ্রের লবণাক্ত জল উঠিয়া দেশকে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত করিয়া তোলে, এই সময় হইতেই চট্টগ্রামের ম্যালেরিয়া জ্বরের বদ্‌নাম রটিতে থাকে।

বাস্তবিকই ঐ সময় হইতেই কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এখানকার লোক অকাল কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে চট্টগ্রামে একটা ভীষণ ভূমিকম্প হয় এবং

সেই বৎসরের ২৪এ অক্টোবর তারিখে পুনরায় ভীষণ ঝটিকা (cyclone) হয়। ইহাতে চট্টগ্রামের অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কুতুবদিয়া দ্বীপ একেবারে জলমগ্ন হয়। কিন্তু এই একই বৎসরে ভূমিকম্প ও ঝটিকায় চট্টগ্রামের প্রভূত পরিমাণে ক্ষতি হইলেও মঙ্গলময় ভগবান অমঙ্গলের ভিতর দিয়াও তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করেন। এই ভূমিকম্প ও ঝটিকার পর হইতেই চট্টগ্রামের জলবায়ুর অনেক উন্নতি হয়। এখন আর এদেশে ম্যালেরিয়া নাই এবং কোন দুরারোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাবও তেমন দেখা যায় না। সহরে ও পল্লীতে রোগীর সংখ্যা তত অধিক নহে, সুতরাং চিকিৎসা ব্যবসাও এখন আর এদেশে তত অর্থকরী নহে।

জুলদা, কুতুবদিয়া, সাতকাণিয়ার অন্তর্গত থানথানাবাদ প্রভৃতি কয়েক স্থানের জলবায়ু অনেকটা স্বাস্থ্যপ্রদ, এখন আর এ দেশের লোকের স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য বৈদ্যনাথ, মধুপুর, গিরিধি প্রভৃতি স্থানে যাওয়ার আবশ্যক করে না। এখন অনেক রোগীই উপরোক্ত স্থান সমূহের কোন স্থানে গিয়া পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন।

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর জল অতীব উপাদেয়। এই দেশে এই সমস্ত প্রস্রবণকে ঝরণা বলে। চট্টগ্রাম সহরে অনেক ঝরণা আছে, তন্মধ্যে বদরের ঝরণা, শীতল ঝরণা, দোনালী ঝরণা, মাছুয়া ঝরণা সমধিক প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রাম সহরের অনেকেই ঝরণার পানীয় জল ব্যবহার করেন। চট্টগ্রাম সহর উত্তর দিক হইতে সরিয়া ক্রমেই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণে চরভরট স্থানে সহর সরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখানকার জল অত্যন্ত খারাপ, চরবস্তি বলিয়া কি পাতকুয়া কি পুকুরের জল পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। সহরের উত্তরাংশে জলের তেমন কষ্ট নাই, তথায় পুষ্করিণীর জল স্বচ্ছ, এমন কি কোন কোন পুষ্করিণীতে একাধিক প্রস্রবণ আছে। দেওয়ারা বাজারের শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের পুষ্করিণীতে ১২টী ঝরণা আছে। এই সহরের বক্সিরঘাট, আন্দর কিল্লা ও বাণ্ডেলে যে জলের কল হইয়াছে, এই একটী মাত্র পুকুরের জলই সমস্ত স্থানের জল যোগাইতেছে, এক বদরের ঝরণা হইতে প্রতি মিনিটে ৮০ গ্যালন জল বহির্গত হয়। সমস্ত ইংরেজ মহলে এই ঝরণার জল বাষ্পীয় কলে প্রেরিত হইয়া থাকে। চট্টলের পল্লীগ্রামে তেমন জলকষ্ট নাই। প্রতি পল্লীতে অসংখ্য পুষ্করিণী ও দিঘী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এ দেশের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে ও পিছনে দুইটী করিয়া পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়, এইরূপ পুষ্করিণীর ব্যবস্থা বোধ হয় চট্টগ্রামে বৌদ্ধ প্রভাব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, চট্টগ্রামে সব্‌ডিভিসন কাক্সবাজার ও ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ এখনও পানীয় জলের জন্য পৃথক পুষ্করিণী সংরক্ষিত করিয়া রাখে।

যে পুষ্করিণীতে তাহারা স্নান কিংবা ধৌত ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহার জল তাহারা কখনও পান করে না এবং পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত পুষ্করিণীতে অঙ্গুলী পর্য্যন্ত ডুবায় না। এখনও আমাদের দেশের গৃহস্থ বাড়ীতে পিছনের পুকুর ধৌত ক্রিয়ার জন্য এবং সম্মুখের পুকুর শুধু স্নান ও পানীয় জলের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অথবা এইরূপ পুষ্করিণী বাহুল্য হয়ত হিন্দুদের জলদানের ধর্ম্মভাব প্রণোদিত; হিন্দুগণ প্রায়ই ধর্ম্মোদ্দেশ্যে দির্ঘীকা খনন, জলা[শয়] প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে আরো বলিবার অনেক কথা রহিয়া গেল। প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ হইতেছে বলিয়া সংক্ষেপে কোন কোন বিষয়ের সামান্য অবতারণা করিলাম মাত্র। আশা করি, কোন যোগ্যতর ব্যক্তি চট্টলের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন কালে সমস্ত বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়া চট্টগ্রামের গৌরব বর্দ্ধিত করিবেন।

সমাপ্ত।

শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী।

রাজামন্দ্রী।

মান্দ্রাজ হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে রাজামন্দ্রীতে নামি। রাজামন্দ্রী গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা; পুণ্যসলিলা গোদাবরী তীরে অবস্থিত।

বাসায় গিয়া স্নানের উদ্যোগ হইতে লাগিল। বন্ধুগণ কূপের জলে স্নানের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, কিন্তু মন তাহাতে সায় দিল না। গোদাবরী এত নিকটে থাকিতে কূপের জলে স্নান করিতে পারিলাম না; গোদাবরীতেই স্নান করিতে গেলাম।

অসংখ্য নরনারী গোদাবরীতে স্নান করিতে নামিয়াছে। দূর-বিস্তৃত নদী; এক অংশে জল, অধিকাংশ স্থানেই বালির চর উঠিয়াছে। রেলের পোলটি গোদাবরীর ঘাট হইতে দেখিতে সুন্দর। একখানি ছোট ষ্টীমার আসিতেছে দেখিতে পাইলাম। গোদাবরী জেলার অভ্যন্তরে যাত্রী লইয়া ষ্টীমারখানি যাতায়াত করে।

স্নানের পর শরীর স্নিগ্ধ হইল; মান্দ্রাজে বাঙালীর আহার পাইয়াছিলাম, এখানে ভাত, ঘি ও মান্দ্রাজী তরকারী পাইলাম। তরকারী দুইটিতে এত ঝাল যে চোখ মুছিতে মুছিতে গলাধঃকরণ করিতে হইল। অপরাহ্নে জনৈক বন্ধুর সহিত স্থানীয় ভিরেশলিঙ্গম্ ব্রহ্মবিদ্যালয় দেখিতে গেলাম। রাজামন্দ্রীতে একটি প্রথম শ্রেণীর গবর্ণমেণ্ট কলেজ আছে, এতদ্ব্যতীত একটি ট্রেনিং কলেজ আছে; তাহা সত্বেও এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন ছিল কি না ইহাই মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে গোযানে উঠিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাঙামাটির পথগুলির ধূলি উড়াইয়া গাড়ী আমাদের ভিরেশলিঙ্গম্ ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করিল। বিদ্যালয় বাটীর সম্মুখ ভাগ দেখিয়া উহার আকার হঠাৎ বুঝিতে পারা যায় না। ভিতরে প্রবেশ করিয়া চারিদিক পরিক্রমণ করিয়া আসিতে অনেকটা সময় লাগিল। প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় এই পবিত্র বিদ্যামন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া যান। বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী শিক্ষাদানের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইলেও কলিকাতার কোনো বেসরকারী কলেজের বাড়ী উহা অপেক্ষা মনোরম বা বৃহৎ নহে। মান্দ্রাজ ও সাউথ মারাঠা রেলপথের ধারেই বিদ্যালয়টি অবস্থিত। দ্বিতল হইতে রেলপথের অপর পার্শ্বে অবস্থিত শ্যামল গিরিশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার, পুস্তকাগার, পাঠাগার প্রভৃতি দেখিয়া শ্রেণীগুলি দেখিতে গেলাম। এখানে একটি বিশেষত্ব দেখিলাম, প্রায় সকল শ্রেণীতেই ছেলেদের সহিত মেয়েরা পড়িতেছে। মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট আছে এইমাত্র প্রভেদ। বন্ধু আমাকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহার সহিত কথা কহিয়া জানিলাম, ছেলে মেয়েদের একত্র পাঠে কোনরূপ অসুবিধা হয় না; ছেলেরা মেয়েদের প্রতি সর্ব্বদাই শিষ্ট ও সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। কলিকাতায় ও ভারতবর্ষের কোনো কোনো প্রধান নগরে কলেজ বিভাগে ছেলেদের সহিত মেয়েদের পড়িবার ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু স্কুল বিভাগের উচ্চতর শ্রেণীতে এরূপ ব্যবস্থা এই প্রথম দেখিলাম। এইরূপ একত্র পাঠের ফলে বালিকাগুলি কতকটা নির্ভীক হয় ও প্রতিযোগীতার বিস্তৃত ক্ষেত্র পাইয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের অপেক্ষা অধিক জ্ঞান ও শক্তি লাভ করে বলিয়া মনে হয়। এইরূপ একত্র পাঠের পক্ষে অসুবিধাও কিছু কিছু আছে, তাহা যাঁহারা এ কার্য্যে ব্রতী তাঁহারা অবশ্যই জানেন। মান্দ্রাজ প্রদেশে পারিয়া জাতি সকলের ঘৃণিত। পারিয়া ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য, এমন কি তাহার বাতাস ব্রাহ্মণের গায়ে সহিবে না, তখনি স্নান করিতে হইবে। রাজামন্দ্রীর খ্রীষ্টান পাদ্রীগণও এই পারিয়াদের সকল সময়ে নিজেদের বিদ্যালয়ে লইতে সাহস পান না, কারণ তাহা হইলে হিন্দু সমাজের লোকের নিকট হইতে তাঁহারা যে উদাসীন (passive) সহানুভূতি পাইয়া থাকেন,

সেটুকুর পরিবর্ত্তে বিরোধ জাগিয়া উঠিবে। কিন্তু এই ভিরেশলিঙ্গম্ ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে অবাধে পারিয়া ছাত্র ছাত্রীদের ভর্ত্তি করা হয় এবং যাহাতে তাহাদের মধ্যে আত্মোন্নতির চেষ্টা প্রবল হয় ও অর্থের অভাব তাহাদের শিক্ষার পথে অন্তরায়স্বরূপ না হয়, এজন্য পারিয়াদিগকে বিনা বেতনে এখানে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধিকল্পে অন্যান্য জাতির বালিকাদিগকেও এই বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশেও একটি ব্রাহ্মণ কন্যা পড়িতেছেন। ইনি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, তাহার পরে এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের পরও ইনি বিদ্যালয় ত্যাগ করেন নাই।

ভিরেশলিঙ্গম্ দম্পতি।

ব্রহ্ম বিদ্যালয় দেখিয়া গোযানে উঠিলাম; বলিলাম ভিরেশলিঙ্গম্ মহোদয়ের আশ্রমে যাইব। গাড়ী চলিল; মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এই ব্যক্তি কর্ম্মী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিদ্যালয়ের সহিত নিজের নামটি জড়িত করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের পরিচয় দিতে পারেন নাই। সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হওয়া যাইতেছে, এমন সময় সঙ্গী বলিলেন, ভিরেশলিঙ্গম্ অন্য দিক হইতে গোযানে আসিতেছেন। তখনি গাড়ী হইতে নামিলাম, সঙ্গী আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার গাড়ী থামাইলেন। সেই চীরবাসপরিহিত দীনমূর্ত্তি দেখিয়া সম্ভ্রমে নত হইলাম। ভিরেশলিঙ্গমের বয়স হইয়াছে, শরীরও নিতান্ত অপটু; কিন্তু উৎসাহে তিনি এখনো যুবক। একেবারে শয্যাগত না থাকিলে তিনি প্রতিদিন একবার বিদ্যালয়ে যাইবেনই। সেই অসুস্থ শরীরে বৃহৎ বিদ্যালয় বাটীর সমস্ত অংশ একবার পরিক্রমণ করা তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে। আমি তাঁহার কাজে ব্যাঘাত না করিয়া বিদ্যালয় পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিতে চাহিলাম, তিনিও আনন্দে আমার ইচ্ছার অনুমোদন করিলেন বিদ্যালয়ে গিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া তিনি পাঠাগারে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁহার সহিত অনেক বিষয়ে আলোচনা হইল। আলোচনার শেষে তিনি আমাকে তাঁহার আশ্রমে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন প্রাতে ডাউন মান্দ্রাজ মেলে আমার কলিকাতায় আসিবার কথা, কাজেই প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহার আশ্রম দেখিব ও সেখান হইতে একেবারে ষ্টেসনে যাইব, এইরূপ স্থির হইল।

ভিরেশলিঙ্গম্ ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত গঙ্গানা মহাশয়ের আতিথ্যস্বীকার করিয়াছিলাম। রাত্রে তাঁহার সহিত অনেকটা সময় কথায় বার্ত্তায় কাটিল। ভিরেশলিঙ্গম্ মহোদয়ের নাম বিদ্যালয়ের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইল, তাহার ইতিহাস জানিতে পারিলাম। এই মহাত্মার অজ্ঞাতসারে গুণগ্রাহী পিঠাপুর রাজের ইচ্ছায় ও গোপন চেষ্টায় মান্দ্রাজের শিক্ষাবিভাগ হইতে বিদ্যালয়টির নাম পরিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে উহার নাম ছিল উচ্চ ইংরাজী ব্রহ্ম বিদ্যালয়; পরে "ভিরেশলিঙ্গম্ উচ্চ ইংরাজী ব্রহ্ম বিদ্যালয়" নামকরণ হয়। ভিরেশলিঙ্গম্ মহাশয় যখন পিঠাপুর রাজের এই কাণ্ড জানিতে পারিলেন, তখন ঐ নাম পরিবর্ত্তনের আর উপায় ছিল না। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অট্টালিকা পিঠাপুর রাজের অর্থেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

ভোরে উঠিয়াই প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া মিঃ গঙ্গানার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গোযানে উঠিলাম। তখনো ফরসা হয় নাই; রাজামন্দ্রীর রাজপথে তখনো লোক চলিতে আরম্ভ করে নাই। গোযান ধীরে ধীরে যখন আশ্রম পথে প্রবেশ করিল, তখন দুই পাশের উচ্চ শির স্নিগ্ধ তরুরাজি দেখিয়া মন আপনা হইতেই বলিতে লাগিল—

"যো দেবোহগ্নৌ যোপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥"

ইঁহারা বালবিধবা, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের অধিবাসিনী। সেই পথের প্রান্তে লতামণ্ডপের মধ্যে একটি উপাসনামন্দির আছে; আশ্রমবাসিনীগণ সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। আমরা মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলাম। এই সময়ে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল—বৃষ্টিপাতের সেই মর্ম্মরধ্বনির মধ্যে মন্দির হইতে নারীকণ্ঠের ব্রহ্মসঙ্গীত কর্ণে পৌঁছিতে লাগিল। সেদিনকার সেই প্রভাতের ভাব ভাষায় বর্ণনা করিতে পারি না। চারিদিকে বৃক্ষরাজির শ্যামল শোভা-বিকশিত পুষ্পসমূহের সম্মিলিত সৌরভ, আশ্রমের পবিত্র বাতাস, বৃষ্টির মৃদু গুঞ্জন ব্রহ্মচারিণীদিগের

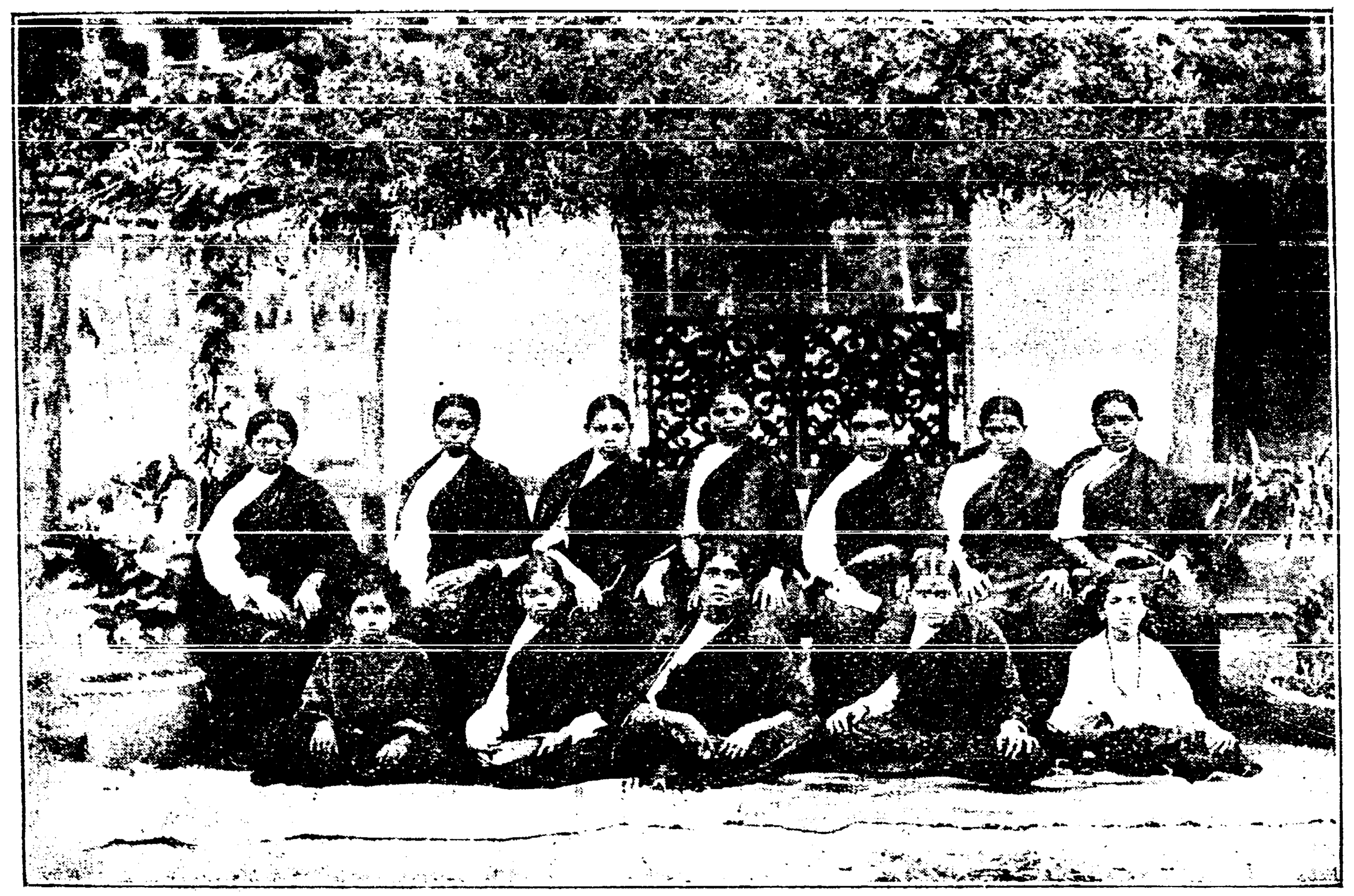

রাজামন্দ্রী বিধবা আশ্রম।

প্রত্যূষে দেবতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে নমস্কার করিতে পারিয়া মনটা প্রফুল্ল হইল। মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে এমন আনন্দ আর কখনো পাই নাই। আশ্রমদ্বারে ভিরেশলিঙ্গম দণ্ডায়মান ছিলেন, গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া আশ্রম ও আশ্রমসন্নিহিত অসংখ্য তরুলতার পরিচয় দিতে দিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরই উদ্যান পথে কয়েকটি নারীকে যাইতে দেখিলাম। যেন উদ্যানপথে বনদেবীর সারি দেখিলাম। ভিরেশলিঙ্গম বলিলেন

কণ্ঠনিঃসৃত ভক্তিরসধারা, তদুপরি সাধু ভিরেশলিঙ্গমের পবিত্র সঙ্গ, এই সব মিলিয়া যেন একটি অপূর্ব্ব স্বর্গলোকের আভাস জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

এই সুবৃহৎ উদ্যান পরিক্রমণ করিবার সময় কয়েকটি ছোট ছোট বাড়ী দেখিয়াছিলাম। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যাঁহারা বিধবাবিবাহ করায় আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের জন্য ঐ সকল বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েকটি পরিবার সেখানে বাস করিতেছেন দেখিলাম। ভিরেশলিঙ্গম্ তেলেগু গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিয়া বিখ্যাত,

এ হিসাবে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তুলনীয়। বালবিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহ প্রচলনকল্পে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তুলনীয় এবং বিধবাদিগকে শিক্ষা ও আশ্রয় দিবার নিমিত্ত তিনি যে স্বার্থত্যাগ ও সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তুলনীয়। ভিরেশলিঙ্গম্ মহোদয়ের সহিত বিধবাশ্রমের প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাহনগরের সেই বিধবাশ্রমের চিত্র মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান এমনি নীরবে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার সৌরভ কখনও লুক্কায়িত থাকে না। বিধবা আশ্রম দেখাইয়া ভিরেশলিঙ্গম্ বলিলেন, "আমার সহধর্ম্মিণীর দেহান্ত হইবার পর হইতে আমি এ কাজে জোর পাইতেছি না, এ কাজে তিনি আমার ডান হাত ছিলেন, এ কাজ তাঁরই কাজ ছিল।" অল্প দিন হইল, ভিরেশলিঙ্গম্ মহোদয় তাঁহার অবশিষ্ট সম্পত্তি লোকসেবায় উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। এখন তিনি ভিখারী। ত্যাগেই ভারত যুগে যুগে পরমের সন্ধান পাইয়াছে। এ যুগেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

রাজামন্ত্রীর টাউনহল, ব্রহ্ম মন্দির, ক্লাব প্রভৃতি ভিরেশলিঙ্গম্ মহোদয়ের অর্থেই নির্ম্মিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশের উত্তর ভাগে এমন কোনো সৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান হয় নাই, যাহাতে ভিরেশলিঙ্গম্ মহোদয়ের চিন্তা বা অর্থ নিয়োজিত হয় নাই। ইঁহার ন্যায় মহাত্মার জীবন-কাহিনী আলোচনা করিলে মনে হয়, এই স্বার্থান্ধতার দিনেও ভারতে ত্যাগীদিগের বংশধারা লুপ্ত হয় নাই।

আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া আসিবার পর সেই বার্দ্ধক্যপীড়িত অথচ চির-নবীন পুরুষসিংহের নিকট হইতে সবিনয়ে বিদায় প্রার্থনা করিলাম। রাজামন্ত্রীতে নামিয়া এই কর্ম্মবীরের আশীর্ব্বাদ লাভ জীবনের একটি পরম লাভ বলিয়া চিরদিন স্মরণ করিব।

সংস্কার ও অন্যান্য কার্য্যে আমরা অগ্রদূত হইলেও, ভারতের অন্যান্য জাতি যে নীরবে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে ও আমাদের বর্ত্তমান রক্ষণশীলতার জড়তা দূর না হইলে অচিরেই উহারা যে আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া নূতন পথের প্রদর্শক হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবাহন।

পদতলে তব পরাণ লুটায়ে
কাঁদিছে পড়িয়া ওই!
ওগো কৃপাসিন্ধু করুণার বিন্দু
সিঞ্চিলে জীবনে কৈ?
দুঃখ দীর্ণ হৃদয় ভেদিয়া
শত হাহাকার ধ্বনিছে।
ধীরে ধীরে ধীরে, নিরাশা তিমিরে,
মরম ছাইয়া ফেলিছে।
ভেঙে যায় ঐ সোণার স্বপন,
মরীচিকা ঘেরা জীবনে!

আলো নিভে যায়, হাসিটি ফুরায়,
কিছু নাহি ভায় নয়নে!
এস চিন্ময়! চিত্ত সরজে
মোহন রূপ বিকাশ!
পলে পলে ভিত, এমলিন চিত,
প্রেমালোকে তব পরশ!
বহে যাক্ প্রাণে ভকতি লহরী
ফুটুক আননে হাসি!
হৃদি শতদল প্রেমে ঢল ঢল
হোক, হেরে রূপরাশি!

শ্রীসরলাসুন্দরী নাগ।

বাবরের জীবনী।

শাহা বেগম কলের পুতুলের ন্যায় বাবরের মস্তক কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বাবর নিতান্ত সহজ সুরে বলিলেন, "নানী সাহেবা! যুদ্ধই যখন শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন আর দুশ্চিন্তার প্রয়োজন কি?" শাহাবেগম কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "বাবর! আমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি—তোমার ন্যায় সরল শিশুকে নিদ্রিতাবস্থায় দংশন করিয়াছি, আমার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" বাবর একটু হাসিলেন এবং তার পর গম্ভীর অথচ সহজ সুরে বলিলেন, "ওঃ! খাঁন মির্জ্জার বিদ্রোহীতা! আমার মন হইতে তাহা দুঃস্বপ্নের ন্যায় কখন চলিয়া গিয়াছে। আমি জানি মাতৃস্নেহেও পক্ষপাতীত্ব আছে, তাই ভাই ভাইয়ের মধ্যে সংগ্রাম বাধিলে গর্ভধারিণী জননীও পক্ষান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন—কিন্তু সে সব কথা থাক। রাজনীতি বাহিরের জিনিষ, দরবার গৃহে আমি তাহা রাখিয়া আসিয়াছি। ইহা আমার মাতৃ মাতামহীর বিশ্রামাগার—এখানে রাজনীতির কোন অধিকার নাই, এখানে শুধু দয়া, ভক্তি ও প্রেম বিধাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। এখানে খাঁন মির্জ্জা এবং আমি উভয়েই আপনার ক্রোড়ে শুইয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে পারি। এইখানে মাথা রাখিয়া শৈশবে আমরা কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়াছি, আজ যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল উত্তেজনার মধ্যে বাহিরের শত আকর্ষণ যদিও আমাদিগের সে স্বপ্নরাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, তথাপি এ মাতৃমন্দিরের পুণ্যকক্ষে আমি ভ্রাতৃদ্রোহীতার কলঙ্ক-কালিমা প্রবেশ করিতে দিই নাই—আজিও ভ্রাতৃকলহের রক্তরেখা এ পুণ্যমন্দির কলুষিত করে নাই।" তারপর বালকের ন্যায় বাবর আপনার মাতামহীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিলেন, "নানী সাহেবা! আজ যুদ্ধের উত্তেজনায় বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি—এই দেখুন, এই শীতের দিনেও আমার সকল শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া গিয়াছে।" বাবর যখন শাহা বেগমকে এইরূপে আশ্বস্ত করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহার নিজের মাতৃষ্বসা মেহের নিজার খানুম সশব্যস্তে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আঃ! তুমি এখানে! আমরা তোমার সংবাদ আনিবার জন্য চারিদিকে বাঁদী প্রেরণ করিয়াছি। যাও, শীঘ্র যাও, তোমার স্ত্রী পুত্র সকলেই তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বসিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে আগে দেখিয়া আইস।" বাবর নিজার খানুমকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহার পদদ্বয় আলিঙ্গন করিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার সহিত আপনার স্ত্রী পুত্রদিগকে দেখিবার জন্য গমন করিলেন। চারিদিকে বাবরের আগমন সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল এবং কাবুলের অধিবাসীগণ কয়েক দিন উৎসব আমোদে অতিবাহিত করিল। অনেকে বাবরের পদধূলি গ্রহণ করিয়া সুর্ম্মার ন্যায় চক্ষের কজ্জল প্রদান করিল এবং এইরূপে বাবরের প্রতি আপন আপন মনের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, খাঁন মির্জ্জা এবং ডগ্‌লাত উভয়েই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ডগ্‌লাত বাবরের সতর্ক পাহারার জন্য কাবুল পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। শাহা বেগমের ভাণ্ডার গৃহে কার্পেট এবং গালিচা স্তূপের মধ্যে লুকাইয়াছিলেন; কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমাগত অনুসন্ধান করিবার পর কয়েকজন অনুচর মির্জ্জা ডগ্‌লাতকে গালিচা স্তূপের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিল। এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র শাহা বেগম এবং নিজার খানুম উভয়েই বন্দী ডগ্‌লাতের সহিত বাবরের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন এবং খানুম বাবরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি আমার বিদ্রোহী ভগ্নীপতিকে তোমার সমক্ষে আনয়ন করিয়াছি—মির্জ্জা রাজবিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী—কিন্তু আমি তোমার নিকট তাহার হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা

করিতেছি—” তারপর সস্নেহে বাবরের চিবুক ধারণ করিয়া খানুম বলিলেন—“বাবর! তুমি আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিবে না?” বাবর তৎক্ষণাৎ পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সকলকে অভিবাদন করিলেন এবং মির্জ্জা ডগলাতের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার করগ্রহণ করিলেন। তাহার পর সহাস্যমুখে নানারূপ কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার আলাপ ব্যবহার দেখিয়া সকলেই মনে করিতে লাগিলেন যেন কিছুই হয় নাই। ইহার কয়েক দিন পরে খাঁন মির্জ্জাও ধৃত হইয়া কাবুলে আনীত হইলেন। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; কিছুদূর যাইতে না যাইতেই রাজকীয় সৈন্যদল তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং তৎক্ষণাৎ বন্দী অবস্থায় কাবুলে লইয়া আসিল। বাবর সে সময় দরবার গৃহে বসিয়াছিলেন। দূর হইতে খাঁন মির্জ্জাকে দেখিতে পাইয়া বাবর সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং সহাস্যমুখে মির্জ্জাকে অভিবাদন করতঃ বলিলেন, “এস, আমার নিকটে এস, তোমাকে আলিঙ্গন করি।” খাঁন মির্জ্জা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন এবং সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া দুইবার পড়িয়া গেলেন; তারপর জনৈক সৈনিকের স্কন্ধে ভর দিয়া সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলে বাবর সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “মির্জ্জা সাহেব; কই তুমি ত আমাকে আলিঙ্গন করিলে না?” খাঁন মির্জ্জা নিরুত্তর, ভয়ে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। বাবর হাসিয়া বলিলেন, “ওঃ! বুঝিয়াছি, ক্রমাগত অশ্বারোহণে তুমি হয়ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছ, আচ্ছা খানিক বিশ্রাম কর।” এই বলিয়া প্রশস্ত সিংহাসনের এক পার্শ্বে কম্পিত দেহ খাঁন মির্জ্জাকে উপবেশন করাইলেন এবং হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “এই দেখ আমরা উভয়েই এক তক্তের উপর উপবেশন করিয়াছি।” তারপর জনৈক পরিচারককে সরবৎ আনয়ন করিতে বলিলেন। বহুমূল্য স্বুবর্ণ পাত্রে স্বুবাসিত সরবৎ লইয়া বাবরের বিশ্বস্ত ভৃত্য সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইল। বাবর স্বহস্তে স্বুবর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া মির্জ্জাকে বলিলেন, “এই লও সরবৎ পান কর।” মির্জ্জার মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল, তিনি চারি দিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বাবর হাসিয়া বলিলেন, “আমি আজিও পর্য্যন্ত বিষপ্রয়োগ করিতে শিখি নাই—কিন্তু সে কথা যাক, তোমার সন্দেহ দূর করিবার জন্য প্রথমে আমিই সরবৎ পান করিতেছি,” এই বলিয়া বাবর প্রথমে পান করিলেন, শেষে খাঁন মির্জ্জা অবশিষ্ট সরবৎ গ্রহণ করিলেন। এইরূপে খাঁন মির্জ্জা এবং ডগলাতকে পুনর্গ্রহণ করিয়া বাবর অসীম মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিলেন। অতঃপর ডগলাতকেও দরবার গৃহে আনয়ন করতঃ বাবর সকলের সমক্ষে তাঁহাদিগকে বলিলেন, “খাঁন মির্জ্জা এবং ডগলাত! আমি তোমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম এবং তোমাদিগের বন্দীত্ব হইতেও মুক্তি প্রদান করিলাম। কিন্তু কাবুলে আমি আর তোমাদিগকে বাস করিতে দিতে পারি না; তোমাদিগের ইচ্ছানুসারে তোমরা অন্য যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পার।” তাঁহারা উভয়ে বলিলেন যে, আমরা খোরাসানে যাইয়া আপন আপন ভাগ্য পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। বাবর তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং উপযুক্ত যানবাহনাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে ডগলাত সেবানী খাঁর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

এই স্থলে বাবরের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি। মোগল বাদশাহদিগের পারিবারিক ঘটনার বৃত্তান্ত অবগত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। কারণ, ঐতিহাসিকগণ এ সম্বন্ধে এক প্রকার নীরব; অথচ এই সকল সংবাদ জানিতে না পারিলে মোগল রাজত্বের ভিতরকার ইতিহাস কিছুই জানা গেল না। শুধু যুদ্ধ জয় এবং লড়াইয়ের কাহিনী দ্বারা একটা জাতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। রোজনাম্চার হিসাবে ইহার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার মূল্য খুব বেশী নহে। বড় পরিতাপের বিষয় এই যে, তদানীন্তন কালের ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে তেমন কোনও সংবাদ রাখিয়া যান নাই; কেবল দুই একজন রাজা রাজড়া খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল রোজনাম্চা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই পরবর্ত্তী কালে ইতিহাসের ভিত্তি স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে। ইঁহাদিগের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও বাবর সৌভাগ্যক্রমে এই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ইঁহার রোজনাম্চার মধ্যে স্থানে স্থানে এরূপ এক একটী পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহার দ্বারা তাঁহার জীবনের ভিতরের পৃষ্ঠা অনেক জায়গায় উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার মেরুদণ্ড কোথায় ছিল, তাহারও ইঙ্গিত এই সকল ঘটনাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, হুসেন মির্জ্জার পরলোক গমনের পর খোরাসানের সিংহাসন লইয়া তাঁহার দুই পুত্র বাদিএজ্জমান ও মোজফঃরএর মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হয় এবং সেবানী এই মনান্তরের সুযোগ অবলম্বন করিয়া খোরাসান আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। মির্জ্জা ভ্রাতৃদ্বয় যে বাবরের অতি নিকট আত্মীয় ছিলেন এবং ইঁহাদিগের এই আকস্মিক বিপদে বাবর আপনার শক্তি সামর্থ্য লইয়া তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য যেরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মির্জ্জা ভ্রাতৃদ্বয় সেবানীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আপনাদের রাজধানী হেরী পরিত্যাগ করতঃ বলখ্ অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা পথিমধ্যে পান ভোজন এবং আমোদ প্রমোদেই কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং ৩।৪ মাসে মারঘাবে পৌঁছিলেন। বাবর আপনার দলবল সহ মারঘাবে আসিয়া ইঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। যেদিন বাবর মির্জ্জা ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেদিন এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহা হইতে বাবরের চরিত্রের দৃঢ়তা এবং আত্মসম্মান জ্ঞান পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মোগলদিগের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের এবং দরবারের আদব কায়দা বড়ই জটিল এবং উভয় পক্ষই এই সকল ব্যাপারের প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রতি এমন সুতীক্ষ্ণ নজর রাখিতেন যে, কোনও ত্রুটি হইলে প্রতিপক্ষ বিশেষ অবমানিত বোধ করিতেন এবং সেই অবমাননার প্রতিশোধ লইতেও বিরত থাকিতেন না।

বাবরের সমগ্র জীবনই একটা সংগ্রামের ব্যাপার; তিনি কতবার যে সিংহাসনে বসিয়াছেন এবং সিংহাসন হারাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করাই দায়; কাজেই যাহাদের সিংহাসনের বনিয়াদ একটু পাকা গোছের তাহারা বাবরকে মনে মনে অবজ্ঞা করিত সন্দেহ নাই। মির্জ্জারা তাঁহার নিকট আত্মীয় হইলেও এই সকল ক্ষুদ্রতার উপরে উঠিতে পারেন নাই। মোগলদিগের দরবারের এই নিয়ম ছিল যে, কোনও সম্ভ্রান্ত এবং সম্পদস্থ অভ্যাগতকে সম্ভ্রম দেখাইতে হইলে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া লইয়া যাইতে হয়। বাবর মারঘাবে পৌঁছিয়া তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীসহ মির্জ্জাদিগের দরবারে উপস্থিত হইলেন। এইরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, বাবর দরবারে ঢুকিয়াই একবার মস্তক নত করিবেন এবং বাদিএজ্জমান তখনই সিংহাসন ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধপথে আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবেন। এই ব্যবস্থানুসারে বাবর তাম্বুতে ঢুকিয়াই মস্তক ঈষৎ অবনত করিলে বাদিএজ্জমান সিংহাসন ত্যাগ করিয়া নামিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত যাহাতে না আসিতে হয়, সেইজন্য অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এইরূপ অবজ্ঞার জন্য বাবর প্রস্তুত ছিলেন না, অথবা তাঁহার মনে কোনও সন্দেহ উঠে নাই। সেইজন্য তিনি স্বাভাবিক গতিতে গমন করিয়া মধ্যপথ পর্য্যন্ত যাইয়া দেখিলেন যে, মির্জ্জা সাহেব তখনও অনেক দূরে; এবং যেরূপ গতিতে তিনি অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে বাবরের বিলম্ব হইল না। তখনই তাঁহার আত্মসম্মান জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং মধ্যপথে যাইয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন যে, সর্ব্বস্ব হারাইলেও বাবরের আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান আজিও লোপ পায় নাই। দরবারের সকল লোক

বাবরের এই দৃঢ়তা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল এবং বাদিএজ্জমান লজ্জায় এবং গ্লানিতে অবনত মস্তক হইয়া মধ্যপথে আসিয়া বাবরকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়া গেলেন। দরবার ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু ব্যাপার এইখানে মিটিল না। বাবর নিজের তাম্বুতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তখনই মির্জ্জাদিগের নিকট দূতের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন—"তোমার ন্যায় স্বর্ণ রৌপ্য-খচিত তাম্বু আমার নাই। আমি ছেঁড়া তাম্বুতে থাকি সত্য, আবার অনেক সময় হয়ত এ তাম্বুটুকুও জোটে না। বিধাতা সকলের জন্য যে স্তম্ভহীন তাম্বু টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন, জীবনে বহুবার সেই তাম্বুর নীচেই মাথা রাখিয়া দিন কাটাইতে হইয়াছে, কিন্তু মাথাটা চিরকাল উঁচু করিয়াই রাখিয়াছি, কখনও শির অবনত করি নাই। আজ যে মারঘাবে আসিয়াছি, সে তোমাদের সোণা রূপায় ঝল্‌মল্‌ দেখিতে আসি নাই অথবা দরবারের শোভা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে আসি নাই—খোরাসানের কার্পেট এবং গালিচায় আমার প্রয়োজন নাই—ঘাসের মাদুরের উপর আমার বেশ আরামে জীবন কাটে। আজ যে এখানে আসিয়াছি, সে শুধু তোমার এবং আমার উভয়ের শত্রু সেবানীর গতিরোধ করিবার জন্য; তোমাদের ন্যায় হস্তের সৌন্দর্য্যবিধায়ক আমার কোনও যষ্টী নাই, বহুযুদ্ধে শত্রুর রক্তরঞ্জিত অসিই আমার একমাত্র যষ্টী, আত্মসম্ভ্রম রক্ষার জন্য বহুবা[র] এই যষ্টী ব্যবহার করিয়াছি এবং প্রয়োজন হই[লে] এখনও করিব।"

এই সংবাদ প্রেরণের পর মির্জ্জা ভ্রাতৃদ্বয় বাবরে[র] তাম্বুতে আসিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন এবং না[না] রূপে তাঁহার মনস্তুষ্টি বিধান করিবার জন্য যত্ন করি[তে] লাগিলেন। বাবরের চরিত্রের আর একটা গুণ এ[ই] ছিল যে, একদিকে যেমন তিনি বজ্রের ন্যায় কঠি[ন] ছিলেন, অন্য দিকে আবার তেমনি পুষ্পের ন্যা[য়] কোমল ছিলেন। আর বহুকাল ধরিয়া কাহা[রও] প্রতি রাগ পুষিয়া রাখিতে পারিতেন না, সহজে[ই] ক্ষমা করিতেন। মির্জ্জারা যখন কৃতকর্ম্মের জ[ন্য] অনুতপ্ত হইলেন, তখন সব গোল মিটিয়া গে[ল] সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইলেন এ[বং] সেবানীর সহিত যুদ্ধাবসানে মির্জ্জা ভ্রাতৃদ্বয় বাবর[কে] অনেক যত্ন করিয়া তাঁহাদিগের রাজধানী হেরা[টে] লইয়া গেলেন। এইখানে বাবরের পিসীমাতা পায়ে[ন্দা] বেগম এবং তাঁহার পিস্‌তুতো ভগ্নী খাদিজা বেগম [ও] আপক্‌ বেগম বাস করিতেন। বহুকাল পরে হেরা[ট] রাজপুরীতে বাবর আপনার নিকট আত্মীয়া[দের] সাক্ষাৎ পাইলেন; এইখানে বাবর তাঁহার আ[ত্ম]জীবনীতে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃ[ত] করিয়া দিলাম।

শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

আশ্বাস।

১

নিখিল আশার দীপ, ফুরাল সকল—
তা' বলে পথিকবর হয়ো না বিকল।
মলিন যে ফুলদল নব শোভা ধরে,
অবনীর উর্দ্ধদেশে অনন্ত নগরে॥

২

পিপাসা কাতর প্রাণে যথা বারি পান,
শ্রম শেষে নিদ্রা যথা শান্তি করে দান!
প্রথম আঁধার, শেষ সবি জ্যোতির্ম্ময়—
শমনবিজয়ী পথ সুধার আলয়॥

শ্রীঅবনীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পূর্ব্বকথা।

সরকারী কার্য্যবশতঃ পিতৃদেব যে সব স্থানে গিয়াছিলেন আমরাও তাহার অধিকাংশই দেখিয়াছি। একবার বড় দিনের অবকাশে আমরা সকলে মিলিয়া মজঃফরপুর বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দিব্য পরিপাটী সহরটী, বাঙ্গালীতে পরিপূর্ণ, প্রবাস বলিয়া মনে হইত না, যাওয়া আইসা আদান প্রদান সব দেশের মতন, দোল দুর্গোৎসব, বার মাসে তের পার্ব্বণ রীতি মতন ছিল। সে কালে পশ্চিমে এক একজন অতি খ্যাতনামা বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদিগের দয়া দাক্ষিণ্য উদার চরিত্রের কথা অদ্যাপি ভুলিতে পারা যায় না। যেমন দ্বারভাঙ্গায় কালীবাবু ডাক্তার, দীন দুঃখীর একমাত্র আশ্রয়, তেজ গর্ব্বে যেন জলন্ত বৈশ্বানর। নীচতা তোষামোদ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখান করিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা ও স্বজাতির কল্যাণ কামনায় জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। পাবনার "প্রসন্ন সিংহ", সিপাইবিদ্রোহের সময় শত শত লোকের জীবন বাঁচাইয়া এবং মৃতব্যক্তির অনাথ স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তেমনি আবার মজঃফরপুরে কেদার বাবু, দান ও পরোপকারে সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অবসর দিনে তিনি পাড়ায় পাড়ায় যাইয়া কত নিরন্নকে অন্ন বস্ত্র দিয়া গৃহহীনকে গৃহ প্রস্তুত করিবার অর্থদানে ধনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের ন্যায় দানশীল সদাশয় ব্যক্তি আজ কালের দিনে বড় দুর্ল্লভ।

পূর্ব্বে ঐ সব অঞ্চলে প্লেগ কিম্বা ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব না থাকায় অনেক কঠিন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সেখানে যাইয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভে পরিপুষ্ট দেহে দেশে ফিরিয়া আসিতেন, প্রাতঃভ্রমণই ঐ সকল স্থানে স্বাস্থ্য লাভের প্রধান উপায়। আমরাও প্রত্যহ তাহা প্রতিপালন করিতাম। একদিন দৈবাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতে একটী রহস্যজনক ঘটনা হইয়াছিল। আমার শরীর অসুস্থ থাকায় সকলে বেড়াইতে চলিয়া যান। আমি শালে মস্তকাবৃত করিয়া একা বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছিলাম এমন সময় চোগা চাপকান পরিহিত একজন ভদ্রলোক সহাস্য-মুখে বৈঠকখানায় আসিয়া দুই হস্ত তুলিয়া নমস্কার-পূর্ব্বক পার্শ্বের চৌকীতে বসিয়া নানা প্রকার গল্প জুড়িয়া দিলেন। শিল্প বাণিজ্য সাহিত্য বিজ্ঞান বিবিধ প্রসঙ্গ তুলিয়া নিজের মতামত প্রকাশ ও আমার মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমিত অবাক, একে অতি অপরিচিত, নামও জ্ঞাত নহি, তাহাতে বাড়ীতে কেহ নাই, তিনি কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমাকে সম্বোধন করিতে করিতে নানা বিষয় স্বাধীনভাবে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অনেক-ক্ষণ এইরূপে গত হইলে পিতৃদেব ভ্রাতাগণ সহ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে বাবুটী "এই যে দুর্গাদাস বাবু, Good morning good morning, আমি ঢেরক্ষণ আপনার বড় ছেলের সহিত বসিয়া গল্পস্বল্প করিতেছি। দিব্য ছেলে মশায়, বেশ বেশ ;" বলিয়া খুব হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এই কৌতুকাবহ ব্যবহারে, পিতৃঠাকুরও হাসিয়া আমার মাথার শাল অপসারিত করিয়া দিবা-মাত্র মুক্তকেশ বাহির হইয়া পড়িলে তিনি তখন অত্যন্ত লজ্জাবশতঃ মুখে বলিলেন, "মা লক্ষ্মী, ঠিক আশুরই মতন দেখিতে। আজ হইতে ইঁনি আমার মা হইলেন, আমি ছেলে, কাল আমার বাড়ী আপনা-দিগের মধ্যাহ্ন ভোজের নিমন্ত্রণ"। তাহার পর সে ভোজের আয়োজন একটা পর্ব্ব বিশেষ। আদর আপ্যায়ন আশাতীত হইয়াছিল। এই আত্মীয়টী কলুটোলার সেন মহাশয়গণের জামাতা ইঞ্জিনিয়ার ৺ মাধব বাবু।

আমরা মজঃফরপুর হইতে ফিরিয়া আসিবার পরেই পিতৃদেব আবার মতিহারী চম্পারণ বদলী হইয়া যান। তৎকালে তাঁহার নিকট আর কেহ ছিল না, কেবলমাত্র লুসি কুকুর ও হাঁণ্টার ঘোটক

সহচরস্বরূপ থাকায় তাহাদিগকে লইয়া কোনরূপে অবসর কাটাইয়া দিতেন। কিন্তু মতিহারী গমন কালে ঘোড়া সঙ্গে লইয়া যাইবার সুবিধা না হওয়ায় পুরাতন বিশ্বাসী সহিস সহ হাণ্টারকে পথ হাঁটাইয়া কৃষ্ণনগর পাঠাইয়া দেন, লুসি হাণ্টারে অতিশয় সদ্ভাব ছিল সর্ব্বদা উভয়ে একত্র থাকিত। প্রিয় বন্ধু হাণ্টার সাহেব চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া লুসি বিবি, কুকুর ক্রন্দন সুরে চারিদিকের শান্তিভঙ্গ করিয়া তুলিল এবং খানিক পরে আবিষ্কার হইয়া গেল যে লুসি আর গৃহে নাই। অনেক খোঁজ তল্লা-সেও তাহাকে কোনখানে না পাইয়া পিতৃদেব তার করিয়া দিলেন। আমরা খালি তাহাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। তিন সপ্তাহ অনবরত হাঁটিয়া ছাতু দানা ও সহিসের উচ্ছিষ্ট চাপাটী প্রসাদে জীবন-ধারণ করিয়া লুসি যখন মৃতপ্রায় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহার আকৃতি অতীব শোচনীয়। কোথায় বলবান দীর্ঘকায়, শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের রণজয়ী অশ্ববৎ তেজস্বী হাণ্টার, আর কোথায় ক্ষীণজীব ক্ষুদ্র সারমেয় লুসি। তুলনায় কোন অংশেই এক নহে, তথাপি ভালবাসার আতিশয্যে এই দুই পশুজীবন এক হইয়া গিয়াছিল, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। সমস্ত দিবস বাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী রূপে থাকিয়া রাত্রে লুসি, হাণ্টারের পদতলে পড়িয়া ঘুমাইত। তাহাতে কখন কোন প্রকারে অশ্বখুরে আঘাত পায় নাই। উচ্চ নীচে ছোট বড়তে অকৃত্রিম স্নেহের কেমন মধুর সম্মিলন হইয়া গিয়াছিল। গৃহপালিত জীব জন্তুর দৈনিক জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে এরূপ অনেক ঘটনা দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়।

আশু কলিকাতায় যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, সেই সময় পিতৃঠাকুর ভাগলপুর যাইবার পথে একবার তাহাকে দেখিতে আসিয়া ভূতপূর্ব্ব ছোট আদালতের জজ ও তাঁহার শিক্ষা গুরু ৺কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া গৃহে উৎসবের আয়োজন, নহবৎ, রসনচৌকী, চণ্ডীপাঠ ও নানা প্রকার আতসবাজীর সমারোহ দেখিয়া শুনিয়া অমনি ত্রস্তভাবে চলি আসিতেছিলেন, এমন সময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্ব আসিয়া হস্ত ধরিয়া ছাড়িয়া দিলেন না এবং তখনকা ছোটলাট সার এস্‌লি ইডনের অভ্যর্থনা সান্ধ্য-সমিতি- পুত্র কন্যার বিবাহ নহে বলিয়া আপ্যায়িত করিলে দেখিতে দেখিতে মহা সমারোহে লাট শুভাগমনে সঙ্গে সঙ্গে মহানগরীর ছোট বড় রাজা মহারাজা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন ও সেলামের পড়িয়া গেল। কেবল পিতৃদেব আশুসহ এক কোণে একক বসিয়াছিলেন, হঠাৎ সেই দিকে লাটে দৃষ্টি পড়িব মাত্র তিনিই অভিবাদন করিয়া নিক আহ্বান করিলেন এবং পিতাঠাকুর কখনই দে শুনা করেন না কেন জানিতে চাহিলে তিনি বিনা ভাবে বলিয়াছিলেন, "দেখা করিয়া অকারণ জ্বালা করা আমার উচিত মনে হয় না, উপকারও নি নাই। নিজের কর্ত্তব্য করিয়াই সুখী থাকি।" ই লাট আশুকেও দেখিয়া অনেক ভদ্রতা দেখা জানিতে চাহিলেন, কোন চাকুরী প্রার্থী কি ন পিতা তৎক্ষণাৎ নির্ভীকচিত্তে মুখের উপর বলি ছিলেন, "না,—দাসত্ব করিতে দিব না, বি,এ, এ এক সঙ্গে দিয়াছে, বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার ক ইয়া আনিব।" এই অভাবনীয় উত্তরে লাটের মুখ আরো লাল হইয়া উঠিল ও কৃত্রিম হাসি হা হাসিতে "গুড বাই বাবু" বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল ইহাতে কুঞ্জলাল বাবুর শুষ্ক মুখ ও ভয়বিহ্বল দেখিয়া তাঁহারাও অচিরাৎ বিদায় গ্রহণে নিষ্কৃতি করিলেন। এই বৎসরই ১৮৮১ সালের মার্চ্চ আশু বিলাত রওনা হইয়া যান। তাহাতে প রাজসাহী জেলায় একটা মহা হুলুস্থূল কাণ্ড উপ হয়। আশু বিলাত যাওয়ার পর গ্রামের জ্ঞাতি পিতৃস্বসা ঠাকুরাণীদিগের জীবনের শান্তিভঙ্গ, ধ নাশ ও সমাজচ্যুতির ভয় প্রদর্শনে তাঁহাদেরই এ কাতর ও উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। দীর্ঘ বর্ষে স্বভাবতঃ এ সব গোল কমিয়া যাইবার কথা, মক্ষিকা ছিদ্রানুসন্ধানীর ন্যায় জাত্যাভিমানীগণ প লাগিয়া থাকিল এবং আশুর স্বদেশ প্রত্যাব

সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন গোলযোগ উঠাইয়া এবার রীতিমত আমাদিগকে "এক ঘরে" করিয়া দিলেন, জাত গেল আমাদের, তাহার জন্য অশান্তি ভোগ ঘটিল পিসীমাতাদিগের ভাগ্যে। সাংসারিক সুচতুর ব্যক্তিরা সময়কালীন আসিয়া পিতাকে গোপনে নিশীথ অন্ধকারে আশুর সহিত আহার ব্যবহার করিতে এবং প্রকাশ্যে দূরে থাকিয়া জাতি রক্ষার্থে উপদেশ দিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। যদিও এ হিত বাক্য ও শুভ ইচ্ছা ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় বৃথা হইয়া গিয়াছিল, তবুও তাঁহাদিগের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। অথবা অটল পিতৃদেবের সেই একই কথা, "সমস্ত ছাড়িব, আশুকে কখন দূরে রাখিয়া জাতরক্ষা করিব না, আশু আমার সর্ব্বস্ব, তাহাকে আমিই বিলাত পাঠাইয়াছি, জাত যাইবার ভয় থাকিলে এ কার্য্য করিতাম না, ক্রমে আমার সব ছেলে বিলাত যাইবে।" তাঁহার এই দৃঢ়তায় ক্রমশঃ জ্ঞাতি বন্ধু জাত লইয়া পলায়ন করিলেন। আমরা আমরাই রহিয়া গেলাম।

সেকালে বিলাত যাত্রা এমন সহজ ছিল না, বিশেষতঃ আমাদের ঘরের ছেলের পক্ষে সে যে কি কঠিন ব্যাপার ছিল, তাহা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না, ভুক্তভোগী ভিন্ন বুঝিতে পারাও শক্ত। আমাদিগের বংশের ও জেলার আশুই প্রথম বিলাত গমন করেন এবং আমরা কেহ সমাজে উঠিবার জন্য কখন কোন প্রকার প্রয়াসও পাই নাই। এমনি শাস্ত্রের বিধান যে জাত গেল আমাদিগের, মধ্যে হইতে পিসীমাতাগণের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা হইয়া পাঁচ পাঁচ কাহন কড়িতে মস্তক মুণ্ডন হইতে অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহারা ত বাল-বিধবা, আশৈশব ব্রহ্ম-চর্য্য প্রতিপালন করিয়া চলিতেন, অকারণ কেন তাঁহাদিগের জাতি লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল, সেটা বুঝিবার ক্ষমতা কাহারো ছিল না ও নাই।

নিঃসন্তান বিধবা পিসীমাতারা চির-জীবন আশার আনন্দে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের, বিশেষতঃ আশুর হস্তের অগ্নি জলপিণ্ডে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, তাহা হওয়া দূরে থাকুক, অন্তিম কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। জ্যেষ্ঠতাত পুত্র নবকুমার চৌধুরী ঠাকুরদাদা মহাশয়ও তখন লোকান্তরে, সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজেদের শ্রাদ্ধ, "কাম্য বৃষোৎসর্গ" ও ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করিয়া দেশের যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্যান্য সব গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ পত্র-দ্বারা আনাইলেন। হরিপুরের "মণ্ডপের আঙ্গিনায়" কানাট ফেলিয়া তাঁহারা তাহার ভিতর হইতে স্বীয় শ্রাদ্ধ কার্য্য, দান ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায়ে জীবনের শেষ ক্রিয়া সমাধান্তর নিরুদ্বিগ্ন ও সার্থক মানস হইলেন। প্রাচীন মৃত ব্যক্তির অনিবার্য্য অন্তিম কার্য্য শ্রাদ্ধ বাসরেই, আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে কত আঘাত লাগে এবং ব্যথিত অশ্রুজল রোধ করিতে পারা কত শক্ত হইয়া উঠে, আর জীবিতে নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করিতেছেন দেখিয়া কেহই রোদন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা এই শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত ছিলেন, শুনিয়াছি তাঁহাদিগের শোকাশ্রুপাতে বক্ষস্থল সিক্ত হইয়া গিয়াছিল ও গৃহের পুরাতন দাস দাসীরা পর্য্যন্ত হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিয়াছিল। জীবিতাবস্থায় শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করা অতিশয় কষ্টসাধ্য ব্যাপার, শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন সংযম, কাঁচা দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া থাকিতে হয়, তাহার পর দিবস প্রাতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সিক্তবস্ত্রে শ্রাদ্ধ সপিণ্ডকরণ ও আর আর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কাণ্ড সম্পাদন পূর্ব্বক অনশনে কুশশয্যায় রাত্রি দিন কাটাইয়া তৃতীয় দিনে হবিষ্যান্ন গ্রহণ বিধি।

প্রায়োপবেশন, মাঘের শীতে ত্রিবেণীতে কল্পবাস, এবং কাম্য বৃষোৎসর্গ ইত্যাদির কঠোরতা পালন করিবার সাধ্য হিন্দু বিধবা নারী ভিন্ন জগতে কাহারো নাই। যাঁহারা মৃত পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছেন, যাঁহারা শত্রু হস্ত হইতে সতীত্ব মান রক্ষার্থে "জহর ব্রত" গ্রহণে আত্ম-জীবন জ্বলন্ত হুতাশন গ্রাসে সমর্পণ করিয়াছেন, সে জাতির তুলনা কোথায় মিলিবে আর?

রাজসাহী জেলায় "কাম্য-শ্রাদ্ধ" এ পর্য্যন্ত আর

কেহ করিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। পিতৃদেব বারেন্দ্র পদমর্য্যাদা ও সামাজিক উচ্চ অধিকার অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের হিত কামনায় তাহাকে যে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে কুলপাবন সৎপুত্রের দ্বারা বংশগৌরব বাড়িয়াছে এমন নহে! বঙ্গজননীরও সমূহ কল্যাণ সাধন হইয়াছে বলিলে গর্ব্ব করা হইবে না।

বিলাত প্রত্যাগতদিগকে পরিহার করিয়া জাতিরক্ষা করিতে যাইলে আমাদিগের কোন দিকেই উন্নতির আশা নাই। তাঁহারাই আজকাল জাতীয় জীবনের আশ্রয়স্বরূপ। বিদ্যা বুদ্ধি পদমান ও কার্য্যদক্ষতায় তাঁহারাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়। স্ব-দেশের দুর্গতি দূর, জাতীয় অভাব মোচনার্থে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা স্মরণ পূর্ব্বক বৃথা জাত্যাভিমান বিস্মৃত হইয়া বিলাত ফেরতদিগের সহিত একত্র সম্মিলিত ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে যে সকল অভাব প্রত্যক্ষ বিদ্যমান, তাহা অচিরাৎ বিদূরীত করিতে পারিবেন ও তাহাদিগকে লইয়া যে সমাজ গঠন করিবেন, তাহাই স্থায়ী কল্যাণকর আদর্শ সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইবে।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

দ্বিপত্নীক।

(৩২)

এবারে বাড়ী ফিরিয়া যামিনী ঈষৎ বিস্ময় অনুভব করিল। তাহার বসিবার ঘর কাজ করিবার ও শয়নের গৃহ যেন সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। জিনিষ পত্র সমুদয় সুবিন্যস্ত ভাবে মানান করিয়া সাজান। টেবিলের কাপড়, চেয়ারের আস্তরণ, পর্দ্দা সমস্তই ধবধবে। ছোট ছোট রাণীগঞ্জের টবগুলা এতদিন খালি পড়িয়াছিল, তাহাতে বাগান হইতে পাস ও শীত ঋতুর বাহারে ফুলের গাছ তুলিয়া লাগাইয়া জানালার ধারে বারান্দার থাটালে স্থাপন করা হইয়াছে। দোয়াতগুলির কালী উঠাইয়া মাজা এবং কলমগুলির নিব পর্য্যন্ত সযত্নে মুছিয়া রাখা রহিয়াছে। দাস দাসীদের হাতে এ ঘর কখনও এমন গোছান হইতে পারে না। এমন রুচিই যে তাহাদের নাই। যামিনী কৌতুহলের সহিত চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

সাদা পাথরের টেবিলের উপর বিচিত্র ফ্রেমে আঁটা যামিনীরই এক খানা ফটোগ্রাফ বহুদিন হইতে দাঁড় করানো ছিল। ধূলা লাগিয়া ফ্রেমটার পূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যের আর চিহ্নও ছিল না। সেই খানাই আজ যেন সব চেয়ে জ্বলিতেছে। সযত্নে মার্জ্জিত করিয়া কেহ তাহার চারিদিকে একটি সেফালিকার মালা ঘেরিয়া দিয়াছিল।

আহারে বসিয়া যামিনী সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজকের মাছটা যে ঠিক ইন্দ্রনাথ বাবুর বাড়ীর ধরণের হয়েচে? তাঁরা পাঠিয়েচেন নাকি?"

সৌদামিনী কহিয়া উঠিলেন "ঐ দেখ একেবারে ভুলো মন হয়েচে বল্‌বো বলে ভুলে গেছি একেবারে। আজ ওরা দু বোনে যে বেড়াতে এসেছিল। ... বোনটি হরিশের বউকে দেখতে গেলো। এই ... আগে কিছুক্ষণ হলো ওর মা এসে বোনকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেছে। কখনও দেখিনি—আহা ... মেয়ে সব।" যামিনীর চোখের পর্দ্দাটা মুহূর্ত্তে স... গেল। এ রন্ধন জ্যোৎস্নার হস্তের, ওই গৃহ মার্জ্জনার মধ্যেও সেই সেবাকুশল ক্ষুদ্র হাতখানিরই ... প্রকটিত। কিন্তু কেন—এ কেন? পিসিমা আ... সঙ্গে কহিতে লাগিলেন "এমন মেয়ে কখনও দেখিনি। একদিনের দেখা বাছা, যেন আমায় মায়ায় বেঁধে গেছে। আমার ভাঁড়ার গুছানো, রান্না ঘর করা থেকে তোর বৈঠক খানা পর্য্যন্ত সারা

ঝকঝকে করে দিয়ে গেলো; কতক্ষণই বা লাগ্‌লো? বারণ করলেই হাসে, বলে তুমি একলা মানুষ সবতো পেরে ওঠো না, একদিন এসেছি একটু সাহায্য করলুমই বা, বাড়ীতে কি করিনে? যেমনি নম্র, তেমনি মিশুনে আবার তেমনি গতরে। আহা চমৎকার মেয়ে—জোচ্ছনা তো জোচ্ছনা।"

এমন যত্ন, এত সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষার অর্থ কি? বিস্ময়ে, সন্দেহে, চিন্তায় যামিনীর হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। এতদিন জ্যোৎস্নাকে মনে করিতে গেলে কেবল একটি ভাবহীন, ভাষাহীন প্রস্তর প্রতিমা ভিন্ন আশা নিরাশায় বিচলিত, সুঃখে দুঃখে আকুল, স্নেহ প্রেমে গড়া মানবের অন্তঃকরণ বিশিষ্টা কোন তরুণী মূর্ত্তিকে তাহার মনে পড়ে নাই। আজ তাহার হৃদয়ের এই টুকু পরিচয় পাইয়া সে করুণার সহিত একটু আনন্দও অনুভব করিল।

(৩৩)

রমেন্দ্র মুন্সেফি লইয়া সস্ত্রীক কর্ম্ম স্থানে চলিয়া গেল। বরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজের জমিদারীর একটা পাকা রকম বন্দোবস্ত করিয়া প্রথম পৌষেই এখানে ফিরিয়া আসিলেন। আতুরাশ্রমের গৃহ নির্ম্মাণ শেষ হইয়া গিয়াছিল। পরিদর্শক সমিতি গঠিত হইয়াছে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কলেজের প্রিন্সিপাল এবং সাতজন দেশীয় ভদ্রলোক লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছিল। দেশের রাজা ইংরেজ। রাজার সাহায্য হস্ত গ্রহণ না করিলে এখনও আমাদের কোনও কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে না, তাই ম্যাজিষ্ট্রেটকে ভিতরে লওয়া হইল, নহিলে স্বয়ং বরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং অংশতঃ যামিনীই তাহাদের নিজেদের উপরে কার্য্য নির্ব্বাহের সমুদয় ভারই গ্রহণ করিয়াছিল। বালিকা বিদ্যালয়টিও এই কমিটির লোকেদের হাতেই ছিল। নৈহাটির মত, সহরের স্কুলটি হঠাৎ উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না কারণ ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি ও সাহায্য দুই ছিল। এই টুকুর জন্যই স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে গেলে চেষ্টা বিফল হওয়ায় ব্যাঘাত পড়িয়া থাকে। অনিমার হৃদয়ে আনন্দের রশ্মিরেখা সহস্র কিরণে ফুটিয়া উঠিল। যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহাই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আহা, ওই হতাশা ক্লিষ্ট রোগিগুলির ক্লেশ তাপ যদি তাহার এই দুখানি পরিপুষ্ট সক্ষম বাহু দ্বারা জুড়াইতে না পারে, তবে বৃথাই এ ভার বহন করা। যামিনীও এই আতুরাশ্রমে কিছু অর্থ দান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাহার ও বরেন্দ্রকৃষ্ণর সমবেত চেষ্টা ও সাহায্যে এই হুগলী সহরের প্রান্তে অনেক বিঘা জমী ক্রয় করা হইয়াছিল। একটি শিল্প বিদ্যালয়ের কল্পনা এই দুইটি সৌভ্রাত্র বদ্ধ বন্ধুর অন্তরে প্রতিদিন প্রতিদিনের চেয়ে সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। পরামর্শ হইতেছিল, যামিনী কুড়ি হাজার, অনিমা দশ হাজার এবং কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ বাকি যাহা লাগে তাহা দিবেন।

অনিমা এখন অধিকাংশ কালই কাশীপুরে থাকে। দাদা মহাশয়ের অনুযোগে মধ্যে মধ্যে বাড়ী আসিলেও বেশী দিন তিষ্ঠিতে পারে না।

দাদা মহাশয় নাতিনীকে এড়াইতে না পারিয়া স্বয়ং একদিন আসিয়া তাহাদের আশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তারপর অবশ্য আর একদিন রাজ কর্ম্মচারী ও বাহিরের লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাহ্য আড়ম্বর দেখাইতেও হইয়াছিল। কিন্তু অনিমা জানিত তাহা কোন কাজেরই নয়। দাদা মহাশয়ের সেই সৌম্য মূর্ত্তি খানিই তাহার পূর্ণ মঙ্গলাচরণ! তাঁহার সরল হাস্য মণ্ডিত মুখ অনন্ত স্বরূপের অক্ষয় আনন্দ জ্যোতির রেখায় উজ্জ্বল বলিয়া অমন সুন্দর, অমন উদার।

একদিন কাছারী হইতে ফিরিয়া যামিনী শুনিল ইন্দ্রনাথ বাবুর মেয়েরা আসিয়াছেন। যে কথাটা নানান্ গোলমালে চাপা পড়িয়া আসিয়াছিল সেইটে যেন হঠাৎ ইহাতে জাগিয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথ বাবুর মেয়েরা—? জ্যোৎস্নাও হয়ত আসিয়াছে! এ'কি ভাল হইতেছে? সে এই সব ভাবিয়া তাহার দূর সম্পর্কিয়া এক জ্ঞাতি ভগিনীকে সম্প্রতি নলিনীর শিক্ষার ভার লইবার জন্য বাড়ীতে আনাইয়াছে। বালিকাকে চির দুঃখী করিয়া ফেলিবার পথে সে এক চুলও সাহায্য করিতে অক্ষম। আবার মাঝে হইতে এই ঘনিষ্ঠতা পাতাইয়া তাহার

সর্ব্বনাশ করিতে বাড়ীর লোকের এ আগ্রহ কেন? কিন্তু তাহারা তো কিছুই জানে না।

অমলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে প্রথমে আতুরাশ্রমটারই কথা পাড়িয়া কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণের অনেক সুখ্যাতি করিল। কিন্তু কথা যেই বেশ একটু জমিয়া আসিয়াছে, অমনি সে হঠাৎ ধাঁ করিয়া এমনি একটা প্রশ্ন করিয়া বসিল যে তাহা অকস্মাৎ যামিনীকে গম্ভীর করিয়া তুলিল। সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল "আপনাকে এ কথা কে বল্লে?"

"সত্য কথা কি কখনও চাপা থাকে? এখন বলুন তো কবে সেই উৎসবটা দেখে চোখ সার্থক করবো?"

যামিনী আরও একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে বেশ বুঝিতে পারিতেছিল যে তাহার উপরে একটা পরীক্ষা চলিতেছে; স্থির কণ্ঠে কহিল "কথাটা সত্য নয়।" অমলা ঈষৎ থমকিয়া গেল, একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তারপর চোখ নত করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "মিস দত্তর সঙ্গে আপনাকে সম্মিলিত দেখবার জন্য আমরা যে অনেক দিন থেকেই উৎসুক আছি।"

ইহা সে প্রশ্নের মত করিয়া না উচ্চারণ করিলেও কণ্ঠস্বরে একটা কৌতুহলপূর্ণ জিজ্ঞাসা প্রকটিত হইয়া পড়িল। যামিনী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া টেবিলটার মাঝখানের জিনিসপত্রগুলার উপর চোখ ফিরাইয়া রাখিতে গেল। সেখানে সব চেয়ে আগেই চোখে পড়িল সেই রূপার কাজ করা ফ্রেমের ভিতরকার নিজের ছবিখানা। এইখানাকে সে সেই দিনের পর হইতে একটুখানি ঈর্ষাপূর্ণ শ্রদ্ধা না করিয়া যেন কোন মতে পারিতেছিল না। সে তাহার রক্তমাংসের শরীরে সমুদয় অন্তর বাহিরের দোষ গুণ, আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা লইয়া যাহা পায় নাই, এই জড় অচেতন পদার্থটা তাহার সেই অভাব সারিয়া লইয়াছে। সে যে প্রভাত শিশিরসিক্ত শুভ্র সেফালিকার মত কুমারী চিত্তের অম্লান একনিষ্ঠ প্রেম পূত অঞ্জলি লাভ করিয়াছিল, এ পৃথিবীতে জন্মিয়া কয়জন ভাগ্যবানের কপালে সেই সুপবিত্র, দেবভোগ্য বস্তু লাভ ঘটিয়া থাকে? বাণীপদলাঞ্ছিত কনক পদ্ম তুল্য কোমল করপল্লবের সেই সপ্রেম উপহার ে কণ্ঠে বরণ করিতে না পারুক,—সেই চিত্ত শতদলে যে সুরভি আঘ্রান সে পাইয়াছিল, তাহা তাহার ব নীয় না হইলেও গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় সন্দে নাই। ধীরে ধীরে সে দৃষ্টি সরাইয়া লইল।

অমলা কহিল, "দেখুন, আমরা পরস্পরকে রকম চোখে দেখে আস্‌ছি, তাতে বাইরের লোকে মত মাপে মাপে না কথাবার্ত্তা কয়ে যদি আপন জনের মত একটু কৌতুহল প্রকাশ ক'রে ফে সেটাকে তো বিরুদ্ধ ভাবে নেবে না?"

অমলা দেখুন বলিয়া আরম্ভ করিয়া 'নেবেন শেষ করিল, তাহা যামিনীর কাণে ঠেকিল, সে ঈ হাসিয়া উত্তর দিল, "আমি আপনাদের কাছ থে আপনার জনের মত ব্যবহারই প্রত্যাশা করি।"

"তোমাদের বিয়ের যে গুজবটা শোনা যায়, সে তবে মিথ্যা? কারণ বোধ হয়, পূর্ব্বের সঙ্গে একই

"প্রায় তাই।"

অমলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "পিসী একান্ত ইচ্ছা, আমাদেরও খুব সাধ, তুমি নি সমাজের একটি মেয়ে পছন্দ করে শীঘ্র শীঘ্র করো, যদি মত দাও, আমরা মেয়ে খোঁজ করি।"

যামিনী অমলার সাগ্রহ দৃষ্টির সহিত বিষ স্থির করিয়া কহিল, "আমার কি আর বিয়ের আছে, না আমার মতন সন্তানের পিতার আর করা সাজে? আমি আর বিয়ে করবো না। র্ব্বাদ করুন, আমার নলিনী বেঁচে থাক।"

অমলা যামিনীকে চিনিত, তাহার কণ্ঠস্বরে বিশেষ আশা পাইল না। ইহা যে বিপত্নীকের বুলি নয়, ইহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। থানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু এই থেকে তুমি সংসারত্যাগী হয়ে থাকবে যামিনী, কিন্তু আমাদের বড় বাজবে।"

"সংসারত্যাগী বল্‌চেন কেন? সংসারে কত কাজ, সব যদি করতে যাই, কোটি জন্ম খাটলেও শেষ হয় না। অবসর যত বেশী পাই তো ভাল? কেন মনে কষ্ট করচেন?"

অমলা এ কথার উপরে আর কোন কথা তুলিল না। সে তখন অন্য দিক দিয়া চেষ্টা করিয়া বলিল, "নলিনীকে তুমি কাল থেকে আমাদের ওখানে পাঠাচ্চো না, জ্যোতি যে খুন হয়ে গেল! এই দেখনা আমায় পর্য্যন্ত ধরে আন্‌লে, বলে ওকে না দেখে আমি থাক্‌তে পারিনে। ওর জন্যে আমি বড়ই ভাবনায় পড়েছি।"

"কেন, কিসের ভাবনা?" কথাটা এবার মুখেরই বটে, মনে মনে সেও এবার একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিল। ব্যাপারটা এতই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে নাকি?

অমলা আজ অনেক দিক ভাবিয়া চিন্তিয়াই পরীক্ষকের আসন লইতে আসিয়াছে, এখনই মন পিছাইতে চাহিলেই বা চলিবে কেন? দুই তিনটি ভাল পাত্র ইহারই মধ্যে মেয়ে দেখার দরখাস্ত দিয়াছিল। অমলা, যোগমায়া ও শরৎ তিনজনে মিলিয়া বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াও যখন একগুঁয়ে মেয়ের মত পরিবর্ত্তন করিতে পারিলেন না, তখন গৃহিণীর অনুরোধে ইন্দ্রনাথ বাবু কন্যাকে ডাকাইয়া তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিয়া অনেক উপদেশ দিয়া বলিলেন, "তুমি বিয়ে করবে না বলচো কেন? আমাদের সমাজ এখনও সে রকম হয়নি। তা ছাড়া নারীশক্তি পুরুষের সহকারিণীরূপেই সংসারের কাজে প্রকাশ পাওয়া ভাল, স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি হওয়া ভাল নয়।"

পিতার আদেশ কন্যার সাধ্য নাই যে লঙ্ঘন করে। সেই রাত্রে গভীর অন্ধকারে শয্যায় পড়িয়া সে নিজের অসম্বরণীয় বেদনাশ্রু আর রুদ্ধ রাখিতে পারিল না এবং অমলাও সে রাত্রে ঘুমায় নাই, নিকটে আসিয়া কাণের কাছে নত হইয়া ডাকিল, "জ্যোতি।" নিরুত্তরে জ্যোৎস্না বালিসে মুখ লুকাইল। "জ্যোতি শোন, উঠে বস, একটা কথা বল্ দেখি, শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদলেই তো হবে না। আমি সব বুঝেছি, তুমি একেবারে মরেছ।"

জ্যোৎস্না সরিয়া আসিয়া দিদির কোলে মুখ লুকাইল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, "দিদি, কিছুতেই কি নিস্তার নেই? বিয়ে তোমরা দেবেই?"

অমলা মনে অত্যন্ত বেদনা পাইল, প্রকাশ্যে সে কহিল, "বাবা যা পছন্দ করেন না, সে কেমন করে তাঁকে আমরাই বা করতে বলবো বল্? আচ্ছা জ্যোতি এত বড় কথাটা তুই এতদিন আমায় কি করে লুকোলি বল্ দেখি? এমন পোড়াকপাল তো'র কেন হলো তাই মনে করে আমার যেন কান্না আস্‌চে। তুই কি জানিস্ নে সে মিস্ দত্তকে কত আগে থেকে ভালবাসে! তুই কি সুখী হ'তে পারবি আর এ জন্মে!"

"দিদি, দিদি সবাই কি সুখী হয়?"

"তা নাই হোক তবু তোর মতন জেনে শুনে দুঃখকেও কেউ ডেকে আনে না। একটা আশা রেখে তো মানুষ কিছু করে।" জ্যোৎস্না দিদির অঙ্ক হইতে মুখ তুলিল, "আচ্ছা দিদি, তুমি বিনয় বাবুকে কি ভুলে গেছ?"

"এ আবার কি কথা! তাঁকে কি কখনও ভুলে যেতে পারি? আমার ধ্যানের দেবতা যে তিনি।"

"দিদি তবে তুমি তো অসুখী নও? একটা আদর্শ মনে রেখে যদি কেউ তোমারই মত সংসারে নিজের সকল কাজ করে কাটিয়ে যেতে পারে, তাতে তোমাদের এতই কি ক্ষতি? থাক্ না সে, যদি তাতেই সে সুখী হয়? তুমি আমায় বেহায়া ভাবচো, কিন্তু তুমিই তো আমায় বেহায়া করে তুল্লে? কিন্তু দেখো যদি আর কেউ শোনে, তা'হলে আমি মরে যাবো।"

অমলা যখন গাড়ী আনাইয়া আজই তাহাকে এখানে আসিতে বলিল, তখন হঠাৎ জ্যোৎস্নার বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল, দিদির মতলব কি? তাহাকে কুণ্ঠিত দেখিয়া অমলা নিজে হইতেই কহিল, "নেল কেন আসচে না, চল্ একবার দেখে আসি।" জ্যোৎস্না দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই মাতৃহীনা শিশু তাহার মাতৃত্বের অংশটাকে কেমন করিয়া যে এই অকালে জাগ্রত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা যাঁহার অদৃশ্য হস্ত এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সবার অলক্ষ্যে প্রসারিত হইয়াছিল, তিনিই শুধু জানেন। নলিনী—আহা সে যদি তাঁহার

নিকট হইতে তাহাকে—শুধু তাহাকে ভিক্ষা করিয়া লইতে পারিত!

যামিনীর প্রশ্নের উত্তরে অমলা যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, জ্যোৎস্না কিছুতেই বিবাহে সম্মতা নয় এবং তাহাদের পিতার ইচ্ছা শীঘ্র শীঘ্রই তাহাকে পাত্রস্থা করেন। প্রফেসর ছেলেটি তাঁহার একান্ত মনঃপুত হইয়াছে, অথচ মেয়ে কিছুতেই রাজী হয় না।

যামিনী সব শুনিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেন তিনি?"

"বলে কি কিছু, শুধু আমার কাছে কাঁদে, বলে আমি কিছুতেই এ পারবো না। আমার একটা সন্দেহ হয়।" যামিনী ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, অস্ফুটে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "কি?"

"সে তোমাকে ভালবাসে।"

আর্ত্তভাবে যামিনী চৌকার পিঠটার উপর দেহের ভর রাখিয়া বলিল, "আমাকে? না, কে বল্লে?"

"যামিনী! আমার প্রাণের গতি যাদের প্রাণের গতিতে, তাদের এতটুকু সুখ দুঃখ আমার বুঝ্‌তে কতক্ষণ যায়, ভাই? বিশেষ জ্যোতি, আমার প্রাণ যে! কেন প্রকাশ, কেন ভাই, তুমি এত বিচলিত হচ্চো? তুমি কি এতে নিজেকে অপমানিত বোধ করচো? কিন্তু তাকে যদি চিন্‌তে, কি ভালবাসা ভরা তার প্রাণটি যদি টের পেতে তাহলে তা ভাবতে না।"

যামিনী প্রথম হইতেই প্রস্তুত ছিল, সে বিশেষ বিস্ময় অনুভব করে নাই। নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া কহিল, "আমার মেয়েকে তিনি যে রকম যত্ন করেন, তাতে তাঁর ভালবাসার যথেষ্ট পরিচয় আমি পাচ্চি বই কি, কিন্তু হয়তো আপনার এটা ভুল। আমার মতন বিপত্নীক—সন্তানের পিতাকে কি কোন মেয়ে পছন্দ করে থাকে? তা নয়, হয় তো তাঁর বিয়েতে স্বাভাবিক একটা অনিচ্ছাই আছে। কিছু মনে না করেন তো আমিও একটা অনুরোধ করি।"

"কি?"

"বিয়ের তাড়াতাড়ি কি? এখন কিছুদিন তাঁকে একটু পড়া শোনার সময় দিন, আপনি একদিন বলেছিলেন, তাঁর উচ্চ শিক্ষার প্রতি খুব অনুরাগ আছে।"

অমলা কহিল, "সেতো তাই চাচ্চে, কিন্তু আমাদের অবস্থা তো তোমার না জানা নয়, ওর ওপর অত কি করে খরচ করতে পারা যায় বলো?"

"সেই কথাই বল্‌চি, আমায় যখন আপনার লোকের মত দেখেন বলচেন, তখন আমার ওপর এই সামান্য ভারটা দিতে কিছু আর কুণ্ঠিত হ'তে পারেন না? তা ছাড়া তাঁর উপরে আমারও স্নে- কিছু কর্ত্তব্য রয়েচে, নেলকে তিনি যে যত্ন করেন।"

অমলা আরক্ত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না যামিনী তা হবে না সে, বাবা কিছুতেই রাজী হবেন না। আর জ্যোতি—সেও যে এ রকম করে তোমার টাকা নেবে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না। যদি তাকে দয়া দেখাতে চাও, তার ভবিষ্যৎটা একটু ভেবে— তুমি তাকে ত্যাগ কর্‌লে তার কি দশা হবে মনে করে দেখো, আর তোমাকে কি বল্‌বো।" চোখের জল চোখে চাপিয়া অমলা গমনোদ্যতা হইল। যামিনী পূর্ব্বে এতদূর পর্য্যন্ত কল্পনা করে নাই। অমলার শেষ কথা কয়টা তাহাকে বাজিল। মর্ম্মপীড়িত হইয়া সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "আমায় মাপ করুন, আমি যে কত নিরুপায় তা আপনারা জানেন না, আচ্ছা যদি অনুচিত না মনে করেন, তাহলে একদিন গিয়ে আমি তাঁকে ঐ সম্বন্ধে আমার যা বলবার আছে, সব বুঝিয়ে বলবো এখন।"

অমলা ভাবিল মন্দ কি, ইহার মনটা ঈষৎ ভিজিয়াছে, হয় ত জ্যোৎস্নাকে দেখিলে শুনিলে আরো একটু নরম হইতে পারে। এই ভাবিয়া বলিল "সেতো এসেছে, আচ্ছা আমি তাকে ডেকে দিচ্চি বেশ তো তুমি যদি তাকে রাজী করে দিতে পারো সে তো ভাল কথাই।"

এই বলিয়া তাহাকে ভাবিবার অবসর না দিয়া সে চলিয়া গেল।

দ্বারের বাহিরে চাবর শব্দ হইতেই যামিনী চমকাইয়া উঠিয়া পড়িল। সে যখন অমলাকে সান্ত্বনা দিবার ছলেই কথাটা বলিয়া গিয়াছিল, তখন একবারও ভাবে নাই ইহারই মধ্যে এই দুরূহ কার্য্য সাধন করিবার জন্য নিজেকে তৈরি করিতে হইবে। একটুখানি ভাবিয়া লইয়া অভিনয়ে নট যেমন নিজের স্থান গ্রহণ করে, সে তেমনি করিয়া নিজের চিত্ত হইতে যথাসম্ভব দ্বিধা, লজ্জা সরাইয়া ফেলিয়া সহজ ভাব অবলম্বন করিয়া বলিল "ভেতরে এসো জ্যোৎস্না।"

ইচ্ছা করিয়াই আসুন' ছাড়িয়া 'এসো' বলিল। পর্দ্দা সরাইয়া অনিচ্ছা কুণ্ঠিত পদে জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া বাধা প্রাপ্তের ন্যায় থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পা দুখানা থর থর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। হস্ত এবং পদতল হিমবৎ অসাড় হইয়া আসিয়াছে। দিদি বলিলেন তিনি তাহাকে কি বলিবেন বলিয়া ডাকিয়াছেন। তাহাকে? কি বলিবেন? হয়ত তাহার গোপন অপরাধ তাঁহার কাছে কোন রকমে সুবিদিত হইয়া গিয়াছে সেই দুঃসাহসিকতার তিরস্কার করিবার জন্যই তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন! লজ্জায় সঙ্কোচে মর্শ্মের ভিতরে সে মরিয়া যাইতে লাগিল—কি বলিবেন? এই অপরাধে শাস্তিস্বরূপই কি, তবে নলিনাকে তিনি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতেছেন? মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কি ক্ষতি? ইহাতে তাঁহার কি ক্ষতি? কোথায় কোন্ সূর্য্যমুখী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহার প্রদীপ্ত কিরণের দীপ্ত তেজে পুড়িতেছে সে সংবাদ সূর্য্য নাইবা রাখিলেন! সে খোঁজ লইয়া, তাহার পুড়িবারও সুখ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিবার জন্য মেঘ ঢাকা দিবারই এমন কি আবশ্যক? যামিনী সঙ্কোচহীন সহজ ভাবেই দুই চোখের পূর্ণদৃষ্টি তাহার সম্মুখবর্ত্তিনীর লজ্জাসঙ্কুচিত আনত নেত্রপল্লবের উপরে স্থির করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল "তোমার সঙ্গে নলিনীর সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ করব বলে ডেকেচি, কেন না তুমি তাকে বড়ই স্নেহ করে থাকো কি না, তুমিই তার কিসে ভাল হবে সেটা ঠিক বুঝতে পার্ব্বে। বসোনা, এই যে এই কেদারাটায় এসে বসো।" এই কথা বলিয়া সে তাহার দিকে একখানা চৌকি টানিয়া সরাইয়া দিয়া নিজের চৌকিখানা তাহার বিপরীত দিকে একটুখানি হঠাইয়া লইয়া বসিল এবং পুনশ্চ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "বসো"।

এতদিন পরে আজই প্রথম যামিনী তাহাকে সে বলিয়া বিশেষ করিয়া দেখিল। ছোট একটি শান্তশিষ্ট মেয়ে এইটুকু মাত্র পরিচয় মনে রাখিয়া ইতিপূর্ব্বে সে যে তাহাকে আর কোন দিনই তেমন লক্ষ্য করে নাই ইহাতে তাহার অপরাধও এমন কিছু ছিল না। সে বরাবরই তাহার সাক্ষাতে কেমন একটা সঙ্কোচ করিয়া সরিয়া থাকিয়াছিল, যাহাতে বাধ্য হইয়া তাহাকেও তাহার কাছে একটু সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছে। আজ প্রথম সে নিজের অন্তরস্থ কৌতুহলের বশেই যখন তাহার আনত মুখে সমালোচকের পর্য্যবেক্ষণ দৃষ্টি প্রেরণ করিল তখনি তাহার সেই সকৌতুক দৃষ্টি মুহূর্ত্তে বিস্ময়পূর্ণ প্রশংসায় চকিত হইয়া উঠিল। কি মিষ্ট কি স্নিগ্ধ সেই ছোট মুখখানি! যেন শরৎকালের ফুটফুটে জ্যোৎস্না টুকু!

জড়িতপদে কোন রকমে জ্যোৎস্না আসন গ্রহণ করিয়া যেন বাঁচিল। ডাকার উদ্দেশ্যটা জানিতে পাইয়াও সে ভিতরে ভিতরে অনেকটা অনুগৃহীত বোধ করিতেছিল। এমন কি, সে যে তাঁহার পরামর্শের ভিতরে আসিবার যোগ্য হইয়াছে, ইহাতে সে খুব একটা আত্ম-গরীমা অনুভবও করিয়া বসিল। কিন্তু বক্ষের মধ্যকার বিপুল আলোড়ন সে কোন মতেই রুদ্ধ করিতে পরিতেছিল না। ষ্টীমারের চাকায় পিছনের জল যেমন করিয়া সশব্দে বিলোড়িত করে তেমন করিয়া হৃদপিণ্ড রক্তের ঢেউ তুলিতে লাগিল।

যামিনী একখানা বইএর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে সেই দিকে চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিতে লাগিল, "আমার তো সময় নেহাৎ কম, আমি যে নলিনীকে ভাল রকম দেখা শোনা করতে পারি, এমন ভরসা হয় না। এখন তুমি দেখচো বটে, কিন্তু বরাবর তো তোমার সে সুবিধা হবে না। তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে, তোমার নিজের শিক্ষাই এখনও সম্পূর্ণ হয়নি, এখন থেকে তুমি একটি শিশুর

শিক্ষার ভার নিলে নিজের ক্ষতি করা হয়। সেইজন্য আমার ইচ্ছা তুমি আরও কিছুদিন নিজে একটু পড়া শোনা করো। তারপর ওকে একটু দেখলে সে দেখাটা ভালই হবে। তত দিনের জন্য আমি একজন লোক ঠিক করেচি। এখন আমার নিজের স্বার্থের জন্য আমি তোমায় একটি অনুরোধ কর্‌তে চাই।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া যামিনী একবার উৎসুক নেত্রে জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিল। সে ঈষৎ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল মাত্র, কিন্তু ফলে যেমন তেমনি স্তব্ধ ও স্থির হইয়া রহিল। মুখের ভাবে কোন প্রকার আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই প্রকাশ পাইল না। ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত যামিনী কহিল, "আমার ইচ্ছা একজন ভাল শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তোমার জন্য আমিই নিযুক্ত করে দিই। এতে তুমি না বল্‌তে পাবে না, কারণ আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ সুবিধার জন্যই আমি এটা কর্‌তে চাচ্চি।"

জ্যোৎস্না ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বিদ্যুৎ চমকের মত একবার বক্তার দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া আবার পর মুহূর্ত্তে তাহার চক্ষের সহিত মিলিত দৃষ্টি হইয়া চোখ নত করিল। তাহার পরিপুষ্ট গণ্ড ও আকর্ণ ললাট সিঁদুর মাখা হইয়া উঠিয়াছিল। এ কি অযাচিত করুণা! না, এ সব দিদির কাণ্ড!

"তুমি এতে অমত করে আমার মনে কষ্ট দেবে না এই বিশ্বাসেই তোমায় সব কথা বল্লুম। তোমার বাবাকে আমি কাল গিয়ে বলে মত করিয়ে আসবো এখন। তিনি আমায় সন্তান তুল্য স্নেহ করেন, তাঁর জন্য আমি ভাবি না। দেখ, তোমরা আমায় সাহায্য না কর্‌লে মেয়েটি নিয়ে যে আমি বড় বিপদেই পড়ব। তার মা নেই, আর তোমার কাছে সব কথা খুলে বলাই ভাল, কারণ সে তোমার ভালবাসার জিনিয, তার অবস্থাটা তোমার জেনে রাখা উচিত মনে করি,—কখনও তার মাতৃস্থান কেউ অধিকার করবেও না। কেন তাও বলি শোন—

আমি পিতার আদেশেই শুধু নলিনীর মাকে বিবাহ করেছিলাম, কিন্তু সে বিবাহে আমারই মনের পাপে দুজনে সুখী হতে পারিনি।

আবার বিয়ে তো আমার মত অবস্থায় সম্ভবই নয়। তুমি তা'হলে নিজের সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখো, আর যা বলবার আছে দিদির কাছেই না হয় বলো, কিন্তু আমায় যদি পর ভেবে সরিয়ে দাও, তাহলে বুঝবো নলিনীর প্রতি তোমার স্নেহ নাই।"

যামিনী যতক্ষণ কথা কহিতেছিল, বরাবরই তাহার দৃষ্টি জ্যোৎস্নার ভাব পর্য্যবেক্ষণের দিকে নিবদ্ধ ছিল। তাহার কণ্ঠ শেষের দিকটায় মৃদু হইতে মৃদুতর ও স্নেহপূর্ণ সহানুভূতিতে উদ্বেলিত হইয়া আসিল। না জানি সে ওই মৌন হৃদয়ে কি তীক্ষ্ণ শর বিঁধিতেছে!

তাহার কথা শেষ হইবার পর দুই তিন মিনিট পরে জ্যোৎস্না হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ না তুলিয়া চোখ নত রাখিয়াই সে তাহাকে নমস্কার করিল এবং তাহার পর ধীর পদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। একটি শব্দও সে উচ্চারণ করিল না, এমন কি একটু চাহনিও রাখিয়া গেল না, যেন একখানা প্রাণহীন প্রস্তর প্রতিমা যাদু মন্ত্রে চলিতেছে ফিরি-তেছে। জ্যোৎস্না চলিয়া গেলে যামিনী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল আহা সুন্দর মেয়েটি! কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দেওয়ালের উপরে একটা চলন্ত ঘটিকা যন্ত্রের প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহারই চিত্ত ভাবের প্রতি লক্ষ করিয়া সেও যেন বলিতেছিল ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্!

যাহা জানান আবশ্যক ছিল তাহা জানান হইয়া গিয়াছে। জ্যোৎস্নার কাছেও সম্ভবতঃ বাহিরের গুজবটা অজ্ঞাত নাই! ইহা হইতেই সে হয়তো প্রকৃত ব্যাপারটা বাহির করিয়া লইতে পারিবে, এবং এই দ্বিপত্নীকের উপর হইতেও সে তাহার যদি কিছু আকর্ষণ থাকে তাহাও ফিরাইয়া লইতে সম্মত হইবে। সেই জন্যই সে তাহাকে শিক্ষার ছলে কিছু সময় দেওয়াইতে চায়। অনেকক্ষণ পরে সে আবার আত্মগত বলিল "ঈশ্বর মেয়েটির মঙ্গল করুন! আহা যেন ও অসুখী হয় না।"

অমলা বিদায় লইতে আসিয়া সন্দিগ্ধ চক্ষে পুন পুনঃ চাহিয়া দেখিল। যামিনী সসঙ্কোচে জিজ্ঞা

করিল "আপনাকে জ্যোৎস্না কিছু বলেছে?" অমলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "কিছু না, শুধু বলেছে নলিনীকে যেন আমি দেখতে পাই। বলবার সময় তার চোখ দুটো ছল ছল করছিল। সে যে ওকে কি ভালবেসেছে প্রকাশ, সে তোমায় আমি কি বল্‌বো। ঘুমন্ত ওর নাম করে। মাতৃস্নেহ এই বয়েসে ওর মধ্যে যে কোথা থেকে এলো আমরা ভেবেই পাইনে।"

এই কথা গুলার গূঢ় অর্থ টা যামিনীকে ভিতরে ভিতরে তীব্র আঘাত করিল। সে ব্যথিত লজ্জায় মাথা নত করিয়া ভাবিতে লাগিল একটি কুসুম পেলববৎ সুকোমল, সুরভি জীবন পারিজাত যদি তাহারই এক বিন্দু সহানুভূতি চাহিয়া হতাশায় ঝরিয়া যায়, তবে সে কি, ইহার জন্য কোনও খানে জবাব-দীহিতে পড়িবে না?

সে দিন বিদায় কালটায় একটা বিষাদের মৌনতা সবাকার উপরেই বিস্তৃত হইয়াছিল। যামিনী অম-লাকে গাড়িতে তুলিয়া দিবার জন্য সঙ্গে আসিল, সান্ত্বনার কথা না পাইয়া বিব্রত হইতেছিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ পক্ষের সন্ধ্যায় হিম পড়িয়া কোয়াসার মত চারিদিক ঝাপ্‌সা করিয়া দিয়াছে। আকাশে অল্প অল্প মেঘও জমিয়া উঠিয়া-ছিল। যামিনী অমলা পাশা পাশি চলিতেছিল কিন্তু কাহারও যেন আজ কথা জুটিতেছিল না। গাড়ি বারান্দায় গাড়ি আনে নাই, গাড়িখানা বাহিরে কাঁকর ফেলা পথের উপরে দাঁড় করাইয়া সহিস লণ্ঠনের বাতি জ্বালাইতেছিল।

যামিনী নীরব ছিল বটে কিন্তু তাহার মনের মধ্যে যে একটা তুমুল আলোড়ন চলিতেছিল, তাহা বুঝিতে অমলার একটুও কষ্ট পাইতে হইতেছিল না, সে মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিল। চলিতে চলিতে সহসা চিন্তিতভাবে যামিনী পিছনে চাহিয়া দেখিল। নক্ষত্রের ছায়ালোকে তাহার পশ্চাতবর্ত্তিনী ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটিকে এক খানি চলন্ত প্রতিমার মত প্রতীয়মান হইতেছিল। অবনত মুখ খানির উপরাংশে খণ্ড চন্দ্রের মত নির্ম্মল ললাট ঘেরিয়া মেঘ পুঞ্জের ন্যায় কালো নরম চুলগুলি ঈষৎ ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। তাহার নীচে তুলি অঙ্কিত সরু দুটি ভ্রূ লেখা ও পাতা ঢাকা পদ্ম কুঁড়ির মত দুটি চোখের অদৃশ্য আভায এবং একখানি নব কিসলয় সদৃশ কোমল মৌন অধর অকস্মাৎ এই শান্তিময় অন্ধকারের আধ ছায়ায় বিশ্ব সৌন্দর্য্যের মোক্ষ প্রাণ লাভ করিয়া যেন নব বসন্তের সহস্র শোভায় ভরিয়া উঠিল। বিশ্বজীবনের মূল যে প্রেম—যাহা সেই সৃষ্টির পূর্ব্বাবধি বিশ্ব বিধাতার অন্তরের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়া তাঁহাকে সৃষ্টি উন্মুখ করিয়াছিল—বিশ্বে এক-মাত্র যাহা তাঁহারি প্রকাশ রূপে শত নামে শত ধারে প্রবাহিত রহিয়াছে—যাহা ক্ষেত্রে শস্য, বৃক্ষে পত্র ও চিত্তে আনন্দ দান করিয়া ইহাকে মরুভূমির পরিবর্ত্তে আনন্দ কাননে পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারি আবেগে আকুল জ্যোৎস্না যেমনি তাহার কোমল দৃষ্টি উন্নমিত করিল, অমনি যামিনী তাহার কৃষ্ণ তারকার ভিতরে তাহারি সেই অক্ষয় অব্যয় জ্যোতি দেখিতে পাইল। তাহার পক্ষে অপূর্ব্ব দৃষ্ট হইলেও এ জিনিষ চিনিতে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। হীরাকে যাচাই না করিলেও নেহাৎ আনাড়ি লোকেও চিনিতে পারে যে তাহা হীরা। একটা গভীর করুণাপূর্ণ সহানুভূতির সহিত অন্তরের মধ্যস্থল একটা অননু-ভূত আবেগে মুহূর্ত্তের জন্য স্পন্দিত হইয়া উঠিল। আহা, কেন সে তাহাকে তাহার প্রথম জীবনে পাইল না? সুসঙ্গতা যদি জ্যোৎস্না হইত, কিন্তু এখন—"

সেই মুহূর্ত্তে সহসা ধুম্ করিয়া একটা ভীষণ শব্দ হইয়া নিমেষে তাহার কাণের পাশ দিয়া একটা গুলি সাঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল। এবং ইহার পরে উপর্য্যুপরি আরো গোটা কতক শব্দ মুহুর্মুহু বাতাসে গর্জ্জিয়া উঠিল ও স্তব্ধ প্রকৃতিকে চমকিয়া শূন্যে শূন্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া রহিল। কেমন করিয়া কি ঘটিল ঠিক বলা যায় না—পর মুহূর্ত্তেই যেন সে বজ্রাহতবৎ নিশ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, এবং শুধু এই টুকু মাত্র অনুভব করিতে পারিয়াছিল যে প্রথম শব্দটার সঙ্গে সঙ্গেই কেহ, একটা অস্ফুট চিৎকার করিয়া বেগে তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল এবং শব্দ গুলার শেষের সঙ্গেই একটা মৃদু আর্ত্তনাদের সহিত সে

তাহার পদতলে আহত বিহঙ্গের মত লুটাইয়া পড়িয়াছে।

মুহূর্ত্তের ভিতরেই সমুদয় কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল। অমলা নিজের জায়গায় দাঁড়াইয়া মূর্চ্ছিতা প্রায় হইয়া গিয়াছিল। সহিস কোচম্যান গুলা পাথরের মত জমিয়া গিয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে যামিনীর বজ্রাহত শরীরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ গর্জ্জন তথনও ব্যর্থ ক্ষোভে তাহার চারিদিক ঘেরিয়া দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া তীব্র বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছিল। ধূমকুণ্ডলী লহরে লহরে ভাসিয়া ঘুরিতেছে। সমস্ত শরীরের নিশ্চল রক্তস্রোত হিম শীতল হইয়া প্রতি শিরা উপশিরার ভিতরে অকস্মাৎ বরফের মত জমিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই একটা নিদারুণ সন্দেহে তাহার নিস্তব্ধধ্বনি সেই সংহার শব্দেরই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বক্ষের ভিতরে আছড়াইয়া পড়িল। তাহার পদতলে এ'কে? তাহার উষ্ণ শোণিতের ধারায় তাহার শীতল পদতল জুতার ভিতরেও ভিজিয়া উঠিল! কম্পিত দেহ অবনত করিয়া সে গভীর উদ্বেগের মধ্য হইতে সেই মৃত্তিকাশায়িত দেহের উপরে কোনমতে চাহিয়া দেখিল। সংশয়হীন সত্য! নিষ্ঠুর সত্য! সেই নিশ্চেতন, প্রাণহীনবৎ শরীর জ্যোৎস্নার! সে-ই তাহার বক্ষ নিজের ক্ষুদ্র দেহ দিয়া ঢাকিয়া তাহার এই আকস্মিক নিষ্ঠুর মরণকে নিজের পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়াছে। তাহার মুখ হইতে মর্ম্মভেদী বিলাপের মত একটা কাতরধ্বনি বাহির হইয়া গেল।

হত্যাকারী আর কেহ নয়, সে সেই ভূষণচন্দ্র। ভূষণ বাগানের ঝোপ হইতে বাহির হইয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া পলাইবার সময়েই ধরা পড়িয়াছিল। চারিদিকে লোক ধর্ ধর্ করিতেই সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল বলিল, "যাক্, বাবুকে যে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে পেরেচি, এই ঢের।"

(৩৪)

গভীর অনুতাপ যামিনীকে যেন বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল। কি হইল! এ কি হইল? যে মুহূর্ত্তে তাহার অন্ধনেত্র এই মর জগতে স্বর্গের আনন্দালোক প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার উপরে এ কি ভীষণ বজ্রাঘাত? সমস্ত সংসার যখন সংহাররূপিণী ভৈরবীর আকস্মিক ভৈরব গর্জ্জনে মন্ত্র সম্মূর্চ্ছিত; সেই প্রলয় বিষাণ একমাত্র প্রেমকে শুধু পরাভব করিতে পারে নাই। কি অতুলনীয় প্রভাব এই নির্ম্মল প্রেমের! জীবনে এবং মরণেও সমান উজ্জ্বলতায় ইহা প্রেমপাত্রকে ঘেরিয়া আত্মবিস্মৃত, অনিদ্রিত জাগরণে জাগ্রত থাকে, নিমেষমাত্র আত্মচিন্তা করে না! যেন যুগ যুগান্তের পরপার হইতেও এই অমর প্রেমের ধারা তাহার উপরে ইহার অমৃত কিরণ বর্ষণ করিয়া আসিয়া আজও নির্ম্মল অক্ষয় রহিয়াছে, ইহার পরে এমান একটা প্রবলতম আকর্ষণ সে অনুভব করিল। আর তাহার বক্ষ ফাটিয়া শোণিতাক্ত হাহাকার উত্থিত হইতে লাগিল। এই অতুলনীয় হৃদয়ের অম্লান মন্দার মাল্য সে কত-টুকুই বা পূর্ব্বে হেলায় ফিরাইয়া দিয়াছে? কেন এই রাবণের শক্তিশেল তাহারই বুকে বিঁধিল না? সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া যাইত যে!

যামিনীর গৃহ ডাক্তারে ও দর্শকে ভরিয়া গিয়াছিল। পুলিসের লোকেরও বিরাম ছিল না। কিন্তু আহতা রোগিণীর নিকটে জনতা খুব কমই। কলিকাতা হইতে সার্জ্জন জেনারেল স্বয়ং আসিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইতে চলিয়াছিল। রক্তস্রাব যখন বন্ধ হইয়া আসিল, তখন আর সমস্ত শরীরে শোণিতের লেশও ছিল না। ইন্দ্রনাথ বাবু কন্যাকে চুম্বন করিয়া শুধু মৃদুস্বরে কহিলেন, "মা তোমার জন্য আমার শোক করবার কিছুই নাই, গৌরব বোধ করবার অনেক আছে। নিজে ধন্যা হয়ে তুমি তোমার মা বাপকে ধন্য করেছ। শান্তিময়ী ছিলে সেই শান্তি তোমার অটুট হোক।"

যোগমায়াকে সৌদামিনী তাঁহার বাড়ীতেই আটকাইয়া রাখিতে গিয়াছেন। এই শোণিতাক্ত দৃশ্য মাতৃ-হৃদয়ের সহনাতীত।

ভোরের সময় কৃষ্ণ পক্ষের ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু পত্র-মর্ম্মর উদ্যান তরুর ছায়াতলে ঘুমাইয়া পড়িতেছিল, এমনি সময় নিবন্তপ্রায় জ্যোৎস্না তাহার স্নিগ্ধ

দুটি নেত্র উন্মীলিত করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। অমলা ও ইন্দ্রনাথ বাবু দুই দিক হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিলেন, "জ্যোতি!" সে পিতার পানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ যামিনীর উৎকণ্ঠাশঙ্কিত চোখের উপরে দৃষ্টি স্থির করিল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত তখনও সেই দুটি শান্ত চোখে কি হৃদয়ভরা প্রেমের জ্যোতি ও সার্থকতার আনন্দ! সে দৃষ্টি যেন জ্বলন্ত গোলার মত যামিনীর অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়া আঘাত করিল। মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া সহসা সে নিজের কম্পিত উভয় হস্তের মধ্যে তাহার হিম শীতল একখানা ক্ষুদ্র হস্ত তুলিয়া লইয়া ব্যাকুল স্বরে ডাকিল, "জ্যোৎস্না! জ্যোতি!"

জ্যোৎস্নার শান্ত অধরে বিজয়ের গৌরব শান্তির হাসির সহিত মধুররূপে ফুটিয়া উঠিল, আর মিলাইল না।

যামিনী ডাকিল, "দিদি!"

অমলা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। প্রভাতের নির্ম্মল আলোক ক্লান্তিহীন স্মিতহাস্যে গভীর নিস্তব্ধ গৃহের মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিতেছিল। মানবের সুখে দুঃখে চির-উদাসীনা প্রকৃতি প্রভাত গগনকে সূর্য্য কিরণ-ছটা দ্বারা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া জলে স্থলে শত বৈচিত্র্য ও ধরণী বক্ষের মুদিত মুকুল ফুটাইয়া বহুল গন্ধের সৃষ্টি করিতেছিল। মানবের চিত্ত বেদনাকে উপহাস করিয়া স্নিগ্ধ বাতাস সেই গন্ধ বহন করিয়া চিরদিনেরই মত উপরে নীচে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। ইহারই মাঝখানে কত বড় যে একটা ভীষণ বিপ্লব ঘটিয়া গেল, তাহার খোঁজে যেন কাহারও আবশ্যক মাত্র ছিল না। অথচ সেই নিষ্পাপ, নিঃস্বার্থ শোণিতের গাঢ় রক্তিমা এখনও ধরণীর মাতৃ অঙ্ক ধুইয়া ফেলিতেও সময় পায় নাই।

যামিনী বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিবার পর তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল "দিদি!" তাহার কণ্ঠে পুঞ্জীভূত অশ্রুজলের সহিত মর্ম্মভেদী যন্ত্রণার হাহাকার ব্যক্ত হইল। অমলা লক্ষ্যহীন দৃষ্টি এতক্ষণে তাহার প'রে স্থির করিল, কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "প্রকাশ ভাই! জ্যোতি আমার কোথায় গেল? আমি যে বড় সাধ করেছিলুম, তাকে দিয়ে তোমায় পাবো।" যামিনী শিশুর মত অকুণ্ঠিত সরলতার সহিত রোদন-কম্পিতা অমলার কোলের উপর মাথা রাখিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "তাইতো পেয়েছ দিদি! সে যে তার নিজের রক্তধারা দিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে দিয়ে গেছে।"

(৩৫)

ফাল্গুনের অতি উজ্জ্বল প্রভাত। একটি নবীন ছন্দের অতি সুমধুর শান্তির সঙ্গীতে তাহার সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে।

গরদের চাদরখানি গায়ে টানিয়া তটচুম্বি জাহ্নবী তরঙ্গের কুলুকুলু ধ্বনি নিনাদিত বাগান ভরা ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা প্রভাত বায়ু সেবিত উদ্যানবেদিকায় আসন করিয়া দত্তজা মহাশয় অনিমার পত্রখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে মধ্যে মধ্যে পথের দিকে চাহিতেছিলেন। যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পত্রখানাতে অনেক কথাই ছিল। সে লিখিয়াছে—"তুমি লিখেছ আমি বরাবরই তাঁকে পেয়েছিলুম, কেবল আত্মবিস্মৃতির জন্য নিজে সেটা বুঝিনি। এইজন্যেই আমাদের একজন গুরু চাই যিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে চোখ খুলে দিতে পারেন। এই কথা তিনিও কতবার বলেছেন। দাদামশাই, তুমি যা বলেছ সব সত্য, তিনিই আমার গুরু। তাঁকে আমার জীবনে না পেলে তোমায় চিনতুম না, কিন্তু তুমি যে আমার কি তা শুধু আমিই জানি। সব যুক্তি সমুদয় তর্ককে দুই হাতে ঠেলে ফেলে শুধু তোমার মুখের দিকে চাইলেই যে সমস্ত দ্বিধা এক হয়ে যায় তা কি তুমি জান? জড়প্রকৃতি যে ওই জ্ঞান ও আনন্দ তোমায় দিতে পারেনি এর ভেতরে কোন সংশয়ও স্থান পায় না। কারণ যা' তার নিজের মধ্যে নেই, সে জিনিষ অন্যকে দিতে কোথায় পাবে সে? তারপর ওই আনন্দের বিশোক জ্যোতি যে পরমাণুপুঞ্জের নশ্বর লীলা সংস্থান মাত্র নয়, যুগ যুগান্তরের সাধনালব্ধ তপঃফল আর একমাত্র অক্ষয়

অব্যয় আনন্দেই এর পর্য্যবসান তাও তোমার মুখে চোখের ওই অনির্ব্বাণ অম্লান আনন্দের স্ফূর্ত্তি নিজের হয়ে নিজেই প্রমাণ দিবে। দুবৎসর আগে যে নাগা সন্ন্যাসীকে আমি একরাত্রের জন্য দেখেছিলুম তখন তার কঠোর মুখের প্রশান্ত শান্তি আমার চোখে বিশ্ব-বিমোহন সৌন্দর্য্যের ছায়া ফেলেছিল বটে কিন্তু তাতে আমায় শুধু বিস্মিত করেছিল, বিশ্বাস করায়নি। আজ তোমায় পেয়ে আমি বুঝেছি, কে তাঁর বিশ্বরঞ্জন তুলিকাপাতে তার মুখে অমন আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এখন আমার এই অশান্ত প্রাণ-টাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্চি ; সেই শান্তি সেই তৃপ্তি দিয়ে একে সফল করে দাও। দাদা আসচেন, এ বাড়ীখানা আমি স্কুলের জন্য দান করছি—বাবা আমাকেই দিয়ে গেছেন। এখন থেকে আমার বাকি রইল, তোমারই কোল—আর কিছু না!"

তোমার অনিমা।

সদ্যোজাত নির্ম্মল প্রভাতকে বিস্ময় চকিত করিয়া মেঘ বিচ্ছুরিত বিদ্যুৎ শিখার মত তরুণী মূর্ত্তি তাঁহার পদতলে মাথা নত করিয়া ডাকিল, 'দাদামশাই!'

দুই হাত তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া প্রবীণ কহিলেন, "এসো দিদি এসো!—" সেই আদরপূর্ণ বাহুর মধ্যে নিজেকে প্রদান করিয়া সে অশ্রুভার রুদ্ধস্বরে কহিল, "এই নাও—আমায় নাও তুমি—আমি আর পারচিনে—চলো দুজনে অনেক দূরে চলে যাই—"

এই বলিয়া অনিমা প্রত্যাশার সহিত তাঁহার হাস্য-স্নিগ্ধ দুটি চোখের উপরে গভীর উদ্বেগ ব্যাকুল দুই চোখের দৃষ্টি স্থাপিত করিল।

তাহার চুলের উপরে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিয়া দত্তজা কহিলেন, "কর্ত্তব্যকে দণ্ড না ভেবে তাকে আনন্দের দান মনে করে নেনা ভাই! এই আনন্দের যজ্ঞকুণ্ডে সব অশান্তি গুলোকে আহুতি দিয়ে দে, পালাবি কার ভয়ে?"

"কারুকে ভয় করিনে দাদামশাই, ভয় শুধু নিজেকে। তোমায় আর কি লুকবো? অন্তর্য্যামি তুমি সবি তো জানো। যা আমার প্রথম জীবনে হারি-য়েছি, সে জন্মব্যাপী ক্ষতি আমি তো সইতেও কাতর হইনি। কিন্তু তাঁর এই মনঃকষ্টের সময় আমি যে তাঁকে দুটো সান্ত্বনার কথা বল্‌তেও অধিকারী নই, এইটে আমি যে কোন মতে বরদাস্ত করতে পার-চিনে। নিজে আমি সব সইতে পারি কিন্তু তাঁর কষ্টে আমার বুকে যে শেল বেঁধে। মানুষ বড় ছোট, দাদা-মশাই, মানুষের মন বড় দুর্ব্বল। তিনি অন্যকে বিয়ে করে সুখী হয়েছিলেন তাতে আমার কোন দুঃখ ছিল না, কিন্তু এ যে একটি শোকের স্মৃতি দিয়ে তিনি আপনাকে বদ্ধ করে রাখবেন এ—আমার অসহ্য! আমার দোষেই এ সব হলো! কেন আমি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে নিজেকে তেমন কঠিন প্রতী-জ্ঞায় বদ্ধ করলাম! সেই আমার কাল হ'ল। তাই থেকে সব হারালাম, দাদাকে আর তাঁকেও। যা গেছে তা আর ফিরিবার নয়, তবু আর যেন পার-চিনে—এখন এসো দূরে নির্জ্জনে দুজনে দুজনকে নিয়ে দিনকতক সরে থাকি। তার পর মনের উপর তোমার ওই আনন্দের ছাপ যখন চেপে বসবে তখন আবার আমার এই কর্ত্তব্যের ভার নিতে ফিরে আসবো। এসব ছেড়ে আমি যাব কোথায়?"

সমাপ্ত।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

প্রার্থনা।

প্রভো! তব প্রিয় কর্ম্মে রত রাখ অনুক্ষণ,
মায়াতে মোহিত যেন হয়নাকো মন।
প্রেম-রসে মজি কর্ম্ম হোক্ মনোহর,
অনাসক্ত, অহেতুক, সুমিষ্ট, সুন্দর!
হোক্ নিষ্কাম, নির্ম্মল, পূত, অভিসন্ধিহীন,
তোমারই মননে, গানে ভরা নিশিদিন।

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

ধর্ম্মের জয়।

৭

একদিন ধীর মন্থর গতিতে প্ল্যাটফরম কম্পিত করিয়া যখন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ বোম্বাই ষ্টেসনে উপনীত হইল, তাহা হইতে একটি যাত্রী সপরিবারে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি সুরেশচন্দ্র, সঙ্গে সুশীলা ও পুত্র কন্যা চারিজন। সুরেশচন্দ্র ষ্টেসনে নামিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন। স্ত্রী ও কন্যা পুত্রদের গাড়ীর ভিতরে বসাইয়া তিনি স্বয়ং কোচ-বাক্সে বসিলেন। সুশীলা তাঁহাকে বারবার সেস্থানে বসিতে নিষেধ করিলেন, কারণ আকাশ তখন ঘন ঘোর মেঘে আচ্ছন্ন, বৃষ্টি আসিবার সব পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা যাইতেছে, শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। সুরেশচন্দ্র বলিলেন—

"উপরে না বসিলে কোন দিকে যাইবে বুঝিব কি করিয়া? নীরজ দিদিকে টেলিগ্রাম পর্য্যন্ত করি-লাম, কই একটা লোকও ত পাঠান নি।" তারপর তিনি ক্যোচম্যানকে এক পূর্ব্ব পরিচিত সরাই ঘর অভিমুখে যাইতে বলিলেন। সরাই ঘরে তাঁহারা যথাসময়ে উপনীত হইলেন বটে, কিন্তু পথে বৃষ্টি হওয়ায় সুরেশচন্দ্রের বস্ত্রাদি সব সিক্ত হইয়াছিল। তাঁহারা সরাইঘরে অবতরণ করিয়া, সরাই অধ্যক্ষের নির্দ্দিষ্ট একটি কক্ষে আশ্রয় পাইয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। সুশীলা পুত্রদের লইয়া দ্রব্যাদি গুছাইতে ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন সুরেশচন্দ্র তখনো বস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। তাড়াতাড়ি তখনি বস্ত্রাদি বাহির করিয়া দিলেন ও তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলেন। সুশীলা সমস্ত দ্রব্যাদি গণনা করিয়া গুছাইয়া রাখিলেন তাহার পর পুত্রদের সাহায্যে রন্ধ-নের উদ্‌যোগ করিলেন। সুশীলার সহিত অল্প চাউল ডাল লবণ ও মশলার চূর্ণ ছিল, কয়েকটা আলুও ছিল। দেখিতে দেখিতে খেচরান্ন প্রস্তুত হইল। সুরেশচন্দ্রের পূর্ব্ব হইতেই শরীর অসুস্থ বোধ হইতে-ছিল, তবু সুশীলা চিন্তিত হইবেন বলিয়া কিছু না বলিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। কন্যা পুত্রদের আহারাদি শেষ হইলে, সুশীলা আপনিও যৎসামান্য আহার করিলেন। ট্রেণের কষ্টে অনিয়মে দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর ও মন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

সুশীলা আহারাদি সমাপ্ত করিয়া সেই নির্দ্দিষ্ট কক্ষটিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সুরেশচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। সে রাত্রি সেই ভাবেই কাটিল, যে যেমন করিয়া পারিল শুইয়া বিশ্রাম করিলেন। সুশীলা প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই কক্ষের একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত করিবামাত্র সূর্য্যের কিরণ সেই গৃহে ছড়াইয়া পড়িল ও সমুদ্রের শীতল বায়ু আসিয়া দেহ মন প্রফুল্ল করিল। সম্মুখেই সমুদ্র, প্রশান্ত মুর্ত্তি, গম্ভীর কলরোলে বহিয়া চলিতেছে। সেই নীল ঊর্ম্মিমালার সহিত সূর্য্যের কনক কিরণ হাসিয়া হাসিয়া খেলা করিতেছে, একবার ইহার উপর ঢলিয়া পড়িতেছে, আবার অন্য চঞ্চল তরঙ্গের উপর ছড়াইয়া পড়িল। সুশীলার চক্ষে আর পলক পড়ে না, সেই অনন্ত সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া তাঁহার হৃদয় যেন কেমন বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই করুণ অথচ গম্ভীর কলধ্বনিতে হৃদয়ে যেন কি এক বিষাদ রাগিণী বাজিতে লাগিল। চক্ষে যেন আপনা আপনি জল ভরিয়া উঠিল, কি যেন হারাইবার ভয়ে হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সুশীলা হৃদয়কে সংযত করিয়া অজিতকে ডাকিয়া বলিলেন—

"অজিত এদিকে আয় সমুদ্র দেখবি।"

অজিত ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "কি সুন্দর মা! এমন আমরা আর কখনো দেখিনি, বাবা কোথায় মা?"

সুশীলা বলিলেন "এখনো শুয়ে আছেন। বোধ হয় ক্লান্ত হয়েছেন বলে এখনো ঘুমিয়ে আছেন।"

সুরেশচন্দ্র শয্যা হইতে বলিলেন—

"আমি ত ঘুমোইনি, জেগেই আছি, শরীরটা কেমন ভার বোধ হচ্ছে, গায়ে হাতে বড় ব্যথা, দেখত বোধ হয় আমার জ্বর হয়েছে। মাথাও তুল্‌তে পাচ্ছিনে।"

সুশীলা দ্রুতপদে শয্যার নিকট আসিয়া স্বামীর ললাটে হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, অত্যন্ত গরম ও বেশ জ্বর হইয়াছে। বিদেশে প্রথম দিন আসিতে না আসিতে এই বিপদ, তাঁহার হৃদপিণ্ড যেন ফাটিয়া যাইবার মত হইল। সুশীলা ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—

"ডাক্তার ডাকাইবে? এখানে কোনও ডাক্তারকে তুমি কি জান?"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "আমি অনেক দিন এখান থেকে চলে গেছি। মামার বাড়ীর কথাই জানতাম। তাঁর ত সব বড় বড় ডাক্তার বাঁধা ছিল। তুমি অজিতকে নিয়ে একবার নীরজ দিদির বাড়ী যাও, আমি ষ্টেসনে তাঁদের ঠিকানাটা জেনে এসেছি। আমার জামার পকেটে আছে। তাঁকে গিয়ে আমাদের সব সংবাদ দিয়ে এসো, বোলো আমার জ্বর, নইলে দিদির কাছে আমিই যেতাম, কি করব এখন, এমন বিপদের সময় তিনি ভিন্ন আমাদের ত গতি নাই। তাঁর ভরসাতেই এসেছি। তাঁর দাসী চাকরও আছে, একখানা ছোট বাড়ী অনায়াসে ঠিক করে দিতে পারবেন, যাও তোমরা এখনি যাও। এসে রান্নার উদ্যোগ করো।"

সুশীলা পুত্র কন্যাদের সামান্য প্রাতরাশ শেষ করাইয়া, সুরেশচন্দ্রের জন্য একটু সাবু করিয়া রাখিয়া দিলেন। অজিত সেই সরাই ঘরের চৌকীদারকে বলিয়া একখানি গাড়ী ডাকাইয়া আনিল, তৎপরে মাতাপুত্রে মিঃ ব্যানার্জ্জির গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মিঃ ব্যানার্জ্জি প্রাতঃকালে আপনার আফিস কক্ষে বসিয়া মক্কেলদিগকে লইয়া মুহুরীর সহিত কার্য্যাদি দেখিতেছেন। এমন সময় একটি ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া তাঁহার গৃহের দ্বারে দাঁড়াইল। তিনি ভাবিলেন, কেহ কার্য্যের জন্য আসিয়াছে, এমন সময় তাঁহার দ্বারবান আসিয়া বলিল, কোন গৃহস্থের পরিবার মেম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি অন্দরে লইয়া যাইতে বলিলেন। সুশীলা অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া অজিতের সহিত সেই নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অজিত গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই সুন্দর সুসজ্জিত গৃহের আসবাব দেখিয়া সঙ্কুচিত ভাবে দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিধেয় বস্ত্র মলিন, পায়ের জুতাও পুরাতন, সে মহামূল্য কার্পেট মণ্ডিত কক্ষে দাঁড়াইতে সাহস হইল না। সুশীলাও বিস্মিত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে ভরসা হইল, ভাবিলেন সুরেশচন্দ্রের নীরজা দিদি যখন এত ধনী, তখন সুরেশচন্দ্রের প্রতি নিশ্চয়ই দয়া করিয়া তাঁহাদের একটা উপায় করিবেন। এমন সময় পার্শ্বের গৃহ হইতে ঘণ্টারব উত্থিত হইল, তৎপরে "কোই হ্যায়?" বলিয়া স্ত্রী কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। একজন সুসজ্জিত বেহারা 'হুজুর' বলিয়া সেই কক্ষাভিমুখে ধাবিত হইল। অল্পক্ষণ পরেই রেশম শাড়ী পরিহিতা সুসজ্জিতা সুরেশের নীরজা দিদি বা মিসেস্ ব্যানার্জ্জি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুশীলাকে ভীত ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

সুশীলা অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া নীরজাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—

"আমরা কাল এখানে এসেছি, হুগলি থেকে এসেছি। ওঁর বড় অসুখ তাই আস্‌তে পার্‌লেন না। সরাই ঘরে আছেন।"

নীরজার হৃদপিণ্ড যেন থামিয়া গেল, তিনি বলিলেন—

"পরিচয় না দিলে কি করে বুঝব? হুগলি থেকে কে এসেছে? আর আমার বাড়ীতেই বা সংবাদ দেওয়া কেন?"

সুশীলা একটু থতমত খাইয়া অজিতের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—

"তোমার বাবার নাম বল।"

অজিত কম্পিত কণ্ঠে বলিল—

"সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।"

নীরজা বলিলেন—"তা আপনারা কি মনে করে এসেছেন? যে দিন সুরেশ মামার বাড়ী থেকে চলে গেছে মামার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সহিতও সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।"

সুশীলার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। হায়, আশা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে কি মোহিনী খেলাই খেলাইতেছিলে, কত সুমধুর বাণীই শুনাইতেছিলে, আর এখন হঠাৎ কোন অকূল সাগরে ফেলিয়া দিতেছ। সুশীলা একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—

"তিনি বড় পীড়িত, ডাক্তাররা তাঁকে সমুদ্রের ধারে থাকতে বলেছেন, আমরা তাই এসেছি। আপনি তাঁর দিদি, তিনি সহস্র অপরাধে অপরাধী হলেও আপনি ক্ষমা না করিলে চল্‌বে কেন? আপনার ভরসায় আমরা এত দূরে এসেছি। আপনার লোক জন দিয়া আমাদের থাকবার গৃহের একটু ব্যবস্থা করে দেন ত বড়ই ভাল হয়। এইটি আমার বড় ছেলে, এদেশ আমাদের একেবারে অজানা, তিনি শয্যাগত। কোথায় ডাক্তার, কোথায় পথ্য যে কিছুই জানি না।"

নীরজা তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—

"সুরেশকে বলে দিবেন, তার কথা আমরা কিছুই জানি না, এবং সে যেন আমাদের এরূপ করে বিরক্ত না করে।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছিলেন, সুশীলা পুনরায় অতি মৃদু কণ্ঠে বলিলেন—

"আর এক কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, তাঁর মামা কি তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন? কিছু কি দান করেছেন?" মুহূর্ত্ত মাত্র নীরজার মুখে ভাবান্তর লক্ষিত হইল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি সংযত হইয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—

"আমি সে সব জানি না। উকিলের বাড়ী গিয়া সে সব জিজ্ঞাসা কর্‌তে বল্‌বেন। আমার এখন আর অন্য কথা শোনবার সময় নাই।"

অজিত অপমানিত মাতার হস্ত ধরিয়া গাড়ীতে উঠিল। সুশীলার রুদ্ধ অশ্রুজল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। জীবনে এরূপ অপমান এই প্রথম। অজিত বালক তবু মায়ের মনঃকষ্টে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

সুশীলা চলিয়া যাইবার পরই নীরজা মিঃ ব্যানার্জ্জির আফিস কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন সে গৃহে অন্য কেহ ছিল না। নীরজা গিয়া দু চারি কথায় সব বলিবার পর, উভয়ের মুখ যেন অন্ধকার মেঘে ছাইয়া ফেলিল। মিঃ ব্যানার্জ্জি অল্প ক্ষণেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বেহারাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে "ভবিষ্যতে যদি ওই ব্যক্তিরা আসে উহাদের জন্য দরওয়াজা বন্ধ।"

৮

সুশীলা ও অজিত গৃহাভিমুখে ফিরিতে ছিলেন, সমুদ্রের ধার দিয়া গাড়ী যাইতেছিল। কিয়ৎদূরে যাইবার পর উভয়ে শান্ত হইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছু দূর যাইতে যাইতে অজিত দেখিল একটি গৃহের সম্মুখে ইংরাজীতে লেখা আছে 'To let।" বাড়ী ভাড়ার কথা লেখা দেখিয়া অজিত গাড়ী থামাইতে বলিয়া মাতাকে বলিল "মা এই যে ভাড়া বাড়ী এসনা আমরা জিজ্ঞাসা করে যাই।" সুশীলা ভাবিলেন সেই সুবিধা, সুরেশচন্দ্র পীড়িত আর সরাই ঘরে কত দিনই বা থাকিবেন?

গাড়ী সেই গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইবার পর, অজিত নামিয়া পড়িয়া গৃহ কর্ত্তার অনুসন্ধান করিয়া জানি" তিনি কোথায় থাকেন কেহ বলিতে পারে না। তবে অপরার্দ্ধে আর একজনরা বাস করেন। তাঁহার বাটীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করায় সেই গৃহ কর্ত্তা বাহিরে আসিয়া অজিতের সব কথা শুনিয়া বলিলেন—

"এ গৃহ আমার নয় আমার প্রভুর। তাঁর মোজা গেঞ্জির কলে আমি কাজ করি। এ বাটী পঞ্চাশ টাকায় ভাড়া দেওয়া হইবে। আপনারা লইলে আমি ব্যবস্থা করিয়া দিব, অদ্যই আমি পরিষ্কার করিয়া রাখিব। কল্য সকালে আপনারা আসিয়া থাকিতে পারেন। বাড়ী বেশ ভাল সমুদ্রের ধারে।"

অজিত সুশীলাকে গিয়া সব বলিল। সুশীলা

অজিতের সহিত গিয়া সেই গৃহ দেখিয়া লইলেন। উপরে দুইটি ও নীচে দুইটি ঘর। তদ্ভিন্ন স্নানের ও রান্নার গৃহ পৃথক আছে ও কয়লা রাখিবারও একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে। ভাড়া পঞ্চাশ টাকা শুনিয়া সুশীলা মনে মনে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু পীড়িতাবস্থায় সুরেশচন্দ্র সরাই ঘরে পড়িয়া থাকিবেন তাহা উচিত নহে। অজিতকে দিয়া সেই গৃহস্বামীকে বলিয়া দিলেন যে উপস্থিত এক মাসের জন্য লওয়া হইল, পরে যা হয় স্থির হইবে। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে আসিবে বলিয়া অজিত মাতার সহিত সরাই ঘর অভিমুখে যাত্রা করিল।

সুশীলা যখন গৃহে ফিরিলেন, দেখিলেন সুরেশচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। সুশীলা সমস্ত কথা বলিবার পর সুরেশচন্দ্র নীরজার ব্যবহারে যাহার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এই সংসারের কি রহস্যময় লীলা, বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। যেখানেই বেশী বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, সেই খানেই অবিশ্বাস আসিয়া পূর্ণ করে। যেখানেই আশা সেই খানেই নিরাশার উপহাস। নীরজা বাল্য কালে সুরেশচন্দ্রের খেলিবার সঙ্গী ছিলেন, উভয়েই পিতৃহীন অবস্থায় একই গৃহে প্রতিপালিত, উভয়ের সুখ দুঃখ একই স্থানে বিজড়িত। উভয়ের মধ্যে কত স্নেহ কত মমতা ছিল। আজ অদৃষ্টের পরিহাসে সুরেশচন্দ্র সংসার চক্রে দলিত হইয়াছেন তাই সে স্নেহ মমতার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। আশ্চর্য্য, পৃথিবীর লীলাই এই। তারপর সুশীলার নিকট বাড়ী ভাড়া হইয়াছে শুনিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন।

তারপর দিন অতি প্রত্যুষে সুশীলা অজিতের সাহায্যে সমস্ত দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইলেন। সুরেশচন্দ্র তখনো জ্বর ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলে সেই ভাড়াটিয়া বাটীতে গমন করিলেন। বাড়ী অতি সুন্দর সমুদ্রের ধারে।

সুশীলা উপরের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম গৃহে সুরেশচন্দ্রের শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া দিলেন, সুশীলা জন্মাবধি গৃহস্থ কন্যার মত সকল শিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহার বিলাসিতা করিবার বাসনা কখনো মনে জাগে নাই। তিনি প্রাণপণে সেবা ও যত্নের দ্বারা স্বামী ও পুত্র কন্যাকে দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহার জীবনে আর অন্য কোনও চিন্তা নাই। বিদেশে এই প্রকার বন্ধু ও আত্মীয় বিহীন অবস্থায় পীড়িত স্বামী লইয়া তাঁহার মনে যে তুমুল আন্দোলন হইতেছিল তাহার সহিত সমুদ্রের কলরোল মিশিয়া এক উদাস ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইতেছিল।

সুশীলা ইন্দু ও অজিতকে লইয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। ললিত ও সুহৃদ পিতার নিকট বসিয়া রহিল। সুশীলা নীচে আসিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন—

"অজিত আজ আমাদের আরত বেশী কিছু নেই, বাজারে কে যাবে?" অজিত বালক, তবু সে বলিল "কেন, আমি যাব।"

সুশীলা বলিলেন—"একি আমাদের সেই পাড়াগাঁ যে তুমি যাবে? এত বড় দেশ এই গাড়ী ঘোড়া তুমি কি করে যাবে? কি করি, যদি এদেশের একজন চাকর বা চাকরাণী পেতাম বড় ভাল হত।"

তাঁহার মুখের কথা শেষ না হইতে হইতে তাঁহাদের খিড়কীর দ্বারে আঘাত হইল। অজিত গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, একজন ভদ্রবেশধারিণী বিধবা রমণী একটি সুন্দরী বালিকার সহিত প্রবেশ করিলেন। অজিতের সহিত সুশীলা যে কক্ষে ছিলেন সেই স্থানে গিয়া সুশীলাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—"আপনারা আজ আসিয়াছেন? আমরা এই পাশের বাড়ীতে থাকি। আমার দাদা থাকেন, আর তাঁর এই একটি মেয়ে বিভা থাকে। আপনার যদি কিছু আবশ্যক হয় বলুন আমি করিয়া দিব।"

সুশীলা সেই রমণীকে দেখিয়া যেন অকূলে কূল পাইলেন। তাঁহার অন্তরে জগদীশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা রস উথলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

"আমরা নূতন এসেছি। এসেই আমার স্বামী পীড়িত হয়েছেন, ডাক্তার কবিরাজ কোথায় তাও জানি না। একটি চাকরাণী না হলে বাজার হাটও হবে না। ছেলেদের খাওয়া দাওয়ার সুবিধা কি করে হবে তাই ভাবছি। একজন গোয়ালা ঠিক না হলেই বা রোগীর দুধ কি করে যোগাড় হবে? আপনি দয়া করে এসেছেন এতে আমি যেন অকূলে কূল পেলাম। এই বিদেশে কি করে কি হবে জানি না।' সুশীলার চক্ষু অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল। আগন্তুক রমণী বলিলেন—

"সেজন্য কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখনকার জন্য দুধ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওবেলা আমাদের গোয়ালাকে বলে দিব, সেই আপনাদের দুবেলা দুধ দিয়ে যাবে। আমাদের চাকরাণীর ছোট বোন রাজিয়া আজ সকাল থেকে এসে বসে আছে, কাল লছমিনিয়া তাকে বলেছিল যে এ বাড়ীতে লোক আসবে। রাজিয়ার অনেক দিন কাজ নাই, সে কাজের প্রত্যাশায় বসে আছে, তাকে ডেকে দিব কি?"

সুশীলা তৎক্ষণাৎ সম্মত হওয়ায়, বিভাকে তাহার পিসিমা বলায় সে ছুটিয়া খিড়কীর দুয়ারের কাছে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিল। বিভার পিসিমার নাম সৌদামিনী, তিনি বলিলেন—

"রাজিয়া বাজার হাট সব করবে ও কিছু কিছু বাংলাও বলে। কয়েক ঘর বাঙ্গালীর বাড়ী কাজও করেছিল। যা বল্‌বেন সব কাজই কর্‌বে। দুধ আমি এখনি পাঠিয়ে দেব। আর আপনার যা দরকার হবে আমায় বল্‌বেন। আমরা ব্রাহ্ম, আপনারা?"

সুশীলা নত মুখেই বলিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

সৌদামিনী "তাহলে আপনাদের আমাদের বাড়ী খাওয়া চলে না। না হলে আজ আপনার ছেলে মেয়ে কটি আমাদের ওখানেই আহার করিত।"

সুশীলা তাঁহার দয়াতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—

"না সেজন্য কিছু বাধা নাই। আমার স্বামী ওসব কিছুই মানেন না। আপনারা ব্রাহ্ম বলে ছেলেদের আহারে কোনও বাধা নাই। তবে আমিই দুটি রাঁধিয়া দিব, এই চাকরাণী বাজার হাট করে দিলেই হবে।"

সৌদামিনী বলিলেন—"যদি বাধা না থাকে, তাহলে ওরা আমাদের ওখানেই এ বেলা আহার করবে। আমরা যখন প্রতিবাসী তখন আর আপনি অত ইতস্ততঃ করবেন না। নিজের বোনের মতই আমায় দেখাবেন। আজ আপনাদের আবশ্যকের সময় আমরা করব, আবার আমাদের আবশ্যকের সময় আপনি করবেন। জগদীশ্বর আমাদের মনুষ্য জন্ম দিয়াছেন কেন? পরস্পর যদি পরস্পরকে সাহায্য না করব, তাহা হইলে কি প্রকারে চল্‌বে? কেবল কি নিজেকে লইয়াই থাকব?"

সুশীলা সেই সুমিষ্ট কথায় এত শান্তি পাইলেন যে আর অসম্মত হইতে পারিলেন না। নীরজা—সুরেশচন্দ্রের ভগিনী, তাঁহার সেই ব্যবহার, আর এই অপরিচিতা রমণীর কি সস্নেহ ব্যবহার! মনুষ্য নামধারী জীব জগতে অনেক আছে, কিন্তু যথার্থ মনুষ্যোচিত দয়া ধর্ম্ম কয় জনের হৃদয়ে আছে? যাহার আছে সেই যথার্থ মনুষ্য নামের উপযুক্ত। পরের দুঃখে যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয়, নিজের দিক বা নিজের সুবিধার দিকে না চাহিয়া যিনি পরের সাহায্যে অগ্রসর হন তিনি যথার্থ মনুষ্যের কার্য্য করেন। নীরজার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অপমানে সুশীলার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, আবার সৌদামিনীর সস্নেহ ব্যবহারে হৃদয় জুড়াইয়া গেল। সৌদামিনী কিয়ৎক্ষণ সুশীলার নিকট থাকিয়া গৃহে ফিরিবার সময় বলিলেন—

"এখন তবে যাই, দুপুর বেলা আবার আস্‌ব, সে সময় আপনার কিছু কাজ যদি করবার থাকে ত করে দিব। বিভা আয় দুধ পাঠিয়ে দি।" তাঁহারা চলিয়া গেলে সুশীলা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া উপরে স্বামীর পথ্যাদি লইয়া গেলেন। পুত্র কন্যাদিগকে পাশের বাড়ীতে আহারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

৯

সুশীলা কোন রকমে সেই স্থানে সব ঠিক করিয়া লইলেন। সুরেশচন্দ্রের জ্বর আর ত্যাগ হইল না। যখন জ্বর একটু কমিয়া যায়, তখন সুরেশচন্দ্র উঠিয়া

বসিয়া ভবিষ্যতের কত কথা কল্পনায় স্থির করেন। মনে করেন একটু সুস্থ হইলেই আবার কোনও স্থানে শিক্ষকতা করিবেন, কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। অদৃষ্টচক্র যে অলক্ষিত হস্তে ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, মনুষ্যের তাহার গতি লক্ষ্য করিবার বা বুঝিবার সাধ্য কোথায়? যে রৌদ্র দীপ্ত আকাশ, এখন সূর্য্যের আলোকে নির্ম্মল হইয়া হাসিতেছে, হয়ত পরক্ষণেই এক খণ্ড কালো মেঘ আসিয়া, সে আলো গ্রাস করিবে, চারিদিক শুধু মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। বাতাসের গতি এখন অনুকূল; কে জানে কখন প্রতিকূল দিকে প্রবাহিত হইয়া, প্রবল ঝটিকায় সব উড়াইয় দিবে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কে বুঝিতে পারে যে কখন কি হইবে? আশায় মানবের জীবন, মানব আশার কুহকে সকল দুঃখ ব্যথা ভুলিতে পারে। আশার মোহিনী বাণীতে ক্ষত স্থান সুস্থ হয়, আশা ভিন্ন মানব বাঁচিতে পারে না। সুশীলা কত আশাতে স্বামীর জীবনের জন্য বোম্বাই আসিয়াছেন, সঙ্গে সামান্য সম্বল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। পথে আসিতে ও এই কয় দিনেই তাঁহার প্রায় দুই শত মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে। আর যাহা আছে হিসাবে করিয়া দেখিলে মাসে প্রায় দেড়শত মুদ্রা লাগিবে মনে হয়। পঞ্চাশ মুদ্রাত বাড়ী ভাড়া। তাহার উপর সকল দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য। ঔষধ ও চিকিৎসকের জন্য মাসে কত লাগিবে স্থির নাই। রাজিয়ার মাহিনা মাসে ৪ টাকা নির্দ্ধারিত হইল। সে শুধু দুই বেলা কাজ করিয়া দিবে ও চলিয়া যাইবে।

অজিত প্রত্যহ সকালে বসিয়া নিজে পড়া করিত, ছোট ভাই দুটিকে পড়া বলিয়া দিত। এক দিন সুরেশচন্দ্র সুশীলাকে বলিলেন—

"সুশীলা, ছেলেদের স্কুলে দিলে কেমন হয়?"

সুশীলা বলিলেন—"স্কুলে দিলে ভাল বই মন্দ আবার কবে হয়, তবে খরচ পত্র বাড়বে। বিভার পিসিমা বলছিলেন যে, এখানকার স্কুলের মাহিনা বড় বেশী।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"আমি এখানকার বিশপ স্কুলে পড়িতাম, সেখানকার দু একজন মাষ্টারের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আছে। আমি প্রথমে বিশপ স্কুলে পড়ে, শেষে বিশপ কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিলাম। আমি তাঁদের মধ্যে এক জনকে কাল চিঠি দিব, অজিত চিঠি নিয়ে যাবে। তুমি কি বল? হয়ত তাঁরা আমার এখানকার অবস্থা শুনে অর্দ্ধেক মাহিনায় বা বিনা বেতনেই উহাদের লইতে পারেন।"

সুশীলা বলিলেন—"সেই কথাই বেশ। ছেলেদের পড়া শোনা যাতে হয় তাত দেখতেই হবে।"

অজিত তাহার পর দিন, পিতৃ দত্ত সেই পত্র খানি লইয়া বিশপ স্কুলে গেল। স্কুলের শিক্ষক সে পত্র খানি লইয়া, অজিতকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া, সুরেশচন্দ্রের সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলেন ও তাঁহার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর সুরেশচন্দ্রের পত্রের উত্তরে লিখিয়া দিলেন যে, আগত কমিটিতে তিনি এ কথা উত্থাপন করিয়া, যাহা হয় যত শীঘ্র সম্ভব জানাইবেন। কিছু দিন পরে সেই শিক্ষকের পত্র পাইয়া, অজিত ও ললিত বিশপ স্কুলে ভর্ত্তি হইল। সেই স্কুলেই মিঃ ব্যানার্জ্জির দুইটি পুত্র পাঠাভ্যাস করিত। অজিত যে দিন সুশীলাকে লইয়া, মিঃ ব্যানার্জ্জির বাটিতে গমন করিয়াছিল, সে দিন সলিল অজিতকে দেখিয়াছিল ও মাতাকে প্রশ্ন করিয়া উহারে কে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইয়াছিল "উহারা ছোট লোক।" কে ছোট লোক, কে বড় লোক এ বিষয়ে সলিলকুমার বিশেষ ভাবে শিক্ষা পাইয়াছিল ও সেই বীজমন্ত্র তাহার অন্তরে বিশেষ রূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। যখন সেই ছোট লোকেরা তাহাদের স্কুলে ভর্ত্তি হইল, সে সেই দিন নিজের মায়ের নিকট গিয়া বলিল—

"মা, আমাদের স্কুলে সেই ছোট লোকেরা ভর্ত্তি হয়েছে।"

নীরজা বিরক্তির সহিত বলিলেন—

"হতে দাও, তোমরা মিশিও না।" বালকের হৃদয়ের ঘৃণা দ্বিগুণ ভাবে জাগিয়া রহিল।

এদিকে সুরেশচন্দ্রের শরীরের আর উন্নতি লক্ষ্য হইল না। প্রত্যহ সেই একই সময়ে জ্বর আসিতে লাগিল, সকালে একটু কম হয়, দ্বিপ্রহর হইতে বাড়িতে থাকে। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া চিকিৎসক আসিয়া ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু কোন রকম উন্নতির চিহ্ন দেখা গেল না।

সুশীলা সেই বিদেশে বড় অসহায় হইয়া পড়িলেন, কাহার কাছেও যেন প্রাণের যাতনার কথা ফুটিয়া বলিতে পারেন না। তিনি অন্তরে জগদীশ্বরের চরণ ধ্যান করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে মন দিয়াছিলেন। ইন্দু সর্ব্বদা মাতার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সে বয়সে বালিকা, বিশেষ কিছুই করিতে পারিত না। দ্বিপ্রহরে সে ও সুহৃদ নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিত।

সুরেশচন্দ্রের যখন জ্বর থাকিত, শয্যায় পড়িয়া থাকিতেন। যখন জ্বর কম হইত বা কখনো কখনো জ্বর ত্যাগ হইত, তখন উঠিয়া বসিয়া সুশীলার সহিত কত আশার কথা কহিতেন। তিনি বলিতেন, একটু সুস্থ হইলেই প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সন্তানদিগের জন্য একটি ছোট বাংলা স্কুল করিবেন, কখনো বলিতেন, কোন স্কুলে ড্রয়িং মাষ্টার হইবেন। তিনি খুব ভাল ড্রয়িং জানিতেন। সুশীলার হৃদয় ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ভাঙ্গিয়া পড়িত, তবু তিনি ম্লান হাসি হাসিয়া সকল কথায় সায় দিতেন।

অজিত ও ললিত প্রত্যহ পাঠাভ্যাস করিয়া আসিয়া পিতার নিকট বসিয়া স্কুলের কত গল্পই করিত। সুরেশচন্দ্র রোগ শয্যায় শয়ন করিয়াও সেই সব গল্পে কত আনন্দ লাভ করিতেন। তাহাদের পাঠের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন ও ভুল সংশোধন করিয়া দিতেন।

এইরূপে আশা ও নিরাশার তীব্র বেদনায় সুশীলার দিন কাটিতে লাগিল. তাঁহার হৃদয়ে ঘন মেঘভার জমিয়া আসিল। কখনো ক্ষীণ বিদ্যুতের আলোর মত হৃদয়ে আশার আলো জ্বলিয়া উঠিত, আবার পরক্ষণেই নিরাশার অন্ধকারে সকলই মগ্ন হইত। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় সুশীলার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। এই প্রকারে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

সৌদামিনী সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন। বিভাও প্রায় ইন্দুর সহিত খেলা করিতে আসিত। সৌদামিনীই সুশীলার সেই আত্মীয় বন্ধুবিহীন স্থানে একমাত্র সহায় ছিলেন।

সৌদামিনী না থাকিলে সুশীলা সেই বন্ধুবিহীন দেশে একাকী কি প্রকারে থাকিতেন ভাবিয়াই পান না। সকল অবস্থায় সেই করুণাময়ের অসীম করুণার প্রতি তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল, তাই এইটুকু সহায় পাইয়াছিলেন। সুশীলা আর নীরজাকে কোনও সংবাদ দেন নাই বা কাহারও নিকট তাঁহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে এ কথা জানান নাই।

ক্রমে সুরেশচন্দ্রের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল। সেই দুরন্ত ক্ষয় রোগের সমস্ত চিহ্নই তাঁহার মুখে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইল। জ্বর আর একবারও ছাড়িত না। সুশীলার আর ভাবিবার কিছু রহিল না। সম্মুখে ভীষণ সমুদ্র, সেই দিকে অগ্রসর হইতেই হইবে। তাঁহার আহার নিদ্রা ক্রমে সব পরিত্যাগ হইল, স্বামীর চিন্তায় শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সংসারের সকল কাজ কর্ম্মই করিতে হইত। ইন্দু প্রায় সর্ব্বদাই পিতার নিকট বসিয়া থাকিত।

একদিন বৈকালে অজিত ও ললিত স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহাদের পিতা ঘুমাইতেছেন। সুশীলা রন্ধন গৃহে রন্ধনে ব্যস্ত। অজিত পিতার নিকট বসিল, অন্য সব ভাইয়েরা ও ইন্দু দূরে বসিয়া রহিল। এমন সময় সহসা সুরেশচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন—

"ঐ যে সুন্দর নৌকা আসিয়াছে, আমি তবে যাই।" তাহার পর তাঁহার মুখ দিয়া ক্ষীণ রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। অজিত তাড়াতাড়ি গিয়া পিতাকে ধরিল, অন্য সকলে মাতাকে ডাকিয়া আনিল। সুশীলাও দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইবার মত হইলেন। তাহাদের সেই চীৎকারে পার্শ্বের বাটী হইতে সৌদামিনী ছুটিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া অজিতকে বলিলেন, "এ কি করিতেছ, এখনি শোয়াইয়া দাও, একটু ঠাণ্ডা জল আন।" ললিত ঠাণ্ডা জল

আনিয়া দিল। অজিত ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল। ডাক্তার বাবু অজিতের সহিত আসিলেন। অজিত আসিয়া পিতার নিকট বসিল। সহসা সুরেশচন্দ্রের জ্ঞান হইল, তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন—"অজিত।"

অজিত পিতার নিকট আসিয়া বলিল—"কি বাবা ?"

সুরেশচন্দ্র পুত্রের মস্তক বক্ষের উপর রাখিয়া বলিলেন—

"মার কথা শুনো, তিনি যাহা বলবেন করো। আমি ত তোমাদের কিছুই করলাম না, মাকে সুখী করতে চেষ্টা করো।" সুরেশচন্দ্রের দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুশীলা স্বামীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। সুরেশচন্দ্রের মুখে মৃদু হাসি জাগিয়া উঠিল। নিভিবার পূর্ব্বে দীপ জ্বলিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—

"তবে যাই সুশীলা"—আর বেশী কথা বলিতে হইল না, পুনরায় মুখ দিয়া রক্তের ধারা প্রবল বেগে ছুটিল। জীবন প্রদীপ দেখিতে দেখিতে নিভিয়া গেল। সুশীলা অচেতন হইয়া শয্যাতলে পড়িয়া রহিলেন।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

কৃপাময় পরমেশ্বর তাঁহার দীন মানব সন্তানগণের নিমিত্ত এমনই সুবিধান করিয়াছেন, যে ইহ সংসারে মনুষ্যের আনন্দ ও উৎসবের দিনে সুহৃদ্‌বন্ধু সমাগম হইলে, সে আনন্দের—সে উৎসবের শতগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য !—দুঃখে ও দুর্দ্দিনে সহৃদয় সহানুভাবক আত্মীয় স্বজন ও সামাজিক বন্ধুবর্গের মিলন হইলে, সে দুঃখের বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে সবিশেষ উপশম হয়, এবং এমন কি, সময়বিশেষে আনন্দপ্লাবনে দুঃখ ডুবিয়া যায়,—শোকের অশ্রুকণাগুলিকে সুখের বাষ্পবারি প্রবাহে ভাসাইয়া লইতে থাকে। আজ আমরা যে বিষম শোকাবহ বিষয় উপলক্ষ্যে এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, এ বিষয় সম্বন্ধেও সম্প্রতি আমার চিত্তের অবস্থা উক্তরূপ। এই শোকসম্মিলনে মিলিত হইয়া, আমার ভ্রাতৃশোকসন্তপ্ত হৃদয় যেন অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে পরিপ্লুত হইতেছে।

আমি আজ সভাসমক্ষে সাশ্রুনয়নে শ্লাঘার সহিত প্রকাশ করিতেছি, স্বদেশবৎসল—স্বজাতিপ্রিয়—বুদ্ধিমান—সাহিত্যসেবী—সুলেখক—সঙ্গীত সুধাকর স্বর্গগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আমার ভ্রাতা। যখনই আমার মনে হইতেছে, আমি এ জন্মের মত সেই ভ্রাতৃরত্ন হারা হইয়াছি, তখনই আমার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিতেছে,—আবার যখনই আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতেছি, দেশের মান্যগণ্য মনীষিগণ আমার সেই স্নেহের রত্নের সম্যক গুণগ্রাহী হইয়া, আজ সকলে সমবেতচিত্তে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ নিমিত্ত এই স্থানে সমাগত,—যখনই ভাবিতেছি, যিনি গাইয়াছিলেন, 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ ইত্যাদি,' তাঁহার বিরহে আজ তাঁহার সেই সাধের সমগ্র বঙ্গদেশ শোকাকুল, তখনই আমার শোকভারের যেন অনেক লাঘব হইতেছে,—কে যেন আসিয়া প্রণের কাণে কাণে কহিয়া দিতেছে,—'তোমার প্রাণের ভাই মরে নাই,—সে অমর হইয়া থাকিবে'। অমনি আমার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। ভাই দ্বিজু, তুমি আমার পশ্চাতে আসিয়াছিলে, ফাঁকি দিয়া অগ্রে চলিয়া গেলে, আমি আর যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব, এ জগতে তোমার সেই চিরহাস্যময়—অমিয় মাখা মুখখানি আর দেখিতে পাইব না,—ইহাই কেবল আমার বড় দুঃখ।

অনেকেই অবগত আছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল 'ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত' গ্রন্থের প্রণেতা—কৃষ্ণনগর রাজ-

এষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব সুদক্ষ দেওয়ান স্বর্গীয় মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। প্রশংসিত দেওয়ান মহাশয় আমার পিতৃব্য। আমি তাঁহাকে লালখুড়া মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম,—দ্বিজেন্দ্রলালকে আমি 'দ্বিজু' বলিয়া ডাকিতাম। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বা ডি, এল রায় বলিলে, অদ্যাপি আমার বোধ হয়, যেন আমার সেই অমৃতময় বস্তুকে ঠিক বুঝাইতেছে না, "দ্বিজু' নামই আমার নিকট বড় মিষ্ট বড় মধুর। কৃষ্ণনগরে আমার ও দ্বিজুর পৈত্রিক বাসভবন দুইটী পরস্পর অতি সন্নিহিত। বাল্যে 'দ্বিজু' আমার সহবাসী—সহভোজী—সহপাঠী—সহচর, যেন যথার্থই সে আমার সহোদর।

পাঠাবস্থায় আমি ও দ্বিজেন্দ্রলাল অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠাভ্যাস করিলে আমাদের পুজনীয় পিতৃদেবদ্বয় তাহাতে বাধা দিতেন, এজন্য আমরা স্বপর একটী বাটীতে পাঠের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। তখন হইতেই আমি দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁহার উপনয়ন হইলে, ব্রহ্মচারী ব্রতে সাতদিন এক নির্জ্জন গৃহে বাস করিয়া অষ্টম দিনে যখন বাহির হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভাই, এ সাতদিন কি করিতে ?' তিনি সহাস্যবদনে কহিলেন, 'আমি কেবল কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত পাঠ করিতাম ; এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থ আমি আর কখনও পাঠ করি নাই, বড়ই মধুর, বড়ই চমৎকার।' কেবল যে এই উত্তর পাইলাম, তাহা নহে, কথাপ্রসঙ্গে বুঝিতে পারিলাম, সাতদিনে দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ দুখানি বৃহৎগ্রন্থ প্রায় কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্তে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের ইহাই প্রথম পরিচয়। এই অনুরাগ বশতঃই তিনি কালে ভারতের ইতিহাসে অসামান্য ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। আমি একদা তাঁহাকে একখানি টড্‌প্রণীত রাজস্থানের সুবৃহৎ ইংরাজি ইতিবৃত্ত দিয়াছিলাম, কিছুদিন পরে দেখি তিনি ঐ গ্রন্থ আদ্যোপান্ত এরূপ কণ্ঠস্থ করিরাছেন যে, উহার যে কোন স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া অনর্গল মুখে মুখে বলিয়া যাইতে পারেন। ইহা ব্যতীত এল্‌ফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি পুরাবৃত্তকার প্রণীত অনেকগুলি ভারতেতিহাস তাঁহার বিশেষরূপে অধিগত হইয়াছিল। এবং বোধ করি ইহারই ফল তাঁহার সাধের 'রাণাপ্রতাপ' ও 'সাজাহান'।

১৬ বৎসর বয়ঃক্রমাবধি তিনি যে সকল সঙ্গীত স্বয়ং রচনা করিয়া গান করিতেন, ঐ সঙ্গীতগুলি একত্রে পুস্তকাকারে 'আর্য্যগাথা' নামে আমিই প্রথমে প্রকাশিত করিয়া গৌরব লাভ করি। ১৮৮২ সালে যখন দ্বিজেন্দ্রের বয়স ১৬ বৎসর, তখন উহা প্রকাশিত হয়, এই সকল গান বড়ই সহজ, সুললিত ও সুরসাল। তাঁহার সঙ্গীতের রচনাচাতুর্য্যের বিষয়ে বঙ্গবাসীর নিকট আমার আজ সবিশেষ পরিচয় প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বর ও গীত নৈপুণ্যের বিষয়ে এইমাত্র বলিতে পারি যে, উহা শ্রবণ করিলে, পণ্ডিত, মূর্খ, পামর, পুণ্যাত্মা, শত্রু মিত্র আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিমোহিত হইতেন। যে যে গুণে দ্বিজেন্দ্রলালকে লোকের হৃদয়রঞ্জক করিয়া রাখিয়াছে, তন্মধ্যে সঙ্গীত রচনাশক্তি ও অসামান্য গীত নৈপুণ্যই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া আমার বিশ্বাস। সঙ্গীত তাঁহার চিরপ্রিয়, সঙ্গীত তাঁহার সাধনের ধন, সঙ্গীত তাঁহার চরিত্রের চিররসায়ন এবং সঙ্গীতই তাঁহার অমরত্ব বিধায়ক। যতদিন বঙ্গদেশ থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি তাঁহার স্বজাতির গৌরবের বস্তু—প্রাণের ধন—কণ্ঠের হার হইয়া থাকিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন, এবং ঐ বৃত্তির দ্বারা নিজের খরচ নিজে চালাইয়া হুগলী কলেজে এফ,এ পড়েন। এফ,এ পরীক্ষায় মাসিক ২৫৲ টাকার বৃত্তি পাইয়া বি,এ, পড়িতে আরম্ভ করেন। বি,এ, পরীক্ষায় সবিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরে এম্,এ, পরীক্ষা দেন। ঐ পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আমার স্মরণ আছে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রো সাহেব একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল

সম্বন্ধে নিজ মুখে স্পষ্ট কহিয়াছিলেন, 'আমি কখনও এরূপ মেধাবী ছাত্র দেখি নাই।'

এম্, এ, পাস করিবার অল্পকাল পরেই ছাপরার 'মুখার্জ্জিস্ সেমিনারি' নামক বিদ্যালয়ের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় যদুনাথ পালিত মহাশয় ঐ স্কুলের শিক্ষকতার নিমিত্ত আমার নিকট একজন উচ্চশ্রেণীর এম,এ উপাধিধারী ব্যক্তির সন্ধান লওয়ায়, আমি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্মতিক্রমে তাঁহারই কথা প্রস্তাব করিয়া পাঠাই। যদু বাবু এই প্রস্তাবে সাতিশয় আহ্লাদিত

পরলোকগত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
(বিলাতে অবস্থানকালে)

হইয়া দ্বিজেন্দ্রলালকে অবিলম্বে পাঠাইতে লিখিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মাসিক ১০০৲ এক শত টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া গেলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সয়রন্‌সেষ্টরে কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন নিমিত্ত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তিনি আত্মীয়বর্গের আপত্তি হেতু ঐ বৃত্তি অস্বীকার করিলেন। আমি এই সংবাদ শুনিয়া দ্বিজেন্দ্রলালকে সত্বর কলিকাতায় আসিবার নিমিত্ত তারযোগে সংবাদ পাঠাইলাম। তিনি সংবাদ পাইবা মাত্র কলিকাতায় আসিয়া উক্ত বৃত্তির প্রার্থী হইলে, তাঁহার প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইল। পরে তিনি বিলাত গিয়া পাঠ সাঙ্গ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এ সময়ের কথা অনেকেই অবগত আছেন। বিলাত বাসকালেও তিনি সবিশেষ যত্ন সহকারে পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা করেন এবং পরে, 'Be not born on Friday, help it if you can etc' প্রভৃতি ইংরাজি

শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল (দণ্ডায়মান), স্বর্গীয় যদুনাথ ঘোষ।
(বিলাত গমনের পূর্ব্বে)

হাস্য রসাত্মক গানের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ হাসির গান রচনা করেন। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়াছিল। তিনি একটী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া অকালে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি এই সময়ে অনেকগুলি শোকের কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার সন্তান দুইটীর সান্ত্বনাসূচক যে গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই :—

"একই ঠাঁই, চলেছি ভাই,
ভিন্ন পথে যদি—"

দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয় স্বর্গীয় ভালবাসায় ও সরলতায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি হাকিম হইয়াও অনেক সময়ে তাঁহার সম্মুখস্থ খোলা ময়দানে বালক বালিকাগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়া করিতেন।

তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমপূর্ণ সুমধুর আলাপে সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইত। কেহ তাঁহার নিকট গান শুনিতে চাহিলে, তিনি অমনি আহ্লাদের সহিত তাহাকে গান গাইয়া শুনাইতেন। অমায়িকতা দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। প্রাণের ভাই দ্বিজু আমার বড়ই প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে জানিতেন, এবং সহজেই মনপ্রাণ ভুলাইতে পারিতেন।

আজ আমার সেই অমায়িক ভালাবাসাপূর্ণ স্নেহাস্পদ ভ্রাতা,—বঙ্গবাসীর সেই পরম প্রীতির পাত্র,—বঙ্গমাতার বড়ই বাৎসল্যের ধন,—বাগ্দেবীর প্রিয়পুত্র,—দিব্যধামগত দ্বিজেন্দ্রলালের বিরহ-ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ দ্বারা তাঁহার অক্ষয় স্মৃতির অভিষেক ও ঔজ্জ্বল্যসাধন করতঃ কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করি। এই প্রকাশ্য সভাস্থলে যে আমি আজ আমার এই অন্তর্ব্যথা প্রকাশ করিবার ও আমার প্রেমাস্পদের কিঞ্চিৎ গুণগান করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলাম, এ আমার বড়ই সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।

যিনি জীবনে মরণে জীবের পরমাশ্রয়, একমাত্র শান্তি-বিধাতা—সেই করুণাময় পরমপিতা পরমেশ্বর সমীপে আমরা আজ যুক্তকরযুগলে প্রার্থনা করি, তিনি সেই গতাসুর আত্মায় স্বীয় সচ্চিদানন্দের বিস্তার করুন,—তাঁহার শোকাকুল পুত্র কন্যা ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের ও তাঁহার চিরপ্রিয় স্বদেশবাসিগণের চিত্তে শান্তি প্রদান করুন। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ *

শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী।

ভক্তের পূজা।

(গল্প)

১

কাঙ্গালীচরণ রায় মহেশপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার। জমিদার বলিলে আজকাল যে শ্রেণীর জীবকে বুঝায় কাঙ্গালীচরণ সে শ্রেণীভুক্ত নন। তিনি ধার্ম্মিক, পরদুঃখকাতর এবং মিতব্যয়ী; এক কথায় বলিতে গেলে কাঙ্গালীচরণ একজন আদর্শ মানব, আদর্শ জমিদার এবং আদর্শ ভক্ত। মহেশপুরের জমিদার বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের ব্যবস্থা। পূজা পার্ব্বণের ব্যয়ের জন্য একটি আলাহিদা তহবিল আছে; উহা হইতে দেবতা গঠন হইতে 'গান বাজনা' পর্য্যন্ত যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কাঙ্গালীচরণের জমিদারীর ভার গ্রহণ করিবার পর হইতে পূজার সময় মহেশপুরের জমিদার বাড়ীতে আর কোনরূপ আমোদ প্রমোদ হয় না। তিনি সেই টাকা কাঙ্গালীদিগকে দান করিয়া আসিতেছেন।

পূজার দুই মাস বাকী থাকিতে কাঙ্গালীচরণের বাড়ীতে পূজার আয়োজন চলিতে থাকে। ভাল চাল, গুড়, নারিকেল ভারে ভারে আসিয়া ভাণ্ডারে জমা হইতে থাকে। এই দুই মাস চাকর গাড়োয়ান, পেয়াদা, গোমস্তা কেহই বিশ্রামের অবসর পায় না। যে বৎসরের কথা বলিতেছি—সে বৎসরও জমিদার বাড়ীতে পূজার মহা ধূম। জিনিষ পত্রে ভাণ্ডার পূর্ণ।

সন্ধ্যার পর সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া কাঙ্গালীচরণ বাড়ীর ভিতর গেলেন। হাত মুখ

* সাহিত্য সভায় পঠিত।

ধুইয়া চাকরকে তামাকু চড়াইতে বলিয়া তিনি এক খানি আরাম কেদারায় বসিয়া ভাবিতেছেন, পূজার সমস্ত আয়োজন হইল, এখন প্রতিমাখানা গড়াইতে পারিলে নিশ্চিন্ত। এমন সময় জমিদার বাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী হরিচরণ সরকার আসিয়া বলিল, "বাবু, বেলা ৫ টার সময় বান আসিয়া "ধূলিসহর" পরগণা ভাসাইয়া দিয়া গিয়াছে। গ্রাম গুলির উপর এখনো জল থৈ থৈ করিতেছে সমস্ত ঘর দরজা, গরু মহিষ ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামবাসী গাছে চড়িয়া কোন গতিকে প্রাণ রক্ষা করিতেছে।"

কাঙ্গালীচরণ এই দুঃসংবাদ জানিবা মাত্র কেদারা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন, "কি বলিলে, নায়েব মহাশয়, আমার অন্ন ভাণ্ডার—ধূলি সহর বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে? হায়, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে! নায়েব মহাশয়, আমাদের লক্ষ্মীর ঝাঁপ ভাসিয়া গেল,—আর রায়বংশের মঙ্গল নাই! আমরা মানুষ হইয়াছি—ঐ ধূলিসহরের অন্নে; স্বর্গীয় পিতার উন্নতির মূল ঐ বন্যা প্লাবিত ক্ষুদ্র গ্রাম কয়েকখান। ধূলিসহর আমাদের অযোধ্যা; আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উহার নিরীহ অধিবাসীগুলি লইয়া রাম রাজত্ব ভোগ করিয়া গিয়াছেন। হায়, আজ আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী মুখ ফিরাইলেন!!" এই বলিয়া কাঙ্গালীচরণ বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। হরিচরণ তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেন, "বাবু, এখন আর কাঁদিয়া কি ফল হইবে? উপস্থিত বিপদ হইতে প্রজাগণ যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা করুন।"

কাঙ্গালী। নায়েব মশায়, গোলায় বৎসর খোরাকী যে চাউল মজুত আছে তাহা বিতরণ কর। আর এই লও সিন্ধুকের চাবি—কাপড় এবং অন্যান্য খরচের জন্য যাহা লাগে ব্যয় করিও। কৃপণতা করিও না। আমি আর টাকা লইয়া নিজে আসিতেছি। আর যদি আবশ্যক হয়—" এই বলিয়া কাঙ্গালীচরণ চিন্তামগ্ন হইলেন। হরিচরণ মনিবকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বলিল, "কি বলিতেছিলেন, বলুন। এখনি রওনা না হইলে তাহাদের আর রক্ষা করা যাইবে না।"

কাঙ্গালী। বলিতেছিলাম যে, যদি দরকার হ... পূজার ভাণ্ডার খুলিয়া দেও।

হরিচরণ। পূজা তো নিকট। সে সময় কি... হইবে?

কাঙ্গালীচরণ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন—"... ব্যবস্থা পরে হ'বে। এখন আমি যাহা বলি তা... কর।" এই বলিয়া তিনি ত্বরিতপদে বাড়ীর ভিত... গেলেন। হরিচরণ আর কিছু বলিতে সাহস না... করিয়া আদেশ পালনে প্রস্থান করিল।

২

"মা, এবার আর পূজা হ'ল না।"

"পাগল, তাই কি হয়? বাপ পিতামহের ক্রিয়া... কলাপ কি বন্ধ করা যায়? যে উপায়ে হোক্ পূ... করতেই হ'বে—নইলে যে অকল্যাণ হ'বে!"

একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া মাতাপুত্রে এইরূপ ক... বার্ত্তা হইতেছে। কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, "অকল্যা... হ'লে কি করবো মা! যদি তা না হ'বে—তাহ... সে পাষাণী আস্‌তে না আস্‌তেই এমন সর্ব্বনাশ হ... কেন? মা, কাঙ্গালীচরণের মন্দির হ'তে তাঁর আ... উঠ্‌লো দেখ্‌চি।"

মাতা। কাঙ্গাল, ক্ষেপেচিস্ নাকি? এম... কথা মুখে আনিস্ নি। সে যে আমার দয়াময়ী মা—... কাঙ্গালের মা!

কাঙ্গালী। মা, আজ আমি ক্ষেপেছি স... এই দেখ তোমার কাঙ্গালীচরণ আজ যথার্থই কাঙ্গা... সেজেছে! আর ঐ চেয়ে দেখ—গোলাবাড়ীতে এক... কণাও চাল নেই। সিন্ধুকগুলি খুলে দেখ—এ... পাই পয়সাও নেই। আর—

এইটুকু বলিয়া কাঙ্গালীচরণ সভয়ে মায়ের ... পানে চাহিয়া রহিল!

মাতা। আর কি?

কাঙ্গালী। আর দেখ গিয়ে পূজার ভা... শূন্য! মা—মা—আমাদের কিছুই নেই; আ... পথের ফকির হয়েছি! তোমার কাঙ্গালীচরণ ... অন্নের কাঙ্গাল হয়েছে! তবুও মা প্রজাদের হাহা... মেটেনি!!

মাতা। করেছিস্ কি, বাছা! সে অভাগীর জন্য কিছুই রাখিস্ নি! সে কি না খেয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে?

এই বলিয়া মাতা ললাটে করাঘাত করিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িলেন।

কাঙ্গালী। মা, তুমি অমন উতলা হয়ো না। তা হ'লে যে আমি বলহারা হ'য়ে পড়বো। তুমিই তো আমাকে না খেয়ে পরকে খাওয়াইতে শিখিয়েছ। তুমিই তো বলেছো, মায়ের পূজায় মেষ, মহিষ, ঢাকঢোলের প্রয়োজন হয় না! তিনি গরীবেরও মা—ধনীরও মা। ভক্তিভরে ডাক্‌লে তিনি দেখা দেন। মা, তুমি আমার শিরে হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করো—আমি প্রজার হাহাকার দূর ক'রে ভক্তি-চন্দনে মহামায়ার পূজা কর্‌বো!

মাতা। বেশ বাছা! বিপদে মাকে ভুলো না; তিনি তোমার সম্পদ, তিনিই শক্তি,—তিনি ভক্তের মা। প্রাণভ'রে তাঁকে ডাকো—তোমার সকল অভাব দূর হ'য়ে যাবে। এস কাঙ্গাল, আমার গহনাগুলি দিতেছি, তাই বিক্রয় ক'রে প্রজাদের কষ্ট দূর করো!

কাঙ্গালী। ধন্য মা তুমি! তোমার মত 'মা' যার ঘরে অধিষ্ঠিতা, তার আর "দুর্গোৎসবে" প্রয়োজন কি মা?

এই বলিয়া কাঙ্গালীচরণ মায়ের চরণধূলি শিরে ধরিয়া গহনা লইয়া প্রস্থান করিলেন। মাতা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "মা জগত্তারিণী—জগদ্ধাত্রী, মা, বাছাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো মা!"

৩

জমিদার কাঙ্গালীচরণের প্রাণপণ চেষ্টায় ধূলিসহর রক্ষা পাইয়াছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রশমিত হইয়াছে! প্রজাগণ এক একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নিম্নে মস্তক রাখিয়া ভক্তিভরে ডাকিতেছে,—"দয়াময়ি, ভক্ত কাঙ্গালের গৃহে আয়, মা! মঙ্গলময়ি, দীন দুঃখীর পিতা মাতা কাঙ্গালীচরণের মঙ্গল কর্, মা।" প্রজাগণ ডাকের মত ডাকিয়াছিল—তাই শারদ প্রভাতে জমিদার-ভবন মুখরিত করিয়া সানাইয়ে সুর উঠিল,—

"ডাকার মতো ডাক্ দেখিরে,
কেমন মা তোর রইতে পারে।"

আজ কাঙ্গালীচরণের বাড়ীতে মায়ের পূজা। ধূমধাম নাই,—ঢাকঢোলের আড়ম্বর নাই,—পুরোহিত নাপিতগণের ছুটাছুটি নাই,—নৈবেদ্যের পাহাড় সাজানো নাই। ভক্তের গৃহে আজ ভক্তের মায়ের পূজা! কাঙ্গালীচরণের মাতৃ-পূজা দেখিতে প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। পুরোহিত স্বয়ং কাঙ্গালীচরণ,—উপকরণ প্রাণভরা 'ভক্তি',—মন্ত্র "মা বোল্"!

কাঙ্গালীচরণ প্রত্যূষে স্নান করিয়া আসিয়া পূজা মণ্ডপে বেদীর উপর ঘটস্থাপন করিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—

"আয় মা বিপদবারিণি, কলুষনাশিনি—মঙ্গলময়ী আয় মা! আয় মা দীন জননি, পতিতপাবনি—ভক্তের পূজা নিতে আয় মা! আজ তোর কাঙ্গাল সন্তান অশ্রুজলে তোর আরতি কর্‌বে, মা! ওই দেখ্ তোর অযুত সন্তান আজ অন্নহীন—বস্ত্রহীন—বাসহীন! তাদের দুঃখ দৈন্য—যাতনা-বেদনা দূর করতে সর্ব্বদুঃখহরা—দয়াময়ী আয় মা! সন্তান গলদশ্রু হইয়া তোর আগমন প্রতীক্ষা করছে, আয় মা!"

কাঙ্গালীচরণ পূজা সাঙ্গ করিয়া আরতির উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার মাতা গললগ্ন কৃতবাস হইয়া অগ্রে আসিতেছেন—আর তাঁহার পশ্চাতে পট্টাম্বরধারিণী পুত্রবধূ এক থালা গহনা লইয়া শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণীর অনুসরণ করিতেছেন। কাঙ্গালীচরণের স্ত্রী গহনার থালা ঘটের সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিলে কাঙ্গালীচরণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বাহু তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"জয় মা!"

মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া শতাধিক কণ্ঠে ধ্বনি হইল—"জয় মা!"

কাঙ্গালীচরণ আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে ভক্তি গদগদকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "মা, এই লও

কাঙ্গালের সম্বল! দয়াময়ি, তোর চরণে যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ কল্লুম্—আমার প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা কর্ মা!

সর্ব্বমঙ্গলা মাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তুতে।"

মাতা-পুত্র-স্ত্রী ভক্তিভরে ঘটের সম্মুখে প্রণাম করিয়া চরণামৃত গ্রহণান্তর বাড়ীর ভিতর গমন করিলেন।

ভক্ত কাঙ্গালীচরণ এইরূপে মায়ের পূজা সাঙ্গ করিয়া দিন শেষে চারিটি হবিষ্যান্ন মুখে দিলেন! কে জানে ভক্তের ডাক সেই পাষিনীর কর্ণে পৌছিল কি না! কাঙ্গালীচরণ ডাকার মত ডাকিয়াছিলেন, তাই মায়ের আসন নড়িয়াছিল! পর বৎসর কাঙ্গালী-চরণের জমিদারীতে সোণা ফলিল! প্রজাগণ দু'বাহু তুলিয়া মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

ভ্রাতা ভগ্নিগণ, এ দুর্দ্দিনে তোমরা কি কেউ দীন দুঃখীকে যথা সর্ব্বস্ব বিলাইয়া ভক্তি-অর্ঘ্যে মায়ের পূজা করিতে পারিবে না?

শ্রীননীগোপাল ঘোষ।

আধুনিক জাপান।

ধর্ম্ম।

জগতের অন্য কোনা দেশেই জাপানের চেয়ে অধিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা বর্ত্তমান নাই তিনটি ধর্ম্ম ক্ষুদ্র জাপানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে—শিণ্টো, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নূতন বিবরণ এইরূপ ঃ—

শিণ্টো মন্দির	১৬২,৪৪২
শিণ্টো পুরোহিত	১৪,৮৩৬
বৌদ্ধ মন্দির	৭১,৯২৭
বৌদ্ধ পুরোহিত	৫১,২৬৮
(খ্রীষ্টান গির্জ্জা)	
রোমান ক্যাথলিক	১৭৬
গ্রীক	১৭৪
প্রটেষ্টাণ্ট	১,১৩২
(খৃষ্টান পুরোহিত)	
রোমান ক্যাথলিক	৩৫৩
গ্রীক	৪০
প্রটেষ্টাণ্ট	১,৪৯৪

শিণ্টো ধর্ম্মই জাপানীদের নিজের দেশের ধর্ম্ম। রাজভক্তি এবং পূর্ব্ব পুরুষ, বীর ও প্রকৃতির পূজাই এই ধর্ম্মের মূল কথা. সম্রাট এই ধর্ম্মা-বলম্বীদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল কথা কি তাহা আর বাঙ্গালীকে বলিয়া দিবার দরকার রাখে না। তবে জাপানে একই ব্যক্তি একই সময়ে বৌদ্ধ ও শিণ্টো এই দুই ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে। জগতে একমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মই তরবারি হস্তে তাহার সত্য প্রচার করে নাই। ইহা এক্ষণে অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা এই ধর্ম্ম জাপানে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে। যাহারা বৌদ্ধ ও নয় শিণ্টো ও নয় তাহারাই খৃষ্ট ধর্ম্মা-বলম্বী।

যাঁহারা জাপানে ভ্রমণ করিতে যান তাঁহাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য থাকে শিণ্টো ও বৌদ্ধ মন্দির-গুলির বিপুল গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করা।

নিবিড় বনস্থলীর ভিতর শিণ্টোদের সেই নীরব মন্দিরগুলির জাল দেওয়া জানালার মধ্য দিয়া ভিতরে যেখানে মহাত্মাদের আত্মা বসতি করে তাহার প্রতি ভক্তদের ভক্তি মিশ্রিত সভয় দৃষ্টি যে একবার দেখিয়াছে সে আর কখনো তাহা ভুলিতে পারে না। আবার, বৌদ্ধ মন্দিরগুলির কোমল সৌন্দর্য্য—বৃহৎ ঘণ্টাগুলির গম্ভীর ধ্বনি, সবুজ ঘাসে ঘেরা বাগান

আর তাহার নির্ভয় পাখী ও মাছগুলি—যে একবার উপলব্ধি করিয়াছে, জীবনের অনেক কর্ম্মক্লান্ত মুহূর্ত্তেও উহা তাহার মানস চক্ষে উদিত হইয়া তাহাকে এক অপূর্ব্ব শান্তিতে মণ্ডিত করিয়া তোলে।

খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার দিন দিনই জাপানে বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু যেমন খৃষ্ট ধর্ম্ম বাড়িতেছে, উহার বিরুদ্ধ ভাবগুলিও তেমনি শক্তিমান হইয়া উঠিতেছে। জাতীয়তা, শিণ্টো ও বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি, কু নৈতিক সাহিত্য ও প্রকৃত জড়বাদ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্ট একটা আন্দোলন তুলিয়াছেন যে, নীতি সম্বন্ধে শিণ্টো, বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্ম একই ভিত্তির উপরে দাঁড়াইতে পারে কি না। কিছুদিন পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছায় এই তিন ধর্ম্মের প্রধানদিগকে লইয়া একটি বৃহৎ সম্মিলন হইয়াছিল। এই ভাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে অনেক শিক্ষিত জাপানী ধর্ম্মের বাঁধন গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু এখন দেখিতে পাইতেছেন যে ধর্ম্মের সহিত সংস্পৃষ্ট না থাকিলে সুনীতি অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তাই বর্ত্তমান সময়ের এই আন্দোলন।

চরিত্র।

প্রেসিডেণ্ট শেরার জাপানীদের চরিত্র সম্বন্ধে, এইরূপ বলেন ঃ—

জাপানীদের প্রধান পাঁচটি গুণ এই—সাহসিকতা, রাজভক্তি, কার্য্যতৎপরতা, সতর্কতা ও আত্মশাসন। প্রথম দুটি হৃদয় ও পরের দুটি মন হইতে এবং শেষেরটি ইচ্ছা শক্তির পরিচালনা হইতে উৎপন্ন।

পোর্ট আর্থারের "নর্থ ফোর্ট" ও "২০৩ মিটার হিল" দেখিয়া কেহ সেই স্মরণীয় ও বরণীয় দিনের কথা মনে না করিয়া পারে না। যে সকল বীরগণ "২০৩ মিটার হিল" আক্রমণ করিয়াছিল ও মারা গেলে টানিয়া বাহির করিবার জন্য কোমরে দড়ি বাঁধিয়া যে সকল বীর "নর্থ ফোর্টের" সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল তাঁহাদের মত সাহসী বীর জগতের ইতিহাসে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানী সাহসিকতা আত্মহত্যারই অনুরূপ; কিন্তু আত্মহত্যা সংঘটিত হয় হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হইতে আর জাপানীদের এই জীবন দানের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে মহৎ কার্য্যে আত্ম বলিদানের ইচ্ছা হইতে।

রাজভক্তি বা বাধ্যতা জাপানী চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। সম্রাটের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতি প্রজাগণের যে সম্বন্ধ, তাহাতে এই বিশেষত্বটি পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন কি স্বামীর সহিত স্ত্রীর যে সম্পর্ক পিতার সহিত সন্তানের যে সম্পর্ক এইরূপ সকল সম্পর্কেই তাহাদের চরিত্রের এই বিশেষত্বটি যথেষ্ট পরিমাণে বিকাশ পাইয়াছে।

কার্য্যতৎপরতা ও সম্পূর্ণতা গুণে জাপানীরা অন্যান্য জাতির চেয়ে সহজে একটা কিছু শিখিতে পারে। অতি অল্প সময়ের ভিতর তাহারা পোত নির্ম্মাণ কার্য্যে অসম্ভব উন্নতি লাভ করিয়াছে। "ওরিয়েণ্টাল ষ্টীম সীপ কোম্পানীর" 'টেনিয়ো মারু' ও 'শিনিয়ো মারু' নামক দুইটি সুবৃহৎ জাহাজগুলি আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত জাপানীদের নিজ হাতে প্রস্তুত। কিন্তু জাপানীদের কার্য্যতৎপরতা বোধ হয় রুষ জাপান যুদ্ধের সময়ই সবচেয়ে স্পষ্ট রূপে বিকাশ পাইয়াছিল।

আত্ম শাসন বা আত্ম দমনে তাহারা সকলকে আশ্চর্য্য করিয়া দেয়। সুখ বা দুঃখ অন্যের নিকট প্রকাশ অন্যকে তাহাদের সুখের বা দুঃখের ভাগী করিতে চায় না। আপন হৃদয়ের ভিতর দুঃখ চাপিয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহাদের যেমন অসীম সেইরূপ সুখের উচ্ছ্বাসও নিজের ভিতর গোপন রাখিবার ক্ষমতা কিছু কম নয়। তাহারা আপনার ভাবে আপনি ভরপুর থাকে; কিন্তু কর্ত্তব্য তাহাদের সর্ব্বাগ্রে। কর্ত্তব্যের সম্মুখে আপনার সুখ দুঃখ ভাবিবার অবসর তাহাদের নাই। গ্রীক দেশস্থ স্পার্টান রমণীগণ দেশের জন্য বা মহৎকার্য্যের জন্য আত্ম বলিদান দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও

বোধ হয় মানসিক বলে জাপানী রমণীগণের চেয়ে অধিক বলীয়ান ছিলেন না। বিগত রুষ জাপান যুদ্ধের সময় জাপানী রমণীরা স্বামীদিগকে যুদ্ধে পাঠাইবার পূর্ব্বে নিজেরা আত্মহত্যা করিতেন, যেন যুদ্ধের সময় তাঁহারা বাড়ীর কথা মনে করিয়া মৃত্যু মুখে অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ না করেন। এইরূপ ঘটনা জগতের ইতিহাসে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

জাপানী চরিত্রের পূর্ব্বোল্লিখিত বিশেষত্বগুলির সহিত এই গুণগুলিও যোগ করা যাইতে পারে—শিষ্টাচার, পরিচ্ছন্নতা, প্রসন্নতা, সন্তুষ্টতা ও রুচিজ্ঞান।

শিষ্টাচারে জাপানীরা সকল জাতিকে অতিক্রম করিয়াছে--এমনকি ফরাসীদিগকেও। উচ্চনীচ সকলের নিকট হইতেই এমন খাঁটি শিষ্টাচার আর কোথাও পাওয়া যায় না। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধেও কোনো জাতি তাহাদের সমকক্ষ নয়। প্রত্যেক জাপানী প্রায় প্রতি দিনই 'গরম জলে স্নান' (hot bath) করিয়া থাকে।

প্রত্যেক জাপানীর মুখের দিকে চাহিলেই তাহার হৃদয়ের প্রসন্নতা ও সন্তুষ্টতা উপলব্ধি করা যায়। সর্ব্বদাই তাহাদের মুখে মৃদু হাসির রেখা অঙ্কিত দেখা যায়। সন্তুষ্ট থাকিবার জন্য যেন তাহারা দস্তুরমত শিক্ষা পাইয়াছে।

রুচি জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহার কিছু কম নয়। চিত্রকলা, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতিতে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি তাহাদের হৃদয় যেমন আকৃষ্ট হয় এরূপ বোধ হয় আর কাহারো নহে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত শুধু তাহাদের গুণেরই আলোচনা করা গেল কিন্তু তাহাদের কি কোনো দোষ নাই? দোষও তাহাদের যথেষ্ট আছে। ইউরোপ বা আমেরিকার সহিত তাহাদের একটি বিশেষ বিভিন্নতা এই যে, তাহারা ভণ্ড নয়। ইউরোপ ও আমেরিকা পাপে লিপ্ত অথচ মুখের ভণ্ডামি তাহাদের যায় না কিন্তু জাপান মাত্র খোলামেলা পরিত্যক্ত পল্লীভিন্ন প্রায় সমস্ত স্থান হইতে পাপকে বহিষ্কৃত করিয়াছে।

জাপানের একজন সুবিখ্যাত মিসনারী ডাক্তার জুলিয়াস্ সোপার একবার বলিয়াছিলেন;—"যদি আগামী পঞ্চাশ বৎসরের ভিতর জাপানীরা যেরূপ রুচিজ্ঞান সম্পন্ন সেইরূপ নীতিপরায়ণ হয় যেরূপ শিষ্টাচারী সেইরূপ সৎ হয়, যেরূপ স্বদেশানুরক্ত সেইরূপ লোকহিতৈষী হয়, যেরূপ যোদ্ধা সেইরূপ ধার্ম্মিক হয়, তাহা হইলে জগতের কোনো জাতিই তাহাদিগকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না।

কিন্তু জাপানী চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব এই যে মন্দকে পরিত্যাগ করিয়া অতি সহজেই তাহারা ভালকে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, তাহাদের এই গ্রহণ প্রবৃত্তি অন্ধ অনুকরণ প্রবৃত্তি নয়। তাহারা ভালর সহিত কখনো মন্দ গ্রহণ করে না—শুধু ভালই গ্রহণ করে। এই জন্যই জাপানীদের সভ্যতা ও উন্নতি এত দ্রুত ও আশ্চর্য্যজনক। বিভিন্ন জাতির সহিত সংমিশ্রণে জাপানীরা তাহাদের চরিত্রের এই বিশেষত্বটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। আজকালকার জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ কাউণ্ট অকুমা ইতিমধ্যেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেছেন। তিনি বলেন:—

ইহা বাস্তবিকই চিন্তার বিষয় যে নূতন নূতন প্রভাবের ফলে আমরা জাতি হিসাবে নিজেদের কিছু হারাইয়াছি কি না। উন্নতি আমাদের হইয়াছে মানসিক—নৈতিক নহে।

ব্যবসা বাণিজ্য।

জাপানের ব্যবসা নীতি মোটের উপর পাশ্চাত্য দেশ হইতে নীচ। যে সকল বিদেশীরা জাপানে ব্যবসা করে তাহারা সকলেই এ বিষয়ে একমত। অভিযোগের প্রধান কারণ এই যে প্রত্যেক জিনিষের তাহাদের দুইটি দর। চুক্তির সর্ত্ত তাহারা সাধারণতঃ বড় গ্রাহ্য করে না। সুবিধা মত চুক্তি ভঙ্গ করিতে তাহাদের একটুকুও দ্বিধা নাই। এরূপ ঘটিবার অবশ্য কারণও আছে। পূর্ব্বে জাপানে কেবল নীচ জাতিরাই ব্যবসা করিত এবং তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে কিঞ্চিৎ ঠকানো ব্যবসায়ের ধর্ম্ম। কিন্তু আজকাল ব্যবসা শুধু নীচ শ্রেণীর ভিতরই আবদ্ধ নয়। যদি ও আজকাল ঐ সকল দোষ নীচ শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান আছে কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে কোনো অংশেই নিকৃষ্ট নয়।

বিদেশী ব্যবসায়ীরা জাপানে বড় বেশি সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে জাপানীরা এখন সমস্ত ব্যবসায় নিজেদের হাতে তুলিয়া লইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোব ও য়িয়োকোহামার প্রায় সমস্ত আমদানী ও রপ্তানী বিদেশীদের হাতে ছিল। ১৯০৬ সনে জাপানীদের হাতে ছিল শতকরা ৪৬ ভাগ; ১৯০৭ ১৯০৯ সনে শতকরা ৪৭; ১৯০৮ সনে শতকরা ৪৯; সনে শতকরা ৫১ এবং ১৯১০ সনে শতকরা ৫৪ ভাগ।

শুধু যে জাপানী ব্যবসায়ীরাই বিদেশীর হাত হইতে ব্যবসা কাড়িয়া লইতেছে তাহা নহে; জাপানী কারিগররাও তাহাই করিতেছে। এ বিষয়ে তাহাদের সুবিধাও অনেক—তাহাদের মজুরি কম, অনুকরণশক্তি প্রবল আর গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে সকল দিক দিয়াই সাহায্য করিয়া থাকেন। কৃষি বা শিক্ষার উন্নতি বিধান করা যেমন গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সেইরূপ ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করাও গবর্ণমেণ্ট একটি প্রধান কাজ বলিয়া মনে করেন।

সমবায় কার্য্য এখনো জাপানে তেমন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের এ বিষয়ে যে অবস্থা ছিল জাপানের অবস্থা আজকাল সেইরূপ। তবে দিন দিনই নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইয়া এ বিষয়ে উন্নতি সাধন করিতেছে। কলকারখানা সম্বন্ধে প্রথম আইন জাপানে মাত্র গত বৎসর বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মজুরদিগকে কোনো প্রকার অত্যাচার করিলে, এই আইন মতে গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হাত দিবার ক্ষমতা আছে এবং ইহা স্ত্রীলোক ও বালকদিগের খাটুনির সময় লাঘব করিয়া দিয়াছে।

রমণীজাতি।

ভারতবষ, চীন বা কোরিয়ার রমণীদের চেয়ে জাপানী রমণীরা অনেক বেশী উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। কিন্তু যুক্তরাজ্য বা কোনো কোনো ইউরোপীয় দেশস্থ নারীরা যে সমস্ত অধিকার বা সুবিধা পাইয়া থাকেন তাহার অনেকগুলিই জাপানী রমণীরা আজও পান নাই। কিন্তু জাপানী রমণীরা মোটেই প্রপীড়িত নহে। বরং তাঁহারা সদয় ব্যবহার পাইয়া থাকেন এবং সামাজিক ও আইন সম্বন্ধীয় স্বত্ব বিষয়ে তাঁহারা পাশ্চাত্য রমণীদের চেয়ে সাধারণতঃ কোনো অংশে খাটো নহেন। কিন্তু মোটের উপর সকল বিষয়েই তাঁহাদের অবস্থা পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্ট।

জাপানী রমণীগণ শান্ত, বাধ্য ও অনুরক্ত। তাঁহারা নির্জ্জনে আবদ্ধ নন—ইচ্ছা মত চলাফেরা করিতে পারেন। তবু ইহা সকলেই অনুভব করেন যে তাঁহাদের জীবন বাড়ীতে পুত্র কন্যার সহিত জড়িত। সামাজিক জীবন প্রধানতঃ পুরুষই যাপন করিয়া থাকেন।

অধুনা ইংলণ্ডে ভোট লইয়া নারীরা যে আন্দোলন তুলিয়াছেন ইহার প্রতিরূপ আন্দোলন জাপানে অসম্ভব। এরূপ আন্দোলনের প্রধান কারণ অবিবাহিতা রমণীদের অবস্থা। কিন্তু জাপানের অবিবাহিতা রমণীদের এমন অবস্থা নয় যাহাতে ঐরূপ একটা আন্দোলন সম্ভবপর হইতে পারে। সাধারণতঃ কুড়ি বৎসরের পূর্ব্বেই জাপানী মেয়েদের বিবাহ হইয়া যায়।

ব্যবসা বাণিজ্য ও স্ত্রীজাতি।

জাপানের কলকারখানার অধিকাংশ মজুরই স্ত্রীলোক। তাহাদের বেশীর ভাগই ১৬ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কা। দশ বৎসরের নীচে বালিকাকেও কাজ করিতে দেখা যায়। কিন্তু কোনো বৃদ্ধা সাধারণতঃ কাজ করে না। বালিকারা প্রথম দুই তিন বৎসর খাওয়া ভিন্ন বিশেষ কোনো মজুরি পায় না।

তৎপর তাহারা দৈনিক ১৫ হইতে ২৫ সেণ্ট পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। এক সেণ্ট আমাদের দুই পয়সার সমান।

নিম্নে জাপানের একটি বৃহৎ মসলিন কারখানার বিবরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতে মজুরদিগের অবস্থা বুঝা যাইবে।

ইহাতে ৩,০০০ বালিকা কাজ করে। কাজের সময় দিনে, প্রাতে ছয়টা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা ও রাত্রে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে প্রাতে ছয়টা পর্য্যন্ত। সবচেয়ে উচ্চ মজুরি দৈনিক ৪০ সেণ্ট—মোটের উপর ২০ ও সর্ব্বনিম্ন ১০ সেণ্ট। দৈনিক আহারের খরচ ছয় সেণ্ট, তন্মধ্যে কোম্পানি দেয় ২ সেণ্ট ও বালিকারা নিজেরা দেয় ৪ সেণ্ট। বালিকারা গম্ভীর ও উৎসাহ-শূন্য। অপরিষ্কার বদ্ধ বায়ুতে কাজ করিতে হয়। কার্য্যান্তে দুই ঘণ্টা পড়িতে দেওয়া হয়। উৎকৃষ্ট স্নানাগার ও খেলিবার জন্য বাগান আছে। কিন্তু অনুমতি ব্যতীত কেহ বাহিরে যাইতে পারে না। মাসের মধ্যে দুই দিন ছুটি। মাতা পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভিন্ন কুঠরী আছে।

এই সকল বালিকাদের প্রায় শতকরা ২০ জনই দুই বা তিন বৎসর কাজের পর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ও অবশেষে কাজের অনুপযুক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক বালিকাদেরই স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। বালিকারা অপরাধ করিলে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হইয়া থাকে; অন্ধকার কুঠরীতে বদ্ধ করিয়া রাখা হয় বা বেতন কাটা হয়। কিন্তু আজকাল এ সব বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে এবং ইন্স্পেক্টারগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছেন, যেন বর্ব্বরোচিত কোনো ঘটনা ঘটিতে না পারে। কিন্তু আজও দোষগুলির আমূল উচ্ছেদ হয় নাই।

অনেক স্থানেই বালিকা মজুররা লেখা পড়া জানে না এবং তাহাদের নৈতিক চরিত্রও ভাল নয়। ইউরোপ ও আমেরিকা যখন কৃষিজীবী হইতে ব্যবসায় জীবীতে পরিণত হইতেছিল তখনো তাহারা ঠিক এই জাপানেরই মত অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের চেয়ে জাপানের উন্নতি হইতেছে দ্রুততর এবং আশা করা যায় অতি শীঘ্রই তাহারা এ সব বিষয়েও অন্যান্য সভ্য জাতির সমকক্ষ হইবে।

অধুনা মজুরদিগের শতকরা ৭৩ জনই স্ত্রীলোক। তাহারা সাধারণতঃ ১২ ঘণ্টা কাজ করে কিন্তু যখন কাজ খুব বেশী করে তখন তাহারা ১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ও কাজ করিয়া থাকে। নিপুণ শ্রমজীবীদের মজুরি ইংলণ্ডের এক তৃতীয়াংশ ও আমেরিকার এক অষ্টমাংশ। জাপানের 'কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগ' পঁচিশটি জেলার শ্রমজীবী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া নিম্নলিখিত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন ঃ—

বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
৯ বৎসরের নীচে	১০৫	৪৭৯
১১ " "	৬৪৩	৩,৮৭৬
১৩ " "	৩,০৯৯	২৪,৭৬২
১৫ " "	৬,০০১	৪৯,৮৯০
১৯ " "	১৩,১১৭	৯৩,৯৭৫
১৯ বৎসর ও তদূর্দ্ধ	৫৮,৯৩৩	১১৬,৫৪২

প্রজা সাধারণের হস্তে রাজনৈতিক অধিকারের অল্পতা জাপানের বর্ত্তমান সভ্যতার একটি প্রধান দোষ। কিন্তু তাহারা দিন দিনই এ বিষয়ে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। অধুনা জাপানের লোক সংখ্যা ৫০,০০০,০০০, তন্মধ্যে জাতীয় নির্ব্বাচনে ভোট দিবার ক্ষমতা রহিয়াছে ১,৫৮২,১৫৬ জনের ও প্রাদেশিক নির্ব্বাচনে ২,৪৩৪,২৫৬ জনের।

বর্ত্তমান সময়ে জাপানীদের বিশ্বাস যে ভোটারের সংখ্যা শীঘ্রই বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এদিকে খুব সতর্ক। এমন কি Universal suffrage Leagueকে সভা আহ্বান করিতে পর্য্যন্ত অনুমতি দেন না। যতদিন না এই ভোটারের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে ততদিন আমেরিকা বা ইংলণ্ডের মত সাধারণতন্ত্র কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যদিও জাপানে প্রকৃত সাধারণতন্ত্র নাই তথাপি তাহারা আশ্চর্য্য রকম ভাবে উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে, বিগত কয়েক বৎসরের ভিতর জাপানের সম্রাট ও শাসন কর্ত্তারা যেরূপ ত্যাগের পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল।

শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী।

নারীর কার্য্য।

ময়মনসিংহ মহিলা-সমিতি।

১৩১৬ সনে ময়মনসিংহ মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান মহিলাগণ জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া উপাসনা, উপদেশ, প্রবন্ধ পাঠ ও বিবিধ বিষয় আলোচনা দ্বারা পরস্পরের আত্মার কল্যাণ সাধন পূর্ব্বক সমবেত কার্য্যক্ষেত্র স্থাপন করিয়া নারী জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন, ইহাই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ চতুর্দ্দশটি মহিলা স্থানীয় ব্রহ্ম মন্দিরে মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত কতকগুলি বিশেষ নিয়মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এই সমিতি সংগঠন করেন।

নিয়মাবলী।

মাসের মধ্যে কোন এক শনিবারে সম্পাদিকা অধিবেশনের দিন ধার্য্য করিয়া মহিলাগণের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিবেন ও তাঁহাদের সমবেত হইবার গাড়ী সমিতি হইতেই প্রেরিত হইবে।

২। ষোড়শ বর্ষের কম বয়স্কা রমণী সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত হইতে পারিবেন না, কিন্তু অল্প বয়স্কারাও সমিতিতে যোগদান ও সঙ্গীতাদি করিতে পারিবেন।

৩। সভ্যগণ যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তাঁহাদের সকলেরই ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ও সুনীতিপরায়ণা হওয়া আবশ্যক।

৪। সমিতির স্থানে কেহ পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ও পরপীড়াদায়ক কোনরূপ অযথা আলোচনা করিতে পারিবেন না।

৫। প্রত্যেক সভ্যকে মাসিক অন্যূন চারি আনা হইতে ঊর্দ্ধ সংখ্যা এক টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে হইবে। সমিতি ইচ্ছা করিলে অবস্থা বিশেষে কাহারও চাঁদার হার হ্রাস করিতে কিম্বা চাঁদা হইতে অব্যাহতি দিতে পারেন।

৬। এই চাঁদা হইতে মাসিক অধিবেশনের গাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা কোন জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করা হইবে।

প্রথমতঃ ৺জ্ঞানদা প্রভা রায় সমিতির সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই ইহার প্রধান উদ্যোক্ত্রী ও উৎসাহদায়িনী ছিলেন, দুঃখের বিষয় সমিতির বয়স ছয়মাস পূর্ণ না হইতেই তিনি পরোলোক গমন করেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে সমিতি মর্ম্মাহত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। ৺জ্ঞানদা প্রভা রায়ের অভাবে সম্পাদিকার ভার এক বৎসরের জন্য শ্রীযুক্তা সুরমাসুন্দরী ঘোষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বর্ষে শ্রীযুক্তা মাধুরী দাস এবং বর্ত্তমানে শ্রীযুক্তা সুধীরা মজুমদার মহাশয়া সম্পাদিকা নিযুক্তা হইয়াছেন, প্রতিবর্ষে সম্পাদিকা পরিবর্ত্তনের কারণ, ইহাতে সকলেই কার্য্য পরিচালন বিষয়ে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিবেন।

এইরূপে আমাদের সমিতি মাতৃহীন শিশুর ন্যায় এক অঙ্ক হইতে অন্য অঙ্কাশ্রিত হইয়া ভগবানের কৃপায় চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

ব্রহ্ম মন্দিরে সমিতির অধিবেশন হওয়াতে হিন্দু মহিলারা কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন এবং ক্রমে তাঁহাদের উপস্থিতির সংখ্যাও হ্রাস হইতে থাকে; তৎপর এক এক মাসে এক এক সভ্যের

বাড়ীতে সমিতির অধিবেশন হওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু তাহাতেও নানা অসুবিধা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সভ্যের গৃহে স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু সমিতির স্থান সঙ্কুলন হয় না বলিয়া সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে বিদ্যাময়ী শিক্ষালয়ের প্রশস্ত গৃহে অধিবেশনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এ স্থলে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ঐ স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী কুমারী ভক্তিসুধা ঘোষ ও এই সমিতির একজন উৎসাহী সভ্য, সমিতির উন্নতির জন্য তিনি আন্তরিক যত্ন ও কার্য্য পরিচালন বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন।

চারি বৎসরের সমিতি বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, শিশুর ন্যায় এখনও কেবল হামাগুড়ি দিয়া, দাঁড়াইবার শক্তি অন্বেষণ করিতেছে মাত্র। সমিতির উদ্বৃত্ত টাকা দিয়া হাইলাকান্দি দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে কুড়ি টাকা প্রেরণ, ঢাকা বিধবাশ্রমে মাসিক ১৲ টাকা ও বহুবাজার নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ও অন্যান্য স্থানে দুই চারি টাকা দান ব্যতীত এ পর্য্যন্ত আর কোন কার্য্যই করা হয় নাই। সমিতির আয় বর্দ্ধিত হইলে কিছু করা যাইবে বলিয়া টাকা সেভিংব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে। সমিতিতে শিল্পশিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলে মহিলাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে বিবেচনা করিয়া গতমাসের অধিবেশনে শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এখন বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ও জন ব্যতিরেকে অন্যান্য মহিলারাও যোগদান করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি শিল্প শিক্ষার আকর্ষণে অধিকতর মহিলা সমাগত হইবেন। আমাদের সমিতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু উচ্চ আশা ও মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই ইহা সংগঠন করা হইয়াছে, পৃথিবীতে ক্ষুদ্র হইতেই মহতের সৃষ্টি তাই আমাদের ক্ষুদ্রশক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধিদাতা করুণাময় ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি তিনি আমাদের উদ্দেশ্য সফল করুন।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ।

তর্পণ।

এস মহাত্মন্ এস হে রাজন্, বসাই হৃদয় আসনে,
যে লোকেই রও প্রকাশিত হও, মোদের মানস গগনে।
ওই দেখ দেব জনে জনে জনে, লয়ে প্রেম প্রীতি পূত শ্রদ্ধাধনে,
মিলেছি সকলে ভাবের কাননে, পূজিতে তোমায় যতনে।
সর্ব্বতোমুখীন প্রতিভার ভাতি, পুণ্য সুরভিত ও মহান্ স্মৃতি,
স্মরিবগো আজি প্রেমানন্দে মাতি, মাখিব সুরভি পরাণে।
শত গুণ রাজি, তার এক রতি, গাহিব সকলে পূত চিতে অতি,
লভিব শকতি বিমল ভকতি, অজেয় হব গো জীবনে।
যবে সে কেবলি ব্রহ্ম কৃপাবলে, নিবিড় আঁধার বঙ্গ নভোতলে,
দীপ্ত নক্ষত্রটি ফুটিয়া উঠিলে, মুগ্ধ করিয়া ভুবনে।
সুধাংশু প্রপাতে সুষুপ্ত ভারতে, হাসালে ভাসালে সারাটি জগতে,
নাশি তমোরাশি নব রশ্মিপাতে উজলি বঙ্গ ভবনে ;—
হায়রে তখন অন্ধ দেশবাসী, ঢালিয়া গঞ্জনা আবর্জ্জনা রাশি,
করেছিল ক্ষীণ সে বিমল রশ্মি, চিনেনি কৌস্তুভ রতনে!
আজ প্রেম প্রীতি লয়ে ভারে ভার, এসহ করিগো প্রায়শ্চিত্ত তার,
এসগো রাজন্ এ বিশ্ব ভুবন, বরিবে তোমায় সঘনে।
এসগো, আমরা বঙ্গের সন্তান, পূজিব পুলক মগনে।*

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

মহানদী।

তোমারে দেখিনি তব গৌরবের দিনে মহানদী
দেখিলাম শুধু হায় ও তোমার শীতশীর্ণ বেশ ;
ছিন্ন ধারা, ক্লান্ত গতি,—গতি পথে বিঘ্ন সে অশেষ
অসংখ্য শিলার স্তূপ শৈলাকারে জাগে নিরবধি
ধূসর ধূমল কৃষ্ণ ;—আশঙ্কা সে আশায়ে নিরোধি
জাগে যেন শতস্কন্ধ। মন্দ দশা হেরি পাই ক্লেশ,
বক্ষে জগদ্দল শিলা সামর্থ্যের চিহ্ন নিরুদ্দেশ
নাম শেষ ও মহত্ত্ব। তবু, জানি, বর্ষা নামে যদি—
নামে যদি কূলহারা প্লাবনের পাবনী ফোয়ারা
পাবে তুমি ঋড় গতি মহানদী! মহাবেগবতী!
ভেসে যাবে বিঘ্ন বাধা গঙ্গাস্রোতে ঐরাবত-পারা ;
মুক্ত হবে পন্থা তব তব আত্ম-স্রোতোবেগে, সতী!
মহাবিঘ্ন বাধা সেথা যেথা মহাজীবনের ধারা ;
আজি বিঘ্ন বলবান,—দিনান্তরে লুপ্ত বাধা গতি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

* রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিতে।

Presented to the KPL
By Shiva Prakad Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { কার্ত্তিক, ১৩২০। } ৪র্থ সংখ্যা।

তুর্কী নারী জীবন।

শিক্ষা প্রণালী।

আমাদের দেশের মোস্‌লেম রমণী জীবনের বিষয় হইতে ভিন্ন দেশীয় মোস্‌লেম নারীজীবনের বিষয় ধারণা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এদেশের মোস্‌লেম মহিলাকুল অবরোধবাসিনী বলিয়া শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা হইতে একপ্রকার বঞ্চিতা। কারণ নারীদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে ভারতের কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়েই আশ্চর্য্যরূপে উদাসীন। কিন্তু তুরস্কের নারীজীবন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

তুরস্কে বহুকাল হইতেই বালক এবং বালিকা উভয়কেই নিম্ন-শিক্ষা এক সঙ্গে দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে যেমন পিতা তাঁহার ছেলেটীকে নব বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যান, আর মেয়েটীকে খেলা ধূলায় ফেলিয়া যান, তুরস্কে সেরূপ নহে। তুর্কী পিতা, পুত্র এবং কন্যা উভয়কেই তুল্য আগ্রহে এবং তুল্য আনন্দে উৎকৃষ্ট বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। পুত্রের হাত-খড়ির দিনে বাড়ীতে যেরূপ উৎসব এবং ভোজের আয়োজন হয়, কন্যার হাত-খড়ির দিনেও অবিকল সেইরূপ আনন্দোৎসব হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ ৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। নিম্ন-বিদ্যালয়ে কোরাণ পাঠ, তুর্কী ভাষা শিক্ষা, নিম্ন-গণিত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, তুর্কীর ইতিহাস এবং ভূগোল মোটামুটি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নমাজের প্রধান প্রধান আবশ্যকীয় বিধি ব্যবস্থা এবং মস্‌লা মসায়েলও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

অধুনা জর্ম্মানীর অনুসরণ করিয়া অতি উন্নত প্রণালীতে কিণ্ডার গার্টেন প্রথানুযায়ী বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই নবশিক্ষা প্রণালী, সামি কনষ্টান্টিনোপল এবং দার্দ্দানেলিস সহরে বিশেষ

ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। আমাদের দেশের বালিকাদের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্রই আমি বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়াছি। তুলনায়, নির্ভীকচিত্তে বলিতে পারি যে, তুর্কী শিক্ষা-প্রণালী আমাদের দেশের অপেক্ষা বহু উন্নত। এমন কি তাহার সহিত আমাদের দেশের প্রবর্ত্তিত কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা-নীতির তুলনাই হইতে পারে না। তুরস্কের যাবতীয় নিম্নবিত্থালয় অতীব পরিপাটীরূপে সজ্জিত। প্রত্যেক স্কুল গৃহের দেওয়ালে পৃথিবীর নানা দেশীয় জীবজন্তুর বৃহৎ বৃহৎ মনোহর চিত্র, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি, নানা প্রকারের উৎকৃষ্ট 'মটো' এবং পৃথিবীর নানা দেশের বৃহৎ বৃহৎ রঙ্গীন মানচিত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ফলতঃ প্রত্যেক বিত্থালয় এক একটী চিত্রশালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শিশু-বিত্থালয়ের সমস্ত শিক্ষা-ভারই শিক্ষয়িত্রীর হস্তে। তুর্কী শিক্ষয়িত্রীর দ্বারা অভাব পূর্ণ না হওয়ায় অনেক ফরাসী এবং জর্ম্মাণ শিক্ষয়িত্রীকেও গ্রহণ করা হইয়াছে। অতীব প্রফুল্ল মুখে স্নেহ এবং আদরের সহিত শিশুসুলভ আমোদ প্রমোদের মধ্যে শিশুদিগকে শিক্ষার রসাস্বাদন করিতে দেওয়া হয়। শিক্ষয়িত্রী নিজে হাতে কলমে খাটিয়া শিশুচিত্তকে নানা কৌশলে শিক্ষা উন্মুখ করিয়া তোলেন। শিশুদিগকে পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য সচেষ্ট মনোযোগ প্রদান করা হয়। কেশবিন্যাস, বেশবিন্যাস এবং পোষাক পরিচ্ছদ পরিস্কৃত রাখিবার জন্য সর্ব্বদা শিক্ষয়িত্রীগণ দৃষ্টি রাখেন। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার স্থূল স্থূল নিয়মগুলিও, মৌখিক উপদেশ এবং চিত্রদ্বারা, বালিকাদের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়া থাকে। বালিকাদিগকেও যাবতীয় প্রসিদ্ধ জাতীয় এবং সামরিক সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সামরিক কায়দায় দস্তুরমত ড্রিল শেখানো হয়। ভূগোল এবং তুর্কী ইতি-হাসের মোটামুটি বিষয়গুলি শিক্ষয়িত্রী মুখে মুখেই শিখাইয়া দেন। আমি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বালিকা-দিগকে পরীক্ষার জন্য ভূগোল ও তুর্কী ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর পাইয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। ৮।৯ বৎসরের বালিকা দূরে থাকুক, উচ্চ ইংরাজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের নিকটও সেই সব ভৌগলিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশা করা, আমা-দের দেশে সম্ভবে না। শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এমন একটু কায়দা আছে, যাহার ফলে তুর্কীর প্রাচীন গৌরব ও বীরত্বের খ্যাতিতে প্রত্যেক বালিকাকে গৌরবান্বিত এবং দৃপ্ত করিয়া তোলা হয়। খেলা-ছলে সন্তান প্রতিপালন কৌশল ও কায়দা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নানাপ্রকারের অভিনয় দ্বারা জন্মভূমির কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগের ভাব বালিকা-দিগের হৃদয়ে প্রবল করিয়া তোলা হয়। বর্ত্ত-মান বল্কান যুদ্ধে তুর্কীর মস্তকের উপর দিয়া বজ্র-বহ্নি-বিদ্যুৎ-সঙ্কুল যে প্রলয় ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে; তাহাও অতি সুন্দরভাবে বালিকাদের সুকোমল চিত্তে পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইতেছে। দেশের সন্তানদিগকে দেশ রক্ষার্থ উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য কোমল ও মধুর কণ্ঠে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। কোমলমতি বালিকা কোমল হস্তে যখন জাতীয় পতাকা কম্পিত করিয়া দুঃখে ক্ষোভে ক্রোধে মৃত্তিকায় সজোরে পদাঘাত করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "জন্মভূমি এবং জাতীয় গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণপাত করাই প্রত্যেক ওস্মাননীর (ওস্মানের সন্তান) প্রধান ও প্রিয় কর্ত্তব্য! হে সন্তান! তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? তোমার জন্মভূমি শত্রু কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টিত; তোমার কৃপাণ এখনও কি কোষবদ্ধ রহিবে?"

আবৃত্তিকারিনী বালিকার চোখ মুখের ভঙ্গীতে তাহার পতাকা কম্পনে এবং ভাষার দাবদাহে আমা-সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। যে জাতির বালিকারা এমন শিক্ষা পাইতেছে; তাহাদের কখনও পতন হইতে পারে না।

বালিকারা ৫ বৎসরকাল নিম্ন বিত্থালয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকে। হাতের কাজও এখান হইতে আরম্ভ হয়। সূচী-শিল্প বেশ ভাল করিয়া শেখানো হয়।

নিম্নবিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্তির পরে বালিকাদিগকে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্ব্বে অধি-কাংশ বালিকাই উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত না। কিন্তু সুখের বিষয় সম্প্রতি কিছুদিন হইতে তুর্কী বালিকাগণের অধিকাংশই উচ্চবিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে। উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতেছে।

উচ্চবিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সন্তানপালন, সেবা-কার্য্য, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, তুর্কী সাহিত্য, চরিত্র গঠন বিদ্যা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। জাতীয় মহাপুরুষ ও কর্ম্মবীরদিগের চরিত্র অধ্যয়ন ও সাহিত্যের একটী

গৃহে তুর্কী রমণী।

প্রধান অঙ্গ। "তালিমে আখলাক" বা চরিত্র গঠন বিত্থার বিশেষ অনুশীলন হইয়া থাকে। এ বিত্থা বালক এবং বালিকা উভয়েরই অনুশীলনীয়।

নারী চরিত্র কিরূপ হওয়া আবশ্যক, পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কাহার প্রতি কিরূপ সম্মান বা স্নেহ প্রদর্শন করা উচিত, কিরূপভাবে কথা বলা চাই, পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনের নিয়মাবলী, উচ্চকণ্ঠে কথা বলার দোষ, সন্তান বা ছোট শিশুদিগের সহিত দয়াপূর্ণ স্নেহ ব্যবহার, সেবা, সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকা, হাস্যমুখে কথা বলা প্রভৃতি বিষয় লইয়া "তালিমে আখলাক" রচিত হইয়াছে।

এই "তালিমে আখলাক" হাতে কলমে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়। বালক এবং বালিকাদের চরিত্র সুপ্রণালীতে গঠিত হইতেছে কিনা, তদ্বিষয়ে শিক্ষয়িত্রী বা শিক্ষকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এই "তালিমে-আখলাকে"র জন্যই তুর্কী জাতি ইউরোপের ভদ্রলোক (Gentleman of Europe) বলিয়া খ্যাত। তুর্কী বিত্থালয়ে মার ধর করিবার কোনও ব্যবস্থা আদৌ নাই। শিক্ষয়িত্রী, মাতার ন্যায় যত্নে এবং আগ্রহে আনন্দের সহিত শিক্ষা দিয়া থাকেন। অত্যন্ত প্রফুল্ল প্রকৃতি স্ফুর্ত্তি সম্পন্না এবং মিষ্টভাষিণী দেখিয়া শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করা হয়। উচ্চ বিত্থালয়ে শিক্ষকও আছেন।

সম্প্রতি উচ্চ বিত্থালয়ে বহুসংখ্যক তুর্কী বালিকা অধ্যয়ন করিতেছেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেক

রাজপথে তুর্কী রমণী।

বালিকা জর্ম্মাণ, ইংরাজ এবং ফরাসী শিক্ষয়িত্রী বাড়ীতে রাখিয়া জ্ঞান চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এইরূপ-ভাবে Home study বা গৃহ-আলোচনার ফলে অনেক তুর্কী যুবতী পাশ্চাত্য ভাষা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। অনেক বিবাহিতা রমণী এক্ষণে ফ্রান্স এবং জর্ম্মণীর বিশ্ববিত্থালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। কনষ্টান্টি-নোপলের রাজপথে বিবাহিতা রমণীদিগকে পুস্তকের ব্যাগ হস্তে কলেজে গমনাগমন করিতে অনেকবার

দেখিয়াছি। হায়! ভারতে এ পবিত্র দৃশ্য দেখিবার দিন কবে সমাগত হইবে?

মহিলা-প্রতিভা।

তুর্কী রমণীদিগের মধ্যে দিন দিন লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক মহিলা ফরসী, তুর্কী এবং ইংরাজী ভাষায় লেখনী পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজী লেখিকাদিগের মধ্যে হালিদা হানম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। "আক্‌দাম" "তনীন" "তর্জ্জমান" "জোয়ান-তুর্ক" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে অনেক তুর্কী মহিলা স্বদেশের উন্নতি এবং রাজনৈতিক জটিল বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনী পরিচালনা করিতেছেন। ফাতেমা হানম্, জোবেদা হানম্, এবং নুরী হানম্ প্রভৃতি লেখিকাগণের প্রবন্ধাবলী বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়।

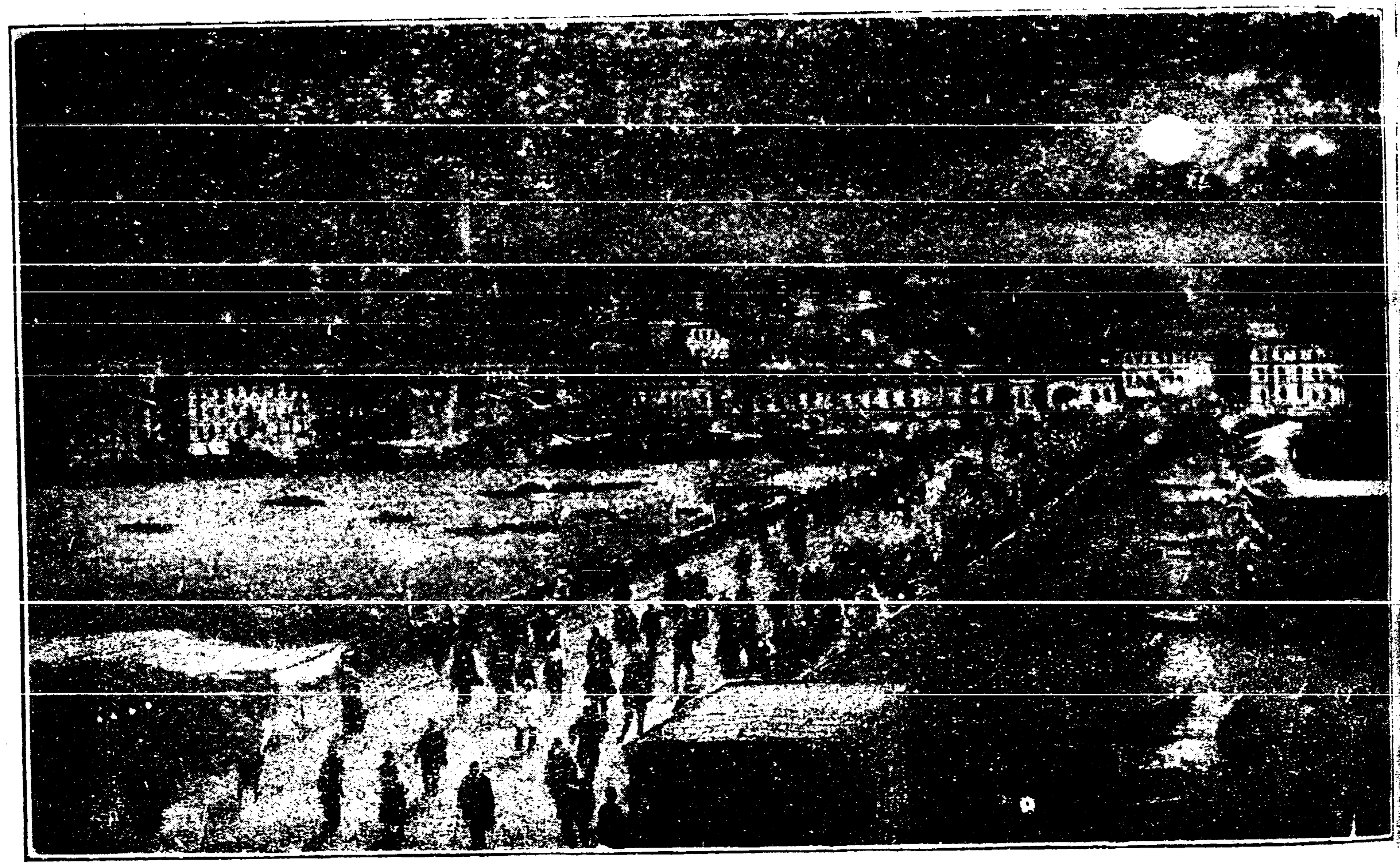

চন্দ্রোদয়ে গোল্ডেন হর্ণের উপরিস্থ সেতুর দৃশ্য।
(কনষ্টাণ্টিনোপল)

স্বজাতি হিতৈষণা।

তুরস্কের বর্ত্তমান বিপদে তুর্কী নারীগণ পুরুষদিগের অপেক্ষা কম চিন্তিত বা কম উদ্বিগ্ন নহেন। তুর্কী রমণীরা কেবল সভা সমিতি করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার পূর্ব্বক স্বদেশ রক্ষার জন্য পুরুষদিগকে মৌখিক উৎসাহিত এবং উদ্বোধিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বহু লক্ষ রমণী আপনাদের অলঙ্কারপত্রও সাম্রাজ্য সংরক্ষিণী সভার ফণ্ডে এবং রেড্‌ক্রেসেণ্ট সোসাইটীতে অর্পণ করিয়াছেন। পাঁচ সহস্রেরও অধিক মহিলা সৈন্যদিগের পোষাক পরিচ্ছদ, বিশেষতঃ আহত সৈন্যদিগের হাঁসপাতালের পোষাক পরিচ্ছদ বিছানাপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত আছেন। যুদ্ধের সময় এতদ্ব্যতীত আরও বহু সহস্র তুর্কী রমণী চাঁদা সংগ্রহ এবং সেবা ও সীবন কার্য্যে রত হইয়াছিলেন। বল্কান প্রদেশের বহু সহস্র বিতাড়িত ও সর্ব্বস্বান্ত রমণী, বৃদ্ধ এবং অনাথ বালকবালিকাগণ তুর্কী রমণীদিগের অসাধারণ বদান্যতা এবং দয়া গুণেই এই দারুণ দুর্দ্দিনেও আশ্রয় ও আহার প্রাপ্ত হইয়া কোনওরূপে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

অনেক পাশা-মহিলাও বর্ত্তমান জাতীয় বিপদে শিল্পকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই শিল্পার্জ্জিত অর্থ তাঁহারা নিয়মিতভাবে জাতীয় ভাণ্ডারে অর্পণ করিতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহারা কেবল আরাম, সুখ এবং অধ্যয়নেই দিন যাপন করিতেন।

দুইশত চিরকুমারী।

পার্লামেণ্ট সংস্থাপনের পরে দুই শত তুর্কী নবীনা দেশের নারী জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য চিরকৌমার্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সুপবিত্র শিক্ষয়িত্রী ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। এই রমণীদিগের আত্মোৎসর্গের পবিত্র এবং সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, নব্য তুর্কীদিগকে স্বদেশ এবং স্বজাতি হিতৈষণার আদর্শে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছে। তুর্কীদিগের মুখে তাঁহাদের মাতৃ জাতির সর্ব্বদা যে প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়; তাহা বাস্তবিকই যথার্থ এবং সার্থক।

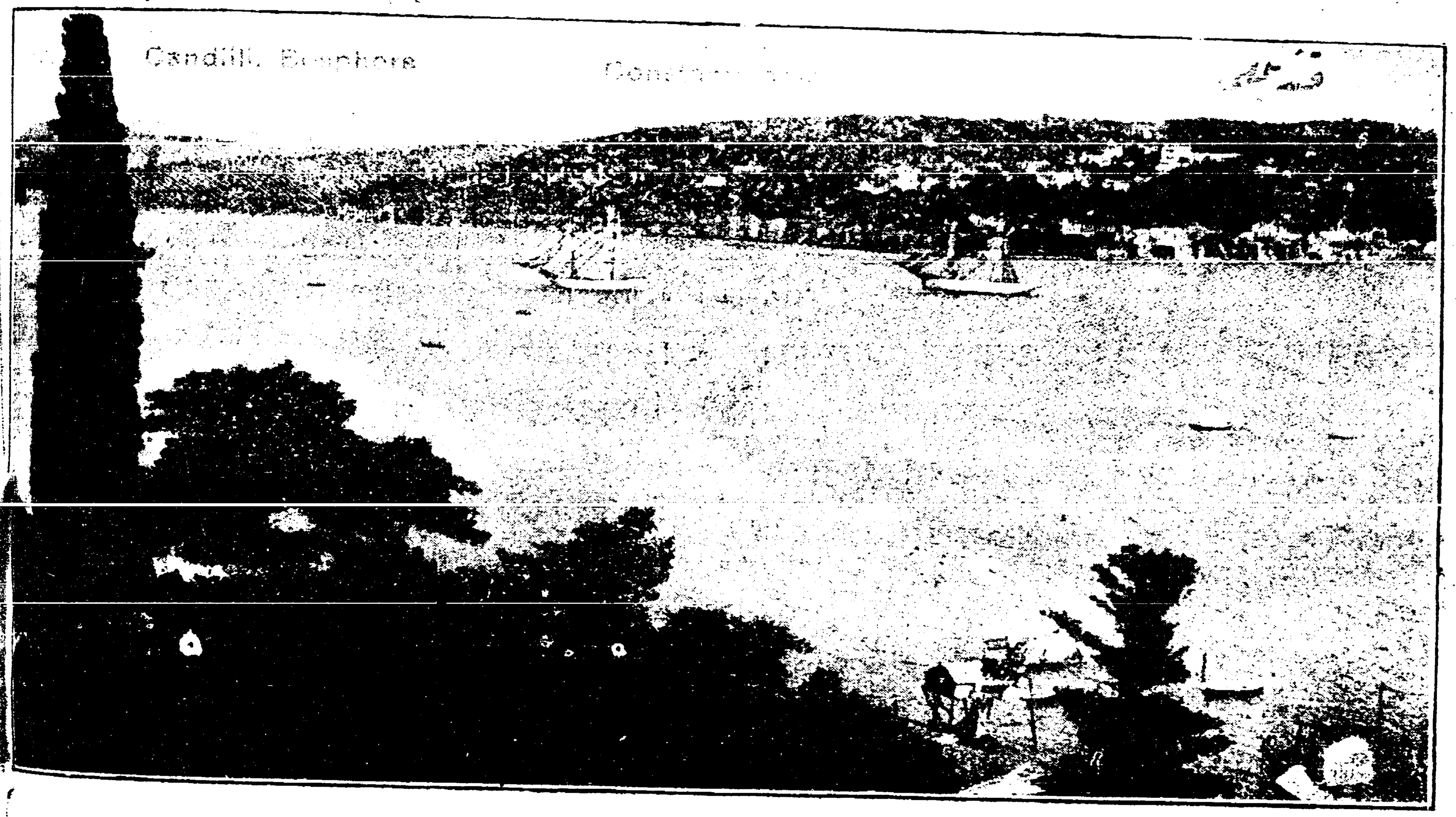

বসফোরাস প্রণালী।

পার্লামেণ্ট লাভে নারীর শক্তি।

নব্য তুরস্ক দীর্ঘকালব্যাপি ঘোর স্বেচ্ছাচার মূলক সোলতান আব্দুল হামিদের ব্যক্তিগত শাসন ও ব্যবস্থা প্রণালী পদদলিত করিয়া সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময় উৎপাদন পূর্ব্বক বিনা রক্তপাতে যে পার্লামেণ্ট বা নিয়মতন্ত্রশাসন প্রণালী সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে তুর্কী নারীদিগের সাধনা এবং ত্যাগ স্বীকার, পুরুষদিগের অপেক্ষা কোনও অংশেই নূন্য নহে। বিচার করিতে গেলে রমণীদিগের কার্য্যতৎপরতা লোকমত গঠন, এবং স্বার্থত্যাগ, পুরুষদিগের অপেক্ষা বোধ হয় বেশীই হইয়া পড়িবে।

অসাধারণ প্রভুত্বপ্রিয় কূটনীতি-বিশারদ স্বেচ্ছাচারী সোলতান আব্দুল হামিদ খানের ষষ্টিসহস্র ডিটেক্‌টিভ পুলিশের নির্য্যাতন ভয়ে নব্য তুর্কীদিগের পার্লামেণ্ট সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার, আন্দোলন এমন কি দলভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংবাদের আদন প্রদান করাও যখন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল, নব্য তুর্কী রমণীগণই তখন জাতির পক্ষে সাক্ষাৎ কল্যাণ ও মঙ্গলের মূর্ত্তি রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। মুসলমান রাজ্য বলিয়া তুরস্কে কোন অবস্থাতেই রমণীদের শরীর তল্লাসী (Body search) হইতে পারে না। এই সুবিধা অবলম্বন করিয়া বহু সহস্র তুর্কী নারী জাতীয় দলের পক্ষে-

ডিটেক্‌টিভের কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। নব্য জাতীয় দলের মেম্বরদিগের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদান, ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার মূলক রাজত্বের উচ্ছেদ-সাধনে বিরুদ্ধ বাদী স্বামী পুত্র ভ্রাতা এবং আত্মীয় দিগকে উদ্বুদ্ধ করা, স্ব:দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গে উৎসাহিত করা প্রভৃতি বিষয়ে তুর্কী রমণীরা বিশেষ চেষ্টা করেন। ভার্য্যা কন্যা এবং ভগ্নীর কাছে উৎসাহ পাইয়া কত হতাশ প্রাণ আশায় উদ্দীপ্ত, কত ভীরু, বীর্য্য দৃপ্ত হইয়াছিল, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে।

ফলতঃ সোলতান আব্দুল হামিদের সুদক্ষ এবং সুচতুর ষষ্টিসহস্র গুপ্তচর যখন নব্য দলের পার্লামেণ্ট স্থাপন সম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকার অভিসন্ধি এবং ষড়যন্ত্র বিফল করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে রাজপুরুষদিগের উৎসাহে এবং পুরস্কারের প্রলোভনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, তখন তুর্কী মহিলাগণও স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া দৃঢ়সংকল্প এবং কঠোর সাধনার পবিত্রাত্মা দেবীর ন্যায়, সেই বিরাট ডিটেক্‌টিভ বাহিনীর সমস্ত কৌশল ও সাবধানতা ব্যর্থ করিয়া পুরুষ জাতিকে স্বেচ্ছাতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনে সঙ্ঘবদ্ধ এবং দৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তুরস্কের নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী সংস্থাপনের ইতিহাসে তুর্কী নারীশক্তি এবং নারী-প্রতিভার বিমল প্রভা চির সমুজ্জ্বল হইয়া রহিবে।

কেহ মনে করিবেন না যে, তুর্কী রমণীগণ বিনা বাধায় এবং বিনা আত্মত্যাগে এই প্রকার সুমহান্ ও বিরাট ব্রত উদ্‌যাপনে সক্ষম হইয়াছিলেন। সোল-তান আব্দুল হামিদের জ্বলন্ত রোষে পতিত হইয়া মানব সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ কত মহামনাঃ তুর্কী রমণীকে গোপন ভাবে রাত্রির অন্ধকারে হস্তপদবদ্ধা-বস্থায় বস্‌ফোরাস প্রণালীর গভীর জলে ডুবিয়া মরিতে হইয়াছে। গুপ্ত হত্যার ভয়ে কত রমণীকে প্যারিস এবং জেনোয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়া-ছিল কিন্তু এত অত্যাচারেও তুর্কী নারীগণ বিচলিত হন নাই অবশেষে নারীদিগের এই সাধনায় এবং বীর-পুরুষ গাজী মাহমুদ শওকৎ পাশা, আনোয়ার বে এবং নিয়াজী বে প্রভৃতির নেতৃত্বে আব্দুল হামিদের স্বেচ্ছা-তন্ত্র রাজত্বের উচ্ছেদ হইয়া তুরস্ক সাম্রাজ্যে প্রজা স্বাধীনতার পুণ্য-পতাকা উড্ডীন হইয়াছে!

আগামীবারে সমাপ্য।

সিরাজী।

শুশ্রুষা নিবাস।

বিধাতার অনুগ্রহে আমি চিরকালই বেশ সুস্থ; অসুস্থতার মধ্যে আছে কেবল শিরঃপীড়া, তাহাও সদা সর্ব্বদা হয় না। আমার শিরঃপীড়ার সময় গোলমাল, কথাবার্ত্তা ভাল লাগে না। ঘরটা একটু অন্ধকার করিয়া, চুপচাপ করিয়া শুইয়া থাকিতে পারিলে কতকটা ভাল বোধ হয়। আমার শিরঃ-পীড়ার সময় সর্ব্বদাই মনে হয় যে, আমি ত ইচ্ছামত এই প্রকার বিশ্রাম লইতে পারি, কিন্তু আমাদের দেশে ত কত স্ত্রীলোক অসহনীয় শিরঃপীড়া অথবা অন্য কোন পুরাতন (chronic) রোগে আক্রান্ত হইয়া একদিনের জন্যও পূর্ণ বিশ্রাম পান না। মাথা হয়ত বেদনায় খসিয়া পড়িবার মত হইয়াছে, তথাপি ছোট ছোট শিশুরা আসিয়া বিরক্ত করিতেছে এবং ঘরেরও সব কাজের তত্ত্বাবধান করিতে হইতেছে। আমি hysterical স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদের ঘরের সংবাদ একটু জিজ্ঞাসা করি। সমস্ত দিন পরিশ্রম, তাহার উপর ছেলেদের উপদ্রব—ইহাতে যদি কাহারও মানসিক equilibriumএর ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে তাহার কি বড় বিশেষ দোষ আছে?

প্রত্যেক বাড়ীর ভৃত্যদের পর্য্যন্ত ছুটী আছে, কিন্তু আমাদের বাঙ্গলা দেশের গৃহিণীদের কোন দিনই সংসারের চিন্তা ও সংসারের কার্য্য হইতে অবসর নাই। গৃহিণী অর্থে আমি সেকেলে ধরণের গৃহিণীদের কথাই বলিতেছি, কেন না এখন পর্য্যন্ত মোটের উপর তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী। গৃহিণী রোগ-শয্যায় শায়িত, তথাপি সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া বাড়ীর সকলে তাঁহাকেই বিরক্ত করিতেছে,—যেমন "অমুকে আসিয়াছেন, কোন ঘরে তাঁহাকে শুইতে দেওয়া হইবে;" "বাজার হইতে কি কি জিনিষ আসিবে"—ইত্যাদি। বিশেষতঃ যে বাড়ীতে গৃহিণী ব্যতীত পূর্ণ বয়স্কা আর কোন স্ত্রীলোক নাই। আমি বাল্যকালে আমাদের নিজেদের বাড়ীতেই এইরূপ দেখিয়াছি; রোগ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাবশতঃ স্বীয় জননীকেই কত বিরক্ত করিয়াছি। আমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতাটির জন্মের অব্যবহিত পরে মাতৃদেবীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়, কিন্তু তিনি যে সে সময় কতটা বিপদের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন, তাহার কোন ধারণাই আমার ছিল না। আমাদের কয়েক ঘণ্টা তাঁহার কাছে যাইতে নিষেধ করা হইল, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ (আমরা মনে করিয়াছিলাম) সদ্যজাত শিশু-টিকে অস্নাত অবস্থায়ই আমরা পাইলাম। আমাদের গোলমাল করিতে বারণ করা হইল। এখন বুঝি-তেছি যে, নার্সের মাতাকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল,—শিশুকে দেখিবার অবসর তাহার ছিল না, সেই জন্যই শিশুকে সে অন্য ঘরে রাখিয়া গেল। যাহা হউক, দুই একদিন পরেই জননী আবার শুইয়া শুইয়া গৃহের সকল কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। সে সময়ে আমাদের কেহ বলিয়া দেয় নাই যে, তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া উচিত ছিল এবং আমরাও অজ্ঞানতাবশতঃ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম।

আমি ডাক্তার হইয়া যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, তখন গৃহিণীদের অবসরের অভাব প্রতি পদেই দেখিতে লাগিলাম। শরীর রোগক্লিষ্ট ও পরিশ্রমের অযোগ্য হইলেও মনের পরিচালনার অব-সর নাই। নিজের শরীর অক্ষম, সুতরাং গৃহের শৃঙ্খলার অভাব হইতেছে বলিয়াও একটা মানসিক উদ্বেগের ভাব দেখিয়াছি। শীঘ্র শয্যাত্যাগ করিতে যদি না সক্ষম হন, এই চিন্তায়ও অস্থির দেখিয়াছি। সকল বিষয় লইয়াই গৃহিণীকে বিরক্ত করিলে, তাঁহার অসুস্থতার জন্য সকলের কতটা কষ্ট হইতেছে, তাহাও তাঁহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় বলিয়াই তিনি সামান্য উপসর্গগুলি গোপন করিয়া ডাক্তারকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া অভ্যস্ত কার্য্যের উপযুক্ত হইয়াছেন। ইহার ফল এই হয় যে, সামান্য ত্রুটিতেই আবার বিশেষভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক-দের এই স্বার্থশূন্য ভাবটা জাতিগত হইয়াছে, গৃহের অন্য সকলের সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজকে কষ্ট দিয়াই যেন তাঁহাদের সুখবোধ হয়। আমি অনেক সময়েই এই অবস্থার প্রতীকারের কি উপায় হইতে পারে, সে বিষয়ে চিন্তা করিতাম।

বিলাতে যাইয়া দেখিলাম,—যাঁহারা ধনী ও সম্ভ্রান্তবংশীয়া তাঁহারা হাস্পাতালে না গেলেও Nursing Institutionsএ রোগের হস্ত হইতে আরোগ্য হইবার জন্য যান। সেখানে ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য, সেবা শুশ্রুষা সকলেরই সুন্দর বন্দো-বস্ত আছে। সকলেরই সে স্থানে পূর্ণ স্বাধীনতাও আছে! আমি Dublinএ অবস্থান কালে একজন গণ্যমান্য ডাক্তারের স্ত্রীকে সন্তান হইবার জন্য শুদ্ধ মেয়েদের জন্যই প্রতিষ্ঠিত একটা প্রথম শ্রেণীর Nursing Insitutionএ যাইতে দেখিলাম। সে ডাক্তারটির সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমি এখান হইতেই introduction letter লইয়া গিয়াছিলাম, কাজেই তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার বিশেষভাবে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। আমিও এই Nursing Institutionএ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই-তাম। টাকা খরচ করিয়া তাঁহাকে Nursing Institutionএ থাকিতে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য লাগিয়াছিল। আমি বলিলাম, "আপনার বাড়ীতে telephone রহিয়াছে, motor car রহিয়াছে, বাড়ীও বড়; যে ডাক্তার চাহেন তাহাকেই যখন তখন পাইতেন; নার্স পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত ছিল, তবে আবার এখানে আসিলেন কেন?" তিনি

বলিলেন, "বাড়ী আমার থাকিবার বাড়ী। সেখানকার প্রত্যেক বন্দোবস্ত সুস্থ অবস্থায়, সুখে ও আরামে থাকিবার জন্যই করা হইয়াছে, সেটা অসুস্থ অবস্থায়; বিশেষতঃ আমার এই অবস্থার উপযোগী নহে। আমার বাড়ীকে এই অবস্থার উপযোগী করিতে হইলে সমস্ত বন্দোবস্তই আবার উল্টাইয়া ফেলিতে হয়। তাহাতে বাড়ীর প্রত্যেকেরই অসুবিধা হইবে। এই Institutionএর উদ্দেশ্য রোগীরই পরিচর্য্যা করা। ইহার প্রত্যেক বন্দোবস্তই রোগীদের সুখ সাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা যে আমার বাড়ীর অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তা'; ছাড়া আমি বাড়ী থাকিলে "Billy"র (স্বামীর) শরীর ও মনের উপর অনেকটা "strain" পড়িত। তাঁহার এত কাজ, অবসর এত কম, তাহার উপর আমি তাঁহাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি নাই। বাড়ীতে থাকিলে নিজের অবসরের সময়টুকুও হয়ত বিশ্রাম না করিয়া আমার কাছে বসিয়া থাকিতেন। এখানে ত বেশী ক্ষণ থাকিতে পান না। এখানে আমার ঔষধ পথ্য, সেবা শুশ্রূষা কিছুরই ত্রুটি হইতেছে না জানিয়া তিনি নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজ করিতে পারিতেছেন।

এই Nursing Institution গুলিতে আবার রোগীরা নিজেদের ডাক্তার দ্বারাও চিকিৎসা করাইতে পারেন, তবে Institutionএর staffএ নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ডাক্তার থাকেন, রোগীর আপত্তি না থাকিলে তাঁহারাই চিকিৎসা করেন।

আমি বার্লিনে অবস্থান কালেও দেখিলাম যে গবর্ণমেণ্ট হাস্পাতাল ছাড়া বহু সংখ্যক প্রাইভেট হাস্পাতাল রহিয়াছে। বড় বড় ডাক্তারদের সকলেরই Home Hospitalএর ন্যায় হাস্পাতাল আছে। অল্প স্বল্প রোগ হইলে তাঁহারা বাড়ীতেই তাহাদের দেখেন; রোগ ভারী হইলে হাস্পাতালে আনিয়া চিকিৎসা করেন।

Dowager Marchioness of Dufferin (যিনি আমাদের দেশে প্রথমে স্ত্রী-চিকিৎসক হইবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন) এবং India Officeএর Under Secretary উভয়েই বার্লিনের British Ambassador, Sir E. Goschenএর কাছে আমাকে introduction letters দিয়াছিলেন। বার্লিনে Charity Hospital নামে একটা প্রকাণ্ড হাস্পাতাল আছে। সুপ্রসিদ্ধ Prof Bumen সে হাস্পাতালে Midwifery ও Gynæcological cases দেখেন। তাঁহার lectures ও operations attend করিবার জন্য আমি অনুমতি পাইয়াছিলাম। German ভাষাতে lecture, কাজেই আমি তাহা বুঝিতাম না বলিয়া Ambassador, তাঁহাদের Embassyর ডাক্তার, Dr. Mainserকে তাঁহার cliniqueএ আমাকে লইতে বলিয়া দিয়াছিলেন।

Dr. Mainser ও আর কতকগুলি ডাক্তার একত্রিত হইয়া এই হাস্পাতালটি খুলিয়াছিলেন, Medical, Surgical, Obstetric ও Gynæcological সব wardsই সেখানে ছিল। Obstetric ও Gynæcological words, Dr. Mainserএর হাতে ছিল। ইনি ইংরাজী জানেন, সেই জন্যই Ambassador তাঁহাকে আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বলিয়া দেন। আমার এই হাস্পাতালের সংশ্রবে আসিবার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না, যে প্রাইভেট হাস্পাতাল এখন সুন্দরভাবে চালান যাইতে পারে। প্রত্যেক বিভাগের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন operation rooms, ভিন্ন ভিন্ন নার্স ও ভিন্ন ভিন্ন anasthetist.

আমি যতই এই Institutionগুলি দেখিতাম ততই মনে ভাবিতাম যে আমাদের নিজেদের দেশে যদি মেয়েদের জন্য এরূপ ভাল বন্দোবস্ত থাকিত তাহা হইলে তাহাদের কতই সুবিধা হইত! প্রকৃত বিশ্রাম আমাদের দেশের মেয়েরা কখনই পায় না রোগের সময় তবুও যদি তাহারা একটু আরাম পাইত! রোগীর পক্ষে নিস্তব্ধতা প্রয়োজন, সময় মত ঔষধ পথ্যের প্রয়োজন, নিযুক্তা শুশ্রূষাকারিণী প্রয়োজন,—কিন্তু নিজের বাড়ীতে এ গুলি হয় না হাস্পাতালে কতকটা এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধ বটে, কিন্তু সেখানে সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বশ্রেণীর লোক থাকে বলিয়া কোন ভদ্র মহিলা সেখানে যাইতে চাহেন না। হাস্পাতালে থাকিলে হাস্পাতালস্থ ডাক্তার দ্বারাই চিকিৎসা করাইতে হয় বলিয়াও অনেকে সেখানে যাইতে অনিচ্ছুক হন। সেইজন্য আমার মনে হয় যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অথবা জাতির লোকেরা যদি নিজেদের স্ত্রীলোকদের জন্য তাঁহাদের মধ্যে শুশ্রূষা-নিবাস খোলেন, তাহা হইলে দেশের অনেক কল্যাণ হয়। রোগীরা ইচ্ছা করিলে নিজেদের ডাক্তার দিয়া চিকিৎসা করাইতেও পারেন।

আমাদের দেশের নারীদের ধৈর্য্য ও কষ্ট সহিষ্ণুতা অসীম, সামান্য রোগ ও সামান্য কষ্ট তাঁহাদের নিকট গ্রাহ্য করিবার জিনিষই নয়। কিন্তু তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে, আরম্ভ কালে একটু নিয়মে থাকিলে, একটু ঔষধ পথ্য খাইলেই যে রোগ সমূলে উৎপাটিত হয়, তাহা অগ্রাহ্য করিলে হয়ত পরে কিছুতেই নির্ম্মূল হয় না। আর তাঁহাদের অবহেলার ফল যে তাঁহারাই শুধু ভোগ করেন তাহা নহে, ভাবী বংশধরদিগকেও তাঁহারা স্ব স্ব দুর্ব্বলতার উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

আমি হাস্পাতাল এবং Nursing Institution দেখিবার জন্য উৎসুক শুনিয়া একটি জর্ম্মান রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী মহিলা আমাকে একটা ক্যাথলিক হাস্পাতাল দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই হাস্পাতালটি ও তাহার সমুদয় বন্দোবস্ত দেখিয়া আমি যারপর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। সম্মুখেই উদ্যান, তাহার পর ঔষধ ইত্যাদি তৈয়ার করিবার চারি পাঁচটি বড় বড় ঘর। তাহার পরেই একটা প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গনে নানা জাতীয় ফুলের বাগান। দুই চারিটা বড় বড় গাছও সেখানে রহিয়াছে, তাহার নীচে কতকগুলি রোগী, যাহাদের পক্ষে মুক্তবায়ু ও সূর্য্যকিরণ প্রয়োজনীয় তাহারা আরাম-চৌকীতে বসিয়া আছে। প্রাঙ্গণের এক দিতে সুসজ্জিত প্রকাণ্ড উপাসনা গৃহ। গৃহ মধ্যস্থিত প্রাচীরে যিশুখৃষ্ট, মেরী ও অন্যান্য সাধুদিগের প্রতিমূর্ত্তি। রোমান ক্যাথলিকদের আবার দিনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সময় আছে, যখন তাহারা সকলে উপাসনার জন্য উপাসনা মন্দিরে সমবেত হয়।

দ্বিতলস্থ গৃহগুলিতে Operation roomes, X ray department, Electric treatment করিবার বন্দোবস্ত ইত্যাদি রহিয়াছে। সব স্থানেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দ্বিতলের কতক গুলি ঘর ও ত্রিতলস্থ ঘরগুলি রোগী রাখিবার জন্য। রেসিডেণ্ট ডাক্তারদের ঘরও ইহারই মধ্যে। অসংখ্য নার্স দেখিলাম, কিন্তু তাহারা বোধ হয় নিকটস্থ কোন বাড়িতে থাকে, তাহাদের বাসস্থান আমাকে দেখান হয় নাই।

সমস্ত হাস্পাতালটাতেই যেন কেমন একটা নীরব স্নিগ্ধ শান্তির ভাব দেখিলাম। শুশ্রূষাকারিণীগণের মুখ ও যেন মানবপ্রীতিতে উদ্ভাসিত। আমার মনে হইল যে, এইরূপ নিস্তব্ধ, শান্তিপূর্ণ স্থানে মরিতেও বোধ হয় আরাম লাগে। আমার এখনও অনেক সময় সেই হাস্পাতালের অথবা Nursing Institutionএর দৃশ্য মানসপটে উদয় হয় এবং মনে হয় যে, আমাদের দেশেও যদি এইরূপ স্থান থাকিত! এই স্থানটাকে দেখিয়া হাস্পাতাল মনে হয় না, মনে হয় যেন কোন শান্তিপূর্ণ আবাস গৃহ। ঘরে ঘরে ফুলদানীতে ফুল; দেয়ালে আলেখ্য। শুশ্রূষাকারিণীরা ধীরপাদবিক্ষেপে রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা। আপনার লোকেরাও সে দেশে বোধ হয় এমন করিয়া যত্ন করে না।

আমার নিজের মনে হয় যে, আমাদের দেশে Nursing Institutionএর প্রতিষ্ঠা করা নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু হয়ত আমি সব দিক ভাল করিয়া বিবেচনা করি নাই, এইজন্য এই বিষয়ের আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

পূর্ব্বকথা।

আশুর বিলাত যাত্রার সমুদ্রপথে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম আলাপ পরিচয়। ঐ একই জাহাজে তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীও যাইতেছিলেন। একে স্বদেশীয় তাহাতে উভয়ই সাহিত্যানুরাগী, কাজে কাজেই আত্মীয়তাটা শীঘ্র গাঢ়তর হইয়া উঠে এবং সেই বন্ধুত্বের ভাবী ফল সুখজনক কুটুম্বিতায় পরিণত হয়। ভ্রাতার প্রবাস পথের অধিকাংশ পত্রই রবীন্দ্রনাথের কথায় পূর্ণ হইয়া আসিত। আমরা তখন "তাঁহার নাম মাত্র শুনিয়াছি, চক্ষে দেখি নাই।" নামের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কবির "ভগ্ন হৃদয়" হস্তগত হয়। সে সময় একা আমিই পিতৃদেবের নিকট আরায় ছিলাম। একে তিনি সরকারী কাজ কর্ম্মে বিব্রত, তাহার উপর পুত্রকে সুদূর বিদেশে পাঠাইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও নিরানন্দ থাকিতেন। তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ প্রত্যহ সায়াহ্নে আশুর প্রেরিত "ভগ্ন হৃদয়" পড়িয়া শুনাইতাম, মনোযোগ সহ শুনিতেন, মতামত কিছু প্রকাশ করিতেন না, তবে যুবক কবির পুস্তকের নাম যে "ভগ্ন হৃদয়" সেটী তাঁহার একেবারেই ভাল লাগিত না। সে অতীত "ভগ্ন হৃদয়" রাজ্য হইতে অদ্যকার সাহিত্য সম্রাট রবীন্দ্রনাথের সিংহাসন অনেক দুর ঊর্দ্ধে, তবুও সে দিনের এই ক্ষুদ্র পূর্ব্বকথা স্মৃতি হইতে লুপ্ত হয় নাই।

আশুর কার্য্যক্ষেত্র কলিকাতা আগমনের সঙ্গে কবিবরেরও ভ্রাতৃপ্রতিম সত্য বাবুর সর্ব্বদা আসা যাওয়া আলাপ আপ্যায়িতের সুখের দিনগুলি দিব্য সার্থক বলিয়া মনে হয়। প্রবাস যাত্রাকালীন পথিমধ্যে পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথ, ভ্রাতুস্পুত্রীর যোগ্যতর পাত্র, হস্তের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া ভবিষ্যৎ শুভ কার্য্যের জন্য পূর্ব্বেই যে মৌখিক রিটেনার দিয়াছিলেন, তাহারই সফলতায় অদ্য এই অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হইয়াছে। জীবনের এক এক যুগে এক একটী ঘটনায় মনুষ্য হৃদয়ের সুখসম্মিলনে বিশ্বসংসারের সবই যেন আপনার হইয়া যায়। কা অভিনব বন্ধু লাভে আবার নব জীবন সঞ্চার হইয়া থাকে। বিবাহ সূত্রে যে আত্মীয়তা জন্মে, তাহা চির সুখকর স্নেহের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ!

ঠাকুর পরিবারে ভ্রাতার বিবাহকালে দেশে আ নূতন কোন আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই, বরং বুদ্ধিমতী সহোদরা পিসীমাতারা এ কার্য্য অন্তরের সহিত অনুমোদনই করিয়াছিলেন ও সুশীলা সুলক্ষণা ভ্রাতুস্পুত্রবধূ দেখিয়া পরম পরিতুষ্টও হইয়াছিলেন পয়মন্ত বধূর আগমনে আমাদিগের গৃহের সর্ব্বাংশ মঙ্গল হইয়াছে। পিতৃকুল "কন্যাগত," কিন্তু পিতৃদেব কনিষ্ঠা কন্যা ও দৌহিত্রীকে স্বশ্রেণী এবং বারেন্দ্র সমাজে বিবাহ দিলে কতকটা পূর্ব্ব সম্বন্ধ রহিয়া যাইত, তিনি তাহা না করিয়া যখন আবার তাহা দিগকে রাঢ়ী শ্রেণীতে বিবাহ দিলেন, তখন দেশের সহিত সামাজিক সম্বন্ধটা একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। পরিবর্ত্তনশীল কালের গতির সঙ্গে ক্র পুরাতনের তিরোধান ও নূতনের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। কালক্রমে সকল বিষয়েই একটা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা কাহারো চেষ্টা সাপেক্ষ নহে। ক্রমশঃ সেই পূর্ব্বকার কঠোর জাত্যাভিমানে নিয়ম সব অমনি অমনি শিথিল হইয়া আসিতেছে সেইজন্য আশা করা যায় যে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিলাত প্রত্যাগতদিগেরও আসন সমান ভাবে রক্ষিত হইবে। তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া হিন্দু সমা আর কখন উন্নতির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পা বেন না। সমাজের অশেষ দুর্গতি যাহাতে তি হিত হয়, এক্ষণে তাহাই করা কর্ত্তব্য। কাপ কু রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্যবধান দূর করিয়া সকলে এক মিলিয়া স্বদেশের হিতকল্পে আত্মসমর্পণ করিয়া নি জাতীয় মঙ্গল। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" থাকি চলিবে না, সকলে এক হইয়া মাতৃপূজা ক হইবে।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এই মহামন্ত্র জীবনে কখন যেন বিস্মৃত না হই।

দীর্ঘকালব্যাপী অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পরিভ্রমণে যুবকের পূর্ণতর স্বাস্থ্যও ভগ্ন হইয়া যায়, তাহার উপর পিতৃদেবের ত বয়সও হইয়াছিল এবং একেবারে অনবকাশে নীরোগ শরীর হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল ও রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। তখনও কার্য্য জীবনের মেয়াদ ফুরায় নাই, কিন্তু ইহলোকের দিন অকালে ফুরাইয়া আসিয়াছিল! তাঁহার স্বর্গারোহণে আমরা সে স্নেহ, মায়া, মমতা ও নিরাপদ আশ্রয় চিরদিনের জন্য হারাইলাম, তাহা আর কোথায় পাইব? তিনি একাধারের জনক জননী ও ক্ষমাশীল যথার্থ বন্ধু ছিলেন। দয়াময় ঈশ্বরের নিকট যেমন অনুতাপে সর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে, তেমনি সেই পার্থিব দেবতার কাছে আমাদিগের এক বিন্দু সরল অশ্রুজলে "সাত খুন মাপ" হইয়া যাইত। তাহার অভাব এ জীবনে কিছুতেই মোচন হইবার নহে। যাহা গিয়াছে, তাহা এ সংসারে কখনও পাইব না। তাঁহার জীবনব্যাপী স্নেহঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আমাদিগের কাহারো নাই। তাঁহার আদর্শ চরিত্রের ও স্বাধীন উদার ভাবের কণামাত্র অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেও এ জীবনের কতক সার্থকতা হইতে পারে।

"কল্পনা গিয়াছে থামি
কবিতার প্রস্রবণ বহে না অন্তরে,
গীতধ্বনি সুখ আশা,
বিশ্বব্যাপী ভালবাসা,
কিছু আর দেখি না সংসারে,

"মমতা আলয় শূন্য,
কিছু নাই, স্মৃতি আছে হৃদয় মাঝার,
ব্যবধান প্রাণে প্রাণে,
স্নেহের বন্ধন হীনে,
দূরতায় শোভে না সংসার।

"মহান সত্যের জ্যোতি,
করুণায় দ্রবীভূত হিয়া, দয়ামায়া
কৃপাসিন্ধু মূর্ত্তিমান,
স্নেহ বিগলিত প্রাণ,
প্রীতিভাবে মগ্ন সমুদয়।

"তব অন্তর্ধানে দেব
জগতের সব যেন সমাপ্ত এখন,
অশ্রুসিক্ত মর্ম্মতলে,
শুধু ক্রন্দন উথলে,
স্মৃতি কহে তোমারি বচন।

"তব পদচিহ্ন শিরে
তোমারি আদর্শ দেব মানস নয়নে,
তোমারি স্নেহের ভাতি,
দেখাইছে দিবা রাতি,
কর্ত্তব্যের পথ এ দুর্দ্দিনে।

"ব্রহ্মাণ্ডের সার পিতা,
জননী রূপিণী মায়া, বিপত্তি সহায়ে,
লভিয়া অমরধাম,
চিরতরে ভাগ্যবান,
তুমি দেব শান্তির নিলয়ে।

"সমাপ্তি' সুখের দিন,
আনন্দের ঐক্যতান প্রাণের দুয়ারে,
বাজে না মধুর রবে,
আর দেখিব না ভবে,
জীবনের স্নেহ মূলাধারে।"

নীহারিকা, দ্বিতীয় ভাগ।

মনুষ্য জীবনের কথা অফুরন্ত, তাহাতে আবার "পূর্ব্বকথা," তাহা যদি শুনিবার ধৈর্য্যশীল শ্রোতা পাওয়া যায়, তবে ত "সোণায় সোহাগা" হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এই বয়সে কথা আরম্ভ করিলে থামা শক্ত, আমার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষ ও মাতৃগণের আশীর্ব্বাদে ইহা যে কতক নির্ব্বিঘ্নে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম, এই পরম সৌভাগ্য মনে করি এবং মাতৃদেবী ইহাতে যে সুখানুভব করিবেন, তাহাই আমার সার্থকতা।

জন্মদিনে পূর্ব্বকথা সমাপ্ত।

(১৪ই আশ্বিন)

"নয়াবউ" শুন শুন, তোমারে কহিছে পুনঃ,
অতীতের দু'চারিটা কথা,
আজি নাকি জন্মতিথি, উপহারে চির ইতি,
দাবিহীন জীবন সর্ব্বথা।
ষষ্ঠীকল্পে মহামায়া, ভক্তগণে পদ ছায়া
আসে দিতে সেবকের তরে,
আশ্বিনে তাহারি সাথে, তাঁরি পদরজ মাথে,
আসিয়াছি জনকের ঘরে।
বোধনের আয়োজন, ঘরে ঘরে আবাহন,
বিল্বমূলে ঘটে অধিষ্ঠান,
ঢাক ঢোল বাজে কাড়া, দিকে দিকে পড়ে সাড়া,
বর্ষ পরে জাগাইয়া প্রাণ।

শঙ্খ, ঘণ্টা, বাজে বাঁশী, বাদ্য করি সুখে হাসি,
ধূপ ধুনা সমীরে ছড়ায়,
ধনী দীন নর্ব্বজনে, পরিতৃপ্ত ফুল্ল মনে,
নব বস্ত্র অঙ্গে শোভা পায়।

আনন্দের কলরব, শরতের মহোৎসব,
আনন্দে আনন্দময়ী আসে,
দেবী পূজা মহা হর্ষ, সেই যেন নব বর্ষ,
চারি ধারে হাসির উল্লাসে।

এই দিনে জন্ম মোর, ঠিকুজি কোষ্ঠীর জোর
বড় ছিল ভাগ্যের লিখনে,
দৈবজ্ঞ কহেন মায়, "সর্ব্ব সুলক্ষণা" তায়
কন্যার আকৃতি দরশনে,

"বৈধব্য ললাটে নাই, ধনে পুত্রে পূর্ণ ঠাঁই,
যেথা যাবে তোমার দুহিতা,"
জননী ভাবেন মনে, পাইলেন "শুভক্ষণে
হেন কন্যা তুলনা রহিতা।"

"বারভুঁয়ে" মাতা সহ, ষষ্ঠী পূজা সমারোহ
তাঁর ঘরে, বর্ণনা অতীত,
অকাতরে অন্নদান, সোণা-দানা ধাত্রী পান,
কুটুম্বিনী গৃহে উপনীত।

পিত্রালয়ে নয় মাসে, উৎসবের মহোল্লাসে
"অন্নারম্ভ" হইল যখন,
কত বাদ্য, কত ভাণ্ড, কত ধুম, কত কাণ্ড,
সে, যে, সব কাহিনী মতন।

অঙ্গ ভরা অলঙ্কার, সহিতে তাহার ভার
ভূমি নাহি ঠেকে কভু পায়,
জনকের স্নেহ প্রীতি, পরিপূর্ণ নিতি নিতি,
ক্ষয় বৃদ্ধি নাহিক তাঁহার।

সে মমতা কহিবারে, বচনে বচন হারে,
কার সনে তুলনা তাহার!
সাত ভাই, দিদি বড়, কর্ত্তামীতে সদা দড়,
বাল্য সুখ এমন কাহার?

পিতামহ কালীকান্ত, ক্ষমাশীল শান্ত দান্ত,
"সোণাবাজু" বাহু শোভা ধরে,
তাঁহারি ঘরের মেয়ে, নবগুণ হাতে পেয়ে,
গৌরীদান জ্যেষ্ঠতাত করে।

শনি দৃষ্টি হলাহলে, অদৃষ্টের ফলাফলে
সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য হয়ে যায়,
চির বৈধব্যের নিশি, নবীন প্রণয়ে মিশি
উড়ে গেল স্বপনের প্রায়,

যৌবন জোয়ার লাগি অনুরাগ আর জাগি
উঠিল না হৃদয় বেলায়।
কল্পনায় মূর্ত্তি গড়া ভাঙ্গা নাহি লাগে জোড়া,
কাঠাম না হলে কদাচন,

দেবতা গড়িতে হলে, প্রেম চাহি হৃদি তলে
শূন্যতায় হয় না বরণ।
আদিতে হইলে ভুল, থাকেনা কাহার মূল,
হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি সার,

ঘটিল ভাগ্যের দোষ, দেবতার বাড়ে রোষ,
মানবের কথা কিবা আর?
লক্ষ্মী বাম, অলকায়, পুঁজিপাটা নিয়ে যায়,
ধরিলাম বাণীর চরণ,

নব ফুল দুর্ব্বাদলে, অর্চ্চনা করিব বলে,
কত অর্ঘ করিনু রচন,
মা কভু ছুঁলে না পায়, সে কুসুম মালিকায়,
যতনের কাব্য-গ্রন্থ মম,

কীটে কাটি ছারখার, কর্পূরে রহে না আর,
বিপণির জঞ্জালের সম।
তার পর জান সব, কি আর কহিব নব?
জীবনের সর্ব্বস্বান্ত কথা,

হৃদয়ের কতখানি, শূন্য তা'ত আমি জানি,
কত শোক, কত মর্ম্ম ব্যথা,
বিশ্বময় স্নেহ দিয়া যাহারে বাঁধিতে হিয়া,
চেয়েছিল আপনারে করি,

স্বপ্ন হলো তাও এবে, দিন গণা সুধু ভবে
জন্মান্তের কর্ম্মফল স্মরি।
এসেছিনু যাহা লয়ে, সেও গেল বৃথা হয়ে,
কৃষ্ণ কেশ তুহিন ধবল,

এখন কাঁদিয়া খুন, বয়সে লেগেছে ঘুন,
স্মৃতিটুকু ভবের সম্বল।
বকে বকে মিছে মরি, দিন গেল হরি হরি
বয়সের স্বধর্ম্ম কেবল।

ঠাকুঝির হাল চাল, বধূগণ জান ভাল,
তবু সুধাইতে পার বোন,
"পূর্ব্বকথা" এত কেন, আবার তুলেছি হেন,
জননীর কাণ্ডখানা শোন,

পোড়া জন্মদিন আজ, মায়ের নাহিক কাজ,
আশীর্ব্বাদ, "চিরজীবি" হতে,
ভয়ে ভীত হয়ে তাই, তোমারে কহেছি ভাই,
অবসর চাহি কোন মতে।

সমাপ্ত।

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

ঔরঙ্জেবের রাজ্যাভিষেক।

ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে সম্রাটগণের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে যে সকল উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্য ঔরঙ্জেবের রাজ্যাভিষেক উৎসবই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ কথা সত্য যে, মোগল সম্রাটগণের মধ্যে সাজাহানের রাজত্বকালেই মোগল সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্যে এবং গৌরবে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তথাপি তাঁহার রাজ্যাভিষেক কালে (১৬২৮ খৃঃ) জগৎ বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসনও রচিত হয় নাই এবং মণিরত্ন কোহিনূরও রাজ-ভাণ্ডারে ছিল না। তখনও পর্য্যন্ত দিল্লী ও আগ্রার সুপ্রসিদ্ধ মণিমুক্তাখচিত প্রাসাদগুলিও নির্ম্মিত হইয়া উঠে নাই। ঔরঙ্জেবের রাজত্বকালে এ সকলই বর্ত্তমান ছিল।

আরও একটা কথা—ঔরঙ্জেবের রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তাঁহাকে অনেকগুলি যুদ্ধে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জয়লাভ করিতে হইয়াছিল। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই এ সকল কথা জানেন। চারিদিকে যখন শত্রু সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিল এবং তাহার সহিত গৃহের অশান্তিও অনেকটা কাটিয়া গেল, তখনই তিনি পরম শান্তিতে অভিষেক উৎসবের আয়োজন করিলেন, বিজয়ের গৌরব তখন পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই।

মুসলমান রাজ্যাভিষেকের প্রধান অঙ্গ রাজসিংহাসনে উপবেশন। আরব ভাষায় ইহার নাম জলাম (Jalam) প্রাচীন হিন্দু বা ইহুদিদিগের ন্যায় এ উৎসবে পুরোহিতেরও কোন প্রয়োজন হইত না, কিম্বা চন্দন লেপনেরও আবশ্যক ছিল না। মুসলমান সম্রাটগণ সাধারণতঃ বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করিতেন। মস্তকে এক প্রকার উষ্ণীষ পরিধানের রীতিও ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় মুকুট ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। পারস্য দেশে কিন্তু অভিষেক কালে সম্রাটকে মুকুট মাথায় দিতে দেখা যায়।

উৎসব কালে প্রত্যেক নূতন সম্রাটের নাম এবং উপাধি জনসমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে এবং সেই দিবসই নূতন মুদ্রায় সম্রাটের নাম প্রথম অঙ্কিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহা বিতরিত হয়;—এই সময়ে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ রাজভক্তির চিহ্নস্বরূপ সম্রাটের পদে নানারূপ উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া থাকেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে যোগ্য উপাধি অথবা অর্থাদি দ্বারা সম্মানিত ও কৃতার্থ করেন। এই দিন ভিক্ষুক ও ফকিরদিগকেও অজস্র খাদ্য দ্রব্যাদি বিতরণ করা হয়। তারপর নাচ গান আমোদ আহ্লাদ ত চলেই।

মোগলদিগের সময়ও ভারতবর্ষে জ্যোতিষের প্রতি অধিবাসিগণের অগাধ আস্থা ছিল। হিন্দু বা মুসলমান যে কোন শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে জ্যোতিষিকগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রাজ্যাভিষেক রাজার জীবনের একটী প্রধান ঘটনা,—অনেক সময়েই তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ ইহার উপরই নির্ভর করে। কাজেই শুভদিন ব্যতীত এ উৎসব কিছুতেই সমাধা হইতে পারে না। মোগল রাজসভায় কেবল জ্যোতিষিকগণের নিমিত্তই একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। অনেক পারস্য ও হিন্দু জ্যোতিষিকের দল মোগল সম্রাটগণের মঙ্গল কামনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। হুমায়ূনের সময়ও—যখন তিনি রাজ্য ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া যশল্মীরের দুর্গম মরুপ্রদেশে পলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, সে সময়ও কতকগুলি জ্যোতিষী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আকবরের জন্ম হইলে এই সকল জ্যোতিষীগণ তাঁহার কোষ্ঠী গণনা করেন।

গণনায় নির্দ্ধারিত হইল, ৫ই জুন রবিবার (১৬৫৯ খ্রীঃ) শুভ দিন, সেই দিনই রাজ্যাভিষেকের পক্ষে প্রশস্ত। ১৬৫৮ খ্রীঃ ঔরঙ্জেব যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত গৃহবিবাদ সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই; সেইজন্যই তিনি এই পূর্ণ এক বৎসরকাল রাজ্যাভিষেক ব্যাপারের

অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেবল রাজকার্য্য পরিচালনের নিমিত্তই একটি ছোট রকমের উৎসবের আয়োজন করিয়া ২১এ জুলাই (১৬৫৮ খ্রীঃ) তিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। এতদিন পরে সেই সর্ব্বজন আকাঙ্ক্ষিত, রাজ্যাভিষেক উৎসবের আয়োজন হইল।

১২ই মে সম্রাট দিল্লীতে পদার্পণ করিলেন। খিজিরাবাদ দিল্লীরই উপকণ্ঠে স্থাপিত। সম্রাট যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই স্থানেই শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। খিজিরাবাদ হইতেই যাত্রা আরম্ভ।

এই শোভাযাত্রা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিলাম।

"Early in the morning the Im erial procession started from Khizirabad, a suburb of Delhi, where the Emperor had e camped on his return from the war. First marched the b nd, making a deafe ing clangour of kettle-drums, tambourines, big brass drums, br zen pipes and trumpets. Next came a long file of huge elephants, richly caparisoned in gold and silver, their housings being of embroidered velvet and cloth of gold, thickset with fl shing gems, with g lden bel s and silver chains jingling from their bodies. Each carried on his back an Imp rial standard of polished balls slu g from poles, as ensigns of Muslim royalty. Then were led forth a troop of choice horses, of the Persian and Arab bree , their saddles decorated with gold, and their bridles set with jewe s; and behi d them were marshalled female elephants and dromeda ies. Then marched dense columns of infantry, consisting of musketeers and rocketmen, carrying flashig blades. Behind them and girt round by a vast crowd of nobles and ministers, came the loftiest elephant of the royal stables, with a golden throne strapped to its back, on which sat the observed of all observes, the undisputed lord and master of al he surveyed Aurangazib Alamgir, Pad shah of Hind."

উদ্ধৃত অংশ হইতে শোভাযাত্রার মহিমা-গৌরব বেশ সহজেই প্রতীয়মান হয়। লাহোর ফটক দিয়া সম্রাট দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানেই শোভাযাত্রার শেষ। হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া সম্রাট দেওয়ানী-আম ও দেওয়ানী-খাসে কিয়ৎকালের নিমিত্ত বিশ্রাম করেন। এই স্থানে পারিষদবর্গ তাঁহার সম্মুখে অজস্র রজত মুদ্রা রাখিয়া যাইলেন। তিনি সেই সকল মুদ্রা দীন দরিদ্রের দুঃখ মোচনের জন্য দান করিতে আদেশ দিয়া বিশ্রামের জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

৫ই জুন উৎসবের দিন। এই দিবস দেওয়ানী-আম ও দেওয়ানী-খাস অপূর্ব্ব শোভায় সজ্জিত কর হইল। বহুমূল্য মণিমুক্তায় খচিত হইয়া অপূর্ব শোভার সৃষ্টি হইল। এ যাবৎকাল মোগল সম্রাট-গণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে সকল বহুমূল্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তৎসমুদয়ই বর্ত্তমান দেওয়ানী-আমের চারি পার্শ্ব বহুমূল্য ভেল্‌ভেটে মণ্ডিত ছিল, গৃহের মধ্যকার কতক স্থান স্বর্ণমণ্ডিত রেলি দিয়া আবদ্ধ—তাহার মধ্যে সুবিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন আজ যেন সহস্র জ্যোতিতে দীপ্তিমান। গৃহ দুইটির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য খুঁটাইয়া বর্ণনা করা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, সমগ্র মুসলমান রাজত্বকালে এমন শোভায় দিল্লী নগরী কখনও সুসজ্জিত হ নাই।

জ্যোতিষী শুনিয়া বলিলেন, সূর্য্যোদয়ের প তিন ঘণ্টা ১৫ মিনিট কাল অতীত হইল, তবে অভি-ষেক কার্য্য আরম্ভ হইবে। অসংখ্য দর্শক উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই শুভ মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময় উপস্থিত হইলে সম্রাট আনন্দ কোলাহলের মধ্যে দেওয়ানী আমের সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। মুহূর্ত্তে অম চতুর্দ্দিক হইতে জয়োল্লাসের বিকট ধ্বনিতে গৃহ প হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বাদ্যের ম স্বরে রাজভবনে এক অপূর্ব্ব হর্ষ ফুটিয়া উঠিল।

একজন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা একটি উচ্চ মঞ্চের উ দাঁড়াইয়া সুস্পষ্ট স্বরে ভগবানের স্তুতিগান করি খুতবা (khutba) পাঠ করিলেন। খুতবা অং সম্রাটের নাম এবং সম্মান সাধারণের সম্মুখে প্র করা। এতৎসহ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাটগণের গুণকাহিনী কীর্ত্তিত হইত। এই সময় দর্শকগণ বক্তাকে তাঁহাদের সমর্থানুযায়ী উপহারাদিও প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত সম্রাটের নামেও অসংখ্য মণিমুক্তাদি সভা গৃহের চতুষ্পার্শ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত হইত। সম্রাটের পার্শ্বচরগণ এই সকল মণিমুক্তা গ্রহণ করিতেন। তাঁহারা মুহুর্মুহু সম্রাটের জয়গান করিয়া দর্শকগণকে আনন্দাতুর উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। সম্রাটও তাঁহাদিগকে খিলাত উপহার দিয়া চরিতার্থ করিতেন।

এই দিবসই নূতন মুদ্রা মুদ্রিত হইয়া সাধারণে প্রচারিত হইত। সাজাহানের সময় মুদ্রার এক পৃষ্ঠায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে কলিমা (kalimah) মুদ্রিত থাকিত, কিন্তু ঔরঙ্গজেব সে প্রথা রহিত করিয়া পারস্য ভাষায় রচিত একছত্র কবিতা মুদ্রিত করিতে আদেশ দেন। ইহার অর্থ—সুপ্রকাশ পূর্ণ-চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীজয়ী ঔরঙ্গজেব কর্ত্তৃক এই মুদ্রা পৃথিবীতে প্রচারিত হইল। অপর পৃষ্ঠায় রাজধানীর নাম—সাল এবং সম্রাটের সম্পূর্ণ পরিচয়—আবদুল মুজাফার মহিউদ্দিন মহম্মদ ঔরঙ্গজেব বাহাদুর আলামগীর পাদশাহ গাজী—এই কয়েকটী কথা মুদ্রিত হইত।

প্রত্যেক প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণের নিকট তাঁহার এই অভিষেক সংবাদ প্রেরিত হইল। এই সকল কার্য্যে দেওয়ানী আমে প্রায় দুই ঘণ্টা ৪৮ মিনিটকাল অতিবাহিত হইল।

ইহার পর তিনি অন্তঃপুরে গমন করিলেন। এখানেও একটী ছোট রকমের সভার অনুষ্ঠান হইল। রাজকুমারীগণ এবং উচ্চবংশীয় সভাসদ-গৃহিনীগণ এই সভার অনুষ্ঠাত্রী। এই স্থানে তাঁহারা সম্রাটের মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহাকে বহুবিধ মণিমুক্তাদি উপহার প্রদান করিলেন, সম্রাটও ইহাঁদিগকে মধুর বাক্যে এবং উপহারাদির দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। তাঁহার ভগ্নী রসিনারা বেগম সম্রাটের প্রতি তাঁহার আজীবন অনুকম্পা প্রযুক্ত পঞ্চলক্ষ মুদ্রা উপহার পাইলেন। তাঁহার চারি কন্যার মধ্যে প্রত্যেককে চারি, দুই, ১·৬, ১·৫ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিলেন।

অন্তঃপুরের কার্য্য সমাধা হইলে সম্রাট দেওয়ানী খাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। কেবল কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীই প্রবেশ অধিকার পাইয়াছিলেন। এই সভায় এইবার উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইল। তাঁহার চারি পুত্র যথাক্রমে তিন, দুই, দুই ও এক লক্ষ মুদ্রা উপহার প্রাপ্ত হই-লেন। এতদ্ব্যতীত সভাসদবর্গ, কর্ম্মচারীবৃন্দ, রাজ-কবি ও শ্রেষ্ঠ গায়কবর্গ প্রভৃতিদিগকেও নানাবিধ পারিতোষিক প্রদত্ত হইল।

এই উৎসব উপলক্ষে কয়েকদিন আনন্দ উল্লাসের স্রোত বহিল, রজনীতে যমুনার উভয় তীর বিচিত্র আলোকমালায় সজ্জিত করা হইল। সমগ্র রাজধানী যেন আলোক তরঙ্গে ভাসিতে লাগিল। কেবল আতসবাজীর মধ্যেই যে কত মুদ্রা পুড়িয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কথায় এমন উৎসব দিল্লী নগরীর অদৃষ্টে ঘটে নাই। মোগল রাজত্বে এমন ধূমধাম ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ।

শ্রীগুরুদাস আদক।

সার্থক।

তোমা লাগি এ জীবন সার্থক আমার,
সুখ দুঃখ বেদনার লজ্জা ভয় বাসনার
কামনার সাধনার স্বাদ,
পূর্ণ করি একেবারে পাইনু এবার
জনম সফল নাথ করিলে আমার!

তোমা লাগি প্রিয়তম হ'ল মোক্ষলাভ,
বাসনার বিসর্জ্জন নাহি কামনার ধন
তৃপ্ত মন, রিক্ত অপরাধ
পরাহত চিরতরে ক্ষণিক প্রভাব,
কর্ম্মবন্ধ ছিন্ন সব, নীরব বিলাপ!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

নরক।

আমি একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যেন এক যন্ত্রণাক্লিষ্ট আত্মা স্বগত বলিতেছিল :—

"এই ভয়ানক অন্ধকারের মধ্যে যদিও কিছুই দেখা যাইতেছে না, তবুও যেন কেন মনে হইতেছে, যে এই মুহূর্ত্তে আমি এই স্থানে একা নহি, যেন আর কেহ এই স্থানে বর্ত্তমান আছেন।"

প্রকাশ্যে বলিল "এখানে কি কেহ. আছেন, আমার কথা কি কেহ শুনিতেছেন ?"

পাপনির্ম্মুক্ত অভিভাবক ভারপ্রাপ্ত কোন আত্মা উত্তর দিলেন "আমি তোমার সঙ্গে তোমার অতি-নিকটেই রহিয়াছি।"

প্রথম আত্মা বলিল "আমি কথা বলিবার একটু অনুমতি পাইব কি ? কতকাল হইল, কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলি নাই ! আর যে কখন কথা বলিব সে আশাও ছিল না। আপনি যিনিই হউন, আমাকে আর একা ফেলিয়া যাইবেন না, আমি এই চিন্তাভার আর একাকী বহন করিতে পারি না। আমার সর্ব্বশরীর অথবা সমগ্র আত্মাটি চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছে, মস্তিষ্ক হইতে অনলশিখা উত্থিত হইতেছে। এই অবিরাম মানসিক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় আমাকে বলিয়া দিন।" অভিভাবক আত্মা বলিলেন" আমি এবিষয়ে তোমাকে আমার যথাসাধ্য সাহায্য করিব। কিন্তু উদ্ধারের উপায় তোমার নিজেরই হস্তে রহিয়াছে। অনুতাপের অশ্রু দ্বারাই কেবল মানসিক যন্ত্রণার অনলশিখা নির্ব্বাপিত করা যায়। তোমার যন্ত্রণার কথা সবিশেষ আমাকে বল।"

"আমার যন্ত্রণার কথা ! বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায় না। নিজের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা দ্বারা যেন আমি অহর্নিশি নিঃশেষপ্রাপ্ত হইতেছি। প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘৃণা যেন তীব্রতর হইতেছে। নিজের বিচারে অপরাধী প্রতিপন্ন আত্মার, যন্ত্রণার পরিমাণ, অন্য কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

এপর্য্যন্ত আমার যন্ত্রনার কথা লোকের অভাবে কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবারও সুযোগ পাই নাই, পাপ স্বীকারও করিতে পারি নাই। এই অন্ধকার স্থানে আমি সম্পূর্ণ একেলাই পড়িয়া রহিয়াছি, এক দিনও একবিন্দু শান্তি অথবা বিশ্রাম লাভ করি নাই। আমি এ যে কোথায় আছি এবং আমার চারিদিকেই বা যে কি রহিয়াছে তাহাও জানি না। বাসনার দংশনে একান্ত প্রপীড়িত হইয়াছি, কিন্তু বাসনার পরিতৃপ্তি শরীরীরই সম্ভব, অশরীরীর নহে ; কাজেই অশরীরী আত্মা, আমি অনর্থক দ্বিগুণ কষ্টভোগ করিয়াছি। আমি ক্রমাগতই যেন কাহার যন্ত্রনা-ব্যঞ্জক অস্ফুট কাতর এবং বিলাপধ্বনি শুনিতেছি সে শব্দ যেন বহু দূর হইতে আসিতেছে ; কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সে শব্দ কিসের ? আমার ন্যায় হতভাগ্য দুর্বৃত্ত আত্মাদের ক্রন্দনধ্বনি কি? এই স্থানই বা এইরূপ নির্জ্জন ও অন্ধকারময় কেন ?"

অভিভাবক আত্মা বলিলেন "তোমার এবং তোমার সমভাবাপন্ন আত্মাদের পক্ষেই এই স্থান ভয়ানক বোধ হয়। তোমাদের চতুস্পার্শস্থিত দূষিত বায়ু ঘন কুজ্ঝটিকার ন্যায় আলোকরাশি প্রচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ইহা দূরীভূত না হইলে তুমি আলোক দর্শনে সক্ষম হইবে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথায়ও অন্ধকার নাই, কিন্তু অনেকে আলোক দেখিতে অক্ষম বলিয়া, এই স্থান তাহাদের নিকট অন্ধকার বোধ হয়। পৃথিবীতে ও ঠিক এই প্রকারেই মনেবগণ, স্বীয় চক্ষু, পার্থিব বস্তুর দিকে সংসক্ত রাখে বলিয়াই, উজ্জ্বল, চিরবিরাজমান সত্যকে দেখিতে পায় না। কিন্তু সে কথা থাক্, আমি তোমার কথায় বাধা দিয়াছি, তুমি নিজের অবস্থা বলিয়া যাও।"

"আমার বলিবার আর বেশী কিছু নাই। পাপ স্বীকার করিলে হয়ত বা যন্ত্রণার কিছু লাঘব হইবে

এই মনে করিয়াই আপনাকে নিজের কথা বলিতে চাহিতেছি।

পৃথিবীতে অবস্থান কালে আমি জীবনের সদ্ব্যবহার করি নাই। আমারই দুর্ভাগ্যবশতঃ এক ধনাঢ্য পরিবারে আমার জন্ম হইয়াছিল। অল্প বয়সেই আমি অগাধ ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হই। ধনকে দুর্ভাগ্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমি অন্যায় করিতেছি না। বাস্তবিকই, ইহা, আমার পক্ষে অভিসম্পাত স্বরূপ হইয়াছিল। ধনী বলিয়া, সমাজের সর্ব্বত্রই আমার আদর ছিল, আমার কোন আকাঙ্ক্ষা ও অভাবই কখন অপূর্ণ থাকিত না। পৃথিবীতে, এমন কোন আমোদ প্রমোদ, অথবা সুখ ছিল না যাহা আমার পক্ষে অসম্ভব হইতে পারিত ; কোনই বাসনা ছিল না, যাহা আমি পূর্ণ করিতে না পারিতাম। আমার পাপাসক্তিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; আমি কত লোকেরই সর্ব্বনাশ করিলাম। উৎসবকালে, গৃহসজ্জার জন্য, সযত্নে আহরিত সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্পরাশি, যেমন পর দিবস শুষ্ক অবস্থাপন্ন হইয়া, আবর্জ্জনা-স্বরূপ, গৃহ প্রাঙ্গণে নিক্ষিপ্ত হয়, আমিও ইহাদের সম্বন্ধে তাহাই করিতাম। এই ভাবে, দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল।

* * * * * *

একদিন হঠাৎ সেই পাপজীবন, শমনের ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তিত হইল। তাহার পর আমি এই ভয়ানক স্থানে আনীত হইলাম। এখানে আমার কি দুরবস্থা ! দুরবস্থার ও চরম সীমা। পৃথিবীতে আমি যে সকল দরিদ্রদের দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছি, আমার অবস্থা তাহাদের অপেক্ষা সহস্র গুণে শোচনীয়। আপনি কি আমাকে, আমারই চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন ! আমি নিজকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহা আপনাকে বলিতেছি। আমার আত্মার আচ্ছাদন শরীর না থাকাতে সে এখন আর তাহার কুরূপ ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না। নগ্ন আত্মা তাহার কদর্য্যরূপের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। শরীর নাই, কিন্তু আত্মা আছে ; আমার প্রত্যেক পাপকার্য্য ও পাপচিন্তা আত্মাকে অবলম্বন করিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক আমার বোধ হইতেছে যে এক একটা পাপকার্য্য ও পাপ-চিন্তা পরস্পর গাত্রে সংলগ্ন থাকিয়া আত্মার সম্পূর্ণ দেহটি গঠন করিয়াছে। কাজেই আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের অবস্থার কথা ভুলিতে পারি না। ক্ষণে ক্ষণে আবার বিদ্যুতের চমকের ন্যায়, এক একটা পাপ, যেন আমার চক্ষের সমক্ষে অত্যুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, আমি তাহা দেখিয়া ঘৃণা, লজ্জা ও ক্ষোভে অভিভূত হইতেছি। নিজের নিকট হইতে ও দূরে পলায়ন করিতে পারিনা, কাজেই, আমার আর কিছুতেই এই যন্ত্রণার হাত হইতে উদ্ধার নাই। ঘৃণা, আমার মস্তিষ্ক দহন করিতেছে। এক এক সময়ে নিজের অবস্থা এতই অসহনীয় বোধ হয় যে, আমি যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের নিকট বিলাপ করি এবং তাঁহাকে আমার চিন্তাশক্তি বিনাশ করিবার জন্য সকাতরে প্রার্থনা করি। আত্মা অমর, আমার এই চিরস্থায়ী জীবন অবিনাশী আত্মা, ইহারও বিনাশ সাধন করিয়া দিবার জন্য কতবার প্রার্থনা করিয়াছি, কেননা তীব্র অনুশোচনারূপ যন্ত্রনা হইতে মুক্তিলাভের ইহাই একমাত্র উপায়।

অভিভাবক আত্মা বলিলেন "ভ্রাতঃ, আশীর্ব্বাদ করি, করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায়, তুমি অচিরেই মুক্তিলাভ কর। তোমার দণ্ড কঠিন হইলেও, ইহা বাস্তবিক পক্ষে দণ্ড নহে, কিন্তু তোমারই কর্ম্ম ফল। স্বকৃত দুষ্কর্ম্ম, আত্মার চক্ষের সমক্ষে এইভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান না হইলে, সে কি প্রকারে, নিজের অপরাধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবে, কি প্রকারেই বা তাহার নিজের পাপজীবনের প্রতি ঘৃণা আসিবে, কি প্রকারেই বা অনুতাপের উদয় হইবে ? আমি তোমার আত্মার কল্যাণের জন্য সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেছি। তোমার নিজের আত্মা যখন স্বীয় দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে, তখন মুক্তি নিকটেই সুতরাং মন হইতে নিরাশা দূর কর।

"আমি আপনার আশ্বাসে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আমার জননী আমরণ আমার আত্মার

কল্যাণের জন্য সানুনয়ে ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আর কেহই তাহা করে নাই। আমার এখনও বেশ মনে পড়িতেছে, শৈশবে তিনি কেমন করিয়া প্রত্যহ আমাকে দিয়া উপাসনা করাইতেন।

তিনি ইহলোক ত্যাগ করার পর হইতে, আমার উপাসনার কথা মনেই আসিত না। দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ হইবার পরে তাঁহাকে স্মরণ করিতেও আমার সাহস হইত না। আমাকে কি আপনি বলিতে পারেন, তিনি আমার বর্ত্তমান দুর্গতির অবস্থা অবগত আছেন কিনা এবং থাকিলে তাঁহার কাতর প্রার্থনা এখনও আমার কল্যাণার্থে পরমেশ্বরের চরণে পৌঁছিতেছে কি না?"

অভিভাবক আত্মা বলিলেন "নিঃসন্দেহ; তিনি এই মুহূর্ত্তেও তোমার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।"

ক্লিষ্ট আত্মা বলিল "আমি প্রার্থনার উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম, প্রার্থনার কথা শুনিলে, পরিহাস করিতাম। মৃত্যুর পরে যে ভবিষ্যত-জীবন থাকিতে পারে, সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না, বর্ত্তমানই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তথাপি কেন যেন আমি প্রকৃত পক্ষে কখন সুখী হই নাই। তখন যদি জানিতাম, মৃত্যুর পরপারে দুরাচার ব্যক্তি-দের এইরূপ নরকযন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে বুঝি জীবনের অন্যপ্রকার ব্যবহার করিতাম। পৃথিবীতে এখনও ত আমারই ন্যায় কতলোক, মৃত্যুর পরেও যে জীবন আছে, সে কথা জানে না। জানে না বলিয়াই ত পাপে মগ্ন থাকে, আমার অবস্থা কেহ যদি তাহাদের জানাইয়া দিত!"

অভিভাবক আত্মা বলিলেন, "পৃথিবীর নরনারী সকলেই নরকের নাম শুনিয়াছে, কিন্তু নরক যে স্থানবিশেষ নহে, অবস্থা বিশেষমাত্র, এবং প্রত্যে-কেই যে নিজের জন্য স্বর্গ অথবা নরক সৃজন করিতেছে, ইহাই তাহারা উপলব্ধি করে না। আইস আমরা উভয়ে তাহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।"

পাপ অন্ধকারে পথহারা এই আত্মা, মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মার সহিত একত্র হইয়া অনন্ত জীবনের মূলাধার পরমেশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। অনতিবিলম্বেই সে তাহার মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন অনুভব করিল। সহানুভূতি শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইবামাত্র, ভীষণ পাপ অনুভূতি যন্ত্রনার একাধিপত্যের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইল। যতই মুক্ত আত্মার প্রার্থনায় সে তন্ময় হইতে লাগিল, ততই তাহার নিজের কথা সে বিস্মৃত হইল, সঙ্গে সঙ্গে আত্মার কদাকার রূপেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। অন্ধকার ও কুরূপ ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া, প্রথমতঃ ঈষৎ আলোকের সঞ্চার, ও পরে তাহা উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া প্রার্থনা সমাপ্ত হইবার সময়ে আত্মা এক মধুর উজ্জ্বল আভাতে উদ্ভাসিত হইল।

আত্মা বলিয়া উঠিল "আমার বোধ হইতেছে যেন আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, দূরে, সুদূরে যেন আলোকরেখা দেখিতেছি। যদি আলোকরেখাটিকে অনুসরণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আর এই ভীষণ অন্ধকারে পড়িয়া থাকিতে হইত না। মা আমার, তোমার পাপী পুত্রের জন্য প্রার্থনা কর। পরমেশ্বরের নিকট তাহার সকল পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর, আলোকের পথে যাইবার জন্য অনুমতি লও। আমি ত নিজের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারি না; আমি ত অগ্রসর হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু পারি কই? দুর্ব্বল পদদ্বয় আমার ভারবহনে অসমর্থ। পূর্ব্বের কলঙ্কিত জীবন যেন পশ্চাত হইতে আমাকে সজোরে আকর্ষণ করিতেছে। মা, সাহস দেও, বলো, ভয় নাই।

* * * * * *

চতুর্দ্দিকে এ কি আলোকরাশি! প্রভো, পর-মেশ্বর তুমি ধন্য, তোমার করুণা ধন্য! এ কি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে? যেন আমাকেই অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিতেছে? একি! এ যে আমারই জননা। মা, মা, মা গো!"

দূর হইতে স্বর্গবাসীরা সুমধুর স্বরে গাহিতেছে শোনা গেল!—

"তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে, মলিন মর্ম্ম মুছায়ে,
(তব) পুণ্য-কিরণ দিয়ে যায় সবার
মোহ আঁধার ঘুচায়ে।"

আমার এই সময়ে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। পতিত আত্মার কথা স্মরণ হইল। সে বলিয়াছিল, "তখন (পৃথিবীতে অবস্থান কালে) যদি জানিতাম, মৃত্যুর পরপারে দুরাচার ব্যক্তিদের এইরূপ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে বুঝি জীবনের অন্য প্রকার ব্যবহার করিতাম। পৃথিবীতে এখনও ত আমারই ন্যায় কত লোক মৃত্যুর পরেও যে জীবন আছে, সে কথা জানে না। জানে না বলিয়াই ত পাপে মগ্ন থাকে, আমার অবস্থা কেহ যদি তাহাদের জানাইয়া দিত!"

আমিই একা যখন তাহার ইচ্ছা অবগত আছি, তখন আমার সকলকে এ কথা জানান কর্ত্তব্য বোধ করিয়া আমি আমার স্বপ্ন বৃত্তান্ত জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযামিনী সেন।

ইতর প্রাণীর সন্তান স্নেহ।

আকৃত-গত সাদৃশ্যে পশু ও মানবের মধ্যে যে খুব একটা নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা একরূপ প্রমা-ণিত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বানরকে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিয়াও সন্তুষ্ট নহেন, আধুনিক পণ্ডিতগণ বানরকে তাহাদের জ্ঞাতি ভাই বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাদের সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা প্রমাণিত হইয়া গেলে বানরের যে কৌলিন্য বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাদের এই কৌলিন্য বৃদ্ধিতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং পশুতে এবং মানবেতে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, এই ব্যবধান যে কোন কালেই দূর হইবার নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহারা মানবের উৎকৃষ্ট মানসিক বৃত্তি-গুলির দোহাই পাড়িতেছেন। তাহাদের বিশ্বাস স্নেহ, প্রেম, দয়া প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তিগুলি মানবেরই এক-মাত্র নিজস্ব সম্পত্তি—ইতর প্রাণীতে এই বৃত্তিগুলির কিছুমাত্র বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং আকৃতগত সাদৃশ্যে পশুদের সহিত কোথাও একটু মিল লক্ষিত হইলেও এই সকল উচ্চতর মানসিক বৃত্তিতে মানব যে চিরকালই ইতর প্রাণীর উপর রাজত্ব করিবে সে বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সত্যই কি তাহাদের এ বিশ্বাস একেবারে অভ্রান্ত? ইহা কি তাহাদের পশু-জীবন পর্য্যবেক্ষণের অভাবের ফল নহে? ইতর প্রাণীতে কি এই সকল উচ্চতর বৃত্তি কিছুমাত্র বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই?

আমরা নিম্নে ইতর প্রাণীর মাতৃ-স্নেহের কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে ইতর প্রাণীর সন্তান স্নেহের গভীরতার কতকটা পরিচয় পাইব।

ইঁদুরকে আমরা নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী বলিয়াই গণ্য করি। এই নগণ্য প্রাণীটির মধ্যে মাতৃ-স্নেহের গভীরতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। বন্য ইঁদুর নকুল অপেক্ষা আর কাহাকে ভয় করে? নকু-লের সম্মুখে পড়িলে ইঁদুরের ধূর্ত্তামি চঞ্চলতা কোথায় চলিয়া যায়। চলিবার এমন কি নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত থাকে না, মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু সন্তানের বিপদ সম্ভাবনায় ইহাদের প্রাণে কোথা হইতে বল ও সাহসের সঞ্চার হয় দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইঁদুর-মাতা সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া নকুলের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অনেক সময় লড়াইয়ে হারিয়া নকুল মহাশয়কে নিজের প্রাণ রক্ষার্থ পলায়ন করিতে হয়। সন্তানের প্রতি স্নেহই যে ইহাদের

হৃদয়ে এই সাহস এবং বল সঞ্চার করে তাহাতে কি সন্দেহ আছে ?

গাভী যখন ছানা প্রসব করে, তখন এমন যে নিতান্ত নিরীহ প্রাণীটি সেও কিরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা আমরা সকলেই দেখিয়া থাকিব। এক মুহূর্ত্তের জন্যও বৎসকে চোখের আড়াল হইতে দেয় না—সে অবস্থায় গাভী ব্যাঘ্রের সঙ্গে লড়াই করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হয় না। কত সময় গাভী ব্যাঘ্রের সঙ্গে লড়াই করিয়া নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও নিজের বৎসকে রক্ষা করিয়াছে, এরূপ উদাহরণ নিতান্ত বিরল নহে ? কোন আকস্মিক ঘটনায় গো-বৎসের মৃত্যু হইলে অথবা বিক্রয়ের জন্য হাটে পাঠাইয়া দিলে গো-মাতার হৃদয়ে যে গভীর দুঃখ হয়, তাহা কি তাহাদের কাতর ধ্বনিতে প্রকাশ পায় না ? যাহারা গরু পালন করেন, তাহারা সকলেই জানেন, বৎসহারা গাভীর ডাকের মধ্যে কেমন একটা কাতরতা থাকে।

বিড়ালের মাতৃ-স্নেহ প্রসিদ্ধ। বিড়াল মাতা ইহাদের সন্তানগুলিতে কত যত্নে পালন করে, তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। কত যত্নে ইহাদের গা চাটিয়া চাটিয়া ইহাদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখে ! স্তন্যদানেই ইহাদের সকল কর্ত্তব্য শেষ হয় না, ছানাগুলিকে জীবন-সংগ্রামের জন্য তৈরী করিয়া তুলিবার ভারও বিড়াল মাতারই উপরে। ছানাগুলি একটু বড় হইলেই ইহাদের পাঠ আরম্ভ হয়—গুরু মহাশয়ের বেত্রের ভয় ইহাদের নাই, স্নেহময়ী মাতাই ইহাদের শিক্ষক। ইহাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বিষয় শিকার ধরিবার প্রণালী আয়ত্ব করা। বিড়াল মাতা তাহার দীর্ঘ মোটা লেজটি ঘুরাইয়া দোলাইয়া শিকার ধরিবার উৎসাহ জন্মায়, ছানাগুলি কি মহা উৎসাহে এই পাঠ গ্রহণ করে, তাহা আমরা সকলেই দেখিয়া থাকিব। এই শিক্ষায় ছানাগুলির হাত বেশ একটু পাকা হইয়া আসিলেই ইহাদের প্রমোশন হয়। তখন ইহাদের উচ্চ শিক্ষার সময় ; বিড়াল মাতা বন ঝোপ জঙ্গল হইতে সাপ, ব্যাং, ইঁদুর, আরসুলা প্রভৃতি জন্তু ধরিয়া আনিয়া ছানাগুলির প্র্যাক্‌টিকেল শিক্ষার আয়োজন করে। প্রথমতঃ একটা ইঁদুর মারিয়া ছানাগুলির সম্মুখে ছাড়িয়া দেয় ; নিজে নিকটে কোথাও এক পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এইরূপে মরা ইঁদুর নিয়ে ইহাদের শিক্ষা কিছুদিন চলে। যখন এ কাজেও ইহাদের হাত পাকিয়া আসে, তখনি ইহাদের যথার্থ শিক্ষা আরম্ভ হয়—তখন আর লেজও নয় মরাও নয় তখন ইহাদের জ্যান্ত ইঁদুর, জ্যান্ত ব্যাং আরসুলা প্রভৃতির সহিত পরিচয় হয়। বিড়াল মাতা জ্যান্ত প্রাণীগুলি ধরিয়া ইহাদের সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া নিজে পাশেই এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ছানাগুলি এই সাপ, ব্যাং ইঁদুরগুলি নিয়া ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি আরম্ভ করিয়া দেয়। যখনি একটু সুযোগ বুঝিয়া ইঁদুর ব্যাংগুলি পালাইবার উপক্রম করে, অমনি বিড়াল মাতা ছুটিয়া আসিয়া ধরিয়া ফেলে। আবার ছানাগুলির সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া নিজে তেমনি এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। যতদিন না ছানাগুলি এ কাজে দক্ষতা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন বিড়াল মাতা একান্ত ধৈর্য্যের সহিত ছানাগুলিকে এই ভাবে শিক্ষা দিতে থাকে।

শুধু বিড়াল নয়, বিড়াল জাতীয় সকল জন্তুর মধ্যেই পশু মাতার মাতৃ-স্নেহের এইরূপ গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। বাঘ, সিংহ, প্রভৃতি জন্তুগুলিও এই সতর্কতা ও যত্নের সহিত ইহাদের সন্তানগুলিকে পালন করে।

ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ কাহিনীতে বানর পরিবারের মনোরম চিত্র পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। শিম্পাঞ্জি, গরিলা ওরাংউটান্ (বনমানুষ) প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর বানরগুলি সাধারণতঃ নিবিড় ও দুর্গম অরণ্যের মধ্যে তাহাদের স্ত্রী পুত্রের সহিত দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। ইহারা কেহই খোলা স্থানে সন্তান প্রসব করে না— সন্তান প্রসবের সময় হইলেই ইহারা বৃক্ষের অত্যুচ্চ শাখায় লতাপাতা ও সরু ডাল দ্বারা এক প্রকারের বাসা নির্ম্মাণ করে। রাত্রিতে গরিলা মাতা সন্তানকে বক্ষে লইয়া নিদ্রা যায় এবং পুরুষ গরিলাটি সমস্ত রাত্রি ইহাদের প্রহরীরূপে নিকটে শাখাগ্রে উপবিষ্ট থাকে। ইহাদের প্রধান শত্রু চিতা বাঘ, গরিলা শিশুর মাংসের লোভে সর্ব্বদাই নিকটে নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু পুরুষ গরিলার তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইয়া ছানাগুলিকে চুরি করিবার সুবিধা প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। অনেক সময়েই গরিলার হাতে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। শিম্পাঞ্জি শিশুও ইহাদের পিতামাতা কর্ত্তৃক তেমনি সতর্কতার সহিত রক্ষিত হয়।

ওরাংউটান্ নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। শৈশবাবস্থায় দীর্ঘকাল পঙ্গু অবস্থায় একমাত্র মাতার স্নেহের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা জীবন যাপন করে। ওরাংউটান্ মাতা দীর্ঘ বলিষ্ঠ শিশুগুলিকে বহন করিয়া আহার অন্বেষণার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও ইহারা একাকী হইলে ইহাদের চীৎকার রোলে নির্জ্জন বন ধ্বনিত হইয়া উঠে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহাতে ওরাংউটান মাতার ধৈর্য্যচ্যুতির বিন্দুমাত্র লক্ষণও প্রকাশ পায় না।

মর্কটজাতীয় বানরের মাতৃ-স্নেহ গরিলা প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর বানর হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। ছানাগুলি বড় হইয়াও মাতার স্তনে ঝুলিয়া ঝুলিয়া ইহারা দুগ্ধপান করে এবং তদবস্থায়ই মর্কট মাতা ছানাগুলিকে বহন করিয়া খাদ্যান্বেষণ করিয়া বেড়ায়। একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ তাহার গ্রন্থে মর্কট মাতার সন্তান-স্নেহের গভীরতার একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য জিব্রাণ্টা দ্বীপের বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি এক দিবস দুইটি বানরকে একটি বৃক্ষ শাখায় সন্তান ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। ঠাকুরমা যেমন তাহাদের আদরের নাতি কিম্বা নাত্নীকে আনন্দিত মনে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া থাকে, ইহাদের মুখে চোখে তেমনি একটা আনন্দ ও গর্ব্বের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কখনো কখনো ইহারা চীৎকার করিয়া ইহাদের হৃদয়ের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছিল। নিকটেই পুরুষ বানরটি বসিয়াছিল, সেও চীৎকার করিয়া ইহাদের আনন্দে যোগদান করিত ; কখন কখন বানর-মাতার ক্রোড় হইতে শিশু বানরটিকে নিজের ক্রোড়ে স্থাপিত করিয়া স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ইহার দিকে চাহিয়া থাকিত।

বেশী দিনের কথা নয়, দু বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় বানরের সন্তান বাৎসল্যের গভীরতা পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা আমাদের ঘটিয়াছিল। একটা আম বাগানে একদল বানরের আড্ডা ছিল। একদিন একটি বানরীকে একটি মৃত বৎস ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। আমরা তাড়া করিলে বানরী সযত্নে মৃত ছানাটিকে বহন করিয়া পলায়ন করিল। তৎপর দিনও সেই স্থানেই বানরীটিকে তাহার সেই মৃত বৎসটিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলাম। এইরূপ তিন দিন পর্য্যন্ত বানরী তাহার মৃত শিশু সন্তানটিকে ক্রোড়ে করিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল। তারপর যখন মৃতদেহ পচিতে আরম্ভ হইল, ইহার ভিতর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল, তখন সে ইহা ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ঘটনাটি আমাদের অনেকেরই চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়াছিল।

শৃগালের ধূর্ত্তামি লোকপ্রসিদ্ধ ; সন্তানের শুভ কামনায়ও ইহারা তেমনি ধূর্ত্তামির পরিচয় প্রদান করে। ফাল্গুন মাসের শেষভাগে ইহাদের ছানা হয়, কিছুদিনের মধ্যে ছানাগুলি গর্ত্তের বাহিরে আসিতে আরম্ভ করে। তখন শৃগাল মাতা ছানাগুলিকে শিকারের প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে ; সমস্ত দিন গর্ত্তের পাশে ছানাগুলিকে লইয়া খেলা করে কিন্তু দৃষ্টিটি সর্ব্বদাই চারিদিকে ঘূরিয়া বেড়ায়। বিপদের আশঙ্কা জন্মিবামাত্র দলবল সহিত গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। অনেক সময়ই দেখা যায় পূর্ব্বদিন শৃগালের গর্ত্ত দেখিয়া আসিয়া পরদিন ছানা চুরী করিতে গেলে শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিতে হয়। গর্ত্তের নিকটে মানুষকে দেখিতে পাইলেই শৃগালের তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে আর দেরী হয় না। তথাপি যদি গর্ত্ত খুড়িয়া ছানা চুরি করিবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে আর শূন্য হাতে ফিরিতে হয় না কিন্তু দা কোদালি আনিবার জন্য বাড়ীতে গেলেই ফিরিয়া আসিয়া শূন্যগর্ত্ত ব্যতীত আর

কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। শৃগাল-মাতা একটু সুযোগ পাইলেই একটি একটি করিয়া ছানাগুলিকে অন্যত্র, 'পার' করে। বিপদের আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্ব হইতেই শৃগালমাতা অন্যত্র একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখে, সেই গর্ত্তের মধ্যেই ছানাগুলিকে আনিয়া লুকাইয়া রাখে। ছানাগুলির জন্য পুষ্টিকর আহার সংগ্রহ করিবার জন্যই কি ইহারা কম চেষ্টা করে? যাহারা হাস, মুরগী প্রভৃতি পালন করেন তাহারাই জানেন, শৃগাল ইহাদের লোভে কেমন চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কুকুরের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াও ইহারা ছানার জন্য কুকুর ছানা সংগ্রহ করে।

শশক বেচারা একটি নিতান্ত নিরীহ প্রাণী। ছানাগুলিকে রক্ষার জন্য ইহাদের সর্ব্বদা কত সতর্ক থাকিতে হয়। সন্তান প্রসবের সময় হইলেই ইহারা স্থান নির্ব্বাচনে নিযুক্ত হয়, শৃগালের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইবার জন্য একটি খুব নিভৃত স্থান বাছিয়া লয়। গর্ত্ত তৈরী হইলে নিজদেহের লোম সযত্নে বিছাইয়া তাহাতে সন্তান প্রসব করে। শশক-মাতার সমস্ত সময় ছানাগুলির নিকট বসিয়া থাকার সুবিধা হয় না, খাবার অন্বেষণের জন্য মাঝে মাঝে বাহিরে যাইতে হয়, কিন্তু গর্ত্ত হইতে বাহির হইবার সময় গর্ত্তের মুখটি মৃত্তিকাদ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিতে কখনো ভুলিয়া যায় না।

যাহারা আলিপুরের চিড়িয়াখানা গিয়াছেন তাহারা নিশ্চয়ই ক্যাঙ্গারু-মাতার বক্ষস্থলের বৃহৎ থালিটি দেখিয়াছেন। এই থালিটি ক্যাঙ্গারু-শিশুর কত আরামের স্থল! ক্যাঙ্গারু-মাতা বৃহৎ বৃহৎ ছানাগুলিকেও তাহার থলির মধ্যে পুরিয়া চলিতে একটুকু কষ্ট বোধ করেনা। বিপদের আশঙ্কা জন্মিলেই ক্যাঙ্গারু-শিশু ছুটিয়া আসিয়া মাতার থালিটির ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। শিকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও ক্যাঙ্গারু-মাতা ছানাকে থালিতে পুরিয়া সুদীর্ঘ লম্ফে ছুটিতে থাকে—ছানাকে বিপদের মুখে ফেলিয়া নিজে ভারমুক্ত হইয়া ইহারা কখন পলায়ন করে না। অনেক সময় ছানাকে থালিতে ধরিয়াই শিকারীর সহিত লড়ায়ে প্রস্তুত হয়। বিপদের আশঙ্কা না থাকিলেও ইহারা মাতার বৃহৎ থালিটির ভিতর আরামে বসিয়া তৃণ ভক্ষণ করে। ইহাতে ক্যাঙ্গারু-মাতার অসহিষ্ণুতা কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। ক্যাঙ্গারু-শিশু মাতৃগর্ভ হইতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়। অন্ধ লোমশূন্য অবস্থায় তখন ইহাদের অনেকটা ইঁদুর ছানার ন্যায় দেখায়, আয়তনেও ইহারা ইঁদুর ছানা অপেক্ষা বড় হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর ক্যাঙ্গারু-মাতা তাহার এই 'কড়ে' আঙ্গুলের মতো ছানাটিকে সযত্নে নিজের থালিটিতে তুলিয়া লয়। তখন ইহার স্তন্যপানেরও শক্তি থাকে না—ক্যাঙ্গারু-মাতা নিজে বক্ষস্থলের মাংসপেশীর শঙ্কোচনদ্বারা একটু একটু করিয়া সন্তানের মুখে দুধ চালিয়া দেয়। এইরূপে মাতার যত্ন চেষ্টায় একটু একটু দুগ্ধ পান করিয়া ইহারা ক্রমে বড় হইয়া উঠে। বড় হইয়াও ছানাগুলি মাতার কেমন আদরে কাটায়; আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গেলেই তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

উদ্-মাতার (otter) সন্তান শিক্ষা দর্শন করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। উদ অত্যন্ত মৎস্য প্রিয় এবং সেই মৎস্য ইহারা নিজের চেষ্টায় ধরিয়া থাকে। সন্তানগুলি একটু বড় হইতে আরম্ভ হইলেই উদ-মাতা ইহাদের এই শিক্ষায় দিক্ষীত করেন। মৎস্য শিকার করিতে হইলেই সাঁতার কাটায় খুব নিপুন হওয়া দরকার মাতার চেষ্টায় উদ-শিশু অল্প সময়েই এ বিষয়ে নিপুন হইয়া উঠে। প্রথমতঃ ছানাগুলি জলের নিকট আসিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক থাকে কিন্তু উদ-মাতা যখন ঘাড়ে কামড় দিয়া জলের মধ্যে আনিয়া ছাড়িয়া দেয় তখন আর ইহাদের কিছুই বলিবার থাকে না। জলে ছাড়িয়া দিতেই ইহারা ডুবিতে থাকে; মা ও সঙ্গে সঙ্গে ডুবিতে থাকে, হঠাৎ এক সময় নীচ হইতে ঠেলা দিয়া উদ-মাতা সন্তান ডাঙ্গায় ফেলিয়া দেয়। তখনো পালাইবার যো নাই, আবার ঘাড়ে কামড় দিয়া জলে নিয়া ছাড়িয়া দেয়—তেমনি সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে ডুবিতে থাকে, আবার হঠাৎ নীচ হইতে ঠেলা দিয়া ডাঙ্গায় ফেলিয়া দেয়। এই ভাবে মাতার সঙ্গে সঙ্গে জলে উঠা নামা করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ইহাদের জলের ভয় ভাঙ্গিয়া কেমন উদ-মাতা সন্তানকে সাঁতার শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হয়। সন্তানটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া নিজে একটু দূরে চলিয়া আসে ছানাটি তো মাতার মুখ হইতে জলে পড়িয়া হাত পা ছুটাছুটি করিতে থাকে। প্রথম প্রথম হাত পা ছুটাছুটি করিয়াও জলের উপর বেশীক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে পারে না—যেমনি ডুবিতে থাকে অমনি মা ছুটিয়া আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ঠেলা দিয়া একেবারে ডাঙ্গায় ফেলিয়া দেয় আবার ধরিয়া আনিয়া জলে ছাড়িয়া এবং নিজে নিকটে ভাসিতে থাকে। এইরূপে যতদিন উদ-শিশু সাঁতার কাটিতে নিপুণ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত এই ভাবে ইহা'র শিক্ষা চলে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় একটি উদের ঘর আছে। সেখানে সাঁতার কাটিবার জন্য ইহাদের জলের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহারা সমস্ত দিন নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে জলে সাঁতার কাটিতে থাকে।

এই তো গেল নিজের সন্তনদের কথা। অনেক সময় পরের সন্তানকে পালন করিতেও পশু মাতাকে দেখা যায়। ঐ সম্বন্ধে যথেষ্ট গল্পও প্রচলিত আছে।

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন।

বঙ্গে পাঠান বিপ্লব।

বঙ্গদেশে মোগল পাদশাহ আকবরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। বঙ্গ দেশের পাঠান রাজন্যবৃন্দ সামন্ত শাসনপতিগণের সাহায্যে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন *। এই কারণ একদিকে পরাজিত পাঠানবর্গ এবং অন্যদিকে বঙ্গের সামন্ত শাসনপতিবৃন্দ রাজ পরিবর্ত্তনে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিপ্লবকারীদের মধ্যে পাঠানবংশীয় ওসমান খাঁ এবং অন্যতম সামন্ত অর্থাৎ ভুঁইয়া ঈশা খাঁ প্রধান ছিলেন। ভাটি প্রদেশ অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের বিপুল অংশ ঈশা খাঁ বশ্যতা স্বীকার করিয়া মোগল দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই ব্যবহারে প্রীতি লাভ করিয়া পাদশাহ তাঁহাকে দ্বাবিংশতি পরগণার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঈশা খাঁর বিরুদ্ধাচরণ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গের পাঠানদের শত্রুতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর পাদশাহের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে রাজপ্রতিনিধি ইস্‌লাম খাঁ তাহাদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিয়াছিলেন।

ঈশা খাঁর পিতা হিন্দু (কালিদাস) এবং ভাটি (ভাটি শব্দের অর্থ নিম্নভূমি, পূর্ব্ববঙ্গের বিপুল অংশ ভাটি নামে পরিচিত ছিল) প্রদেশের শাসনাধিকারী ছিলেন। এই হিন্দু শাসনপতির জন্মভূমি রাজপুতানা; তিনি বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও জন্মস্থান রাজপুতানার মাহাত্ম্যে শৌর্য্যবীর্য্যশালী হইয়া উঠেন এবং উৎকট সাধনাবলে সুবিস্তৃত ভাটি প্রদেশ অধিকার করিতে সমর্থ হন। ভাটি প্রদেশের বৈশ্য অধিপতি নিজ বাহুবলে দৃপ্ত ছিলেন, মুসলমান রাজশক্তি উপেক্ষা করিতেন। এই কারণ দিল্লীর সম্রাট ছলিম খাঁ তাঁহার বিনাশ সাধন জন্য বঙ্গদেশের অধিনায়ক তাজ খাঁ করানীকে আদেশ করেন। তদনুসারে তাজ খাঁ দরিয়া খাঁ নামক একজন সেনাপতিসহ বৈশ্য রাজকে আক্রমণ জন্য গমন করিলে তিনি মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন; কিন্তু অচিরে পুনর্ব্বার বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাজ খাঁ এবং দরিয়া খাঁ পুনর্ব্বার বৈশ্য রাজার অধিকারে সসৈন্যে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে তদীয় শিশু পুত্রদ্বয় ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ বন্দী করিলেন। তাজ খাঁ বৈশ্য রাজার জীবনান্ত করিয়া এবং তদীয় শিশু পুত্রদ্বয়কে তুরাণ দেশের বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। বৈশ্য

* Stewarts History of Bengal.

রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন এবং কুতব খাঁ নাম গ্রহণ করিলেন। কুতব খাঁ অচিরে তাজ খাঁর সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তিনি বহু অনুসন্ধান করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে স্বীয় সকাশে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাদের জ্যেষ্ঠের নাম ঈশা খাঁ এবং কনিষ্ঠের নাম ইস্মাইল খাঁ রাখিলেন। ঈশা খাঁ আপন কৃতিত্ব বলে সর্ব্বসাধারণের নিকট যশস্বী হইয়া উঠিলেন এবং পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। ঈশা খাঁ ভবিষ্যত চিন্তা করিয়া বঙ্গের পাঠান অধিপতির বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট পেশকস প্রেরণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিরত থাকিয়া দূর হইতেই বাধ্যতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। (১)

এই সময় বঙ্গ বিহারে মোগল পাদশাহ আকবরের আধিপত্য স্থাপিত হইল। ঈশা খাঁ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মোগল প্রতিনিধি সাহবাজ খাঁ স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং বিপুল বিক্রমে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঈশা খাঁ পরাজিত হইবার পূর্ব্বেই সাহাবাজ খাঁর সহিত মোগল ওমরাহগণের বিরোধ উপস্থিত হইল; তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানী টাণ্ডায় গমন করিলেন। পরে আগরায় যাইবার ইচ্ছা করিলে আকবর শাহ তাঁহাকে আগ্রায় প্রত্যাগমন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ গুজরাট হইতে প্রত্যাগত উদীয়মান সেনাপতিকে নিয়োজিত করিলেন। (২)

নবীন মোগল সেনাপতি রাজ নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন। সাহবাজ খাঁ তাঁহাকে লইয়া ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। অতঃপর বহু জয় পরাজয় অন্তে ১৫৬৮-৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ঈশা খাঁ বশ্যতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন এবং পাদশাহের নিকট প্রেরণ জন্য পেশকস আনয়ন করিলেন। আকবর সাহ এই সকল উপঢৌকন দর্শনে প্রীতি লাভ করিয়া তৎসমুদয় গ্রহণ করিলেন। ঈশা খাঁ রাজপ্রসাদের চিহ্নস্বরূপ পূর্ব্ববঙ্গের নদ নদী এবং ফল শস্যপূর্ণ দ্বাবিংশতি পরগণার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। (৩)

ইহার দুই বৎসর পরে সাহাবাজ খাঁ বঙ্গ বিহারের শাসন ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন এবং তৎপদে উজির খাঁ নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি অত্যল্প কাল মধ্যেই দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিলেন। আকবর শাহ উজির খাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হইয়া মহারাজ মানসিংহকে বঙ্গ বিহারের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

মানসিংহের বঙ্গ বিহারের শাসন ভার গ্রহণ কালে সমপ্রদেশ অশান্তিপূর্ণ ছিল। প্রধান ভৌমিক ঈশা খাঁ বিধ্বস্ত হইয়া বশ্যতাস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যান্য ভৌমিক বঙ্গদেশের শান্তিভঙ্গ করিতেছিলেন; উড়িষ্যায় পাঠানগণ সাতিশয় প্রবল ছিলেন। মহারাজ মানসিংহ শাসন ভার গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ পাঠানদিগকে বিধ্বস্ত করিতে মনন করিলেন।

পাঠানদের দমন উদ্দেশ্যে মহারাজ মানসিংহ ৯৯ হিজিরী অব্দে উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু জাহানাবাদ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেই বর্ষাকাল সমাগত হওয়াতে তিনি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন এবং বর্ষাকলে যাপন উদ্দেশ্যে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

আফগানদের অধিনায়ক কতলু খাঁ মহারাজ মানসিংহের উৎসাহ শূন্যতা এবং বলহীনতা দর্শন করিয়া সাহসী হইয়া উঠিলেন। আফগানগণ জাহানাবাদ অঞ্চলের নানা স্থান লুণ্ঠন করিয়া ফিরিতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ বা অধিকার করিয়া নির্ব্বিঘ্ন হইল। মহারাজ মানসিংহ পাঠানদের তাদৃশ উপদ্রবের সংবাদ অবগত হইয়া অস্পষ্ট খণ্ড যুদ্ধ দ্বারা তাহাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে দমনে রাখিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ কুমার জগৎসিংহ সবিশেষ কৃতিত্ব সহকারে স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অচিরে শত্রুর কৌশলে পতিত হইয়া বন্দী হইলেন।

এই ঘটনার পর অল্পকাল মধ্যে পাঠান অধীনেতা কতলু খাঁ পঞ্চত্ব লাভ করিলেন এবং পাঠান নায়কগণ অধীনেতার মৃত্যুতে ভীত হইয়া সন্ধি স্থাপন উদ্দেশ্যে মহারাজ মানসিংহের অনুগ্রহ লাভ কামনায় জগৎসিংহকে ছাড়িয়া দিলেন। মহারাজ মানসিংহ পাঠান সেনানায়কদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

এই সন্ধি স্থাপনের অব্যবহিত পরেই পাঠান সেনানায়কগণ হিন্দুর পবিত্র তীর্থক্ষেত্র পুরীতে তাণ্ডব করিতে লাগিলেন। মহারাজ মানসিংহ তাঁহাদের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া সন্ধি ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি বাদশাহের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আফগানদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। মানসিংহ অমিতপরাক্রমে পাঠানদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য রণক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। সুবর্ণরেখা তীরে মোগল সৈন্যের বাহুবলে পাঠানগণ পরাজিত হইল এবং আত্মরক্ষা উদ্দেশ্যে পলায়ন করিল। মহারাজ মানসিংহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন।

পাঠানগণ রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং তারপর ক্রমে ক্রমে সম্মিলিত হইয়া ওসমান খাঁর নেতৃত্বে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গে উপনীত হইল। মহারাজ মানসিংহ পাঠানদের অনুসরণ পূর্ব্বক ঢাকায় আগমন করিলেন এবং বাহার খাঁ এবং তোলক খাঁকে তাহাদের বিনাশ সাধন জন্য নিযুক্ত করিলেন।

অতঃপর পাঠানগণ বিক্রমপুরে প্রবেশ করিয়া নানা স্থানে লুণ্ঠন করিয়া ফিরিতে লাগিল। অচিরে মোগল সৈন্য তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া বিক্রমপুরে উপস্থিত হইল। প্রসিদ্ধ সোণারগাঁর অদূরে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাঠানেরা অসমযুদ্ধে মোগলের বাহুবলে অস্থির হইয়া পড়িল; তাহারা অন্যতম ভৌমিক চাঁদ রায়ের বাসস্থানাভিমুখে ধাবিত হইল; ইহার ফলে চাঁদ রায়ের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। অতঃপর পাঠানগণ বিক্রমপুর হইতে বাসরাই এবং গণকপাড়া প্রভৃতি স্থানে আগমন করিল। * তাহারা এইরূপে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে উপদ্রব করিয়া ফিরিতে লাগিল।

এই সময় ঈশা খাঁ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার মস্তকোত্তলন করিলেন। মানসিংহ তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার জন্য স্বীয় পুত্র দুর্জ্জনসিংহকে প্রেরণ করিলেন। ঈশা খাঁ নদনদীপূর্ণ পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই কারণ সেনাপতি দুর্জ্জনসিংহ তাঁহাকে জলযুদ্ধে পরাজিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রবল নৌ-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেনাপতি দুর্জ্জনসিংহ শত্রুর আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পুত্রের মৃত্যু সমাচার আগত হইলে মানসিংহের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং অচিরে ঈশা খাঁকে পরাজিত করিয়া এগার সিন্ধুর দুর্গ অধিকার করিলেন।

সুচতুর ঈশা খাঁ পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ সসৈন্যে আগমন করিলেন, কিন্তু সৈন্যসহ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইয়া মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। মানসিংহের সঙ্গে ঈশা খাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না। তিনি স্বীয় জামাতাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধার্থ পাঠাইলেন। ঈশা খাঁ মানসিংহ ভ্রমে তাঁহার সঙ্গেই যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মানসিংহের জামাতা পরাজিত হইলেন; ঈশা খাঁর অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া পড়িল। দ্বন্দ্বযুদ্ধ অন্তে ঈশা খাঁ নিহত ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলেন। ইহাতে ঈশা খাঁ বিরক্ত হইলেন এবং মানসিংহকে তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর মানসিংহ স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক ঈশা খাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিরত হইলেন। কিন্তু যুদ্ধের আরম্ভ কালেই দৈবাৎ মানসিংহের তরবারী হস্তচ্যুত হইল,

(১) আকবরনামা তৃতীয় খণ্ড।
(২) প্রতাপাদিত্য; আকবরনামা তৃতীয় খণ্ড। ২৮১ পৃষ্ঠা।
(৩) Stewarts History of Bengal প্রতাপাদিত্য। আকবরনামা, তৃতীয় খণ্ড ৪৬০ পৃষ্ঠা।

* Blockman's contributions to the Journals of the Asiatic Society of Bengal.

সেই মুহূর্ত্তে ঈশা খাঁ মানসিংহকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করা ন্যায়যুদ্ধ বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে স্বীয় তরবারী প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। মানসিংহ তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; মোগল পাঠানে সন্ধি স্থাপিত হইল। অনন্তর ঈশা খাঁ মানসিংহের পরামর্শে মোগল রাজধানীতে গমন করিলেন। পাদশাহ প্রবল শত্রুকে অবনত দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং দেওয়ান ও মসনদ আলী উপাধি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সম্মান ও মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিলেন।

ঈশা খাঁ মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, মোগল রাজশক্তি দীর্ঘকাল বিব্রত ছিল, মোগল পাঠানের যুদ্ধে দেশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। কিন্তু রালফ ফিচ নামক একজন ইংরেজ পর্য্যটকের (ইনি ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন) সাক্ষ্যে জানিতে পারা যায় যে, ঈশা খাঁর শাসিত দেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, এই সকল দেশের প্রধান অধিপতি ঈশা খাঁ। তিনি অন্যান্য অধিপতির প্রধান। ঈশা খাঁ খ্রীষ্টানদের পরম হিতকারী। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় তত্রত্য গৃহসমূহও খড় দ্বারা নির্ম্মিত। এই সকল গৃহের প্রাচীর বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত। অধিকাংশ অধিবাসীর অবস্থা উত্তম। তাঁহারা মাংসাশী নহে, তাহারা পশু হত্যা করে না, তাহারা ভাত, দুগ্ধ এবং ফল আহার করে। তাহারা অতি সামান্য বস্ত্র পরিধান করে, তাহাদের শরীরের অধিকাংশ নগ্ন। এই দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র এবং চাউল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এবং সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

জন্মভূমি।

(তুরস্ক হইতে)

জননী জনমভূমি! মা আমার! মা আমার,
রমনীয় কমনীয় তিন ভুবনের সার।
প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ চির শ্যাম সুশোভন,
রেখ মা! দাসেরে মনে শুধু এই আকিঞ্চন!
তোমার মূরতি মাগো! নিয়তি জাগায় প্রীতি,
তোমার স্মিরিতি মাগো! প্রাণকুঞ্জে গাহে গীতি!
যেখানে সেখানে থাকি যে দেশ সে দেশ দেখি,
নয়নে হৃদয়ে মনে তোমারি মূরতি আঁকি!
ভিন্ন-দেশ রাজা হ'তে তোমার রাখাল চাষী
নয়নে লাগে মা! ভাল, পরাণেতে ভালবাসি!
তব ধূলি-কণা মাগো! স্বর্ণ-কণা হ'তে বেশী,
তোমার 'কালা মানুষ' সে যে পূর্ণিমার শশী।
তোমার শাকান্ন মাগো! কত মিষ্ট, কি সুতার!
তব জল তব বায়ু কি কোমল চমৎকার!
তোমার কোমল ভাষা অনন্ত মধুর ধ্বনি
জাগায় কতই আশা! শুনায় কতই বাণী!
অন্যের রাজত্ব মাগো! অনন্ত বিষের খনি,
তোমার দাসত্ব মাগো! অনন্ত সম্পদ গণি!
রেখ মা তোমার মনে পরবাসী এ সন্তানে,
ভুল'না ভুল'না মাগো অধম অসার জ্ঞানে।
তোমার স্মরণে মাগো চখে বহে অশ্রুধার,
কাঙ্গালিনী বঙ্গভূমি! মা আমার মা আমার!

সিরাজী।

ধর্ম্মের জয়।

(১০)

সুশীলা অকূলে ভাসিতেছেন, স্বামীকে হারাইয়া তাঁহার জীবন শূন্য মরুভূমির তুল্য হইয়া গিয়াছে। সম্মুখে ভীষণ পরীক্ষা, সেই প্রবাসে অসহায় অবস্থায় চারিটি নাবালক সন্তান লইয়া অদৃষ্টের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিতে হইবে। কি প্রকারে গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে, শিশু পুত্র কন্যার ক্ষুধা শান্তি হইবে, পরিধেয় বস্ত্র জোগাইয়া লজ্জা নিবারণ হইবে, সুশীলা তাহা ভাবিয়াই পান না। স্বামীর শোকে হৃদয় অবসন্ন, তার উপর পুত্র কন্যার অন্ন জলের সংস্থান নাই। সুরেশচন্দ্রের পীড়ায় যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তিন মাসের বাড়ী ভাড়া বাকি পড়িয়াছে। তাহার জন্য বাড়ীর অধ্যক্ষ মিঃ রায়ের ব্যারিষ্টারের লোক অর্থাৎ মিঃ নিখিলনাথ ব্যানার্জ্জির লোক আসিয়া কয়েকবার তাগিদ করিয়া গিয়াছে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ী ভাড়া দিবার জন্য নোটিশ দিয়া গিয়াছে, ইহা শেষ নোটিশ।

সুশীলা ইতিপূর্ব্বেই আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নির্ম্মলচন্দ্রকে কলিকাতায় পত্র দিয়াছেন ও সকল কথা জানাইয়াছেন। নির্ম্মলচন্দ্রেরও ক্ষমতা সেই প্রকার, তিনি ত কোনও স্কুলে শিক্ষকতা করেন। সুশীলা প্রত্যহই ডাকের সময় পথ চাহিয়া থাকেন। সুশীলা নীরজা দিদিকে আর সংবাদ দেন নাই বা তাঁহারা সুশীলাদের কোনও সংবাদ রাখেন নাই। নীরজার পুত্রেরা স্কুলে এ সংবাদ পাইয়াছিল, গৃহে গিয়া মাতাকে বলিয়াছিল। সে সংবাদ পাইয়া নীরজা ও মিঃ ব্যানার্জ্জি দুঃখিত না হইয়া যেন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জি মিঃ রায়ের ব্যারিষ্টার। মিঃ রায় এখন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী, তিনি অতিশয় স্বাধীন প্রকৃতির লোক, অত্যন্ত দয়ালু ও পরোপকারী। তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন বলিয়া তাঁহার শিক্ষার ত্রুটি ছিল না। তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও আজন্ম সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে থাকিতেন। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া তিনি প্রথমে বোম্বেতে সামান্য বেতনে এক কোম্পানীর নিকট কার্য্য করিতেন, সেই কোম্পানীর অধ্যক্ষ মিঃ রায়ের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া তাঁহার শিক্ষার প্রসারতার জন্য তাঁহাকে নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। মিঃ রায় ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত হইয়া সেই কোম্পানীর ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন। সেই সঙ্গে তিনি নিজের যৎসামান্য মূলধনে একটি ছোট মোজা ও গেঞ্জির কারখানা খুলিয়াছিলেন। ক্রমে সেই ক্ষুদ্র কারবার এক বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সেই কোম্পানীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া নিজের ব্যবসা চালাইতেছেন। দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থ রমণীদিগের সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে এক অদম্য বাসনা জাগরিত হয়। এই মোজা ও গেঞ্জির কারখানায় কত যে অসহায় দরিদ্র রমণীদিগের ভরণ-পোষণ হইত তাহার সংখ্যা নাই। তাহারা গৃহে মোজা গেঞ্জি করিত, মিঃ রায় সকলকে একটি করিয়া কল দিতেন ও সামান্য করিয়া ভাড়া লইতেন। তাহারা প্রতি সপ্তাহে সেই মোজা ও গেঞ্জি আপনাদের আত্মীয়ের দ্বারা কারখানায় পাঠাইয়া দিত। তাঁহার এই কারখানায় এত বেশী এ সকল দ্রব্য মজুত থাকিত ও সেই সকল দ্রব্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে ও ইংলণ্ডের নানা উপনিবেশেও প্রেরিত হইত। তিনি বোম্বের একটি নির্জ্জন স্থানে এক বৃহৎ ভূখণ্ড ক্রয় করিয়া তাহা পল্লীতে পরিণত করাইয়া দরিদ্র ব্যক্তিকে অল্প মূল্যে ভাড়া দিয়াছেন। সেই পল্লীর নাম "রায় বস্তি," সেই বস্তিতেই তাঁহার কারখানার অনেক কুলি মজুর বাস করিত এবং তাহাতে সকল প্রকার জাতিই ছিল। তাঁহার সহরেও অনেকগুলি বাড়ী ছিল, সেগুলিও ভাড়া দেওয়া হইত। মিঃ ব্যানার্জ্জি এই সকল বাড়ী সংক্রান্ত সকল বিষয়

দেখিতেন, সেজন্য মিঃ রায় তাঁহাকে নিজের ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়াছিলেন ও মাসিক নির্দ্ধারিত কিছু অর্থ দিতেন। মিঃ ব্যানার্জ্জি মিসেস রায়ের দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি ভ্রাতা হইতেন। সেজন্য মিঃ রায়ের বাটীতে তাঁহার যাতায়াতও ছিল।

মিসেস রায় বিবাহের পর হইতে বরাবরই স্বামীর সহিত বিদেশে আছেন। পার্শী মহিলাদিগের স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রভাব অনেকটা লাভ করিয়াছেন। তিনি অতিশয় শান্ত প্রকৃতির লোক। স্বামীর কোন কাজেই কখনো হস্তক্ষেপ করেন না। স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভরের ভাব তাঁহাকে সকল অবস্থায় সুখী করিয়াছে। তিনি জানিতেন, তাঁহার স্বামী যাহা করিবেন, তাহাতে কখনো শুভ বই অশুভ হইবে না। তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্র শিশিরকুমারের বয়স চতুর্দ্দশ, সে চিররুগ্ন ও দুর্ব্বল। বাল্যকালে কেমন করিয়া পায়ে আঘাত পাইয়াছিল, সেই আঘাতে একটি পা কেমন দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিল ও ক্রমে তাহা পক্ষাঘাতে পরিণত হইয়াছিল। সেই অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মিঃ রায়ের একমাত্র পুত্র চিররুগ্ন। তাঁহার জীবনে কোন দোষ ছিল না যে তিনি এই প্রকার মনোকষ্ট পান, ইহা জগদীশ্বরের বিধান, তাঁহারা তাহা অবনত মস্তকেই বহন করিতেছিলেন। শিশিরকুমার স্কুলে যাইতে পারে না। সে বাটীতেই শিক্ষকের নিকট ও পিতার সাহায্যে লেখাপড়া করে, লেখাপড়ায় তাহার বেশ উন্নতি হইতেছিল। মিঃ রায়ের কন্যা ইলা অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা। তাহার সেই সুন্দর সুষুমার মত মুখ যেন একখানি ছবির মত। সেই মুখে যেন শুধু সরলতা ও পবিত্রতা প্রভাসিত রহিয়াছে। বালিকা যে কালে সুন্দরী হইবে, তাহা এখনি বেশ বুঝা যাইতেছে। সে মায়ের নম্র প্রকৃতি ও পিতার দৃঢ়তা লাভ করিয়াছে। মিঃ রায় তাহাকে কনভেণ্টে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছিলেন, সে রীতিমত শিক্ষালাভ করিতেছে।

সুরেশচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পর মিঃ ব্যানার্জ্জি সুশীলাকে বোম্বাই পরিত্যাগ করাইবার উপায় স্থির করিলেন। ক্রমাগত লোক দিয়া, বাড়ী ভাড়ার তাগিদ করিয়া অবশেষে শেষ নোটিশ দিলেন। সে নোটিশ পাইয়া সুশীলা অত্যন্ত ভাবনায় পড়িলেন। তাঁহার যাহা সম্বল ছিল, তাহা প্রায় সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নিকট দশ পনের মুদ্রার অধিক ছিল না। সেই বিদেশে সহায় শূন্য অবস্থায় পরে কি করিবেন, সেই ভাবনায় তাঁহার শরীর ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পুত্র কন্যাদের যতটুকু খাদ্য না দিলে নয় তাহাই দিতেছেন, নিজে অনাহারে বা অল্পাহারে দিন কাটাইতেছেন।

সুশীলার বাড়ী ভাড়ার জন্য শেষ নোটিশ পাইয়া মন বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পুত্র কন্যাদের জন্য খানকত রুটি গড়িয়া আনিলেন ও একটু গুড় ছিল, সেদিন তরকারী আর কিছু ছিল না। ছেলেদের যখন খাইতে দিলেন, ইন্দু শুধু রুটি দেখিয়া কাঁদিয়া বলিল—

"মা আমি আর শুক্‌নো রুটি খেতে পারি মা, আমার গলায় বড় লাগে, বুকে ব্যথা হয়।" সুশীলার তাহার সেই করুণ ক্রন্দনে ও কথায় বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল, তবু তাহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন—

"যা আছে তাই খাও মা, আর আমি কোথায় পাব? লক্ষ্মী মেয়ে অমন কোরো না।"

সুহৃদও কাঁদিয়া বলিল, "আজ আমিও আর খাব না, তুমিত জান মা আমি মিষ্টি দিয়ে খেতে পারিনে।" সুশীলা তাহার রুটিতে একটু লবণ দিয়া ভুলাইয়া খাওয়াইলেন। অজিত ও ললিত আপন আপন অংশ বিনা বাক্যব্যয়ে খাইয়া লইল। আহারাদির পর অজিত সুশীলাকে বলিল—

"মা তুমি কিছু খাবে না?"

পুত্রের সেই সস্নেহ বাক্যে সুশীলার চক্ষে জল ভরিয়া উঠিল বলিলেন—

"না বাবা রাত্রে ত আমি কিছু খাই না।" তার পর তিনি পুত্রদের ও কন্যাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন—

"আমার একে ত দুঃখের সীমা নাই, বাছা তোরা যদি এখন আমার কথা না শুনিস, এই দুঃ দরিদ্রতা সহ্য না করিস, তা'হলে আমার ত আর দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকবে না। আমার আর কিছু নাই, এই কটা মাত্র টাকা আছে, ইহাতে আমার পনেরো দিনেরও সংস্থান নাই। তারপর আমরা কি খাব, কোথায় যাব কিছুই জানি না। এস সবাই মিলে সেই দয়াময় জগদীশ্বরকে ডাকি, যিনি আমাদের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল যোগাইতেছেন, যিনি আমাদের এই সঙ্কটে এই সহায়হীন স্থানে রক্ষা করিতেছেন, যিনি তোমাদের পিতাকে নিজের স্নেহের কোলে তুলিয়া লইয়াছেন, এখন তিনিই তোমাদের পিতামাতা আশ্রয় তাঁহাকে ডাক। সকল শিশুগুলি করযোড়ে জগদীশ্বরের চরণে নমস্কার করিল, সুশীলার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল!

অজিত মায়ের চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল—

"মা তুমি কেঁদো না, তুমি যা বলিবে আমি তাই করিব ও তোমার সকল কথা শুনিব, কখনো তোমার অবাধ্য হব না।" মাতা সস্নেহে পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিলেন, তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শান্তিরসে পূর্ণ হইল।

(১১)

সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। নির্ম্মলচন্দ্রের নিকট হইতে কোনও পত্র না আসায় সুশীলা বিশেষ চিন্তায় পড়িয়াছেন। এদিকে পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থ হইতে আরও কিয়দংশ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সেই বিদেশে সহায় সম্বলহীন অবস্থা সুশীলার হৃদয়ে এক ভীষণ যন্ত্রণা জাগাইয়া তুলিতেছে। সপ্তাহ যেদিন অতীত হইল, সেই দিন সুশীলা উপরের কক্ষ হইতে দেখিলেন, দুইজন হিন্দুস্থানী বেশীয় ব্যক্তি তাঁহাদের দ্বারে আঘাত করিতেছে। তিনি অজিতকে দেখিতে বলায় সে যেমন গিয়া দ্বার খুলিল, অমনি তাহারা দুইজনে গৃহে প্রবেশ করিয়া সম্মুখের কক্ষেই গিয়া চেয়ার দুখানিতে বসিয়া পড়িল ও উভয়ে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। অজিত তাহাদের এই ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"আপনারা কি চান?"

তন্মধ্যে একজন তাহাকে বলিল—

"এই ছোকরা তুমারা মাতারীকো বোলো ঘরকে কেরায়া দেনে হোগা, নেইত হামলোগ ইতনা সমান সব কোরক করেগা।"

অজিত হিন্দুস্থানী কিছু কিছু বুঝিত, সে মায়ের নিকট গিয়া সকল কথা বলিল। সুশীলা অকূল পাথারে পড়িলেন। সুরেশ চন্দ্র দরিদ্র হইলেও তাঁহার রুচি বড় সুন্দর ছিল। বোম্বাইতে আসিয়া বসিবার কক্ষটি নিজের অবস্থার মত মনোরম করিয়া সাজাইয়াছেন। অভয় বাবু নীলামে কয়েকখানি চেয়ার, টেবিল কয়েকখানি শয়নের খাট ইত্যাদি কিনিয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিলে ও তাঁহাদের বাসন পত্র বিক্রয় করিলে হয়ত ৬০।৭০ টাকা উঠিবে। সুশীলার কিন্তু স্বামীর দ্রব্যগুলি বিক্রয় করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। বাড়ী ভাড়ার জন্য যে দ্রব্যাদি নীলাম হয়, এ কথা তিনি স্বপ্নেও জানিতেন না। সুশীলা কম্পিত হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সৌদামিনীর নিকট গমন করিয়া সকল কথা বলিলেন। তখন অভয় বাবু বাটী ছিলেন না। কাজেই সৌদামিনী কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন—

"মিঃ ব্যানার্জ্জির নিকট গিয়া তাঁকে বল, নতুবা উপায় নাই। এদেশে এমনি নিয়ম, ইহা নিত্য হইতেছে, বাড়ী ভাড়া দিতে না পারিলে বা ঋণ পরিশোধ না করিলে সব নীলাম করিয়া লয়। কিন্তু এ যে মিঃ রায়ের বাটী, তিনি ত এমন প্রকৃতির লোক নহেন, আশ্চর্য্য কথা। দাদাও ত বাটী নেই, কখন যে আসবেন তাত জানি না, তিনি মফঃস্বলে কি আনিতে গেছেন।"

সুশীলা তখনি অজিতকে দিয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকাইয়া মিঃ ব্যানার্জ্জির গৃহাভিমুখে অজিতের সহিত যাত্রা করিলেন। সেই কয়েকটি মাত্র রৌপ্য মুদ্রা সম্বল, তাহা হইতে গাড়ী ভাড়া দিতে হইবে মনে করিয়া সুশীলার হৃদয় ফাটিয়া গেল। উপস্থিত লজ্জা ও মান বাঁচাইতে হইবে, আর অন্য উপায় নাই। তাঁহারা মিঃ ব্যানার্জ্জির বাটীর সম্মুখে গাড়ী থামাইলেন, অজিত নামিয়া গিয়া দ্বারবানের

নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে মিঃ ব্যানার্জ্জির নিকট সংবাদ পাঠাইল। কয়েক মাস পূর্ব্বে অন্য দ্বারবান ছিল, এ নূতন কাজেই অজিতকে চিনিত না। দ্বারবান গিয়া যখন মিঃ ব্যানার্জ্জিকে বলিল, একজন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে বলিলেন। দ্বারবান যখন অজিতকে লইয়া আফিস কক্ষে উপস্থিত হইল, অজিতকে দেখিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জির ক্রোধে আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। সেখানে কয়েকটি ভদ্র মক্কেল উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে নীচ ভাষা প্রয়োগ করা সুবিধাজনক হইল না। তিনি অজিতকে রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি চাও?"

অজিত মৃদুকণ্ঠে বলিল—

"আমার মা আসিয়াছেন, বাড়ীর কথা বলিতে—"

মিঃ ব্যানার্জ্জি সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—

"এখন অপেক্ষা করিতে বল, যখন কার্য্য শেষ হইবে ডাকিয়া পাঠাইব।" অজিত চলিয়া গেল।

একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ছেলেটি কে? বাঙ্গালী দেখছি, বড় বিপদে পড়িয়াছে বুঝি? মুখ একেবারে শুকাইয়া গেছে।"

ব্যারিষ্টার মহাশয় হাস্য করিয়া বলিলেন—

"কোথাকার ছোট লোক কে জানে। হয়ত কেবল মাথা বকাইতে আসিয়াছে। ভিখিরি হবে বোধ হয়, কিছু চায়।"

ভদ্রলোকটীর মন বিষণ্ন হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইতেছিল, ছেলেটী যদি তাঁর কাছে কিছু চাইত ত তিনি দিতে পারিতেন।

গাড়ী ভাড়া অল্পতেই হইয়াছিল, গাড়ীওলা মহা ব্যস্ত করিয়া তুলিল, দ্বারবান যে সে ছোট লোক হইলেও তাহারও প্রাণে দয়া ছিল, সে যখন দেখিল যে, গাড়ীওলা মহা গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে, সে অজিতকে বলিল—

"মায়িকে হামারা কুটরীমে বৈঠনে বোলো বাবু, হাম দোসরা গাড়ী বোলায় দেগা।"

সুশীলা অগত্যা দ্বারবানের কক্ষে আশ্রয় লইলেন ও ভাড়া দিয়া গাড়ীওলাকে বিদায় করিয়া দিলেন। অজিত দ্বারবানের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। দুই ঘণ্টা সময় চলিয়া গেল, সমস্ত লোক একে একে বাহির হইয়া গেল, তবু মিঃ ব্যানার্জ্জি অজিত বা তার মাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন না। সুশীলার মন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শিশু তিনটীকে সেই দুই ভীষণ মূর্ত্তি অপরি-চিতের নিকট ছাড়িয়া আসিয়াছেন, ভয়ে তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া যাইতেছে। যদি তাহারা সেই ক... ছেলেদের মারিয়া বসে তারই বা আশ্চর্য্য কি। এদিকে মিঃ ব্যানার্জ্জির আহারাদি শেষ হইয়া গেল, আফিস যাইবার সময় হইল। একখানি সুদৃশ্য নূতন টমটম আসিয়া গাড়ী বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। সহিস চামর হস্তে ঘোটকের অঙ্গে মক্ষিকা তাড়াইতে লাগিল। দ্বারবান সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—

"মায়ি সাহেব তো আভি আফিস যাতা, আপকে কেয়া বোল্‌নেকে হ্যায় আভি যা কর বোলো, নেহি সাব আভি চলা যাগা।"

সুশীলা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া কম্পিত চরণে অজিতের হাত ধরিয়া সেই গাড়ী বারান্দার নিকট গেলেন। তখন মিঃ ব্যানার্জ্জি দাঁড়াইয়াছিলেন, এক জন ভৃত্য বুটের লেশ খুলিয়া গিয়াছিল, তাহাই ঠিক করিয়া দিতেছিল, আর একজন হ্যাট ও ছড়ি লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নীরজা দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। সুশীলা ও অজিতকে দেখিয়া উভয়ের মুখে ক্ষণকালের জন্য ভাবান্তর হইল। স্বামীর চক্ষের ঈঙ্গিতে নীরজা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জি অজিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আবার এ সময় বিরক্ত করিতে আসিয়াছ কেন?"

অজিতের দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইতেছে, ক্ষুৎ-পিপাসায় শরীর অবসন্ন। মায়ের অপমানে চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—

"মা আসিয়াছেন।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি উপহাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন—

"তোমার মা এসেছেন, তবে আর ভাবনা কি? এখন কি করতে হবে?"

সুশীলার চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারা বহিতেছিল, রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইতেছিল, তবু তিনি সংযত কণ্ঠে বলিলেন—

"আপনি আমাদের রক্ষা করুন। আমি বাড়ী ভাড়া শীঘ্রই পরিশোধ করিব, শুধু সময় দিন। আমার মত হতভাগিনীকে দয়া করিলে আপনার কোনও ক্ষতি হইবেনা।"

সুশীলার ক্রন্দন, সেই অসহায় ভাব দেখিয়া, ভৃত্য দুইজনের চক্ষে জল আসিল, কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জি মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

"এসব কথা আমি কিছু জানিনা, মিঃ রায়ের বাড়ী তিনিই জানেন। আমি তাঁর হুকুমেই চলি। আপনি বৃথা আর আমার সময় নষ্ট করিবেন না, বাড়ী যান, আমারও আফিস যাইবার সময় হইয়াছে। তাহার পর পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন—

"ওঃ প্রায় ১২ টা বাজে। আর দেরি নয়।" তাড়াতাড়ি ভৃত্যের হস্ত হইতে হ্যাট ও ছড়ি লইয়া যেমন শকটারোহন করিবেন সুশীলা অগ্রসর হইয়া পুনরায় বলিলেন—

"তা'হলে আমাদের কি উপায় হবে? আপনি একটু দয়া করে বলে দিন, কি করিব, আপনারা যদি দয়া না করেন কে করিবে, হাজার হোক আমার স্বামী আপনাদের আত্মীয় ছিলেন—" এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জি দ্রুতপদে সিঁড়ি হইতে নামিয়া শকটারোহণ করিয়া অশ্বকে এক কষাঘাত করিলেন, অশ্ব প্রস্তুত আপনার গন্তব্য পথাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

পতনোন্মুখ মাতার হস্ত ধরিয়া অজিত বাড়ীর বাহিরে আসিল। দ্বারবান গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া-ছিল, উভয়ে গৃহে ফিরিলেন।

(১২)

সুশীলা অবসন্ন হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, ললিত দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহার মুখ শুষ্ক হইয়াছে, তদপেক্ষা সেই ভীষণ মূর্ত্তিদ্বয়কে দেখিয়া ও তাহাদের কঠোর ব্যবহারে তাহার হৃদয় শুষ্ক হইয়াছে। গাড়ী হইতে যখন সুশীলা নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন সেই দুই ব্যক্তির মধ্য হইতে একজন বলিল—

"এ ছোকরা হাম লোগনকে ভোজন্‌কে কেয়া ঠিক হুয়া? যাও বাজার সে পুরী মিঠাই লে আও" অজিত দৃঢ় মুষ্টিতে মাতার হাত ধরিয়া ভিতরে গেল। সুশীলা ভিতরের বারান্দায় গিয়া আর সামলাইতে পারিলেন না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অজিত মায়ের নিকট বসিয়া পড়িল ললিত সুহৃদ ও ইন্দু সজল চক্ষে ম্লানমুখে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সকলেরই প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, সকলকারই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়াছে।

সৌদামিনী পার্শ্বের বাটী হইতে সুশীলাকে আসিতে দেখিয়া দ্রুতপদে সুশীলার বাটীতে আগমন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিভাও আসিল। সৌদামিনী সুশীলাদের সেই ভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত পাইলেন, তার পর ধীরে সুশীলার নিকট বসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন—

"কেঁদোনা বোন, ছেলেদের মুখের দিকে চাও। ভগবান তোমার দুঃখ দূর করিবেন, চিরকাল কিছু এমন ভাবে যাইবে না।" সুশীলা চখের জল মুছিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করিবার শক্তি তাঁহার নাই। সৌদামিনী অজিতকে বলিলেন—

"মিঃ ব্যানার্জ্জি বাড়ীর কথা কি বলিলেন"?

অজিত মৃদুকণ্ঠে বলিল—

"তিনি বলিলেন, তিনি কিছুই জানেন না, মিঃ রায় সব জানেন।" সৌদামিনী সবিস্ময়ে বলিলেন—

"মিঃ রায় কোনমতে এমন নিষ্ঠুর কাজ করিতে পারেন না। তিনি কি প্রকার পরপোকারী, কি প্রকার দয়ালু, যে একবার তাঁকে দেখিয়াছে সেই জানে"। তারপর বিভার দিকে ফিরিয়া বললেন—

"বিভা শীগ্‌গীর যাও তোমার বাবাকে একবার ডেকে আন, তিনি এর উপায় করিবেন"। বিভা বিদ্যুতের মত ছুটিয়া গেল, পরক্ষণেই অভয় বাবু

আফিসের সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন ও সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"সদু কি বলছ ?" সৌদামিনী তখন সকল কথা বলিলেন ও কি উপায় করা হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অভয়বাবু নীরবে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—

"মিঃ রায়-কথনো এমন নীচ জঘন্য কাজ করিবেন না। আমি তাঁকে বলিব, কিন্তু তিনিত রোজ আফিসে আসেন না। যাইহোক অজিত তুমিও তোমার মাকে নিয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মিঃ রায়ের বাসায় গিয়া তাঁকে সব কথা বলিও, ও এই ছোট-লোকদের বিদায় করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিও, উহারা থাকিতে তোমাদের শান্তি থাকিবে না। আর ওরা যে লোক আমার কথাও রাথিবে না, নতুবা আমি মানা করিতাম। ললিত কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—

"মা আর দাদা চলে গেলে, ওরা আমায় বাজারে পাঠিয়েছিল, পান আর চুরুট কিনে আনতে, আমি কোথায় যাব জানতাম না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলুম, একজন ফিরিওলা যাচ্ছিল তার কাছ থেকে, পান ও চুরুট কিনে এনে দিলাম। আমায় আবার তামাক সেজে দিতে বলছিল।"

অভয় বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন "ছি! ছি!" তারপর সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আমি এখনি মিঃ রায়ের কাছে যাইতাম কিন্তু ১২ টার সময় আমাদের আফিসের টাকা জমা দেবার কথা, এখন কোন মতে যাবার যো নাই। আপনি ভাবিবেন না একবার মিঃ রায়ের কাছে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, আপনারা যাবেন তারপর আমিও যাব। তবে আপনারা গেলে যেমন কাজ হবে এমন আমার দ্বারাও হবে না। মিঃ রায়ের মত লোক কথনো কাহারও অনিষ্ট করিতে পারেন না।"

তারপর সৌদামিনীকে বলিলেন—

"আমি এখন তবে যাই, আজ আফিসে বড় কাজ, ওবেলা এসে যা হয় কর্ব্ব। তুমি এঁদের পাঠিয়ে দিও।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সৌদামিনী ললিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা সব খেয়েছ" ললিত নিরুত্তরে রহিল। সুশীলা ধীরে ধীরে বলিলে "আমি যাইবার পূর্ব্বে অন্ন প্রস্তুত করিয়াছিলা যাই উহাদের খাওয়াই গিয়া।"

সৌদামিনী "তুমিও দুইটি মুখে দিবে চল, শরীর আর বেশী কষ্ট দিও না, তুমি পড়িলে ছেলেদের দেখিবে তা বল ?" সুশীলা শিহরিয়া উঠিলেন সত্য তারা নিতান্ত শিশু, তারা নিতান্ত অনাথ, জগ তাহাদের কোনও সহায় বা আশ্রয় নাই। তিনি উঠি সুহৃদকে কোলে করিলেন। সে এতক্ষণ চুপ করি ছিল, আদর পাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল বড় খিদে পেয়েছে।"

সুশীলা তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—

"চল বাবা খাবে চল।"

ইন্দু মায়ের আঁচল ধরিয়া বলিল

"আমারো বড় খিদে পেয়েছিল মা, তা আমি খেয়েছি।" সুশীলা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া স কয়টিকে খাইতে দিলেন, আহার সামান্য ভাতে করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও এমন শুকাইয়া গিয় ও যে কণ্ঠে লাগে। ইন্দু বড়ই দুর্ব্বল, সে শুকনা ভাত দুগ্রাস খাইয়া বলিল—

"মা গলায় বড় লাগে।" সৌদামিনী দ্বারে বসি ছিলেন বিভাকে চুপি চুপি বলিলেন—

"যাওত মা তোমার এ বেলার দুধটা নিয়ে এ ইন্দুকে দিব।" বিভা ত্বরিতপদে গিয়া দুধ আনি সৌদামিনী সুশীলাকে বলিলেন—

"বোন এই দুধটুকু দিয়ে ভাতকটা ইন্দু সুহৃদকে মেখে দাও, তারা খেয়ে ফেলবে।" সু লজ্জিত হইয়া বলিলেন "দুধ আমার এখানেও ছিল।" ললিত খাইতে খাইতে বলিল—

"সে বুঝি আর আছে, ওই লোক দুটো সে দুধ নিয়ে খেয়ে ফেলে নি বুঝি ? আমি এত মানা বল্লুম ইন্দুর দুধ, আমার তেড়ে মারতে এলো।"

সৌদামিনী বিস্মিত, সুশীলার মুখে বাক্য না। এই প্রকার পরীক্ষায় পড়িতে হবে তাহা স্বপ্নেও মনে আনিতে পারিতেন না। সেই ছোট বাড়ীখানি, স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননীর মুখ মানসপটে জাগিয়া উঠিল। সর্ব্বাপেক্ষা স্বামীর সেই যত্ন, সেই ভালবাসা, দরিদ্রের অমূল্য রত্ন। সেই কথা মনে পড়িয়া আজ নিজের অসহায় অবস্থাকে আরো যেন অসহায় বোধ হইতে লাগিল। কি হইবে, কোথায় দাঁড়াইবেন। ভাইকে পত্র দিলেন তারও উত্তর আসিল না, সংসারে ত আর কেহ আত্মীয় নাই— যে তাঁরা একদিনের জন্য সেই আত্মীয়ের কাছে দাঁড়াইবেন। আত্মীয়ের নামে নীরজার ব্যবহার, মিঃ ব্যানার্জ্জির অপমানের কথা, মনে করিয়া যেন অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। মানুষ কি করিয়া এত নিষ্ঠুর, এত হৃদয়হীন হয় ? অর্থ থাকিলেই কি দরিদ্র আত্মীয়কে এত অপমান করিতে হয় ? আত্মীয়ের চেয়ে যে পর ভাল। সৌদামিনী তাঁর কে যে এত করিতেছেন, এত দুঃখে দুখী হইতেছেন। আর এই লোক দুটো যে নীলাম করিবে বলিয়া বসিয়া আছে তারা নীলামে কিই বা পাইবে ? গৃহসামগ্রী যাহা আছে নীলাম করিলে ৪০।৫০ টাকার বেশী হইবে না, বাড়ী ভাড়া দেড়শত টাকা বাকি। কি করিয়া হইবে ? চারিদিকে অকূল সমুদ্র, কোথাও কিনারা নাই। সুশীলা আর যেন ভাবিতে পারেন না। সৌদামিনী সুশীলাকে সেই প্রকার চিন্তান্বিতা দেখিয়া বলিলেন—

"ভাবনার সময় আছে বোন। হাত ধুয়ে ফেল ছেলেদের খাওয়া হল, নিজে দুটি খেয়ে নাও"। সুশীলা কলের পুত্তলিকার মত উঠিয়া হাত ধুইয়া ভাত লইয়া বসিলেন। তাঁহার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, প্রথমেই এক ঘটি জল পান করিলেন, তার পর ভাতে হাত দিলেন মাত্র, উঠিয়া পড়িলেন। সৌদামিনী দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

"এমন করে কদ্দিন বাঁচবে বোন, তুমি ধৈর্য্য ধরে থাক শেষে তোমার ভাল হবেই। ঈশ্বর তোমার একটা না একটা উপায় করে দেবেনই। তাঁকেই ডাক"। সুশীলা ছেলে মেয়েগুলিকে লইয়া উপরে গেলেন। সৌদামিনী আহারাদি করিয়া আসিয়াছিলেন, তিনিও কিয়ৎক্ষণ বসিবেন বলিয়া তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। এমন সময় নীচে খুব শব্দ হইতে লাগিল, টেবিল চেয়ার পড়িবার শব্দ। সে দুইটা লোক যেন ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। একজন চীৎকার করিয়া বলিল—

"এই ছোকরা পুরী মিঠাই লে আও, নেহিত হাম লোক সব তোড় দেগা"

সুশীলার সম্বল ফুরাইয়া আসিল, তিনি তাহা হইতে আট আনা পয়সা লইয়া অজিতকে পাঠাইয়া দিলেন। অজিত নীচে গিয়া বলিল—

"এই পয়সা লও, বাজার থেকে কিনিয়া খাও।"

তন্মধ্যে যে বিকটতর ব্যক্তি সেই বলিল—

"কেয়া হাম তুমরা নোকর হায়, বাজারমে যা কর কিন খায়েগা ? ও আট আনা পয়সামে কেয়া হোগা ?" এই বলিয়া নিকটস্থ চেয়ার তুলিয়া অজিতকে মারিতে উদ্যত হওয়ায়, অজিত পয়সাগুলি মাটিতে ফেলিয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহিরে আসিয়া ভিতর হইতে দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল। তাহারা দুইজনে কিয়ৎক্ষণ বিকট চীৎকার করিল, নানাপ্রকার সুমধুর বাক্যাবলী বর্ষণ করিল, অবশেষে একজন পয়সা কটি লইয়া বাজার অভিমুখ গমন করিল।

বৈকাল হইল, ঘড়িতে ৪ ঘটিকা বাজিল। সুশীলা ভিতর দিয়া সব দ্বার অর্গল বদ্ধ করিয়া ও তালা লাগাইয়া ললিত সুহৃদ ইন্দুকে সৌদামিনী দেবীর নিকট রাখিয়া অজিতের সমভিব্যাহারে পুনরায় গাড়ী ডাকাইয়া মিঃ রায়ের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। মিঃ রায়ের গৃহ তাঁহাদের গৃহ হইতে অনেক দূরেই ছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

স্বামী বিবেকানন্দ ও নারীজাতি।

শক্তি-স্বরূপা নারীর উন্নতি ও অধোগতির উপর দেশের বা জাতির মঙ্গলামঙ্গল যত অধিক পরিমাণে নির্ভর করে, ততটা আর কিছুতেই নয়। কারণ এই নারীকুল হইতে দেশের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। স্নেহময়ী জননীর প্রথম চুম্বনই স্তনন্ধয় শিশুকে প্রেমের প্রথম পাঠ শিক্ষা দেয়। স্ফুটবাক্ সন্তানের কমনীয় কণ্ঠে যখন অমৃত-মধুর "মা" কথা আধ আধ স্বরে উচ্চারিত হয়, তখনই মাতৃভাষার সহিত তাহার প্রথম পরিচয় ঘটে। রোরুদ্যমান শিশু যখন জননীর স্নেহ-শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া সান্ত্বনা লাভ করে এবং মাতৃ-স্তন-যুগলের পীযূষময় ক্ষীরধারা পান করিয়া ক্ষুৎ-পিপাসার নিবৃত্তি করে, তখনই উহার স্বচ্ছ হৃদয়-মুকুরে করুণার শান্তিময়ী ছায়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। দিবসের ধুলা-খেলা ছাড়িয়া সায়ংকালে চলচিত্ত বালক-বালিকা-গণ কর্ম্ম-ক্লান্ত-দেহে গৃহাঙ্গনে উপবিষ্টা জননীর উরুদেশে যখন মস্তক রাখিয়া বিশ্রাম করে, তখন রাক্ষস-রাক্ষসীর অলীক উপকথার পরিবর্ত্তে যদি পুরাকালের ধর্ম্মপ্রাণ সাধুমহাত্মা, দেশবৎসল বীর-পুরুষ ও পতিব্রতা সতীসাধ্বীর পুণ্যকাহিনী মাতৃকণ্ঠে সুমধুর মাতৃভাষায় তাহাদের নিকট বিবৃত হয়, তবে তাহাদের কোমল হৃদয়ে মহদ্ভাবের বীজ স্বভাবতঃই উপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই কৈশোরে অঙ্কুরিত এবং যৌবনে পল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া ফলবান্ মহীরুহে পরিণত হয়। সুতরাং নারী-চরিত্র গঠন করা জাতীয় অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রকৃষ্ট পন্থা। নারীকুলের হৃদয় জ্ঞান-সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময়ী আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত না হইলে এবং সৎশিক্ষা-প্রভাবে তাঁহারা দেশকালোপ-যোগী মহনীয় গুণগ্রামে ভূষিতা না হইলে, দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ কখনই সুগম হইতে পারে না।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় হিন্দুললনাগণের শোচ-নীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিলে হিন্দুজাতির ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। যে জাতির মধ্যে খনা-লীলাবতীর ন্যায় বিদুষী এবং গার্গী-মৈত্রে-য়ীর মত ঋষিস্থানীয়া "ব্রহ্মবাদিনী" মহিলা বিদ্যমানা ছিলেন, কালবশে আজ সেই হিন্দু-কুললক্ষ্মীগণ অজ্ঞতার তমোময় গর্ভে নিমজ্জিত রহিয়াছেন। যাঁহাদের পূর্ব্বগামিনীগণের মধ্যে কর্ম্মদেবী, দুর্গাবতী প্রভৃতির ন্যায় বীরাঙ্গনা যুদ্ধক্ষেত্রে তেজস্বী বীরপুরুষ-গণকেও অবলীলাক্রমে রণশায়ী করিয়া শক্তিমত্তার পরিচয় দিতেন, আজ অদৃষ্ট দোষে তাঁহাদিগকে সতীত্ব-রক্ষার জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষিণী হইয়া থাকিতে হয়। যে হিন্দুমহিলাগণের মধ্যে পদ্মিনী, সংযুক্তা ও ধাত্রী পান্না প্রভৃতির মত আত্মত্যাগিনী দেবী প্রতিমা এবং সীতা সাবিত্রীর ন্যায় পুণ্যশ্লোকা সতী-সাধ্বী পতিব্রতা নারী বিরাজমানা ছিলেন, আজ পুরুষদিগকে তাঁহাদেরই বংশধরগণের সম্মুখে ত্যাগ ও সতীত্বের আদর্শ স্থাপন করিতে হইতেছে। যে হিন্দু সমাজের বীর্য্যবতী বীরাঙ্গনাগণ সন্তানকে সৎকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য প্রণোদিত করিতেন এবং নিজ হস্তে সন্তানের সমর-সাজের আয়োজন করিয়া সহাস্য আস্যে তাহাকে বিদায় দিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না, আজ সেই হিন্দু পুরাঙ্গনা-গণ সন্তানকে পরসেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতেও দ্বিধাবোধ করেন।

সন্তান বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করুক; অর্জ্জিত অর্থ ভোগ-বিলাসে ব্যয়িত হউক; কৈশো[র] অতিক্রম করিতে না করিতেই উদ্বাহ-বন্ধনে [আবদ্ধ] হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হউক ও যৌবনের [সীমা অতিক্রম করিতে] হইতে না হইতেই পুত্র কন্যার পিতা হইয়া বৃদ্ধ সাজু[ক] এবং কেবল সংসার-চিন্তায় দিবারাত্রি লিপ্ত হই[য়া] স্বার্থের পঙ্কিল প্রবাহে গা ঢালিয়া দেউক—ই[হাই] বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের অধিকাংশ মহিলার পুত্রকাম[না]র অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা অপেক্ষা দেশের ও জাতি[র] যে আর কি দুর্গতি হইতে পারে, শক্তিরূপিনী জন[নী]

জাতির যে কি অধঃপতন হইতে পারে এবং চির গরীয়সী হিন্দু-কুল-লক্ষ্মীগণের যে কি শোচনীয় অবস্থা হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। বলা বাহুল্য যে, পুরুষেরাই নারী-জাতির এই অধঃপতনের মূল কারণ। তাঁহারা দেশাচারের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া নারীকে শক্তিহীনা ও পরচ্ছন্দানুবর্ত্তিনী করিয়া ফেলিয়াছেন। দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ ভক্ত, চিন্তাশীল সংস্কারক ও সর্ব্বত্যাগী সাধক বিবেকানন্দ হিন্দুললনাগণের অবস্থা আলোচনা-প্রসঙ্গে একস্থলে এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন:—"দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন, স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে বুঝতে পাত্তিস্। মেয়েদের ঐ দুর্দ্দশার জন্য তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের জাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বল্‌ছি কাজে লেগে যা। কি হবে ছাই শুধু কতগুলি বেদবেদান্ত মুখস্থ করে?"

স্বামীজি নারীজাতিকে কতটা ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে উন্নত করিবার জন্য কতটা আগ্রহান্বিত ও যত্নবান ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য। স্বামীজি বলিতেন যে মহিলাগণের অবাধ বিদ্যা চর্চ্চার সুবন্দোবস্ত না করিলে এবং তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-বিধান-কল্পে পুরুষগণ যত্নবান না হইলে, জন্মভূমির কল্যান সাধন করা সুদূর-পরাহত। পুরুষেরা যেমন নির্ব্বিরোধে জ্ঞানালোচনা করিতে পারেন, নারীজাতিকেও সে অধিকার দেওয়া একান্ত বিধেয়। কারণ বৈদিক যুগে হিন্দু-ললনাগণ পুরুষের ন্যায় স্বাধীন বিদ্যা চর্চ্চার অধিকারিণী ছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতির ন্যায় প্রাতঃস্মরণীয়া বিদুষীর উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহার মতে রমণীগণের হৃদয় শিক্ষা দ্বারা এরূপভাবে গঠিত করা আবশ্যক, যেন তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের প্রকৃত অভাবাদি বুঝিতে সমর্থা হন এবং পুরুষের মুখাপেক্ষিণী না হইয়াও তৎসমুদয় মোচনের উপায় স্বয়ং উদ্ভাবিত করিতে পারেন। তিনি আরও বলিতেন যে, পুণ্যশ্লোকা সীতা-সাবিত্রীর পবিত্র চরিত্র হিন্দু নারীর আদর্শ স্বরূপ গৃহীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। হিন্দু সমাজের মহিলাগণকে আধুনিকভাবে বর্ত্তমান যুগের উপযোগিনী করিয়া শিক্ষিতা ও গঠিতা করিবার যে আয়োজন ও উদ্যম চলিতেছে, তাহা প্রশংসনীয় বটে। কিন্তু তৎসঙ্গে যদি তাঁহারা হিন্দু নারী, পতিব্রতা সীতা দেবীর পুণ্য পূত চরিত্রের মহান্ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন, তবে তাঁহাদের উন্নতির যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

স্বামীজি ১৮৯৮ সনে হিমালয়ের একটি মনোহর উপত্যকায় যখন অবস্থান করিতেছিলেন, সে সময়ে মান্দ্রাজের "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক সংবাদ পত্রের একজন প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া-ছিলেন। "ভারতীয় রমণী—তাহাদের অতীত, বর্ত্ত-মান ও ভবিষ্যৎ"—এই বিষয়টি লইয়া স্বামীজির সহিত সেই প্রতিনিধির আলোচনা হইয়াছিল। এতৎপ্রসঙ্গে স্বামীজি নারীজাতির শিক্ষার কথা উত্থাপন করিয়া একস্থলে বলিয়াছিলেন:—"শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তি-গুলির শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তি সকলকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহাদের ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থা নির্ভীক-হৃদয়া মহীয়সী রমণী-গণের অভ্যুদয় হইবে—তাহারা সঙ্ঘমিত্তা, লীলা, অহল্যাবাই ও মীরাবাইএর পদাঙ্কানুসরণে সমর্থা হইবে—তাহারা পবিত্রা, স্বার্থগন্ধশূন্যা বীর রমণী হইবে—ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শে যে বীর্য্য লাভ হয়, তাহারা সেই বীর্য্যশালিনী হইবে—সুতরাং তাহারা বীরপ্রসবিনী হইবার যোগ্য হইবে!" হিন্দু-সমাজের হিতৈষিগণের মধ্যে যে সমুদয় স্বজাতি বৎসল ব্যক্তি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, স্বামীজির উল্লিখিত অভিমতের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কারণ ঐরূপে শিক্ষিতা হইলে হিন্দু ললনাগণের দ্বারা অধঃপতিত

সমাজ যে অনেক পরিমাণে উন্নত হইতে পারিবে—তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নারীজাতির উপর কতটা নির্ভর করে এবং তাঁহারা প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিলে ভারতের জাতীয় অভ্যুত্থানে তাঁহাদের নিকট হইতে পুরুষাপেক্ষা কত অধিক সহায়তা পাওয়া যাইবে, তাহা স্বামীজি সম্যক্ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এ জন্যই তিনি রমণীগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দেশবাসিগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামীজির অনুগৃহীতা শিষ্যা, পাশ্চাত্যদেশীয়া বিদুষী মহিলা, ভারতবাসীর অশেষ হিতাকাঙ্ক্ষিনী পরলোকগতা ভগিনী নিবেদিতা এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ;—

"The Swami felt that there was no task before India which could compare in importance with that of woman's education His own life had had two definite personal purposes, of which one had been the establishment of a home for the Order of Ramkrishna, while the other was the initiation of some endeavour towards the education of woman With five hundred men he would say, the conquest of India might take fifty years ; with as many women not more than a few week's."*

অর্থাৎ ;—স্বামী বিবেকানন্দ ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নারীজাতির শিক্ষা ব্যতীত ভারতবর্ষের সম্মুখে আর এত অধিক প্রয়োজনীয় কার্য্য কিছুই নাই। তাঁহার জীবনের দুইটি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল ; তন্মধ্যে একটি—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যগণের জন্য মঠ প্রতিষ্ঠিত করা এবং অপরটি—নারীজাতির শিক্ষাকল্পে কিছু চেষ্টা করা। তিনি বলিতেন যে পাঁচ শত পুরুষের দ্বারা যদি ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান পঞ্চাশ বৎসরে সম্পন্ন হইতে পারে, তবে সমান সংখ্যক রমণী দ্বারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ঐ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে।

স্বামীজির জীবনের যে দুইটী ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছিল, তাহার একটী তিনি জীবিতাবস্থায়ই কার্য্যে পরিণত করিয়া যান। কলিকাতার অনতিদূরে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বেলুড় গ্রামে "শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ" প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি তাঁহার অন্ত-তম জীবনোদ্দেশ্য সফল করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মাতৃজাতির শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধে কার্য্যতঃ তেমন কোন অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে পারেন নাই। নারীগণের শিক্ষাকল্পে তিনি যে একটী স্ত্রী-মঠ স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা যদি কার্য্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারিতেন, তবে তদ্দ্বারা কেবল যে স্ত্রীজাতির শিক্ষার সুবন্দোবস্তই হইত তাহা নহে—পরন্তু উহা দ্বারা ভারতবর্ষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত। ঐ স্ত্রীমঠ কোথায় প্রতিষ্ঠিত ও কি ভাবে পরিচালিত হইবে এবং কি প্রণালীতে মঠের শিক্ষার্থিনীগণকে শিক্ষাদান করা হইবে—এই সমুদয় বিষয়ে স্বামীজির যে সারগর্ভ ও চিন্তাশীলতাপূর্ণ উক্তি লিপিবদ্ধ আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"গঙ্গার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে অবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে আর বিধবা ব্রহ্মচারিণীরা থাক্‌বে। আর ভক্তিমতী গেরস্থের মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে অবস্থান কত্তে পাবে। এই মঠে পুরুষদের কোন সংস্রব থাক্‌বে না। পুরুষ মঠের সাধুরা দুর থেকে স্ত্রীমঠের কার্য্যভার চালাবে। স্ত্রীমঠে মেয়েদের একটা স্কুল থাক্‌বে ; তাতে ধর্ম্ম শাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি অল্প বিস্তর ইংরাজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। সেলাইয়ের কাজ, রান্না, গৃহকর্ম্মের যাবতীয় বিধান এবং শিশুপালনের স্থূল বিষয়গুলিও শেখান হবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা এসবত শিক্ষার অঙ্গ থাক্‌বেই। যারা বাড়ী ছেড়ে একেবারে এখানে থাক্‌বে তাদের অন্নবস্ত্র মঠ থেকে দেওয়া হবে। যারা তা পার্‌বে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রী স্বরূপে এসে পড়া শুনা করতে পারবে। চাই কি, মঠাধ্যক্ষের অভিমতে মধ্যে মধ্যে এখানে থাকৃতে এবং যতদিন থাক্‌বে খেতেও পাবে। মেয়েদের ব্রহ্মচর্য্যকল্পে এই মঠে বয়োবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫। ৬ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে দিতে পার্‌বে। যোগ্যাধিকারিণী বলিয়া বিবেচিত হইলে অভিভাবকদের মত লইয়া ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী ব্রতাবলম্বনে অবস্থান কত্তে পার্‌বে। যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন কর্‌বে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে Centres (শিক্ষা-কেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে যত্ন কর্‌বে। চরিত্রবতী ধর্ম্মভাবাপন্না ঐরূপ প্রচারিকাদের দ্বারা দেশে যথার্থ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার হবে। স্ত্রী মঠের সংস্রবে যতদিন থাক্‌বে, ততদিন ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা এ মঠেরও ভিত্তিস্বরূপ হবে। ধর্ম্মপরতা, ত্যাগ ও সংযম এ মঠে ছাত্রীদের অলঙ্কার হবে ; আর সেবাধর্ম্ম তাদের জীবনব্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখ্‌লে কে তাদের না সম্মান কর্‌বে—কেই বা তাদের অবিশ্বাস কর্‌বে ? দেশের স্ত্রীলোকদের জীবন এইরূপে গঠিত হইলে তবে ত তোদের দেশে সীতা, সাবিত্রী, গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে।............বে করে সংসারী হলেও ঐরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দিবে ও বীরপুত্রের জননী হবে। কিন্তু স্ত্রীমঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে তাদের বে দেবার নাম গন্ধ কর্‌তে পার্‌বেন না—এ নিয়ম রাখ্‌তে হবে।" *

বাস্তবিক পক্ষে স্বামীজি কল্পনায় স্ত্রী মঠের যে মনোরম আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা কার্য্যতঃ অনুষ্ঠিত হইলে চির-নিগড়-বদ্ধা ও প্রতিপদে পুরুষের মুখাপেক্ষিনী হিন্দু-কুললক্ষ্মীগণের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার আমুল পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হইবে এবং তাঁহারা শিক্ষিতা ও সংস্কৃতা হইয়া আদর্শ হিন্দুনারীর ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারিবেন। এইরূপ শিক্ষিতা ও পূত-চরিতা হিন্দু-ললনার দ্বারা চিরারাধ্যা জন্মভূমির অপরিসীম কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায়।

* The Master as I saw him, by Nivedita Page 396.

আবাহন।†

যথা পিকবরে মধুর ঝঙ্কারে পঞ্চমে তুলেগো তান,
তেমনি সুতানে অমৃতের গানে মোহিলে বিশ্বের প্রাণ।
মুগ্ধ বিশ্ববাসী নিল হাসি হাসি সম্ভ্রমে বরণ করি,
মরম মন্দিরে অমর কবিরে আনন্দ-উৎসবে ভরি।
পূরি হৃদি সাজি ফুল্ল ফুলরাজি কীর্ত্তি কাননে তুলি
পুষ্পাঞ্জলী দানে পুজিল যতনে নিল তুলি পদধূলি।
যশের ভূষণে সাজাল রতনে স্বর্ণ মুকুটে কিবা,
ব্যাপিয়া জগত বিজলীর মত উজলিল তার বিভা!
দীপ্ত তারাবৎ সাহিত্য জগৎ নিরখিল বরণীয়,
দেশে কি বিদেশে সাহিত্য আকাশে তুমি সে অতুলনীয়!
বিজয় বেদিকা কুসুম-মালিকা তোমারেই মহাত্মন,
করিলা প্রদান দিয়া বহু মান বিশ্বের মনীষিগণ।
দেশের ভুষণ শুধু তুমি নও—বিশ্ব-মুকুট-মণি,
কাব্যকলার দিব্য ফুলহার অপূর্ব্ব রতন খণি!
কত রত্নবর, কত ফুলথর, কত কোকনদ দলে
সাজালে গো থালি যুগে যুগে তুমি জননী চরণ তলে,
নিবেদিলে আনি নবতর আজি মিলনের মধুমালা,
দেশ বিদেশের মঙ্গলাচরণে সাজান বরণডালা!
সিদ্ধ মনোরথে গিরিচূড় হ'তে আগত তপস্বী পারা
আসিলে গো দেশে, এস, দিশে দিশে ঝরুক পীযূষ ধারা!
তোমার গৌরবে গরীয়ান সবে যশেতে যশস্বী দেশ,
এস, এস ঘরে লহরে লহরে আনন্দের (হ) উন্মেষ!
কত ভক্ত, কত পিপাসিত চিত আছে পথপানে চেয়ে—
আসিলে এবার সোণা কি হীরার কিসের "তরী"টি নিয়ে!
বিশ্বভূবন করিয়া মন্থন কে জানে অমৃত কত,
আনিলে দেবতা, মাণিক মুকুতা ভরি হিয়া-পুষ্প-রথ!
আহরিলে ঋষি, কত ফুলরাশি বিদেশীর উপবনে,
কত অমৃত রাগিণী সৃজিয়া মোহিনী বাজিছে মনের কোণে!
—নাম রসধারা কলকণ্ঠ ভরা লয়ে সে হৃদয় বীণে,—
হৃদয় পাবন অতি বিনোদন তব বিশ্ববেদ গানে
কর মুখরিত সুধা সঞ্জীবিত সারা বিশ্ব-তপোবনে,
বিশ্বমানবের সখ্য মিলনের ঐক্যবাদন তানে!

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

* স্বামিশিষ্য সংবাদ—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত যোড়শবল্লী।
† পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভারত প্রত্যাবর্ত্তনে।

টেরাকয়া।

(জাপানী পাঠশালা)

সুপ্রভাতের পাঠকপাঠিকাগণ ইতিপূর্ব্বে কিণ্ড-গিজিকুর কথা শ্রবণ করিয়াছেন। কিণ্ডগিজিকু পাশ্চাত্য প্রণালীবদ্ধ বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষাগার। অদ্য আমরা জাপানের প্রাচ্য সংস্কার ও প্রণালী-বদ্ধ প্রাচীন পাঠশালা টেরাকয়ার কথা বলিব। ২৮৪ খৃষ্টাব্দে কোরীয়া দেশের রাজা একজন চীনা শিক্ষক লইয়া জাপান গিয়াছিলেন। সেই চীনা পণ্ডিত স্বীয় জাতীয় সাহিত্য জাপানে প্রথম প্রচার করেন বলিয়া ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে জাপানে সাহিত্য বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না। সুতরাং চীনার নিকটই জাপানের শিক্ষা ও সভ্যতার সূত্রপাত হয়। পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত জাপানে চীনীয় প্রভাব অপ্রতিহত গতিতে বিদ্যমান ছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তাহার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়। সেই সময় দিগ্বিজয়ী বৌদ্ধ প্রচারকগণ কোরীয়া হইতে জাপানে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন। তৎপূর্ব্বে জাপান শিণ্টোধর্ম্মী ছিল। শিণ্টোধর্ম্মের অর্থ "দেব-পন্থ"। এই ধর্ম্মে পঞ্চভূতাত্মিক প্রকৃতি পূজা ও পিতৃ-তর্পণই প্রশস্ত ছিল। বৌদ্ধ পুরোহিত ও প্রচারক-গণ বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় শিণ্টোধর্ম্মী-দিগকে স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাও কৌশলে। তাঁহারা শিণ্টোদিগের দেবদেবীকে আপনাদের দেবতার তালিকাভুক্ত করিয়া লওয়ার পর শিণ্টোগণ তাহা অবলম্বন করিতে পারিয়াছিল, তথাপি অনেকেই পূর্ব্ব ধর্ম্মেই বহাল ছিল। ১৯০১ অব্দে যখন লোকগণনা করা হয়, তখন জাপানে ১৯৫০০০ শিণ্টো মন্দির, ১১০০০০ বৌদ্ধ প্যাগোডা এবং ১০৫৫টী খ্রীষ্টভজনালয় দেখা গিয়াছিল। আমা-দের দেশে পূর্ব্বে যেমন সাধারণের শিক্ষা গুরু-মহাশয়ের পাঠশালাতেই সমাপ্ত হইত এবং বর্ণ-বিশেষের শিক্ষা টোলে হইত, জাপানে তেমনি সাধারণের শিক্ষা বৌদ্ধ পুরোহিতদিগের পাঠশালায় হইত এবং আভিজাত্য সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষা জাপা-নের মিথিলা, কাশী ও নবদ্বীপ স্বরূপ চীনদেশে গিয়া সমাপ্ত করিতে হইত। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই জাপসম্রাট একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করেন। তখন হইতে দেশে প্রাচীন উচ্চ সাহিত্য, গণিত শাস্ত্র ও হস্ত লিপি চাতুর্য্যের অনুশীলন আরম্ভ হয়। তখন চীনা "ঈহ্-কিং," "শূ-কিং," "শি-কিং"; "লি-কিং" এবং "চান্‌ট্‌স্থ" অর্থাৎ যুগান্তর কথা, ইতিহাস গ্রন্থ, কাব্য এবং "শরদ্বসন্তঋতু" নামক পঞ্চগ্রন্থের সার সংগ্রহ অধ্যয়নের পরিবর্ত্তে 'কজিকি' জাপানি 'নিহোঙ্গী,' অর্থাৎ পুরাণ ও জাপানের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণীত ও অধীত হইতে লাগিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অন্তর্ভুক্ত উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয়গুলি উচ্চবংশীয় ছাত্রগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জমীদার ও রাজন্যবর্গ স্ববংশীয়গণের জন্য সম্রাটের অনুকরণে একে একে অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় দেশময় শিক্ষার খরস্রোত বহিয়াছিল। ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দী জাপানের স্বর্ণযুগ বলিয়া কথিত হয়। তখন গুরুতর ও উচ্চ বিষয়গুলি চীন ভাষায় এবং কাব্য কবিতা উপন্যাস নাটকাদি জাপানী ভাষায় লিখিত ও অধীত হইত। পাশ্চাত্য শিক্ষার যুগ আসিলে সাধারণের শিক্ষাগার পুরাতন পাঠশালাগুলি অদৃশ্য হইয়া যায়। পুরাতন পাঠশালাগুলির জাপানী নাম "টেরাকয়া।" প্রত্যেক নগরে কতকগুলি এবং প্রতি গণ্ডগ্রামে অন্ততঃ একটী করিয়া টেরাকয়া থাকিত। এখানে ছেলেরা ছোট ছোট টেবিলের সামনে গদিতে জানু পাতিয়া বসিত এবং দুই দুইসারি জাপানি বর্ণমালা লইয়া লিখিতে শিখিত। এক এক সারিতে ৪৭টী করিয়া বর্ণ থাকিত। ছেলেরা সে বর্ণগুলি কাগজের উপর চীনাকালি ও লিখিবার তু

দিয়া ধীরে ধীরে নকল করিত এবং কাগজখানি শুকাইয়া গেলে পুনরায় তাহার উপর মক্স করিত। ক্রমাগত এইরূপ করিতে করিতে দিনের শেষে "হাতে কালি মুখে কালি" মাখিয়া ছেলের দল ঘরে ফিরিত। একটু সড়গড় হইয়া আসিলে পরিষ্কার সাদা কাগজে ভাল করিয়া লিখিয়া গুরুমহাশয়কে দেখা-ইলে তিনি লাল বা কাল কালিতে শোধন করিয়া দিতেন। এক সাট্ অক্ষর অভ্যস্ত হইলে অন্য সাট শেখান হইত। বর্ণমালা শেষ হইলে শতাবধি চীনা বর্ণের পরিচয় করান হইত। সাধারণতঃ লোকজনের নামধাম দৈনিক কাজকর্ম্ম করার উপযোগী হাতের লেখা ও পড়া নামতা এবং কোন কোন টেরাকয়াতে কিছু ইতিহাসও শেখান হইত। এই সকল পাঠ-শালায় ছেলেরা ২।৩ বৎসর করিয়া থাকিত; কেহ কেহ ৬।৭ বৎসরও পড়িত। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গেই লেখাপড়া করিত। বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক ছিল। ছাত্রেরা গুরুমহাশয়ের ইচ্ছানুসারে উপহার দিতে পারিত। গুরুমহাশয় সচরাচর কয়েক সের চাউল এবং ছাত্র দিতে পারিলে, কিছু অর্থও লই-তেন। শিক্ষার যাবতীয় ব্যয় রাজা ও জমীদারবর্গ বহন করিতেন। কোন কোন ছাত্র স্বগৃহে থাকিত, অবশিষ্ট শিক্ষকের পরিবার ভুক্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিত।

শিক্ষক ছাত্রকে যাহা দান করিতেন তাহা অর্থ-দ্বারা পরিশোধ করা যায় না তখনকার ইহাই বিশ্বাস ছিল। শিক্ষা দান মহা পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য ছিল। শিক্ষক পিতামাতার তুল্য ভক্তি ও সেবার পাত্র ছিলেন। তাঁহারা "মনের জনক" বলিয়া অভিহিত হইতেন। সমাজে তখন চতুর্বর্ণের অস্তিত্ব ছিল। শ্রেষ্ঠবর্ণ রাজবংশ ও যুদ্ধজীবী সামুরাই। দ্বিতীয়বর্ণ কৃষক; তৃতীয় শিল্পী এবং অধম বাণিজ্যজীবী। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ সামুরায়ের সহিত আসন পাইতেন। বণিকের স্থান সর্ব্বনিম্নে হওয়ার কারণ এই যে পূর্ব্বে জাপানে বণিগ্‌বৃত্তি অতিশয় হীন বলিয়া ঘৃণিত হইত। তাই বলিয়া কৃষক ও শিল্পীই যে সম্মানিত ছিল তাহাও নহে। তাহাদেরও অবস্থা প্রায় বণিকজাতির মতই ছিল। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের মত অন্য তিন বর্ণের মধ্যে লেখাপড়া চর্চ্চার নিদর্শন থাকিলেও উচ্চশিক্ষালয়গুলি সামুরাইদিগের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। বর্ণাচার-ধর্ম্মী সামুরাইয়ের যেমন চাষ করিলে ছবি আঁকিলে, গৃহ নির্ম্মাণ করিলে বা ক্রয় বিক্রয় করিলে তাহার জাতিনাশ হইত, অন্য তিন বর্ণকে তদ্রূপ যুদ্ধবিদ্যা শিখিলে, কবিতা লিখিলে, গণিত ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে পাপ স্পর্শ করিত। এদিকে সামুরাই বালক বালিকারাও যে টুকু লেখা পড়া শিখিত তাহাও বড় কার্য্যকরী ছিলনা। তাহারা জাপানী ও চীনা বর্ণমালা কণ্ঠস্থ করিয়া পাঠ্যপুস্তক আদ্যোপান্ত এক-বার উচ্চারণ শুদ্ধ করিয়া কণ্ঠস্থ করিত। দ্বিতীয়বার আদ্যোপান্ত বর্ণ ও শব্দের অর্থ কণ্ঠস্থ করিয়া এবং শেষে তাৎপর্য্য বুঝিয়া গ্রন্থখানি পুনরায় আগাগোড়া অধ্যয়ন করত "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানি বোধাদপি গরীয়সী" প্রথায় বহু সময় শক্তিক্ষয় করিত। উচ্চ সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের জ্ঞান, মানবের কর্ত্তব্য, কংফুচীয় নীতিগ্রন্থ চতুষ্টয়; পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য; মহাবংশচরিত; সম্রাটা-দির পূর্ব্বপুরুষগণ, ইত্যাদি বিবিধগ্রন্থ অধ্যয়ন করিত। সাধারণতঃ তাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিজ নিজ নাম, রাজাদের নাম, প্রদেশ, নগর, গ্রাম পথঘাট ও পরিচিত বস্তু, মাস, ঋতু, বর্ষ যুগ প্রভৃতির নাম নাম লিখিতে, সরকারী হুকুমনামা, আইন-কানুন পড়িতে এবং অল্প স্বল্প পাটিগণিতের অঙ্ক কষিতে শিখিত। কিন্তু অনেকটা সময় তাহাদের আদব কায়দা শিক্ষা করিতেই ব্যয় হইত, সামুরাই বালক এতদূর শিখিবার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইত। এখানে তাহারা চীন ও জাপানের ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র এবং দেশের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিত ও সমরবিদ্যা শিক্ষা করিত। শেষোক্ত বিষয়ের উপর এখানে অধিক লক্ষ্য থাকিত। যুবকগণ অস্ত্রচালনা, মল্লযুদ্ধ, বল্লমবাজী, সন্তরণ অশ্বচালনা প্রভৃতিতে তিন বৎসর শিক্ষা পাইত এবং এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এইগুলিই কলেজে গিয়া বিস্তারিত ভাবে শিখিত, সেইসঙ্গে পাটীগণিত বীজগণিত ও ইতিহাসে

উচ্চশিক্ষা পাইত। অল্প ছাত্রই কিন্তু এতদূর পৌঁছিতে পারিত। যতদিন না শিক্ষা সমাপ্ত হইত ততদিন ছাত্রদিগকে অবিবাহিত থাকিতে হইত। সাধারণতঃ স্কুলে ছয়ঘণ্টা পাঠের কাল নির্দ্ধারিত ছিল; কিন্তু বৎসরের মধ্যে অসংখ্য পর্ব্বদিন থাকায় বহুদিন পাঠ বন্ধ থাকিত। শাসনের কঠোরতাও বড় সামান্য ছিল না। কোন ছাত্র বিলম্বে বিদ্যালয়ে আসিলে সমস্ত দিন তাহাকে বাহিরে থাকিতে হইত। একবার ভিতরে প্রবেশ করিলে কেহ বাহিরে যাইতে পারিত না। তাহাদের স্কুলে আটক রাখা, ক্লাসের দিকে মুখ করিয়া ঘণ্টাখানিক দাঁড় করিয়া রাখা, বেতমারা ডেস্ক মাথায় করিয়া সোপানাবলী বহিয়া উপর নীচে গমনাগমন করা, জ্বলন্ত ধূপ হাতে পুড়াইয়া নিঃশেষিত করা ইত্যাদি বহুবিধ দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। সামুরাই বালক যাহাতে সচ্চরিত্র হয়, রাজা ও গুরুজনদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে শিখে, নিজের দেশের ও চীনের বিষয় খুব ভাল করিয়া জানিতে পারে; সুস্থ সবল দৃঢ়কায় এবং কষ্টসহিষ্ণু হয় তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। ছেলেরা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইন-কানুন, রাজাদেশ এবং কতকগুলি চীনা সাহিত্য গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিত। এতদ্ব্যতীত অন্য এক বিষয়ে জাপানি বালকদিগের যে শিক্ষা ছিল তাহা প্রাচীন স্পার্টার অনুরূপ এমন কি তদপেক্ষাও কঠোর ছিল। বালকদিগকে সদ্যোনিহত ব্যক্তির রক্তদর্শন করিতে দেওয়া হইত। কিরূপে শিরশ্ছেদন করিতে হয় তাহা দেখান হইত। ছেলেরা মৃতদেহ, শশ্মানক্ষেত্র, বধ্যভূমি প্রভৃতি দেখিতে অভ্যস্ত হইত। শিশুদিগের সাহসের পরীক্ষা লইবার জন্য দ্বিপ্রহর রজনীতে তাহাদিগকে একাকী মশানে পাঠান হইত এবং তথা হইতে মড়ার মাথা কাটিয়া আনিয়া দেখাইতে বলা হইত। কটিবন্ধনের ছুরিকা কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, প্রয়োজন হইলে নিমেষের মধ্যে কি প্রকারে স্বহস্তে আত্মপ্রাণ নষ্ট করিতে হয়,—এ সকল বিষয় বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। এদিকে চীনা দার্শনিকগণের অজ্ঞেয়বাদ স্বভাবতঃই ছাত্রগণকে অতি প্রাকৃত ও অলৌকিক ধর্ম্মমাত্রেরই উপর আস্থাহীন ও সন্দেহবাদী করিয়া তুলিয়াছিল। সামুরাই যুবক যদিও দেশের পৌরাণিক দেবদেবীর প্রতি ভক্তি এবং পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতাত্মার পূজা করিত তথাপি স্বর্গের প্রলোভন বা নরকের ভয় তাহাদের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত না। নৈতিক চরিত্র ও দৈহিক শক্তি লাভ করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার পক্ষে মানসিক শক্তির অনুশীলন গৌণ বিষয়। গ্রাম্য টেরাকয়াতে অনেক মেয়ে পড়িত। নগরের মেয়েরা লিখিতে পড়িতে শিখিয়া স্বামীর কাজকর্ম্মে সহায়তা করিবার উপযুক্ত হইত। সূচীকর্ম্ম, কৃষিকর্ম্ম, বয়নকার্য্য, সাংসারিক হিসাবপত্র তাহাদের শিক্ষার বিষয় ছিল। সামুরাই বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ছিল। সেখানে তাহারা লেখা পড়া ব্যতীত অস্ত্রচালনা ও ব্যায়াম শিক্ষা করিত। বড় বড় ঘরের মেয়েরা গৃহ শিক্ষকের নিকট শিক্ষা পাইত। তাহারা লিখিতে পড়িতে গীত বাদ্য করিতে কবিতা রচনা ও পুষ্প সজ্জা করিতে শিখিত। শিষ্টাচার সম্মত আদব কায়দা তাহাদিগকেও ছেলেদের ন্যায় শিক্ষা করিতে হইত। কেহ কেহ চীনা সাহিত্যও অধ্যয়ন করিত। মেয়েরাও অস্ত্রাদির ব্যবহার আত্মরক্ষার কৌশল এবং সন্তানগণের শিক্ষার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা পাইত। ছেলেদের মত মেয়েদেরও আবশ্যক পড়িলে নিমেষের মধ্যে কিরূপে নিজের প্রাণ অবলীলাক্রমে নষ্ট করিতে হয় তাহা শিখান হইত। ছেলে মেয়েরা এইরূপে টেরাকয়াতে ও নিজ গৃহে শিক্ষা পাইয়া সমাজ ও দেশের আদর্শানুরূপ হইয়া উঠিত।

কোরীয়া ও চীনের নিকট জাপানিরা পুরুষানুক্রমে শিক্ষা লাভ করিলেও, তাহাদের সভ্যতায় তাহারা অনুপ্রাণিত হইলেও, চীনাদিগের মত জাপানি পুরাতনের গোঁড়া অর্থাৎ বন্ধরক্ষণশীল কোন কালেই ছিল না। চিরকালই যে যাহা বলে জাপানি তাহাই শুনিয়া লয় কিন্তু যে যাহা বলে ঠিক তাহাই বিনা বিচারে বেদ বাক্য বলিয়া কখনও গ্রহণ করে নাই। যাহাতে তাহাদের অনিষ্ট সম্ভাবনা, যাহার সহিত তাহাদের খাপ খায়না, সেই সকল লেজামুড়া বাদ দিয়া তাহারা চিরদিনই সংস্কার করিয়া লয়। সেইজন্য তাহাদের জীবন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যেভাবে একটানা বহিয়া আসিয়াছিল হঠাৎ য়ুরোপীয় সংঘর্ষে তাহার স্রোত ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে বড় বাধে নাই।

১৫৪২ অব্দে মেণ্ডেজ পিণ্টু নামে জনৈক পর্ত্তুগীজ জাপানের সন্ধান পাইয়া জাপানে আগমন করেন এবং জাপানিদিগকে বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধান দেন। তদবধি ফিরিঙ্গীরা এবং ১৮৪৯ অব্দে জেভিয়ার প্রমুখ জেসুট মিশনরী সম্প্রদায় জাপানে আসিতে থাকেন। তাঁহাদের দেখাদেখি ফ্রান্সিস্কান্ ওলন্দাজ ইংরাজ প্রভৃতি জাপানে প্রবেশ লাভ করেন। ধর্ম্মের নামে জগতের অন্যান্য দেশে কি ঘটিতেছে—জাপানিরা তাহার সংবাদ রাখিত সুতরাং এই নব-ধর্ম্মের সংঘর্ষ ফল যখন নানা উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল তখন "সী-ই-তাই" অর্থাৎ "বর্ব্বর মর্দ্দন" উপাধিধারী সোগুন বংশীয় সম্রাট য়েমিৎসু দেশের বাহিরে যাওয়া আইন-বদ্ধ করিয়া বন্ধ করিয়া দেন। তখন কতিপয় চীনা ও যে সকল ওলন্দাজ, বৈদেশিকদিগের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারা ছাড়া বাহিরের আর কেহই জাপানে থাকিতে পাইল না। ফিরিঙ্গিগণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে নাগাসাকি দ্বীপে বাস করিতে লাগিল। তাহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে বন্দুক, তামাক, মশারী, স্পঞ্জ দুই একটী নূতন রোগ ও কতিপয় বিদেশী শব্দ ছাড়া বিদেশীয়দের আর কোন চিহ্নই রহিল না। বাহিরের জ্ঞানের দ্বার এইরূপে রুদ্ধ হইলে জাপানে কংফুচীয় ধর্ম্ম,—যাহা এতদিন বৌদ্ধ ধর্ম্মের তেজে মলিন হইয়াছিল, তাহার পুনরভ্যুদয়ে—তাহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে কংফুচীয় প্রাচীন গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইল। আবার জাপানে (১) পিতাপুত্রের, (২) রাজা প্রজার, (৩) স্বামী স্ত্রীর, (৪) জন্মভূমি বা স্বদেশের সহিত প্রত্যেক নরনারীর ও (৫) বন্ধুর সহিত বন্ধুর এই পঞ্চ সম্বন্ধমূলক নীতিবাদ; এবং রাজভক্তিই যে মুক্তির চরমপন্থা; পিতৃভক্তিই যে ধর্ম্মের সার এই শিক্ষা প্রচার লাভ করিল। কিন্তু সাগরবক্ষের উন্মুক্ত ভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত জাপানের পক্ষে, চীনের মত দেশটীকে সুদৃঢ় প্রাচীরবদ্ধ করতঃ বাহিরের সহিত সম্বন্ধশূন্য জীবন-সমাধিতে পরিণত করিয়া তোলা অসম্ভব হইয়া উঠিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৫৩-৫৪) মার্কিণ নৌবিভাগের অধ্যক্ষ পেরী সাহেব জলমগ্ন জাহাজের নাবিকগণের প্রতি সদ্ব্যবহারের দাবীতে জাপানকে সন্ধিসূত্রে বদ্ধ করিতে আসিলেন। মার্কিনের সঙ্গে ইংরাজ ফরাসী ও রুষ সমান দাবী করিয়া বসিলেন। তখন ডেমিও জমিদার সম্প্রদায় স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল এবং সোগুন রাজাদিগের শক্তি হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলার আবির্ভাব হইল। এতদিন জনসাধারণের শিক্ষার অভাবে, প্রাচীন একদেশদর্শী নীতি, সংকীর্ণ জ্ঞান, শিক্ষকের প্রভাব ও সুশিক্ষকের অভাবে দেশময় যে অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহাতেই সোগুন বংশীয় রাজাদের পুরুষানুক্রমে একাধিপত্য করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যে পিণ্টু সাহেব প্রমুখ য়ুরোপীয়গণের নবজ্ঞান ও শিক্ষাসংঘর্ষে, নাগাসাকির ফিরিঙ্গীনিবাসের সংস্পর্শে জনসাধারণের চক্ষু ফুটিল। জাপানীরা কখনই অন্ধবিশ্বাসের ক্রীতদাস ছিল না। ধর্ম্মান্ধতার অভাবই এবং উদার মতই জাপানের বিশেষত্ব। এই জন্যই তাহারা অবলীলাক্রমে অল্প সময়ের মধ্যে বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে। তাই একই পরিবারের মধ্যে শিণ্টো, বৌদ্ধ, কংফুচীয়, খৃষ্টানের একত্র বাস সম্ভব হয়। সুতরাং প্রজাবর্গের চক্ষু ফুটিতে বিলম্ব হইল না। এবং এতদিন শিণ্টো, বৌদ্ধ, কংফুচীয়ের ত্র্যহস্পর্শজাত যে "বুশিদো" ধর্ম্ম অভিজাত সম্প্রদায়কে অপর সাধারণ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল সে বাঁধও ভাঙ্গিয়া গেল। উচ্চ, নীচ, ভদ্র, ইতর সকলেই সেই প্রাচীনতম জাপানীর স্বাভাবিক সংস্কারজাত শিণ্টোধর্ম্ম অথবা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মহীন-নীতিবাদ শিরোধার্য্য করিয়া লইল। ১৮৬৭-৮ অব্দে সোগুন শক্তির পতন হইলে, জাপান এক সম্রাটের অধীন হইল। ইহাই মীজি বা উদার শাসনের সূত্রপাত করিল এবং তৎসঙ্গে মীজি অব্দের প্রারম্ভ হইল। যে সকল

মনস্বী ব্যক্তির প্রভাবে মীজি যুগের প্রবর্ত্তন হয়, তাঁহারা সকলেই য়ুরোপীয় শিক্ষায় অনুপ্রাণিত, জ্ঞান বিজ্ঞানে যে জাপান অন্যান্য শক্তির বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে ইহা তখন তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিলেন। কিন্তু দেখিয়া, প্রাচীন পুঁথি পত্র ঘাঁটিয়া "আমাদের অমুক ছিল,—আমাদের তমুক ছিল—আমাদের ছিল না কি ?" এ সব বাজে কথায় তাঁহারা সময় নষ্ট ও বাতিক বৃদ্ধি না করিয়া বৈদেশিকগণের অনিবার্য্য শক্তির মূল কোথায় তাহারই নির্দ্ধারণে তৎপর হইয়াছিলেন। এবং মূলসূত্র খুঁজিয়া পাইয়া য়ুরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, কল কৌশল প্রভৃতি আত্মস্থ করতঃ জাপানকে ক্রমে জাপানী ছাঁচে য়ুরোপীয় অথবা য়ুরোপীয় ছাঁচে জাপানী করিয়া তুলিলেন। তখন আর সোগুণ সামুরাই ইতা, হীনিনে ইতর বিশেষ রহিল না। সকলেই জাপানী নামে এক জাপ জাতিতে পরিণত হইল। এই জাতীয় একতার ভাব সম্প্রসারিত করিতে এবং সমাজের অসমান ভূমি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া তাহাকে সমভূম করিবার প্রতি-কূলে যখন যাহারা দণ্ডায়মান হইয়াছে তখনই তাহা-দিগকে বশীভূত করিয়া এবং যাহারা উচ্চ মঞ্চে ছিল তাহাদিগকে নিম্নে নিক্ষেপ না করিয়া বরং যাহারা নিম্নে পড়িয়াছিল তাহাদের হাত ধরিয়া উপরে উঠাইয়া দিয়া ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করিতে অবশ্য সংস্কারকগণকে অমানুষিক অধ্যবসায় ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই জাতীয়তার সৃষ্টি একদিনেও হয় নাই এবং বিনা রক্তপাতেও হয় নাই। কিন্তু এত অল্প রক্তপাতেও এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন দেশে কোন কালেই এমন গুরুতর সংস্কার হইতে শুনা যায় নাই। জাপানের ইহাই বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব সংস্কার প্রয়াসী সমাজও জাতির স্থিরচিত্তে ও ধীর-ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বিশেষত্বের জন্যই আজি জাপান জগতের শিক্ষাস্থল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বঙ্গ সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালের যে সকল বৈজ্ঞানিকগ্রন্থ আছে তাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই সকল গ্রন্থ বঙ্গভাষায় লিখিত এবং প্রচলিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কারণ আজকাল বিজ্ঞান চর্চ্চা প্রধানতঃ ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত। ইহা অবসম্ভাবী; কারণ আমাদের দেশে যে বিজ্ঞানের হাওয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা পশ্চিম সমুদ্রতীর হইতে আসিতেছে। পশ্চিম; বিজ্ঞান মন্দিরে বাণীর সেবায় নিরত এবং বহুদিন হইল তাহার সাধনাসিদ্ধ হইয়াছে তাই সেস্থানে বিজ্ঞানের চর্চ্চা এত বেশী এবং কার্য্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগও তদনুরূপ। আজকাল সেইজন্য কোন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে হঠাৎ বিজ্ঞান-সমাজ মানিতে চাহেন না। নানা প্রশ্ন ও পরীক্ষা দ্বারা নূতন সত্যকে বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী বারংবার বাজাইয়া লইয়া তবেই তাহাকে সত্যরূপে গ্রহণ করেন। পশ্চিম এই বিজ্ঞানলক্ষ্মীকে মন্দিরে পূজা করিতেছে।

আমরা নিজের দেশ সম্বন্ধে যতই কেন গর্ব্ব করি না, আমাদের বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া যে অভাব আছে তাহা বোধ করি সকলেই মানিবেন। অনেক সময় শুনা যায় যে, অতিরিক্ত বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা দেশের চিত্তকে আধ্যাত্মিক দিক হইতে খাটো করা হয়। এরূপ মত বা ভ্রম পোষণ করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক সময় মানুষ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিত না স... কিন্তু সুখের বিষয় হইতেছে এই যে, সময়ও বদ... নাই এবং মানুষের উন্নতিও দ্রুতগামী। দুই শতাব্দী পূর্ব্বে হয় ত পূর্ব্বমত প্রচলিত ছিল কিন্তু আমরা যদি সেই প্রাচীন দুই শতাব্দীর লোক হইয়াই থা... তবে আর বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিবার সুবি... কি হইল ?

ডুবারী যেমন কোমরে লোহার শিকল বাঁ... সমুদ্রের তলদেশে রত্ন অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায় ...

তথাকার বিচিত্র বর্ণলীলায় মুগ্ধ হইয়া সমুদ্রের আশ্চর্য্য সংবাদ জ্ঞাত হইয়া থাকে, মানবও তদ্রূপ এই অসীম জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে বিজ্ঞানের পোষাক পরিধান করিয়া একেবারে তাহার তলদেশে নামিয়াছে। এখানে যে সকল রত্ন আছে তাহা গগনের ক্ষেত্রগ্রহোপগ্রহের জ্যোতি হইতেও মনোরম। এই সমুদ্রে মানুষ যতই বিচরণ করিবে ততই বিশ্বেশ্বরের মহিমা তাহাকে মুগ্ধ করিতে থাকিবে। কেবল উর্দ্ধে আকাশের দিকে তাকাইয়াই যে ঈশ্বরের মহিমা সন্দর্শন করা যায় তাহা নহে, মাথা নীচু করিলেও এই ধরণীর ধূলি তলেও তাঁহার ক্ষমতা দেখা যায়। কেবল সাহিত্য, ললিত কলা ইত্যাদি ব্যতীত ঈশ্বরের হস্ত নাই বলাও যা' আর আকাশ ছাড়া অপর কোনো স্থানে তাহার হস্ত নাই বলাও তাই। মানুষ আকাশের নিম্নে এই বিজ্ঞান সমুদ্রের তলে যতই ডুবিবে ততই নব নব রত্নের আলোক তাহার চক্ষে প্রতিদিন প্রতিভাত হইবে। তাহার পর যখন এই অনন্ত বিজ্ঞান সমুদ্র-বক্ষে আকাশ প্রতিবিম্বিত হইবে তখনই সমস্ত সমস্যার সমাধান। অন্বেষণ এবং স্থিরতা, চাঞ্চল্য এবং গগনের শান্তি তখনই একত্র হইয়া এক পরম রমণীয় দৃশ্য সৃজিত করিবে।

যাহাই হোক্ বিজ্ঞানদ্বারা জীবনে সাধনার দিক্ চলিয়া যায় যাঁহারা বলেন, বলিতে হইবে তাঁহারা অগ্রনী মানুষের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছেন এবং তাঁহারা ক্ষীণ কণ্ঠে অগ্রবর্ত্তী দলকে যতই কেন বাধা দিন না বিধাতার "মাভৈঃ" রবে যে সকল সাধক বৈজ্ঞানিকের দল অগ্রগামী, তাহাদের মানুষ কখনো থামাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক ত ঈশ্বর সাধনাকেই নূতন পন্থা দ্বারা লাভ করেন। আমাদের স্বদেশবাসী আচার্য্যবর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় যখন উদ্ভিদ ও ধাতু দেহে প্রাণীশরীরের ন্যায় অনুভব শক্তি এবং স্নায়ুবিস্তার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছেন,—"আমরা যাহাকে নির্জীব বলিয়া মনে করি, তাহাও যে অনন্ত প্রাণ সমুদ্রে প্রকম্পিত হইতেছে!" তখন কি এই উক্তি আমাদের প্রাচীন ঋষি উক্তির সহিত মিলিয়া যায় না ? ধর্ম্মসাধনাও বিজ্ঞান সাধনার ভিতর একটু প্রভেদ আছে। বিজ্ঞান সাধনায় মানুষ প্রতিপদে ঈশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষ দেখিয়া আনন্দিত হইয়া উঠেন কিন্তু ধর্ম্ম সাধকের অন্তরে পরিপূর্ণতার আশাকে বহু ধৈর্য্যের সহিত রক্ষা করিতে হয়; তাহার পর একদিন তাহার ফল পাওয়া যায়। সাধনা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের উন্নতি যেন এক একটি সোপান বাহিয়া উপরে উঠা এবং ধর্ম্ম সাধনা যেন ব্যোমযান যোগে ধীরে ধীরে অনন্তে পৌঁছানো। সেইজন্য এই দুইপক্ষের মধ্যে শেষোক্ত পথে বিপদ অনেক। কিন্তু ধীর এবং ঈশ্বর বিশ্বাসপরায়ণ হইলে প্রথম পথে "মাভৈঃ"। এতগুলি কথা বলিবার হয় ত আবশ্যক ছিল না কিন্তু বাংলা দেশে আজও শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিজ্ঞানচর্চ্চা মানুষকে ধর্ম্ম-সাধনার পথ হইতে বিচলিত করিয়া থাকে। বঙ্গদেশের একান্ত দুর্ভাগ্য যে এতদিন পশ্চিমের প্রভাবে থাকিয়াও আমরা পশ্চিমের বিজ্ঞান চর্চ্চার আসল জিনিষটি ধরিতে পারিলাম না। নকল হইয়াছে অনেক। বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য পশ্চিম-দেশে বড় বড় বৈজ্ঞানিকের এক একটি দল আছে; এই বৈজ্ঞানিকের শিষ্যগণ গুরুর মৃত্যুর পরও তাঁহার সাধনার শিখাটিকে নির্ব্বাপিত হইতে দেন না! বাংলা দেশে যদি তেমন ভক্ত বৈজ্ঞানিক শিষ্যগণ থাকিতেন তাহা হইলে জগদীশচন্দ্র আজ আমাদের যে কত গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং প্রফুল্লচন্দ্র যে কত উপকার করিয়াছেন সেই ব্যাপারই অপর সমস্ত আলাপ আলোচনা হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিত। জগদীশচন্দ্র এবং প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা মন্দিরে বাংলার শিষ্যগণ কোথায় ? তাঁহাদের আহ্বান কি আজও আমাদের কাণে বাজিবে না ? এবং সর্ব্বাগ্রে বাজিবে উত্তেজনার বাণী ?

বিজ্ঞান কে সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গভাষায় সহজ বোধ্য করিয়া লিখিবার প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্রের ভিতর দেখা যায়। তাহার পর বিজ্ঞান জিনিষটাকে সহজ করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা অল্প কয়েকজন লেখকের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। তন্মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং রামেন্দ্রসুন্দরের নামই সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়িয়া যায়। বিজ্ঞান জিনিষটা যে একটা ভীতিপ্রদ

দুরূহ বিষয় নহে এবং দৈনিক জীবনেরই যে একটা অতি সহজ বোধ্য অংশ এই কথাটাই তাঁহারা বঙ্গীয় পাঠক সমাজকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্রও জগদানন্দ এবিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ইদানীং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ হইতে একপ্রকার লেখনী ক্ষান্ত করিয়াছেন। যোগেশ বাবুও কতকটা চুপ্ করিয়া আছেন। প্রফুল্লচন্দ্র এবং জগদীশচন্দ্র ত আপনাদের সাধনায় নিযুক্ত। অধ্যাপক জগদানন্দ রায় তাঁহার লেখনীকে আজও যে অপ্রতিহত ভাবে চালিত করিতেছেন ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। সাধনা এবং শিক্ষার যে বিভাগেই বলুন্ না কেন সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ না করিলে তাহাতে সিদ্ধ হওয়া যায় না। ওকালতী করিব অথচ কবিতা লিখিয়া 'কবি' হইব এমন দুঃসাহস একমাত্র বঙ্গীয় সাহিত্যিকেরই সম্ভব। অধ্যাপক জগদানন্দ রায় বিজ্ঞান সাধনায় এই সুদীর্ঘকাল নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহার জীবন এই সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ করিতে থাক্ আমাদের ইহাই প্রার্থনা। বাঙ্গলা দেশের এমন অবস্থা আসে নাই যাহাতে ইউরোপের ন্যায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের বহু বিক্রয় হইবে। এইরূপ অবস্থা আমাদের দেশে না আসিলেও তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ যে পাওয়া না যাইতেছে তাহা নহে। যে দিন বঙ্গবাসী পশ্চিমের ন্যায় বিজ্ঞান মন্দিরে সাধনায় নিযুক্ত হইবে সেই দিন জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রের সাধনা এবং রামেন্দ্রসুন্দর, যোগেশচন্দ্র ও জগদানন্দের শ্রম সার্থক হইবে। সম্প্রতি অধ্যাপক জগদানন্দ রায় যে তিনখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের অতীব আদরের সামগ্রী। ইতিপূর্ব্বে "সুপ্রভাতে" গ্রন্থকারের "প্রকৃতিপরিচয়" নামক গ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি আচার্য্যবর শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্কারাবলী বঙ্গভাষায় লিখিয়া যে অশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সত্যই শ্রদ্ধার বিষয়। বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের সূত্রপাৎ করিবার অনেকগুলি অসুবিধা আছে।

প্রথমতঃ বঙ্গভাষায় ইংরাজি বৈজ্ঞানিক শব্দের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞাপক শব্দ সম্পদের একান্ত অভাব। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজির একটা শব্দ প্রয়োগ করিলেই পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন লেখকের বক্তব্য কি, কিন্তু বাংলা ভাষায় ইংরাজি একটি বৈজ্ঞানিক শব্দ বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। তৃতীয়তঃ এই দুইদিক, বজায় রাখিয়া সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাঠকগণের মস্তিষ্কে বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রেরণ করা যেমন তেমন ব্যাপার নহে। ভাষার উপর আশ্চর্য্য দখল না থাকিলে তাহা হইবার জো নাই। সেই জন্যই আজকাল যে কয়জন নূতন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের রচনা সাধারণের সুবোধ্য হয় না। বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা ব্যতীত তাহা সহজ বোধ্য করিয়া লেখা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অনেক সময় কোন একটি বিষয় বুঝাইবার সময় হয় ত এমন একটি উপমা দিতে হয় যাহা সাধারণের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ ব্যাপার অথচ তাহা বিজ্ঞানের দিক্ দিয়াও সত্য। কেবল শুষ্ক বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলীকে শব্দ ঝঙ্কারময় ভাষার ভিতর দিয়া পেষণ করিয়া যাইলাম অথচ তাহাকে একটুও কোমল করিতে পারিলাম না; এইরূপ যাঁহাদের ভাষা তাঁহারা কদাপি বিজ্ঞানের ভাষায় সুদক্ষ নহেন। বোধন এবং বুদ্ধি দুইটা পৃথক্ জিনিষ। আমি নিজে বুঝিতে পারি কিন্তু অপরকে হয়ত বুঝাইতে পারি না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের এই বোধনশক্তির আশ্চর্য পরিচয় পাইয়া বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণ আনন্দিত হইয়াছেন। দুরূহ জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য গুলিকে তিনি এমন সহজ করিয়া বিবৃত করেন যে পা… করিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। বঙ্গীয় পাঠক সমাজ আজও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকে তেমন সম… দিতে সক্ষম হন নাই। ইহা দেশের সাধারণ গতি তজ্জন্য কাহাকেও দোষী করা চলেনা। আশা কর… যায় বঙ্গীয় পাঠকসমাজ শীঘ্রই সাহিত্যে বিজ্ঞানকে আসন দান করিয়া ভাষার মেরুদণ্ড সুদৃঢ় ক… বেন।

জগদানন্দবাবুর এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থত্রয়ের দুই এক খানিকে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যগ্রন্থ নির্ব্বাচক সমিতির সুযোগ্য সভ্যগণ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাংলার পাঠ্যগ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া সকলের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদাহরণ দেখিয়া পাঠকপাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন সাহিত্যে জগদানন্দবাবুর গ্রন্থগুলির কিরূপ আদর হওয়া আবশ্যক। আমরা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারি পশ্চিমদেশ হইলে দুই সপ্তাহের ভিতর এইরূপ পুস্তক নিঃশেষ হইয়া যাইত। আশা করি, বঙ্গীয় পাঠক সমাজ এই পুস্তকত্রয়ের যথোচিত আদর করিবেন। "প্রকৃতি পরিচয়ের" পর জগদানন্দবাবু "আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" নামক দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন। উভয়েরই মূল্য ১।০ । প্রকাশক, অতুল লাইব্রেরি; ৫৪।৬ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা অথবা ইসলামপুর রোড ঢাকা। এই উভয় ঠিকানাতেই পাওয়া যায়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের তৃতীয় গ্রন্থের নাম "বৈজ্ঞানিক"। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। এই ঠিকানা অথবা ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস্; ২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, এই উভয় স্থানেই পুস্তক প্রাপ্তব্য।

মোসলেম রাজনীতি।

('ওয়ালায়ৎ অল্ মজালিম' বা মজালিম বিচার মন্দিরের এলাকা)

সুবিখ্যাত রাজনীতি বিশারদ বিধি ব্যবস্থা লেখক পণ্ডিত অল্-মাওয়ার্দ্দি তাঁহার 'আহকাম-অস সুলতানিয়া' নামক রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থের 'ওয়ালায়ৎঅল মজালিম' শীর্ষক অধ্যায়ে খলিফীয় রাজ্যের উচ্চতম বিচারসভা মজালিম কোর্টের এলাকা সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যাহারা পরস্পর অন্যায় করিবে (মতাজালিমুন্) তাহাদিগকে পারস্পরিক ন্যায় বিচারে বাধ্য করা এবং মোকদ্দমাকারিগণের মনোমধ্যে ভয় ও ভক্তি উত্তেজিত করিয়া দাবি অগ্রাহ্য করা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্তি করাই মজালিমের এলাকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিচারালয়ের বিধিসঙ্গত ক্ষমতা (এলাকা) পরিচালনকারী ব্যক্তির আবশ্যকীয় নৈতিক গুণগুলিও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কার্য্যতঃ তাঁহাকে দৃঢ় এবং সতর্ক হইতে হইবে (পৃঃ ১২৯)। এরূপ এলাকা উজির ও পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসনকর্তৃবর্গের অন্তর্জাত থাকে, কেননা কার্য্যক্ষেত্রে এলাকা সাধারণ বলিয়া নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে খলিফীয় পদে উত্তরাধিকারী মনোনীত, উজির, বা বৃহৎ প্রদেশিক শাসনকর্ত্তার কর্ত্তব্যপালনের উপযুক্ত হওয়া চাই। কিন্তু যদি কাজির অসম্পূর্ণ ক্ষমতা পূরণকরণার্থ এলাকার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, তবে নিম্নতর পদস্থ লোকদিগের উপর যতদিন অবিচার ও উৎকোচ গ্রহণের সন্দেহ সংস্পৃষ্ট না থাকে ততদিন তাঁহারাও এই পদের উপযুক্ত হন।

খালের (বা প্রণালীদ্বারা জলসিঞ্চনের) স্বত্বের পূর্ব্ববর্ত্তিতা সংক্রান্ত একটি বিবাদের মোকদ্দমায় প্রেরিতপুরুষ কর্ত্তৃক বিধিসঙ্গত ক্ষমতা পরিচালিত হইয়াছিল, এবং পক্ষপাতিত্বের (বা অনুগ্রহ প্রদর্শনের) অঙ্গচ্ছেদনকালে তিনি রোষবশতঃ যে বিচার-মীমাংসার ফল প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নানারূপে—কখন স্পষ্টবিধি কখন বা আদেশস্বরূপ গৃহীত হয়।

পরবর্ত্তী চারিজন খলিফের এলাকা পরিচালন করিতে (পৃঃ ১৩৩) অবহেলা করিবার কারণ এই যে, ইসলামের প্রারম্ভকালে নৈতিক প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং তখন সন্দিগ্ধপূর্ণ সমস্যাগুলি কাজি দ্বারাই পূরণ করা হইত, পক্ষান্তরে বিধিব্যবস্থার অবাধ্য

আরবেরা উপদেশ ও তিরস্কারের বশবর্ত্তী হইত। তাঁহারা যে বিচারালয় সংক্রান্ত আদেশ জারি করিতেন তাহারা তাহারই বশবর্ত্তী হইত। আলি তাঁহার রাজত্বের শেষ ও গোলযোগপূর্ণ দিনে অধিকতর কঠোর শাসন ও আইনানুমোদিত প্রণালী সমূহের সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃঢ়তর আসক্তির আবশ্যকতা অনুভব করিয়াও এই এলাকার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার দুইটি বিচার মীমাংসার বিষয় উল্লিখিত আছে। তৎপরে (আলির রাজত্ব কালের পর) প্রকাশ্য আইনবিরুদ্ধ কার্য্য হইতে একপ্রকার এলাকার উপায় অবলম্বন করিবার আবশ্যক হয় (পৃঃ ১৩১) যাহাতে বিচরালয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলী পালন করার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালক বাহুর শক্তিকে মিলিত করা হইয়াছিল। অন্যায় ব্যবহারের জন্য অভিযোগকারী ব্যক্তিগণের (মতাজালিমুনের) ঘটনার বিবরণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে আব্দুল মালিক বিন মরওয়ানই প্রথমে একটিদিন নির্দ্দিষ্ট করেন। তিনি স্বয়ং তাহাদের আবেদন শ্রবণ না করিয়া তাঁহার কাজি আবু ইদ্রিস কর্ত্তৃক শ্রুত হইতেন। তিনিও তাঁহার প্রভুর বিশেষ জ্ঞান ও মনোযোগের ভয়ে সন্দিগ্ধপূর্ণ বিষয়গুলির সংশয় দূর করিয়া আদিষ্ট ডিক্রিজারি করিতে যাহা আবশ্যক হইত তাহা করিতেন।

অতঃপর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও অন্যান্য অবাধ্য লোকদিগের পক্ষে অমিতাচারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় দৃঢ় ও গুরুতর শাসনের আবশ্যক হয় এবং ওমর বিন আব্দুল আজিজই স্বয়ং মজালিম ধর্ম্মাধিকরণে প্রথম বসিয়াছিলেন। তিনি প্রবল প্রভুত্বকারী সম্ভ্রান্ত বংশের বহুসংখ্যক অন্যায় কার্য্যে বাধা দিয়া, তাঁহার উপর তাঁহাদিগের প্রতিশোধ দেওয়ার ভয় সত্বেও তাঁহাদিগকে কঠোরভাবে শাসন করিয়াছিলেন। মেহদী হইতে মহতাদী পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী সকল খলীফই স্বয়ং বসিয়া পারস্যদেশীয় রাজন্যবর্গ ও কোরেশ বংশীয়দিগের প্রথানুসারে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদিগকে তাহাদের সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন (পৃঃ ১৩২-৩৪)। ইসলামের পূর্ব্বে বিভিন্নজাতির (বা সম্প্রদায়ের) সাহায্যে একযোগে কার্য্য করিবার উপায় অবলম্বন করিয়া অত্যাচারজনিত কার্য্যের গতিরোধ করণার্থ এই কোরেশ বংশের চেষ্টাতেই 'হিল্‌ফ অল ফজুল'* সৃষ্ট হইয়াছিল এবং প্রেরিত পুরুষও তাঁহার-সম্মতি দ্বারা ইহা বিধি-সঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন।

কেবল মজালিম ব্যাপার সমাধা করিতে যদি জজ (নাজির) নিয়োজিত করা না হয় তবে তিনি ইহার জন্য কতিপয় নির্দ্দিষ্ট দিন স্থির করিবেন এবং সেই দিনে উভয় পক্ষেরই (বাদী ও প্রতিবাদীর) হাজির হওয়া চাই এবং তিনি অন্যান্য কর্ত্তব্যকার্য্যে জন্য তাঁহার অবশিষ্ট সময় ন্যস্ত করিবেন। লোকে যেন সহজেই তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিতে পায় এবং তাঁহার কোর্টে এই পাঁচ শ্রেণীর লোক (কর্ম্মচারী) অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন : (পৃঃ ১৩৫)। আবশ্যকীয় বল প্রয়োগ এবং বাদী ও প্রতিবাদীকে সমন দিবার জন্য (১) 'হামি' ও 'আওম' (রক্ষক বা পিয়াদা); আইনের মূলতত্ত্ব ও প্রযোজ্য ধারা ঠিক করিবার জন্য (২) 'কাজি' ও 'হাকিম' (বা বিচারালয় সম্পর্কীয় ব্যক্তি); সন্দিগ্ধ ও দুর্ব্বোধ্য (বা জড়িত) বিষয়ে মধ্যস্থস্বরূপ (৩) 'ফকিহ' (বা ব্যবহার শাস্ত্র বিশারদ ব্যক্তি; বা উকিল); উভয়পক্ষের মধ্যে যাহা ঘটে এবং তাহাদিগের পক্ষে বা বিরুদ্ধে যাহা বিচার নিষ্পত্তি করা হয় তাহা লিপিবদ্ধ করিতে (৪) 'কাতিব' (লেখক); এবং কোথায় স্বত্ব আছে, ও কিরূপ বিচার ফল হইবে প্রমাণদ্বারা তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য (৫) 'শাহীদ' (বা সাক্ষীস্বরূপ গৃহীত ব্যক্তি)।

মজালিম বিচারালালয়ের বিচারাধিকারের যো[গ্য] ব্যাপার (বা বিষয়) অনন্তর দশভাগে বিভাগ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে !

১। প্রজার বিরুদ্ধে শাসনকর্ত্তৃবর্গ (ওয়ালি) কর্ত্তৃক কৃত অন্যায় কার্য্য ও অত্যাচার, সর্ব্বতোভাবে এই কোর্টের এলাকা এবং তাঁহাদিগের কার্য্যে উৎসাহ বা বাধাদিবার উদ্দেশ্যে উহা বিশেষরূপে তদন্ত করা বা আবশ্যক হইলে শাসনকর্ত্তাকে স্থানচ্যুত করাই ইহার কর্ত্তব্য। ওমর বিন আব্দুল আজিজের প্রথম উপাসনাবেদীর বক্তৃতা হইতে যে সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে তিনি শাসনকর্ত্তাদিগের পক্ষে ন্যায় বিচারে অগ্রাহ্য করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

২। যে যে নিয়মানুসারে পূর্ব্বতন খলিফাদিগের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল ঠিক তাহার উপর, অন্যায় কর আদায়ের প্রতীকার করা, কোনরূপ বাহুল্য কর আদায় করা হইলে তাহা রাজকোষ (ট্রেজারি) হইতে কিম্বা যদি রাজস্বকর্ম্মচারীর ('আমিন-কর' আদায়কারীর) নিকট থাকে তো তাঁহা কর্ত্তৃক প্রত্যর্পণ করা। খস্‌রোর মুদ্রায় বাহুল্য কর আদায় করায় মহতাদী তৎসংক্রান্ত সমস্যা মীমাংসা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার ইতিহাস তাঁহার নিকট তাঁহার মন্ত্রী (উজির) সোলেমান বিন ওহাব কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল। ওমর বিভিন্ন বিজিত প্রদেশের খাজনা মুদ্রায় আদায় করাইয়াছিলেন এবং তৎকালের মুদ্রা হয় পারস্য দেশীয় নাহয় বায়জেণ্টাইন ছাঁচে মুদ্রিত হইত। মুদ্রার প্রকৃত ভার (বা ওজন) লক্ষ্য না করিয়া সাধারণতঃ সংখ্যাতেই প্রদত্ত হইত। পুরাতন গুণের ধ্বংস হওয়ায় 'তাবেরী' দিনার—যাহার মূল্য কেবল চারি দানক মাত্র, তাহাই প্রদত্ত হইত; পক্ষান্তরে পূর্ণ ওজনের গুলি রাখিয়া দেওয়া হইত। যেয়াদ যখন এরাকের শাসনকর্ত্তা তখন তিনি পূর্ণ ওজনের মুদ্রায় আদায় করাইয়াও ন্যূনতার জন্য দায়িত্ব স্থাপন করেন—এই অবিচার ওম্মীয়দ শাসনকর্ত্তৃবর্গ কর্ত্তৃক এবং আব্দুল মালিকের শাসনকালে মুদ্রাসকল নিয়মিত (বা ঠিক) করিবার পর—কেবল দ্বিতীয় ওমরের শাসনকাল ছাড়া যিনি ইহা রহিত করিয়াছিলেন—অলহাজ্জাজ ও পরবর্ত্তী অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগদ্বারাও পরিচালিত হয়। মনসুরের সময়ে সওয়াদের বিনাশ হওয়ায় টাকার পরিবর্ত্তে প্রধানতঃ উৎপন্ন দ্রব্যে কর আদায় করা হয় এবং অধিকাংশ শস্য সম্বন্ধেও তখনও এইরূপ অবস্থা ছিল (পৃঃ ১৩৭)। মহতাদী এই সকল ঘটনা শ্রবণ করিয়া ভবিষ্যতে এক কোটি বিংশতি লক্ষ দেরেম রাজস্ব ক্ষতি হইবে এরূপ জানা সত্বেও বর্ণিত রীতি অনুসরণ করিতে অস্বীকার করিয়া ন্যূনতা (বা অভাব) বলপূর্ব্বক আদায় না করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

৩। গভর্ণমেণ্ট আপিস (দেওয়ান) সমূহের সেক্রেটারিদিগের কার্য্যাবলী তদারক করা; যেহেতু তাঁহারা মুসলমানদিগের সম্পত্তি হইতে যাহা প্রাপ্ত হন ও যাহা ব্যয় করেন তৎসম্বন্ধে তাঁহারা তাহাদিগের পক্ষে ন্যাসধারী অবস্থায় আছেন। অতএব তাঁহাদিগকে কঠোরভাবে নিয়মে আবদ্ধ রাখা চাই, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ অনিয়মিত আয় বা ব্যয়ে বাধা দেওয়া চাই, এবং সর্ব্বপ্রকার অমিতাচারের জন্য শাস্তি দেওয়া চাই। মন্‌সুর, এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক কৃত জাল ও পরিবর্ত্তন ব্যাপারগুলি সংশোধন ও শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রকৃত অভিযোগের অনুপস্থিতিতেও অগ্রবর্ত্তী তিন শ্রেণীর অভিযোগ হস্তে লওয়া যাইতে পারে।

মোহাম্মদ কে, চাঁদ।

---

* লেনের Lexicon, 'আঘানী' এবং এব্‌নে খলিদূন দ্রষ্টব্য। এই লিগের উৎপত্তি মক্রিজী, মোকফ্‌ফা কর্ত্তৃক আব্‌[...] বিন জদানের জীবনীতেও বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহারই বাটীতে প্রেরিত পুরুষ এই মিলন (সমিতি) স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন [...] উল্লিখিত আছে। এস্থলে ব্যবহৃত 'ফজুল' শব্দ যাহা অনিশ্চিত অর্থ-বিশিষ্ট বলিয়া লেন কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, তাহা [...] জোহরীর প্রমাণের উপর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎকালে বিদ্যমান দুইটি লীগ—'মতাতায়ইবিন' ও 'আহলাফ'—পারস্পরিক [...] বশতঃ উৎপীড়িত লোককে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিত।

সমালোচনা।

কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথ—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ঘোষাল সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ॥/০+২৫১ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনের ও কর্ম্মের অনেক পরিচয় এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে; ইহাকে ঠিক জীবন-চরিত বলা যায় না, তবে ইহা পাঠ করিলে সুরেন্দ্রনাথের কৃতকর্ম্মের ও যশোগৌরবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি সুরচিত; কয়েকখানি হাফ্‌টোন ছবিও ইহাতে আছে। এই শ্রেণীর পুস্তক এ দেশের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, ইহা দ্বারা বহু উপকার সাধিত হইবে।

পুষ্পহার—শ্রীমতী সরসীবালা বসু প্রণীত। হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। ডিমাই দ্বাদশাংশিত মূল্য আট আনা।

এখানি কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলির অধিকাংশই আন্তরিকতায় পূর্ণ; এবং কবিত্ব ও সরসতা হইতেও একেবারে বঞ্চিত নহে। তবে ছন্দ অভাবে কাঁচা, তাই কবিত্ব পরিস্ফুট নহে এবং কোন বিশেষত্বও দেখিতে পাওয়া যায় না। মধ্যে মধ্যে দুই একটি ভাবব্যঞ্জনা আছে মাত্র!

পোষ্যপুত্র—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। চুঁচুড়া, ভূদেব ভবন হইতে শ্রীযুক্ত কুমার দেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কাত্তিক প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৪৭৪ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা চারি আনা।

এখানি উপন্যাস। 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বৃহৎ উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। লেখিকা অবরোধ বাসিনী বঙ্গীয় মহিলা, স্কুল কলেজে কখনো শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পান নাই। তিনি যে এমন সুপাঠ্য সুদীর্ঘ উপন্যাস রচনা করিতে পারিয়াছেন এজন্য আমরা আজ গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। এই সুবৃহৎ পুস্তকখানি লেখিকার লিপিচাতুর্য্যে ও বর্ণনা মাধুর্য্যে এমনি কৌতূহলদ্দীপক হইয়াছে যে, পড়িতে কোথাও এতটুকু বাধে না, কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয় না। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, আখ্যানটিও বেশ মনোরম চিত্তাকর্ষক। রজনীনাথ চরিত্রে আদর্শ পিতৃ-চরিত্র অঙ্কনের চেষ্টা লেখিকার বিফল হয় নাই। 'শান্তি'ও 'শিবাণী' চিত্রে লেখিকা যে আদর্শের ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা ছায়াশরীরী হইয়া যায় নাই। বরং তাহা বঙ্গনারীর গৌরব স্বরূপই হইয়াছে। শ্যামাকান্ত, বিনোদ ওরফে নীরদ, হেমেন্দ্রনাথ, যোগেশ প্রভৃতি চিত্রগুলি রসবাস্তবতা লাভ করিয়াছে। লেখিকার রচনা কোনো স্থানে পান্‌সে হইয়া যায় নাই। তবে কোন কোন স্থানে রস জমিয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। দৃশ্যাদি বর্ণনার অতিরিক্ত বাক্‌জাল হইতে লেখিকা সর্ব্বত্র রক্ষা পান নাই। এবং কোনো কোনো স্থানে বর্ণ বৈচিত্র্যের অভাবে উপন্যাসের সম্বন্ধ স্থানগুলিকে তিনি পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তথাপি আমরা অসঙ্কোচে একথা বলিতে পারি যে, 'পোষ্যপুত্রের মতো সুন্দর উপন্যাস বহুদিন আমরা পড়ি নাই। পুস্তকের ছাপা ভালো, বাঙালীর ঘরে ঘরে এই পুস্তকের আদর হইবে।

নীলাম্বরী—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৭১ পৃষ্ঠা, মূল্য বারো আনা।

এখানি কয়েকটি ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি। ইহাতে নীলাম্বরী হতভাগ্য' 'প্রেমে প্রতিদন্দ্বী', ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' 'আশার সমাধি' 'ঘুমের পাহাড়', 'প্রত্যাবর্ত্তন ও বাঁশী-চোর' এই আটটি গল্প আছে। খগেন্দ্র বাবুর নাম সাহিত্যানুরাগীদিগের নিকট অপরিচিত নহে। 'নীলাম্বরী', 'বাঁশী-চোর', 'প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্প কয়েকটি বাংলা ছোট গল্পের রাজ্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবে। খগেন্দ্র বাবুর ভাষায় কোনোরূপ ন্যাকামী বা মুদ্রাদোষ নাই, দেখিয়া আমরা সাতিশয় প্রীতি ও আনন্দিত হইয়াছি। তবে তিনি সর্ব্বত্র ছোট গল্পের আর্ট বজায় রাখিতে সমর্থ হন নাই। অনেক জায়গায় দীর্ঘ বক্তৃতায় রসভঙ্গ হইয়াছে। তথাপি 'নীলাম্বরী' উপভোগ্য হইয়াছে। ছাপা কাগজ ভালো।

অন্তহীন।

কেমনে বলিব ক্ষুদ্র মানবের মন?
যার সেই ক্ষুদ্র ঘরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ধরে
তরুতৃণ পুষ্প পাতা অগণ্য নক্ষত্র গাঁথা
অনন্ত গগন,
স্মৃতির নির্ঝরে যার মহাকাল পারাবার
বন্দী অনুক্ষণ,
সীমাহীন ভবিষ্যৎ যেথায় হারায় পথ
নিভৃত মন্দিরে যার বিশ্বব্যাপী দেবতার
অচল আসন!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

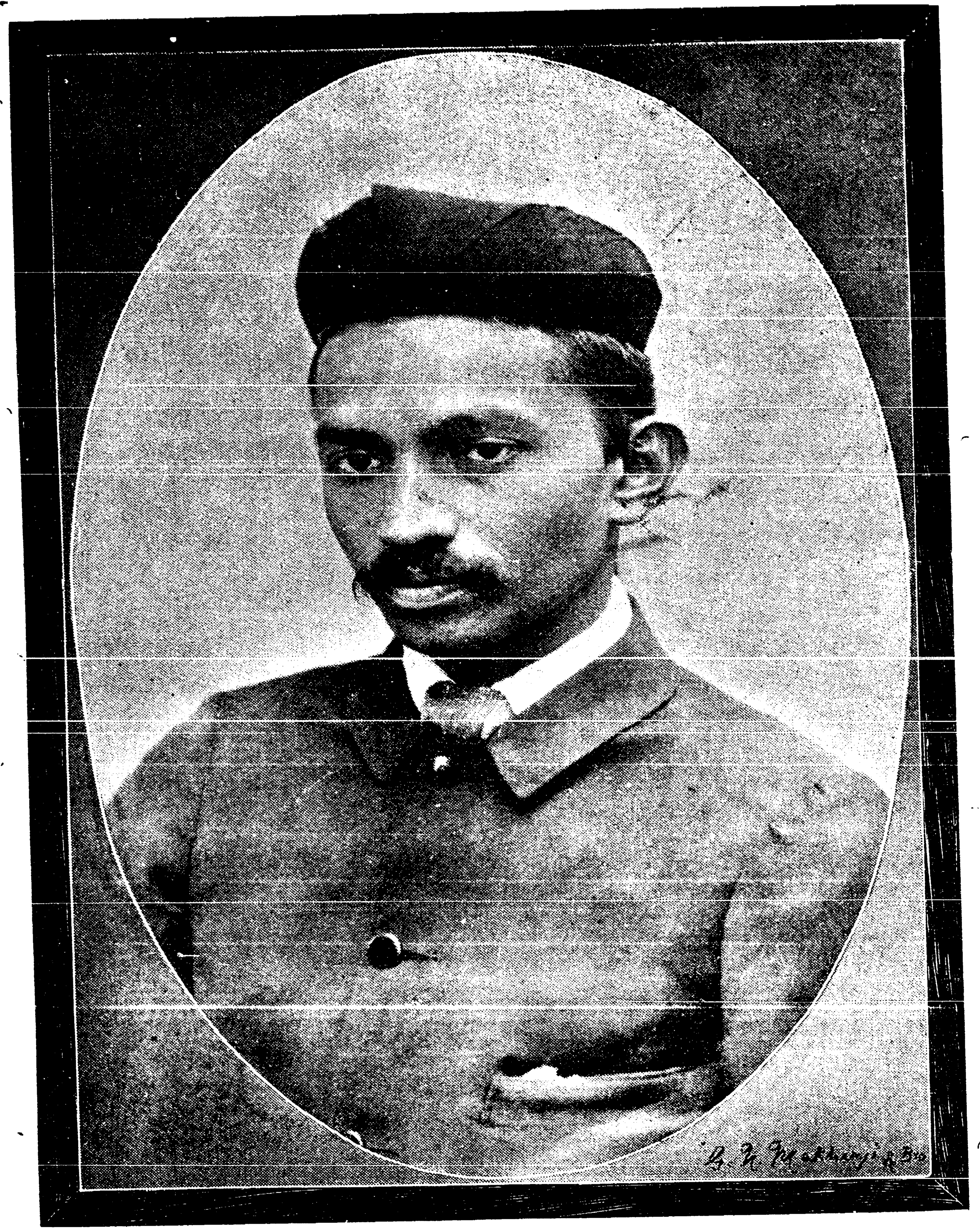

শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি।

সাম্যপ্রেস, ৬নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

Presented to the K. P. L.
by Shiva Prashad Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের
জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { অগ্রহায়ণ, ১৩২০। } ৫ম সংখ্যা।

তুর্কী নারী জীবন।

নারীর সম্মান।

আমাদের হতভাগ্য পতিত দেশে রমণীদিগকে যেরূপ অনেক স্থলেই লাঞ্ছিত অবমানিত অনাদৃত এবং ঠাট্টা তামাসার বিষয়ীভূত হইতে দেখা যায়, তুরস্কে সেরূপ ঘটনা কদাপি ঘটে না। আমাদের দেশে অনেক সময় অনেক পদস্থ এবং শিক্ষিত ব্যক্তিকেও রমণীগণকে এ সংসারের পাপ এবং বিপদের হেতু বলিয়া বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি। চোর, ডাকাত এবং আততায়ীর সংখ্যা পুরুষদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ সত্ত্বেও অনেককেই স্ত্রীজাতির কুৎসা কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ দেখা যায়। কিন্তু তুর্কীগণ তাঁহাদের মাতৃজাতি সম্বন্ধে এরূপ ঘৃণিত ধারণা পোষণ করেন না। তুর্কীরা বীরজাতি বলিয়াই হউক বা যে কোনও কারণেই হউক, স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সর্ব্বদাই একটা সম্মানের ভাব পোষণ করেন। যে কোনও তুর্কী পুরুষ, যে কোনও তুর্কী মহিলাকে হাটে মাঠে ষ্টীমারে বা রেলে যে কোনও প্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। দীর্ঘকাল ইউরোপে বাস করিলেও এবং অধুনা ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও তুর্কীদিগের মধ্যে খ্রীষ্টানদিগের ন্যায় রমণীর প্রতি চটুলতার ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। খৃষ্টান ও তুর্কী উভয়েই স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী। কিন্তু এই সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। খৃষ্টান স্ত্রী ও পুরুষ সমাজের বাহিরের জীবনে (public life) পরস্পর সহচরী ও সহচর সদৃশ। কিন্তু তুর্কীদিগের ভাব মাতা ও পুত্র সদৃশ। অতি শুদ্ধ এবং পবিত্র। কোনও প্রকার হাসি ঠাট্টার ভাব নাই। ধীর গম্ভীর শান্ত এবং সংযত।

স্ত্রী-স্বাধীনতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের ন্যায় তুরস্কে

নারীজাতি গৃহ কোণে বন্দিনী নহেন। তুর্কী জাতি ভারতীয় মুসলমানগণের ন্যায় ধর্ম্ম এবং ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিশ্বসংসারের সমস্ত কার্য্য সমস্ত আন্দোলন এবং সমস্ত দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা হইতে নারী সমাজকে বঞ্চিত করিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন নাই। স্ত্রীলোকেরা সেখানে দিবাভাগে প্রয়োজন মত হাটে বাজারে সর্ব্বত্রই গমনাগমন করিয়া থাকেন। নমাজ পড়িবার জন্য প্রত্যেক মস্‌জিদেই স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র আসনের বন্দোবস্ত আছে। সভা সমিতিতেও স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন। ময়দানে পার্কে এবং সমুদ্রে হাওয়া খাইবার জন্য স্ত্রীলোকেরা অবাধে বিচরণ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের আবশ্যকীয় জিনিস স্বহস্তে দোকান হইতে খরিদ করেন। নব বিবাহিতা যুবতীদিগকে অনেক সময় স্বামী নিজের সঙ্গে করিয়া বাজারে লইয়া যান। বিবাহিতা যুবতীরা গৃহের বাহিরে যাইবার সময় বিশেষতঃ বাজারের মধ্যে যাতায়াত কালে মুখের উপরে এক খণ্ড পাতলা কৃষ্ণবর্ণ পরদা ঝুলাইয়া দেন। কিন্তু যাঁহাদের যৌবন উত্তীর্ণ বা উত্তীর্ণ প্রায় হইয়াছে, তাঁহারা প্রায় এরূপ পর্দ্দা ব্যবহার করেন না। স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাহিরে দোকানদার ব্যতীত কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মহিলাদিগের ন্যায় কখনও হোটেলে পানাহার করেন না। হোটেলে পানাহার করা স্ত্রীলোকের পক্ষে তাঁহারা অপমান জনক বলিয়া মনে করেন। সন্ধ্যার পরে কোনও তুর্কী মহিলা গৃহের বাহির হন না।

শুক্রবারের নমাজ বাদে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও পার্কে, উদ্যানে বা ময়দানে একত্রিত হন। সেখানে স্ত্রীলোকেরা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা এবং আন্দোলন করেন। অপরাহ্নে বস্‌ফোরাসে বা গোল্ডেন হর্ণে নৌকা সহযোগে হাওয়া খাইতে থাকেন। অনেক রমণী সুপ্রসিদ্ধ তাপস হজরত আয়ুব আন্‌সারী কিম্বা হজরত ইউশা আলায়হেচ্ছালামের মজার শরিফ (পবিত্র সমাধি) জেয়ারত বা দর্শন করিতে যান। মহিলারা সাধারণতঃ সহরে পদব্রজেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

মহিলাদিগের সম্মান।

তুর্কীরা মহিলাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে অভ্যস্ত। প্রত্যেক রেল গাড়ীতে, ট্রামে এবং ষ্টীমারে স্ত্রীলোক এবং পুরুষদিগের বসিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন আছে। যদি ঘটনাক্রমে কখনও স্ত্রীলোকদিগের আধিক্য বশতঃ তাঁহাদের আসনগুলি পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে যে কোনও পুরুষ যাত্রী—তিনি পাশাই হউন আর সোলতান পুত্রই হউন,—অবিলম্বে সাগ্রহে তাঁহার নিজের আসন ত্যাগ করিয়া সমাগত মহিলাকে আসন প্রদান করিয়া থাকেন। কোনও মহিলার সঙ্গে কোনও জিনিসপত্র ট্রাঙ্ক বা পেটিকা থাকিলে, তাহা যদি তুলিবার বা নামাইবার জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে কোনও পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

গার্হস্থ্য বিবরণ।

আমাদের দেশে ধারণা আছে যে, স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে গৃহ কর্ম্মে পটুতা লাভ করিতে পারে না। আমাদের দেশের শিক্ষিতা মহিলাদিগের সম্বন্ধে এ কথা কতটা প্রযোজ্য তাহার আলোচনা করিতে চাহি না, কিন্তু তুর্কী রমণীদিগের সম্বন্ধে এ কথা আদৌ প্রযোজ্য নহে। আমাদের দেশের ন্যায় তুরস্কে চাকর চাকরাণী রাখা সহজ ব্যাপার নহে। ৫৲।৩০৲ টাকার কমে একজন সাধারণ ভৃত্য রাখা যায় না। মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর পরিবারে প্রায় চাকর চাকরাণী নাই। সুতরাং মহিলাদিগকে গৃহের সমস্ত কার্য্যই স্বহস্তে সম্পন্ন করিতে হয়। আমাদের দেশের ন্যায় তুর্কীরাও একান্নভুক্ত পরিবারে বাস করেন। বধূ শাশুড়ীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া চলেন কিন্তু তাই বলিয়া বধূ আমাদের দেশের হিন্দু মুসলমান সমাজের বধূদিগের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে শাশুড়ীর অধীন নহে। পরিবারস্থ সকলে সাধারণতঃ শান্তি এবং সদ্ভাবের সহিত বাস করেন। তুরস্কে অবস্থানকালীন, ইংরাজ ফরাসী এবং আমেরিকান বহুদর্শী পুরুষ ও রমণীদিগের লিখিত পুস্তকেও তুর্কীদিগের পারিবারিক জীবনের শান্তি শৃঙ্খলা এবং সদ্ভাব সম্বন্ধে অনেক উচ্চ মন্তব্য পাঠ করিয়াছি।

আমরা কনষ্টান্টিনোপলের "কদিরগাহ্ হাঁসপাতালে" প্রায় একমাসকাল বাস করিয়াছিলাম। এই হাঁসপাতালের চতুর্দ্দিকেই মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর তুর্কীদিগের মহল্লা ছিল। প্রত্যেক মহল্লাতেই অনেক ছেলেমেয়ে দেখিতে পাইতাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কখনও আমরা কোনও ছেলে মেয়েকে ক্রন্দন করিতে বা পরস্পর মারামারি বা কলহ করিতে দেখি নাই।

কোনও দিন কোনও গৃহে রমণীর উচ্চকণ্ঠ বা বিবাদ কলহের শব্দ শুনিতে পাই নাই। তুর্কী পরিবারের এই নিরাবিল শান্তি এবং সদ্ভাবের জন্য ইউরোপের স্বাতন্ত্র্য প্রিয় ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মান, রুষ, গ্রীক প্রভৃতি শতশত রমণী তুর্কী যুবকের পরিণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া একান্নভুক্ত পরিবারে বাস করিতে কিছুমাত্র অসুবিধা: বোধ করেন না। ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার উপর তুর্কী মহিলারা কখনও ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা, মহিলাদিগকে বিলাসিনী করিয়া তুলিবে বলিয়া, কিছুদিন পূর্ব্বে তুরস্কে একটী প্রবল জনশ্রুতি উঠিয়াছিল। কিন্তু পরম আনন্দের বিষয় এই যে, নব্য শিক্ষিতা তুর্কী নারীগণ এই জনশ্রুতি বা জন-আশঙ্কা অলীক কল্পনায় পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পারিবারিক শৃঙ্খলা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিক্ষিতা রমণীদের হস্তে তুর্কী যুবকেরা সাংসারিক দৈনন্দিন ব্যয়ভার অর্পণ করায় অনিষ্টের পরিবর্ত্তে ইষ্টই সাধিত হইয়াছে। তুর্কী রমণীরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, নির্দ্দিষ্ট অর্থে পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ বিষয়ে পুরুষদিগের অপেক্ষা রমণীরা অধিকতর পটু। পারিবারিক দায়িত্বজ্ঞান পুরুষদিগের অপেক্ষা রমণীদিগের অধিক। অনেক উচ্চ শিক্ষিতা সম্ভ্রান্তা মহিলা এই জাতীয় দুর্দ্দিনে অতীব কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। প্রমাণ স্থলে তুর্কী গবর্ণমেণ্টের মস্তিষ্ক স্বরূপ নব্য তুর্কীর মন্ত্রদাতা এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী মহামনা তালাত বে মহোদয়ের স্ত্রীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি স্বহস্তে গৃহের যাবতীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। তাঁহার গৃহে একটি চাকর বা চাকরাণী নাই। তালাত বে স্বরাষ্ট্র সচিব হইলেও মাসে মাত্র ৩০৲ টাকা রাজকোষ হইতে গ্রহণ করেন। সুতরাং এই সামান্য টাকায় তাঁহার ন্যায় পদস্থ ব্যক্তিকে কিরূপ দৈন্য সহকারে দিন গুজরান করিতে হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার গুণবতী এবং স্বদেশ হিতৈষী ভার্য্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক এই দীনতা এবং কঠোর পরিশ্রম বরণ করিয়া লইয়া নারীর বিলাসবিমুখতা এবং স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

মধ্যবিত্ত অধিকাংশ তুর্কী পরিবারের স্ত্রীলোকগণ স্বহস্তেই বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া থাকেন। তুরস্কে ধোপার পারিশ্রমিক যেরূপ বেশী এবং তুর্কীরা যেরূপ প্রচুর বস্ত্রাদি ব্যবহার করেন, অন্যদিকে তাঁহারা যেরূপ চরম মাত্রায় পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন, তাহাতে এই প্রকারে বাড়ীতে কাপড় ধুইবার ব্যবস্থা বিশেষ মঙ্গল জনক। ইহাতে অনেক অর্থ বাঁচিয়া যায়। শিক্ষিতা মহিলারা স্বহস্তে বস্ত্র ধৌত এবং তাহা নিজের ইচ্ছানুযায়ী ইস্ত্রী করিয়া লইতে আমোদ উপভোগ করেন।

তুর্কী নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

তুরস্কের আর্টস্কুলে বা কলাবিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকারের জন্য শিক্ষিতা মহিলাগণ সম্প্রতি এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। আর্ট বিভাগের অধ্যক্ষ রমণীদিগের আকাঙ্ক্ষা অচিরে পূর্ণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

উচ্চ চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যও রমণীদিগের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই কনষ্টান্টিনোপলে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেক

তুর্কী মহিলা এই বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া বিশেষ:যশের সহিত ধাত্রীর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

পোষাক পরিচ্ছদ।

অধুনা তুর্কী রমণীরা সকলেই ফরাসী পরিচ্ছদ

প্রবন্ধ লেখক সিরাজী।

পরিধান করেন। মস্তকে টুপী ব্যবহারের পরিবর্ত্তে একখণ্ড কারুকার্য্য খচিত শ্বেত বা কৃষ্ণ বর্ণের রুমাল ব্যবহার করেন। কোন পর্ব্ব বা উৎসবাদি উপলক্ষে নানাবর্ণের !কারুকার্য্য খচিত টুপী ব্যবহার করেন। তুরস্কে বাল্যবিবাহ এবং অবরোধ প্রথা না থাকায় মহিলারা বেশ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ। ১৭।:৮ বৎসরের নীচে প্রায়ই মেয়েদের বিবাহ হয় না। বিবাহিতা রমণীরা গৃহের বাহির হইবার সময় "চারশাফ" নামক এক প্রকার অতিসুন্দর 'বোর্কা' পরিধান করেন। ইহাতে সমস্ত শরীর বেশ সুন্দরভাবে আবৃত হ[illegible] ভারতবর্ষে এই তুর্কী বোর্কা বা "চারশাফে"র প্র[illegible] লন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অলঙ্কারাদি।

তুর্কী মহিলারা অলঙ্কার পরিধান বিষয়ে একেবারেই উদাসীন। হাতের অঙ্গুরী এবং গলার হার ব্যতীত তাঁহারা আর কোনও অলঙ্কার পরিধান করেন না। ইউরোপীয় অনেক খৃষ্টান মহিলা কর্ণে দুল এবং হাতে বলয় বা চুড়ি পরিধান করেন; কিন্তু তুর্কী রমণীরা তাহাও পরিধান করেন না। শিক্ষাও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশ হইতেও বালিকাদিগের নাসা কর্ণবেধ উঠিয়া গেলেই মঙ্গল।

নৈতিক জীবন।

তুর্কী নারীদিগের নৈতিক জীবন অতি উন্নত এবং পবিত্র। কনষ্টান্টিনোপলবাসী ইংরাজ ফরাসী এবং ইটালীয়ানদিগের মুখেও তুর্কীনারীদিগের সতীধর্ম্মের অতি উচ্চ প্রশংসা শুনিয়াছি। তুর্কীরা বলেন, "রমণীরাই আমাদের জাতির গৌরব। তাঁহাদের চরিত্র এবং ধর্ম্মপ্রভাবে আজও আমরা টিঁকিয়া আছি।" তুর্কীনারীর ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি ও খ্যাতি সম্বন্ধে একটী প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি। কনষ্টান্টিনোপল মহানগরীতে অধুনা ২৫ লক্ষ লোকের বাস। কনষ্টান্টিনোপলের তুর্কীদিগের অধিবাস অংশ স্কুটারি এবং স্তাম্বুলে কোনও চরিত্রহীনা রমণী নাই। কিন্তু ইউরোপীয়ান কোয়ার্টার পেরায় এইরূপ ৭।৮ শত রমণী আছে। এই ৭।৮ শত রমণীর মধ্যে তুর্কী রমণীর সংখ্যা মাত্র ৬ জন। অবশিষ্ট সমস্তই ইউরোপীয় বিভিন্ন রাজ্যের খৃষ্টান নারী। নগরের মিউনিসিপ্যালিটীর কোনও বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে আমরা এ তত্ত্ব অবগত হইয়াছি।

আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা।

তুর্কী রমণীরা প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সঙ্গীত এবং কবিতা-আবৃত্তি বিষয়ে বেশ পটু। ময়দানে পরিভ্রমণ এবং বস্‌ফোরাস এবং "গোল্ডেন হর্ণে" নৌকারোহনে তাঁহারা বেশ আনন্দ লাভ করেন। রমণীদিগের দ্বারা পরিচালিত নারীজাতির মধ্যে উচ্চ আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সম্প্রতি কয়েকটী থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভদ্র ও শিক্ষিতা মহিলারা এখানে অভিনয় করিয়া থাকেন। ছোট ছোট বালক ব্যতীত পুরুষদিগের ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। তবে অভিনয়ের সমালোচনার জন্য বিশেষতঃ কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বা কোনও ধর্ম্মাচার্য্যকে আহ্বান করা হয়। সম্প্রতি জাতীয় দুর্দ্দিন ও শোকের জন্য সমস্ত তুর্কী থিয়েটারই বন্ধ আছে।

সৌন্দর্য্য।

তুর্কীরা পৃথিবীর মধ্যে কেবল সভ্যতম এবং শিষ্টতম জাতি নহে, পরন্তু সৌন্দর্য্যেও তুর্কীদিগের সমকক্ষ পৃথিবীতে আর কোনও জাতি নাই। যে কোনও জাতীয় যে কোনও ব্যক্তি তুরস্ক ভ্রমণ করিয়াছেন; তিনিই তুর্কীদিগের ভদ্র বিনয়পূর্ণ উদার ব্যবহার এবং আতিথেয়তা ও তাঁহাদের সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ নিন্দিত কমনীয়কান্তি এবং মধুর মোলায়েম প্রীতিপূর্ণ চেহারায় মুগ্ধ লুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তুর্কীদিগের এই অসাধারণ ভদ্রতা এবং নম্রতার কারণ; তাঁহাদের "তালিমে আখ্‌লাক" বা চরিত্র গঠন বিদ্যা। আর অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও রূপের কারণ;—ছয় শত বৎসর ধরিয়া সার্কেশিয়ান, জর্জ্জিয়ান, গ্রীক, ইহুদী, আর্ম্মানী, আরব প্রভৃতি জাতি হইতে কন্যা গ্রহণ। এই বিভিন্ন জাতি হইতে ভার্য্যা গ্রহণের ফলে তুর্কিজাতির মধ্যে এতগুলি সুন্দর জাতির সৌন্দর্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়া একসঙ্গে ষোলকলায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সিরাজী।

আলেক্জান্দারের অভিযান সম্বন্ধে কয়েকটী মন্তব্য।*

১। পুস্তকাবলী (Bibliography)

কালিসস্থিনিস, মিশর-রাজ টলেমি, আলেকজান্দারের নাবধ্যক্ষ নিয়ার্কাস, রণতরী পরিচালক অনিসিক্রিটস, আরিষ্ট বুলস, বীটন, ডায়গনীটস প্রভৃতি, যাঁহাদিগকে আলেকজান্দার তাঁহার অভিযানকালীন রাজপথাদি পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা আলেকজান্দারের অভিযানের সকল বৃত্তান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের লিখিত বৃত্তান্তাদিই অত্যন্ত মূল্যবান হইলেও, বর্ত্তমানে ঐ সকল আর পাওয়া যায় না। এই সকল গ্রন্থকারগণের বর্ণনাদি দায়দরস, কুইণ্টাস কার্টিয়াস, প্লুটার্ক লিখিত "আলেকজান্দারের জীবনী" এবং আরিয়ানের "আনাবেসিস" ও "ইণ্ডিকায়" অনেক পরিমাণে "Itinerarium of Alexandii" ("আলেকজান্দারের পরিভ্রমণ") নামক লাটীন ভাষায় লিখিত গ্রন্থে অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। অধুনা সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক পরলোকগত নিবুর (Niebuhr) লিখিত "Lectures on Ancient History," আত হল্‌ম লিখিত "History of Greece," ডজের (Dodge) "Alexander," অধ্যাপক মাহাফি প্রণীত "Problems of Greek History," এবং হুইলার বর্ণিত "Alexander the Great" নামক গ্রন্থ গুলিতে এই বিষয়ের বিশেষ বর্ণনাদি ও আলেকজান্দারের চরিত্রের বিশ্লেষণাদি আছে।

আরিয়ান নামক উপর্য্যুক্ত গ্রন্থ দুইখানি এই বিষয় আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত মুল্যবান। প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে বিথীনিয়া প্রদেশান্তর্গত নিকোমিডীয়া নগরে আরিয়ান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি, দার্শনিক, রাজনৈতিক, যোদ্ধা, ও ঐতিহাসিকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দার্শনিক এপিকটেটাসের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া, রোমক সম্রাট আণ্টোনিয়াস পিয়াস তাঁহাকে কনসাল নিযুক্ত করেন। শেষ জীবনে, তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, জন্মস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও তথায় ইতিহাস রচনায় কালযাপন করেন। তিনি সম্রাট মার্কাস ওরিলিয়াসের রাজত্বকালে বৃদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

আরিয়ানের লিখিত পুস্তক দুইখানিকেই † মনিষিগণ অত্যন্ত প্রশংসার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং তাঁহার লিখিত বর্ণনাকে অনেকাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন। স্বয়ং আরিয়ান নিজ গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "আমার গ্রন্থে, লাগাসপুত্র টলেমি এবং আরিষ্ট বুলস বর্ণিত বর্ণনার, কেবল সত্যঘটনাই গ্রহণ করিয়াছি। টলেমি ও আরিষ্ট বুলসের মধ্যে বৈষম্য দৃষ্ট হইলে, যাহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার আলেকজান্দারের কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছেন। আলেকজান্দার সম্বন্ধে যত অধিক কথা লেখা হইয়াছে এরূপ আর কাহারও সম্বন্ধে হয় নাই এবং আলেকজান্দারের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে যেরূপ মতদ্বৈধতা দৃষ্ট হয়, তাহাও আর কাহারও সম্বন্ধে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু, আমার মতে টলেমি ও আরিষ্টবুলসের বর্ণনাই অধিকতর গ্রহণীয় বলিয়া মনে হয়। কারণ প্রথমোক্ত, আলেকজান্দারের অভিযানে তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন, এবং শেষোক্ত স্বয়ং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকায়, মিথ্যা বর্ণনা করিলে অন্যাপেক্ষা তিনি অধিকতর নিন্দনীয় হইতেন। অধিকন্তু, অন্য একটী কারণেও তাঁহাদের বৃত্তান্ত অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে

* মৎ-সম্পাদিত "সমসাময়িক ভারত" গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত তৃতীয় খণ্ডে এই সকল বিষয় বিষদরূপে আলোচিত হইতেছে।

† অধ্যাপক ম্যাক্রিণ্ডল অনুবাদিত আরিয়ান অনেক অভাব মোচন করিয়াছে।

পারে। উভয়েই আলেকজান্দারের মৃত্যুর পরে, নিজ নিজ পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন কারণ, তখন আলেজান্দারের ভয়ে ভীত হওয়া বা তাঁহার পুরস্কারের প্রলোভনে প্রলোভিত হইবার কোন কারণই ছিল না। অন্য লেখকগণ কর্ত্তৃক কোন কোন ঘটনাও আমি গ্রহণ করিয়াছি; কারণ সেগুলি উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং একেবারে অসম্ভব নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। কিন্তু, সেগুলি আমি সাধারণ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি কোন ব্যক্তি মনে করেন, এতগুলি ইতিহাস থাকিতে, কেন আমি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহা হইলে, তিনি যেন প্রথমে আমার পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া, পরে, যদি সম্ভব হয়, তবে যেন আমার পুস্তক লেখার কারণ অনুসন্ধান করেন।"

বঙ্গভাষায় পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত "ভারতে অলিকসন্দর" ও পণ্ডিতবর রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের লিখিত কয়েকটী প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আলেক্জান্দার।
(নেপলস নগরের যাদুঘরে রক্ষিত মূর্ত্তি হইতে)

২। আলেক্জান্দারের অভিযানের সময়।

আলেক্জান্দারের অভিযানের সময় লইয়া পূর্ব্বে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। নিয়ার্কাস নামক আলেক্জান্দারের প্রথিতনামা নাবধ্যক্ষের লিখিত বর্ণনা সম্বন্ধে ভিনসেণ্ট নামক ইংলণ্ডীয় এক লেখক গবেষণাপূর্ণ এক পুস্তক লিখিয়াছেন। টীকাকার ভিনসেণ্ট

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১৫ সনে ওয়াটারলুর যুদ্ধের বৎসরে দেহত্যাগ, করেন। তিনি ১৭৭৯ সনে অল্ হালোসের (All Hallows) রেক্টর, ১৮০১ সনে ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের প্রধান শিক্ষক ও পরবর্ত্তী বৎসরে "ডীন" (Dean) পদে নিয়োজিত হন। তৎকালে তাঁহাকে ইউরোপের অভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্গ মধ্যে উচ্চস্থান প্রদান করা হইত। 'Defence of Public Education," "The Commerce and Navigation of the Ancients," "Voyage of Nearchus" নামক পুস্তকগুলি শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানেও যথেষ্ট আদরণীয় আছে। শেষোক্ত পুস্তকখানি ১৭৯৭ সনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য। প্রভূত গবেষণাপূর্ণ এই পুস্তকে ভিনসেণ্ট আলেক্জান্দারের অভিযান ও নাবধ্যক্ষ নিয়ার্কাসের জলযাত্রা সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ তাঁহার ও আধুনিক প্রাজ্ঞগণের নির্দ্ধারিত সময়ে প্রায় দুই বৎসরের প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তথাপি, ভিন্সেণ্ট আলেকজান্দারের অভিযান সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া যে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহারই পর্য্যালোচনার ফলে যে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহেরই হেতু নাই।

আলেকজান্দারের ভারতীয় অভিযানে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ৩২৭ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি হিন্দুকুশ অতিক্রম করেন এবং ৩২৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি সুসায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ের মধ্যে, তিনি সিন্ধুর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী জনপদে ঊনবিংশ মাস (৩২৬ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের মার্চ্চ হইতে, ৩২৫ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে) অতিবাহিত করেন। প্রথমোক্ত তারিখে তিনি সিন্ধুর উপরিস্থ সেতুদ্বারা সিন্ধু অতিক্রম করেন এবং শেষোক্ত তারিখে তিনি থারাবিস জাতির রাজ্যে উপনীত হন।

আলেকজান্দারের অগ্রসর।

৩২৭ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ।

মে—হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রমণ।

জুন—পার্ব্বত্যজাতিকে পরাভূত করিবার জন্য আলেকজান্দারের এবং কাবুল নদীর উপত্যকায় তাঁহার অন্যতম সেনাপতি হিফেসটীয়নের অগ্রসর।

আগষ্ট—হিফেসটীয়ন কর্ত্তৃক হস্তীজাতির নগর অধিকার।

সেপ্টেম্বর—মাসাগা প্রভৃতি অধিকার।

নবেম্বর ও ডিসেম্বর—আয়র্নস অধিকার।

৩২৬ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ।

জানুয়ারী—ওহিন্দ

ফেব্রুয়ারী—সৈন্যগণের বিশ্রাম।

মার্চ্চ—তক্ষশীলা।

এপ্রিল ও মে—হাইডাসপিস তীরে পৌঁছান।

জুলাই—হাইডাসপিসের যুদ্ধ—পোরসের পরাভব—সন্ধি—নিকাইয়া এবং বৌকেফলা নামক নগর স্থাপন।

আগষ্ট—কাফিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধ।

সেপ্টেম্বর—হাইফানিস তীরে পৌঁছান এবং সৈন্যগণের অগ্রসর হইতে আপত্তি।

আলেকজান্দারের প্রত্যাগমন।

৩২৬ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ।

সেপ্টেম্বর হইতে অক্টোবর...হাইডাসপিস তীরে প্রত্যাগমন।

অক্টোবরের শেষভাগ......নিয়ার্কাসের জলযাত্রা।

৩২৫ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ।

জানুয়ারী—মাল্লিজাতির পরাজয়।

জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর—সগদি, সাম্বস ও মৌসি কানিস জাতির পরাভব।

অক্টোবরের শেষ ভাগ......নিয়ার্কাসের পারস্যোপসাগরের দিকে যাত্রা।

অক্টোবরের প্রারম্ভ...আলেকজান্দারের গেড্রোসিয়া অভিমুখে যাত্রা।

৩২৩ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ।

জানুয়ারী—আলেকজান্দারের গেড্রোসিয়ার রাজধানী পৌরায় পৌঁছান।

ফেব্রুয়ারী—কারমেনিয়ার মধ্য হইয়া যাত্রা।

এপ্রিলের শেষ অথবা মের আরম্ভ—সুসা।

জুন—আলেকজান্দারের মৃত্যু।

আরিয়ান তাঁহার "ইণ্ডিকা" গ্রন্থের একবিংশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন "যখন দক্ষিণ পশ্চিম দিকস্থ সাময়িক বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছিল, তখন নিয়ার্কাসের নৌবাহিনী আলেকজান্দারের রাজত্বের একাদশ দিবসে অগ্রসর হইতে থাকে। যে বৎসরে কেফিসোদরস আথেন্সে আর্কন পদে ব্রতী ছিলেন, সেই বৎসরের বিদ্রোমিয়ন মাসের ২০ তারিখে নৌবাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে।"

এই সম্বন্ধে ভিনসেণ্ট যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভিনসেণ্টের নির্দ্ধারণ ভ্রমপূর্ণ হইলেও উহা উল্লেখ-যোগ্য।

"নিয়ার্কাস বলিয়াছেন যে, সিন্ধুর নিকটবর্ত্তী স্কন্দাবার হইতে নৌবাহিনী কেফিসোদরসের "আর্কন" থাকা কালীন "বিদ্রোমিয়নের" বিংশতি দিবসে আলেকজান্দারের রাজত্বের একাদশ বর্ষে অগ্রসর হয়। কিন্তু, আর্কনদিগের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহা সঠিক নহে। ডডওয়েল এবং উসার, দায়দরস, সিকুলাস এবং অন্যান্য গ্রন্থকার হইতে উদ্ধৃত করিয়া

আলেক্জান্দার ও পোরস।
(পাশ্চাত্য চিত্রকরের চিত্র হইতে)

আর্কনদিগের তিনপ্রস্থ নাম দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু, এই তিনটীতেই এরূপ ভুল দৃষ্ট হয় যে, উহা হইতে কিছুই সঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না। তবে, আলেকজান্দারের রাজত্বের একাদশ বর্ষে এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হয়, এই উক্তি হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে, আলেকজান্দার অলিম্পিক অব্দের প্রথম বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। ডডওয়েলের মতে খৃষ্টের জন্মের ৩২৫ বৎসর পূর্ব্বে জুলাই মাসের ২৫শে তারিখে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। প্রকৃত তারিখ সম্বন্ধে নানা-মুনির নানা মত দেখা যায়। যদি আলেকজান্দার ৩৩৬ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর সিংহাসনাধিরোহন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রাজত্বের একাদশ বৎসর ৩২৬ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দের ২৪এ সেপ্টেম্বর তারিখে আরম্ভ হইয়াছিল এবং নৌবাহিনী যখন অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে যাত্রা করে নাই, তখন এই তারিখ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। আরিয়ানও এই তারিখের কথাই বলিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে আর্কনের নামে বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, মূল প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণে কোন ত্রুটী হয় না।

দায়দরস এক বৎসরের প্রভেদ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই ঘটনা খৃষ্টের জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে সম্পাদিত হয়। পিটোভিয়াসও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। দায়দরসের বর্ণনা পাঠ করিলে প্রথমে মনে হয় যে, তিনি নৌবাহিনীর নিসিয়া ও সিন্ধু হইতে যাত্রা একই বলিয়া মনে করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বৃত্তান্ত পড়িলে ইহা মনে হয় না। অধিকন্তু তিনি ৩২৭ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দেই জলযাত্রা আরম্ভ ও শেষ করেন। ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আলেকজান্দার ৩২৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন এবং যখন সুসায় তাঁহার নিকট নৌবাহিনী পৌঁছিয়াছিল, সেই সময় হইতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল বিষয়ের সময় নির্দ্ধারণে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিতে হয় না।

যদিও ঐতিহাসিক হিসাবে এই তারিখ সঠিকরূপে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক, তথাপি ইহার অন্যান্য দিক দেখিলে, এই তারিখ নির্দ্ধারণ অত্যাবশ্যক বলিয়া বোধ হইবে না। মণ্টেস্ক বলিয়াছেন, নিয়ার্কাসের নৌবাহিনী সাময়িক বায়ুর প্রতিকূলে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ হইলে মাসিদোনিয়ান রণতরীগুলি কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিত না। সৌভাগ্যবশতঃ সাময়িক বায়ু আলেকজান্দারের সময়েও যে ভাবে প্রবাহিত হইত, অদ্যাপিও সেই ভাবেই প্রবাহিত হয় এবং ষ্ট্রাবো ও আরিয়ান নিসিয়া এবং সিন্ধু হইতে যাত্রার মাস এরূপ ভাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, উহাতে কোন সন্দেহই দেখা যায় না। এই উভয় গ্রন্থকারই আরিষ্টবোলস এবং প্লিনির পুস্তকাবলম্বন করিয়াছেন। আরিষ্টবোলস এবং প্লিনিতে এত সাদৃশ্য দেখা যায় যে, তাহাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারি না।

খ্রীষ্টের জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে সপ্তর্ষি মণ্ডলের অস্তগমনের কয়েক দিবস পূর্ব্বে নৌবাহিনী নিসিয়া যাত্রা করিয়াছিল, ষ্ট্রাবো এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। এই উক্তিটি কিছু আপত্তিকর বলিয়া মনে হয়। প্রাচীনেরা তাঁহাদের সপ্তর্ষিমণ্ডলের দুই প্রকার অস্তের কথা উল্লেখ করিতেন—প্রাতে ও সন্ধ্যায়। এই জন্যই কোন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, অক্টোবর মাসের ২০শে কিংবা ২১শে তারিখ হইতে প্লিয়াইডিস প্রাতঃকালে অস্তগমন করিত এবং অন্যত্র বলিয়াছেন যে, ২৮শে অক্টোবর প্লিয়াইডিস অস্তগমন করিত। ষ্ট্রাবো প্রাতঃকাল বা সন্ধ্যার কথা উল্লেখ করেন নাই এবং সেই জন্য পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থকারের মতানুসরণ করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, খৃষ্টের জন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে ২৩শে অক্টোবর নৌবাহিনী নিসিয়া হইতে যাত্রা করিয়াছিল।"

৩। নিয়ার্কাসের জলযাত্রা সম্বন্ধে ম্যাক্রিণ্ডলের মন্তব্য।

প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক সাধিত জলযাত্রার মধ্যে আলেকজান্দারের সংকল্পিত ও নিয়ার্কাস কর্ত্তৃক সম্পাদিত সিন্ধুর মোহনা হইতে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত জলযাত্রাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ভিনসেণ্ট বলিয়াছেন যে, ইহা হইতে

ইউরোপ ও এসিয়ার প্রান্তস্থিত প্রদেশ সমূহের সহিত সম্পর্ক সংস্থাপিত হয় এবং এই জলযাত্রাই পর্ত্তুগীজদিগের ভারত আবিষ্কারেরও আদিভূত কারণ। ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকারের মূলীভূত কারণও যে এই জলযাত্রা তাহাও এক প্রকারে উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিয়ার্কাস স্বয়ং এই অভিযানের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; যদিও বর্ত্তমানে উহা পাওয়া যায় না, তথাপি আরিয়ানের ইণ্ডিকায় নিয়ার্কাসের বর্ণনা গ্রন্থীভূত হওয়ায় উহা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

লেখক হিসাবে নিয়ার্কাস ধর্ম্মভীরু ও সাধু। তিনি তৎকালে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালেও তাহা সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ষ্ট্রাবো তাঁহার বর্ণনাকে অসত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন যে, "যে সকল লেখক ভারতবর্ষের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিথ্যাবাদী। ডিমাকস এই শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন; তৎপরে মেগস্থেনিস, অনিসিক্রিটস এবং নিয়ার্কাসের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আরও অনেকে আছেন, তাঁহারা দুই একটী সত্য কথা বলিয়াছেন।" এরূপ নিন্দাসূচক বাক্য প্রয়োগ সত্ত্বেও ষ্ট্রাবো ভারতবর্ষের বর্ণনাকালে নিয়ার্কাসের বর্ণনার উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছেন এবং নিয়ার্কাস কথিত অনেক বৃত্তান্ত নিজ গ্রন্থীভূত করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো কথায় যাহা বলিয়াছেন, কার্য্যে তাহার বিপরীত করিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণযোগ্য কি না তাহা বিচার সাপেক্ষ। তবে আমরা নিঃসন্দেহে ইহা বলিতে পারি যে, যে সকল লেখক আখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন, ষ্ট্রাবো আখ্যানের সত্যতা নিরূপণ না করিয়া সেই সকল লেখককেই নিন্দা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালেও হার্ড্‌য়িন এবং হুইয়েট পূর্ব্বোক্ত লেখকগণের বিরুদ্ধে এই প্রকার অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। যে স্থানে নিয়ার্কাস সিন্ধুর বিস্তৃতি ২০০ শত ষ্টাডিয়া বলিয়াছেন এবং যথায় তিনি বলিয়াছেন যে, মালানার ছায়া দক্ষিণ দিকে পতিত হয়, কেবল এই দুইটী স্থলেই এই অভিযোগ প্রযুক্ত হইতে পারে। প্রথমটী সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বর্ষাকালে সিন্ধুর বিস্তৃতি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়াতেই নিয়ার্কাস এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বোধ হয় যে, নিয়ার্কাস যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বোধগম্য না হওয়াতেই আরিয়ান ঐরূপ লিখিয়াছেন। যাহা হউক, ভ্রমবশতঃ নিয়ার্কাস এইরূপ লিখিলেও একটী উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও যে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিও প্রমাণ যোগ্য হইবে না, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

এতদ্ব্যতীত নিয়ার্কাসের বর্ণনার বিরুদ্ধে অন্য একটি অভিযোগও আনয়ন করা হইয়াছে। ডডওয়েল ইহা নিয়ার্কাসের লিখিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। প্লিনির একটী উক্তির উপর নির্ভর করিয়াই ডডওয়েল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সে উক্তিটি এই—"অনিসিক্রিটস বা নিয়ার্কাসের বর্ণনায় দূরত্ব উল্লেখ করা হয় নাই।" ইহা হইতে ডডওয়েল অনুমান করেন যে, যখন আরিয়ানের নিজ বর্ণনায় স্থানের নাম ও দূরত্ব প্রদান করা হইয়াছে, তখন আরিয়ানের বর্ণনা নিয়ার্কাসের বর্ণনা নহে; কারণ প্লিনি বলিয়াছেন যে, নিয়ার্কাসের বর্ণনায় এ সকল বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। এতদুত্তরে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অন্যান্য সকল লেখকাপেক্ষা প্লিনির কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বিশেষতঃ প্লিনিও সকল সময় সঠিক বর্ণনা প্রদান করেন নাই। অধিকন্তু আরিয়ান স্বয়ং গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে, তিনি নিয়ার্কাস লিখিত বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ স্থানটি সম্ভবতঃ ভ্রমসঙ্কুল অথবা তাহা না হইলেও পরবর্ত্তী স্থানের সহিত ইহার ঐক্যতা দৃষ্ট হয় না। ডডওয়েল এই দুই স্থানের বিভিন্নতার কারণ নির্দ্দেশে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন এবং সকল দিক পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আরিয়ানের গ্রন্থেই প্রকৃত নিয়ার্কাসের বর্ণনা গ্রথিত হইয়াছে।

৪। নিয়ার্কাসের জলযাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(এই স্থানে নিয়ার্কাসের বর্ণনার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও কিছু কিছু বিবরণ প্রদত্ত হইল।)

নিয়ার্কাস যে নৌবাহিনীর কর্তৃত্বে স্থাপিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কতকগুলি রণতরী এবং কতকগুলি রসদবাহী জাহাজ ছিল। এইগুলির কতক ঐ স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং হাইডাসপিস তীরে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই স্থানে আলেকজান্দার নৌ-বাহিনীর উপযুক্ত সৈন্য নিজ সৈন্যদল হইতে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। এবম্প্রকারে সংগৃহীত রণতরী সমূহ ধীরে ধীরে হাইডাসপিস, আকিসাইন ও সিন্ধু হইয়া অগ্রসর হইতেছিল। আলেকজান্দারের অন্যান্য সৈন্যগণ তীরপথে অগ্রগামী হইবার কালীন তীরস্থ যুদ্ধপ্রিয় জাতিগুলিকে পরাভূত করিতেছিল। ষ্ট্রাবোর মতে এই নিম্নাভিমুখী জলযাত্রায় দশ মাস অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ নয় মাসের অধিককাল অতিবাহিত হয় নাই। যাহা হউক নৌ-বাহিনী পাটল নামক স্থানে পৌঁছিয়া কিছুকাল তথায় অপেক্ষা করে। পাটল হইতে আলেকজান্দার সিন্ধুর পশ্চিম শাখা হইয়া যাত্রা করেন, কিন্তু এই স্থানে তাঁহার কতকগুলি জাহাজ বিনষ্ট হয় এবং কতকগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়! আলেকজান্দার তজ্জন্য পাটলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং তথা হইতে পূর্ব্বশাখা দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। ইহা পশ্চিম শাখাপেক্ষা কম বিপদসঙ্কুল ছিল। পুনর্ব্বার পাটলে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি পারস্যাভিমুখে যাত্রা করেন এবং নিয়ার্কাসকে যথা সময়ে অগ্রসর হইতে আদেশ প্রদান করেন। আলেকজান্দার নৌ-বাহিনীর অন্তর্ভূত সৈন্যাবলীর রসদ সংগ্রহাদির ব্যবস্থার জন্য, যতদূর সম্ভব উপকূলের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া অগ্রগামী হইতে অভিলাষী ছিলেন; কিন্তু এরূপ পথ দুর্গম বলিয়া, তিনি অন্য পথে সুসাভিমুখে প্রস্থান করেন। তিনি লিওনিটাসকে ওরিইটাই দেশে রাখিয়া যান এবং যাহাতে নিয়ার্কাস তদ্দেশে পৌঁছিলে, তিনি তাঁহাদের সাহায্য করেন, তজ্জন্য যথাযথ আদেশ প্রদান করেন।

আলেকজান্দারের প্রস্থানের পরে, নিয়ার্কাস কিলোট্টা বন্দরে এক মাস অতিবাহিত করেন, এবং পরে, সাময়িক বায়ু কিছুকালের জন্য প্রশমিত হইলে অগ্রসর হইলেন। তদ্দেশবাসী অধিবাসীদের আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবার জন্যও বন্দর পরিত্যাগের অন্যতম কারণ। ভিনসেণ্টের মতে নিয়ার্কাস ৩২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর কিলোট্টা পরিত্যাগ করেন। ধীরে ধীরে নদীপথে অগ্রসর হইয়া তিনি কিলোট্টা হইতে একশত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী ষ্টৌরা নামক স্থানে উপনীত হন। নৌ-বাহিনী এই স্থানে দুই দিবস অতিবাহিত করিয়া ৩০ ষ্টাডিয়া দূরস্থ কোন্ নামক স্থানে পৌঁছিয়া পুনরায় তথায় অবস্থিতি করেন। তথা হইয়া কোরিয়াটীস পৌঁছিয়া জাহাজগুলি আবার নঙ্গর করে। পুনর্ব্বার অগ্রগামী হইবার চেষ্টা করিলে তাঁহাদের গতি নদীমুখস্থ বিপজ্জনক পর্ব্বতে প্রতিহত হয়। বিশেষ চেষ্টা করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহারা অগ্রসর হইতে থাকেন এবং সমুদ্রবক্ষে ক্রোকালা দ্বীপে উপনীত হন। এই দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া নিয়ার্কাস বর্ত্তমান করাচী বন্দরে পৌঁছিয়া তথায় চতুর্ব্বিংশ দিবস অপেক্ষা করেন। নিয়ার্কাস এই বন্দরকে “আলেকজান্দারের বন্দর” নামে অভিহিত করেন।

৩রা ডিসেম্বর নৌবাহিনী এই বন্দর পরিত্যাগ করে ও ওরিইটাই প্রদেশের কোকালা বন্দরে উপনীত হয়। পথিমধ্যে খাদ্যাদির অভাবে ও ঝটিকাতে সৈন্যগণ বিশেষ কষ্টানুভব করে। যাহা হউক, লিওনিটাসের চেষ্টায় কোকালায় প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত হইয়াছিল এবং নিয়ার্কাস আবশ্যক খাদ্যাদি গ্রহণ করেন। এইস্থানে নৌবাহিনী প্রায় দশ দিবস অতিবাহিত করে। সাময়িক বায়ুর প্রকোপ এই সময়ে প্রশমিত হওয়াতে, নৌবাহিনী পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু ইকচি ও ফাগিগার দেশে খাদ্যাদির অভাবের জন্য নিয়ার্কাস আ... করিতেছিলেন, পশ্চাৎ সৈন্যগণ অনাহারে ও দৈব...

জাহাজ পরিত্যাগ করে। পারস্যোপসাগরের প্রণালীগুলি না পৌঁছান পর্য্যন্ত সৈন্যগণের ক্লেশান্ত হয় নাই। প্রণালী মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিয়ার্কাস আনামিস নদীর মোহানায় প্রবেশ করেন এবং তথায় পোতসংস্কার-স্থান নির্ম্মাণ ও নদীতীরে স্কন্দাবার স্থাপন করেন। এই স্থানের জলবায়ু প্রীতিকর ছিল এবং স্থানটীও উর্ব্বরা ছিল। নিয়ার্কাস এই স্থানে জানিতে পারিলেন যে, আলেকজান্দার মাত্র পাঁচ দিবসের দূরের পথে অবস্থান করিতেছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া তিনি আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাত করণাভিলাষে তথায় গমন করিলেন। ইতিমধ্যে জাহাজের সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হওয়াতে নিয়ার্কাস স্কন্দাবারে প্রত্যাগমন করিয়াই অগ্রসর হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। একবিংশতি দিবস এই স্থানে অতিবাহিত করিয়া, তাঁহারা কারা আগাব নামক স্থানে উপনীত হইলেন। তৎপরে, নানা স্থান হইয়া নিয়ার্কাস ডিরিডোটীস নামক বাবিলোনিয়ার এক বন্দরে পৌঁছিলেন। তথা হইতে টাইগ্রিস অভিমুখে প্রত্যাগমন করিয়া টাইগ্রিস নদী হইয়া সুসায় উপনীত হইলেন। এই স্থানে আলেকজান্দারের অধীনস্থ স্থলপথের সৈন্যগণ ও নিয়ার্কাসের অধীনস্থ জলপথের সৈন্যগণ একত্র হইল। আলেকজান্দার প্রীতিভরে নিয়ার্কাসকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সকলকে যথাযোগ্য পুরস্কারে প্রীত করিলেন। ভিনসেণ্টের মতে ৩২৫ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিয়ার্কাস তাঁহার জলযাত্রা শেষ করেন। সুতরাং সে হিসাবে ১৪৬ দিবসে এই ব্যাপার সমাধা হইয়াছিল।”

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

মোগল রাজত্বে পররাষ্ট্র নীতি।

ভারতীয় মোগল বাদসাহদের আমলে পররাষ্ট্রনীতি কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে যে সকল উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা নিতান্ত সামান্য মাত্র। তৎসম্বন্ধীয় ঘটনাগুলি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়াই যে এমন হইয়াছে, তাহা নহে; তৎসম্বন্ধে ঘটনারই একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহার কারণ এই যে, মোগল রাজত্বে কোন নির্দ্দিষ্ট পররাষ্ট্র নীতি ছিল না বলিলেই হয়। যাহাকে আমরা অধুনা পররাজ্যনীতি বা বৈদেশিক সম্বন্ধ বুঝি, তাহা বাস্তবিক নিতান্ত আধুনিক সৃষ্টি। আধুনিক কালে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থার অভাবনীয় বিপর্য্যয় হেতু এক রাজ্যের সহিত অপর রাজ্যের সম্বন্ধ স্থাপন যেমন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, মোগল রাজত্বে তেমন সম্বন্ধ স্থাপনের কোন প্রয়োজন ছিল না! মোগলদের সময়ে বিভিন্ন রাজ্যের শাসনকার্য্য কোন একটা স্থায়ী নীতি অনুসারে সম্পাদিত না হইয়া অস্থিতিশীল নিয়মানুসারেই সম্পাদিত হইত। সাম্রাজ্য ও রাজ্য একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একরূপ স্বপ্রতিষ্ঠ ভাবেই পরিচালিত হইত। এই বিষয়ে মোগলদের অবস্থা বরং ভালই ছিল, দেশের নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক আত্মরক্ষণশীলতা, যাতায়াতের সুবন্দোবস্তের অভাব এবং বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রভুত আত্মরক্ষণোপায় হস্তগত থাকায় মোগলদের ভারতীয় সাম্রাজ্য স্বভাবতঃই কিছু বেশী পরিমাণে আত্মস্থ ছিল,—বৈদেশিক রাজ্যাদির সহিত তাহার বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু তাহা হইলেও তাৎকালীন মোগল সাম্রাজ্যের মত বৃহত্তম সাম্রাজ্যের পক্ষে যে সময় সময় পররাজ্যের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় নাই, এরূপ মনে করা ভুল মাত্র। এ বিষয়ে অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে পারস্যের সহিত মোগল সাম্রাজ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব।

আপনাদের সাম্রাজ্যের বাহিরে বস্তুতঃ একমাত্র

পারস্য রাজ্যের সহিতই মোগলদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এই সম্পর্ক তাঁহারা বহুদিন রক্ষা করিয়াছিলেন। অবস্থানের নৈকট্য এবং এক জাতি না হউক, একই ধর্ম্ম ও একই রূপ শিক্ষা দীক্ষা পারস্য ও মোগল সম্রাটদের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ পরে রাজনৈতিক বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। যে দিন হুমায়ুন ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া পারস্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন এবং আফগানদিগের হস্ত হইতে আপনার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য পারস্যের সাহ হইতে প্রভূত সৈন্য ও অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই পারস্যের সহিত মোগলদিগের এই বন্ধুত্বের বীজ উপ্ত হয়। এই অবস্থায় হুমায়ুনের উত্তরাধিকারিগণ যে আপনাদের ও পারস্য সম্রাটদের মধ্যে এই সৌহার্দ্দ্য স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিবার জন্য অতিমাত্র আগ্রহান্বিত ও যত্নশীল হইবেন, তাহাত একান্তই স্বাভাবিক। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই, সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, সাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারত ও পারস্যের মধ্যে বহুবার দৌত্য কার্য্যের আদান প্রদান হইয়াছল। এইরূপ দৌত্য প্রেরণ দ্বারা উভয় রাজ দরবারের মধ্যে যে শুধু পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব প্রকাশিত হইত এমন নয়, তদ্দারা পারস্যের সাহের সহিত মোগল সম্রাটদের সম্প্রীতি রক্ষার প্রবল আগ্রহও ইচ্ছাও পরিব্যক্ত হইত, সন্দেহ নাই। সামাজিক বা রাজকীয় ভদ্রতা প্রদর্শনই এই সকল দৌত্য প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। মোগলদের পক্ষে এইরূপ দৌত্য প্রেরণ বা গ্রহণ তাঁহাদের পররাষ্ট্রনীতির একটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ ছিল বলিয়াই বলা যাইতে পারে। সম্রাট আকবর একবার পারস্যের সাহ তমাস্পের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পারস্যরাজও সমুচিত সমাদর সহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মোহাম্মদ রেজা বেগ নামধেয় এক পারসিক রাজদূত মোগল দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি প্রচুর দলবল সহকারে ও সম্রাটের জন্য বহুমূল্য উপঢৌকনাদি লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আজমীরে প্রকাশ্যভাবে আগমন করেন। পরে একটা প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে গ্রহণ করা হয়। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা হেতু প্রদর্শিত হইয়া থাকে। "তুজুকী জাহাঙ্গীরির" মতে দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণের সহিত দিল্লীর বাদসাহের সন্ধি সংস্থাপন মানসে কথাবার্ত্তা স্থির করিবার জন্যই রেজা বেগ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। মতান্তরে প্রকাশ যে, তুর্কীদের বিরুদ্ধে পারস্যের প্রতি জাহাঙ্গীরের সহায়তা প্রার্থনা করাই তাঁহার ভারতাগমনের উদ্দেশ্য ছিল। স্যার টমাস রো তদীয় জর্ণালে এই দৌত্যের অপর এক উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, পারস্যের জন্য কান্দাহার হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে কথাবার্ত্তা স্থির করিবার জন্যই রেজা বেগ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। কান্দাহারের অধিকার লইয়া তখন পারস্যরাজ ও মোগলদের মধ্যে সর্ব্বদা একটা বিরোধ বর্ত্তমান ছিল।

এই দূতের মুখে—নাকি এরূপও ব্যক্ত হইয়াছিল যে, পারস্যের সাহ তাঁহার নষ্ট রাজ্যোদ্ধার ব্যাপারে হুমায়ুনকে এই সর্ত্তে সাহায্য করিয়াছিলেন যে, হুমায়ুন সেই উপকারের বিনিময়ে কান্দাহার পারস্যরাজের অধিকারে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু এই কথার মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, তাহা বলা সহজ নহে। যেহেতু উক্ত দৌত্যকার্য্যের ফলে তৎসম্বন্ধে পরে কিছু করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

বাদসাহ সাহজাহান যখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে উৎখাত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন তন্মধ্যে একজন পারস্যে পলাইয়া যান। ইহাঁর না[ম] বুলাকী। সাহজাহান নিজকে সম্রাট বলিয়া ঘোষ[ণা] করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ইনি অতি অল্পকালে[র] নিমিত্ত হিন্দুস্থানের সম্রাটপদে অভিষিক্ত ছিলেন। সাহজাহান এই পলাতক ব্যক্তিকে তদীয় হ[স্তে] সমর্পণ করিবার জন্য পারস্যের সাহের নিকট রাজ[দূত] প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পারস্যরাজ তাঁহা[কে সমর্পণে]

অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া স্বীয় আতিথেয়তার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে মোগল দরবারেও পারস্য এবং অন্যান্য দেশের অনেক রাজনৈতিক পলাতক আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে পারস্যের সাহ দ্বিতীয় আব্বাস হইতে এক রাজদূত ভারতে আগমন করেন। সম্রাট তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সহিত ততটা সদয় ব্যবহার করেন নাই। আওরঙ্গজেব তখন সবে মাত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। তখনো তিনি নিজকে নিরাপদ ও সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করিতে পারেন নাই। তাঁহার দরবারস্থ পারস্য দেশীয় ওমরাহগণ তাঁহার অনিষ্টের কারণ হইতে পারেন, এরূপ আশঙ্কা করিয়া নিজের জাঁকজমক ও ক্ষমতা দেখাইয়া উক্ত রাজদূতের মনে ভয় ও বিস্ময় জন্মাইবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। কয়েক বৎসর পরে বৃদ্ধ ও বন্দী সাহজাহানের মৃত্যু হইলে আওরঙ্গজেব পারস্যের সেই সাহ আব্বাসেরই নিকট দূত প্রেরণ করিয়া যখন আওরঙ্গজেবকে হিন্দুস্থানের সম্রাট স্বরূপ স্বীকার করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন এবং পুনরায় পারস্যের সহিত রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ইচ্ছুক হন, তখন পারস্যরাজ যে আওরঙ্গজেবের দূতের অপমান ও তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া স্বীয় পূর্ব্ব প্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন, তাহা আর কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেব এই অপমান নীরবেই সহিয়া গিয়াছিলেন। তিনি পারস্যের সাহের সহিত প্রকাশ্য বিরোধ করণে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি এইরূপ চতুরতা না করিলে যে পারস্যের সহিত মোগল বংশের চির প্রচলিত নীতি পরিহার করা হইত এবং তাহাতে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূচক সম্বন্ধ-বিচ্ছেদও অনিবার্য্য হইত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

অতএব আমরা দেখিতেছি, বৈদেশিক সম্বন্ধ বলিতে মোগলদের যদি কিছু থাকে, তাহা একমাত্র পারস্যের সঙ্গেই ছিল। অন্যান্য দেশ বা রাজ্য সম্বন্ধে কোন নীতি অবলম্বন করিবার তাঁহাদের যেমন কোন ইচ্ছা ছিল না, তেমন কোন প্রয়োজনও উপস্থিত হয় নাই। অবশ্য সময় সময় এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাকে পররাষ্ট্র নীতির অন্তর্গত করিলেও করা যাইতে পারে। এরূপ ঘটনাবলীর মধ্যে আওরঙ্গজেবের সঙ্কল্পিত চীন দেশাক্রমণ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই ঘটনায় আওরঙ্গজেবের জ্ঞান ও দূরদর্শিতা অপেক্ষা তাঁহার উৎসাহশীলতা ও উচ্চাকাঙ্খাই বেশী প্রকাশিত হয় বটে। ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, আওরঙ্গজেব আমীর জুমলার অধিনায়কতায় চীনদেশ বিজয়ার্থ এক অভিযান প্রেরণ করেন। সেই অভিযান আসাম প্রদেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় চীনের প্রান্ত সীমায় গিয়া উপনীত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক মাস ধরিয়া অশেষ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিবার পর তাহা অবশেষে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ইহার পর আওরঙ্গজেবের মুখে চীন দেশ জয় সম্বন্ধে আর কখনো কোন কথা শুনা যায় নাই।

মোগল রাজদরবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সদ্ভাব পরিজ্ঞাপন মানসে বাল্‌খের রাজা বহুমূল্য উপঢৌকনাদি সহ আওরঙ্গজেবের নিকট ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে এক দৌত্য প্রেরণ করেন। সম্রাট উক্ত দূতের প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং বাল্‌খের অধিপতির জন্য যথোপযুক্ত উপায়নাদি প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন। সম্রাট কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপঢৌকন রাজির মধ্যে সরপা নামক এক প্রকার পোষাক ছিল। এই পোষাক মোগল বাদসাহেরা আপনাদের অধীন রাজগণকেই প্রদান করিতেন। যাঁহারা উহা গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা মোগলদের অধীনতা অঙ্গীকার করিলেন বলিয়া অনুমিত হইত। বাল্‌খ হইতে সমাগত দূতেরা ইহা অবগত ছিলেন না সুতরাং তাঁহারা সরল চিত্তেই সম্রাট-প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এস্থলে বলা যাইতে পারে, সম্রাট তাঁহাদের অজ্ঞতার সুযোগে তাঁহাদের সহিত রাজনৈতিক চতুরতা খেলিয়াছিলেন।

মোগল সম্রাটেরা অন্যান্য বৈদেশিক রাজ্য হইতেও

সময় সময় এইরূপ দৌত্য গ্রহণ করিতেন। ফ্রান্স, ওলন্দাজ, ইথিওপিয়া এবং ইংলণ্ড হইতেও কখন কখন মোগল রাজ দরবারে দূত প্রেরিত হইতেন, কিন্তু তাঁহারা কোন গুরুতর রাজনীতিক কার্য্যভার লইয়া আসিতেন না। এই সকল রাজদূতের মধ্যে সকলেই মহা মহিমান্বিত মোগল বাদসাহদের অনুগ্রহ লাভ করিবার আশাতেই আসিতেন। ইয়োরোপীয় রাজদূতেরা কেবল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অর্থাৎ বাণিজ্যের সুবিধাজনক অনুগ্রহ লাভের জন্যই আগমন করিতেন। তাঁহারা প্রায়ই মোগল সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করণার্থ আশাতিরিক্ত সুবিধা ও অনুগ্রহ লাভে সক্ষম হইতেন। ইয়োরোপ হইতে সমাগত দৌত্যগুলির মধ্যে হকিন্‌সের দৌত্য (১৬০৮ খৃঃ অঃ) এবং সার টমাস রোর দৌত্যই (১৬১৫ খৃঃ অঃ) সর্ব্ব প্রধান। এই উভয় দৌত্যই মোগল রাজ দরবারে বিশেষ সমাদরের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছিল। প্রাগুক্ত রাজদূতদ্বয় তাঁহাদের দৌত্য কার্য্যের এবং ভারতে অবস্থান কালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার সুন্দর বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মোগল সম্রাটগণ দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাজ্যগুলির প্রতি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরিণামে তাহাই তাহাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণতঃ একথা বলা হইয়া থাকে যে এই আত্মহত্যাকরী নীতির জন্য একমাত্র আওরঙ্গজেবই প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক এ অনুমান ঠিক নহে। মোগল বংশের প্রত্যেক বড় বড় সম্রাটই—আকবর হইতে আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এই বিষয়ে আপন আপন অংশের জন্য দায়ী। আকবর আপন বংশের নিমিত্ত বৈদেশিক নীতির এই নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। সাহজাহান এই নীতি অবলম্বনে একটু বেশী সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবও তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বটে কিন্তু আপন সাম্রাজ্যের ক্ষতি সাধন করিয়া। শক্তি ও সামর্থ্যের এইরূপ বৃথা অপচয়ে গৌরবান্বিত মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন যতটা হইয়াছিল, আমাদের বোধ হয় আর কিছুতেই ততটা হয় নাই।

আকবরের রাজত্বের শেষ ভাগে তিনি উড়িষ্যার রাজার সহিত এক সন্ধিস্থাপন করেন। উড়িষ্যাধিপতি এই সন্ধিমূলে স্বীকার করেন যে, বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা সোলেমান খাঁ আফগান যাহাতে তদীয় আত্মীয় আলী কুলি খাঁকে কোনরূপ সাহায্য করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আলী কুলি খাঁ তখন মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন।

মোগলদিগের পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, উপরে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। তাঁহাদের যে কোন নির্দ্দিষ্ট পররাষ্ট্রনীতি বা তদবলম্বনের কোন প্রয়োজন ছিল না, তাহা এই কথাতেই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের রাজত্বে পররাষ্ট্রবিভাগ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বিভাগের অস্তিত্ব কখনো ছিল না। সম্রাট সাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের অধীনে দানিসমন্দ খাঁ পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন বলিয়া বার্ণিয়ার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মোগল রাজত্বের ইতিহাস লেখকদের মধ্যে একমাত্র তিনি ভিন্ন আর কেহই উক্ত নামধেয় কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। সুতরাং যেরূপেই হউক, এক মাত্র কর্ম্মচারীকে উক্তরূপ উপাধি ভূষণে ভূষিত দেখিয়া মোগলরাজত্বে পররাষ্ট্র বিভাগের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া সমীচীন মনে হয় না।

আবদুল করিম।

মুস্কিল-আসান।

(গল্প)

তখন ভেরুলাম আর আমি, আমাদের সেই ছোট জাহাজখানির ভোজন কক্ষে বসিয়াছিলাম; সেই মাত্র আমরা এক পক্ষকাল বিদেশ বাসের পর দেশে আসিয়া নঙ্গর করিয়াছিলাম। মাসাধিক কাল এমনি অলস ভাবে কাটিয়া গিয়াছে; এ এক মাসের মধ্যে একবার ভজনালয়ে যাইবারও অবসর পাই নাই।

এরূপ আলস্যে কালহরণ করিতে ভেরুলামের আর মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। লোকটা অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিল; কিন্তু এতদিন ধরিয়া কেবল সঙ্গীত আলোচনাতেই কাটিয়াছে, কাজেই সঙ্গীতও আর ভাল লাগিতেছিল না; সেটাও বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল।

তখন সারা ইউরোপ শান্তিপূর্ণ। সম্প্রতি বল্কান রাজ্যে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া থামিয়া গিয়াছিল। রাজনৈতিক আকাশ তখন মেঘ লেশহীন। ইহা সাধারণের প্রীতিকর হইলেও ভেরুলামের বড় ভাল লাগে নাই; সে ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর বলিয়া মনে করিতেছিল।

সে ক্ষুব্ধস্বরে বলিয়া উঠিল,—"রাজনৈতিক আকাশের এ স্তব্ধভাব বড় শুভ লক্ষণ ব'লে মনে হচ্চে না। শীঘ্রই বোধ হয় একটা ঝড় উঠ্‌বে।"

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার কথার সার্থকতা উপলব্ধি করিলাম।

ঠিক সন্ধ্যার বাতি জ্বালা হইবার পরই আমাদিগের পরিচারিকা একখানি পত্র হস্তে সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

পত্রের আবরণ উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গেই ভেরুলামের মুখে একটা আনন্দ দীপ্তি দেখা গেল। পরে শুনিলাম, পত্রখানি পররাষ্ট্র সচিব লর্ড ফার্কুহার্সনের নিকট হইতে আসিয়াছে।

ভেরুলাম নীরবে সেখানি পড়িয়া ফেলিল, তাহার পর দ্রুতহস্তে প্রত্যুত্তর লিখিয়া দিল।

পরিচারিকা চলিয়া গেলে সে আমায় বলিল,—"আপাততঃ আমি পররাষ্ট্র সচিবের আফিসে চল্লুম। আবার আমাদের কাজ পড়েছে।"

যখনই কোন আবশ্যক পড়িত, আমরা দুইজনে একত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতাম। কখনও একা কোন কাজ করি নাই।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ভেরুলাম ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এখুনি আমাদের জিনিষ পত্তর গুছিয়ে নাও; রাত্তির দুপুরে লিভারপুলে আমাদের বোট ট্রেণ ধ'ত্তে হবে। আর দেরী ক'র না।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"ভেলেষ্টার্ড,—সেখানে একটা বিদ্রোহের সূচনা পাওয়া গেছে।"

ভেরুলামের ব্যবহারে তখন একটা অস্বাভাবিক ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। চলনেও একটা অসম্ভব দ্রুততা; আমি শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি গমনোপযোগী সকল আয়োজন শেষ করিয়া ফেলিলাম।

ভেরুলাম ভোজন কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটী সিগারেট ধরাইয়া বলিতে লাগিল,—"এখন দশটা বেজেছে; ইতিমধ্যে আমরা একবার ভার্ণোর হোটেলে গিয়ে নৈশ ভোজনটা শেষ করে নিতে পারবো।"

যথাসময়ে আমরা ভোজন শেষ করিলাম। ভেরুলাম কিন্তু এইবার বড় গম্ভীর হইয়া পড়িল। লিভারপুলে ট্রেণে উঠিয়া সে প্রথম কথা কহিল। ভোজনের পর হইতে আর একটী কথাও কহে নাই।

সে গাড়ীর জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া একটা সিগারেট ধরাইল, তাহার পর কৌটাটী আমার হাতে দিয়া স্থির হইয়া আপন আসনে বসিল।

"আমিত' তোমায় বল্লুম রাজনৈতিক আকাশের এ নিস্তব্ধতা বড় শুভ লক্ষণ নয়; ফলেও তাই দাঁড়ি-

য়েছে। ম্যাগিনার ম্যালিভিয়া স্কটের কাছ থেকে পররাষ্ট্র সচিব একখানা চিঠি পেয়েছেন; তাতে জানা গেছে যে, শীঘ্রই কোন দুটী রাজশক্তির ভেতর একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হবে, তার পরিণাম ইংলণ্ডের পক্ষে অতি শোচনীয় যুদ্ধ! অবশ্য এটা তাঁর অনুমান মাত্র; কিন্তু তা' বলে অবহেলা করবার উপায় নেই; অতি বিশ্বস্ত লোকের কাছ থেকেই খবরটা এসেছে।" তাহার বদনে একটা মৃদু হাস্যের অস্পষ্ট রেখা দেখা দিল। সে আবার বলিতে লাগিল,—"তারা মনে ক'রেছে আমাদের পরাজিত করে আপনাদের মধ্যে বিজিত রাজ্য বণ্টন ক'রে নেবে। সানুবিয়ার সম্রাটই সকল অনিষ্টের মূল। আজকাল সানুবিয়ার প্রজা-সংখ্যা দিন দিন বেড়ে উঠ্‌চে, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের লোলুপ দৃষ্টি ভারতের দিকে প্রসারিত হচ্চে। তিন দিনের মধ্যে সানুবিয়ায় একটা গুপ্ত সভার অধিবেশন হবে; ষড়যন্ত্রকারীদের প্রায় সকলেই সে সভায় উপস্থিত থাকবে——।" হঠাৎ সে একবার চুপ করিল। তাহার পর আবার বলিল,—"সেই সভার গুপ্ত উদ্দেশ্য জানাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।"

"আচ্ছা ম্যালিভিয়া স্কটইত' অনায়াসে এ কাজটা সম্পন্ন কর্‌তে পার্‌তেন, তবে আমাদের যাবার দরকার কি?"

"কারণ তিনি মৃত! কাল ম্যাগিনার একটা গলির মধ্যে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেছে; কে তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে তাঁকে খুন ক'রেচে।"

"হঠাৎ এ রকম হবার মানেটা কি? তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের নাড়ি নক্ষত্রের খবর রাখতেন ব'লে বুঝি?"

"হুঁ, তাই বটে! কিন্তু আমাদের আবার তাঁর চেয়ে বেশী খবর জানতে হবে; তত কথা তিনি জীবনে কখনও জান্‌তে পার্‌তেন কি না সন্দেহ।"

জুলাই মাসের প্রভাত অরুণের কণক কিরণ যখন আমাদিগের গাড়িতে আসিয়া উঁকি মারিল তখন গাড়িখানি হারউইচ ষ্টেসনে প্রবেশ করিয়াছে। আরও প্রায় ষোল ঘণ্টা পরে আমরা ভেলেষ্টার্ডে পৌছিলাম।

"আর এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের ম্যাগিনার ট্রেণ ধর্‌তে হ'বে, জাহাজেই প্রাতরাশ শেষ করা যাবে এখন চ'লে এস।" এই বলিয়া ভেলেষ্টার্ড চলিতে লাগিল; আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

তখন প্রাতঃকাল। ধীরে ধীরে সুপ্ত নগরীর সজীবতা ফিরিয়া আসিতেছিল। পথে ভেরুলাম আমায় একটী লোক দেখাইল, দেখিলাম লোকটী বেশ সুশ্রী, তাম্রোজ্জল কেশাবৃত বদনখানি বেশ হাস্যোজ্জল।

ভেরুলাম বলিল,—"উনি হ'চ্চেন ফাদার এডলফ্ লাইনিম্যান। বোধ হয় উনি আমাদের দেখ্‌তে পান্‌নি; পূর্ব্বে কিন্তু আমার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল।"

"বন্ধুভাবে নয় বোধ হয়?"

প্রত্যুত্তরে ভেরুলাম মৃদু হাসিল। তাহার পর বলিল,—"লোকটা ভারি দুষ্ট; সারা সেনুবিয়াতে এমন ধূর্ত্ত লোক আর দুটী পাবে না। ও ইচ্ছে ক'ল্লে এখনি যা জানিতে যাচ্চি সব ব'লতে পারে।"

ভেরুলাম গাড়ির আড়ালে লুকাইয়া তাহার গতি বিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সে বলিল,—"সমাজ ঘেঁসা পুরুত গুলোকে আমি দু'চোক্ষে দেখতে পারি না; তারা মানুষ নয় পিশাচ।"

ষ্টেসনে পৌছিয়া আমি দুইখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিতে গেলাম; ইতিমধ্যে ভেরুলাম একখানি গাড়ি রিজার্ভ করিয়া লইল।

ট্রেণটা কিছু মৃদুগামী; ম্যাগিনায় পৌছিতে আমাদের প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা লাগিল। ভেরুলাম সারা পথটা অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছিল কর্ত্তব্য ভারে সে বুঝি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

গাড়ি ম্যাগিনা ষ্টেসনে প্রবেশ করিলে সে বলিল —"আর আমাদের ঠিক আটাশ ঘণ্টা সময় আছে, কাল রাত্রি আটটার মধ্যে আমরা আবশ্যকীয় সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ফিরবো।"

"কোন মৎলব ঠিক ক'রেচ?"

"কই, না।"

একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া আমরা কল্‌ন ট্রেসির একটা হোটেলের উদ্দেশে চলিলাম। পূর্ব্বে এ অঞ্চলে আসিলে আমরা এই হোটেলেই থাকিতাম। হোটেলের কর্ত্তার সহিত ভেরুলামের পরিচয় ছিল, লোকটা বেশ বিশ্বাসীও বটে!

আমরা হলে প্রবেশ করিলে সে গম্ভীর ভাবে আমাদিগকে অভিবাদন করিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"যে ঘরে থাকেন সেইটেই নেবেন ত'?"

"হ্যাঁ, আর এখুনি আমায় এক কাপ কড়া চা পাঠিয়ে দেবেন।"

মেজরটী আবার অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

ভেরুলাম বলিল,—"গাসটেক, লোকটা ফরাসী হওয়ায় আমাদের ভারি সুবিধে হ'য়েছে। ফরাসী দেশে সেনুবিয়া বাসীকে, আর সেনুবিয়ায় ফরাসীকে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করা যায়।"

আমরা উপরে আমাদিগের নির্দ্দিষ্ট কক্ষাভিমুখে চলিতে লাগিলাম, মুটিয়া মোট লইয়া আমাদিগের পিছু পিছু আসিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিয়াই ভেরুলাম রাস্তার ধারের একটা খোলা জানালার সম্মুখে একটী আরাম কেদারা পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল ভেরুলাম নীরবে চেয়ারে বসিয়া রহিল। চা আসিলে কেবল একবার উঠিয়া সেটা পান করিয়াছিল মাত্র।

এক ঘণ্টা পরে উঠিয়া সে বরাবর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল। কতক্ষণ যে সে অনুপস্থিত ছিল তাহা বলিতে পারি না তবে তাহার কয়েক মিনিট পরেই একজন সেনুবিয়াবাসী আমাদিগের কক্ষে প্রবেশ করিল।

আমি ব্যস্তভাবে উঠিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে উদ্যত হইলে লোকটী মৃদু হাস্য করিয়া আপন ছদ্মবেশ ঈষৎ অপসরণ করিল; আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, ছদ্মবেশে ভেরুলাম!

সে বলিল,—"চেম্বার অব ডিপুটিসে ঢোকবার আজই হ'চ্চে প্রশস্ত দিন; সেখানে যেতে আমিও বড় উৎসুক হ'য়ে উঠেচি।"

আমি অনুসন্ধিৎসু নেত্রে তাহার দিকে চাহিলাম। সে আবার বলিল,—"ষড়যন্ত্রকারিরা সেই খানেই তাদের গুপ্ত সমিতির অধিবেশন করছে।"

"তবে কি আমায় সঙ্গে নেবে না নাকি?"

সে মাথা নাড়িয়া অসম্মতি দেখাইল। তাহার পর বলিল,—"তোমার এখানে থাকা দরকার; শত্রুপক্ষীয়েরা আমাদের চিনে ফেলেছে; ক্রুজেল প্রায় ছ'সাত জন লোককে হোটেল পাহারা দিতে পাঁঠিয়েছে। জানিনা আবার কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে; কিন্তু তোমায় ফুরসত মত খবর দেব নিশ্চয়। আলাদা আলাদা থাক্‌লে আমাদের কাজেরও সুবিধে হ'বে; তুমি এখানে রইলে, আর আমি?—ভাগ্য যে পথে নিয়ে যায় সেই খানেই চল্লুম।" সে আমার দিকে হাত বাড়াইয়া দিল; আমি তাহার সহিত করমর্দ্দন করিলাম। পরমুহূর্ত্তে আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

সেদিন প্রায় সারারাত্রি তাহার অপেক্ষায় আমি বসিয়া কাটাইলাম। শেষে রাত্রি প্রায় তিনটার সময় একবার বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। হোটেলের প্রহরীকে বলিয়া দিলাম কোন সংবাদ আসিলে তখনি যেন আমায় দেওয়া হয়।

সকালে প্রাতরাশের সময়ও কোন সংবাদ পাইলাম না। বৈকালে চা পানের সময় অবধি আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত সময় কাটাইলাম। এক একটা ঘণ্টা যেন এক একটা যুগের অপেক্ষাও দীর্ঘ! আমার দ্বারের নিকট কোন শব্দ পাইলেই ভেরুলামের সংবাদ আসিতেছে মনে করিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে সেই দিকে চাহিতেছিলাম।

ভেরুলামের কথা চিন্তা করিতে করিতে যখন আমি একাকী চা পান করিতেছিলাম তখন একটী প্রহরী একখানি পত্র লইয়া আসিল। উপরের হস্তাক্ষর দেখিয়াই বুঝিলাম লেখক ভেরুলাম! সাগ্রহে আমি পত্রখানি পড়িতে লাগিলাম,—

"আমি আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছি। এই

পত্র পাঠমাত্র 'উইন্টার গার্ডনে' যাইও। যাইবার সময় বেশ লোক জানাইয়া যাইবে; আমাদিগের উপর যাহারা দৃষ্টি রাখিয়াছে তাহারা যেন অনুসরণ করিবার সময় পায়। বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে উৎসের নিকট একজন ফরাসীকে দেখিতে পাইবে; সে লোকটার দৃষ্টি থাকিবে ভেনাসের প্রতিমূর্ত্তির উপর। লোকটা সাতটা নাগাইদ সেখানে পৌঁছিবে। লোকটীর বাম চক্ষু টেরা, আকৃতি সুন্দর, ঈষৎ দীর্ঘকায়। মিনিট কয়েকের জন্য লোকটাকে কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত রাখিও, কিন্তু কাজটা অতি সাবধানে করিতে হইবে সে যেন তোমার পরিচয় না পায়। কথা কহিবার সময় মধ্যে মধ্যে যেন কিছু লিখিয়া লইতেছ এইরূপ ভাণ করিবে। তাহার পর ষ্টেসনে গিয়া ভেলেষ্টার্ডগামী গাড়ীতে একখানি গাড়ি রিজার্ভ করিয়া রাখিবে। আমাদিগের জিনিষ পত্রগুলা যথা সময়ে ষ্টেসনে লইয়া যাইও। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আমি গিয়া উপস্থিত হইব।

এইচ, আর, ভেরুলাম।

তখন ছয়টা বাজিয়াছিল, আমি আরও অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া ধীর পদে উণ্টার গার্ডন:অভিমুখে যাত্রা করিলাম। বাগানে পৌঁছিয়া এমন একটী স্থানে বসিলাম যে সেখান হইতে ভেরুলাম কথিত উৎসটী বেশ দেখা যায়।

বাগানটায় তখন আর কেহই ছিল না। সাতটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে দেখিলাম একটী লোক ভিনাসের প্রতিমূর্ত্তির নিকট গিয়া দাঁড়াইল এবং এক দৃষ্টে সেটীকে দেখিতে লাগিল।

লোকটীর নিকটে গিয়া দেখিলাম বাস্তবিকই তাহার বাম চক্ষু ঈষৎ টেরা!

তাহার আরও একটু নিকটে গিয়া আমি লোকটীকে কোন পথে কল্‌নষ্ট্রেসী যাইতে হয় জিজ্ঞাসা করিলাম।

ত্বরিতে লোকটী আমার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বলিল,—"বড় দুঃখের বিষয় মহাশয়! আমি আপনার এই সামান্য উপকার টুকু কর্‌তে পাল্লুম না। আমি নিজেই এখানে একজন নবাগত।"

কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত আমি তাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলাম। সেই বাগান ও প্রতিমূর্ত্তিটীই এখন আমাদিগের আলোচনার প্রধান বিষয়।

আমি বলিলাম, "এমন সুন্দর স্থান এখানে আর নেই ব'ল্লেও চলে।" সঙ্গে সঙ্গে পকেট হইতে একখানি খাতা বাহির করিয়া বাগানটীর একটা নক্সা আঁকিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই ভদ্রলোকটী বাগান ছাড়িয়া চলিয়া গেল। সে কয়েক গজ যাইতে না যাইতে দুইটী লোক একটী ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন আমার নিকটে আসিয়া স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া বলিল,—"এখানে ছবি আঁকবার জায়গা নয়; খাতা খানা আমি দেখবো।"

লোকটার পরিধানে নীল পোষাক, দেখিলে সানুবিয়ার সশস্ত্র পুলিস বলিয়া মনে হয়।

আমি বলিলাম,—"অপরাধ?"

"ওটা এখানে আইন বিরুদ্ধ; তুমি আমায় খাতা খানা দিতে আইনতঃ বাধ্য।"

আমি একটু বিরক্তভাবে খাতা খানা তাহার হাতে দিলাম। সেই একটানে আঁকা বাগানের নক্সাটী ব্যতীত খাতা খানায় অন্য কিছুই লেখা ছিল না।

লোকটা একবার পাতাখানায় চোখ বুলাইয়া লইল, তাহার পর আমার মুখের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার সঙ্গীর উদ্দেশে চলিয়া গেল।

উইণ্টারগার্ডন হইতে বাহির হইয়া আমি একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া বরাবর ষ্টেসনে চলিয়া গেলাম এবং ভেরুলামের উপদেশ মত সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আসিলাম।

* * * * *

ধীরে ধীরে ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে ভেরুলাম আসিয়া গাড়ীতে উঠিল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাজ শেষ ত'?"

সে বলিল,—"হ্যাঁ; কিন্তু ক্লান্তিতে আমার শরীর একেবারে অবসন্ন। তোমার কাছ থেকে গিয়ে অবধি এক মিনিটও ঘুমুতে পাইনি।"

"কোথায় ছিলে?"

সে একটু হাসিয়া বলিল, "চেম্বার অব ডিপুটিসে একটা বর্ম্মের পিছনে। ও, সে যে কি কষ্ট তা আমিই জানি। কেউ যদি আমায় সমস্ত ইউরোপটা দিতে চায় তবুও আমি কালরাত্রের অভিনয়ের পুনরভিনয় করতে রাজি নই।"

"কি ক'রে ঢুকলে সেখানে?"

"সূর্য্যাস্তের পর এক ঘণ্টা সেখানে কোন পাহারা থাকে না; লোকগুলো বেরিয়ে গেলে আমি চুপি চুপি গিয়ে সেখানে লুকিয়েছিলুম। তারপর আর কোন ভয় নেই; আজ সকালে একজন পাদরীর পরিচ্ছদে আমার কাছে আসে তার হাত দিয়েই তোমার চিঠিখানা পাঠাই। তুমিও দেখছি সব ঠিক ক'রেছ।"

"হ্যাঁ; কিন্তু সে ফরাসীটা কে?"

"সে বেচারী সম্পূর্ণ নিরীহ। কালকেই আমি বুঝতে পেরিছিলুম আমাদের পেছনে লোক লেগেচে; আমাদের ঘাড় থেকে সন্দেহ দূর করবার জন্যে আমি অনেকক্ষণ ধরে একটা মৎলব ঠিক কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছিলুম। অদৃষ্ট আমাদের পথে ফরাসীটাকে ফেলে দিলেন। লোকটা যতদূর নিরীহ হ'তে হয়; ছুটিতে ম্যাগিনায় বেড়াতে এসেছে এই মাত্র তার অপরাধ। উইণ্টার গার্ডনে গিয়ে ভিনাসের প্রতিমূর্ত্তি দেখতে ব'লেছিলাম। এখন দেখছি লোকটা আমার পরামর্শ মতই কাজ ক'রেছে।"

"হ্যাঁ সে ঠিক তোমার কথা মতই কাজ ক'রেছে।"

"আমার বোধ হয় এতক্ষণ তাকে পুলিসে ধ'রেচে। তা হোক সে অনায়াসেই আপনার নির্দ্দোষীতা প্রমাণ ক'রে মুক্তি পাবে। আমি ইচ্ছে ক'রে কা'কেও বিপদে ফেলতে চাই না। আর তিন দিন আমরা যে কাজ ক'রবো ইংরাজ রাজত্বের স্থায়িত্ব তার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। আমি ফারকুহার্সনের কাছে টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছি; কাল রাত্রে আমরা 'কুইন' জাহাজখানার সাক্ষাৎ পাবো।"

"এখন আমাদের কোথায় যেতে হবে?"

"জিব্রণ্টার। যদি সেনুবিয়ার সম্রাট তার আগে গিয়ে পৌঁছয় তাহ'লে রবিবার জিব্রণ্টার যে কোন্ মহাশূন্যে উড়ে যাবে তা' বলতে পারি না। আজ হ'ল মঙ্গলবার; এখনও আমাদের যথেষ্ট সময় আছে। যে পাহাড়ের উপর জিব্রণ্টারের ভিত্তি তার একটা ক্ষীণ অংশ শত্রুদের নজরে প'ড়েছে। বৃহস্পতিবার একখানি ছোট জাহাজ বারুদ নিয়ে জিব্রণ্টার অভিমুখে যাত্রা ক'র্‌বে; নির্ব্বিঘ্নে যদি তারা পৌঁছিতে পারে তবে তাই দিয়েই অনায়াসে সারা ব্রিটিশ আইলটা উড়িয়ে দিতে পার্‌বে, জিব্রণ্টার ত' তুচ্ছ! রাত্রির অন্ধকার-বর্ম্মে আত্মগোপন ক'রে জাহাজখানি বেশ নির্ব্বিঘ্নেই অগ্রসর হ'বে, আমরা না জানলে, কেউ কণামাত্রও সন্দেহ ক'র্‌তে পার্‌ত না।

"তুমি তা'হলে তাদের কাজে বাধা দিতে যাচ্চ?"

"তা' এখনও ব'লতে পারি না; আমার টেলিগ্রামের উত্তরে লর্ড ফারকুহার্সন যেমন বলবেন আমাদের তেমনি ক'র্‌তে হ'বে। 'কুইনে' ক্যাপটেন উইলোবির কাছে আমরা তাঁর মতামত জান্‌তে পার্ব্বো।"

* * * * *

প্রায় আঠার ঘণ্টা পরে আমরা ভেলেষ্টার্ড ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ঘড়ি দেখিলাম তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

ভেরুলাম বলিল,—"আমরা ঠিক সময়ে পৌঁছেছি কাল রাত্রি দশটার সময় 'কুইন' বন্দরের বাহিরে আমাদের জন্য অপেক্ষা ক'র্ব্বে।"

"তা'হলে একখানা নৌকা ভাড়া ক'র্‌তে হ'বে ত'?"

"ম্যাগিনা থেকেই সকল কাজ আমি সেরে রেখেছি এখন বাকি কেবল ঘুম!"

আমরা একটী হোটেলের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

* * * * *

আমরা যখন নদীতীরে উপস্থিত হইলাম তখন সারা নগরীটী সুপ্ত। কেবল দুই জন লোক শুল্ক

আদায়ের ঘরটীর নিকট দাঁড়াইয়াছিল। তখনও আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে কয়েক গজ দূরে, এরূপ সময়ে তাহারা সে স্থান ছাড়িয়া ধীরে ধীরে নগরীর দিকে ফিরিয়া গেল। ভেরুলাম জেটীর শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়া ধীরে ধীরে একবার শীস দিল; উত্তরে প্রায় কুড়ি গজ দূরে একটী নীল আলো দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইল।

ভেরুলাম নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেও?—ব্রান্‌সন্?"

উত্তর আসিল,—"হাঁ মহাশয়!"

"দাঁড়াও, আমরা নেবে যাচ্চি।" তাহার পর আমার নিকট আসিয়া বলিল,—"মই দিয়ে একটু সাবধানে নেবো! ঠিক খাড়া ভাবে দেওয়ালের গায়ে লাগান আছে সেটা।"

তাহার পর সে নামিতে লাগিল। কয়েক সেকেণ্ড পরে সে আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। তাহার পর দেখিলাম সে নৌকায় উঠিল; আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

আমরা নৌকায় উঠিয়া বসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কুইন' এসে পৌঁছেছে?"

"তা আমি দেখিনি।"

"দু' মাইলের মধ্যে কোনো বয়ায় তার থামবার কথা আছে। চল খুঁজে দেখিগে।"

তিন জন লোক আমাদিগের নৌকা চালাইতেছিল। সারা নদীটা তখন শান্ত। কয়েক মিনিট পরে অন্ধকারের মধ্যেও আমরা 'কুইনের' 'হাইল' দেখিতে পাইলাম।

ভেরুলাম সাগ্রহে আমার হাত ধরিয়া বলিল,—"ঐ দেখ 'কুইন'।"

আমরা ক্রমশঃ তাহার পার্শ্বে নৌকা লাগাইলাম। জাহাজখানি সম্পূর্ণ অন্ধকার, কোথাও আলোকের চিহ্ন মাত্রও ছিল না; কেবল তাহার চারিটী 'চোঙ' দিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল মাত্র।

অন্ধকারের মধ্য হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল,—"মিঃ ভেরুলাম নাকি?"

"হ্যাঁ, কাপ্তেন উইলোবি!"

"বেশ, উঠে এস।"

"লর্ড ফারকুহার্সেন আমায় কোন চিঠি দিয়া-ছেন?"

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন থাক; সমুদ্রে জাহাজখানা পড়লে তবে আমরা কেবিনে গিয়ে সে সব দেখবো। এখানে কেউ আমাদের পথ আটকাতে পারে।"

প্রথমে সারা জাহাজখানা একবার কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর দানবী বেগে সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিল।

বহুক্ষণ অবধি আমরা রেলিং ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাদের জাহাজখানি জমাট বাঁধা অন্ধকার ভেদ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। জাহাজের বেগে জলরাশি চুর্ণ তুষার রাশির ন্যায় দুই পার্শ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল।

তখন কাপ্তেন উইলোবি প্রথম কর্ম্মচারীর উপর কর্ম্মভার প্রদান করিয়া আমাদিগকে বলিল,—"এস, এবার কেবিনে যাই।"

আমরা তাহার অনুসরণ করিয়া কেবিনে প্রবেশ করিলে সে সিন্দুক খুলিয়া নীলবর্ণের একখানি খাম ভেরুলামকে প্রদান করিল। ভেরুলাম সেখানি পড়িয়া কাপ্তেনের হাতে দিল।

পত্র পাঠ শেষ হইলে কাপ্তেন বলিয়া উঠিল,—"ওঃ! এর ভেতর এত কাণ্ড! তারা যদি সফলকাম হয় তা হ'লে আমাদের কি সর্ব্বনাশটাই হবে!"

ভেরুলাম বলিল,—"কিন্তু তা' আর হ'তে দিচ্চি না।"

ক্ষুব্ধস্বরে কাপ্তেন বলিল,—"না না কিছুতেই তা হ'তে দেব না।"

প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা পরে আমরা 'মোল' পার হইয়া জিব্রল্টারের বন্দরে উপস্থিত হইলাম। জাহাজ জেটীতে লাগিলেই আমি ও ভেরুলাম বরাবর গি... গভর্ণরের বাটীতে উঠিলাম।

গভর্ণর চারলস সেলকট আমাদিগের সহিত কর মর্দ্দন করিয়া বলিলেন,—"মিঃ ভেরুলাম, তোমার কথা আমি পূর্ব্বেই শুনেছি। আর তুমি যে ... আমার সাহায্য পাবার জন্যেই এসেছ তাও জানি।"

"আপনি এর মধ্যেই এ সব কথা কি ক'রে জানলেন?"

"মিঃ ফারকুহার্সন সব কথাই আমায় লিখে পাঠিয়েছেন। উইলোবিই তা' হ'লে টংষ্টারের ধ্বংস করতে যাচ্চেন?"

ভেরুলাম বলিল,—"হ্যাঁ।"

*   *   *   *   *

পরদিন রাত্রি দশটার সময় 'কুইন' বন্দরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। গভর্ণর কাপ্তেনকে আবশ্যকীয় উপদেশ দিতেছিলেন,—"যদি তা'রা তোমাদের জাহাজ দেখতে পায় তা' হ'লে আর বন্দরে ঢুকবে না; খান বারো নৌকা তার আগে আগে আসবে।"

কাপ্তেন গম্ভীরস্বরে বলিল,—"না, তারা আমাদের দেখতে পাবে না।"

গভর্ণর একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"এইবার বেশ অন্ধকার হ'য়েছে।"

"হ্যাঁ, এটা আমাদের উভয়েরই স্মরণীয় রাত্রি। মিঃ ভেরুলাম! প্রস্তুত আছ?"

আমরা জাহাজে উঠিলে 'কুইন' ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আবার আমরা মোল অতিক্রম করিলাম; এইবার কুইন অর্দ্ধবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। সমুদ্রে উপনীত হইলে বায়ু বেশ বেগে বহিতে লাগিল। ভীষণ উর্ম্মীমালা আমাদিগের জাহাজখানি আলোড়িত করিয়া তুলিল। ক্রমে বায়ু মত্ত হস্তির বেগে বহিতে লাগিল।

মধ্যে মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোকের ক্ষণিক স্ফূরণ ব্যতীত সারা জাহাজখানি তখন গভীর তমসাচ্ছন্ন; আমরা সেই ক্ষণিক স্ফূরণের সহায়তাতেই পথ দেখিয়া লইতেছিলাম।

কাপ্তেন উত্তর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"আর একঘণ্টা পরে ঐ দিক থেকে টংষ্টার আসবে।"

একঘণ্টা কাল আমরা সমুদ্রের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলাম; তৎপরে বিদ্যুতের সাহায্যে উত্তর দিকে বহুদূরে একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাইলাম। সেই আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন দূরবীক্ষণ সাহায্যে জাহাজখানি একবার দেখিয়া লইল।

"ঐ টংষ্টার দেখা দিয়েছে। ঘণ্টায় ছাব্বিশ মাইল বেগে জিব্রাল্টারের দিকে আসছে।"

তাহার পর কাপ্তেন আমাদিগের জাহাজের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ণবেগে চালাইবার আদেশ দিল।

কয়েক মিনিট আমরা কেবল অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তাহার পর শুনিতে পাইলাম ক্ষুব্ধ উর্ম্মীমালা টংষ্টারে আহত হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে।

আবার একবার বৈদ্যুতিক আলোক স্ফূরিত হইল; দেখিলাম টংষ্টার তখন আমাদের নিকট হইতে প্রায় দুই শত গজ দূরে।

অকস্মাৎ 'কুইনে'র প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ভীষণ বেগে কম্পিত হইল; তাহার পরই 'কুইন' স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ক্ষুব্ধ বায়ু আমাদিগের কর্ণের নিকট টংষ্টারের নাবিকবর্গের করুণ চীৎকার ধ্বনি আনিয়া দিল।

আমরা ধীরে ধীরে বন্দর অভিমুখে ফিরিতে লাগিলাম। কাপ্তেনের মুখে শুনিলাম টংষ্টারের তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে!

অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই অদূরে একটী ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম টংষ্টারের বয়লার ফাটিয়া গেল!

কাপ্তেন বলিল,—"টংষ্টার এইবার সমুদ্রের মধ্যে সমাধি নেবে।"

তখন আমরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। সেন্থুবিয়ার সম্রাটের অভিসন্ধি ব্যর্থ হইল; জিব্রল্টার ধ্বংসের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইল।

*   *   *   *   *

তাহার তিন দিন পরে কাগজে টংষ্টারের জলমগ্নের সংবাদ বাহির হইল। তাহাতে লেখা ছিল,—"কোন অজ্ঞাতনামা জাহাজ টংষ্টারকে জলমগ্ন করিয়াছে।"

ইহা পাঠ করিয়া আর আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ভেরুলাম হাসিয়া বলিল,—"তোমার মত সকলেত আর মুস্কিল আসানের আদত খবরটা রাখে না, ত আর কি লিখ্‌বে বল? একটা কিছু ত' লেখ চাই।" *

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্মের জয়।

(১৩)

সুশীলা ও অজিত মিঃ রায়ের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বৃহৎ প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার সম্মুখে মনোহর পুষ্পোদ্যান। গাড়ী ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, সুন্দর সুপরিস্কৃত পথ, দুই পার্শ্বে দেবদারু বৃক্ষের শ্রেণী। গাড়ী ঘুরিয়া গাড়ী বারান্দার নিকটবর্ত্তী হইল, অজিত দেখিল গাড়ী বারান্দায় সুন্দর একখানি খোলা ল্যাণ্ডো রহিয়াছে, কাজেই তাহাদের গাড়ী একটু দূরে রহিল। অজিত মলিন বসনে, ম্লান মুখে গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। সে বালক মাত্র, তার মা হিন্দু ঘরের কুলস্ত্রী, কখনো গৃহের বাহিরে যান নাই বা কোনও অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কন নাই। আজ এই দুঃসময়ে তাঁহার আর লজ্জার ভয় নাই, শিশু কয়টি নিরাশ্রয় অনাথ, এখন গৃহশূন্য হইতে বসিয়াছেন কাজেই সৌদামিনী দেবীর পরামর্শে বাহির হইয়াছেন। বোম্বাইতে অধিকাংশই মহারাষ্ট্র ও পার্সি দেশীয় লোকের বাস, তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা নাই, তাঁহারা অসঙ্কোচে ইংরাজ মহিলাদের মত পথেও গমনাগমন করেন ও আবশ্যক হইলে সকলকার সহিতই কথা কহেন। সৌদামিনী দেবী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ও উপায়ান্তর না থাকায় সুশীলাকেও বুঝিতে হইয়াছিল যে আর অন্য উপায় নাই। সুশীলা শুভ্র থান বস্ত্র পরিধান করিতেন, যখন বাহির হইলেন একখানা শুভ্র মোটা চাদর দিয়া সমগ্র দেহ ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন। অজিত একাকী সভয়ে সেই ধনীর প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। একজ শুভ্রকেশ বৃদ্ধ দাস দাঁড়াইয়া ছিল, জিজ্ঞাসা করিল-

"কি চাই বাবু?"

অজিত বলিল "মিঃ রায় কোথায় আছেন, একবার দেখা কর্‌তে এসেছি।" বারান্দার দুই পার্শ্বে দুখানি প্রস্তরের বেঞ্চ ছিল, বেহারা তাহা দেখাইয়া দিয়া বলিল—

"ওইখানে বসুন বাবু, সাহেব এখনি আসবেন।" অজিত দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় মিঃ রায় ও মিসেস রায় কথা কহিতে কহিতে বাহিরে আসিলেন। মিঃ রায় অজিতকে দেখিয়াই বলিলেন—

"তুমি কি চাও?"

অজিত মিঃ ব্যানার্জ্জির বাটী গিয়া যথেষ্ট শিক্ষ পাইয়াছিল, সে সভয়ে বলিল,—

"আমার মা এসেছেন।"

তাহার সেই যাতনাক্লিষ্ট ম্লান মুখ দেখিয়া, মি রায়ের মন ব্যথিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন-

"তোমার মা কোথায়? কোনও কাজ আছে কি?"

অজিত বলিল—"মা ওই গাড়ীতে আছেন, আপনার সহিত দেখা কর্‌তে এসেছেন। আপনার দুজ লোক আমাদের বাড়ী গিয়া বড় উপদ্রব কর্‌ছে—"

মিঃ রায় বিস্মিতভাবে বলিলেন—

"সে কি?" তার পর স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন—

"নির্ম্মলা, তুমি এখন ভিতরে যাও, আমি আ দেখি ব্যাপার কি।"

তাঁহার স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুযায়ী কক্ষের ভিতরে গমন করিলেন। মিঃ রায় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অজিত জননীকে লইয়া আসিল। মিঃ রায় সসম্ভ্রমে তাঁহাদের লইয়া পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গমন করিয়া বলিলেন—

"আপনি বসুন, আপনার যাহা বল্‌বার আছে শুনে তবে আমি বাহিরে যাব।"

সুশীলা তাঁহার সেই সদয় কণ্ঠস্বরে সাহস পাইলেন, ধীরে ধীরে অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আপনার দুঃখের কথা বলিলেন। স্বামীর পীড়ার কথা, দেশ হইতে আসিবার কথা, স্বামীর মৃত্যুর কথা, শিশুদের লইয়া নিজের অসহায় অবস্থার কথা সকল কথাই বলিলেন। মিঃ রায় নীরবে অশ্রুপূর্ণ নয়নে সব শুনিয়া যাইতেছিলেন, অবশেষে যখন সুশীলা বলিলেন যে তিনমাস বাড়ীভাড়া দিতে পারেন নাই বলিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জি মিঃ রায়ের নাম দিয়া দুইজন হিন্দুস্থানী লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহারা বাড়ীতে অত্যন্ত উপদ্রব করিতেছে, অপমান করিতেছে, এমন কি টাকা না দিলে কল্য দ্রব্যাদি সব নীলাম করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছে—তখন মিঃ রায় দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

"আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না, আমি এসব কিছুই জানি না। অভয় বাবু আপনাদের বাড়ীর পাশে থাকেন, তাঁর নিকট একদিন আপনার স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনেছিলাম, কিন্তু আপনাদের যে এত কষ্ট তিনিত আমায় সে সব কথা বলেন নাই। আপনি শান্ত হোন, আমি এখনি সে লোক দুটোকে তাড়িয়ে দিব আপনার কোনও ভয় নাই, তারা কিছুই নীলাম কর্‌তে পার্‌বে না।" সুশীলার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন—

"আপনার ভাড়া আমি কিছু দিন পরে দিব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। শুধু অনুগ্রহ করে সময় দিন। আমি বড় দুঃখিনী, আমার পুত্র কন্যাদের মুখ চেয়ে দয়া করুন"।

মিঃ রায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন—

"ভাড়ার জন্য কোনও তাড়াতাড়ির আবশ্যক নাই। আপনার যখন সুবিধা হবে দিবেন, বরং আমার দ্বারা যদি কোনও উপকার সম্ভব হয়, বলুন আমি কর্‌তে প্রস্তুত আছি, আপনি আমায় যখন ইচ্ছা জানাবেন।"

সুশীলা শান্তভাবে বলিলেন,—

"আপনাকে শত ধন্যবাদ, আপনি এই যে উপকার কর্‌লেন তাহা ইহজন্মে ভুল্‌ব না। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

মিঃ রায় বলিলেন—

"আপনি এখন বাড়ী যান, আমি এখনি নিজে গিয়া সে লোক দুটোকে তাড়িয়ে দিচ্ছি।"

সুশীলা ও অজিত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া গাড়ীর নিকট আসিলেন, বৃদ্ধ বেহারা সঙ্গে গিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল। সুশীলা কৃতজ্ঞ অন্তরে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

মিঃ রায় সেই কক্ষে বসিয়া মিঃ ব্যানার্জ্জিকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন—

"মহাশয়, আপনি অদ্য হইতে আমার বাটী সংক্রান্ত কোন বিষয়ে আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া, বা আমার অনুমতি না লইয়া হস্তক্ষেপ করিবেন না। আপনি আমার নাম দিয়া কোন্ সাহসে একজন দরিদ্র বিধবা (আবার স্বজাতি) স্ত্রীলোকের বাটীতে দুইজন নীচ জঘন্য ব্যক্তিকে বসাইয়াছেন? কে অনুমতি দিয়াছে? আর যদি কখনো এ প্রকার হয়, আমার বিষয় সংক্রান্ত কোন কার্য্যই আপনার হস্তগত হইবে না জানিয়া রাখিবেন। ইতি—

শ্রীআনন্দমোহন রায়"

মিঃ রায় পত্র শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন, ও মিসেস রায়কে ডাকিয়া বলিলেন—

"নির্ম্মলা, এসো চল বেড়াতে যাই।"

মিঃ ও মিসেস রায় গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। মিসেস রায় বলিলেন,—

"ও স্ত্রীলোকটি কে? কেন এসেছিল?" মিঃ রায় সংক্ষেপে সমস্ত কথা বলিবার পর, মিসেস রায় দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

* ইংরাজী হইতে।

"আহা গরিবমানুষ, মিঃ ব্যানার্জ্জি নিজের স্বজাতিকে, এমন দুঃখিনীকে, কেন এমন পীড়ন কর্‌লেন? বিদেশে বিধবা মানুষ একা।" মিঃ রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আশ্চর্য্য।"

গাড়ী অনতিবিলম্বে আসিয়া সুশীলার বাটীর দ্বারের নিকট থামিল। সুশীলা তথনি বাড়ী আসিয়া পঁহুছিয়াছেন।

মিঃ রায় গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, সুশীলার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সম্মুখের ঘরে দুইজন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি বসিয়া আছে ও একজন ধূমপান করিতেছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র উভয়েই সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে ধূমপান করিতেছিল সে অধিকতর ভীত হইল। মিঃ রায় কঠিন স্বরে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমাকে তোমরা চেন?"

তাহারা উভয়ে বলিল হুজুর, আপনাকে কে না চেনে।"

মিঃ রায় বলিলেন "এ বাড়ী কার জান?"

এক ব্যক্তি ভীতকণ্ঠে কহিল, "হুজুর, এ বাড়ী আপনার, এধারের সব বাড়ীইত আপনার।"

মিঃ রায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "কার হুকুমে এখানে এসেছিস?"

এক ব্যক্তি বলিল "হুজুর, ব্যানার্জ্জি সাহেব বাড়ী ভাড়ার জন্য পাঠিয়েছেন, বাড়ী ভাড়া না পেলে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে নিষেধ করেছেন।"

মিঃ রায় তাঁহার হস্তস্থিত পত্র লইয়া একব্যক্তির সম্মুখে ফেলিয়া বলিলেন,—

"এই চিঠি নিয়ে শীঘ্র তোমাদের ব্যানার্জ্জি সাহেবের নিকট যাও, শীঘ্র বাড়ী ত্যাগ কর, এই মুহূর্ত্তে আমার সম্মুখে চলে যাও।"

তাহারা ব্যস্ত ভাবে আপনাদের বস্ত্রাদি ও লাঠি তুলিয়া লইয়া বাড়ীর বাহিরে গমন করিল। একব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল—

"হুজুর বাড়ী ভাড়া"—

মিঃ রায়ের মুখের ভাব দেখিয়া সে আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিল।

অজিত নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, সুশীলাকে সংবাদ দেওয়ায় সুশীলা বাহিরের ঘরে আসিয়া আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, মিঃ রায়ের চরণের নিকট ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন ও অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন—

"আমি ভাড়া সব ঠিক দিব, আপনি অনুগ্রহ করে সময় দিন।"

মিঃ রায় ব্যস্তভাবে বলিলেন "ভাড়ার জন্য ভাব্‌বেন না, বরং আপনার কি আবশ্যক আমায় বলুন, আমি এখনি কর্‌তে প্রস্তুত আছি।"

সুশীলা বলিলেন—

"আপাততঃ আর কিছু চাহি না, আমি বড় দুঃখিনী, আজ আপনি আমার প্রতি যে দয়া কর্‌লেন, ঈশ্বর তাহা দেখ্‌লেন, তিনি আপনার মঙ্গল কর্‌বেন।"

দু একটি অন্য কথার পর মিঃ রায় গাড়ীতে আরোহণ করিলেন, তখন তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল। গাড়ী ছুটিয়া চলিবার পর মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি রকম দেখিলে?"

মিঃ রায় বলিলেন—

"আহা, বেচারীরা এই বিদেশে কি কষ্টেই পড়েছে, ছোট ছোট ছেলেগুলি, কি সুন্দর মুখ, দেখলে মায়া হয়। তাদের এই বিদেশে আত্মীয় স্বজন কেউ নাই।"

মিসেস রায় বলিলেন, "ওরা কি বাড়ীভাড়া দিতে পার্‌বে? যদি না পারে তুমি নিও না।"

মিঃ রায় বলিলেন, "তাত নিশ্চয়ই, কিন্তু দেখে ওরা নিশ্চয়ই দেবে। হাতে হলেই দেবে। আমি কেবল ভাব্‌ছি, মিঃ ব্যানার্জ্জি কি রকম লোক, স্বজাতির প্রতি এত বিদ্বেষ, আশ্চর্য্য যাহোক!"

(১৪)

সুশীলার ঘরদ্বার অত্যন্ত অপরিষ্কৃত হইয়াছিল, তিনি সেগুলি সব গুছাইয়া লইয়া, পুত্র কন্যাদের আহারাদি করাইলেন। আহার আর কি, শুধু খান কত শুকনা রুটি, ও একটু গুড়। নিজে সামান্য একটু গুড় খাইয়া খানিকটা জল খাইলেন। মন যে

চিন্তাস্রোতে ভাসিতেছিল, কি করিয়া যে পুত্র-কন্যাকে লইয়া জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিবেন, বুঝিতেই পারিতেছিলেন না। প্রভাত হইলে পুত্র কন্যাকে বাটীতে রাখিয়া চিন্তান্বিত হৃদয়ে অভয় বাবুর বাটীতে গমন করিলেন। সেথানে গিয়া দেখিলেন সৌদামিনী একটি কলে সুতা দিয়া মোজা বুনিতেছেন, কল দ্রুত চলিতেছে, সেলাইও দ্রুত হইতেছে, তিনি কিছু না বলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে তাবে তাহাই দেখিতে লাগিলেন। সহসা সৌদামিনীর চক্ষু সেইদিকে পড়ায়, তিনি কল বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন—

"বসো বোন বসো, কাল সমস্ত দিন যে করে কেটেছে।" সুশীলা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন—

"এ কলে কি কর্‌ছেন?"

সৌদামিনী বলিলেন—

"এ কলে মোজা ও গেঞ্জি হয়, মিঃ রায়ের গেঞ্জি ও মোজার কারখানা আছে, মোজা প্রস্তুত হলে সেখানেই পাঠিয়ে দিতে হয়। আমিত বেশী পারি না, কখন কদাচ সেলাই করি, তা আমার মাসে ২।৪ টাকা হয়ে যায়। দাদা ত ঐ কারখানাতেই কাজ করেন। আচ্ছা আসুন না আপনাকেও শিখিয়ে দি। তাতে আপনার খুবই ভাল হবে।"

সুশীলা ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "আমি কি পারব?"

সৌদামিনী বলিলেন,—

"কেন পার্‌বেন না? তাঁরাই কল দেবেন, সুতা দেবেন। মজুরী প্রতি জোড়া তিন আনা। একদিনে ২জোড়া মোজা অনায়াসে হয়, খুব পরিশ্রম কর্‌লে ৩।৪ জোড়াও হয়।"

সুশীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, যেন নদীতে মগ্ন ব্যক্তি কূল দেখিতে পাইলেন এমন ভাবে বলিলেন—

"তবে আমি শিখবো, আপনিত আমার ঘরের সব কথাই জানেন। যদি কোন উপায়ে কিছু উপার্জ্জন কর্‌তে না পারি ত, আমার পুত্র কন্যাদের দশা কি হবে?"

সৌদামিনী তাঁহাকে কলে মোজা বুনিতে শিখাইতে লাগিলেন, সুশীলার প্রথম একটু বাধ বাধ মনে হইতেছিল শেষে তাহা এক প্রকার শিখিয়া লইলেন। সৌদামিনী অভয় বাবুকে উলের কথা বলিলেন, তিনি আফিস হইতে আসিবার সময় কল ও সুতা আনিবেন। তদ্ভিন্ন তিনি সৌদামিনীকে বলিলেন যে অত বড় বাড়ীতে সুশীলাদের আর আবশ্যক কি, নিজেদের ব্যবহারের জন্য নীচের তলা রাখিয়া উপরতলা ভাড়া দিলে তাহা হইতে ৪০৲।৫০৲ টাকা হইয়া যাইবে। সে সময়ে অনেকেই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সেখানে আসিতেছিল। সুশীলা একথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হওয়ায়, অভয় বাবু বলিলেন আফিস হইতে বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া আনিয়া, গৃহের সম্মুখে ঝুলাইয়া দিবেন।

সুশীলার অন্তঃকরণের ভার অনেক পরিমাণে লঘু হইয়া গেল। নিরাশার তীব্র বেদনায় হৃদয় অধীর হইতেছিল, অকূলে ভাসিতেছিলেন, আশার আলোকে যেন কূল পাইলেন ও হৃদয়ে শান্তি লাভ করিলেন। গৃহে আসিয়া আপনার গৃহ কর্ম্মে মন দিলেন। বালকদিগের আহারাদি শেষ হইলে স্কুলে পাঠাইয়া দিলেন।

বৈকালে অভয় বাবু মোজার কল, সুতা আনিয়া দিলেন। বিজ্ঞাপনটিও টাইপ যন্ত্রে ছাপাইয়া আনিয়াছিলেন, দ্বারদেশে ঝুলাইয়া দিলেন। সুশীলা শীঘ্র শীঘ্র সব গৃহ কার্য্য শেষ করিয়া সৌদামিনীর সাহায্যে সেলাইতে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথম প্রথম ক্রমাগত ভুল হইতে লাগিল, কত চেষ্টা করিয়াও কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিলেন না। তখন তাঁহার মন নিরাশায় মগ্ন হইতেছিল, ভাবিতেছিলেন আর আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না; পরে আবার নূতন আশায় বলীয়ান হইয়া দৃঢ়তার সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন ও ক্রমে কৃতকার্য্য হইলেন। প্রথম প্রথম প্রত্যহ ১ জোড়া করিয়া মোজা হইত, ক্রমে প্রত্যহ তিন জোড়া করিয়া মোজা বুনিতে লাগিলেন।

একদিন বৈকালে সুশীলা সেলাই করিতেছেন, এমন সময়ে অজিত ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

"মা শীগ্‌গীর এসো, বাড়ী ভাড়া নেবার জন্য কারা এসেছেন দেখবে এসো, বোধ হয় খ্রীষ্টান মেম হবেন।"

সুশীলা সেলাই ফেলিয়া বসিবার ঘরে গিয়া দেখিলেন দুজন স্ত্রীলোক আসিয়াছেন। একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বেত্রাসনে বসিয়া আছেন, ও একজন স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান। যে দণ্ডায়মান তাহাকে দাসী বলিয়াই মনে হইল। সেই স্ত্রীলোকটি বলিল—

"এবাড়ী কি ভাড়া দেবেন?"

সুশীলা বলিলেন—"হাঁ, ভাড়া দেওয়া হবে।"

বেত্রাসনে উপবিষ্টা রমণী বলিলেন—

"কটি ঘর?"

সুশীলা বলিলেন—"উপরটা ভাড়া দেওয়া হবে, নীচে আমরা থাক্‌ব।"

দাসী বলিল—"তখনি বলেছি মা, এ বাড়ী আমাদের পোষাবে না। নিজেরা থাকবেন, আর ঐ এক পাল ছেলে"—

সুশীলার চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল।

ঠাকুরাণী বলিলেন—"চুপ কর বামা, তোর সব তাতে এত কথা কেন?"—সুশীলাকে বলিলেন, "চলুন উপরটা দেখে আসি।"

সুশীলা ও অজিত তাঁহাদের লইয়া উপরকার ঘর দেখাইতে গেল। ঘরগুলি দেখিয়া ঠাকুরাণী প্রীত হইলেন। দুইটি বড় ঘর, সম্মুখে খোলা বারান্দা ও ছোট দুটি ঘর। সমুদ্রের বাতাস ঘরে প্রবাহিত হইতেছিল।

ঠাকুরাণী বলিলেন,—"ভাড়া কত?"

সুশীলাকে ৫০ টাকা করিয়া ভাড়া দিতে হইত। অভয় বাবু বলিয়া দিয়াছিলেন এপ্রকার বাড়ী ৫০ টাকার কমে উপর পাওয়া যায় না। ব্যারাকের মত বৃহৎ বাড়ী, তন্মধ্যে প্রতি অংশে এক পরিবারের বাসোপযোগী করিয়া ৫০ টাকা ভাড়া দিতে হইত। অথচ প্রতি বাড়ীই ভিন্ন মনে হইত। সুশীলা ৫০ টাকা বাড়ী ভাড়া দিয়া কায়িক পরিশ্রমে যে কোন উপায়ে হোক ঐ বাড়ীতে থাকিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কারণ পৃথিবীতে তাঁহার আর আপনার বলিবার কেহ ছিল না কোথায় যাইবারও উপায় ছিল না। কাজেই সৌদামিনী দেবীর নিকট হইতে দূরে যাইতে তাঁহার সাহসও হইল না। দেশে আত্মীয় কেহ নাই, জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিবাহিতা হইয়াছিলেন তিনিও বহু দিবস হইল লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। দেশে বাটী নাই, অন্নের সংস্থান নাই, কাজেই বিদেশে থাকা ভিন্ন আর উপায় নাই। সুশীলা ভাড়ার কথার উত্তরে বলিলেন,—"৫০ টাকা।"

বামা চীৎকার করিয়া বলিল—"৫০ টেকা! একি মগের মুল্লুক নাকি? তখুনিত গিন্নীমাকে বলেছিনু এই টুকু বাড়ী, তার উপর একপাল ছেলে—"

ঠাকুরাণী বিরক্ত ভাবে বলিলেন—

"চুপ কর্‌, সব তাতে তোর কথা কইবার দরকার কি? তা কিন্তু ৫০ টাকা বড় বেশী ভাড়া মনে হচ্ছে, ঘরেত তেমন আসবাব পত্র কিছু নেই, বসবার ঘরে একটা সতরঞ্চ চাই।"

বামা বলিল—"কয়লার ঘর কই?"

সুশীলা বলিলেন—"নীচে একটি কয়লার ঘর আছে, তাতেই আমরা রাখি, আপনারাও সেইখানে রাখবেন।"

বামা বলিল—"হাঁ, তাহলে ওই ছেলে গুলোর বড় মজা হবে, চুরি কর্ত্তে দেরি হবে না।"

লজ্জায় ও অপমানে সুশীলার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, বলিলেন—

"আমার ছেলেরা ভদ্রলোকের ছেলে, এখনো ওসব শেখে নাই, আর ভগবান করুন কখনো যেন ওরূপ কাজ শিখ্‌তে না হয়।"

বামা বলিল—"তা যা বল বাছা, কয়লার ঘর ভিন্ন না হলে আমরা এ বাড়ীতে আসব্‌না। চলুন গিন্নীমা চলুন, এ বাড়ীতে আমাদেরকে পোষাবেনা। তখনি বুঝেছি যে বাড়ীতে একপাল ছেলে—"

সুশীলা বলিলেন—"আমার ছেলেরা আপনাদের কিছু বিরক্ত করবেনা, তারা খুব শান্ত।"

বামা বিরক্ত হইয়া বলিল—"হাঁ, শান্ত কত, দেখনা ছোট ছেলেটির চোক দুষ্টুমীতে ভরা, কেবল উপর নীচে ঘটঘটিয়ে বেড়াবে।"

সুশীলা বলিলেন—"ওরা কখনই উপরে যাবেনা।"

ঠাকুরাণী বলিলেন—"আচ্ছা এখন যাই, পরে বিবেচনা করে সংবাদ দেব।" দাসী ও ঠাকুরাণী চলিয়া গেলেন।

(১৫)

সুশীলা বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। এমন সময় সৌদামিনী আসিয়া পড়িলেন ও বলিলেন—

"ও কি, অমন মুখ শুকিয়ে গেছে কেন?"

সুশীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

"কি আর কর্‌ব? একজনরা বাড়ী ভাড়া নিতে এসেছিল। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, তিনিই বোধ হয় বাড়ী নিবেন, সঙ্গে একজন দাসীর মত। দাসীর ব্যবহার দেখে ত অবাক হলাম, কিছুতেই ঘর নিতে দিল না, বলিল, সতরঞ্চ ময়লা, কয়লার আলাদা ঘর চাই।"

ললিত ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

"মা, ওই তারা আবার ফিরে আস্‌ছে।"

বামা ও ঠাকুরাণী আসিলেন; ঠাকুরাণী বলিলেন—

"আপনার কথাই রইল, আমি ৫০ টাকা করে ভাড়া দিব। পরশু থেকে এ বাড়ীতে আস্‌ব, সব যেন পরিষ্কার থাকে।"

বামা বলিল—"কয়লার ঘরে ভাগ চল্‌বে না, আমি চাবি দিয়ে রাখ্‌ব।"

সুশীলা বলিলেন—"সেই ভাল, আমার কয়লাও তোমরা রেখো, আমার দরকার হলে দিলেই হবে।"

বামা ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"ও সব গোলমালে আমি নেই বাপু, নতুন সতরঞ্চ চাই, সেটা যেন মনে থাকে, গিন্নিমার অসুখ শরীর।"

সৌদামিনী চুপে চুপে সুশীলাকে বলিলেন, বলিয়া দাও সতরঞ্চ থাকিবে। সুশীলা তাঁহাদের বলিলেন যে, সতরঞ্চও থাকিবে। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেলেন।

সেই দিন রাত্রে অভয় বাবু সৌদামিনীকে বলিলেন যে, মিঃ রায় তাঁর আফিসের কাজ কর্ম্ম দেখিবার জন্য একটি বালক খুঁজিতেছেন। অজিত যদি সে কাজ করে ত তার মায়ের ভাল হয়। যদিও কাজ ছোট, কারণ চাকরেরই কাজ, চিঠি পত্র বিলি করিতে হইবে। উপস্থিত এত কষ্টে তবু একটা উপায় হবে। সৌদামিনা এক সময়ে গিয়া এই কথা সুশীলাকে বলিয়া আসিলেন।

সুশীলা রাত্রে বালক বালিকাকে আহারের জন্য ডাকিলেন। কেহই সাড়া দিল না। ইন্দু কাঁদিয়া উঠিল। সুশীলা তাহার নিকট গিয়া বলিলেন—

"কেন কাঁদছ মা, কি হয়েছে?"

ইন্দু বলিল—"আর শুক্‌নো রুটি খেতে পারিনে মা, গলায় বড় লাগে।"

ললিত ফুঁপাইয়া বলিল—"একটু ডাল কি ঝোল না হলে কি করে খাব? আমরা কি চিরকালই এমনি খাব? আর কি কিছু খেতে পাব না। সবাই ত কত ভাল জিনিস খায়।"

ইন্দু বলিল—"আমার ত কেবল গলা ব্যথা করে আমি শুধু জল খাই।"

সুশীলার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল, তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার রুদ্ধ অশ্রু আর বাধা মানিল না। কি ভীষণ পরীক্ষাতেই তিনি পড়িয়াছেন, কাহার কাছে হৃদয়ের বেদনা জানাইবেন? কে আর আছে? যাঁহার চরণে সব জ্বালা জুড়ায়, সেই চরণ স্মরণ করিয়াই তিনি নীরবে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মায়ের চক্ষের জল দেখিয়া অজিতের মন ব্যথিত হইল, পিতার শেষ আদেশ মনে পড়িল, সে ধীরে ধীরে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা কেঁদ না, কি কর্‌তে হবে বল, আমায় তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই শুন্‌ব।"

সুশীলা তাহার ললাটে চুম্বন করিয়া বলিলেন—

"আমার সব ভরসাই তুমি, আমার জন্য তোমার অনেক কষ্টই সইতে হবে।" সুশীলা কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে রহিলেন, শেষে সকলকে পুনরায় ডাকিয়া আহার করাইলেন। মায়ের চোখে জল দেখিয়া

সকলেই বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া যে যা পারিল, আহার করিয়া শুইয়া পড়িল। অজিত মায়ের কাছেই বসিয়াছিল, সে দেখিল থাকিয়া থাকিয়া মার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে। সে পুনরায় মায়ের কাছে গিয়া আদর করিয়া বলিল—

"কি হয়েছে মা? আমায় একটিবার বল, কি কর্‌লে তোমার মনে সুখ হবে, আমি তাই কর্‌ব।"

সুশীলা সৌদামিনীর নিকট চাকরীর কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত ভাবিতেছেন, কি করিয়া অজিতকে তিনি সেই প্রকার চাকরী করিতে বলিবেন। তা না হইলেও কি করিয়া সকলকার গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে? নিজে পীড়িত হইলে মোজা বোনা হইবে না, যদি নির্ম্মল টাকা না পাঠান, তিন মাসের ভাড়া দিতে হইবে, কি করিয়া এ সব হইবে? অজিতকে এই সামান্য কাজেই প্রবেশ করিতে হইবে, ক্রমে মনিবের সুনজরে পড়িলে হয়ত একটু ভাল কাজও জুটিতে পারে। আর অজিত ব্রাহ্মণের সন্তান হইলেও আজ পথের ভিখারী, তার আর মান অপমান কি? অজিতের কথা শুনিয়া সুশীলা অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—

"অজিত, বাবা আমার, একটি কথা তোমায় রাখ্‌তে হবে।"

অজিত আগ্রহের সহিত বলিল—"বল মা, কি কর্‌তে হবে, আমার সাধ্যমত যাহা হবে, আমি তা কর্‌ব।"

সুশীলা বলিলেন—"বিভার বাবা বল্‌ছিলেন যে, মিঃ রায় তাঁর আফিসের কাজ দেখবার জন্য একটি ছেলে খুঁজছেন, তুমি যদি সেই কাজ কর ত আমাদের পক্ষে বড় ভাল হয়।"

অজিত বলিল—"তাতে কি কাজ কর্‌তে হবে?"

সুশীলা বলিলেন—"এই ঘর দোর পরিষ্কার করা, চিঠিপত্র বিলি করা, তা ছাড়া আফিস ঘর আগলান—"

অজিত তীব্র কণ্ঠে বলিল—"তবে চাকরের কাজ, মা কি করে আমি কর্‌ব? আমার লেখা পড়া স্কুল?"

সুশীলা বলিলেন—"এখন লেখা পড়া করলে, স্কুলে গেলে, আমাদের খাওয়ার সংস্থান কোথা থেকে হবে?"

অজিত বলিল—"ললিত সুহৃদ ওরা কি কর্‌বে?"

সুশীলা বলিলেন—"ওরা যেমন স্কুলে যাচ্ছে যাবে, ওদের ত মাহিনা লাগে না, তা ছাড়া ওরা এখন কি কাজ কর্‌বে বল?"

অজিত বলিল—"মা, তা হলে তুমি আমায় এই চাকরের কাজই কর্‌তে বল্‌ছ?"

সুশীলা ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন—"আর উপস্থিত কোনও উপায় দেখছিনে, তিন মাসের বাড়ী ভাড়া বাকি রয়েছে।"

অজিত মাটিতে শুইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে কাতর ভাবে পিতাকে ডাকিল, সে যে তার পিতার বড় আদরের ছিল। তারপর পিতার সেই শেষ কথা মনে পড়িল, তিনি যে শেষ সময়ে বলিয়া গিয়াছেন, "অজিত মায়ের কথা শুনিও।" সে যদি এখন হইতে মিঃ রায়ের চাকর হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর ত উন্নতির আশা নাই। সে যে বিদ্যার জন্য ব্যাকুল, সেই বিদ্যা শিক্ষাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। ছোট লোকদের সহিত মিশিয়া ছোট হইয়া সে চাকরের কাজ করিবে। হায়, দুর্ভাগ্য! বালক অজিত আর ভাবিতে পারে না।

সুশীলা পুত্রের ক্রন্দনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া হতাশ ভাবে বলিলেন—

"অজিত তুমি অমন করে কেঁদ না, তোমার যদি এত কষ্ট হয়, তা হ'লে ও কাজ করো না।"

অজিতের চোখের জল শুকাইয়া গেল, সে উঠিয়া বসিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—

"মা, তোমার কি ইচ্ছা আমি এই কাজ করি?"

সুশীলা বলিলেন—"হাঁ বাবা, তাহলে আমাদের এই দুঃসময়ে বড় উপকার হবে।"

অজিত মায়ের হাত ধরিয়া বলিল—

"মা, আমি কাল থেকেই এ কাজ কর্‌ব। অভয় বাবুকে বলে আসব, তিনি যাবার সময় যেন আমায় নিয়ে যান।"

সুশীলা পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—

"বাবা, জগদীশ্বর তোমায় এর পুরস্কার দিবেন, মার আশীর্ব্বাদে তুমি চিরসুখী হবে।"

পরদিন অজিত অভয় বাবুর সহিত মিঃ রায়ের আফিসে গেল। মিঃ রায় তখনো আফিসে আসেন নাই। অভয় বাবু অজিতকে দ্বারের নিকট বসাইয়া রাখিলেন। দ্বিপ্রহরে যখন মিঃ রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন দ্বারে অজিত দাঁড়াইয়া আছে, তিনি ভাবিলেন যে হয়ত সে কোন কাজের জন্য তাঁহাকে কিছু বলিতে আসিয়াছে, অথবা পুনরায় কাহারও দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে আসিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি যে এখানে, তোমার কি চাই?"

অজিত নতমুখে বলিল "আমি কাজের জন্য এসেছি, অভয় বাবু আমায় সঙ্গে করে এনেছেন, তিনি বলেছেন যে এখানে কি কাজ খালি আছে।"

সেই সময় অভয় বাবুও আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—

"আপনি যে একটি ছোকরা চাকরের কথা বলেছিলেন, সেই কাজের জন্যই ওকে এনেছি, ছেলেটি ভাল,"—

অজিতের দুই কপোল রক্তিমবর্ণ হইল, সে নত মুখে ভূমিপানে চাহিয়া রহিল। বালকের সেই বিষাদ ও লজ্জা পূর্ণ সুন্দর সরল মুখ দেখিয়া মিঃ রায়ের মন গলিয়া গেল, তিনি বলিলেন—

"বেশ ভালইত, তাহলে আজ থেকেই তুমি কাজ কর।"

অভয় বাবু বলিলেন—"কি কি কাজ কর্ব্বে আপনি একবার অনুগ্রহ করে ওকে বলে দিন।"

মিঃ রায় বলিলেন—"ওকে অন্য কাজ কর্‌তে হবেনা, আমার দুএকখান চিঠি বিলি কর্‌তে হবে, আফিসেই থাক্‌বে।"

অভয় বাবু বলিলেনন—"আফিষ ঝাড়বে?"

মিঃ রায় বলিলেন—"না না, ওসব কাজ কর্‌বার কোন দরকার নেই।"

তারপর অজিতের প্রতি চাহিয়া বলিলেন "তোমার নাম কি?"

অজিত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল "অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়।" মিঃ রায় অভয় বাবুকে বলিলেন "অন্য ছেলেরা কত মাহিনা পায়?"

অভয় বাবু বলিলেন—"চারটাকা করে পায়।"

মিঃ রায় বলিলেন—"একে ছয়টাকা করে দেবেন, ও ভাল কাজ কর্‌লে ক্রমশঃ বাড়বে বলে দেবেন।" তার পর তিনি অজিতকে ডাকিয়া আফিস ঘরে প্রবেশ করিলেন, ও তাহাকে কতগুলি পুস্তক গুছাইয়া রাখিতে বলিলেন।

সন্ধ্যার সময় অজিত যখন বাড়ী ফিরিল, সুশীলা দেখিলেন তাহার মুখ শুষ্ক ও ম্লান, তিনি সারাদিন পথ চাহিয়া ছিলেন। পুত্রকে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কাজ কি বড় শক্ত?"

অজিত নতমুখে বলিল 'না।'

সুশীলা বলিলেন "তোমার যদি কষ্ট হয় তা হলে ও কাজ না হয় আর করে কাজ নেই।" অজিত মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল,—

"যতই কষ্টের হোক না মা, তোমার কষ্ট মনে করে আমার কর্‌তেই হবে। তুমি একা কত কর্‌বে?"

সুশীলা সস্নেহে পুত্রকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় লাঞ্ছিত ভারতবাসী।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল ভারতবাসী ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এবং জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অন্যান্য নানা কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হইতেছে তাহার সংবাদ আমরা প্রতিদিন সংবাদ পত্রে পড়িয়া পড়িয়া মর্ম্মাহত হইতেছি। তাঁহাদের অপমান ক্ষত হৃদয়ের জ্বালা, তাঁহাদের দুঃসহ বেদনার তীব্র দাহ, তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব সংগ্রামের বীরত্ব, তেজস্বিতা, মনুষ্যত্ব তাঁহাদের মাতৃভূমির সুপ্ত, নৈরাশ্য জড়িত অবনত সন্তানদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে এক বিপুল স্পন্দন তুলিয়াছে। মাতৃভূমির মর্য্যাদা রক্ষার্থ তাঁহাদের আত্মত্যাগের পুণ্য সুরভি সেই সুদূর হইতে সমুদ্রের উপর দিয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে।

প্রশ্ন হইতে পারে ভারতবাসী স্বদেশ ছাড়িয়া সেই সুদূর আফ্রিকায় গিয়া বাস করিতেছে কেন? তাহাদের উপর অত্যাচারইবা কেন হইতেছে? সে অত্যাচার কি কি? এ অত্যাচার সহিয়া ভারতবাসীর সেখানে থাকিবার প্রয়োজনইবা কি? দেশে ফিরিয়া আসিলেইত সকল গোল চুকিয়া যায়।

কেপকলনী নেটাল, অরেঞ্জিয়া ও ট্রান্সভাল এই চারিটি প্রদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত। এই সকল স্থানেই ভারতবাসিগণ বাস করিতেছেন এবং অত্যাচারে পীড়িত হইতেছেন। বুয়ারদের সহিত ইংরাজের যুদ্ধের পূর্ব্বে কেপকলনি ও নেটাল ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। বুয়ারগণ পরাজিত হইলে উপরোক্ত চারিটি প্রদেশ লইয়া বুয়ার এবং ইংরাজের সম্মিলিত গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় দক্ষিণ আফ্রিকা এক্ষণে ইংলণ্ডের একটি উপনিবেশ।

ইহার শাসনভার বুয়ার এবং ইংরাজের মিলিত পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত। বহিঃশত্রু হইতে রাজ্য রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ এবং ইংলণ্ড হইতে গভর্ণর প্রেরণ, এই তিনটি বিষয় ইংলণ্ড কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হয় এবং কেবলমাত্র এই তিনটি বিষয় লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ। অন্যান্য সকল বিষয়েই ইহা স্বাধীন।

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত এই সকল প্রদেশে বহু সোণার, কয়লার এবং হীরকের খনি আছে সেখানে চিনির কারবার সুবিস্তৃত। চিনি প্রস্তুতের জন্য বহু আকের ক্ষেত, চায়ের ক্ষেত এবং ক[illegible] কারখানা আছে। বুয়ার যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে এই স্থানের দুইটি প্রদেশ (নেটাল ও কেপকলনি) যখন ইংরাজ অধিকারভুক্ত ছিল তখন এই সকল খনির ও কারখানার মালিকগণ এবং চা-কর ও চিনি-কর[illegible] ব্যবসা বাণিজ্য সুচারুরূপে চালাইবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে পরিশ্রমী, মিতাচারী এবং সৎস্বভাবসম্পন্ন মজুর দক্ষিণ আফ্রিকায় আমদানী করিবার জন্য ইংলণ্ডকে অনুরোধ করেন। এতদিন তাঁহারা কাফ্রি কুলি লইয়া এই সকল কাজ চালাইতেন কিন্তু কাফ্রিগণ তাঁহাদের ব্যবসা ক্রমশঃই অবনতির দিকে লইয়া যাইতেছিল। এই সকল ব্যবসায়ীর স্বার্থের উন্নতির জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে একদল মজুর দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত নেটালে প্রেরণ করেন। [illegible] আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময় হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আফ্রিকায় ভারতবর্ষ হইতে কুলি চালান হইতেছিল। বিদেশে ধনোপার্জ্জনের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, আপনাদিগকে দারিদ্র্য রাক্ষসীর ভীষণ গ্রাস হইতে মুক্ত করিবার মায়া-মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া, দুঃখী, পরপদানত ভারতবাসী সেই কে[illegible] অজানা অচিন্ রাজ্যে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে ম[illegible] সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল! সম্মুখে যে কি উত্তাল তরঙ্গ কি ভীষণ সংগ্রাম, কি শোচনীয় ভবিষ্যৎ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তাহাদের জানা ছিল না। তাহারা তখন ভবিষ্যত সুখের আশায় মোহমুগ্ধ! আর তাহাদের মালিকগণ

তাহাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের এক মোহন ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যের কশাঘাত যে বড় ভীষণ! ভারতবর্ষে ভারতবাসী দরিদ্র কিন্তু বিদেশী আসিয়া এই ভারতবর্ষ হইতেই মণি মুক্তা খুঁড়িয়া লইয়া সম্পদশালী হইতেছে। তাই ভারতবাসীকে আহার অন্বেষণে দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইল।

নেটাল তখন ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত। খনির ইংরাজ মালিকগণ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ মজুরদিগের বসবাসের নানা প্রকার সুবিধা করিয়া দিলেন। চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তাহারা স্বাধীন ভাবে জমি জমা লইতে পারিবে, চাষ বাস ও ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারিবে এই অধিকার প্রদান করিলেন। ক্রমে মজুরদিগের সহিত বহু ভারতবাসী স্বাধীনভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নেটালে গমন করিতে লাগিলেন। নেটালে এই শ্রেণীর ভারতবাসীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তাঁহারা তত দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য দেশে গিয়া ব্যবসা করিতে উৎসুক হইলেন। একদল ভারতবাসী স্বাধীন ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নেটালের সীমা অতিক্রম করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ করিলেন। ট্রান্সভাল নেটালের নিকটবর্ত্তী আর একটি প্রদেশ। ইহা তখন বুয়ারদের অধীন উপনিবেশ ছিল। মিতাচারী, পরিশ্রমী, শান্ত এবং সচ্চরিত্র বলিয়া ভারতবাসিগণ ঐ সকল প্রদেশে স্বাধীন ভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে এতদূর উন্নতি লাভ করিলেন যে তাঁহাদের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম প্রবেশের কুড়ি বৎসরের মধ্যে নেটালের ইংরাজ ও ট্রান্সভালের বুয়ারগণ দেখিলেন ভারতবাসীর সহিত প্রতিযোগিতায় তাঁহারা পরাজিত হইয়া যাইতেছেন। তখন তাঁহাদের স্বার্থে প্রবল আঘাত লাগিল। বণিক পকেটে টান পড়িলেই ক্ষেপিয়া উঠে। পকেট যে তাহাদের সর্ব্বস্ব! সেই সময় হইতে আজিকার এই ভীষণ সংগ্রামের সূত্রপাত হইল।

ভারতবাসিগণ যাহাতে স্বাধীন ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস, ব্যবসা বাণিজ্য করা এবং কলকারখানা চালাইতে না পারেন তজ্জন্য তাঁহারা নানারূপ আইন বিধিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার তাঁহারা ভারতবাসীকে কুলিরূপে চাহিলেন, কেননা ভারতবর্ষীয় কুলি না হইলে তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্য অচল —কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বাধীন ভারতবাসীর অস্তিত্ব তাঁহাদের অসহ্য হইল। স্বাধীন ভারবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে তাড়াইবার জন্য তাঁহারা নানাপ্রকার ঘৃণ্য আইন করিয়া যে অত্যাচার সুরু করিয়া দিলেন তাহারই দূরীকরণ ইংরাজের সহিত বুয়ারের যুদ্ধের অন্যতম কারণ। অনেকেই একথা জানেন যে বুয়ার যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরাজ এই বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ভারতবাসীর প্রতি বুয়ারগণ যে অত্যাচার করিতেছেন তাহা দূর করাই আমাদের এই যুদ্ধের প্রধান কারণ। ভারতবাসী আমাদের প্রজা, তাহাদের প্রতি অত্যাচার কি আমরা সহ্য করিতে পারি? বুয়ারদিগকে পরাজিত করিয়া আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় যে শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিব তাহা ভারতবাসীর সকল দুঃখ দূর করিবে, ভারতবাসীর প্রতি সুশাসন করিয়া তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাঁহারা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া অগণ্য সৈন্য প্রেরণ করিয়া, নিজের দেশের বাছা বাছা বীর পাঠাইয়া আমাদেরই সুখের জন্য, আমাদেরই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বুয়ারদিগের সহিত ভীষণ সংগ্রামে রত হইয়াছিলেন। এই সংগ্রামে ভারতবাসী নানা প্রকার অসুবিধার জন্য যদিও যুদ্ধ করিতে সক্ষম হন নাই কিন্তু মিঃ গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে প্রায় এক হাজার ভারতবাসী ইংরাজের পক্ষে থাকিয়া আহতদিগের সেবার ভার লইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্বলন্ত গোলার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, কালান্তক অগ্নি বৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া রণক্ষেত্র হইতে আহত যোদ্ধাদিগকে Stretcherএ করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। সে সময় তাঁহাদের অকুতোভয়তা, অক্লান্ত উৎসাহ, অকুণ্ঠ সাহস দেখিয়া ইংরাজগণ চমকিত হইয়াছিলেন। এবং এই আত্মত্যাগের ফলে যুদ্ধের পর কয়েক বৎসর ভারতবাসিগণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা ভারতবাসীর এ উপকার বিস্মৃত হইলেন। বুয়ারগণ পরাজিত হইবার পর সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা যখন ইংরাজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল,

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যখন পার্লামেণ্ট গঠিত হইল তখন ভারতবাসীর সকল আশা নির্ম্মূল হইল। উপকারের প্রত্যুপকার যে ধর্ম্মসঙ্গত তাহা কাহারও মনে হইল না। বুয়ারদের অধীনে বাস করিবার সময় ভারতবাসীর প্রতি যত অত্যাচার হইত, ইংরাজ ও বুয়ারে মিলিত পার্লামেণ্টের অধীনে ততোধিক অত্যাচার আরম্ভ হইল। জানিনা, ইংরাজের যত শুভকামনা কোন্ দেবতার অভিশাপে শূণ্যে বিলীন হইয়া গেল! তাঁহারা যে সকল অত্যাচারমূলক আইন বিধিবদ্ধ করিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি আইন প্রধান :—

(১) ইমিগ্রেসন আইন। এই আইন অনুসারে এসিয়ার কোন অধিবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নামিতে হইলে এমন কয়েকটি সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয় যাহা মনুষ্যত্ব ও ন্যায় ধর্ম্মের বিরোধী। কোনো ইউরোপিয়ানকে এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইতে হয় না।

(২) দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সকল ভারতবাসী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা স্বাধীন ভাবে কেপ-কলোনিতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদের এই অধিকার ছিল।

(৩) নেটালের ভারতবাসী মজুরগণ চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাৎসরিক ৪৫ টাকা ট্যাক্স দিবার পর তথায় স্বাধীন ভাবে বাস করিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশে তাহাদের বাস করিবার অধিকার নাই।

(৪) ভারতবর্ষ হইতে মজুরদিগকে চুক্তিবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। আইন করা হইল, প্রত্যেক চুক্তিমুক্ত ষোল বর্ষের অধিক বয়স্ক পুরুষ এবং তের বৎসরের ও তদূর্দ্ধ বয়সের নারী বৎসরে ৪৫ টাকা ট্যাক্স দিতে বাধ্য। এই আইনের দুটি উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ, স্বাধীন ভারতবাসীকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বহিষ্কৃত করা, কারণ ট্যাক্স দিতে না পারিলে তাহারা জেলে যাইবার ভয়ে দেশ ছাড়িয়া যাইবে দ্বিতীয়তঃ, চুক্তিমুক্ত হইবার পর ট্যাক্স দিতে অসমর্থ হইলেই পুনরায় তাহারা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া দাসত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। কেননা স্বাধীন ভাবে বসবাস করিতে গেলেই এই ট্যাক্স দিতে হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান প্রধান নেতাগণ বলিয়াছেন, "আমরা ভারতবাসীকে এদেশে যে চাইনা এমন নহে, কিন্তু তাহাদিগকে কুলিরূপে চাই। তাহারা আমাদের দাস হইয়া আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া দিবে। নিজেরা স্বাধীন ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আপনাদের অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া তাহাদের দেশকে সম্পদশালী করিবে কেন? আমাদের দেশে যখন আসিয়াছে তখন চিরকাল আমাদের দাস হইয়া থাকুক। স্বাধীন ভাবে আমাদেরই মত প্রজাস্বত্ব ভোগ করিয়া, কারখানা খনির মালিক হইয়া, জমিদার হইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া দিবে, একি তাহাদের স্পর্দ্ধা? কৃষ্ণবর্ণ জাতির এ স্পর্দ্ধা কখনও বরদাস্ত করা যাইতে পারে না।" অতএব স্বাধীন ভারতবাসীর অস্তিত্বের মুলোচ্ছেদের জন্য এই ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হইল! এই রক্তশোষণকারী ট্যাক্স কত পরিবারকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, কত পুরুষকে পাপে ডুবাইয়া দিতেছে, কত রমণীকে অধর্ম্মের পথে দাঁড় করাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভাবিয়া দেখুন, একটি পরিবারে পিতা, মাতা, এবং একটি ১৬ বর্ষ বয়স্ক পুত্র ও একটি তের বর্ষের কন্যা থাকিলে প্রত্যেককেই বৎসরে ৪৫ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। এক দরিদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে প্রতি বৎসর এত টাকা ট্যাক্স দেওয়া কি ক্লেশকর!

(৫) দক্ষিণ আফ্রিকায় কিংবা তাহার বাহিরে কোথাও হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম অনুসারে যে বিবাহ হইয়াছে তাহা অবৈধ। এই আইন অনুসারে কোনো হিন্দু কিংবা মুসলমান স্ত্রী দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনতঃ স্ত্রী বলিয়া গণ্য নহেন। সুতরাং কোনো বিবাহিতা হিন্দু কিংবা মুসলমান রমণী দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনতঃ প্রবেশ করিতে পারেন না। কিংবা দেশে থাকিয়া স্বামীর নিকট যাইতে অথবা অল্পদিনের জন্য দেশে ফিরিয়া আসিতে আইনতঃ অক্ষম। তাঁহাদের বিবাহ অবৈধ বলিয়া তাঁহাদের সন্তান সন্ততিও অসিদ্ধ। জঘন্য, অমানুষিক আইন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে।

তাঁহারা রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া এই আইন দূর করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত। সমগ্র ভারত নারী সমাজের প্রতি একি ঘোর অবমাননা! ভারতবর্ষের নারীত্বের প্রতি একি ঘৃণ্য অত্যাচার! সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, পদ্মিনীর জন্মভূমির কন্যাগণের প্রতি একি নিদারুণ নিষ্ঠুর অপমান! ভগিনীগণ! আমরা মৃত, আমরা আপনাদের কুসুমবিকীর্ণ শয্যায় শুইয়া আরামে, আয়াসে দিন কাটাইয়া দিই বলিয়া নারীর এই অপমানের কথা বিস্মৃত হইয়া আছি। বিদেশে আমাদের ভগিনীগণের মস্তকে যে অপমানের জ্বালা পুঞ্জীকৃত হইয়াছে, আমরা কি তাহার এক বিন্দুও অন্তরে অনুভব করিতে পারি? যদি তাহা পারিতাম, তবে ভৈরব নিনাদে সমগ্র দেশ প্রকম্পিত করিয়া আমাদের তীব্র প্রতিবাদধ্বনি ভারতাকাশ মুখরিত করিয়া তুলিত। কিন্তু আমাদের যাহা অসাধ্য, সেই সুদূর বিদেশে আমাদেরই দেশের অত্যাচারে পীড়িত, অপমানে জর্জ্জরিত, আমাদেরই ভগিনীগণ অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য যে জ্বলন্ত আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত দেখাইয়েছেন তাহাতে আশা হয়, প্রয়োজন হইলে ভারতনারী অপমান নীরবে মস্তক পাতিয়া না লইয়া তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ।

মিঃ গান্ধীর জেলে যাইবার পূর্ব্বে মিসেস গান্ধীর সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হয় তাহা একান্তই হৃদয়বিদারক। মিসেস গান্ধী রোষে, ঘৃণায় উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "এদেশের আইনানুসারে আমরা ত স্বামী স্ত্রী নই। আমাদের সন্তানেরাও অবৈধ। যে দেশের এমন ঘৃণ্য আইন, চল সে দেশ হইতে চলিয়া যাই।" মিঃ গান্ধী বলিলেন, "না, তাহাত হইবে না। এই আইন রদ করিয়া ভারতবাসীর অপমান দূর করিতে আমাদিগকে এখানেই থাকিতে হইবে।" মিসেস গান্ধী বলিলেন "তুমি জেলে গেলে আমার জীবন ধারণের সার্থকতা কি?"

ইহার পরই মিসেস গান্ধীও সংগ্রামের রক্ত পতাকা উড্ডীন করিয়া দিলেন, আর দলে দলে নারীগণ আপনাদের মান, মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাহার তলে মিলিত হইলেন। উপর্য্যোক্ত পশুজনোচিত আইন অমান্য করাতে মিসেস গান্ধী, তাঁহার দুই পুত্রবধূ এবং অন্যান্য কত রমণী আজ কারাগারের নিষ্ঠুর পীড়নে জর্জ্জরিত হইতেছেন।

উপরোল্লিখিত আইন ব্যতীত ভারতবাসী সম্বন্ধে আরও নানা প্রকার অপমান সূচক আইন বিধিবদ্ধ আছে। ভারতবাসীকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইতে হইলে দশ আঙ্গুলের দশটি ছাপ এবং দুই হাতের দুইটি ছাপ, এই বারটি ছাপ দিতে হয়, আইনে ভারতবাসীকে সর্ব্বত্রই কুলি বলিয়া লিখিত আছে। যাঁহারা কুলিস্বরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া তথায় গমন করেন নাই এমন সব স্বাধীন ব্যবসায়ী ভারতবাসীও কুলি বলিয়া আইনে আখ্যাত হইয়াছেন। ভারতবাসী হইলেই তাঁহারা কুলি। আর তাঁহাদের চোর, ডাকাত প্রভৃতির সামিল করা হইয়াছে। ভারতবাসীর ফুটপাথে হাঁটিবার অধিকার নাই। যে ট্রাম, ট্রেণের যে গাড়ী কিংবা বাসে কোনো ইউরোপীয় যাইতেছেন তাহাতে ভারতবাসীর চড়িবার অধিকার নাই। ব্যবসা করিবার জন্য ভারতবাসীকে প্রায়ই লাইসেন্স দেওয়া হয় না। শতবার আবেদন নিবেদনে পরিশ্রান্ত হইয়া মিঃ গান্ধী ১৯·৬ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের এক মহতী সভায় এই প্রতিজ্ঞা করেন যে এই অত্যাচার ও অপমানমূলক, এই ঘৃণ্য পাশব আইন মান্য করা অপেক্ষা আমরা কারাগারের যাতনা সহ্য করিব। যতদিন না ভারতবাসীর ইজ্জত রক্ষিত হয় ততদিন আমরা এই দেশের বে-আইন মানিব না এবং তাহার ফলস্বরূপ যে দণ্ড ভোগ করিতে হয় করিব। ইহাই দক্ষিণ আফ্রিকায় Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের আরম্ভ।

এই সংগ্রামের ফলে এ পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ ৩ হাজার ৫ শত বার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, এক শত লোক নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, শত শত পরিবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং সমগ্র সম্প্রদায় আজ পথ ভিখারী। আজ কত পরিবারের উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ কারাগারে আবদ্ধ বলিয়া রমণীগণ অসহায়া,

শিশুসন্তান অনাহারে মৃতপ্রায়। খনির মালিকগণ খনিগুলিকে জেলখানায় পরিণত করিয়াছেন আর তাঁহারা হইয়াছেন জেলার। কুলিদিগকে সেই খানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। জেলের আইনানুসারে কোনো কয়েদী অবাধ্য হইলে জেলার তাহাকে গুলি করিয়া মারিতে পারে এবং ইচ্ছামত বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে পারে। খনিগুলি জেলখানায় পরিণত করাতে এই ফল হইয়াছে যে খনির মালিকগণ ইচ্ছামত কুলিদিগকে গুলি করিয়া মারিতে কিংবা বেত্রাঘাত করিতে পারেন অনেক স্থলে খনির কুলিগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহাদিগকে কাজে আনিবার জন্য খনির মালিকগণ তাহাদিগকে বেত্রাঘাতে মৃতপ্রায় করিতেছেন।

ব্যবসা করিবার জন্য ভারতবাসীকে অনেক স্থলে লাইসেন্স দেওয়া হয় না। কতবার এইরূপ ঘটিয়াছে যে এই আইনের প্রতিবাদ কল্পে ভারতবাসিগণ বিনা লাইসেন্সেই রাস্তায় জিনিষ ফেরি করিয়াছেন। পুলিস আসিয়া যেই তাঁহাদের ধরিয়া লইয়া গেল; অমনি একদল নারী আসিয়া জিনিষ ফেরী করিতে আরম্ভ করিলেন, পুলিস তাঁহাদিগকেও ধরিয়া লইয়া গেল। আবার আর একদল আসিলেন। এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, একাগ্র নিষ্ঠা, আত্মোৎসর্গের মহানভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসিগণ এই অপূর্ব্ব সংগ্রামে তনু মন ধন অর্পণ করিয়াছেন। স্বার্থের পূতিগন্ধময় পঙ্কিল ধারায় আজ তাঁহারা মলিন নহেন, আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জল দীপ্তিতে তাঁহারা আজ ভাস্বর। ভারতবর্ষের নরনারীর এই বীরত্ব ও আত্মত্যাগ জগতের সুসভ্য জাতির সম্মুখে তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। এখন এই সংগ্রাম ত্যাগ করিয়া অপমান ও লাঞ্ছনার বোঝা বহন করিয়া অবনত মস্তকে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহারা অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন কিন্তু বিদেশে ভারতবাসীর গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের এই যে প্রাণপণ সংগ্রাম ইহার অক্ষয় ফল হইতে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হইবে। তাঁহারা ভারতবাসীর অপমান সূচক এই সকল আইন রদ করিয়া, ভারতবাসীর মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইউরোপীয় সুসভ্য জাতিদের সহিত ভারতবাসীকে সমান আসনে বসাইয়া ভারতবর্ষের মহিমা ও গৌরব জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই সংগ্রাম আরো পাঁচ মাস কাল অব্যাহত রাখিতে পারিলে তবে সুবিচারের আশা আছে। এই পাঁচমাস তাঁহাদিগকে জীবিত রাখিতে হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে প্রতিমাসে অন্ততঃ ৭৫ হাজার টাকা পাঠাইতে হইবে। আফ্রিকার এই সহানুভূতি জ্ঞাপন কেবল কাগজে কলমে

মিসেস্ সেখ মেতাব।

এই রমণী মুসলমান নারীদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম কারাগারে গমন করিয়াছেন।

না থাকিয়া, কেবল প্রস্তাবের মধ্যে আবদ্ধ না রহি[illegible] প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হউক। আমাদের অত্যাচা[illegible] পীড়িত, লাঞ্ছিত ভাই ভগিনীদিগের দুঃখে অন্ত[illegible] দুঃখ ঢালিয়া দিয়া, তাঁহাদের অশ্রুতে অশ্রু মিশাই[illegible] তাঁহাদের কণ্টকাকীর্ণ পথের যাতনা প্রাণে বিন্দুমা[illegible] অনুভব করিবার জন্য আজ আমরা প্রস্তাব করি যে সমগ্র বঙ্গনারী সমাজ এক প্রাণে মিলিত হইয়া একটি দিন নির্দ্ধারণ করিয়া উপবাস করুন। সে দিনের আহার্য্যের ব্যয় প্রত্যেক নারী, লাঞ্ছিত ভাইভগিনীদিগের জন্য প্রেরণ করুন। সমগ্র বঙ্গের প্রত্যেক প্রসিদ্ধ স্থানের রমণী সমাজকে পত্র লিখিয়া ঐ দিনে উপবাস করিতে অনুরোধ করুন। একটি দিনের এই সামান্য ত্যাগ সমগ্র দেশের নারী সমাজের অন্তরে যে শক্তির তরঙ্গ উত্থিত করিবে তাহা হয়ত আমাদিগকে আমাদের স্বাভাবিক জড়তা, আরামপ্রিয়তা ও নিশ্চেষ্টতা হইতে তুলিয়া ধরিয়া মনুষ্যত্বের ভাব জাগ্রত করিতে সক্ষম হইবে। *

শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা।

হেমন্তের অবসানে যখন প্রকৃতি দেবী শরতের শুভ্র আভরণগুলি একে একে উন্মোচন করিয়া তপস্বিনীর বেশে শিশিরের নিস্পন্দতার মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছিলেন, তখন সবেমাত্র তরু পত্রান্তে দুই এক বিন্দু নীহার নয়ন বারি দেখা দিয়াছে। তখনও মাতা বসুন্ধরা গলিত পত্র পুষ্পের শেষ অঞ্জলি অঙ্গে ধারণ করিয়া শীর্ণা স্রোতস্বিনীর অস্পষ্ট কলকলে স্তোত্রপাঠ করিতেছিলেন; কুজ্ঝটিকার নিবিড় আবরণে তখনও চন্দ্রসূর্য্যের জ্যোতিঃ বিমলিন হয় নাই; এ যেন একটা মহাসমাধির আরম্ভ;—ধ্যানের সন্ধি সময়। এই সময় আমরা অর্দ্ধ সহস্র যাত্রী জগতের শ্রেষ্ঠ কবি, আমাদের নিতান্ত আপনার-জন রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনায় বোলপুর যাত্রা করিয়াছিলাম।

ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে বিচিত্র সৌধ শোভিত রাজধানীর নানা কর্ম্ম কোলাহল পশ্চাতে রাখিয়া আমাদের বাষ্পীয় রথ যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই দেখিলাম, পল্লীগ্রামের সরল এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কেমন ধীরে ধীরে আসিয়া নগরের কৃত্রিমতাকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। সুদক্ষ চিত্রকরের তুলিকার মৃদুস্পর্শে যেমন চিত্রপট-লিখিত ছায়া রেখা গুলি আলোকে আসিয়া চক্ষুর অজ্ঞাতসারে মিলাইয়া যায়, তেমনি নগর বিলাসিনী কমলার মণি মুক্তা খচিত অঞ্চল খানি কেমন অলক্ষিতে আসিয়া গ্রাম্যলক্ষ্মীর আড়ম্বরহীন ছিন্ন বসন প্রান্তের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, তাহা ধরিবার উপায় নাই। এইরূপ মিলনেই সমাজচিত্রের সৌন্দর্য্য যথার্থরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আমরা যে পবিত্র আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, শতপ্রকারের কৃত্রিমতা অন্তরে লইয়া তথায় প্রবেশ করিবার অধিকার আমাদের নাই। সেই জন্যই বুঝি আমাদের হৃদয়কে তপোবনের উপযোগী করিবার জন্য পল্লীজননী চারিদিক হইতে আমাদিগকে আলিঙ্গন প্রদান করিতেছিলেন। কোথাও দিগ্‌ব্যাপিনী লোচন লোভনীয়া সুবর্ণ প্রভাময়ী শস্যপংক্তি, কোথাও ইতস্ততঃ দূর্ব্বাদলমণ্ডিত শৃঙ্খলা বিহীন মৃত্তিকা স্তূপ, কোথাও বা বিরল-শষ্প বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতার বিতান, হেমন্তের মেঘচ্ছায় মলিন নিস্তেজ রৌদ্রে কেমন সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে—তাহাতে দীপ্তি আছে কিন্তু প্রখরতা নাই। যন্ত্রপরিচালনায় সুপটু সারথির কৌশলে আমাদের বিপুলায়তন শতচক্র স্যন্দনখানি তাহার চির পরিচিত লৌহবর্ত্মে নিঃসঙ্কোচে অগ্রসর হইতেছিল; কোনো অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই,—কোনো বাধা বিঘ্নের আঘাত নাই। নিত্য ঘর্ষণে তদুপরি যে রজতসন্নিভ রেখা চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা যেন পূর্ব্বেই আমাদিগকে আমাদের লক্ষ্যস্থানের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে। যখন মনে হয় আমরা আশ্রমে যাইতেছি,

* দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী অত্যাচার পীড়িত ভারতসন্তানগণের প্রতি সহানুভূতিজ্ঞাপক নারী সভায় পঠিত।

তখন এক এক বার সহস্র বৎসর পশ্চাতে যাইয়া দেখি, কত ছিল, আর কত নাই,—কত ছিল না, আর কত হইয়াছে। পথের দুই পার্শ্বে চারণ-ভূমিতে সবৎসা গাভীসমূহ হরিৎ তৃণ রাজি ভক্ষণ করিতেছে, কোথাও বা রৌদ্রতপ্ত মহিষ-যূথ স্বল্পতোয় সরোবরের পঙ্কিল সলিলে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে,—অদূরে বৃক্ষচ্ছায়ায় হলবিমুক্ত নিদ্রালু বৃষভ অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে রোমন্থন করিতেছে; কিন্তু ইহারা কেহই এই গম্ভীর নির্ঘোষকারী বিদ্যুৎ গতি রথের পানে চোখ তুলিয়াও চাহে না। বাস্তবিক স্বাভাবিকতা, মানবের বুদ্ধিকে অনেক সময় এমনি ভাবে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে। এই বিচিত্র বিশ্বলীলায় যিনি অধীশ্বরী স্বরূপে অন্তরালে থাকিয়া অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতেছেন যে ভাগ্যবান্ তাঁহার স্নেহ শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তিনি এমনি করিয়া বিজ্ঞান গর্ব্বের উচ্চ ঢক্কা নিনাদে উদাসীন থাকেন।

ক্রমে বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইতে চলিল। যাত্রীগণ সমুৎসুক চিত্তে প্রকোষ্ঠাভ্যন্তর হইতে গ্রীবা নির্গত করিয়া সম্মুখে বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। উদ্গীরিত ধূমপটলে বায়ুমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হওয়ায় অদূরবর্ত্তী বৃক্ষলতাদিও মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিল। পবনাভিহত ভস্মাবশিষ্ট অঙ্গারকণা সমূহ নেত্র-কণীনিকাকে পীড়িত করিতে লাগিল। পলিত কেশ বয়োবৃদ্ধগণ সকলে মিলিয়া কিরূপে রবীন্দ্র নাথের সমাদর করিবেন, তাহাই আলোচনা করিতেছিলেন; আর যুবক ও বালকগণ, যাঁহারা সর্ব্বদাই কোনো উৎসবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন না, পুষ্পচয়নে, মন্দির সজ্জায় অথবা গীত বাদ্যের আয়োজনেই যাঁহাদের সমস্ত আনন্দ ও সমস্ত উৎসাহ নিঃশেষে ব্যয়িত হয় তাঁহাদের কাজ কেবল ছুটাছুটি আর কোলাহল। পথিমধ্যে নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানে রথ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহারা কেহ কেহ বিস্রস্ত রথ-সজ্জাগুলি যথা সন্নিবিষ্ট করিতে লাগিলেন, কেহ বা যাত্রীগণের জন্য সুমিষ্ট খাদ্য ও শীতল পানীয় সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। কেহবা মনোরম পল্লীশোভায় মুগ্ধ হইয়া বন্ধুগণের সহিত হাস্য কলরব করিতে করিতে একটু দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন অমনি রথ চালকের তীব্র বংশীধ্বনি শ্রবণে চমকিত হইয়া ছুটিয়া আসিলেন; কেহ যাত্রিগণের মধ্যে সুগন্ধি তাম্বুল বিতরণ করিতেছিলেন। এই সকল বিশ্রাম স্থানগুলিতেও দেখিলাম কেমন একটা গ্রাম্যতা আসিয়াছে। সযত্নরচিত একখানি সুন্দর পুষ্পিত উদ্যান, চতুঃপার্শ্বে বিশৃঙ্খল বনরাজি, নিকটবর্ত্তী গৃহস্থগণের দৃষ্ট বংশকঙ্কাল কুটীর সমূহ, সঞ্চিত-শৈবাল অপসৃত চুর্ণপ্রলেপ হর্ম্ম্য-গাত্রে ভগ্নকোণ ইষ্টকরাশি, এই পল্লী প্রভাবের সাক্ষী। একটা কোমলতা যেন স্নেহময়ী জননীর মত অবাধ্য কঠোরতাকে মৃদুস্পর্শে নিরন্তর চাপিয়া রাখিতেছে। যতই আমরা অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই এই গ্রাম্য প্রভাব অধিকতর পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎসমূহ প্রাবৃটের প্রচুর দানের যাহা কিছু সঞ্চিত করিতে পারিয়াছিল, তাহাই লইয়া তৃষ্ণার্ত্ত গ্রাম খানিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তরু লতা পশুপক্ষী নরনারী সকলকে সমান আদরে জল দান করিতেছে। স্থানে স্থানে সেতু নির্ম্মাণকল্পে প্রোথিত স্তম্ভমূল প্রদক্ষিণ করিয়া, কোথাও মন্ত্রঃপূত চন্দনলিপ্ত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া, কোথাওবা পরিত্যক্ত আবর্জ্জনাপঙ্ক বিধৌত করিয়া সেই ক্ষীণধারা নীরবে চলিয়া যাইতেছে। আমার মনে হইল বাস্তবিক কবির কাব্যামৃত রসধারাও এমনি ভাবে সম্মানের পুষ্পোপহার ও অপযশের আবর্জ্জনা অবিচারিত ভাবে গ্রহণ করিয়া মানব হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া যায়। অদূরে সুবৃহৎ সরোবরে নানা জলচর পক্ষী তীরতরুচ্ছায়া শীতল সলিল মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নিমগ্ন হইয়া ক্রীড়াচ্ছলে স্নান করিতেছে। তাহাদের অস্ফুট কেলি কলরব ও পক্ষপুট প্রহার সমুত্থিত জলোচ্ছ্বাস শব্দ আমাদের রথনেমি নির্ঘোষের নৃত্যকরী তালে তালে সম্মিলিত হইয়া এক ভাষাবিহীন ভাবময় সমুদ্র সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছিল।

কতক্ষণ পরে আমাদের রথ খানি ধীরে ধীরে অজয়ের সেতুর উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিলাম এখনও ভক্তকবি জয়দেবের প্রেমাশ্রুরূপিণী শীর্ণ ধারা বিরহিনীর মত দিগন্তব্যাপী ধূলিশয্যা

বোলপুর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সঙ্গমে।
ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ঈশ্বরারাধনা করিতেছেন।

চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সেই সৈকত-প্লাবন সলিলরাশি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অনল্প পরিসর খাতচিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিলাম "ধন্য হে ভক্ত-কবির প্রিয় পারিষদ্! তুমি একদিন গীতগোবিন্দের ললিত পদাবলী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলে, আজ বুঝি "গীতাঞ্জলির" পুষ্প চন্দন গ্রহণ করিবার জন্য এই দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমার মুমূর্ষু প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছ। তবে আবার তোমার ক্ষীণ বক্ষঃ প্রেমের জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক;—আবার এই তপ্ত বালুকারাশি ডুবাইয়া দেও। যুগে যুগে এমনি করিয়া তুমি ভক্ত কবিগণের পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হও,—এমনি করিয়া তাঁহাদের প্রেমাশ্রুবিন্দু সংগ্রহ করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে দেবতার প্রসাদের মত বিতরণ করিয়া দেও।" মুহূর্ত্তের মধ্যে রথখানি অজয়কে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিল; কিন্তু সেই চিন্তার পারম্পর্য্য কিছুতেই ছিন্ন হইল না। আমার মনে হইল এখনও নিত্য নিদ্রাহীন ভিখারী ভগবান্ কাতর কণ্ঠে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় দ্বারে আসিয়া বলিতেছেন—"দেহি পদপল্লবমুদারম্"। আমরা সংসারাভিমানী ধনগর্ব্বিত গৃহস্থের মত সেই আহ্বানে কর্ণপাত করি না। তিনি সকলের কাছে ভিক্ষা করিতে আসিয়া বিফল মনোরথ হইয়া যাইতেছেন। এই সহস্র বৎসর ধরিয়া পুণ্যবান্ অজয় ক্ষুদ্র কেন্দুবিল্বকে কোলে লইয়া ভগবানের এই করুণ কণ্ঠের সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়াছে। আজ কেন্দুবিল্বের পার্শ্বে বোলপুরকে দেখিয়া মনে হয়, অজয়ের সাধনা নিস্ফল হয় নাই। ভানুসিংহের পদাবলীতে যে প্রেমের কৈশোর কোরক দেখিয়াছিলাম আজ গীতাঞ্জলীতে সেই প্রেমেরই প্রৌঢ়ে পরিণত পূর্ণ বিকশিত পুষ্পরাজি সজ্জিত হইয়াছে। আমার মনে হয় পুরুষোত্তমের সমুদ্র-তরঙ্গে যিনি গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই অতলস্পর্শ অতলান্তিকের তুষার শীতল বক্ষে দাঁড়াইয়া "গীতাঞ্জলির" রচিত অর্ঘ্য পাশ্চাত্য মনীষিমণ্ডলীর সম্মুখে ধরিয়াছিলেন।

অপরাহ্নের আরম্ভে আমরা বোলপুরে উপস্থিত হইলাম। পীতবসনধারী আশ্রম শিষ্যগণ সুমঙ্গল-ধ্বনি সহকারে আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন। যাত্রিগণের মধ্যে কেহ বলীবর্দ্দ বাহিত মনোরম শকটে, কেহবা বলবান্ অশ্বযুগ-যুক্ত যানে আরোহণ করিয়া আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সুকুমার শিষ্যগণ শিশু-সুলভ কোমল কণ্ঠে শান্তিনিকেতনের সরল সুন্দর সঙ্গীত গাহিতেছিল;—আর যাত্রিগণ ভক্তিপূরিত চিত্তে সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা- শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীর বন্দনা-গীতি গাহিতে গাহিতে বার বার "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করিতেছিলেন। কাহারও যত্ন প্রসাধিত কেশকলাপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, কাহারও যথাবিন্যস্ত সুচিক্কণ উত্তরীয় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে; কাহারও কুঞ্চিত বসনপ্রান্ত মর্দ্দিত কুসুমের মত শোভাহীন হইয়াছে। সোনার বাংলার ঘাটে মাঠে যে ধূলি নিত্য দরিদ্র কৃষককুলের পদাঘাতে উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত হয়, সেই ধূলিরাশি বিভূতির মত আমাদের অঙ্গে পরিলিপ্ত হইল। পথিমধ্যে পবনবিধূত গৈরিক রজঃ কুঙ্কুম তিলকের মত যাত্রিগণের ললাট দেশ চিহ্নিত করিয়া দিল, তখন মনে হইল এইবার আমরা যথার্থ ভাবে আশ্রম প্রবেশের উপযোগী বেশে সজ্জিত হইয়াছি। নগর সুলভ বহুমূল্য পরিচ্ছদের আর সেই নেত্র চাঞ্চল্যকর ঔজ্জ্বল্য নাই। কবির সেই পুরাতন সঙ্গীত মনে পড়িল,—

"তোমার এই ধূলামাটী অঙ্গে মাখি
ধন্য জীবন মানি"।

বিকশিত কাশকুসুমের শুভ্রচামর পথের দুই পার্শ্বে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছিল; যাত্রিগণ সকলেই সেই সুখ স্পর্শ ব্যজনে প্রফুল্ল হইলেন। কোথাও অবনত বৃক্ষ শাখা আমাদের শিরশ্চুম্বন করিয়া পল্লী জননীর আশীষ জ্ঞাপন করিতেছিল। অদূরে সরোবর তীরে তালতরু সকল এই যাত্রিদলের সম্বর্দ্ধনার জন্য সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে সুবিশাল শ্যামল প্রান্তর-থালায় কুঞ্জকুটীর সমাকুল আশ্রমখানি একখানি নৈবেদ্যের মত সজ্জিত রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাবলীর নাতি নিবিড় পত্রান্তরালে শুভ্র কুটির

প্রাচীরগুলি আকাশচ্যুত জ্যোৎস্না খণ্ডের মত দেখা যাইতেছিল। আমরা আশ্রমের প্রবেশ পথে উপনীত হইয়া দেখিলাম দুইপার্শ্বে কদলীবৃক্ষশ্রেণী রোপিত হইয়াছে। সম্মুখে মঙ্গল ঘট; তাহাতে আম্রপল্লব যবশীর্ষ ও পুষ্পমাল্য স্থাপিত রহিয়াছে। প্রত্যেক কদলী তরুমূলে পদ্মপত্রের উপর শঙ্খ, হরিদ্রা, অক্ষত, সুবর্ণ, প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য, ও ধূপ দান রক্ষিত হইয়াছিল। স্তম্ভীভূত কদলী বৃক্ষান্তরে বিলম্বিত পত্র পুষ্প-রচিত তোরণ স্রক্ সমূহ ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল। উৎসবক্ষেত্রের প্রবেশ-তোরণে আশ্রমের অন্তর্গত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ চন্দন ভাণ্ড লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন; তাঁহারা শীতল সুগন্ধি প্রলেপে আমাদের উত্তপ্ত ললাট সিক্ত করিয়া দিলেন। আম্র কাননের গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে বৃত্তাকৃতি মৃন্ময় বেদিকা, তদুপরি আস্তৃত দর্ভ ও পদ্মপত্রে আসন রচিত হইয়াছে, বেদির চারিপার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিচিত্র আলিপনা, হরিদ্রা তণ্ডুল কুঙ্কুম প্রভৃতি চূর্ণের নানাবিধবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। কি সুন্দর—ইহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বসুমতীর শ্যামল বক্ষঃ উদ্ভিন্ন করিয়া যেন শতদল কমল বিকশিত হইয়াছে। তাহার চারিপার্শ্বে অসংখ্য ধূপদান হইতে নিরন্তর সুগন্ধি ধূমরাজি উত্থিত হইয়া উৎসবক্ষেত্রকে আমোদিত করিয়াছে। বেদির সম্মুখে শ্বেত-মর্ম্মর প্রস্তর-পীঠে সভাপতির আসন রচিত হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে শত শত দর্শকমণ্ডলী আসন পরিগ্রহ করিয়া নীরবে অবস্থান করিতেছিলেন। উপরে অনন্ত আকাশ, নিম্নে শ্যামলা বসুন্ধরার বক্ষে আনন্দ উচ্ছ্বাস, মধ্যে বিশাল বায়ুমণ্ডল শঙ্খ নিনাদে মুখরিত! কি মহান্ দৃশ্য! দেখিলাম, এই যে আমাদের মা! মা এখনও তুমি আছ? যখন আমরা সকলেই উচ্ছিষ্ট পলান্নের প্রত্যাশায় শিশুর মত ধনবানের গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন তুমি এই নিভৃত কুটীরে তোমার স্নেহ পরিবেশিত শাকান্নের থালা সাজাইয়া বসিয়াছিলে, আমরা যখন তড়িদালোক বিভাসিত রাজপ্রাসাদের পানে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়াছিলাম, তখন তুমি এই বিশাল প্রান্তরে, আঁধার বন-প্রান্তে ক্ষুদ্র একটী মৃৎপ্রদীপ জ্বালাইয়া কত দীর্ঘ রজনী কাটাইয়া দিয়াছ। এখনো তোমার নিঃশ্বাস পবনে ধূপচন্দন-কুসুম-গন্ধ প্রবাহিত হয়, এখনো সহস্র বৎসরের পুরাতন সেই প্রণব-সম্বলিত সামসঙ্গীতের গম্ভীর ঝঙ্কার নীরব হয় নাই। এমনি করিয়া কত নদীর কূলে কূলে কত গিরির মূলে মূলে তুমি তোমার স্নেহাশ্রু-বিন্দু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ, কে জানে? মা, আছে সবই—কেবল বুঝি আমরা নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে তোমারি একটী সন্তান এই নির্জ্জন অরণ্য প্রদেশে পূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। কেউ তখন ইহার কথা জানিত না। আজ সেই মহাপুরুষ আর ইহ জগতে নাই, কিন্তু জানি না মা কি যাদুমন্ত্র বলে সমগ্র জগতের বিজয় বাদ্য এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর রচিত নৈবেদ্য আজ এইখানে উৎসর্গিত হইবার জন্য আসিতেছে। আজ তাঁহার স্বহস্তরোপিত আম্রকাননে বসিয়া তোমাকে চিনিতে পারিলাম।

উত্তর কালের নব নব চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে প্রাচীন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড এখন সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে। কালধর্ম্মের নিয়মে তাহা হওয়া যদিও স্বাভাবিক এবং সমাজরক্ষণে যদিও তাহা প্রয়োজন তথাপি আমরা সেই সঙ্গে যে একটা মহৎ নীতি হারাইয়াছি একথা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের সমস্ত বিদ্যা এখন কেবল মাত্র উদরান্ন সংস্থানের চেষ্টায় নিয়োজিত হয়, আর সেই বিদ্যায় যথার্থ রূপে আমাদের হৃদয়কে মনুষ্যত্বের আদর্শের দিকে উন্নত না করিয়া নরকের পথে টানিয়া লইয়া যায়। অর্জ্জিত সমস্ত বিদ্যাকে ধর্ম্মের অভিমুখীন করিতে না পারিলে আমাদের এই বর্ত্তমান হীনাবস্থা চিরদিন থাকিয়া যাইবে। যেদিন হইতে স্থপতিগণ দেবমন্দির ছাড়িয়া রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিয়াছে, ভাস্করগণ খেলার পুতুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বিজ্ঞান কেবল বিলাসের উপকরণ প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইয়াছে, সেই দিন হইতে আমরা অধঃপাতে যাইতেছি। এই শান্তি নিকেতনের বালকগণ উৎসব উপলক্ষে তাহাদের আশ্রমের পথ হইতে আর

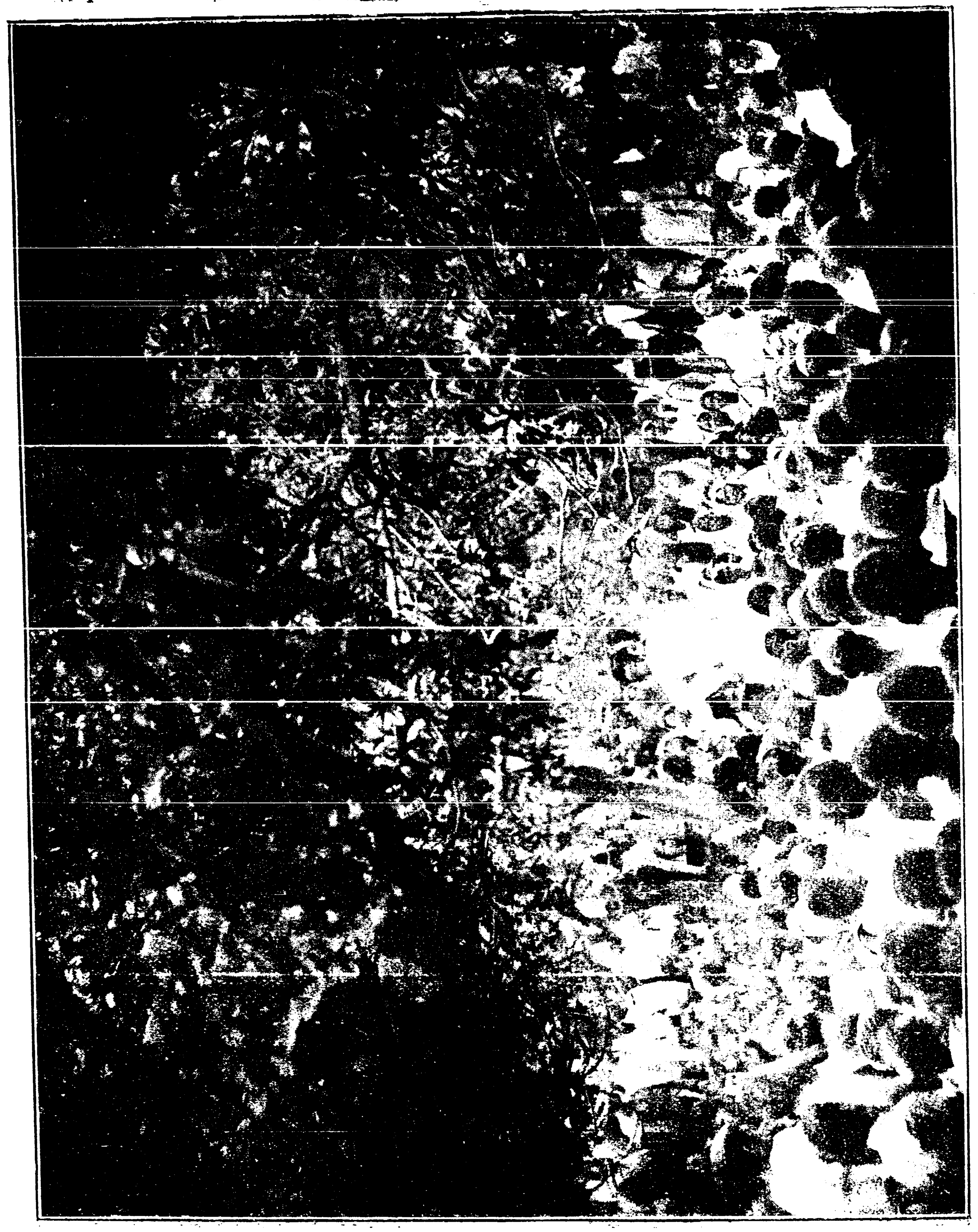

(১) বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু দণ্ডায়মান হইয়া কবিবরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"কবি! তুমি বিদেশ হইতে জয়মাল্য আহরণ করিয়া মাতৃভূমির চরণে অর্পণ করিয়াছ। আমরা চিরদিনই তোমার গুণমুগ্ধ তোমার প্রীতিতে বন্দী। আজ তোমার গান করিতে আসিয়াছে।"

করিয়া সমস্ত অভ্যর্থনাক্ষেত্রে ও তাহার চতুঃপার্শ্ব যেমন সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের চিত্র-শিল্প ও কলাবিদ্যার পরিণতি পবিত্র পথে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যায়।

আশ্রমের শিষ্যগণ মিলিত কণ্ঠে বেদ গান করিতে লাগিলেন। তারপর উৎসবের পুরোহিতগণ রবীন্দ্রনাথকে পট্টবস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া উৎসবক্ষেত্রে আনয়ন করতঃ মৃণ্ময় বেদির উপর উপবেশন করাইলেন। তাঁহার সম্মুখে সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র প্রস্তর-পীঠে আপনার আসন গ্রহণ করিলেন। দর্শকমণ্ডলী স্থিরভাবে উপবেশন করিলে পর বেদান্ত-রত্ন হীরেন্দ্রনাথ মৃদুগম্ভীর স্বরে অভিনন্দন-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে মাল্য-চন্দনে বিভূষিত করিয়া তাঁহাকে একটী লজ্জাবতী লতা উপহার প্রদান করিলেন। এই লজ্জাবতী লতা জগদীশচন্দ্রের বড় সাধের। জড়বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে যখন তিনি জীবন-তত্ত্ব নিরূপণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, তখন এই লজ্জাবতী লতাই তাঁহাকে অভীষ্ট পথে পরিচালিত করিয়া নিত্য-নূতন জ্ঞানে তাঁহার সংশয়াকুল হৃদয় আলোকিত করিয়া দিয়াছিল। তিনি তাঁহার অভিনব আবিষ্ক্রিয়ার বিষয় পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিবার সময় তথাকার পণ্ডিতগণকে বলিয়াছিলেন "আমি যে তত্ত্ব আপনাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলাম, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিগণ পূত-সলিলা জাহ্নবীর তীরে বসিয়া সেই জীবন মৃত্যুর জটিল রহস্য উদ্ভেদ করিয়া গিয়াছিলেন।" জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের দিক হইতে যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, আজ রবীন্দ্র নাথ কাব্যের দিক্ হইতে ঠিক সেই বাণী প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। আলোক রশ্মিপাতে, অথবা তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালনে, জগদীশচন্দ্র লজ্জাবতীর মনের কথা বুঝিয়া লইয়াছেন; আর রবীন্দ্র নাথ আপনার হৃদয় দিয়া লজ্জাবতীর অস্ফুট কথা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়বীণার তন্ত্রীগুলি এমনি সুরে বাঁধা যে বৃন্তচ্যুত পুষ্পের পতন শব্দেও সেই বীণা বাজিয়া উঠে। এইরূপে তিনি নির্ব্বাক্-প্রকৃতির জীবন কাহিনী পাঠ করিয়াছেন। জগতে কেথাও যাহা হয় নাই, আজ এই শান্তি নিকেতনে তাহাই দেখিলাম। ইউরোপের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলিয়াছিলেন,—

"There is a spirit in the woods"

কিন্তু সেখানে জড়বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণের কাছে সে কথা ছোট হইয়া গেল। আর এদেশে যুবক রবীন্দ্রনাথ একদিন গাহিয়াছিলেন—

"নলিনি মেল গো আঁখি
ঘুম এখনো ভাঙ্গিল নাকি।"

আজ জগদীশচন্দ্র লজ্জাবতী লতার উপহার প্রদান করিয়া রবীন্দ্রনাথের সেই সঙ্গীত সার্থক করিয়াছেন। কবি ও বৈজ্ঞানিক পরস্পর সাহায্য-প্রার্থী হইয়া একই পথে আসিয়া মিশিয়াছেন। ধন্য বঙ্গভূমি,—যেখানে এই মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র স্থাপিত হইল।

রবীন্দ্রনাথ সম্মানের সমস্ত উপহার স্পর্শ করিয়া বলিলেন "যিনি প্রসন্ন হলে অসম্মানের প্রত্যেক কাঁটাটী ফুল হয়ে ফোটে, প্রত্যেক পঙ্ক-প্রলেপ চন্দন পঙ্কে পরিণত হয় এবং সমস্ত কালিমা জ্যোতিষ্মান্ হ'য়ে ওঠে, তাঁরি কাছে আজ আমি এই প্রার্থনা জানাচ্ছি তিনি এই আকস্মিক সম্মানের প্রবল অভিঘাত থেকে তাঁর বাহু বেষ্টনের দ্বারা আমাকে নিভৃতে রক্ষা করুন।" তাঁহার এই প্রার্থনা কেমন সুন্দর সরল শিশুর মত। আমরা প্রলোভন লইয়া সংযমীর কাছে গিয়াছি, বিলাস লইয়া বৈরাগ্যের সমাদর করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সংসার সঙ্গে লইয়া তপোবনে বিচরণ করিতে আসিয়াছি, যদি তিনি আমাদের প্রদত্ত উপহার অন্তরে স্থান দেন, তবে তিনি অনেক নীচে নামিয়া পড়িবেন, তিনি যতদূর উচ্চে উঠিয়াছেন, সেই স্থান হইতে তাঁহার অধোগতি না হয় এই আমাদের প্রার্থনা। তাঁহার একচক্ষু উর্দ্ধে আর একচক্ষু নিম্ন-পানে বিস্ফারিত থাকুক; এক হস্ত উর্দ্ধে আর এক হস্ত নিম্নে প্রসারিত থাকুক। কবি যেমন বলিয়াছিলেন—

"True to the kindred points of Heaven and home"

উৎসব শেষে আমরা সকলে গৃহাভিমুখে চলিলাম, বিষণ্ণ হৃদয়ে নহে,—প্রফুল্ল অন্তঃকরণে। কারণ আমাদের শূন্যহৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দূরে দিক্ চক্রবালরেখায় অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রক্তরশ্মি বিলীন হইয়া যাইতেছিল,—সে কেমন সুন্দর! এমনি করিয়া আমাদের রবীন্দ্র তাঁহার বিচিত্র জীবনের ছায়াময় অপরাহ্নে পশ্চিম গগন প্রান্তে সুবর্ণ সিংহাসনে বসিয়া প্রতীচ্যজগতে অরুণ রাগ রঞ্জিত নব-প্রভাত আনয়ন করিয়াছেন। আ এদিকে পূর্ব্বদিক্ বধূর প্রশান্ত ললাটে বিমল চন্দ্র উদিত হইয়া সুস্নিগ্ধ কৌমুদী ধারা বর্ষণ করিতেছে, তালপুকুরের তীরে ধীরে ধীরে একটা নীরবতা ঘনাইয়া আসিতেছে। কৃষকের কুটীরে মৃৎপ্রদীপের মৃদু জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দেবমন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ কর তালের গম্ভীর নিনাদ, আমাদের রথচক্রের শব্দকে ছাপাইয়া অনন্ত আকাশ পথে উত্থিত হইতেছে। বুঝিলাম বিশ্বদেবতার আরতি আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী।

বাবরের জীবনী।

(পুনরাবৃত্তি)

এই সকল নিকট আত্মীয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাবর তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেনঃ—"হেরীতে উপস্থিত হইলে আমার পিতৃষ্বসা পায়েন্দা বেগম এবং আবু সৈয়দ মির্জ্জার কন্যাদ্বয় খাদিজা বেগম ও আপক বেগম আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। বহুদিন পরে এই সকল নিকট আত্মীয়াকে দেখিলাম সুতরাং আমাদের যে কি আনন্দ হইল তাহা বর্ণনাতীত; আমি প্রথমে আমার পিতৃষ্বসার পাদবন্দনা করিলাম, পরে খাদিজা ও আপক বেগমকে আলিঙ্গন করিলাম। পায়েন্দা বেগম সর্ব্বাগ্রে আমাকে নমাজ পড়িবার গৃহে লইয়া গেলেন এবং সেখানে পরিবারস্থ সকলে উপবিষ্ট হইলে শ্রদ্ধার সহিত কোরাণ পাঠ করা হইল। সেখান হইতে আমরা সকলে বাদিএজ্জমানের উদ্যান বাটীতে গমন করিলাম। ইনি আমাদের বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া পিতৃষ্বসা আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলেন এবং যে কয়েকদিন হেরীতে ছিলাম নমাজের পর প্রত্যহই অভিবাদন করার জন্য আমাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইত। পরিবারস্থ গুরুজনবর্গকে এইরূপ শ্রদ্ধার্পণ করার পদ্ধতি আমার নিকট বড় ভাল লাগিত এবং দৈনিক উপাসনার পর প্রথমে বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রণাম করিতে যাওয়া পারিবারিক হিসাবেও খুব সুন্দর বলিয়া মনে হয়। ইহাতে যেমন বংশের সকলের মধ্যে প্রীতি ও স্নেহের বন্ধন অটুট থাকে তেমনি অনেক পুরাতন সুখ দুঃখের স্মৃতি জাগ্রত হয়। দুপুরে সফেদ চামনে মোজাঃফরের বাড়ীতে খাইতাম এবং রাত্রিতে পিতৃষ্বসার গৃহে আহারাদি হইত; আহারান্তে আমরা সকলে তেরেব খানায় (আনন্দ আগার) সমবেত হইতাম এবং নানারূপ আমোদ প্রমোদে সময় কাটাইতাম। এ তেরেব খানার দেওয়ালে আবু সৈয়দ জীবনে সকল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন তাহারই চিত্র আঁকা ছিল; আমোদ প্রমোদের মধ্যে যখনই দেওয়ালের চিত্রের দিকে নজর পড়িত তখনই তাঁহার বীরত্ব মনে পড়িয়া এই সকল আমোদ প্রমোদের জন্য বোধ হইত।"

এইখানে বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে মদ্য পানের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি। কারণ সকলেই বোধ হয় জানেন যে বাবর উত্তরকালে অত্যন্ত পানাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই সুরারাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে বিশেষ মানসিক বলের সহিত এই পাপের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। কেমন করিয়া তিনি এই প্রলোভনের হস্তে পড়িয়াছিলেন তাহা বিশদরূপে তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। হেরীর বাদশাহী দরবার তদানীন্তন কালের সমৃদ্ধ জনপদসমূহের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মার্জ্জিত রুচি, সাহিত্য কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য কলাবিদ্যা ও নানারূপ চারুশিল্পের জন্য সমগ্র পারস্য দেশের মধ্যে হেরীর নাম বিখ্যাত ছিল। এখানকার সঙ্গীত, সাহিত্য এবং কলাবিদ্যা তদানীন্তন কালের লোকসমূহের নিকট যেমন আদর্শস্থানীয় ছিল তেমনি হেরীর দরবারের আদব কায়দা রীতিনীতি প্রভৃতি সকলেরই অনুকরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। বাবর তাঁহার আত্ম জীবনীতে লিখিয়াছেন "হেরীর দরবারে যাইবার পূর্ব্বে আমি জীবনে কখনও মদ্য স্পর্শ করি নাই। আমার পিতা ওমর শেখ মদ্যপায়ী ছিলেন, সুতরাং তাহার কুফল আমি বিলক্ষণ জানিতাম। * তাঁহার জীবদ্দশায়—আমার বাল্যকালে বহুবার তিনি আমাকে পেয়ালা ভরিয়া সাকি পান করিতে দিয়াছেন কিন্তু কখনও আমি তাহা স্পর্শ করি নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর সৌভাগ্য ক্রমে আমি মৌলনা কাজির ন্যায় অভিভাবক এবং কাশিম বেগ প্রভৃতির ন্যায় অকৃত্রিম বন্ধু পাইয়াছিলাম; তাঁহারা নিজেও যেমন ধার্ম্মিক, নীতিবান ও সচ্চরিত্র ছিলেন আমাকেও তেমনি দুর্নীতি হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখিতেন, তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি এতকাল আমাকে পাপ প্রলোভনের হস্ত হইতে দূরে রাখিয়াছিল; কিন্তু হায়, মৌলানা কাজির স্মৃতি এবং কাশিম বেগের বন্ধুত্ব কিছুই আমাকে এই পাপের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। হেরীর দরবারে আসিয়া দেখিলাম সকল মজলিসেই মদের ফোয়ারা ছুটিতেছে; নৃত্যগীত এবং নৈশ আমোদ প্রমোদের প্রধান অঙ্গই হইতেছে সিরাজের মদ; সভাসদেরা সকলেই আবেশে বিভোর হইয়া পিয়ালা ভরিয়া এই গরল পান করিতেছে এবং রজনীকে বিভীষিকাময়ী করিয়া তুলিতেছে। এই সকল দরবারে যাইয়া সুরাপান না করিলে ভদ্ররীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আমি যেদিন প্রথম দরবারে গেলাম সেদিন নৈশ ভোজনের পর মজলিসে দেখিলাম সুরার স্রোত চলিয়াছে; তেরেবখানার প্রধান অঙ্গই হইতেছে সুরা। আমি প্রধান অতিথি বলিয়া আমার জন্য একটী বৃহৎ সুবর্ণাধারে বহু মূল্যবান মদ্য আনা হইল এবং মজাঃফর নিজে আমার হাতে সুরাপাত্র উঠাইয়া দিয়া সৌজন্যতা দেখাইলেন। পাছে অসভ্যতা প্রকাশ পায় এইজন্য আমি সুরাপাত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম না; কিন্তু বহুদিনের সঙ্কল্পের বলে পান করিতেও প্রবৃত্তি হইল না। আমি কৌশল করিয়া বলিলাম যে আমাদিগের সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ বাদিএজ্জমান আমাকে সুরা দিয়াছিলেন কিন্তু আমি তাহা গ্রহণ করি নাই, আজ আপনাদিগের প্রদত্ত সুরা গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রতি অবমাননা করা হইবে। সুতরাং আগে তাঁহার সম্মান রক্ষা করিয়া শেষে আপনাদের সহিত আমোদ করিব। এই বলিয়া প্রথম দিন কাটিয়া গেল বটে কিন্তু সঙ্গদোষের এমনই প্রভাব যে তাহার কুহকে জীবনের সমুদয় সাধনা ও সঙ্কল্প স্রোতের তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল এবং আমি জন্মের মত এই রাক্ষসীর নিকট আত্মবিক্রয় করিলাম। হেরীতে আসিবার পূর্ব্বে সুরার আস্বাদ কি তাহা আমি জানিতাম না এবং সুরাপায়ীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতাম। আমার দরবারে কেহই সুরাপান করিতে পারিত না;

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ওমরশেখ যে কবুতর উড়াইতে গিয়া পাহাড় হইতে পড়িয়া মারা যান মদ্যপানই তাহার প্রধান কারণ।

এসম্বন্ধে আমার কঠোর আজ্ঞা প্রচারিত ছিল। যাহারা সুরাপান করিত তাহারা আপন আপন গৃহে দরজা বন্ধ করিয়া সঙ্গোপনে পান করিত এবং পাছে কেহ জানিতে পারে এই জন্য লোকালয়ে কখনও পান করিত না। রাজ্যের যিনি প্রধান, তিনি নীতিবান এবং সচ্চরিত্র হইলে অত্যন্ত-দুশ্চরিত্র লোককেও সাবধান ও সংযত হইতে হয়; কিন্তু যিনি নেতা ও কর্ত্তা তিনিই যদি পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেন তাহা হইলে অনুচর ও সভাসদগণ ভালমন্দ বিচার না করিয়াই তাঁহার অনুষ্ঠিত রীতিনীতির অনুসরণ করিবে। যতদিন আমি নিজে ভাল ছিলাম আমার দরবারেও ততদিন কোনও পাপ প্রবেশ করিতে পারে নাই; কিন্তু যখন আমারই পদস্খলন আরম্ভ হইল তখন আমি আর আমার দরবার গৃহের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিলাম না।" এইরূপে বাবর অতি সরলভাবে আপনার প্রথম পদস্খলনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাপের পথ এতই পিচ্ছিল যে, একবার এ পথে পা দিলে কোথায় যে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া নামায় তাহার ইয়ত্তা নাই। বাবর হেরীর সুসভ্য দরবারে যাইয়া যে ব্যাধির বীজ বপন করিলেন কালে তাহাই শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া তাঁহার সমগ্র জীবনকে এমন ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল যে তাহার কবল হইতে কিছুতেই আর তিনি উদ্ধার লাভ করিতে পারিলেন না।

ক্রমশঃ

শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া।

(ভগিনীর প্রতি ভ্রাতা।)

১

আজি শুভ দিনে বোন ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়
কি তিলক দিয়ে ভালে সাজাবে আমায়?
তোমাদের স্নেহ প্রীতি
পাইয়াছি নিতি নিতি
প্রতিদানে কি দিয়াছি বলা নাহি যায়;
তাই লজ্জা নম্র আজি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়।

২

কাপুরুষ দুরাশয়
মোরা তব ভ্রাতৃচয়,
তাই এ ভারতে দস্যু তস্করেরা হায়,
রমণীর অপমান করিবারে পায়।
তাই লয়ে এস বোন
ওই তব কৃষ্ণাঞ্জন
ওর টীকা দিয়া ভালে সাজাও আমায়
চেতাও ভ্রাতারে তব ধিক্কারে লজ্জায়।
তার পরে কোন দিন
যদি এ দুর্ব্বল ক্ষীণ
জাগি উঠে রক্ষিবারে ভাগিনী ও মায়,
যদি তার কোন দিন সাহস জুয়ায়;
সে দিন সে শুভ কালে
পবিত্র চন্দন ভালে
দিয়া অভ্যর্থনা করো তোমরা ভ্রাতায়
মনুষ্যত্ব যেই দিন দেখাবে ধরায়।

৩

আবার যেদিন তব
ভ্রাতা নিয়ে দীক্ষা নব
মাতৃ দৈন্য নাশ যজ্ঞে হ'য়ে মত্ত প্রায়
সরবস্ব সমর্পিবে মাতৃ-ভূমি পায়;
সে দিন এ পবিত্র হবি
দিও তার ভালে লেপি
সাজায়ো ভগিনী তারে ঋত্বিক সজ্জায়—
তোমরাও যজ্ঞ কার্য্যে হইও সহায়।

৪

সেই পুণ্য যজ্ঞাগারে
কত শত অত্যাচারে—
উপদ্রব নিপীড়ন সহস্র তথায়—
ক্লিষ্ট হ'বে ভ্রাতা তব কত যাতনায়;
কিন্তু সে ঋত্বিকপতি
দিয়ে যাতে পূর্ণাহুতি
যেদিন ফিরিবে ঘরে শ্রান্ত ক্লান্ত কায়,
নাশিয়া মায়ের দৈন্য বিধির কৃপায়;
সেদিন—সেদিন বোন,
এস তুমি সচন্দন
সাজায়ো সে মাতৃভক্তে ভ্রাতার সজ্জায়
ফোঁটা দিয়ে ভালে তার ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ায়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত

ঘরের কথা।

আজ আমাকে আপনাদের কাছে কিছু বল্‌বার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। অনুরোধ এড়ান বড় দায় বিশেষতঃ যাঁদের মান্য করি, যাঁরা অনুরোধ ছেড়ে আদেশ করলেই বেশী সঙ্গত হয় তাঁদের কথা কাটিয়ে দেবার মত সাহস আমার নেই। তাই নিজের অক্ষমতা জেনেও আমার সাধ্যে যা কুলোয় তেম্নি দুচার কথা বলবার চেষ্টা করব। ত্রুটি যদি কিছু ঘটে, আমার বক্তব্য, যদি তেমন সুন্দর ও পরিস্ফুট না হয় তাহলে সে অক্ষমতা আপনারা নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করবেন জানি; তবে যদি কথা বল্‌বার মোহে আমার হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞানের কিছু অভাব দেখেন তাহলে তাও সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে হবে।

মানুষের যাকিছু নিতান্ত নিকটে তাতেই নাকি আগে চোখ পড়ে তাই আমার প্রথমে ঘরের কথাই মনে এল। ঘর বল্‌তে কতখানি বোঝায়, আমাদের সুখ দুঃখের আশা ভরসার সুদিন দুর্দ্দিনের আশ্রয়। এইখানে বাপমায়ের কোলে, ভাই বোনের স্নেহ সম্ভোগে আমরা বেড়ে উঠি। যখন বাপের ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে যাই তখন ভালবাসা দিয়ে নিয়ে, সন্তান পালন করে, গুরুজনের অনুগত হয়ে সেবা করে তাঁদের অসময়ে অন্ধের যষ্ঠিস্বরূপ হয়ে দুঃখী কাঙ্গাল দাসদাসীদের স্নেহ মমতা করে, পৃথিবীতে একখানি সীমাগত স্বর্গ সৃষ্টি করতে পারি। এখানকার ঠাকুর ঘরে আমাদের জীবনের সব সুখ দুঃখের কথা দেবতার পায়ে নিবেদন করে শান্তি পাই। এই যে মানুষের ঘর বাড়ী এ যেমন তার জীবনের দুর্গ তেম্নি তার জীবনের দেব মন্দিরও বটে; একে কি সাধ্যমত আমাদের সুন্দর পবিত্র করতে ইচ্ছে করে না? আমাদের চির আশ্রয় এই বসত ঘর এর সম্পূর্ণ ভার কার উপরে, কে এ ঘরের ভিত্তি দৃঢ়, শিখর অভ্রভেদী, কেই বা এর চারিদিক লতাপাতায় শ্যামল, পাখীর গানে সুমধুর কুঞ্জ ভবন সৃজন করতে পারে? সে কি আমরা মেয়েরাই নই? আমাদের দেশের দেবতাদের মধ্যে অনেকেই মেয়ে। অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী শ্যামা মা এঁরাই তো দেশের সবভক্তি সব শ্রদ্ধা অধিকার করে আছেন—এহতেই বোঝাযায় দেশের লোকের নারী আদর্শ কত উঁচুতে ছিল। সুগৃহিনীকে আমরা বলে থাকি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা; ভাল মেয়ে বৌকে বলে থাকি মা আমার পূর্ণলক্ষ্মী, অনুপমা সুন্দরীর তুলনা দিতে হলে, বলি যেন মূর্ত্তিমতী সরস্বতী। এ আদর্শ বজায় রাখা আমাদের জীবনের সাধনা হওয়া আবশ্যক একটি ছোট্ট মেয়ের উপরে তিনকুলের গৌরব নির্ভর করে। বাপের ঘরে যে ভাল, শ্বশুর ঘরেও সে ভাল হবারি কথা। একা মেয়ের মহিমায় পিতৃমাতৃ শ্বশুরকুল যেমন উজ্জ্বল হয় তেমনি তাতে কলঙ্কের স্পর্শ হলে তিনকুল—আর কতযে পুরুষ তাকে গণনা করবে—অতল জলে ডুবে যায়। মেয়েটিকে যত্নে লালন-পালন করে আমরা যখন যোগ্য বরের হাতে সমর্পণ করে শ্বশুর ঘরে পাঠাই তখন চোখের জল মুছতে মুছতে আমরা উপদেশ দিয়ে থাকি এ ঘর ছেড়ে যে ঘরে যাচ্ছ তাতে তোমার অধিকার অক্ষুণ্ণ হ'ক। বৌটি যখন ঘরে আসেন তখন কি আনন্দ চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তা আর কাউকে অধিক করে বলে দিতে হবে না। সেই আনন্দের রেশ জীবনে চিরদিন জাগিয়ে রাখবার উপায় ছোট্ট মেয়েটির উপরে অধিক নির্ভর করে— তাই বলে সম্পূর্ণরূপে নয়। তার অভিভাবক স্থানীয় যাঁরা, তাঁদের শিক্ষা ও ব্যবহারের উপর অনেক পরিমাণে প্রসর লাভ করে। আমাদের দেশে সুবিশাল হিন্দু-সমাজে মেয়ের বিয়ে অল্প বয়সেই হয়, সচরাচর দশ হতে পনেরর মধ্যে এ কাজ সমাধা হয়ে থাকে। এসময়ে তাদের চরিত্র কত অপরিণত থাকে, তাদের মনের মত করে গড়ে নেওয়া কঠিন নয়। শৈশব শিক্ষাই সব জীবনের ভিত্তি—এটুকু গড়বার ভার বাপ মায়ের উপরে। সূচনা তাঁরাই করে দেবেন, অঙ্ক

সকলের ক্রমবিকাশ ও পরিসমাপ্তি শ্বশুরের ঘরেই হবে। মা যদি ভাল হন মেয়ের শিক্ষা যে ভাল হবেই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তে আমরা যা শিথি শত উপদেশেও আমাদের সে উপকার হয় না। আদর্শ খুঁজতে পৃথিবীময় ঘুরবার দরকার নেই আমাদের ভারববর্ষেই তা প্রচুর আছে। দেশের আদর্শে চল্‌লেই সবদিক বজায় থাকবে। আদর্শ বল্‌তে যা কিছু উন্নত নিঃস্বার্থ সুন্দর পবিত্র, তাই বোঝায়। আমাদের নারীজীবনের আদর্শ, সতী সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি। প্রত্যেক সাধারণ রমণীর জীবনে এমন ঘটনা ঘটেনা—আমরা সবাই কিছু তেমন হতেও পারিনে তবে সবচেয়ে ভালর উপর নজর রাখলেই তবেই কিনা কতক ভাল হতে পারি, তাই শ্রেষ্ঠতমের আদর্শই মনে পোষণ করতে হয়।

আমাদের দেশের নারীর আদর্শ কি? তাঁরা স্থির, ধীর, নম্র, সেবাপরায়ণ, নিঃস্বার্থ পতিপুত্র বৎসল, ধর্ম্মে অনুরক্ত এবং বিলাস বিহীন। রাজকন্যা হয়েও সাবিত্রী জীবনের ঐশ্বর্য্যের সমস্ত অভ্যাস ভুলে গিয়ে সন্তুষ্ট মনে অভাবের মধ্যে গুরুজন সেবা করেছিলেন। সীতা স্বামীর দুঃখ ভাগ করে নেবেন বলেই কুশকণ্টকে ক্ষত চরণ, ফলমূলাহার আর পর্ণ শয্যা বরণ করেছিলেন, দময়ন্তী, দ্রৌপদীকে কতই না লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল, তবুত একদিনের জন্যও কর্ত্তব্যে বিচলিত হননি। বাপের ঘরে যেমন মায়ে মেয়ে ও বৌয়ে ঘর চালান, শ্বশুর ঘরেও তেমনি শ্বাশুড়ী ননদ বৌএ ঘর করতে হয়। সবারি ধৈর্য্য চাই, স্নেহ চাই, ক্ষমা করবার সাধনা চাই। ছোট্ট মেয়েটি যে পরের ঘর হতে আসে, বাপ মায়ের স্নেহের আশ্রয় হতে দূরে অপরিচিত পরিবারে তাকে কত ভয়ে ভয়েই থাকতেই হয়—ত্রুটিত হবেই, তাকে শিখিয়ে নিতে হবে, শাসন করতে হবে, আবার তেমনি ভালও বাস্‌তে হবে। অসাধারণ মমতা না থাকৃলে শাসন অনধিকার চর্চ্চা। আমরা মেয়ে বৌএ অনেক তফাৎ করি বলেই আমাদের দেশে স্বামীর বোনের নাম ননন্দা অর্থাৎ যিনি কিছুতেই বৌএর উপর খুসী হন না—এটা যে হয় মায়ের দোষে, নিজের মেয়েটির প্রতি অত্যধিক পক্ষপাত করলে, তার দাবীও বেজার বেড়ে চলে—কাজেই ভাই বৌটি যখন তার অংশীদার হয়ে আসে, তখনই তার আর বিরক্তির শেষ থাকে না। মেয়ে সুবুদ্ধি না হলে প্রতিপদে বৌকে অপদস্থ করে নিজের প্রতিপত্তি বজায় রাখবার চেষ্টা করে। তাতে অগৌরবই যে বাড়ে, তা কজনই বা বোঝে? জোর করে কাড়া খোস-নাম অনেকদিন টেঁকে না, যে যথার্থ ভাল তার গুণ কিছুতেই ঢাকা পড়্‌বার নয়। তবে আমাদের দেশেই ঝিকে মেরে বৌকে শেখাবার রীতি আছে। বউ যদি বুদ্ধিমতী হন তিনিও সে ইঙ্গিত ঠিক বুঝে ত্রুটি সত্বর সংশোধন করে নিতে পারেন। শ্বাশুড়ী যেমন স্নেহ ও ধৈর্য্যশীলা, বউ তেমনি বাধ্য নম্র সেবাতৎপর, আর ননদ ঠাকুরাণীকেও সরল স্নেহে সব দিক বজায় করে চল্‌তে হবে। আগের মত বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার আমাদের এখন উঠে যাচ্ছে—আগে বহুদূর সম্পর্কীয় দরিদ্র আত্মীয় আশ্রয় পেয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতেন—এখন দেশ কালের গুণে জীবন যাত্রা বহুব্যয়-সাধ্য হওয়ায় তেমন একান্নবর্ত্তীতা আর সম্ভব নয় তবুও আপন বাপ ভাই বোনকে আশ্রয় দিতেই হয়। রোজগেরে স্বামীর স্ত্রী যদি অক্ষম দেওর ননদকে তাচ্ছীল্যের চক্ষে দেখেন তাহলেই ঘরে নানা অসন্তোষের কারণ ঘটে। সেকালের একালের সব কালের ভাল গৃহিণীদের প্রশংসা চিরকালই নিঃস্বার্থ পরতায়। আমার ছেলের রাবড়ি খাবার ব্যাঘাত ঘটবে বলে আমার দেওরের ছেলেকে দুমুঠো ক্ষুধার অন্ন দিয়ে কিম্বা তার স্কুলের বেতন দিয়ে খুঁতখুঁত করা তাতে কি আমার ছেলেরি ভাল হবে? মনটাকে চোর কুঠুরি না করে একটু উদার করতে হবে, সেখানে রোদ বাতাসের প্রবেশ অধিকার থাকলে কোনও বিষ বীজ বেঁচে থাকৃতে পারবে না।

এখন আমাদের বিলাস অভিলাষও খুব বেড়ে গেছে—আগে বিলাসীতা খুব ধনীকেই সাজত, কেনন বিলাসের উপকরণ তখন বড় দুর্ম্মূল্য ছিল। তখন এত নকলের আমদানী হয়নি—নকল বোম্বাই, নকল

আতর, নকল সোণারূপা, হীরা, ঝুটো জরি আর ঝুটো মুক্তো কিছুই ছিল না। গৃহস্থ ঘরের বউকে একখানি বারাণসী বালুচরী দু একখানি ঢাকাই কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকৃতে হত। আর সে সব জিনিষ এমন ছিল তিন পুরুযে পরা চল্‌ত, দাম দিয়ে কেনা সার্থক হত। এখনকার মত এমন বেহায়া হাওয়া শাড়ী, চটকদার দুদিনে সুতো ছিঁড়ে আসা বারাণসী জাপানী কিম্বা রকম বেরকমের ঢাকাই শান্তিপুরেরও এমন সস্তা আমদানী ছিল না। আগে যেখানে একখানায় চলত এখন সেখানে দশখানা চাই, অথচ কোন খানিই টেঁকসই নয়; কাজেই টাকার শ্রাদ্ধ হয়, অভাব অভাবই থাকে, নিত্য নূতনের তাড়নায় ভাল পাওয়া যায় না, সংগ্রহ যা কিছু সবই অকেজো। আমাদের ঝি বউরা যদি সে কথাটা বুঝে যথার্থ ভবিষ্যযুক্ত দামী দুএকখানি সত্যিকার সুন্দর শাড়ী নিয়ে সন্তুষ্ট হন তাহলে অনেক অভাব দূর হয়, ঘরেও টানাটানি পড়ে না, বাইরেও পসার বজায় থাকে। এই সব খেলো কাপড়ের প্রশ্রয় দেওয়ায় আমাদের দেশের চারু শিল্প নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেটাও মনে রাখা উচিত, এর প্রতিবিধান আমাদেরি হাতে। ঘরে টানাটানি পড়লেই রাজ্যের অশান্তি এসে সেখানে বাসা বাঁধে—হাওয়া শাড়ী যোগাতে গৃহস্থের হাওয়া খেয়ে থাকার যোগাড় হয়। মোটা ভাত কাপড়ে যদি ঘরে শ্রী সৌভাগ্য থাকে, তাহলেই কি জীবন অধিক সুখের হয় না? আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে লক্ষপতি যে নেই তা নয়, তবে তাদের সংখ্যা পরিমিত। আর যে বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসত তাই যখন আমাদের নেই, গোড়ায় গলদ, তখন টাকা আসে কোথা হতে? আর চাঁদ সদাগরের মত মুণি মুক্তাই পাওয়া যায় কোথায়? অধিকাংশেরি বহু পরিশ্রমের কষ্টলব্ধ গুটিকত টাকা, তারি মধ্যে সংসার চালাতে হয়, ছেলেকে লেখা পড়া শেখাতে, মেয়ের বিয়ের জন্যে সঞ্চয় করৃতে হয়। কাজেই এর মধ্যে খুবই হিসাব করে না চল্‌লে জীবন-যাত্রাই নির্ব্বাহ হয় না, বিলাস বিন্যাস হয় কোথা হতে? মানুষ জীবনে বড় একটা বিপদে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, তার প্রতিরোধ করবার জন্যে শক্তি আপনা হতেই আসে। সেগুলি কিনা দৈব যেমন মৃত্যু ইত্যাদি তার উপায় ভগবান নিজেই করেন। আর এই যে আমাদের নিজে হাতে রচা ছোটখাট উপদ্রব এ সহ্য করা বড়ই কঠিন। এর পেষণে স্বাভাবিক শক্তি হীন হয়ে আমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে, আমরা কর্ত্তব্য ভুলে স্বার্থপর হয়ে নিজের অপরের জীবন দুঃখময় করি। যাকে জন্ম দিলে আমাদের জীবন সংশয় ঘটে তাহতে দূরে থাকাই ভাল—নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থেকে তারি উপযোগী পথে যদি চলি তবে কোন গোলই থাকে না। আমরা মা মেয়ে স্ত্রী বউ আমরাই যদি আপনার লোকের কষ্ট না বুঝি তবে অপরে বুঝাবে কি? নাই হল য়িহুদী মাকড়ি আর মাদ্রাজি শাড়ী, বেগমবাহার আর অপরাজিতা। আমাদের স্বামী, পুত্র, শ্বশুর, ভাই, দেওর সুখে থাক, ঘরে শান্তি থাক তবেই কি আমাদের মন ভরা থাক্‌বে না?

আর একটি জিনিষে ঘরের শোভা শান্তি আনন্দ সব নষ্ট হয়ে যায়—ছোট কথাকে বড় করা, পরচর্চ্চার উৎসাহ এখানকার কথা সেখানে করা—এতে বড় অশুভ হয়। ঘর করতে হলেই ছোট ছোট কথায় বড় বড় ঝগড়া বেধে যেতে পারে। মানুষের মেজাজ কত কারণে যে খারাপ থাকে—অনেকদিন সহ্য কর্‌তে কর্‌তে একদিন অসহ্য হয়—এমন সময় যদি দুটো অপ্রিয় কথা হয়ই তাহলে সেটা ধরতে নেই—অনেকদিনের ধৈর্য্য মনে করে একদিনের অধৈর্য্য মাপ কর্‌তে হয়। ততদূর যদি নাও করতে পারা যায় তাহলে ছোটকে বাড়িয়ে বড় কোরনা, দশ জায়গায় ঢাক পিটিয়ে বেড়িও না, একটু শুধু চুপ করে থেকো। তাহলে ক্ষণিকের অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো জেগে উঠ্‌বে আর যথার্থ ভালবাসা যদি থাকে তাহলে মনান্তর কখনই হবে না। কিন্তু ছোট্ট একটি কথার জন্যে ভ্রান্তি কিম্বা ত্রুটির জন্যে ঘরে পরে যদি নিরন্তর গ্লানি উপস্থিত হয় তাহলে সীতার মত ধৈর্য্যময়ীরও পাতাল প্রবেশ অসম্ভব ব্যাপার নয়, রামায়ণ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এদেশে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হ'য়ে যাওয়ার

দরুণ লেখা পড়ার যে আরম্ভ হয়, তা' আর শেষ হয় না আরম্ভ হ'তে না হ'তেই বন্ধ হয়ে যায়। এতে কোনই কল্যাণসাধন হয় না, বিদ্যা অর্জ্জন কখনই অপকারের হ'তে পারে না—অল্প বিদ্যাই ভয়ঙ্করী ব'লে খ্যাত। তাই বিয়ের পরও মেয়েদের লেখাপঁড়া শেখাটা যাতে ভাল করে হয়, তার চেষ্টা করা উচিত, এ বিষয়ে মা ও শাশুড়ী দুজনেরি সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। শিক্ষা মানেই সাধনা—কিছু শিখতে হলেই আমাদের অধ্যবসায় যত্ন পরিশ্রম করতে হয়। এ সবগুলিই সংযম সংজাত প্রবৃত্তি দমনের ফলে তবে হয়। ভাল না লাগলেও করতে করতে ভালও লাগে, উপকার পরে পাওয়া যায়। সব শিক্ষার প্রথমটাই নীরস, ক্রমে তার মধ্যে প্রবেশ লাভ করলে মনও লাগে কাজও হয়। মেয়ে মাত্রেরই জীবনে মাতৃত্বের সম্ভাবনা আছে, এই সংযম শিক্ষা ভবিষ্যতের জীবনে অনেক সহায় হয়। মাকে কতই না সহ্য করতে হয়। শিক্ষিত মানে শুধু পুঁথি পড়া শিক্ষা নয় মনের শিক্ষা যাঁর হয়েছে, তিনি যেমন ধৈর্য্যের সঙ্গে সন্তান পালন করতে পারেন অপরে তা পারে না। ছেলের প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে হয়, তিনি যদি সম্পূর্ণ অজ্ঞ হন, ছেলের অসংখ্য প্রশ্ন, নিরন্তর কৌতূহলের কোনই গতি নিরূপণ করে না দিতে পারেন তাহলে কত সময়ের অপব্যয় হয়ে যায় কত সুখ হতেই মাও ছেলে উভয়ে বঞ্চিত হন। মা লেখা পড়া জানলে আমাদের টানাটানির সংসারে আর এক উপকার—কিছুকাল মাষ্টারের মাহিনাটা বেঁচে যায়। সুশিক্ষিত বাধ্য নম্র সংযত ছেলে মেয়ে যে ঘরের প্রধান শোভা তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। মহামণ্ডল বিবাহিত মেয়েদের শিক্ষাভার গ্রহণ করে দেশের এই মহদুপকার করেছেন, তাতে আমরা সকলে কৃতজ্ঞ। ঘরের সুখশান্তি বিধানের জন্য আর একটি জ্ঞান আমাদের অর্জ্জন করা উচিত, সেটি হচ্ছে সময়ের জ্ঞান। ইংরাজীতে যাকে বলে punctuality। আমাদের এখনকার মেয়েদের অনেক নিন্দার মধ্যে একটা শুনতে পাই, তাঁরা বড় মেম। মেমের ভাল গুণগুলি যদি নিতে পারি, তা হলেত লাভই হয়। খাঁটির আদর সর্ব্বত্র—আমরা যদি খাঁটি মেমের মত সময়ের মর্য্যাদা বুঝি, তাঁদের মত সুশৃঙ্খলায় পরিষ্কার স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মে ঘরকন্নার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে আমাদের লাভ বই অলাভ নেই। এখানে ধার করলে নকল বলে দোষ নেই।

ঘরকে বাসযোগ্য করতে হলে যেমন মাঝে মাঝে মেরামত করতে হয়, পূরোপূরি না পারলেও দাগরাজি করে চালাতে হয়—ঘরের সুখ শান্তি সৌন্দর্য্য স্থায়ী করতে হলেও আমাদের ধৈর্য্য, আমাদের স্নেহ, আমাদের সংযমে বলবিধান করে তাকে বাহিরের আক্রমণ আর গৃহশত্রুর ভেদবুদ্ধি হতে রক্ষা করতে হবে। একটু সহ্য করে, একটু ত্যাগ করে, একটু ভালবেসেই আমরা এ জীবনে অনেকটা করতে পারি, করেও থাকি, এই কথাই আমি এত কথায় বলবার চেষ্টা করলাম। *

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভ্রম সংশোধন।

কার্ত্তিক সংখ্যার সুপ্রভাতে "বঙ্গ সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক বলিয়া যাঁহার নাম ছাপা হইয়াছে, তিনি উহার লেখক নহেন।

কার্ত্তিকের সুপ্রভাতের ১৬৯ পৃষ্ঠা ৬ষ্ঠ লাইনে বাসরাই স্থানে ধামরাই হইবে।

* ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের অধিবেশনে পঠিত।

Presented to the A.P.
By Shiva Prashad Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { পৌষ, ১৩২০। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান। (১)

পেরিপ্লাস। (২)

১। ইরিথ্রিয়ান সাগরের (৩) উপকূলস্থ সকল নির্দ্ধারিত (ক) বন্দর সমূহ ও ইহার চতুর্দ্দিকস্থ

(১) আমরা ধারাবাহিকরূপে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানমূলক গ্রন্থগুলির অনুবাদ প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। বর্ত্তমানে আমরা "পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সি" (Peryplus of the Erythræan sea) নামক সুপ্রাচীন গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় উপযুক্ত পাদটীকা সহ প্রদান করিতেছি। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকারের নাম কেহই অবগত নহেন। তবে তিনি মিশরে বাস করিতেন এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। গ্রন্থকার এই পুস্তকের অনেক স্থানে তৎকালীন ভারতীয় বাণিজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তকখানি দুর্ম্মূল্য। কয়েকখানি ইংরাজী গ্রন্থাবলম্বনে এই অনুবাদ করা হইয়াছে। 'পেরিপ্লাস' এবং 'ইরিথ্রিয়ান' শব্দদ্বয়ের অর্থের জন্য ৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২) রোমকদিগের সময়ে বাণিজ্যের সুবিধা ও ভ্রমণকারীর সাহায্যার্থ যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইত, তাহাদিগকে পেরিপ্লাস নামে অভিহিত করা হইত। সেই সময়ে এই সকল বিষয়ক বহু পুস্তক প্রকাশিত হইত।

(৩) গ্রীক ও রোমানগণ ভারতীয় মহাসাগর ও লোহিত সাগর এবং পারস্যোপসাগরকে এই নামে অভিহিত করিতেন। ইরিথ্রা=লোহিত। আগাথারকাইডিস নামক প্রাচীন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, রাজা ইরিথ্রাসের নামানুসারেই এই সকল সমুদ্রকে 'ইরিথ্রিয়ান সাগর' বলা হইত। যে আখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"পুরাকালে পারস্য দেশে ইরিথ্রাস নামক এক পরাক্রান্ত ও ধনী পারসীক বাস করিতেন। তিনি সমুদ্র তীরে কতকগুলি দ্বীপের সন্নিকটে বাস করিতেন। এই সকল দ্বীপ তৎকালে জনশূন্য ছিল। শীতকালে তিনি পাসারগাদীতে নিজ ব্যয়ে গমনাগমন করিতেন। কোন সময়ে এক সিংহ-যূথ তাঁহার ঘোটকীগুলিকে আক্রমণ করাতে অনেকগুলি ঘোটকী হত হয় এবং অন্যগুলি অক্ষতাবস্থায় সমুদ্রের দিকে পলায়ন করে। সেই সময়ে প্রচণ্ড বাতাস বহিতেছিল এবং ঘোটকীগুলি ভীতা হইয়া জল মধ্যে পতিত হয় এবং সন্তরণে সমুদ্রমধ্যস্থ দ্বীপে পৌঁছে। একটী ঘোটকীর পুচ্ছাবলম্বনে একজন সাহসী পালকও দ্বীপে পৌঁছিতে সক্ষম হয়। ইরিথ্রাসও ক্ষুদ্র ভেলা সহযোগে দ্বীপে পৌঁছিয়া তাঁহার ঘোটকী ও পালককে দেখিতে পান। পরে এই দ্বীপে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং মহাদেশস্থ যে সকল ব্যক্তি প্রচলিত শাসন প্রণালীতে অসন্তুষ্ট ছিল, তাহাদের ঐ দ্বীপে লইয়া যান। ক্রমে ক্রমে সমুদ্রমধ্যস্থ সকল দ্বীপেই তাঁহার আনীত অধিবাসীবৃন্দ বাস করিতে থাকে। এই কারণেই তদ্দেশীয় সমুদ্র তাঁহার নামানুসারে ইরিথ্রিয়ান সাগর নামে অভিহিত হইয়াছে।

(ক) পূর্ব্বকালে কেবল কতকগুলি নির্দ্ধারিত বন্দরেই বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল এবং এই সকল বন্দরে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ শুল্ক সংগ্রহ করিতেন। টলেমীদিগের সময়ে লোহিত সাগরে এই প্রকার অনেকগুলি বন্দর ছিল।

ক্রয় বিক্রয় স্থান সকলের মধ্যে মিশরের অন্তর্গত মুশেল (১) বন্দরই সর্ব্ব প্রধান। এই স্থান হইতে সমুদ্র পথে অষ্টাদশ শত ষ্টাডিয়া (২) অগ্রসর হইলে দক্ষিণ দিকে বেরিনিস (৩) বন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েরই পোতাশ্রয় মিশরের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত এবং পোতাশ্রয়গুলি ইরিথ্রিয়ান সাগরেরই উপসাগর।

২। বেরিনিসের পরেই দক্ষিণ উপকূলে বার্ব্বারদিগের (৪) দেশ। উপকূল ভাগে অপ্রশস্ত উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত গুহায় (৫) মৎস্যভোজীরা বাস করে। আরও দেশাভ্যন্তরে বার্ব্বারগণ বাস করে এবং তাহাদের বন্য-মাংসভোজী ও গোবৎস-খাদক (৬) জাতিদ্বয় নিজ নিজ দলপতির শাসনাধীনে বাস করে। ইহাদের পশ্চাতে এবং আরও দেশাভ্যন্তরে পশ্চিম দিকে মিরো (৭) নগর অবস্থিত।

৩। বেরিনিস হইতে চারি সহস্র ষ্টাডিয়া সমুদ্র পথে অগ্রসর হইয়া গোবৎস-খাদকদিগের দেশের অধোভাগে টলেমিশথেরণ (৮) বলিয়া একটী ক্ষুদ্র হাট আছে, টলেমিদিগের সময়ে (৯) এই স্থান হইতেই শিকারীরা অন্তর্দ্দেশে গমন করিত। এই হাটেই অল্প পরিমাণে প্রকৃত স্থলজ-কচ্ছপ (১) পাওয়া যায়, ইহা শ্বেতবর্ণের এবং ইহাদের চাড়া ক্ষুদ্রাকার। আদুলিসের (২) ন্যায় এই স্থানে সামান্য পরিমাণে হস্তিদন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই স্থানে কোন পোতাশ্রয় নাই এবং ক্ষুদ্র নৌকা করিয়া এই স্থানে পৌছিতে হয়।

৪। টলেমিস থেরণের প্রায় তিন সহস্র ষ্টাডিয়া দূরে (৩) দক্ষিণাভিমুখিনী উপসাগরের প্রান্তে নিয়মানুযায়ী স্থাপিত (৪) একটী বন্দর আছে। উপসাগরেরই সম্মুখে এবং উহা হইতে প্রায় দুই শত ষ্টাডিয়া দূরে "পার্ব্বতীয় দ্বীপ" নামে (৫) একটী দ্বীপ আছে; মহাদেশ এই দ্বীপের উভয় দিকেরই নিকটবর্ত্তী। বন্দরাভিমুখী জাহাজগুলি আক্রমণের ভয়ে এই স্থানেই নঙ্গর করে। পূর্ব্বে তাহারা উপসাগরের অগ্রভাগস্থ ও উপকূলের সন্নিকটস্থ দায়দরশ নামক দ্বীপে নঙ্গর করিত; উপকূল হইতে পদব্রজেই এই স্থানেই উপস্থিত হওয়া যাইত এবং তজ্জন্য অসভ্য অধিবাসিগণ দ্বীপ আক্রমণ করিতে পারিত। "পার্ব্বতীয় দ্বীপের" বিপরীত দিকে উপকূল হইতে কুড়ি ষ্টাডিয়া দূরে, মহাদেশে আদুলিস নামে নাতিবৃহৎ গ্রাম আছে। এই স্থান হইতে তিন দিবসের দূরবর্ত্তী পথে কোলো (৬) নামক একটী নগর আছে। হস্তিদন্তের এই প্রথম ক্রয় বিক্রয় স্থান। এই স্থান হইতে অক্সুমাইট জাতির নগরে পৌছিতে পাঁচ দিবস আবশ্যক হয়। নীল নদের দূরবর্ত্তী প্রদেশের হস্তিদন্ত (৭) সিনিয়াম (৮) জিলার অভ্যন্তর দিয়া এই স্থানে আনীত হইয়া আদুলিতে প্রেরিত হয়। যদিও কদাচিত আদুলির নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের উপকূলে হস্তী ও গণ্ডার শীকার করা হয়, তথাপি কার্য্যতঃ এই সকল পশু দেশাভ্যন্তরেই হত হয়। এই ক্রয় বিক্রয় স্থানের সম্মুখস্থ উপসাগরে আলালি নামে (৯) অনেক ক্ষুদ্র বালুকা দ্বীপ রহিয়াছে; এই সকল দ্বীপে কচ্ছপের খোলা পাওয়া যায় এবং এই খোলা উল্লিখিত হাটে মৎস্য-খাদকগণ কর্ত্তৃক আনীত হয়।

৫। এই স্থান হইতে প্রায় আট শত ষ্টাডিয়া দূরে অন্য একটী সুগভীর উপসাগর আছে; ইহার প্রবেশ মুখের দক্ষিণ দিকে বৃহৎ বালুকা স্তূপ রহিয়াছে। ইহার নিম্নদেশে অপ্সিয়ান (১০) প্রস্তর পাওয়া যায়; ইহা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। গোবৎস-খাদকের দেশ হইতে বার্ব্বার দেশ পর্য্যন্ত স্থানগুলি জোসকালেস (১১) কর্ত্তৃক শাসিত হয়। ইনি অত্যন্ত কৃপণ এবং লোভী; কিন্তু অকপট ও গ্রীক সাহিত্যে পটু।

৬। এই সকল স্থানে নিম্নলিখিত পণ্যের আমদানী হয়ঃ—

(১) মুসেল বন্দর বা মায়সহর্ম্মস বর্ত্তমানে রস আবু সোমর বন্দর নামে অভিহিত হয়। ২৭৪ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে মিশরাধিপতি টলেমি ফিলাডেলফাস কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হয়। যাহাতে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য অবাধে চলিতে পারে, তজ্জন্যই তিনি এই বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। বাণিজ্য পোতগুলি জুলাই মাসে মালাবার উপকূল বা সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিত। যদি ১লা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে তাহারা লোহিত সাগর অতিক্রম করিতে সক্ষম হইত, তবে তাহারা সহজেই ভারতীয় সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিত। আগাথারকাইডিস ইহাকে 'আফ্রোডাইটীস হর্ম্মস' এবং প্লিনি 'ভেনেরিস পোর্টাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন, "বর্ত্তমানে কপ্টস এবং মায়স হর্ম্মসেই অধিক সংখ্যক বণিক্ সমাগত হয় এবং এই দুইটী বন্দরই সুবিখ্যাত।"

আলেক্জান্দারের পরবর্ত্তী টলেমিগণের অধীনে মিশর তাহার পূর্ব্ব গৌরব পুনর্ব্বার লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় টলেমির সময়ে নীল ও লোহিত সাগরের মধ্যস্থিত খাল সুসংস্কৃত করা হয়। অনেকগুলি রাজপথ নির্ম্মাণ এবং সঙ্গে সঙ্গে বণিক্গণের ভ্রমণ সৌকর্য্যার্থে কূপ খনন ও ধর্ম্মশালা স্থাপন করেন। অনেকগুলি বন্দরও প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) তিন প্রকার ষ্টাডিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক প্রকার বর্ত্তমানে ৬৫০ ফিট, অন্য প্রকার ৬০০ ফিট এবং তৃতীয় প্রকার ৫২০ ফিট। পেরিপ্লাসে উল্লিখিত ষ্টাডিয়াম এই শেষোক্ত প্রকারের ছিল। ভৌগোলিক ইরাটসথিনিসও এই প্রকার ষ্টাডিয়ামের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ পেরিপ্লাসের ১০ ষ্টাডিয়া ইংরাজী এক মাইলের সমান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অবশ্য পেরিপ্লাসে উল্লিখিত স্থানের দূরত্ব একেবারে সঠিক নহে।

(৩) বেরিনিস বন্দর টলেমি ফিলাডেলফাস কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার মাতৃদেবীর নামানুসারে ইহার ঐরূপ নামকরণ হয়। বর্ত্তমানেও এই বন্দরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কপ্টস হইতে ইহা ২৫৮ মাইল দূরে ছিল। যে সময়ে পেরিপ্লাস লিখিত হয়, সে সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলের সহিত বাণিজ্যের জন্য বেরিনিসই সুপ্রশস্ত ছিল। পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার সম্ভবতঃ বেরিনিসেই বাস করিতেন।

(৪) বার্ব্বারদিগের দেশ—ম্যাক্রিণ্ডল এই প্রদেশকে বার্ব্বারিয়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু অন্যতম অনুবাদক সফ্ ইহাকে বার্ব্বারদিগের দেশ বলিয়াছেন। শেষোক্ত টীকাকার পাদটীকায় বলিয়াছেন যে, এ স্থলে গ্রন্থকার অসভ্যদিগের দেশ বলেন নাই। কেহ কেহ ইহাকে বর্ত্তমান আবু ফতিমার নিকটবর্ত্তী জনপদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৫) কেহ কেহ কুটীর বলিয়াছেন।

(৬) মৎস্যভোজী—আরিয়ানও মৎস্যভোজীর (ইফথিওফাগির) কথা উল্লেখ করিয়াছেন। গোবৎস-খাদক (calf eaters) সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, প্রকৃত পক্ষে ইহারা গোবৎস-খাদক ছিল না, কিন্তু ইহারা গোবৎসের ন্যায় হরিৎ তৃণ আহার করিত বলিয়াই ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

(৭) নিউবিয়ান রাজ্যের শেষ রাজধানী। ৫৬০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে ইহা বেগ্রাউইয়া নামে খ্যাত। ম্যাক্রিণ্ডল "is situated the metropolis called Meroe" অর্থাৎ 'মিরো নামক রাজধানী অবস্থিত' বলিয়াছেন।

(৮) বর্ত্তমানে ইহাকে এরি দ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। প্লিনি ইহাকে টলেমিস এপিথেরাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহা একটী সামান্য গ্রাম ছিল। টলেমি ফিলাডেলফস ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া হস্তী ক্রয় বিক্রয়ের স্থান নির্দ্দেশ করেন। ইতঃপূর্ব্বে মিশরবাসিগণ এসিয়া হইতে হস্তী আমদানী করিত; কিন্তু এই সময় হইতে ইথিওপিয়া হইতে হস্তী আনয়নের সুবিধা হয়।

(৯) আলেক্জান্দারের অন্যতম সেনাপতি প্রথম টলেমি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ৩২৩ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে ইনি সিংহাসনারোহণ করেন। এই সময় ক্রমান্বয়ে ত্রয়োদশ জন টলেমি রাজত্ব করেন। ত্রয়োদশ টলেমি ৪৩ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধা ক্লিওপেট্রা কর্ত্তৃক হত হইলে ক্লিওপেট্রা ৪৩ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে মিশরের সিংহাসনারূঢ়া হন এবং ৩০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে অগষ্টসের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে এই বংশ লোপ পায়।

(১) সফ "true land-tortcise" বলিয়াছেন এবং ম্যাক্রিণ্ডল "true (or marine) tortoise-shell" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

(২) আদুলিস বা আদুলি। টলেমি ইহাকে আদোলিস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেম। বর্ত্তমান ঝুলা গ্রামকেই অনেকে প্রাচীন আদুলিস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমানেও এই গ্রামে অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। টলেমি ফিলাডেলফস এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তৎকালে আদুলিস বিশেষ প্রসিদ্ধিও লাভ করিয়াছিল।

(৩) পেরিপ্লাসের গ্রন্থকারের বর্ণিত দূরত্ব অত্যধিক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

(৪) ১ (ক) পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৫) এই দ্বীপ ওরিইন নামে অভিহিত হইত।

(৬) বর্ত্তমান কোহেটে নগরের নিকটে প্রাচীন কোলো বন্দরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ টলেমি ফিলাডেলফসকর্ত্তৃক উপনিবেশ এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং আদুলিস এই উপনিবেশের বন্দররূপে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণেও প্রচুর পরিমাণে ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

(৭) খ্রীষ্টের জন্মের ২৬০০ পূর্ব্বে মিশর দেশীয় ইতিহাসে হস্তিদন্তের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৮) বর্ত্তমান সেনার—পূর্ব্ব সুদান।

(৯) অধুনা এই দ্বীপপুঞ্জ ডাহালাক নামে অভিহিত হয়।

(১০) প্লিনিও এই প্রস্তরের কথা উল্লেখ করিয়া ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

(১১) কর্ণেল ইউল এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত লোহিত সাগরের উপকূলস্থ জনপদসমূহ আবিসিনিয়ানদের অধীন ছিল।

জোসকালেসকে কেহ কেহ আবিসিনিয়ার অধিপতি জা হাকেল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সম্ভবতঃ ইনি ৭৬—৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন।

বার্ব্বারদিগের ব্যবহারের জন্য মিশরে প্রস্তুত অসংস্কৃত চর্ম্ম।

আর্সিনোতে (১) উৎপাদিত পরিচ্ছদ।

বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত নিকৃষ্ট অঙ্গাবরণ।

ঝালর দেওয়া বস্ত্রের অঙ্গাচ্ছাদন।

স্ফটিক (২) নির্ম্মিত নানা দ্রব্য।

ডাইয়সপোলিসে (৩) উৎপাদিত মারহাইন (৪) নামক স্বচ্ছ প্রস্তর নির্ম্মিত নানা দ্রব্য।

অলঙ্কার ও মুদ্রার জন্য ব্যবহার্য্য পিত্তল।

পাকশালায় ব্যবহার্য তৈজসপত্রাদি ও স্ত্রীলোকের বলয় ও মলের জন্য তাম্রের (৫) কোমল আস্তরণ।

হস্তী ও অন্যান্য বন্য পশুর বিরুদ্ধে ব্যবহার্য বর্শা এবং যুদ্ধাস্ত্রের আবশ্যক লৌহ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠার।

তরবারী এবং বাইস।

তাম্রনির্ম্মিত গোলাকার বৃহৎ পানপাত্র।

ক্রয় বিক্রয়ের জন্য অল্প পরিমাণ মুদ্রা।

লাওডিকিয়া এবং ইতালির প্রস্তুত মদ্য (স্বল্প পরিমাণে।)

জলপাই তৈল (স্বল্প পরিমাণে।)

রাজার ব্যবহার্য্য তদ্দেশীয় প্রণালীতে প্রস্তুত স্বর্ণ এবং রৌপ্যপাত্র।

সৈন্যগণের অঙ্গাবরণ।

পশুচর্ম্ম নির্ম্মিত সূক্ষ্ম অঙ্গাবরণ।

এই সমুদ্রের অপর পার্শ্বস্থিত আরিকা জিলা হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি আমদানী হয় :—

ভারতীয় লৌহ।

ভারতীয় ইস্পাত।

কার্পাস নির্ম্মিত ভারতীয় বস্ত্র। (৬)

মলোকিন (৭) এবং সাগমাটোসীন নামক বনাত।

কোমরবন্ধ।

চর্ম্ম ও নানা বর্ণের বস্ত্র।

মসলীন।

চিত্রিত লাক্ষা।

এই স্থান হইতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি রপ্তানী হয় :—

হস্তিদন্ত।

কচ্ছপের খোল।

গণ্ডারের শৃঙ্গ।

সাধারণতঃ অধিকাংশ পণ্যই মিশর হইতে জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আনীত হয়। তবে সেপ্টেম্বর মাসেই তাহারা সমুদ্র পথে অগ্রসর হয়।

৭। এই স্থান হইতে আরব্যোপসাগর পূর্ব্বাভিমুখীন্ হইয়াছে এবং আভালাইটীস (৮) উপসাগরের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই উপকুল হইয়া পূর্ব্বদিকে ৪০০০ (৯) ষ্টাডিয়া অগ্রসর

(১) বর্ত্তমান সুয়েজ। টলেমি ফিলাডেলফসের প্রিয়তমা পত্নীর নামানুসারে ইহা আরসিনো নামে অভিহিতা হইত। এককালে ইহা বাণিজ্য প্রধান স্থান ছিল। তৎপরে বহুকাল ধরিয়া এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্রাদি আমদানী হইত।

(২) প্লিনি বলিয়াছেন যে, ফিনিসিয়ায় প্রথমে কাচ নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীনকালেও কাচ প্রস্তুত হইত এবং প্লিনি বলিয়াছেন যে, "ভারতীয় কাচই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করা হয়।" (প্রাচীন ভারত, প্রথম খণ্ড ১২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) কেহ কেহ ডাইয়সপোলিসকে বর্ত্তমান কর্ণাক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কোন সময়ে কর্ণাক মিশর রাজ্যের রাজধানী ছিল। টলেমি এবং রোমানদিগের সময়ে ডাইয়সপোলিস নামেই খ্যাত ছিল। ষ্ট্রাবোও এক ডাইয়সপোলিসের নামোল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ডাইয়সপোলিস ও এই ডাইয়সপোলিস বিভিন্ন।

(৪) সম্ভবতঃ চিত্রিত কাচ।

(৫) সফ 'পিত্তল' ও ম্যাক্রিণ্ডল 'তাম্র' বলিয়াছেন।

(৬) সকল প্রাচীন গ্রন্থকারই ভারতীয় কার্পাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

(৭) এই বস্ত্রের সম্বন্ধে কেহই সঠিক নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

(৮) বর্ত্তমান ঝীলা—বাবেলমণ্ডেব প্রণালী হইতে ৭৯ মাইল। প্রাচীন আভালাইট নামের সহিত বর্ত্তমান আবালিট গ্রামের সাদৃশ্য দেখা যায়। ইবন বটুটার ভ্রমণে ঝীলার উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যান্য পর্য্যটকও ঝীলার উল্লেখ করিয়াছেন।

(৯) গ্রন্থকারের মতে এই স্থান হইতে উপসাগর পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছে, কিন্তু যে দূরত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা অতিরঞ্জিত বোধ হয়। ষ্ট্রাবো, প্লিনি, টলেমি এই ভূভাগে আর্শিনো, বেরিনিস প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

হইলে বারবারিয়া প্রদেশীয় অন্যান্য পণ্যস্থান দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এই সকল পণ্যস্থান "দূরবর্ত্তী বন্দর" (১) নামে কথিত হয়। ইহা একটীর পরে আর একটী অবস্থিত, ইহাদের বন্দর নাই, তবে যে সকল পোতাশ্রয় আছে, উহাতে সময়ে সময়ে জাহাজগুলি নঙ্গর করিয়া আশ্রয় লাভ করিতে পারে। প্রথমটী আভালা নামে কথিত হয়; এই স্থান হইতে প্রণালী হইয়া আরবের প্রান্ত সীমা পৌঁছান সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য পথ। এই স্থানে আভালাইটীস নামে একটী ক্ষুদ্র ক্রয় বিক্রয় স্থান আছে; ইহা কেবল নৌকা ও ভেলা দ্বারা পৌঁছান যায়। নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি এই স্থানে আমদানী হয়। যথা :—

নানাপ্রকারের স্ফটিক।

দায়সপোলিসের টক আঙ্গুরের নির্য্যাস।

বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্র।

শস্য।

মদ্য। (২)

সামান্য পরিমাণে টীন। (৩)

রপ্তানীর দ্রব্যগুলি বার্ব্বারগণ কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র ভেলায় করিয়া অন্য উপকূলস্থ ওকিলিস এবং মৌজায় লইয়া যাওয়া হয়। সে গুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সুগন্ধি মসলা।

স্বল্প পরিমাণে হস্তিদন্ত।

কূর্ম্মের খোল।

সামান্য পরিমাণে উৎকৃষ্ট গন্ধরস।

যে সকল বার্ব্বারগণ এই স্থানে বাস করে, তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত।

ক্রমশঃ।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

প্রাণের মুক্তি।

প্রাণ যার চলে—
লজ্জা তাহারে যত দেয় বাধা
ভীতি, সংশয়, যত আসে ধাঁধা
কিছুতে নাহি সে টলে।
বীজ হতে কুঁড়ি—
কঠিন মাটিতে শিকড় গাড়িয়ে
উপরের চাপা মাটিরে ছাড়িয়ে
আকাশে গড়িল গুঁড়ি।
শিলা বুকে নদী
নম্র হৃদয়ে উচ্ছ্বলি চলে
মধুর ভাষণে কত কথা বলে
বাধা ঠেলি নিরবধি।

মৃদু চন্দ্রালোক—
সকল ধরারে হাসায়ে হাসায়ে
সকল প্রাণীরে সুখেতে ভাসায়ে
মুছি দেয় তাপশোক।
মৃদু হাসি' ফুল
লজ্জার ভরে, পল্লব ঘরে
শিশির আঘাত লাগিলে যে মরে
বাসে তার প্রাণাকুল।
বায়ূ ঘুরে ফিরে
বাধার জীবন নিয়ত বহিছে
ফুল মধু কথা অলিরে কহিছে
চলিছে জগত ঘিরে।

শ্রীকালিদাস বসু।

(১) ম্যাক্রিণ্ডল "opposite point" এবং সফ "farside coast" বলিয়াছেন।

(২) পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, আরব দেশ হইতে মদ্য ভারতবর্ষে রপ্তানী হইত। (৩৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(৩) পেরিপ্লাসের গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মিশর হইতে সোমালি ও ভারতবর্ষে টীন রপ্তানী হইত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ লাসেন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতেই টীন রপ্তানী হইত। কিন্তু সফ ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাহা স্বীকার করেন না।

দিব্যদেবী।

সরোজসুন্দর এবং সরোজিনী দুই ভাই ভগিনী। তাহারা পিতামহের নিকট চিতোরের পদ্মিনী দেবীর কথা শুনিতেছিল। তাহারা এই কথা শুনিয়া বড় প্রীত হইল। আলাউদ্দীনের অন্যায় ও অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া তাহারা বড় বিচলিত হইল। সরোজসুন্দর আলাউদ্দীনের উপর বড়ই রাগ করিল,—সেই বহু দিনের পুরাতন সম্রাট্‌কে সম্বোধন করিয়া অনেক ভৎর্সনা করিল। তাহার পর রাজপুত বীরদিগের সাহস এবং বীরত্বের কথা এবং পদ্মিনী দেবীর অলৌকিক পতিপরায়ণতার পরিচয় শুনিয়া তাহারা দুইজনেই আনন্দ, বিস্ময় ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল,—দুইজনেই কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার পরদিন দুই ভাই ভগিনী আবার পিতামহকে গল্প শুনাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। সরোজ বলিল, "দাদা মহাশয়, আলাউদ্দীনের মত লোভী, অত্যাচারী এবং পাপাত্মা কখনও জন্মে নাই,—" আর সরোজিনী বলিল, "পদ্মিনীর মত মেয়ে আমাদের দেশে ভিন্ন অন্য কোথায়ও জন্মে না।" দাদা মহাশয় দেখিলেন যে, বালক বালিকাদের হৃদয়ে কোন ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইতে দেওয়া অন্যায়। তাই বলিলেন, "সকল দেশে, সকল কালেই পাপী ও পুণ্যাত্মা নরনারীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আজ তোমাদিগকে একটী গল্প শুনাইব, যাহাতে তোমরা দেখিবে, অন্য দেশেও পদ্মিনীর মত ভাল মেয়ে পাওয়া যায়,—আর আলাউদ্দীনের অপেক্ষাও অধিকতর পাপী লোক সংসারে অনেক আছে।" দাদা মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া উভয়ে তাঁহার নিকটে ধীরভাবে বসিল, বৃদ্ধ গল্প আরম্ভ করিলেন।

এখন এসিয়া মহাদেশের যে অংশকে এসিয়া মাইনর কহে এবং এখন যে সকল প্রদেশ তুরস্কের সুলতানের শাসনাধীনে রহিয়াছে,—অতি প্রাচীনকালে ঐ সকল প্রদেশ ধনধান্যে, সভ্যতায় এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জগৎপ্রসিদ্ধ ছিল। তখন ইংলণ্ড, ফ্রান্স অথবা জার্ম্মাণীর নামও কেহ শুনে নাই,—য়ুরোপ তখন অসভ্য জাতির বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল,—আর আমাদের এই মাতৃভূমি ভারত ও আমাদের প্রতিবেশী পারস্য, মিডিয়া, আসিরীয়া প্রভৃতি দেশ অত্যুন্নত সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ছিল। এই সভ্যতার আলোকই ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া একদিকে আফ্রিকায় মিসর প্রদেশ ও অন্য দিকে য়ুরোপে গ্রীস দেশকে আলোকিত করিয়াছিল। সেকালে এসিয়া মাইনর প্রদেশে কত সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য এবং জনবহুল ও ধনপূর্ণ নগর বিগুমান ছিল, তাহা এখন মনে করিলে আরব্যোপন্যাসের কল্পিত গল্প বলিয়া মনে হয়। আমাদের তবু ত অযোধ্যা ও মথুরা আছে,—কিন্তু কোথায় সে ব্যাবিলন, কোথায় নিনেভ,—কোথায় টায়ার,—কোথায় ট্রয়? হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু প্রমুখ অসুরদিগের স্থাপিত এই সকল মহারাজ্য এবং মহানগরীর নামমাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান। কথায় কথা বাড়িয়া যায়, তোমরা বড় হইলে,—এই সব দেশের ইতিহাস, তাহাদের সভ্যতার বিবরণ, লক্ষ লক্ষ নরনারীপূর্ণ মহানগর, গগনস্পর্শী উচ্চ সৌধাবলী,—মহানদীতুল্য কৃত্রিম সরিৎ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া কতই বিস্মিত হইবে। এখন সে সকল কথা থাকুক।

এই এসিয়া মাইনর প্রদেশে, ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে প্রবল পরাক্রান্ত ফিনিসীয় জাতির সাম্রাজ্য ছিল। টায়ার নগরে উহাদের রাজধানী ছিল। প্রাচীনকালে বহির্বাণিজ্যে এবং সমুদ্রযাত্রায় ফিনিসীয় জাতি সর্ব্ব প্রধান ছিল এবং তজ্জন্য সেকালে ইহাদের মত ধনবান পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় ছিল না। টায়ার নগর পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান নগর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

শ্রীমান্ পদ্মসিংহ এই ফিনিসীয় রাজ্যের রাজা ছিলেন এবং টায়ার নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।

শ্রীমতী দিব্য দেবী এই পদ্মসিংহের ভগিনী ছিলেন। দিব্য দেবীর রূপ ও গুণের সুখ্যাতি শুনিয়া পৃথিবীর অনেক রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যথাকালে মহা আড়ম্বরে স্বয়ম্বর সভার অধিবেশন হইল এবং নিকট ও বহুদূর হইতে অনেক রাজা ও ধনী লোক নিমন্ত্রিত হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। দিব্য দেবী কিন্তু সমাগত সকল নৃপতিকে উপেক্ষা করিয়া অতুল রূপবান, সাহসী ও ধনীশ্রেষ্ঠ কুমার শ্রীসিংহের গলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন। কুমার শ্রীসিংহ পদ্মসিংহের জ্ঞাতি ভ্রাতা এবং টায়ার নগরের অধিবাসী। সকলে বলিত যে শ্রীসিংহের মত ধন নাকি আর পৃথিবীতে কাহারও ছিল না! দিব্য দেবী শ্রীসিংহকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

তোমরা জেরা করিতে পার, জ্ঞাতি ভ্রাতার সহিত দিব্য দেবীর বিবাহ হইল কিরূপে? কিন্তু অসুর জাতির মধ্যে এই প্রথা খুব প্রচলিত ছিল;—জ্ঞাতি ভ্রাতা শুধু নহে,—সহোদর ভ্রাতার সহিত ভগিনীর বিবাহও অসুরদিগের সমাজে খুব চলিত। ঐ সকল জাতির বংশধরগণ বহুকাল পরে খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের প্রভাবে সহোদর সহোদরার বিবাহরূপ ঘৃণিত প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও উহাদের মধ্যে খুড়তুত, জাটতুত, মামাত, পিসতুত প্রভৃতি ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ হইতেছে। য়ুরোপীয় সমাজে সর্ব্বত্রই এই প্রথা চলিতেছে। এই দেখ না কেন,—আমাদের সম্রাটের ভাগিনেয়ী ডচেস্ অফ ফাইফের সহিত সম্রাটের খুল্লতাত পুত্র প্রিন্স আর্থর কনটের সেদিন শুভ বিবাহ হইয়া গেল। এ ক্ষেত্রে মামার সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহ হইল। তোমরা 'ছি ছি' বলিও না, কথায় বলে, যে দেশে যে আচার। (১)

যাহা হউক, যে কথা বলিতেছিলাম, দিব্য দেবীর সহিত কুমার শ্রীসিংহ পরম সুখে দিনপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীসিংহের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা,—এত ধন। তাঁহার বাড়ী, বাগান, হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, জাহাজ, দাসদাসী, কে গণনা করিবে? স্বয়ং রাজা পদ্মসিংহ, শ্রীসিংহের তুলনায় গরীব। একদিন রাত্রিতে দিব্য দেবী স্বামীর সহিত ভ্রাতার বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন;—এমন রথে আসিলেন যে, সেরূপ কারুকার্য্য সমন্বিত, স্বর্ণ রৌপ্য এবং মণিমাণিক্যবিভূষিত রথ, রাজার বাটীতে নাই; তাঁহাদের সেই রথ যে চারিটী দুগ্ধফেনসদৃশ ধবল, উচ্চকায় উচ্চৈঃশ্রবার মত ঘোড়ায় টানিয়া আনিয়াছিল, তেমন ঘোড়া একটীও রাজার আস্তাবলে ছিল না। পতি পত্নীর ত কথাই নাই,—তাঁহাদের দাস দাসীর বসন ভূষণও এত উৎকৃষ্ট ও বহুমূল্য যে রাজার ও রাণীর পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার তাহাদের নিকট লজ্জা পায়! শ্রীমতী দিব্য দেবীর হস্তের কঙ্কণ, বক্ষের হার এবং মস্তকের মুকুট সকলই রত্নের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময়। কুমার শ্রীসিংহের শ্রী ও সম্পদ কে বর্ণনা করিতে পারে? রাজা পদ্মসিংহের মহিষী ননন্দার এইরূপ বেশভূষা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন;—স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় বড় দুর্ব্বল,—দিব্য দেবীর ঐশ্বর্য্য দৃষ্টে রাণীর হৃদয়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে হিংসা আসিল (২)। ঐশ্বর্য্য দেখাইতে সকল মহিলারই ইচ্ছা হয়, তাই তাঁহারা এত অলঙ্কার ভালবাসেন। পদ্মসিংহের রাণীর অলঙ্কার, হীরা মতি,—দিব্য দেবীকে দেখাইবার মত ছিল না;—তিনি বিষণ্ণচিত্তে মৌনভাবে ভাবিতে-

---

(১) মামাত ভগিনীর সহিত বিবাহ ভারতে আর্য্যদিগের মধ্যেও চলিত। সুভদ্রা অর্জ্জুনের মামাত ভগিনী, উহাদের বিবাহ হইয়াছিল। রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন, মামা রুক্মীর কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে নাকি এখনও চলে। "উদ্‌বাহ্যতে দাক্ষিণাত্যৈ মাতুলস্য সুতাধিজৈঃ।"

(২) প্রাচ্য দেশের অনেক স্থানেই স্ত্রী জাতির পক্ষে অলঙ্কার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি একমাত্র উপাস্য ছিল এবং তন্নিমিত্ত এই প্রবৃত্তি খুব বলবতী হইয়াছিল। এমন কি মনুসংহিতাতেও রহিয়াছে,—

"বস্ত্রাসনমলঙ্কারং কামক্রোধমনার্জবম্।
দ্রোহভাবং কুচর্য্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যোমনুরকল্পয়ৎ॥" অনেকে বলেন, এটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক।

ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে পড়িল, সেই দিন প্রাতঃকালে নগরের একজন ধনবান্ বণিক তাঁহার ব্যবহারের জন্য ভারতের একখানি কার্পাস বস্ত্র উপহার দিয়াছেন। তোমরা শুনিলে হয় ত অবিশ্বাসই করিবে যে, সেকালে ঐ সব দেশে তুলার কাপড় আদৌ ছিল না। রেশম পশম ছিল,—কিন্তু কার্পাস ছিল না। মসিনা প্রভৃতি গাছের ছাল হইতে সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত হইত, তাহা হইতে খুব ভাল কাপড় হইত, (এখনও হয়, আমরা যাহাকে "ছালটী" বলি) কিন্তু তুলার কাপড় ছিল না। মিসর খুব প্রাচীন সভ্যদেশ বটে, আর আজকাল মিসরের তুলা জগৎ-বিখ্যাত, কিন্তু সেকালে সে দেশেও তুলা ছিল না (১)। একজন লোক এদেশ হইতে তুলার গাছ ও তুলা দেখিয়া গিয়া দেশে গল্প করিয়াছিল, "ওরে ভাই, ভারত কি মজার দেশ! সে দেশে এক রকম গাছ আছে,—সেই গাছে ভেড়ার লোম জন্মে!" সেই বিজ্ঞ পর্য্যটক মহাশয় এই গল্প করিয়া পকেট হইতে একটী তুলার অর্দ্ধস্ফুটিত ফল দেখাইলেন। সকলে হাতে করিয়া টিপিয়া টাপিয়া, পোড়াইয়া, শুঁকিয়া,—কত রকমারী পরীক্ষা করিয়া তবে বক্তার কথায় বিশ্বাস করিলেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে একজন বৃদ্ধ বলিলেন, "ওরে ভাই, ভারতের কথা কি বলিব? অমন দেশ কি আর আছে? আমার মাসীমার শ্বশুরের বাবা একবার সে দেশে সওদাগরি করিতে গিয়া তথা হইতে পাথরের বাটীর মত দুইটী বাটী আনিয়াছিলেন;—সকলে সে বাটী দেখিয়া ত অবাক্। তিনি বলিলেন, এ আর কি দেখ? ভগবান সে দেশের লোককে কত ভালবাসেন জান? সে দেশে সারি সারি লম্বা লম্বা সরু সরু গাছ আছে, তাহাতে শত শত ফল ফলে। ফলের ভিতর ভাই এই দুইটী বাটী আর বাটীর ভিতরে দুইখানি রুটি আর এক গ্লাস সরবৎ!—সে খাস খোদার তৈয়ার রুটি, তার কথা কি আর বলিব?" তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, আমাদের নারিকেলের কথা হইতেছে। এইরূপে সে কালে ভারতের কত কথা কত পল্লবিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে পৌঁছিত। মস্ত মস্ত ঐতিহাসিক পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন, ভারতের লোকের কাণ এমন লম্বা ও চওড়া যে, তাহারা এক কাণ পাতিয়া শোয় ও আর একটা কাণ লেপের মত গায়ে দেয়। ষাঁড়ের মত বড় বড় পিঁপড়ে, পৃথিবীর গর্ত্ত হইতে সোনার গুঁড়, ইন্দুরের মত রাশি রাশি বাহির করিয়া বৃহৎ গাদি দেয়—ইত্যাদি (২)। আবার দেখ, বুড় মানুষ,—কথা বলিতে বলিতে কত কথাই বলিতেছি। সে থাকুক,—এখন শোন, রাণী খুব আনন্দের সহিত সেই সোণার জরির পাড় দেওয়া,—ঢাকাই শাড়ী গো, আর কিছু নয়,—সেই কাপড়খানি বাহির করিয়া দিব্য দেবীকে উপহার দিলেন।

দিব্য দেবী, প্রকৃতই দিব্য দেবী; তাই ভ্রাতৃজায়ার স্নেহের উপহার খুব আহ্লাদের সহিত হাত পাতিয়া লইলেন এবং "কাপড়খানি বড় ভাল, এমন কখনও দেখেন নাই—" ইত্যাদি বলিয়া কত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সেখানি এক দাসীর নিকট রাখিতে দিলেন। দাসী ছোট লোক কি না, সে ত আর ভদ্রতা জানে না,—সে কাপড় দেখিয়াই অনুচ্চ স্বরে রাণীর এক পরিচারিকাকে বলিল, "মা গো, পোড়া কপাল আর কি! এই নকল ঢাকাই শাড়ী, ঝুটো পাড়, মোটা মোটা কাজ,—এই কাপড় মা পরিবেন? এমন কাপড় যে আমাদের বাটীতে চাকর চাকরাণীতেও পরে না! দেখ আমার কাপড়।" এই বলিয়া সেই প্রগল্‌ভা পরিচারিকা নিজের অতি সূক্ষ্ম ঢাকাই সাঁচ্চা জরির ফুল পাতা তোলা মস্‌লিনের ওড়না,—বেনারসী গরদের পেশোয়াজ এবং ঝক্‌ঝকে সোণা মুক্তার কাজ করা মখমলের কাঁচুলী দেখাইয়া দিল। আসল কথা

(১) ইহা আমার কথা নহে,—বড় বড় ঐতিহাসিকের কথা। হিব্রু ভাষাতেও নাকি তুলার নাম 'carbas' অর্থাৎ কার্পাস।

(২) ইতিহাসের জন্মদাতা স্বয়ং হেরোডোটাস হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক (যথা মেগাস্থিনিস, প্লিনী প্রভৃতি) এই সকল উপকথা লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যেও এই "কর্ণ প্রাবরক" এবং "স্বর্ণ-পিপীলিকার" অভাব নাই।

তাই,—রাণীর শাড়ীখানি ঝুটোই ছিল। সে দেশে ঢাকাই শাড়ী ঝুটো সাঁচ্চা কে চিনে? তাই সদাগর নকল জিনিস রাজার রাণীকে উপহার দিতে সাহস করিয়াছিল। যাহা হউক, মেয়ে মহলের কথা,—ছাপা ত থাকে না, তখনই কথা রাণীর কাণে গেল। তিনি সেই পরিচারিকাকে কাছে আনিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন, সত্যই সেই দাসীর পোষাকের মত পোষাক তাঁহার ত নাই। ঈর্ষ্যার শল্য রাণীর কোমল বক্ষে বিঁধিল।

তাহার পর ভোজন। রাজবাড়ীতে বড় বড় লোকেদের নিমন্ত্রণ হইলে ভারী ভারী রূপার থাল বাটী, গেলাস ব্যবহার হইত। সেকালে আজকালকার সভ্যভব্য দেশের মত কাচ কি মাটীর বাসনের ব্যবহার এত অধিক ছিল না। গরীবের সেই সনাতন কাঁসা, পিতল, কিন্তু ধনীদের রূপা কি সোণার বাসনের রেওয়াজ ছিল। পাঁজিতে যে লেখা আছে, সত্যযুগে সোণার বাসন ও ত্রেতাযুগে রূপার বাসন ছিল, তা একেবারে মিথ্যা নয়। যাহা হউক, রাণী ও দিব্য দেবী যখন একত্রে বসিয়া খাইতেছেন,—সেই সময় দিব্য দেবীর দাসীরা পরস্পরের গা টেপাটিপি করিয়া ফিস্‌ফাস শব্দে বলিতে লাগিল,—"ওমা! কি অভাগ্যি দেখ! রূপোর বাসনে মা ঠাক্‌রুণ খাচ্চেন! রূপোর বাসনে খেতে গেলে কলঙ্কের গন্ধে আমাদেরই বমি আসে, মাথা ধরে,—আর মা ঠাক্‌রুণ কেমন করে খাবেন! ইত্যাদি।" দিব্য দেবীর কাণে কথাগুলি পৌঁছিবামাত্র তিনি দাসীদিগকে ইঙ্গিতে সাবধান করিয়া দিলেন, কিন্তু রাণীর হৃদয়ের শল্য আরও একটু গাঢ় হইয়া বসিল।

দিব্য দেবী নিজে কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দাস দাসীর ব্যবহারে রাণী বড়ই মনস্তাপ পাইলেন। তাঁহার কপালে চিন্তার রেখা অঙ্কিত হইল, মুখ শুকাইয়া গেল,—দিব্য দেবী যেন তাঁহার চক্ষুর বালি বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে এই দম্পতি রাজবাটী হইতে বিদায় লইলেন। বিদায় লইলেন বটে, সেই বিদায়েও রাণীর হৃদয়-শল্য আরও একটু ভিতরে বসিল। তাঁহারা রথে আসিয়াছিলেন কিন্তু ফিরিলেন নরযানে। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব যানের শোভা, কারুকার্য্য, সজ্জা,—এমন কি বাহকগণের আকৃতি ও বেশভূষাও অদ্ভুত। মহার্ঘ কাষ্ঠে গজদন্ত বসাইয়া সেই পাল্কী বা সুখযান নির্ম্মিত,—কাষ্ঠে ও দন্তের শিল্পকার্য্য তেমন ত আর কখনও কেহ দেখে নাই! বহুমূল্য কিংখাবের আসন, দুর্লভ কাশ্মিরী শালের চন্দ্রাতপ, মণিমুক্তাখচিত ঝালর,—যে দেখিল, সেই ধন্য ধন্য করিল! বাহকগুলি সকলেই দীর্ঘকায়, গৌররূপ, একরূপ বয়স, একরূপ উচ্চ, একরূপ সুবর্ণ রৌপ্যময় কারুকার্য্য বিভূষিত পরিচ্ছদে বিভূষিত। সকলেরই উষ্ণীষে রাজপুত্রের ন্যায় অষ্ট্রীচ পক্ষীর পালক এবং হীরক। বিদ্যাধর যুবক বাহিত দৈবযানে যেন দুটি দেব দেবী অমরাবতীর রথ্যা দ্বারা চলিয়া গেলেন। এমনই সেই দম্পতির রূপলাবণ্য, পরিচ্ছদ, যান বাহন ও ভূষণের পারিপাট্য! পরিচারিকাগণ কেহ চামর হস্তে, কেহ বীণাহস্তে, কেহ বা গন্ধরস পরিপূরিত শৃঙ্গকোষ হস্তে,—উর্ব্বশী মেনকা তিলোত্তমাদি অপ্সরাগণের ন্যায় তাঁহাদের বেষ্টন করিয়া সেই যানের উপরিভাগেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। নগরের লোকে সেই দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের কণ্ঠ ও যন্ত্রোত্থিত মধুর সঙ্গীত শুনিয়া বিমূঢ়ের মত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে ঠিক সুপ্তোত্থিতের ন্যায় হঠাৎ দেখিল, রাজপথ শূন্য। অনেকে ভাবিল,—"আমরা কি রূপ যৌবন এবং ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখিলাম!" রাণীও অলিন্দ হইতে এই দৃশ্য দেখিলেন,—তাঁহার হৃদয়শল্য মর্ম্মভেদ করিল,—তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন!

সুচিকিৎসায়, পরিচর্য্যায়, তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, শারীরিক স্বাস্থ্যও ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মানসিক শান্তি আর ফিরিল না! তিনি ভাবিলেন,—তিনি রাণী কেবল নামে। দিব্য দেবীর পরিচারিকার কপালও তাঁহার কপাল হইতে ভাল। রূপ, যৌবন, শিক্ষা, কৌলীন্য—কিসে তিনি কম? তবে দিব্য দেবীর কপালে এত সুখ কেন? কাঁদিতে কাঁদিতে গদ্‌গদ কণ্ঠে তিনি স্বামীকে সকল কথা বলিলেন।

স্বামী মৌন, গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। কণ্টক শয্যায় এই রাজদম্পতি রাত্রি কাটাইলেন। দেখ ভাই,—ত্বরাকাঙ্ক্ষা কি ভয়ানক ব্যাধি।

পরদিন, অপরাহ্নে, রাজ্ঞী নিজ কক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন,—এক পরিচারিকা নিকটে ময়ূর-পুচ্ছ নির্ম্মিত ব্যজনী হস্তে দাঁড়াইয়া আছে,—এমন সময় বিচিত্রোজ্জ্বলবেশা, মধুরহাসিনী, এক পরমা-সুন্দরী তরুণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজ্ঞীকে প্রণাম করিল। সেই আগন্তুকের সৌন্দর্য্য বেশপারিপাট্য এবং বিনীত ব্যবহার দেখিয়া রাণী ভাবিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই নগরের কোন উচ্চকুলের কুলাঙ্গনা,—তাই একটু সম্ভ্রমের সহিত,—নিকটস্থ দাসীকে একখানি আসন দিতে বলিলেন এবং নিজেও প্রতিনমস্কার করিলেন। আগন্তুক কিন্তু আসনে উপবেশন না করিয়া অতি বিনীতভাবে করযোড়ে নিবেদন করিল, "রাজ্ঞি, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি আপনার দাসী মাত্র। রাজভগিনী শ্রীশ্রীমতী দিব্যদেবী আমার যোগে আপনাকে তাঁহার সাষ্টাঙ্গ অভিবাদন জানাই-য়াছেন এবং আপনার ব্যবহারের নিমিত্ত কিছু উপা-য়ন পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে এই সকল অকিঞ্চিৎকর পদার্থ দেশের অধিশ্বরীর অযোগ্য হইলেও, কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রদত্ত ভক্তির উপহার বলিয়া যেন আপনি গ্রহণ করেন।" রাজ্ঞী মস্তকা-ন্দোলন করিয়া অনুমতি প্রকাশ করিলে সেই সুন্দরী দাসী ঘরের বাহিরে আসিয়া ক্ষুদ্র একটী পেটক লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিল। সে তখন নিজের গায়ের ওড়না হর্ম্ম্যতলের বহুমুল্য কার্পেটের উপর প্রসারিত করিয়া তদুপরি পেটকের অন্তর্নিহিত দ্রব্যগুলি একে একে রাখিল। রাণী বিস্ময়াপ্লুত হৃদয়ে দেখিলেন,—যাহা দেখিলেন তাহা আর কখনও দেখেন নাই। ঢাকাই মসলিনের ও রেশমের সেরূপ পরিচ্ছদ, মণি-মুক্তা বিভুষিত পাদুকা ও মধ্যাহ্ন তপনের জ্যোতির ন্যায় জ্যোতিষ্মান্ হীরক, বালারুণের ন্যায় রক্তবর্ণ পদ্মরাগ, চন্দ্রের জমাট জ্যোৎস্নার ন্যায় চন্দ্রকান্ত, নব-দুর্ব্বাদলপ্রভ মরকত, নীলমেঘের কান্তির মত নীল-কান্ত,—প্রভৃতি মণিখচিত মস্তক হইতে পদযুগল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার,—তেমন তিনি বাপের বাটীতে কি স্বামীর প্রাসাদে অথবা আত্মীয় স্বজনের গৃহে কোথাও কখনও দেখেন নাই। এরূপ বসন ভূষণ দেখিলে বুঝি স্বর্গের দেবীগণও পরিতুষ্ট হন,—মানুষের কথা ত ছার! রাজ্ঞী নারীজনসুলভ আহ্লাদে গদ গদ হইয়া শত মুখে ননন্দার দানের প্রশংসা করিলেন এবং স্বামীকে এই আনন্দের অংশ দিবার অভিপ্রায়ে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজা আসিবার অগ্রেই কিন্তু দিব্যদেবীর পরিচারিকা বিদায় গ্রহণ করিল। রাণী পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে নিজ অঙ্গুলী হইতে একটী উৎকৃষ্ট রত্নাঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। সুশিক্ষিতা ও সুচতুরা দাসী অভিনেত্রী ন্যায় ললিতভঙ্গীর সহিত ঐ আংটীটী উভয় হস্তে গ্রহণ করতঃ একবার আপন মস্তকে স্পর্শ করিয়া এবং অবশেষে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

অল্প সময় মধ্যেই রাজা অবরোধে রাণীর শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। অসময়ে রাণীর আহ্বানে তাঁহার একটু চিন্তা হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিলেন যে দেবী গৃহের দেহলীতে, স্মিতমুখে অতি আনন্দের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন,—তখন তাঁহারও মনে আনন্দের উদ্রেক হইল। রাজা এবং রাজ্ঞী উভয়েই এক আসনে উপবেশন করিলেন। রাণী তখন, শয্যাপৃষ্ঠ হইতে তুলিয়া একে একে জিনিস গুলি দেখাইলেন। যদিও রাজা রত্নাদি পরিচয়ে বিশেষ পারগ ছিলেন না তথাচ, দেখিয়াই বুঝিলেন যে এ উপহার বহুমূল্য। রাণী প্রফুল্লমুখে বলিলেন "তোমার ভগিনী আমাকে এইগুলি পাঠাইয়া দিয়াছে। আহা সে সুখে থাক্।" রাণীর এই কথায় কিন্তু রাজার মুখ গম্ভীর হইল; তিনি তৎ ক্ষণাৎ একজন রত্ন-বণিককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র, নগরের প্রধান শ্রেষ্ঠী, বিখ্যাত রত্নপরীক্ষক শোভাচাঁদ শ্যামলচাঁদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন! রাজা পরীক্ষকের নিকট বস্ত্রালঙ্কারগুলি অর্পণ করিয়া তাহাকে বলিলেন "একজন বণিক রাজ্ঞীর ব্যবহারের নিমিত্ত এই দ্রব্যগুলি আনিয়াছে বল দেখি, এগুলি আসল না নকল। আর যদি আসল হয়, তাহা হইলে এগুলি আমার মত সমৃদ্ধি-শালী রাজার পাটরাণীর যোগ্য কি না,—আর ইহার মূল্য কত? চতুর বণিক, ধীরে ধীরে, একে একে, কাপড়, ওড়না, কাঁচুলি, কাঞ্চী, কঙ্কণ, হার, মুকুট, মেখলা, নূপুর, অঙ্গুরী সমস্ত দ্রব্যগুলির পরীক্ষা করিল। নিক্তিতে রত্নগুলি ওজন করিল, হীরা মুক্তা পরীক্ষা সে ভালই জানিত, তথায় পরীক্ষায় খুব সময় লাগিল। অবশেষে, দীর্ঘ পরীক্ষার পর, রাজার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে দেখিয়া সে বলিল "মহারাজ, তিন সত্য করিয়া বলিতেছি, জিনিষগুলি সমস্তই আসল; তথাপি, মহারাজার সন্দেহ অমূলক নহে, অর্থাৎ ইহারা আমাদের মত সমৃদ্ধিশালী রাজার পাটরাণীর যোগ্য কিনা? আমি স্পষ্টই বলিব, "না মহারাজ, ইহার একটীও আমাদের রাজ্ঞীর যোগ্য নহে।" রাজাও রাণী উভয়েই বণিকের কথায় বিস্মিত হইয়া সমস্বরে একটু তীব্র বিরক্তির সহিত বলিলেন "একি অসম্বন্ধ প্রলাপ? জিনিসগুলি সমস্তই অকৃত্রিম অথচ আমাদের যোগ্য নহে?" বণিক কিছুমাত্র ও অপ্রভিত না হইয়া বলিল "মহা-রাজ এই সকল রত্ন মিসর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, পারস্য কি ভারতের সম্রাটের সম্রাজ্ঞীর যোগ্য ভূষণ, আমাদের মত ক্ষুদ্রও দরিদ্র রাজ্যের রাণীর যোগ্য নহে। মহারাজ, এই সকল দ্রব্যের মূল্য আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহারা প্রকৃতই 'সাত রাজার ধন' অর্থাৎ আমাদের ফিনিসীয়া রাজ্যের মত সাতটি রাজ্য বিক্রয় করিলেও বুঝি ইহার মূল্য উঠিবে না। যে রাজা মিসরের পিরামিড্ কি ব্যাবিলনের বল-দেবের (১) মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারেন, তিনিই এই রত্ন কিনিতে পারেন। আর এদেশে এমন বণিকই বা কে আছে, যে এরূপ জিনিসের ব্যবসা করিবে? এরূপ দ্রব্যের ক্রেতা কোথায়, বিক্রেতাই বা কোথায়? আমার অপরাধ লইবেন না, ফিনি-সীয়া দূরে থাকুক, এক কুমার শ্রীসিংহ ব্যতীত, এই বিশাল সিরিয়া প্রদেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহই নাই, যিনি এই সকল রত্নের মধ্যে একটীও দিতে পারেন।" রাজা বণিকের কথা শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন! তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার শ্রীসিংহের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ কত?" বণিক বলিল "মহারাজ, আরবদেশের মরুভূমির বালুকা অথবা আকাশের তারা কে গণিবে? শ্রীসিংহের প্রপিতামহ লক্ষ্মীর সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীসিংহের ঘরে বাঁধা। স্বয়ং চঞ্চলা যে ঘরে অচলা, তাঁহার ধনরত্নের পরিমাণ বৃথা! কুমার ইচ্ছা করিলে টায়ারের রাজপথ পদ্মরাগ দিয়া বাঁধাইয়া দিতে পারেন, স্বর্ণমুদ্রায় লোহিতসাগর ভরাইয়া দিতে পারেন।" বণিক প্রণাম করিয়া বিদায় হইল, রাজদম্পতী অবাক্ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। রাজ্ঞী যত্নের সহিত সেই উপায়নগুলি তুলিয়া রাখিলেন। রাত্রিতে পতিপত্নীতে অনেক পরামর্শ করিলেন। শ্রীসিংহের এত ঐশ্বর্য্য! সেত রাজা না হইয়াও রাজার অধিক! কি উপায়ে সে এত ধন রত্ন পাইল? কি উপায়ে—এই ভাবনায় রাতি পোহাইয়া গেল। রাজারাণীর চক্ষুর পাতা মুদিল না। হায় রে দুরাকাঙ্ক্ষা!

পরদিন দিব্যদেবীর বাটী হইতে ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃজায়ার নিমন্ত্রণ আসিল। কুমার শ্রীসিংহ নিজে একটী কলের ঘোড়ায় চড়িয়া রাজবাড়ীতে রাজা ও রাণীকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তোমরা ভাবিতেছ, বুড়া মিথ্যা গল্প করিতেছে; তা' নয়। সেকালে আমাদের দেশে ও অসুরদের দেশে, আজকালের মোটারকার কি এরোপ্লেনের মত, কলের ঘোড়া, কলের রথ, কলের নৌকা জলে স্থলে শূন্যে দৌড়াইত। আমি দেখি নাই, কিন্তু ঋষিরা

(১) জগৎপ্রসিদ্ধ ব্যাবিলন নগরে অসুরদিগের উপাস্য বলদেবের অত্যুচ্চ মন্দির বিদ্যমান ছিল। অনেকে অনুমান করেন যে, বাইবেল কথিত Tower of Babelর কথা ঐ মন্দিরের উপলক্ষ্যে রচিত হইয়াছিল। অধুনা নাকি উহার ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দেখিয়াছিলেন, নিশ্চয়। বেদে ঐ সকল যানের চমৎকার বর্ণনা আছে। আজকালকার ছেলেদের দোষই এই; কিছুই বিশ্বাস করিবে না, কেবল জেরা, আর তর্ক। আচ্ছা ভাই, তোমরা মোটার-গাড়ী, এরোপ্লেন, এসব না দেখিলে, কলের গান না শুনিলে, বিশ্বাস করিতে? না, কখনই না। আচ্ছা বিশ্বাস না কর, মনে কর, যে শ্রীসিংহ কলের ঘোড়ায় চড়িয়া রাজবাড়ীতে আসিয়া রাজা ও রাণীকে নিমন্ত্রণ দিয়া গেলেন;—তারপর কি হ'ল? আর একদিন বলিব।

(আগামীবারে সমাপ্য।)

শ্রীসত্যবন্ধু সাস।

সুলতান বায়েজিদ বস্তানীর দরগাহ্।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমরা সুলতান বায়েজীদের কবরস্থান দেখিতে গিয়াছিলাম। এই স্থান চট্টগ্রাম সহর হইতে ৫ মাইল উত্তরে। কবরের সম্মুখে প্রকাণ্ড একটী দীঘি আছে। সেখানে অনেক কচ্ছপ আছে। রুটি, খৈ, কলা ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য জলের নিকট দিয়া ডাকিলে তাহারা ঘাটে আসিয়া সেইগুলি খায়। তাহাদের চেহারা দেখিলে বোধ হয়, তাহারা বহুবৎসরের পুরাতন কচ্ছপ। কবরের মাতোয়ালি সাহেব বলিলেন যে বস্তান প্রদেশের সুলতান বায়েজিদ নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এই স্থানে আসিয়া আসন গ্রহণ করেন এবং বার বৎসর সাধনা করিবার পর ১১ শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে দেহত্যাগ করেন। যখন তিনি আসিয়াছিলেন, তখন এই স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং পরী ও দানবগণের বাসস্থান ছিল। তাঁহার ভয়ে অনেকে পলাইয়া গিয়াছিল এবং যাহারা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সেখানে ছিল, তাহাদিগকে তিনি কচ্ছপ ও গজাল মাছ করিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই সুলতান বায়েজীদ সম্ভবতঃ বল্ক প্রদেশের রাজা ইব্রাহিম ইবন্ আদহাম। ইহাঁর পিতা রাজপুত্র ছিলেন কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া একটি কুটীরে বাস করিতেন। একদিন বল্ক প্রদেশের রাজ-কন্যা সেই কুটীরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। আদহাম রাজকন্যাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন এবং রাজার নিকট যাইয়া ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সুলতান অবশ্য তাঁহার একমাত্র কন্যাকে ফকিরের সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন না। ওদিকে রাজকন্যাও ফকিরের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ফকিরের সহিত বিবাহ না হওয়াতে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, একদিন তাঁহার মূর্চ্ছা হইল। সকলে ভাবিল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে! এই মনে করিয়া তাহারা রাজকন্যার কবর দিল। ওদিকে ফকির আদহাম প্রত্যহ রাজকন্যার সন্ধান লইতেন। তিনি শুনিলেন রাজকন্যার মৃত্যু হইয়াছে ও তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে। তিনি রাজকন্যার শব রাত্রে কবরস্থান হইতে উঠাইয়া আপনার কুটীরে লইয়া আসিলেন এবং সেই শব নিকটে রাখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ঘটনাক্রমে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, রাজকন্যার মৃত্যু হয় নাই, তিনি মূর্চ্ছিত অবস্থায় আছেন। অনেক চেষ্টা করিয়া চিকিৎসক তাঁহার মূর্চ্ছা অপনয়ন করিলেন। এইরূপে রাজার অজ্ঞাতসারে রাজকন্যার সহিত আদহামের বিবাহ হইল। ইহার কয়েক বৎসর পরে ১৭৬ হিজরীতে অর্থাৎ অষ্টম খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিমের জন্ম হয়। যখন তাঁহার বয়স ৫ বৎসর, তখন রাজা একদিন হঠাৎ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং কোন এক অজ্ঞাত কারণে বালকটির দিকে মন আকৃষ্ট হইল। তিনি বালককে রাজভবনে লইয়া গেলেন এবং বালকের পিতাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন।

বালকের পিতা তখন ঐ বালক রাজার কে, সেই পরিচয় দিলেন। রাজা যখন জানিতে পারিলেন যে, ঐ বালকটী তাঁহারই একমাত্র কন্যার পুত্র, তখন তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। রাজা বৃদ্ধ হইলে ইব্রাহিমকে রাজ্যভার দিয়াছিলেন। ইব্রাহিম একদিন মৃগয়া করিতে করিতে একটি হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন। এমন সময় আকাশ-বাণী হইল, "ইব্রাহিম!

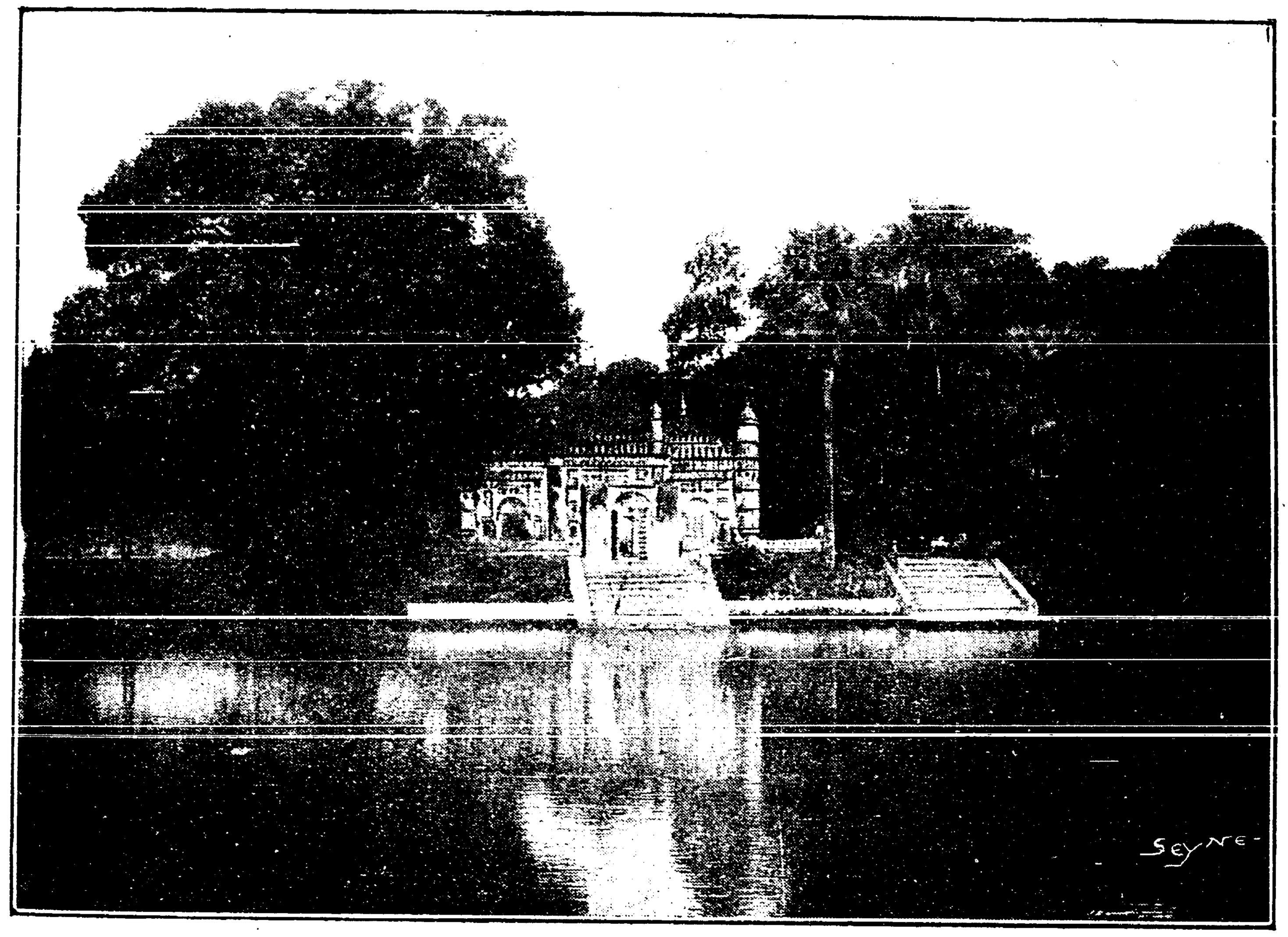

সুলতান বায়েজিদ বস্তানির দরগাহ্।

এই ক্রীড়ার জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই।" সেই বাণী শুনিয়া ইব্রাহিম ঘোড়া হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। জ্ঞান হইবার পরও সেই বাণী তাঁহার হৃদয়ে থাকিয়া গেল, আর একদিন তিনি ঘরে বসিয়া ভগবানের কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহার ছাদের উপর একটা গোলমালের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওখানে "কে?" ছাদ হইতে উত্তর পাইলেন, "আমি পথিক, আমার একটী উট হারাইয়া গিয়াছে। তাহাই খুঁজিতেছি।" সুলতান উত্তর করিলেন, "তুমি নিতান্ত পাগল, সেই জন্য রাজার ছাদের উপর উটের তালাস করিতেছ।" ছাদ হইতে উত্তর আসিল, "রাজার ছাদে উটের তালাস করা যদি পাগলামি হয়, রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া ভগবানের তালাস করা কি অধিকতর পাগলামি নয়?" আর একদিন তিনি ঘরে যাইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার বিছানায় একটী দাসী শুইয়া আছে। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ৩ বার বেত্রাঘাত করিলেন। ইহাতে দাসী হাসিতে লাগিল। তাহার হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমি অল্পক্ষণ এই বিছানায় শুইয়া থাকায় যদি তিনবার বেত্রাঘাতের উপযুক্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে যে চিরকাল এই বিছানায় শুইয়া থাকে, সে কত বেত্রাঘাতের উপযুক্ত।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে সংসারের প্রতি একবারে বিরাগ জন্মিল। তজ্জন্য তিনি পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া ফকিরী গ্রহণ করিলেন ও নানাতীর্থ ও দেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ২৮২ হিজরীতে চট্টগ্রামে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীশৈলবালা রায় চৌধুরাণী।

বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ।

চুঁচুড়ার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতি মাননীয় মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অভিভাষণে আমরা মিঃ হালহেড সাহেব কৃত 'Grammar of Bengali Language' নামক বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণের কথা জানিতে পারি। সভায় আমার পার্শ্বে হুগলীর একজন খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হালহেড সাহেবের এই ব্যাকরণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। এই সংবাদে শ্রীরামপুর যাইয়া ব্যাকরণখানি দেখিয়া আসিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে ইহার এক সুবিধাও উপস্থিত হইল। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যক্ষের প্রতিনিধি সম্মিলনে সমাগত সাহিত্যসেবীবৃন্দকে কলেজ লাইব্রেরী পরিদর্শন জন্য সাদরে আহ্বান করিয়া গেলেন। এই আহ্বানে পরদিন প্রাতঃকালেই আমি এবং দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর ইতিহাসের অধ্যাপক সুলেখক শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ, এক সঙ্গে শ্রীরামপুর যাত্রা করিলাম। যথাসময়ে কলেজে পৌছিয়া পুস্তকালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ের সহিত বৃহৎ পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিয়া স্ফটিকাধারে যত্নে রক্ষিত সংস্কৃত, চীন, হেব্রু প্রভৃতি বহু ভাষায় লিখিত বহুসংখ্যক দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথি দেখিতে দেখিতে অবশেষে কথিত ব্যাকরণখানি প্রাপ্ত হইলাম। ব্যাকরণখানি সেকালের সাদা পুরু কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত। ইহার প্রথম পত্রাঙ্কে—'বোধ প্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থম ক্রিয়তে হালেদং গ্রেজি' এই যে বচন আছে, তাহা হইতেই গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ও গ্রন্থকার ইংরেজ হালহেড সাহেবের নাম জানিতে পারা যায়।

হালহেডের পূর্ণ নাম মিঃ ন্যাথানিয়েল ব্রেসি হালহেড—ইনি হুগলীর সিবিল কর্ম্মচারী ছিলেন।

এখন ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস একটু বলিব। ইংরাজেরা এদেশে আধিপত্য লাভ করিয়া ১৭৬৫ খৃঃ ইহার দেওয়ানী ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশী ভাষা না জানায় কোম্পানীর নবাগত কর্ম্মচারীবর্গের বিষয় কার্য্যের যথেষ্ট অসুবিধা হইতে লাগিল। সেই অসুবিধা দূরীকরণ জন্য কোম্পানীর তৎকালিক ছোট বড় সকল কর্ম্মচারীই বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা বোধ করিলেন। কিন্তু কোনও বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার মূল প্রকৃতি ও গঠনের নিয়ম জানার দরকার। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত বিদেশীর পক্ষে সে বিষয়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল—কিন্তু তখন বাঙ্গলা ভাষার কোনও ব্যাকরণ ছিল না। তাই অদ্ভুতকর্ম্মা হালহেড বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং বিপুল পরিশ্রমে অতি অল্প দিনের মধ্যে তাহাতে সম্যক্ অধিকার লাভ করিয়া ১৭৭৮ খৃঃ এই ব্যাকরণখানি প্রণয়ন করিলেন।

এই ব্যাকরণ রচনা করিতে হালহেড্ সাহেবকে যে কি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, পুস্তকখানি পাঠ করিলেই তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে। তিনি সংস্কৃত, আরবী, পারসী, গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি কয়েকটী ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিয়া এই বাঙ্গলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাতে তৎকালিক ও আধুনিক বাক্ পদ্ধতির বহু উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন এদেশে বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন আলোচনাই আরম্ভ হয় নাই, তখন সাত সমুদ্র তেরনদী পারের ভিন্ন ভাষাভাষী একজন রাজকর্ম্মচারী বাঙ্গলা লেখ্যও কথ্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ রচনা দ্বারা সেই ভাষার শৃঙ্খলা ও গদ্যরচনার সৌকর্য্য সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন ইহা ভাবিলেও বিস্মিত অবাক্ হইতে হয়।

ব্যাকরণ লিখিত হইলে ইহার মুদ্রাঙ্কণ জন্য এ দেশে বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিবার প্রয়োজন হয়।

কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব সিবিল কর্ম্মচারী স্যার চার্লস উইলকিন্সকে ইংলণ্ড হইতে আনাইয়া তাঁহারই উপর এই কার্য্যের যাবতীয় ভার, অর্পণ করা হইয়াছিল। স্যার চার্লস সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রাচীন পুঁথির অক্ষর ও পাকা মুন্সীদিগের হস্তাক্ষরের আদর্শ লইয়া বহুদিন পরিশ্রমের পর স্বহস্তে কাষ্ঠের খোদাই বাঙ্গলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এই কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি পঞ্চানন কর্ম্মকার নামীয় জনৈক এদেশীয়কে অক্ষর খোদাই কার্য্য শিখাইয়াছিলেন। স্যার চার্লস ও পঞ্চানন কর্ম্মকারের প্রস্তুত কাষ্ঠের অক্ষর দ্বারা স্থাপিত মুদ্রাযন্ত্রে ১৭৭৮ খৃঃ হুগলীতে হালহেডের বাঙ্গলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়। সুতরাং এই পুস্তকখানি যে শুধু বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ বলিয়াই প্রসিদ্ধ তাহা নয়—বাঙ্গলা দেশের প্রথম মুদ্রাযন্ত্রে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গলা পুস্তক বলিয়াও ইহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক গৌরব আছে—তাহা স্পর্দ্ধা সহকারে বলা যাইতে পারে।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

বেতাল পঞ্চ বিংশতি।

(পুরাতন কাগজ সংগ্রহ।)

(৩)

পুরাতন হস্তলিখিত কাগজ সংগ্রহকালে যে কয়খানি হস্তলিখিত পুস্তক পাইয়াছিলাম বেতাল পঞ্চ বিংশতি তাহার অন্যতম। এখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল নহে; ইহা কবিতাকারে গ্রথিত। উপাখ্যান ভাগ একই। দেশী কাগজে অতি সুন্দর মুক্তাপংক্তি গঞ্জিত হস্তাক্ষরে পুস্তকখানি লিখিত। লিপিকর যে স্বীয় লিপিকল'তে সুনিপুণ ছিলেন এই পুস্তকখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা সকলেরই বোধগম্য হইবে। তাঁহার অক্ষরগুলি সকলেই "সমানি সম শীর্ষানি ঘনানি বিরলানি চ"। ছাপার লেখা ত্যাগ করিয়া এই হস্তলিপি পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়।

আমার কাছে যে পাণ্ডুলিপি আছে তাহা অসম্পূর্ণ। মধ্যের এক অংশ নাই। এই পুস্তকখানি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞাত নহি। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুস্তকেও ইহার কোন নিদর্শন পাই নাই; সুতরাং তিনি এই পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন কি না তাহা জানিবার কোন উপায় আমার নাই। আমার পুস্তকখানির শেষে এইরূপ লিখিত আছে "ইতি সন ১২৫১ বারশত একান্ন শাল তারিখ ৮ ফাগুনঃ সনিবার প্রতিপদঃ।" সুতরাং এই পাণ্ডুলিপিখানি ৬৮ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত।

আসল পুস্তকখানি কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল পুস্তক হইতে তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। লেখকের পরিচয়ের মধ্যে কেবল এই জানা যায় যে তাঁহার নাম কালীদাস। পুস্তকের সর্ব্বত্রই "কহে কবি কালীদাস মজাইয়া মন," কি ঐরূপ ধরণের ভনিতা আছে; কেবল একস্থানে "দিগাম্বর দাস" দেখা যায়। তবে সেটা আমাদের বোধ হয় কালিদাসেরই প্রকার ভেদ মাত্র। দিগম্বরীর স্থলে দিগাম্বর হইয়াছে। আর সকল স্থলেই যখন 'কালীদাস' ভনিতাই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে তখন কবির নাম যে কালীদাস ছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

সংস্কৃতে যে বেতাল পঞ্চ বিংশতি নামে কথা গ্রন্থ আছে তাহারও প্রণেতা কালিদাস বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

যাহা হউক আমাদের এই বাঙ্গলা বেতাল পঞ্চ বিংশতির রচয়িতা কালীদাস কে, তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল এবং তিনি কোন সময়ের লোক তাহার

কোনই অনুসন্ধান করিবার সুযোগ আমি প্রাপ্ত হই নাই। যেখান হইতে আমি এই হস্তলিপি প্রাপ্ত হই সেখানেও ইহার তথ্যানুসন্ধানে আমি সচেষ্ট ছিলাম, কিন্তু তাহার ফল হতাশা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই।

এ পুস্তকের অন্য কোনও পাণ্ডুলিপিও আমি অনুসন্ধান করিয়া কোথাও পাই নাই। বঙ্গ সাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব নির্ণয় নিরত কোন মহাত্মা যদি এই কালীদাসের কোনও সংবাদ সংগ্রহ করিয়া থাকেন তবে তাহা জানাইলে সুখী হইব।

হস্ত লিখিত পুস্তকখানি ৮৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহার মধ্যে বেতাল পঞ্চ বিংশতির উপাখ্যান কবিতাকারে বিবৃত আছে। কবিতার কিছু কিছু নমুনা পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিতেছি।

প্রথমেই যথারীতি গণেশ বন্দনা ; যথা :—

"নম নম বিঘ্নরায়ঃ লম্বোদর মহাশয়ঃ
ছিন্নদন্ত কুঞ্জর বদনঃ।
কুম্ভে সিন্দুর ভূষণঃ গণপতি ত্রিলোচনঃ
ব্রহ্মতম লহিত বরণঃ॥
শংখ চক্র গদাম্বুজঃ শুশোভন চারি ভূজঃ
অঙ্গদ বলয় বিভূষিতঃ।
* * * * *
* * * * *
কিবা শোভা কটিতটে পরিধান কিঙ্কিপটে
সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ শিব পুত্র।
ইত্যাদি।

তার পর "আমি অতি অকিঞ্চন" ইত্যাদি বলিয়া গ্রন্থকার নিজ দৈন্য খ্যাপন করিয়া গণেশের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন।

অতঃপর গ্রন্থ সূচনা যথা :—

"হরি হর হৈমবতি গণেশ দিনেশ।
পঞ্চ দেব পদে মন করিয়া নিবেশঃ॥
গ্রন্থের সূচনা আগে করিয়া বর্ণন।
মহারাজা বিক্রমাদিত্যের বিবরণ॥"

এই বলিয়া পুস্তকখানির বর্ণিতব্য বিষয়ের একটা বস্তু সংক্ষেপ (Summary) প্রদত্ত হইরাছে। সেটি উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—

"সন্ন্যাসীর আগমন শ্রীফল প্রদান।
বিল্বাসন মানসে মাণিক তাতে পান।
কপটে সন্ন্যাসী ভূপে জানাইল বাত্রা।
হইতে বেতাল সিদ্ধি নৃপতির যাত্রা!
শ্মশানেতে উপনিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে
সবরূপী বেতাল আনিতে যান রঙ্গে॥
পঞ্চ বিংশতি সমিস্যা জিজ্ঞাসে বেতাল।
ক্রমে ক্রমে সমিস্যা পুরিল মহীপাল।
প্রথম প্রশ্নেতে পদ্মাবতী উপাক্ষণ।
দ্বিতীয়েতে মন্দাবতির বিবাহ বর্ণন।
তৃতীয়েতে বিরবর উপাক্ষণ আর।
চতুর্থেতে শুক পঞ্চ বিলাস কথার।
পঞ্চমেতে হরিদাসের কন্যা সম্প্রদান।
ষষ্ঠে ধর্ম্মসিল সদাগরের আখ্যান।
সপ্তমেতে চর্ম্মকেশ রাজার বর্ণন।
তনয়া বিবাহে পাত্রে ছবি দরশন।
অষ্টমেতে গুণাধিপ রাজার কথন।
নবমেতে হিরণ্যদণ্ডের উপাক্ষণ।
নৃপতি বল্লভদাশ শন্যপুর গ্রামে।
তাহার আখ্যান প্রশ্ন সমিস্যা দশমে।
একাদশে চূড়ামনি রাজার বর্ণন।
বেতাল সমিস্যা ভূপে জিজ্ঞাসে তখন।
দ্বাদশ প্রশ্নের কথা শুন অতঃপর।
উপাক্ষণ ধর্ম্মগোজ নামে সদাগর॥
চক্ষুপ্রভা নৃপতির প্রশ্ন ত্রয়োদশে।
বিদ্যাধর রাজার আখ্যান চতুর্দ্দশে।
পঞ্চদশে রত্নদত্ত সাধুর আখ্যান।
ষোড়শেতে গুণাকর বিপ্র গুণ গান।
ধনঞ্জয় সদাগর কন্যা ধনবতি
সপ্তদশ সমিস্যায় তাহার ভারতি।
অষ্টাদশে রূপদত্ত রাজার কথন!
উনবিংশে ধনদত্ত সাধুর বর্ণন।
বিংশতি প্রশ্নেতে বিষ্ণু শর্ম্মার নিবাশ।
একবিংশে ধর্ম্মযজ্ঞ কৌতুক প্রকাশ।
দ্বাবিংশে প্রস্তাব প্রশ্ন শেখর রাজার
ত্রয়োবিংশে বিদগ্ধ ভূপের সমাচার।

চতুর্বিংশতিতে প্রশ্ন শুনহ রাজন।
অদ্ভুত সমিস্যা চারি বন্ধু উপাক্ষণ।
পঞ্চ বিংশতির কথা শুন দিয়া মন।
পরে বেতালের মুখে পাইলা বিবরণ।
সন্ন্যাসীরে কাটিয়া আপনি মহীপাল।
বিক্রমাদিত্য সিদ্ধ হইল বেতাল।
আপনার স্বরাজ্যে আইল নরপতি।
বিংশতি সমিস্যা পূর্ণ ইতি।"

ইহার পরে ক্রমে কথার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের গুণ বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে।

"কলিতে বিক্রমাদিত্য নামেতে ভূপতি
সর্ব্বগুণান্বিত রাজা পূন্যবান্ অতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত দয়াবন্ত ধির।
সত্য বাক্য পালনে যেমন যুধিষ্ঠির।
পরম সুন্দর রূপ জিনি রতি পতি।
কুবের সমান ধনে বুদ্ধে বৃহস্পতি।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যেমন দশানন।
রামরার্য্য প্রায় করে প্রজার পালন।
দুর্য্যোধন প্রায় মানে কর্ণ সম দানে।
মহাবল পরাক্রম ভীষ্ম সম রণে।
সদানন্দ হাস্যযুক্ত বাক্যে সরস্বতি।
অক্রোধিত জেমন জানিবে বসুমতি।
গুণ বোদ্ধা রসিকতা সদানন্দ মন।
নবরত্ন শভাশত অতি বিচক্ষণ।
ইন্দ্রের সমান সভা বিক্ষাত ভূবনে।
কিত্তি জশ ঘোশনা করয়ে শর্ব্ব জনে।
ধন্বন্তরি বররুচি বরাহ মিহির।
ক্ষপণ কামর সিংহ ঘটক কর্পূর।
শঙ্কু বেতাল ভট্ট এই কয় জন।
কালিদাস সহ হইল এ নব রতন।
সভার বর্ণনা কত কহিব বিস্তার।
কলিতে এমন রাজা নাহি হৈল আর।"

গল্পগুলির কতকগুলি আদি রসের অপ প্রয়োগে পূর্ণ, তবে তাৎকালিক রুচি অনুযায়ী বিচার করিলে সে গুলির মধ্য দিয়া উপদেশ প্রদানের অভিপ্রায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। বীরবলের উপাখ্যানটি অতি সুন্দর এবং প্রভুর কার্য্যে আত্মোৎসর্গের অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

বস্তু সংক্ষেপে পঁচিশটি উপাখ্যানের কথা থাকিলেও পুস্তকখানিতে এতগুলি উপাখ্যান নাই। একাদশ কথনের শেষ হইলে সেখানেই "সাঙ্গ পঞ্চবিংশতি" বলা হইয়াছে।

যে সমুদয় অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই পুস্তকের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সর্ব্বত্রই প্রায় এই ধরণেরই লেখা। একটি স্বভাব বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

"* * * *
পিতা পুত্রে বন মধ্যে করয়ে ভ্রমণ॥
দেখিয়া বনের শোভা হরষ অন্তর।
ফলফুলে পূর্ণিত জতেক তরুবর।
নানাজাতি বিহঙ্গম করে নানা রব।
মধুলোভে অলিকুল গুঞ্জরিছে সব।
কুহু কুহু রবেতে ডাকিছে পিকগণ।
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয়া পবন।
বিহরিছে মৃগগণ আনন্দিত মনে।
* * * *"

এই পুস্তকের কবির কবিত্ব শক্তি যে বড় উচ্চ দরের ছিল, তাহার কোন পরিচয় বড় ইহাতে পাওয়া যায় না। তবে সংস্কৃতে অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত অনেক স্থলেই দেখা যায়।

যাহা হউক, এই পুস্তকখানির প্রণয়ন কাল নির্ণয় সম্বন্ধে আমি কোনই সুবিধা করিতে পারি নাই। যদি কেহ এ বিষয়ে কোন সাহায্য করিতে পারেন, তবে সুখের বিষয় হইবে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিকানীরে মহোৎসব।

বিকানীর রাজপুতানার একটী প্রসিদ্ধ দেশী রাজ্য। ইহার পরিধি ২৪ হাজার বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ছয়লক্ষের অধিক। বার্ষিক আয় একুশ লক্ষ টাকা। পশমি বস্ত্র, পাথর, হস্তি দন্ত, পিতল ও অন্যান্য শিল্প দ্রব্যের জন্য বিকানীর প্রসিদ্ধ। চুরু, রাজগড়, রত্নগড় ও রেণী এই কয়টী বিকানীর রাজ্যের প্রধান সহর। বিকানীর রাজধানী। ইহার চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রস্তরময় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই প্রাচীর পাঁচ হইতে দশ গজ পর্য্যন্ত উচ্চ ও দুই গজ প্রস্থ। পরিধি সাড়ে তিন মাইল। নগরের অনতিদূরেই প্রাচীন দুর্গ বর্ত্তমান। পঞ্চদশ শতাব্দিতে যোধপুর নগর নির্ম্মাতা যোধাজীর পুত্র বিকাজী এই নগর নিজ নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫০৪ সালে বিকাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ এই রাজ্যের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। মোগল শাসনকালে আরও উন্নত হইয়াছিল। যে সকল রাজপুত রাজা মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আকবর বাদসাহকে সাহায্য করিয়াছিলেন বিকানীর রাজা তাঁহাদের অন্যতম। আকবর বিকানীর রাজাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন ও আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময় মোগল ও বিকানীর রাজবংশ পরস্পর প্রীতিসূচক সন্ধি দ্বারা আবদ্ধ ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিকানীর রাজ্যও পতনোন্মুখ হইয়া পড়িল। ঘরোয়া বিবাদই ইহার প্রধান কারণ। ১৮১৮ সালে বিকানীর রাজ্য একেবারে হীনবল হইয়া পড়ে। ঐ সালে রাজপুতানার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য লইয়াছিল। বিকানীর রাজাও তাহাই করিলেন। তখন হইতে বিকানীরের মহারাজ ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন। আফ্‌গান ও শিখ যুদ্ধের সময় বিকানীরের মহারাজা রত্নসিংহজী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় মহারা[জ] সরদারসিংহ ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করি[য়া]ছিলেন। দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে, মহারা[ণী] ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে শাসন ভার লইলে গবর্ণমে[ণ্ট] হইতে মহারাজ সরদারসিংহকে পুরস্কারস্বরূপ বি[স্তর] জাইগীর প্রদান করা হইয়াছিল। ১৮৭২ সা[লে] মহারাজ সরদারসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার কো[ন] সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার বিধবা পত্নী ভার[ত] সরকারের অনুমতি লইয়া মহারাজ ডুঙ্গরসিংহ[কে] সিংহাসনে বসাইলেন। ইনিও অপুত্রক অব[স্থায়] ১৮৮৭ সালে পরলোক গমন করেন। কিন্তু ই[নি] জীবিতাবস্থায় নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বর্ত্তমান মহারা[জ] গঙ্গাসিংহজীকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৮০ সালে মহারাজ গঙ্গাসিংহের জন্ম [হয়]। ইনি আজমিরের মেও কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হই[য়া]ছিলেন। আঠার বৎসর বয়সে ইনি রাজ্যাধি[কার] প্রাপ্ত হন। ইনি একজন প্রকৃত বীর পুরুষ। স[কল] সময়ে যুদ্ধবিগ্রহতেও ভারত সম্রাটকে সাহা[য্য] করিয়াছেন! ১৯০১ সালে চীন দেশে নি[জ] (Camel Corps) উষ্ট্র সওয়ার সেনার সহিত [যুদ্ধ]ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে এই সে[নার] সহিত সোমালিল্যাণ্ডেও গমন করেন। ইনি এক[জন] প্রজাবৎসল সুশাসক রাজা, পূর্ব্বাপেক্ষা রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ইঁহার রাজ্যে প্রথমে রেল ছিল না, উষ্ট্র দ্বারাই সমস্ত কা[র্য্য] নির্ব্বাহ হইত। ইনি বিকানীরের মরুভূমিতে [রেল] বিস্তার এবং শিক্ষা প্রচারের সুবন্দোবস্ত করি[য়া]ছেন। ভারত সরকার অনেকবার ইঁহার [প্র]শংসা করিয়াছেন। ইঁহাকে প্রথম শ্রেণীর কাই[সর-ই-]হিন্দ পদক ও জি, সি, আই, ই, কে, সি, আই, [ই,] সম্মানসূচক উচ্চ উপাধি প্রদান করা হইয়া[ছে।] মহারাজের রাজত্বকাল ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া[য় এই] বৎসর ২০এ হইতে ২৮এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বিক[ানীর]

রাজ্যে মহোৎসব হইয়াছিল। বনভোজন, কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয়, শোভাযাত্রা, আলোকমালায় নগরী সজ্জিত, বায়স্কোপ, সৈনিকদিগের কুচ কাওয়াজ প্রভৃতি বহুবিধ ক্রীড়া কৌতুকে প্রজাদিগের মনোরঞ্জন করা হইয়াছিল। পাঠশালায় পারিতোষিক বিতরণ ও পোলো খেলার খুব ধূম হইয়াছিল। ২৪এ সেপ্টেম্বর মহারাজকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। সেইদিন প্রাতঃকালের দরবারে মহারাজ স্বয়ং প্রজাদের সুবিধার জন্য অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিয়াছেন। বিকানীরবাসীরা মহারাজের প্রস্তাবগুলি অতিশয় আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণের কৌতূহল নিবারণের জন্য তাঁহার প্রস্তাবগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) প্রজা প্রতিনিধি সভা গঠিত হইবে। ইহার দ্বারা রাজ্যের আয় ব্যয় ও আইন কানুন সম্বন্ধে এবং আপনাদের হিতকর কার্য্যে প্রজারা তাহাদের প্রতিনিধি দ্বারা মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবে।

(২) দেওয়ানীর ছোট ছোট মোকদ্দমা বিচার করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে।

(৩) অনতিবিলম্বে রাজদপ্তরে হিন্দি ভাষা ও নাগরি লিপির প্রচার হইবে।

(৪) ধান্যের উপর যে কর বসান ছিল—যাহার আয় বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা—তাহা একেবারে রহিত করা হইবে।

(৫) যে সমস্ত জহরত ও স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার নিজ ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত হইবে তাহার উপর আর কর দিতে হইবে না।

(৬) পিত্তল ও প্রস্তরের উপর যে কর ধার্য্য ছিল তাহা হ্রাস করা হইবে।

(৭) শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সুবিধা করা হইবে। শিক্ষাবিভাগে একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইবে। দরবার হাইস্কুলকে কলেজে পরিণত করা হইবে। সরদার স্কুলের ছাত্র বৃদ্ধি করা হইবে, এবং পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি বোর্ডিং নির্ম্মাণ করা হইবে। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে।

(৮) রাজধানীতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য হাস্পাতাল খোলা হইবে। রাজ্যের অপরাপর স্থানেও হাস্পাতাল নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইবে।

প্রজাবৎসল মহারাজের এই অশেষ কল্যাণকর প্রস্তাব গুলি যখন কার্য্যে পরিণত হইবে, তখন বিকানীরবাসীদের সুখ স্বচ্ছন্দতা সবিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। মহারাজ আপন দপ্তরে হিন্দি ভাষা প্রচার করিলে, প্রজাবর্গের অনেক অসুবিধা দূর হইবে। হিন্দির পক্ষপাতী মহারাজ এই কার্য্য সম্পাদন করিতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আশা করি, মহারাজ হিন্দি সাহিত্যের উন্নতি কল্পে আরও বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বাস।

সংসারের নানা কাজে নানা কোলাহলে,
তোমারে ভুলিয়া যাই প্রতি পলে পলে।
দিবা-অবসানে যবে একান্ত নির্জ্জনে,
তোমারে ডাকিব বলে বসেছি আসনে,—
তখনো চঞ্চল মন নাহি রহে স্থির,
ধায় কার পিছু পিছু—কোন্ পৃথিবীর!
তোমার অনন্ত বিশ্ব নিমেষে আমারে
স্মরণ করায়ে দেয়—তুমি আছ ধারে!

ভুলে থাকি তাহে ক্ষতি বেশি কিছু নাই,
অবিশ্বাসী করিয়োনা এই শুধু চাই।
চিরকাল তোমা'পরে অটল বিশ্বাস,
বিরাজ করুক্ হৃদে এই শুধু আশ।
নিরাশ করোনা মোরে হে আমার প্রভু,
নাস্তিক করিয়া নাথ, দহিয়োনা কভু!

শ্রীসুব্রত নন্দী।

চাঁদ রায় কেদার রায়ের সময়ে বিক্রমপুরের অবস্থা।

ষোড়শ শতাব্দী বিপ্লবের যুগ। সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ নামেমাত্র মোগলের অধীন হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, কারণ চাঁদ রায় ও কেদার রায় মোগলের বশ্যতাস্বীকার না করিয়া স্বাধীন ভাবেই বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। মোগলের প্রভাব সে সময়ে বিক্রমপুর অঞ্চলে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই; বরং পাঠান রাজগণের শাসন নীতি ও অন্যান্য আচার পদ্ধতি কিয়ৎ পরিমাণে এ অঞ্চলে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শাসন নৈপুণ্যে মোগলেরা পাঠানদের অপেক্ষা বহুল পরিমাণে উন্নত থাকিলেও তাহাদের কোন রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি, শিল্প-ভাস্কর্য্য স্থাপত্য সাহিত্য সমাজ শাস্ত্র শাসন সমুদয়ের জন্যই রায় রাজগণ প্রশংসা বা নিন্দাভাজন ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে।

চাঁদ রায়ের মৃত্যু ১৫৮৬ খ্রীঃ অঃ সংঘটিত হয়। ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ স্থল, সমগ্র বিক্রমপুর পরগণা, কার্ত্তিকপুর, চাঁদপুর, ইদিলপুর, সাহাবাজপুর এবং সনদ্বীপ রায় রাজগণের করতলগত ছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তাঁহারা শাসন ও সংরক্ষণ করিতেন। রাজ্যের উন্নতিকল্পে এবং বিক্রমপুরবাসীর সুখ সুবিধার জন্য ইঁহারা নানারূপ যত্ন করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই পর্ত্তুগীজ, মগ, পাঠান ও মোগল সৈন্যগণের বিবিধ নির্য্যাতনের হস্ত হইতে নিজ নিজ প্রজাগণের মান-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত রায় রাজগণকে বিশেষরূপে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। এজন্য ইঁহারা সর্ব্বাগ্রে স্বীয় রাজধানীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে দুর্গের শেষ চিহ্ন কীর্ত্তিনাশা স্বীয় উদর গহ্বরে চিরদিনের জন্য গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গ হইলেই দুর্গ রক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন—সেজন্য বিপুল সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। সৈন্য সংখ্যাও ছিল প্রচুর।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের অধিকারভুক্ত স্থান।

শাসন-নীতি।

তৎপর বিক্রমপুর নদী মাতৃক দেশ, ইহার দক্ষিণ দি... সে সময়ে প্রকৃতই বিশাল বারিধির অঙ্গীভূত ছি... ডাক্তার ওয়াইজ তৎকালীন বিক্রমপুরের প্রাকৃতি... অবস্থা বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—"It was then a... open sea to the south of Vikrampu... নদ নদী সঙ্কুল দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নৌ-বা... বিশেষ প্রয়োজন, এজন্য রায় রাজগণ বহু নৌসৈ... রণতরী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রচুর পরিমা... নৌবল ও সৈন্যবল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। উপকূলব... রাজ্যের নৌবলের একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বাণি... ব্যপদেশে আগত নৌ-সমর কুশল পর্ত্তুগীজগণে... সহিত বিবিধরূপে সদ্ভাব সংস্থাপন করিয়া রায়রাজগ... নিজ নিজ নৌসৈন্য, রণতরী এবং পদাতিক সৈনি... গণকে দেশীয় ও বিদেশীয় উভয়রূপ সমর-কৌ... শিক্ষাদান করিয়া মোগলের গতিরোধে সমর্থ হই... ছিলেন।

যে দেশে যে জিনিষের প্রয়োজন, সেই দেশে... নরনারী সে সমুদয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে বা গঠনেও বি... নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। বিক্রমপুর ন... মাতৃক দেশ বলিয়া এ স্থানের নৌ-শিল্পীগণও ত... গঠনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিত। শ্রীপুর নৌ-... শিল্পের কেন্দ্রভূমি ছিল। এই স্থানে নানা জা... তরণী-শ্রেণী নির্ম্মিত হইত। কার্ভালোর রণতরী... মগদিগের সহিত যুদ্ধে বিধ্বস্ত হইলে সে সক... পুনর্গঠনের জন্য তাহাকে শ্রীপুরে আসিতে হই... ছিল। তৎকালে শ্রীপুরে কোষা, জল্বা, ... পারেন্দা, বজ্রা, পাতেলা, সলব, জেলে, পা... বহর, বালাম, খাটকুড়ি, মহালকুড়ি, পালও... জঙ্গিখালু, ভাওয়ালী, হান্দী, ছিপ, ডিঙ্গী, ... কুমারিয়া, ঘাসী, সরঙ্গা, কোন্দা, ঢুটা, ভেদী, ... ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণীর তরী প্রস্তুত হইত। ... ছিপ জেলে ইত্যাদি যুদ্ধার্থে ব্যবহৃত হইত। ... ইত্যাদি আবার আগ্নেয়াস্ত্রেও সুশোভিত হ...

...নৌ-পরিচালনে পূর্ব্ববঙ্গের মাঝিগণ বিশেষ দক্ষ ছিল। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে কবিকঙ্কণ, কেতক দাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি কবিগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে বাঙ্গাল মাঝিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই। সমুদ্র গমনেও পূর্ব্ববঙ্গের অর্থাৎ বিক্রমপুরবাসী মাঝিগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিত। সেকালে ডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্য ব্যপদেশে বিভিন্ন দেশে গমন বিষয়ে নানা উপাখ্যান, নানা গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ধনপতি সওদাগর সিংহল যাত্রার সময় সঙ্গে যে সমুদয় নাবিক লইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিল। তাই মগড়ার ভীষণ ঝড়ে ডিঙ্গা-নাশে নাবিকদের রোদনে দেখিতে পাই;—

"কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাফোই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে শিরে দিয়া হাত।
হল্দী গুড়া হারাইলা শুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে বড় লাগে মায়া মো।
বিদেশে রহিলুঁ না দেখিলুঁ মাও পো॥
আর বাঙ্গাল বলে আমি অই তাপে মৈল।
কালী গুরী তুটী কাগু সেই কোথা গেল॥

শ্রীপুরে সেকালে নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মিত হইত, এমন কি কামান পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইত। চন্দ্রদ্বীপ রাজবাটীতে একটী পিত্তল নির্ম্মিত কামান বিদ্যমান আছে। ঐ কামানের গায়ে রাজা কন্দর্পনারায়ণের নাম ও '৩১৮' এইরূপ এবং নির্ম্মাতা রূপিয়া খাঁ—সাং শ্রীপুর এই কথাগুলি লিখিত আছে। এই কামানটির দৈর্ঘ্য ৭৮ ফিট, বেড় ২' ফিট, মধ্যভাগের ব্যাস ১৯॥ ইঞ্চি।* ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীপুর নগরীতে যে নানা শ্রেণীর শিল্পীগণের সমাবেশ ছিল, ইহা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়। কেদার রায়ের রণতরীসমূহ শ্রীপুরে নির্ম্মিত আগ্নেয়াস্ত্র সমূহেই সুসজ্জিত হইত।

একদিকে যেমন শিল্পীর বাস হেতু শ্রীপুর সর্ব্বপ্রকার শিল্পকলায় সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ বিবিধ স্থাপত্য শিল্পেও বিক্রমপুর তৎকালে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। শ্রীপুরের কোটীশ্বর ও অন্যান্য বিবিধ হর্ম্ম্যরাজী এবং রাজাবাড়ীর মঠ অদ্যাপি তৎকালীন স্থাপত্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মঠ বাঙ্গালা দেশের আর কোথায়ও বিদ্যমান নাই। ভাস্কর্য্য শিল্পের অবনতি ষোড়শ শতাব্দীর বহু পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয়। এ যুগে তাহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্ত্র-শিল্পের জন্যও শ্রীপুর বিশেষ বিখ্যাত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রথম ইংরেজ পরিব্রাজক রাল্ফ ফিচ্ বঙ্গদেশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি শ্রীপুরের বস্ত্র-শিল্পের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"Great store of cotton cloth is made here"। ষোড়শ শতাব্দীতে যে বিক্রমপুর সর্ব্ব দিক দিয়াই কমলার ভাণ্ডার রূপে পরিগণিত হইত, তাহা উক্ত শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গদেশ ভ্রমণকারী ইতালী দেশবাসী লুডিভিকো ডি ভারথেমার ভ্রমণ-কাহিনী হইতেও বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। এদেশে যেমন শস্য, চিনি, তুলা, আদা ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য ও পশুপক্ষীর সংখ্যা প্রচুর, এরূপ পৃথিবীর আর কোথাও নাই।†

স্থাপত্য-শিল্প।

বস্ত্র-শিল্প।

যুদ্ধার্থে সে সময়ে তীর ধনু, বন্দুক, কামান, লাঠি সড়্কি, ঢাল তরোয়াল, শূল (সুলী) ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত। বিক্রমপুরের তীরন্দাজ ও লাঠিয়ালগণ বিশেষ খ্যাতিমান ছিল।

অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি।

ধর্ম্ম বিষয়ে এ যুগে বিবিধ আন্দোলন উপস্থিত হয়। চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম এ সময়ে কাঠকাটা বা কাঠাদিয়া গ্রাম নিবাসী জগন্নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ বিক্রমপুরাঞ্চলে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। হিন্দু সম্প্রদায় সাধা-

ধর্ম্ম-সংস্কার, সমাজ পূজা-পার্ব্বণ-ব্রত নিয়ম ইত্যাদি।

*J R. A. S. B. P. 207 187

† The Travels of Ludivico di verthema.

রণতঃ বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীস্থ জনসাধারণই বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বন করিত। রায়রাজগণ তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য ছিলেন। এই সময়ে তন্ত্রমত অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। গোঁসাই ভট্টাচার্য্য, ব্রহ্মানন্দগিরি, সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি তান্ত্রিক মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি প্রভাবে অধিকাংশ নরনারীই তান্ত্রিক মতে দীক্ষালাভ করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দের 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' ও সর্ব্বানন্দের 'সর্ব্বানন্দ তরঙ্গিণী' এই যুগে বিরচিত হয়।

তন্ত্রের বিবিধ সদসৎ অনুষ্ঠানও এ সময়ে এ

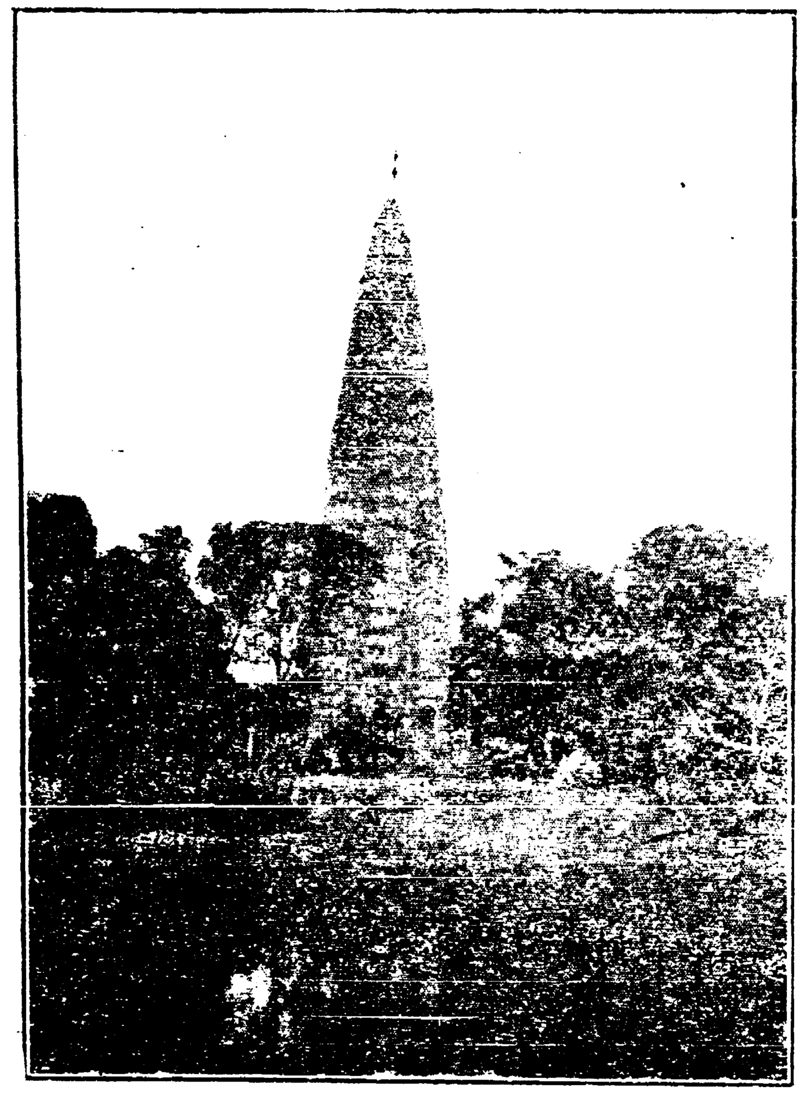

আউটসাহীর মঠ।
(সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্ম্মিত)

অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। নরবলি, পঞ্চ মকার সাধন খুবই ছিল। এখনও বিক্রমপুর অঞ্চলে তন্ত্রের যত বিভিন্ন গ্রন্থরাজি দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্গের আর কোথাও তাদৃশ আছে কিনা বিশেষ সন্দেহস্থল। বিশেষ রায় রাজগণ তান্ত্রিক গুরুর শিষ্য ছিলেন বলিয়া রাজানুগ্রহ লাভ আশেও অনেকে উক্ত মতানুসারে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। রাজ্য শাসন-সংরক্ষণে ইহাঁরা প্রাচীন হিন্দু রিত্যানুযায়ী শাসন-সংরক্ষণ করিতেন। ব্রাহ্মণের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ প্রায়শঃই ব্রহ্মোত্তর ইত্যাদি পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইতেন। রাজপথ নির্ম্মাণ, জলাশয় উৎসর্গ, দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান সেকালের পুণ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। গুরুতর অপরাধীগণের প্রতি শূলে আরোপিত করিয়া কিংবা জল্লাদ দ্বারা গর্দ্দান লইবার ব্যবস্থা ছিল। চৌর্য্য ইত্যাদি তখন খুব অল্পই অনুষ্ঠিত হইত, কারণ সকলের ঘরেই খাবার থাকিত। প্রচুর শস্য জন্মিত, মৎস্য, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, লবণ ইত্যাদি এত সুলভ ছিল যে সেকালের নর-নারী অতি সামান্য

রাজাবাড়ীর মঠ।
(চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের মাতৃ শ্মশানোপরি নির্ম্মিত—ষোড়শ শতাব্দীর স্থাপত্য কলার অপূর্ব্ব নিদর্শন)

মাত্র আয়ে বার মাসের তের পার্ব্বণ নির্ব্বাহ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। বিক্রয়ের জন্য অধিকাংশ স্থলেই কড়ি ব্যবহৃত হইত। রায় রাজগণ কোনরূপ মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে বিশেষ কোন বিবরণ জানিতে পারি নাই, আর করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের প্রচলিত কোন মুদ্রা হস্তগত করিতে পারি নাই।

সামাজিক দলাদলি খুবই ছিল। সামান্য কারণেই

জাতঃপাত করিতে একালের ন্যায় সেকালের ব্রাহ্মণগণও বিশেষ পটু ছিলেন। বর পণের পরিবর্ত্তে কন্যাপণ সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা-বিবাহও হইত। সমাজে নানাজাতীয় লোকের বাস ছিল। স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কামার, লৌহ কর্ম্মকার, সাহা, তিলি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ ব্যবসার দ্বারা সবিশেষ উন্নতি লাভ করিত। এক দিকে যেমন দেশে প্রচুর শস্য জন্মিত এবং সমুদয় জিনিষপত্রই সুলভ ছিল, তেমনি আবার একবার ভালরূপ শস্য না হইলেই দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত, কারণ আমদানী বা রপ্তানী হইবার সুযোগ ছিল না। এই জন্যই মনুষ্য বিক্রীর প্রাচীন দলিল ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সমৃদ্ধ গৃহস্থেরই নফর বা সিক্‌দার থাকিত। দান ধ্যান না করিত এমন গৃহস্থ কেহই ছিল না—মুষ্টি ভিক্ষা দান, অতিথি সেবা, জলদান, ফলদান ইত্যাদি সাধারণ রীতি ছিল।

দস্যু ডাকাতের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও জন-সাধারণ তাদৃশ ভীত হইত না, কারণ তাহার প্রতীকারের উপায়ও প্রতি গৃহেই থাকিত। সেকালে সকলেই কুস্তী, লাঠি খেলা, বন্দুক চালান, সন্তরণ ও বন্দুকের ব্যবহার জানিত, কাজেই দস্যুদল অতর্কিতভাবে গৃহস্থের বাড়ী আক্রমণ করিলে গৃহস্থগণ ভীত হইত না, প্রতীকার করিতে পারিত। দস্যুগণ একেবারে কপর্দ্দক বিহীন করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হইত না।

পূজা-পার্ব্বণ এবং আমোদ-প্রমোদও খুব ছিল। কবির গান, যাত্রা, পাঁচালী, মনসার ভাসান গান, হরি-সংকীর্ত্তন, চড়ক-পূজা, দুর্গোৎসব, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, হোরীর গান, ভাসান-যাত্রা, ত্রিনাথের গান ইত্যাদি আমোদ ও উৎসব বিশেষরূপে দেশবাসীর আনন্দবর্দ্ধন করিত। মহিলা বারব্রতগুলি বর্ত্তমানেও যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, তখনও তেমনি ছিল। সেকালে চতুষ্পাঠির পাঠ সমাপন করিয়া লোকে বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ এ উভয় স্থান হইতেই উপাধি প্রাপ্ত হইত। ন্যায়লঙ্কার, তর্কালঙ্কার, বিদ্যাভূষণ, তর্কভূষণ, ন্যায়চঞ্চু ইত্যাদি উপাধির বিশেষ সমাদর ছিল। অল্প অল্প পার্সীরও প্রচলন ছিল। রাজকার্য্যও বাঙ্গলা ভাষাতেই সুসম্পন্ন হইত।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গৌতম।

(১)

জন্ম :—

নগরী কপিলামাঝে উঠিল ধ্বনিয়া
লক্ষ শঙ্খ মঙ্গল নিনাদ
ঘুচি বিশ্ব মানবের, শাক্য নৃপতির
গ্লানিময় সর্ব্ব অবসাদ।
"মুছাইতে জগতের তপ্ত-আঁখিধার
এসেছেন বোধি-সত্ত্ব মুক্তি-অবতার।"

(২)

ক্রীড়া :—

সুবিশাল রাজপুরী করি মুখরিত
করে ক্রীড়া যতেক কিশোর;
গৌতম তো নাহি সেথা সে ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে
সেত নহে সে ভাবে বিভোর!
"কোলাহলময় পুরী হ'তে দূরে সরি'
সে যে রত মহাযোগে জগত বিস্মরি।"

(৩)

প্রকৃতি :—

আকাশ পথিক হংস পক্ষ বিস্তারিয়া
করিতেছে দিগন্তে প্রয়াণ,
কার বজ্রাঘ'তে পড়ি' ভূমে গতিহীন
গাহে হায় মরণের গান!
"রক্তাপ্লুত পক্ষী দেহ হৃদয়ে টানিয়া,
কাঁদে শিশু মানবের প্রকৃতি স্মরিয়া।"

(৪)

সংসার ত্যাগ :—

রোগ, শোক মানবের জরা, মৃত্যু আর
যুগপৎ করি নিরিক্ষণ,
শাশ্বত নির্ব্বাণ-পথ আবিস্কার তরে
চিন্তামগ্ন রাজেন্দ্র নন্দন,
"পত্নী, পুত্র প্রাণসম রাজ নিকেতন,
তেয়াগিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্য বরিলা কানন।

(৫)

সাধনা :—

পণ্ডিতের শাস্ত্রনীতি দুরূহ জটিল,
তার্কিকের বচন চাতুরী,
কহে না সরল ভাবে তত্ত্ব নির্ব্বাণের
সেথা নাহি মিলিল মাধুরী,
"বোধিদ্রুম ছায়ে বসি স্তিমিত নয়ন
খুঁজে বুদ্ধ মুক্তিপথ শাশ্বত মোহন।"

(৬)

ধর্ম্মপ্রচার :—

প্রচারিছে নব ধর্ম্ম নগরে নগরে
ক্ষৌমবাস নবীন তাপস,
দূর দূরান্তর হ'তে লক্ষ নরনারী
লভিবারে নব ধর্ম্ম রস,
শুনিবারে পুণ্যময় গাথা নির্ব্বাণের
ছুটে আসে পদতলে মহা যোগীন্দ্রের।

(৭)

নির্ব্বাণ :—

অশীতি বর্ষের সাক্ষী নব ধর্মদেব
মুক্ত আত্মা নির্ব্বাণ আসনে ;
ভাতিছে মঙ্গলময় জ্যোতিঃ স্বরগের
তেজদীপ্ত সে দেব বয়ানে,
"চতুর্দ্দিকে বাষ্পাকুল অর্ব্বুদ নয়ন
নেহারিছে চিরতরে শ্রীবুদ্ধ চরণ।"

শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী।

স্ত্রীশিক্ষা সমস্যা।

সকল দেশে সকল সমাজে একটা সময় আসে যখন সমাজের গতির কোন স্থিরতা থাকে না, নিয়ম থাকে না, শৃঙ্খলা থাকে না, আমাদের দেশে সেই সময় আসিয়াছে। সমাজের কতক লোক পুরাতন আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী, কতক লোক নূতন আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী, আবার কতক লোক দুইটাকেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজেদের মনোমত ও সুবিধা মত পন্থা অবলম্বন করিতেছেন। কোনটা শ্রেয়ঃ সে কথার বিচার করা এক্ষণে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কারণ আমাদের মত সামান্য লোক যাহাদের মতামত সমাজের বিবেচনার মধ্যেই আসে না, তাহাদের সে বিচারে কোন ফল নাই। এক্ষণে সমাজের এই বিশৃঙ্খলতায় মেয়েদের কি ভাবে চরিত্র গঠন করা যায়, সে সম্বন্ধে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। কোন দিকে তাহাদের মনের গতি ফিরান কর্ত্তব্য, কিরূপ অভ্যাসে তাহাদিগকে অভ্যস্ত করা যায়, সেই সমস্যার মীমাংসা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এক্ষণে প্রায় অনেকেই বোঝেন ও তাহার জন্য মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেও অনেকে সচেষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকে মনে করেন শিক্ষার অর্থ ভাষা শিক্ষা এবং শিক্ষিতার অর্থ যে স্ত্রীলোক কোন এক বিশেষ ভাষায় সুপণ্ডিতা। কিন্তু যথার্থ পক্ষে তাহাকে শিক্ষা বলা যায় না। শিক্ষা তাহারই নাম যাহাতে মানুষের চরিত্র গঠিত হয় ও মনের উন্নতি সাধন হয়। সুতরাং যখন শিক্ষাতে চরিত্র গঠিত হয়, তখন দেখিতে হইবে আমরা মেয়েদের কিরূপ চরিত্র গঠন করিতে চাই, কিরূপ স্বভাবের মেয়ে এখনকার সমাজের উপযোগী, এবং তাহা বিবেচনা করিয়া মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ মেয়েদের স্বভাব সমাজের ও পুরুষদের মতানুযায়ী না হইলে মেয়ে ও পুরুষ উভয় পক্ষেরই কষ্টকর; বিশেষ ভাবে মেয়েদের। কিন্তু সেইটাই হইতেছে সমস্যা, কিরূপ ভাবে মেয়েদের স্বভাব গড়া যায়?

মনে করুন, আমি পুরাতন হিন্দু আদর্শে মেয়েকে শিক্ষা দিলাম। আমার কন্যা রন্ধনে সুপটু, গৃহকর্ম্মে নিপুণা এবং সন্ধ্যা আহ্নিক ব্রত পুজার দিকেই তাহার মন। কিন্তু সে জানে না কিরূপে নব্য ধরণে সাড়ী পরিতে হয়, জুতা পায় দিতে সে একেবারেই অনভ্যস্ত, গাইহিল ত দূরের কথা। হারমোনিয়ম কি পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিবার কল্পনামাত্রে সে লজ্জায় লাল হইয়া উঠে। শূদ্রের ছোঁয়া অন্ন ছুঁইলে সে স্নান করে, মুসলমানের অন্নের ত কথাই নাই। কন্যা অতীব লজ্জাশীলা, অধিক কথাবার্ত্তায় অপটু, বেশ বিন্যাসে মনোযোগশূন্যা। কিন্তু ভবিতব্যের কথা কেহ বলিতে পারে না, কন্যার বিবাহ হইল, জামাতা আমার নব্যধরণের, হয়ত বা বিলাত ফেরত। এই দুইটি দম্পতি কি কখনও সুখী হইতে পারে? আমার কন্যার সেই লজ্জাশীলা বধূমূর্ত্তিতে কি জামাতার তৃপ্তি হইবে? তাহার আচার নিষ্ঠা জামাতার কুসংস্কার বলিয়া মনে হইবে, এবং সেজন্য তাহার প্রতি অশ্রদ্ধার উদয় হইবে। যদি জামাতা বড় উদার স্বভাবের হন ত, না হয় কিছুদিন তাহাকে নিজের মনের মত করিবার চেষ্টা করিবেন কিন্তু আমার অনভ্যস্থা কন্যা যখন তাহাতে অপারগ হইবে তখন তাঁহার মন কোথায় আকৃষ্ট হইবে কে জানে? হায়, কত সংসারের সুখ শুধু এই এক কারণে নষ্ট হইয়াছে। আর আমার কন্যারই কি, তাহাকে ভাল লাগিবে? স্বামী যখন মুসলমানের খানা খাইয়া সেই কাপড়ে—হয়ত আচমন পর্য্যন্ত না করিয়া—গৃহে আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবে তখন সে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে। যখন দেখিবে তাহার আচার নিষ্ঠার জন্য সে তাহার স্বামীর উপহাসভাজন, অবজ্ঞার পাত্রী তখন তাহার কি মনে হইবে? অথচ সে আজন্মের সংস্কার ছাড়িতেও পারে না, তাহার সমস্ত মনোবৃত্তি তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, অথচ তাহার নিজের ধারণা মতই সেই স্বামী তাহার জীবন্ত দেবতা! কিন্তু সেই দেবতার মনস্তুষ্টি সাধন তাহার অসাধ্য সুতরাং মৃত্যু ভিন্ন আর কোথায়ও তাহার শান্তি নাই। জীবনের আরম্ভেই সে জীবন শেষের কামনা করিবে।

এখন মনে করুন, আমার কন্যার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আপনি আপনার কন্যাকে পাশ্চাত্য আদর্শে শিক্ষিতা করিলেন। আপনার কন্যা পোষাকে পরিচ্ছদে রুচিতে সম্পূর্ণ নব্য ধরণের। গাহিতে বাজাইতে পারে, শিল্পকর্ম্মে নিপুণা, সরস কথাবার্ত্তায় সকলকে আমোদিত করিয়া তোলে, ইংরাজী লেখা পড়ায় সুদক্ষা ইত্যাদি। কিন্তু হয় ত আপনার কন্যার জন্য নানাপ্রকারে উপযুক্ত যে পাত্রটি মিলিল সে পাত্রটি এবং তার পরিবারস্থ সকলে একেবারে পুরাতন আদর্শের। কন্যা শ্বশুরালয়ে গেল। প্রথমেই বধূর পায়ে জুতা দেখিয়া ত সকলে একেবারে ছি ছি করিয়া উঠিল, জুতা খুলিয়া দেওয়া হইল। শুধু পায়ে চলিতে তাহার কষ্ট হইতে লাগিল এবং স্বামীও সকলের মতে সায় দিলেন দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। তারপর সকালে যখন বধূকে পূজার সাজ করিতে বলা হইল, তখনত বধূর চক্ষু স্থির। সেত জানে না পূজার সাজ কি করিয়া করিতে হয়। তখন সকলে একবাক্যে "ওমা সে কি গো পূজার সাজ করিতে জান না, খ্রীষ্টান নাকি?" বলিয়া ধিক্কার দিয়া উঠিল। তারপর হয়ত কেহ অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা এস আমি দেখিয়ে দিচ্চি"। বৌ যেমন কাপড় পরিয়াছিল তেমনি ঠাকুর ঘরে গিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, "ওমা একি, ও কাপড়ে ঠাকুর ঘরে ঢুকচ কি!" বৌ বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "কেন আমার ত বেশ ফরসা কাপড়।" "ওমা এ কোথাকার মেম গো, ও কাপড়ে কি ঠাকুর ঘরে আসতে আছে, যাও জামা কাপড় ছেড়ে শুধু একখানা গরদের কাপড় পরে এস।" বৌ বলিল, "সে কি, খালি গায়ে? সে আমি পারব না।" তখন সকলে বৌয়ের অপরাধ অমার্জ্জনীয় মনে করিল, অথচ বৌ তাহার অন্যায় কোথায় দেখিতে পাইল না। ঘোমটা দিতে বৌ হাসিয়াই অস্থির, হয়ত ভাসুরের সম্মুখে একদিন মুখ খুলিয়া উপস্থিত, সকলে ছি ছি করিয়া উঠিল "এমন বেহায়া বৌত কোথায়ও দেখি নাই।" মাটিতে বসিয়া খাইতে অনভ্যস্ত বৌ শ্বশুর বাটীর নিয়মের খাতিরে কষ্টে মাটীতে বসিয়া খাইতেছে কিন্তু ভাত খাইতে খাইতে বাম হাতে গেলাস ধরিয়া জল খাইয়া সেই হাত কাপড়ে মুছিল। এবারে সকলে যথার্থ হায় হায় করিয়া উঠিল "এ বাড়ীতে

শেষে এমন বৌ আসিল।” বধূ ক্রমাগত তাহার প্রতি দোষারোপে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল এক্ষণে মনঃকষ্টে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল। কারণ সেত কোথায়ও নিজের দোষ দেখিতে পাইতেছে না বরং শ্বশুরবাটীর নিয়মের জন্য সে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াই থাকে। এদিকে অন্য সকলে বধূর উপর আরও বিরক্ত হইয়া উঠিল, সে দোষ করিবে আবার বলিলে পরে রাগ করিবে! সমস্ত দিন কেহ তাহাকে ডাকিল না, নিকটে গেল না, সমস্ত দিন একলা থাকিয়া সন্ধ্যার সময় স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়া সে স্বামীকে বলিল “আমার একলা থাকিয়া থাকিয়া বড় কষ্ট হইতেছে, আমায় একটু বেড়াইতে লইয়া চল।” স্বামী বলিলেন “সেকি হয়, আমি কি করে তোমায় বেড়াতে নিয়ে যাব সকলে কি বলবে?” বধূর আজ আর সহ্য হইল না, সে বলিল “কেন এতেও আবার কি দোষ? তোমার বাড়ীর সকলে বড় মুর্খ ওঁদের মন রেখে মানুষে চল্‌তে পারে না।” স্ত্রীর মুখে নিজ মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে মূর্খ বলিতে শুনিয়া স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিলেন “আমরা মূর্খই হই আর যাই হই যখন অদৃষ্ট দোষে আমাদের হাতে পড়েছ, তখন আমাদের মতেই চলতে হবে।” “তা জানি মরণ ভিন্ন আর কোন রকমে আমার নিস্তার নেই।” এই হইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। এই সকল দেখিয়া বুঝা যাইতেছে মেয়েদের এখন কেবলমাত্র সেকালের আদর্শে শিক্ষা দিলেও চলিবে না। আর কেবলমাত্র একালের পাশ্চাত্য শিক্ষা দিলেও চলিবে না। তাহাদিগকে দুই রকমেই গড়িতে হইবে, যাহাতে তাহারা তাহাদের স্বামী যে ধরণের লোক হইবে সেই ভাবেই নিজেদের মনকে সহজে ফিরাইতে পারে। আর তা নহিলে কেবল মনান্তরের সম্ভাবনা ও তাহাতে উভয় পক্ষেরই জীবন কষ্টকর হইয়া পড়ে। সুতরাং আমাদের মেয়েদের ড্রইংরুম সাজাইতে ও পুজার সাজ করিতে ড্রই শিখাইতে হইবে। রাঁধিতে শিখুক কিন্তু পিয়ানো বাজাইতেও শিখাইতে হইবে। হাই হিল জুতা পরুক কিন্তু খালি পায়েও যেন সে থাকিতে পারে আহারাদির বিষয়ে আচার নিষ্ঠা করুক, কিন্তু অন্যে বিদেশীয় আহারে যেন ঘৃণা না করে। আবার ধরি টেবিলে খায় খাক, কিন্তু আসনে বসিয়া ভা খাইতে গিয়া যেন বাঁ হাতে জল না খায় ও সেই হা কাপড়ে না মুছে। শুধু একখানি লালপেড়ে গর পরিয়া ব্রতপূজা করুক কিন্তু নব্যধরণে কাপড় পরি পার্টিতে যাইবারও যেন ক্ষমতা থাকে। সকলে সম্মুখে বাহির হউক কিন্তু ঘোমটা দেওয়াকে এক কিম্ভূত কিমাকার হাস্যকর ব্যাপার মনে করিতে শিখে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে শ্বশুর শাশুড়ীর অধীনে যেন থাকিতে শিখে কিন্তু তাহার সহিত আত্ম নির্ভর তাও যেন শিখে, বিনয়ী হউক কিন্তু আত্মসম্মা বোধও যেন থাকে। আবার নিউইয়ার্সডেতে কা পাঠাক্ কিন্তু বিজয়ার দিন গুরুজনবর্গকে প্রণা করিতে না ভুলিয়া যায়।

কিন্তু মেয়েদের যখন আমাদের দুই রকম আদ গড়িতে হইবে, দুই রকম শিক্ষা দিতে হইবে তখ তাহা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আমাদে দেশে মেয়েদের ১০।১১ বৎসরে বিবাহ হইয়া যা দুই রকম শিক্ষা ত দূরের কথা ভালরূপে কোনরক শিক্ষারই অবসর থাকে না। সুতরাং ইহার প্র বাল্যবিবাহ নিবারণ সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। আ বাল্যবিবাহ যে সমাজের একটি অনিষ্টকর প্রথা তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন কি দুংখের বিষয় ইহার সংস্কারে কেহই যত্নবান নহে কিন্তু সে বিষয় আজ এ প্রবন্ধের আলোচ্য ন সেজন্য এইখানেই ইহা শেষ করিলাম। *

শ্রীমনোরমা দেবী।

* প্রয়াগ স্ত্রী-মহামণ্ডলের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

সোমবংশীয় নৃপতিগণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল মধ্যপ্রদেশের পাটনা নামক দেশীয় রাজ্যে কোশল রাজ্যের সোমবংশীয় নৃপতিগণের চারিখানি শাসনপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে এই নৃপতিগণের আর ও ছয় খানি শাসনপত্র সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লীট সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। (ক) শেষোক্ত শাসনপত্রের মধ্যে চারিখানি মহাভব গুপ্ত ১ম, একখানি মহাশিব গুপ্ত এবং শেষখানি মহাভব গুপ্ত ২য় কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। নূতন চারিখানির মধ্যে একখানিতে মহাভব গুপ্ত প্রথমের নাম ও অবশিষ্ট তিনখানিতে মহাশিব গুপ্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত দশখানি শাসনপত্র বিশেষ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে আমরা দেখি যে, উহাদের ভাষা, বর্ণমালা বা লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য দেখা যায় না। কয়েকটি নূতন গ্রাম ও গৃহিতার নাম ব্যতীত আমরা কোনও নূতন ঐতিহাসিক তথ্যও উহাদের মধ্যে প্রাপ্ত হই না। পূর্ব্বোক্ত ফ্লীট সাহেব তাঁহার ছয়খানি শাসনপত্র সম্বন্ধে যে প্রকার মতামত প্রদান করিয়াছেন, এই নূতন চারিখানি সম্বন্ধে তদতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার নাই। যাঁহারা ফ্লীট সাহেবের ঐ প্রবন্ধ পাঠ করেন নাই, আমরা তাঁহাদের অবগতির জন্য এই নূতন শাসনপত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। আমরা অবশ্য অন্ধের মত ফ্লীট সাহেবকে অনুসরণ করি নাই। এই স্থানে আর একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। মহাভব গুপ্ত দ্বিতীয়ের অধীনে পঞ্জ নামক একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। কিলহরণ সাহেব ইঁহার প্রদত্ত একখানি তাম্র শাসনলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। (খ)

উপরোক্ত এগারখানি শাসনপত্রে আমরা চারিজন নৃপতির নাম দেখিতে পাই; (১) শিবগুপ্ত, (২) মহাভবগুপ্ত ১ম, বা জন্মেঞ্জয়, (৩) মহাশিব গুপ্ত বা যযাতি, (৪) মহাভব গুপ্ত ২য় বা ভীমরথ। ইঁহাদের মধ্যে পিতা পুত্র সম্বন্ধ অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রথমের পুত্র, তৃতীয় দ্বিতীয়ের পুত্র ইত্যাদি। ইঁহারা আপনাদিগকে সোম বা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইঁহাদের সকলের নামের শেষে “ত্রিকলিঙ্গেশ্বর” উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইঁহাদের প্রদত্ত সমস্ত ভূমি কোশল প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত দেখিয়া ইঁহাদিগকে কোশল রাজার শাসনকর্ত্তা বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ মহাভব গুপ্ত কোশলেন্দ্র বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উপরোক্ত এগারখানি শাসনলিপির মধ্যে পাঁচখানি পাটনা রাজ্যে ও অবশিষ্টগুলি কটক প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দানের একখানি গ্রাম দক্ষিণ কোশল দেশে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই সমস্ত ঘটনা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ঐ সময়ে কোশল রাজ্য মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যার কিয়দ্দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাশিব গুপ্ত এবং তাঁহার পুত্রের সনন্দ বিনীতপুর এবং যযাতি নগর নামক মহানদী কূলে অবস্থিত দুইটি স্থান হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে ফ্লীট সাহেব অনুমান করেন যে, উড়িষ্যাও এই নরপতিগণের অধিকারভূক্ত ছিল। তাঁহার মতে আধুনিক কটকই এক সময়ে ঐ দুই নামে পরিচিত ছিল, এবং ইহা যে এক সময়ে তাঁহাদের রাজধানী ছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার এই শেষ অনুমানের কারণ এই যে, মহাভব গুপ্ত ১ম, বিজয় কটক নামক স্থান হইতে সনন্দ লিপি প্রদান করেন।

এক্ষণে দেখা যাউক ফ্লীট সাহেবের এই অনুমানের কোনও বিশিষ্ট ভিত্তি আছে কি না। শাসন লিপিতে আমরা ‘মুরসীমসমাবাসিত শ্রীমতী বিজয়

(ক) Vide Ep'graphica Indica, Vol III, pages 323 to 3'9

(খ) Vide Epi Indica Vol IV, page 254.

কটকাৎ' এবং 'আরামসমাবাসিত শ্রীমতী বিজয় কটকাৎ' এই দুইটি ছত্র দেখিতে পাই। ইহাদের অর্থ আমরা এই ভাবে গ্রহণ করাই সমীচীন বলিয়া মনে করি। মুরসিম এবং আরামে অবস্থিত বিজয় শিবির হইতে অথবা শ্রীমান নৃপতির বিজয় শিবির হইতে যাহা মুরসিম এবং আরামে অবস্থিত ছিল। আমরা অনুমান করি, উক্ত নৃপতি মুরসিম এবং আরাম, নামক স্থানে বিজয় লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। সেই জন্য ঐ শুভবাসরে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। আর এক কথা, এই সোমবংশীয়েরা যদি দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উড়িষ্যার সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করা অসম্ভব কারণ ঐ সময়ে তথায় গঙ্গাবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেছিলেন।

যদি তাহাই হয়, তবে এই সকল নরপতি ত্রিকলিঙ্গেশ্বর উপাধি কেন গ্রহণ করিয়াছেন? কলিঙ্গ কি বর্ত্তমান উড়িষ্যা নহে? এই আপত্তি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। প্রাচীন কলিঙ্গ ও বর্ত্তমান উড়িষ্যার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। মহাভারতের মতে কলিঙ্গ দেশের উত্তর প্রান্তে বৈতরণি নদী ও দক্ষিণ দিকে আধুনিক ভিজিগাপট্টম অবস্থিত। সকলেই জানেন বৈতরণি পামেরা অন্তরীপের নিকট সমুদ্রের সহিত মিলিত হইতেছে। আধুনিক উড়িষ্যা উত্তরে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বৈতরণি হইতে সুবর্ণরেখা উড়িষ্যার প্রায় তৃতীয়াংশ। ইহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে প্রাচীন কলিঙ্গ ও আধুনিক উড়িষ্যা এক নহে। সোমবংশীয় নরপতিগণ কলিঙ্গ বা আধুনিক উড়িষ্যার দক্ষিণাংশের ভুস্বামী ছিলেন, কিন্তু সমগ্র উড়িষ্যা তাঁহাদের অধীন ছিল না। এই স্থানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। শাসনপত্রগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে আমরা দেখি যে, তাঁহাদের সময় কোশল দেশ 'ত্রিকলিঙ্গের' মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই বংশের সমস্ত নরপতির নামের শেষে আমরা 'ত্রিকলিঙ্গাধিপতি' বা 'ত্রিকলিঙ্গেশ্বর' প্রভৃতি উপাধি সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। কিন্তু কোশল ণ সম্বন্ধে কোনও প্রকার উপাধি আমরা তাঁহাদের নামের ঠিক পূর্ব্বে বা পরে আদৌ দেখিতে পাই না। কোশলেন্দ্র শব্দ কয়েক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার প্রয়োগ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, ঐ সকল নৃপতি কোশল দেশের নামে পরিচিত হইতে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন না। ইহাতে কি ইহাই মনে হয় না যে 'ত্রিকলিঙ্গ' শব্দ 'কোশল' শব্দ অপেক্ষা অধিকতর সম্মানজনক ছিল?

শাসনপত্রগুলির মধ্যে শিব গুপ্তের নাম আমরা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাঁহার কোনও দানের উল্লেখ আমরা কুত্রাপি দেখিতে পাই না। আমরা একটি বিষয়ে পাঠকগণ লক্ষ্য রাখিবেন। এই রাজার নামের পূর্ব্বে 'মহা' শব্দ সংযোজিত নাই। ইহা হইতে হয়ত আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ইহার সময় রাজ্যের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। তাঁহার পুত্র মহাভব গুপ্ত প্রথমের সহিত 'মহা' শব্দের উল্লেখ দর্শনে মনে হয়, এই সময়ে রাজ্যের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র মহাশিব গুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অজাপাল নামক জনৈক ভূপতিকে পরাজিত করেন, এবং চেদীবংশীয় জনৈক নরপতিকে নিহত করিয়া দহাল রাজ্য ধ্বংস করেন।

নিম্নে আমরা নূতন শাসন লিপিগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপ বিবরণ প্রদান করিলাম :—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই চারিখানি শাসন লিপি মধ্যপ্রদেশের পাটনা রাজ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক লিপি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ অপর ভাগের সহিত এক একটি স্থূল ধাতব অঙ্গুরি দ্বারা আবদ্ধ। প্রত্যেক অঙ্গুরির দুইটি প্রান্তে শিলমোহর ধারা অঙ্কিত। সনন্দগুলি সমস্তই দেবনাগরি অক্ষরে ক্ষোদিত। তবে আজকাল আমরা যে জাতীয় নাগরি অক্ষরের সহিত পরিচিত ইহা ঠিক সেপ্রকার নহে। এই জাতীয় দেবনাগরিকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা 'কুটিল' অক্ষর নামে পরিচিত করেন। খোদাই কার্য্য বেশ পরিষ্কার, পাঠের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। সমস্ত লিপিগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ। কয়েকটি বিশেষ স্থল ব্যতীত লিপিগুলির সর্ব্বত্র গদ্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা সুবিধার জন্য এইগুলিকে ক, খ, গ, ঘ নামে পাঠকদিগের নিকট পরিচিত করিব।

(ক) শাসন লিপি।

মহারাজ মহাভব গুপ্তের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে ইহা প্রদত্ত হয়। ইহার ওজন সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২ সের ১১॥০ ছটাক। অঙ্গুরিটি প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু এবং ইহার বেড় প্রায় ৪ ইঞ্চি। শিলের উপর এক দেবী মূর্ত্তি (বোধ হয় লক্ষ্মী)। ইহাঁর দুইদিকে দুইটি হস্তী। অক্ষরগুলি বেশ পরিষ্কার ও পড়িতে কোনও কষ্ট হয় না। ইহার ভাষা সংস্কৃত। ইহার প্রায় সমগ্র অংশ (২০শ হইতে ৪০শ লাইন ছাড়া) গদ্যে লিখিত। অনেক স্থানে সন্ধির নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। আরও অপরাপর ভ্রমের অভাব নাই। ১৬শ এবং ১৭শ লাইন পাঠ করিলে দেখিতে পাই যে প্রদত্ত গ্রামখানি নিষ্কর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু শেষের দুইটি লাইনে লিখিত আছে যে, গৃহিতাকে ঐ ভূমির জন্য নৃপতিকে বার্ষিক পাঁচটি করিয়া রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে। ৪৫শ লাইনে এই শাসন লিপিকে 'কর শাসনম্' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

এই লিপির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"মুরসিম নগরের বিজয় শিবির হইতে (১—৪) মহেশ্বরের পরম ভক্ত, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সোমকুল অলঙ্কার, ত্রিকলিঙ্গাধিপতি, পরমেশ্বর শ্রীমহাভব গুপ্ত রাজদেব মহারাজাধিরাজ শ্রীশিব গুপ্তের চরণ ধ্যান করিয়া, (৪—৫) সুস্থ দেহে এবং …পোতা জেলার শাসীতলা গ্রামের ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া (৪—৮) সমস্ত কৃষক ও অপরাপর সকলকে এই আদেশ দিতেছি (৮—১৮) আমাদের স্বর্গীয় পিতামাতা ও নিজের ধর্ম্মার্থে এই গ্রামখানি ইহার সমস্ত জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত সম্পত্তির এবং ইহার রাজস্ব সংগ্রহের অধিকারের সহিত নিষ্কর অবস্থায় যাবচ্চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও ধরিত্রী বিদ্যমান থাকিবে, ভোগ করিবার জন্য ভট্টপুত্র শ্রীকেশব এবং শ্রী অপরকে ভট্টমন্দির পুত্র এবং কৌশিক গোত্রোপৎন্ন ও লয়সড়গা নিবাসীকে দান করিলাম, এবং তাহাদের ঐহিক সুখের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্যাদি এবং অপরাপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও দান করিলাম। (১৮—১০) এই কয়েক লাইনে দাতা নিজের ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে আদেশ দিতেছেন যাহাতে তাঁহারা তাঁহার এই আদেশ আবহমান কাল পালন করিয়া চলেন। এই কয়টি লাইন ছন্দে রচিত। (৪০—৪৬) এই কয় লাইনের প্রথমেই লিপিকরের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে :—লেখকের নাম কয় ঘোষ, কায়স্থ বংশজাত। পিতার নাম বল্লভ ঘোষ। সহকারি লেখকের নাম নাই বটে, কিন্তু অন্যপ্রকার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে :—ইনি ধরদত্তের পুত্র মহাসন্ধি-বিগ্রহিন মল্লদত্তের আফিসের জনৈক কর্ম্মচারী। সময়ের বিবরণ এই প্রকার :—কার্ত্তিকি শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশি তিথি; পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীজন্মেঞ্জয়ের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

(খ) শাসনলিপি।

ইহা মহারাজ মহাশিব গুপ্তের (যযাতি) রাজত্বের অষ্টম বর্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার ওজন সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিন সের ছয় ছটাক। অঙ্গুরির বেড় প্রায় ৪॥ ইঞ্চি। খোদাই কার্য্য যে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ও বিশেষ অসাবধানতার সহিত হইয়াছিল তাহা দেখিলেই বেশ স্পষ্ট বোধ হয়। অনেক স্থানে অক্ষর এবং কথা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত, বানান ভুল অনেক। এই সমস্ত কারণ নিবন্ধন ইহার অর্থ অনেক স্থানে পরিষ্কার বুঝা যায় না, এবং অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়।

ইহা বিনীতপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। মূলে 'বিনীত পুরাৎ কটকাৎ' এই প্রকার শব্দ যোজনা দেখিয়া ফ্লীট সাহেবের ন্যায় অনেকে মনে করেন, বিনীতপুর এবং কটক অভিন্ন স্থান। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। কটক শব্দকে আমরা বিনীতপুরের বিশেষণ বলিয়া মনে করি। এই শাসনলিপি পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, কোশল দেশে অবস্থিত জলজড্ড গ্রামবাসী হর্ষের পৌত্র, নরসিংহের পুত্র কামদেব

নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দশানার্ঘ্য নদীর উত্তরে অবস্থিত তলকজ্জ গ্রামের কিয়দ্দংশ দান করা হইয়াছিল। যে কয়েক স্থানে লেখকের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা এ প্রকার অস্পষ্ট যে এ স্থলে আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিলাম না। ইহার শেষাংশও অত্যন্ত অস্পষ্ট। উহা হইতে মনে হয় যে, মহারাজ মহাশিব গুপ্ত চেদীদিগকে পরাজিত করেন। ইনি দাহল নামক কোনও স্থান ধ্বংশ করিয়া ফেলেন।

(গ) শাসনলিপি।

ইহা যযাতি মহাশিব গুপ্তের সময়ের চতুর্বিংশতি বৎসরে প্রদত্ত হয়। ইহার ওজন প্রায় চারি সের পাঁচ ছটাক। ইহাতেও ভ্রম আছে, কিন্তু অনেক কম। ইহারও পরবর্ত্তী লিপির দাতা ও গৃহিতা একই ব্যক্তি। উভয়ই যযাতি নগর হইতে প্রদান করা হয়। এই লিপিদ্বয়ের মধ্যে তিনটিমাত্র পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়; (১) প্রদত্ত গ্রামের নাম, (২) লেখক এবং সহকারী লেখকের নাম, (৩) সময়। এই গ সংখ্যক শাসন লিপিতে কোশল দেশের তেলাভট্ট জেলার ভেলওলি গ্রাম দান করা হইয়াছিল। গৃহিতার মাম ভট্ট মহাদধি। কায়স্থ জাতীয় তথাগত ইহার লেখক। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চম দিনে দান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

(ঘ) শাসন লিপি।

যযাতি মহাশিব গুপ্তের অষ্টাবিংশতি বৎসরে ইহা প্রদত্ত হয়। ইহার ওজন প্রায় ৪ সের ৫ ছটাক। খোদাই কার্য্য বেশ নিপুণতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার মর্ম্মার্থ এই:—

(১-১৩) শ্রীযযাতি নগর হইতে—তাহার পর এই স্থানের কবিজনোচিত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার অনুবাদ প্রদান নিরর্থক বোধে আমরা উহা হইতে বিরত হইলাম। (১৩ ১৬) এই স্থানে জন্মেঞ্জয় নামক জনৈক শ্রীসম্পন্ন নরপতি বাস করিতেন। ইহাঁর হৃদয় অতি কোমল ও পবিত্র, মুখ কমলের ন্যায়, ইনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত অরাতিকুল দমন করিয়াছিলেন এবং ইহাঁর নির্ম্মল যশঃ প্রভা ত্রিলোক ব্যাপ্ত হইয়া আছে। (১৬-১৮) ইহাঁ হইতে যযাতি নামক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর যশঃগীতি ত্রিভুবনে প্রচা[রিত] হইয়াছে, ইনি অরাতিকুলকে অতি অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন, এবং ইহাঁর তরবারির তীক্ষ্ণধার গজমুক্তার দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। (১৮-২১) তরবারির প্রশংসা। (২১-২৪) ইনি সম্মুখ সমরে অজাপাল নামক নরপতিকে পরাজিত করাতে দেব বালাগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং ইনি একক বত্রিশটা মদমত্ত হস্তীকে ধৃত করিয়াছিলেন * * *। (২৪-২৯) দেবাদিদেব মহাদেবের পরম ভক্ত, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সোমকুলের অলঙ্কার; ত্রিকলিঙ্গাধিপতি শ্রীমহাশিব গুপ্ত রাজদেব যিনি মহাদেবের ভক্ত উপাসক, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, সোমকুলের অলঙ্কার, ত্রিকলিঙ্গাধিপতি শ্রীমহাভবগুপ্ত মহারাজের পদানুধ্যায়ী আজ (২৯-৩০) সুস্থ দেহে এবং ব্রাহ্মণগণের যথাযোগ্য উপাসনা করিয়া যগবতী প্রদেশের তেলাভট্ট জেলার লুওঙ্গ গ্রাম হইতে আদেশ দিতেছেন যে, তাঁহার অধীন সমস্ত সমাহত্র (রাজস্ব সংগ্রাহক), সন্নিধাত্র (যাঁহারা সর্ব্বদা রাজার নিকট উপস্থিত থাকেন), নিযুক্তানিক কারিক (যাঁহারা নূতন লোককে রাজসরকারে নিযুক্ত করেন, দণ্ডপাশিক (যাঁহারা অপরাধীকে শাস্তি দেন), পিলুন (গুপ্তচর), বেত্রিক (বেত্রধারী কোনও কর্ম্মচারী হয়ত পূর্ব্বোক্ত দণ্ডপাশিকের ন্যায় কোনও কর্ম্মচারী), অবরোধ জন (অন্তঃপুর রক্ষক), রাণক (ইহাঁর কার্য্য ঠিক বুঝা গেল না), এবং রাজবল্লম (যাঁহারা নৃপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র) সকলে যেন তাঁহার এই আদেশ কোনও মতে অবহেলা না করেন,—(৩৩-৩৬) আমার নিজের ও পিতামাতার ধর্ম্মার্থে আজ আমি এই গ্রাম ইহার সমস্ত গুপ্ত ও জানিত সম্পত্তির সহিত ১০ প্রকার অপরাধের অর্থদণ্ডের অধিকার, ইহার সমস্ত আম্র বৃক্ষ ও মধুচক্রের অধিকার, ইহার সমস্ত পতিত ভূমির ও অপরাপর ভূমির অধিকারের সহিত নিষ্কর ভাবে যাবচ্চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও পৃথিবী বর্ত্তমান থাকিবে তাবদকালের জন্য এই শাসনলিপি দ্বারা ভট্টপরমেশ্বরের পৌত্র, সিদ্ধেশ্বরের পুত্র ভট্টমহাদধি[কে] প্রদান করিলাম। (৪৩-৪৪) ইহা তোমরা [অবগত থা]কিয়া ইহার সমস্ত রাজস্ব প্রভৃতি তোমরা ইহাঁকে নির্ব্বিবাদে ভোগদখল করিতে দিবে। (৪৪-৪৫) আমার ভাবী বংশধরেরা যেন ইহা নিজের দান মনে করিয়া এবিষয়ে কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ না করেন। (৪৬) ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, (৪৭-৪৯) প্রাচীনকালের সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া বহুতর নরপতি ভূমিদান করিয়াছেন। (৪৯-৫০) ভূমিদানকারী ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গবাস করেন; যিনি অপরের ভূমি হরণ করেন বা এই কার্য্যে সহায় হয়েন তিনি নরকে গমন করেন। (৫১-৫২) অগ্নি হইতে সুবর্ণ, বিষ্ণু হইতে পৃথিবী, এবং সূর্য্য হইতে গাভী সকল উৎপন্ন হয়। যিনি সুবর্ণ গাভী বা ভূমিদান করেন, তিনি ত্রিলোকলাভ করেন। (৫২-৫৪) ইহলোকে কেহ ভূমিদান করিলে পরলোকবাসী পিতা, পিতামহাদি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহেন, "আমাদের বংশে ভূমিদানকারী উৎপন্ন হইয়াছেন, আমরা তাঁহার জন্য উদ্ধার লাভ করিব।" (৫৪-৫৫) ভূমিদানকারী এবং ঐ দান গৃহিতা উভয়েই স্বর্গে গমন করেন। (৫৫ ৫৬) যে অপরের দত্ত ভূমি হরণ করে সে সহস্র তড়াগ খনন, শত পাদপের যজ্ঞ বা কোটি গোদান করিলেও স্বর্গে গমন করিতে পারে না। (৫৬ ৫৭) যে সুবর্ণ গাভী বা অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমিত ভূমি হরণ করে সে মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নরকে বাস করে। (৫৬-৬৬) এই কয়েকটি লাইনেও ভূমিদানকারীর প্রশংসা এবং ভূমিহরণকারীর নিন্দা বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য বোধে উহা পরিত্যাগ করিলাম। (৬৬-৬৯) যিনি বুদ্ধি এবং সম্মানে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং দানব গুরু শুক্রাচার্য্যকেও অতিক্রম করিয়াছেন, যিনি রাজকার্য্যের গুরুভার অনায়াসে বহন করিতে সমর্থ, রাজনীতি এবং বিক্রম যাঁহাকে প্রিয়বন্ধুর ন্যায় সর্ব্বদা অনুসরণ করিয়া থাকেন, সেই ভাগ্যবান শ্রীসিংহদত্ত সন্ধি বিগ্রহ বিভাগের সচিব। (৬৯-৭০) কোশল দেশবাসী ও সন্ধি বিগ্রহ বিভাগের কর্ম্মচারী কায়স্থ

জাতীয় সূর্য্যসেন এই শাসন লিপির লেখক। সূর্য্যসেন লিখিত এই শাসন পত্র আবহকাল বর্ত্তমান থাকুক। (৭১-৭৪) ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চম দিবসে মহেশ্বরের পরমভক্ত উপাসক, মহারাজাধিরাজ সোমকুলের অলঙ্কার, ত্রিকলিঙ্গাধিপতি শ্রীযযাতিদেবের রাজত্বের অষ্টবিংশতি বৎসরে এই কার্য্য সম্পন্ন হইল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক তাম্র শাসন তিন ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ চারিখানি দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। এক্ষণে আমরা প্রত্যেক তাম্র শাসনের লাইন সংখ্যা প্রদান করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব:—

(ক) তাম্র শাসন—১ম ভাগ ১৩ লাইন।
২য় „ ২৬ „
৩য় „ ৭ „
মোট ৪৬ „

(খ) তাম্র শাসন—১ম ভাগ ১৩ লাইন।
২য় „ ২৭ „
৩য় „ ১০ „
মোট ৫০ „

(গ) তাম্র শাসন—১ম ভাগ ১৬ লাইন।
২য় „ ৪২ „
৩য় „ ৬ „
মোট ৬৪ „

(ঘ) তাম্র শাসন—১ম ভাগ ১৭ লাইন।
২য় „ ৩৪ „
৩য় „ ২৪ „
মোট ৭৫ „

বারান্তরে মূল সংস্কৃত শাসন লিপিগুলি প্রকাশ করিবার উচ্ছা রহিল। সেই সঙ্গে কয়েকটি অপরাপর প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখ করিব।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

ভাগ্যচক্র।

(গল্প)

অরুণ যোসেফ্ কোম্পানির ফার্ম্মে সহকারী কেসিয়ার। সংসারে তাহার স্ত্রী অনিলা ও একমাত্র কন্যা রমা ব্যতীত আর কেহই ছিল না। সে যাহা উপার্জ্জন করিত তাহাতেই এই ক্ষুদ্র সংসারটি বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই চলিয়া যাইত।

জীবন অরুণের বন্ধু। প্রত্যহ সে অরুণের বাটীতে চা পান করিতে আসে, এবং দুই এক ঘণ্টা গল্প গুজব করিয়া চলিয়া যায়। সেদিন পেয়ালায় খানিকটা গরম চা ঢালিতে ঢালিতে অরুণ জিজ্ঞাসা করিল "হাঁহে তুমি নাকি তুলো খেল্তে আরম্ভ করেছ?" মুখ হইতে ধীরে ধীরে পেয়ালা নামাইয়া জীবন বলিল "হাঁ, যেমন ক'রে হোক দু'পয়সা রোজগার করতে পারলেই হ'ল।"

"নাহে ওদিকে যেও না, বেনো জলটা আর ঘরে ঢুকিও না।"

"অরুণ, "তুমি কিছু বুঝতে পারছ না, এ তুলো খেলায় লোকসানের সম্ভাবনা খুবই কম। অথচ একটু বুঝে খেলতে পারলে বেশ দু'পয়সা আসে। এই দেখ না আমি এ ক'দিনে আশি টাকা পেয়েছি। তুমি না হয় আমার মতলবে দু'দিন খেলে দেখ, কিছু না কিছু নিশ্চয়ই পাবে।"

"মাপ কর ভাই, ওদিকে আমি নেই, জুয়া খেলাটা—"

"কে বল্লে জুয়া খেলা? এটা কেবল ভাগ্য পরীক্ষা, তুমি সমস্ত মাস খেটে যা না উপায় করতে পারবে আমি এক দিনে তা উপায় করব। আমার ইচ্ছে তুমিও একদিন ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ।"

"না ভাই আমি গরিব আমারও ঘোড়া রোগে কাজ নেই!"

"আচ্ছা আমার একটা কথা রাখ, তুমি না হয় চারটে পয়সা ধর; মনে কর পয়সা কটা জলে ফেলে দিলে এতে তুমি ফতুর হয়ে যাবে না, বল?"

"না ভাই ও বড় নেসা।"

"তবে থাক্! কিন্তু আমি যা পাব তোমা[কে] রোজ দেখিয়ে নিয়ে যাব।"

এই ঘটনার পর হইতে জীবন প্রত্যহ আসি[য়া] টাকা দেখাইতে লাগিল। টাকার লোভ বড় লোভ[...] দুই চারিদিন পরেই তুলা খেলিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা অরুণ আর বোধ করিয়া রাখিতে পারিল না। সে ভাবিল, বেশী ত নয় এক দি[ন] চারিটা পয়সা ধরিয়া দেখি কি হয়! কিন্তু জীবনকে সে কিছুই বলিল না। পরদিন অফিস হইতে ফিরিবার সময় অরুণ সাত নম্বরে এক আনা ধরি[য়া] আসিল। এই এক আনাতেই সে সাত আনা জিতি[ল]। এই সাত আনাই সে আবার চারে ধরিয়া আসিল। পরদিন সেই সাত আনায় সে তিন টাকা পাইল, এ[বং] সেই তিন টাকাই তিনে ধরিয়া আসিল। পরদি[ন] এই তিন টাকায় সে সাতাস টাকা পাইল। ত[খন] সে মনে ভাবিল জীবনের কথা এতদিন না শুনি[য়া] বড়ই অন্যায় করিয়াছি! ভাগ্যলক্ষ্মী যথার্থই এ[খন] তাহার সহায়; ধূলার মুঠি ধরিলে নিমেষেই তা[হা] সোণার মুঠিতে পরিণত হইবে।

ক্রমে তুলা খেলার নেশা অরুণকে ভূতের মত পাইয়া বসিল। হঠাৎ একদিন কমলার কৃপাদৃ[ষ্টি] হইতে বঞ্চিত হইল। পরদিন ভাগ্য ফিরিতে পা[রে] ভাবিয়া আবার সে জুয়ার আড্ডায় আসিল, কি[ন্তু] লক্ষ্মী আর কৃপা করিলেন না। ক্রমে যখন তু[লা] খেলায় তাহার সঞ্চিত অর্থ একে একে নিঃশে[ষ] হইয়া আসিল, তখন অনিলার অলঙ্কার গুলির উপ[র] তাহার হাত পড়িল। ক্রমে দেনার দায়ে এক বৎসরে[র] মধ্যেই তাহার বাড়ী খানি বন্ধক পড়িল। তখ[ন] [তা]হার চেতনা হইল না, সে ভাবিল একবার একটা মোটা টাকা ধরিতে হইবে, তাহা হইলে সমস্ত টাকা একদিনে উঠিয়া আসিতে পারে কিন্তু টাকা কোথায়—কি লইয়া সে খেলিবে?

এই সময় রমা শ্বশুরবাটী হইতে পিতৃগৃহে আসিয়াছিল। অরুণ বিস্তর প্রলোভনে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তাহার অলঙ্কার কয়খানি একদিন লইয়া গেল—কিন্তু আর তাহা ফেরত আসিল না। এমনি করিয়া সে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিল।

অরুণের মুখ এখন আর পূর্ব্বের মত হাস্যোজ্জ্বল নাই। ললাটে চিন্তার রেখা সূচিত হইয়াছে। দেহের লাবণ্যও অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার জ্যোতি-হীন চক্ষু এখন নিতান্ত মলিন, শুষ্ক। সহসা দেখিলে আর তাহাকে চেনা যায় না। গৃহেও কাহারো মনে আর স্বস্তি নাই সুখ নাই! তাহার সেই শান্তিময় ক্ষুদ্র গৃহখানি আজ যেন ভীষণ বাত্যায় বিপর্য্যস্ত, দৈন্যের তাড়নায় একান্ত জীর্ণ!

২

অনিলা যখন বুঝিল তাহারও রমার অলঙ্কার গুলি ফেরত পাইবার আর কোন আশা নাই—বাটী খানি অবধি বন্ধক পড়িয়াছে, তখন তাহার প্রাণের ভিতর একটা নিরাশার ঝড় বহিয়া গেল। একটা অপ্রত্যাশিত বেদনা, একখানা ভারি পাষাণের মত তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল। স্বামীর নিকট গহনার জন্য অনুযোগ করিলে, অরুণ শুধু অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া সমস্ত কথা নীরবে সহ্য করিত। যখন অনিলার বাক্য-বাণ অরুণের অসহ্য হইত, তখন সে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিত—অর্থের চিন্তায় সে বিব্রত হইয়া পড়িত কোন দিকেই সে কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

একদিন অনিলা বলিল "আমার গহনা গেছে তার কথা না হয় ছেড়ে দি, কিন্তু বেচারা রমা—তার কি অপরাধ—তার শ্বশুরের দেওয়া সমস্ত গহনাগুলো তুমি উড়িয়ে দিলে—আজ বাদে কাল তাকে যখন তারা নিতে আস্বে! তখন তুমি কি বল্বে? বল্বে কি যে আমি তুলো খেলে তার সমস্ত গহনা উড়িয়ে দিয়েছি—ছি! কাল তুমি যেমন করে পার রমার গহনাগুলো অন্ততঃ এনে হাজির করে দাও—"

"কি করে দোব? চুরি না ডাকাতি করব?"

"সে সব আমি জানি না, যেমন করে পার, আনা চাই।"

অরুণ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া কি ভাবিল—পরে কম্পিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল "তোমাদের গহনা ক'খানা পেলেইত তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আমার উপর আর কোন দাবী থাক্বে না?"

অনিলা গাঢ় স্বরে বলিল "কথার শ্রী দেখ! গহনা গুলো চাইত!" "বেশ যেমন করে পারি কাল আমি তোমাদের গহনা এনে দোব।"

৩

পরদিন যথাসময়ে অরুণ অফিসে আসিল। এখন সে অফিসে কেসিয়ারের কার্য্য করিতেছে। কেসিয়ার পীড়িত। আজ তাহার মনের ঠিক ছিল না—শুধু এক চিন্তা টাকা! টাকা! টাকা! অনেক ভুল-চুকের মধ্য দিয়া সে সেদিনকার কার্য্য শেষ করিল। বেলা চারিটার সময় সে ক্যাস বন্ধ করিল। একটা দারুণ চিন্তার তাড়নায় তাহার প্রাণটা অস্বাভাবিক চঞ্চল হইয়া উঠিল—টাকা কৈ! কোথায় মিলিবে? অত্যন্ত অধীরভাবে সে সেফ্ হইতে হাজার টাকার খুজ্রা নোট বাহির করিয়া পকেটে রাখিল। তাহার বুকটা দুড়্ দুড়্ করিয়া উঠিল—মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে সে সেফের চাবি বন্ধ করিল, এবং বড় সাহেবের নামে একখানি চির-কুট লিখিয়া আপনার টেবিলের উপর রাখিল। পরে যথারীতি সেফের চাবি ম্যানেজারের নিকট দিয়া সেদিন একটু সকাল সকাল অফিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তখন সন্ধ্যার কাল ছায়া ধরণীর উপর নামিয়া আসিয়াছে, ঘরে ঘরে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে। রমা হস্তস্থিত শঙ্খটী যথাস্থানে রাখিয়া দালানে

আসিয়া দাঁড়াইল। অনিলা তুলসী তলায় প্রদীপ দিয়া গলবস্ত্র হইয়া যুক্ত করে প্রণাম করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল "হে হরি আজ যেন গহনা গুলি নিয়ে আসেন।"

এমন সময়ে অরুণ ধীরে ধীরে বাটীতে প্রবেশ করিল। তখনও তাহার বক্ষ স্পন্দিত হইতেছিল।

রমা সাগ্রহে বলিল "হাতে ও কি বাবা ?"

"এটা গহনার বাক্স—এই নাও মা, তোমাদের গহনা পেলে ত ? ব্যস !"

গহনার নাম শুনিয়া অনিলা তাড়াতাড়ী আসিয়া বাক্স হাতে লইল। খুলিয়া গহনাগুলি পরীক্ষা করিল —সব ঠিক আছে !

রমা বলিল "আজ বুঝি বাবা তুলো খেলায় অনেক টাকা জিতেছিলে ?"

"হ্যাঁ মা, আজ অনেক টাকা জিতেছিলাম, তাই গহনা গুলো ছাড়িয়ে এনেছি।"

"আর খেলোনা বাবা !"

"না মা, আর খেল্‌ব না, এই শেষ !"

রমা তাড়াতাড়ী পাখা আনিয়া অরুণকে বাতাস করিতে লাগিল। অনিলা গহনার বাক্স তুলিয়া রাখিয়া তাহার জলযোগের ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইল।

অনিলার সেই বেদনা কাতর মলিন মুখ খানা আজ হাস্যের ছায়াপাতে সহসা দীপ্ত, উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অরুণ বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল, যেন তাহার চোখের সম্মুখে সংসার রঙ্গমঞ্চে ছোট একটা নাটকের এক অঙ্ক অভিনয় হইয়া গেল। যেন মেঘের সম্মুখে রৌদ্র আসিয়া দাঁড়াইল—বিষাদ সাগরে হাস্যের তরঙ্গ খেলিল। এ এক অপূর্ব্ব লীলা !

* * * *

অরুণ অফিস হইতে চলিয়া আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই ম্যানেজার সাহেব কোন প্রয়োজন বশতঃ অরুণের কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সম্মুখে টেবিলের উপর অরুণের লিখিত সেই চিরকুট দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। চিরকুটখানি ফার্মের বড় সাহেবের উদ্দেশ্যে লেখা ছিল। উঁহার ম[র্ম]... এই—আমি আপনার ক্যাস হইতে আজ হাজার টাকা লইলাম এবং আপনার নিকট হইতে—আপনার কেন, সংসারের নিকট হইতেই চিরবিদায় লইলাম।

আপনার অকৃতজ্ঞ ভৃত্য, অরুণ

ম্যানেজার সাহেব তৎক্ষণাৎ ক্যাস মিলাইয়া দেখিল, বাস্তবিকই হাজার টাকা কম, সে একেবারে লালবাজার পুলিসে টেলিফোঁ করিল, এবং ... সাহেবকে চিরকুটখানি পাঠাইয়া দিয়া এক প[ত্র] লিখিল যে সে এখনই পুলিসের সাহায্যে অরু[ণকে] এ্যারেষ্ট করিতে যাইতেছে।

অরুণ সবেমাত্র তখন আহারে বসিয়াছে এমন সময়ে বহির্ব্বাটীতে একটা কোলাহল শুনিয়া সকলে সচকিত হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই কয়েকজন কনষ্টেবল, একজন ইনেস্পেক্‌টর ও আফিসের ম্যানেজার সাহেব আসি[য়া] সাড়া দিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল, এবং ম্যানেজারের আদেশে পুলিস তখনই অরুণকে এ্যারেষ্ট করিল। ইনেস্পেকটর সাহেবের হুকুমে একজন কনষ্টেবল অরুণের হস্তে হ্যাণ্ডক্যাফ পরাইয়া দিল। পরে খানা তল্লাসী আরম্ভ হইল—অরুণের পকেট হইতে এক ভরি আফিম্ ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া গেল না। অরুণ যে কি উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বন্ধকি অলঙ্কারগুলি ছাড়াইয়া আনিয়াছে, তাহা তখন অনিলা ও রমার আর জানিতে বাকী রহিল না। গৃহাভ্যন্তর হইতে করুণ ক্রন্দনের রোল উঠিয়া পাড়া পল্লীটিকে সহসা চকিত করিয়া তুলিল। পাড়ার অনেকেই অরুণের বাটীতে ছুটিয়া আসিল—রমা গহনার বাক্সটী সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ওগো তোমরা আমার বাবাকে ছেড়ে দাও গো—আমরা গহনা চাই না !"

ইনেস্পেকটর সাহেব চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিল "চুপরও"। রমা ও অনিলা ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িল।

ম্যানেজার সাহেব ইনেস্পেক্টরের দিকে চাহিয়া বলিল "আসামি চালান দাও।"

এমন সময় অফিসের বড় সাহেব ত্রস্তভাবে [আ]সিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অরুণের অবস্থা দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন, পরে ম্যানেজারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "কার হুকুমে তুমি অরুণকে এ্যারেষ্ট করলে ?"

"সে ক্যাস থেকে টাকা চুরি করেছিল।"

"কে বল্‌লে সে টাকা চুরি করেচে—তার টাকা আমার কাছে জমাছিল, তাইথেকে সে হাজার টাকা নিয়েছে—"

"আমরা ভেবেছিলাম সে টাকা চুরি করেছে— এবং সেইজন্য আত্মহত্যা করবার মৎলব করেছে— ওর পকেট থেকে অনেকটা আফিমও বেরিয়েচে।"

সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি জানি অরুণ আফিম খায়—সেইজন্যে সে একমাসের মত আফিম কিনে এনেছিল।" পরে অরুণের দিকে চাহিয়া বড় সাহেব বলিলেন 'কেমন অরুণ, তুমি আফিম খাও, না !"

অরুণ সম্মতি সুচকভাবে ঘাড় নাড়িল।

বড় সাহেবের ইঙ্গিতে অরুণের হ্যাণ্ডক্যাফ তৎক্ষণাৎ খুলিয়া লওয়া হইল।

ম্যানেজারকে লক্ষ্য করিয়া বড় সাহেব কহিলেন, "তুমি আমার বিনা অনুমতিতে অরুণকে অ্যারেষ্ট করেছিলে, সেজন্য কাল থেকে তোমার চাকরিতে জবাব হ'ল—তুমি তোমার লোকজন নিয়ে এখনি এখান থেকে চলে যাও।"

ম্যানেজার সাহেব একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল—তাহার সস্মিত মুখ সহসা মলিন ও সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পুলিসের লোকজন লইয়া ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

ইনস্পেক্টর সাহেব বাহিরে আসিয়া বলিল, "অদ্ভুত ! ইহার ভিতর নিশ্চয় কিছু রহস্য আছে !"

ম্যানেজার বলিল, "আমার ত তাই মনে হয়। পরিষ্কার চুরি ধরে দিলাম—কোথায় আমার মাহিনা বাড়বে—তা নয়——"

ইনস্পেক্টর সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিল, "সবই বরাত—আজ আমার বরাতেও এই কর্ম্মভোগটা ছিল।"

৪

সাহেব ডাকিলেন, "অরুণ ?"

অরুণ নিরুত্তর—তাহার বড় বড় চোখ দুটি হইতে শুধু অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

সাহেব অরুণকে আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন, তাঁহার হৃদয় মধ্যে একটা স্নেহের নির্ঝর উথলিয়া উঠিল। তিনি অশ্রু সজল নয়নে ধীরে ধীরে কহিলেন, "অরুণ তুই হাজার টাকা নিয়েছিলি পাঁচ হাজার টাকা নিলি না কেন ? দশ হাজার টাকা নিলি না কেন ? কেন আমায় একবার বল্‌লিনে ? তা'হলে ত তোর এ দশা আমাকে দেখতে হ'ত না—তুই জানিস এই যে এত বড় বিশ লাখ্ টাকার ফার্ম—এ কার ? এ সব তোর ! এই ফার্ম থেকে আমি ভগবানের কৃপায় আর তোর বাপের আশীর্ব্বাদে অনেক টাকা উপায় করেছি। আমার এই যে এত উন্নতি, সে কেবল তোর বাপের সাহায্যে। আমি নিমকহারাম নই ! তোর বাপকে আমি আমার বাপের চেয়েও ভক্তি কর্‌তুম। আমার বাপ আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল—আর তোর বাপ আমাকে রাস্তা থেকে ডেকে এনে বাড়ীতে স্থান দিয়েছিল—সে ঋণ আমি কি জীবনে শোধ কর্‌তে পারব ? তুই তখন ছেলে মানুষ সব কথা তুই জানিস না ! আমার গোড়ার খবর তোকে আজ বলি—শোন্ ! আমার বাপের অগাধ সম্পত্তি ছিল। বাপের আমি এক ছেলে। প্রথম বয়সে অত্যন্ত আদর পেয়ে লেখাপড়া ভাল শিখ্‌তে পারলাম না—তারপর যত বয়স বাড়তে লাগল—সঙ্গে সঙ্গে সখের মাত্রাও তেমনি বাড়তে লাগ্‌ল—কতকগুলা বদসঙ্গী জুট্‌ল। ক্রমে থিয়েটার দেখবার সখ চাপ্‌ল। প্রত্যহ সঙ্গীদের নিয়ে বিলাতের বড় বড় থিয়েটারে যেতে লাগলাম—এতে প্রতি রাত্রেই অনেক টাকা খরচ হ'ত—তারপর গার্ডেনপার্টি নাচের মহালীলা এ সব ত আনুষঙ্গিক ছিলই। বাবা যখন আমার সব কথা জান্‌তে পারলেন, তখন আমার হাতে যাতে

এক পয়সাও না আসে, তার ব্যবস্থা কর্‌লেন। তখন আমি মার কাছে থেকে, আবদার করে, ভয় দেখিয়ে, নানা উপায়ে টাকা আদায় করতাম। বাবা যখন এ ব্যাপার জান্‌তে পারলেন, তখন মাকে একদিন ধম্‌কে দিলেন। বাবার বকুনিতে মাও হাত গুটালেন। তখন আমি আর অন্য উপায় না পেয়ে বাবার অনুপস্থিতিতে দেরাজ বাক্স ভেঙ্গে টাকা নিতে লাগলাম। বাবা ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দিয়ে কড়া হুকুম দিলেন, যেন আমি আর বাড়ীতে ঢুক্‌তে না পাই। কিন্তু তাতে তেমন ফল হ'ল না। আমি গুপ্ত পথ দিয়ে চোরের মত বাড়ী এসে অভীষ্ট সিদ্ধ কর্‌তে লাগলাম। একদিন বাবা আমাকে ডেকে স্পষ্ট ক'রে বলে দিলেন— পুনরায় যদি আমি তাঁর বাড়ীতে ঢুকি, তা'হলে তিনি আমাকে পুলিসে দিতে বাধ্য হবেন।

সেদিন আমার মনে কেমন একটা ঘৃণা হ'ল— ভাবলাম বাবা আমাকে পুলিসে দেবেন! ধিক্ আমাকে! যদি কখনও মানুষ হ'তে পারি, তবেই বাবাকে আবার এ মুখ দেখাব। নচেৎ আর না! মনে কর্‌লাম বিলাতে আর থাকব না। ভারতবর্ষে যাব। সেখানে গিয়ে ত আমার মত অনেক বেকুবও মোটা টাকা উপার্জ্জন করে। যেমন ভাবা অমনই কাজ। সেই রাত্রেই বাবার বাক্স ভেঙ্গে পথ খরচের টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম। রাত্রিটা একটা হোটেলে কাট্‌ল, সকালেই জাহাজে উঠলাম। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে কোন কথা ভাঙ্গলাম না। একবার দেখাও কর্‌লাম না, প্রাণের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল—বাবা আমাকে পুলিসে দেবেন!

তারপর যখন কলকেতায় এলাম, তখন আমার পুঁজি পাটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মনে করেছিলাম, কলকেতায় এলেই একটা মোটা মাহিনার চাকরি জুট্‌বে। কিন্তু কাজে তার কিছুই হ'ল না। পোষাক পরিচ্ছদের অভাবে, আর কোন মুরুব্বি না থাকায় চাকরির কোন সুবিধা কর্‌তে পার্‌লাম না। লালবাজারের পুলিস কোর্টের ধারে বসে দরখাস্ত লিখে যে কিছু উপায় কর্‌ব, সে ক্ষমতাও আমার ছিল না। ইংরেজের ছেলে বটে, কিন্তু ইংরেজীতে ভা[illegible] করে একখানা চিঠি অবধি লিখ্‌তে পার্‌তাম না। আমার মত অভাগাকে কে চাকরি দেবে?

উদরান্নের জন্য ছট্‌ফট্ করে ঘুরে বেড়াতাম- বেলা দুটার সময় খানসামারা যখন সাহেবদের উচ্ছি[illegible] খাদ্য সামগ্রী নিয়ে লালদিঘীতে আস্‌ত, তখন আমি তাদের হাতে দু' চার পয়সা দিয়ে কিছু খেয়ে উদর পূর্ণ ক'রে লালদিঘীর জল খেতাম। ক্ষিধের জ্বালায় কত দিন আমার শুধু কলকাতার পথের ধারে কলের জল খেয়ে কেটেছে, তা তোকে কি বল্‌ব?

এই রকম অবস্থায় একদিন আমি লালদিঘীর বাগানে একটা বেঞ্চের উপর বসে আছি, এমন সময় তোর বাপ এসে আমার পাশে বস্‌লেন। সেদিন আমার খাওয়া হয় নি, হাতে একটীও পয়সা ছিল না। আমি তোর বাপের কাছে দুটি পয়সা ভিক্ষা চাইলাম।

তিনি খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বল্‌লেন, "তোমার বুঝি কিছু খাওয়া হয় নি আজ?"

"না মশাই।"

"তুমি থাক কোথায়?"

আমার থাকবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই—কোন দিন এই বেঞ্চের উপর কোন দিন বা কোন দোকানের তক্তার উপর পড়ে রাত কাটাই। তারপর আমার ইতিহাস তাঁকে সংক্ষেপে বস্‌লাম। শুনে তাঁর দয়া হ'ল—তিনি আমাকে বল্‌লেন "সাহেব ভাত খাবে?"

আমি আগ্রহের সহিত বল্‌লাম "খাব।"

তিনি আমাকে সঙ্গে করে তাঁর এই বাড়ীতে আন্‌লেন, তখন তোর মা বেঁচেছিলেন। স্বহস্তে তিনি আমাকে পরিবেশন কর্‌লেন। আমি এই রকে বসে ভাত খেলাম; তুই তখন খুব ছোট, বোধ হয় সে কথা তোর মনে না থাকৃতেও পারে! সেদিনকার সে ভাত আমার অমৃতের মত মধুর লাগ্‌ল। আজও তা আমি ভুল্‌তে পারিনি। কখনও ভুল্‌ব না! তারপর আরও কতবার এখানে বসে ভাত খেয়ে গেছি, সে কথা তোর বেশ মনে আছে বোধ হয়।

অরুণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল "হাঁ!"

তারপর তোর বাপ বল্‌লেন "সাহেব ব্যবসা করবে?"

আমি বিস্মিত নেত্রে তাঁর মুখের পানে চেয়ে বল্‌লাম "ব্যবসা, আমি! আমি যে পথের ভিখারি বাবু, এক পয়সার সঙ্গতি নেই, তবে আমি আপনার অধীনে যে কোন চাকরি করতে রাজি আছি।"

তিনি বল্‌লেন "এ ব্যবসায়ে মূলধনের দরকার নাই, আমি যে সব চিঠি পত্র লিখব, তাতে তুমি সই করবে শুধু। কেমন, পার্‌বে ত?"

আমি বললুম "আপনি আমার অন্নদাতা, পিতার তুল্য—ন', তাঁর চেয়েও বড়—আপনি আমাকে যা বল্‌বেন আমি তাই করব।" তিনি ক্লাইব ষ্ট্রীটে একটী গুদাম ভাড়া নিলেন, এবং যৎসামান্য আসবাব নিয়ে সেখানে এক অফিস খুল্‌লেন, আর আমাকে এক সুট ভাল পোষাক কিনে দিলেন; আমি সেজে-গুজে একখানা চেয়ার দখল করে বসে রইলাম। তারপর তোর বাপ প্রধান প্রধান খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, যে বিলাতের সুবিখ্যাত যোসেফ্ সাহেব——নং ক্লাইব ষ্ট্রীটে যোসেফ্ কোম্পানি নাম দিয়ে কমিশন এজেণ্টের কাজ কর্‌বে। বিলাত ও জার্ম্মাণির বড় বড় ফার্ম্মে আমার সই করা চিঠি পাঠানো হ'ল। তারপর চারিদিক হ'তে নানা রকম মাল পত্র এসে আমাদের গুদাম ভরে গেল আমরা তখন উচিত কমিশনে অদম্য উৎসাহে বাজারে সেই সব মাল পত্র বেচ্‌তে লাগলাম। সে বৎসর খরচ-খরচা বাদ আমাদের প্রায় বিশ হাজার টাকা লাভ দাঁড়াল। এখন এই বিশ বৎসরে সমস্ত খরচা বাদ পাঁচ লক্ষ টাকা আমার নামে ব্যাঙ্কে জমা আছে আর পাঁচ লক্ষ টাকার মাল পত্র গুদামে মজুত আছে, এর অর্দ্ধেক তোর বাপের - এখন তোর!

আমি স্থির করেছি আগামী সপ্তাহে একবার বিলাত যাব, ফির্‌তে নাও পারি। এই পাঁচ লক্ষ টাকার কারবারে তুই আমার অর্দ্ধেক অংশীদার। আমার অনুপস্থিতিতে অফিসের সব ভার তোর উপর। কাল থেকে এটর্ণি বাড়ী ঘুরে কাগজ পত্র তৈরী করাচ্ছিলাম, দলিল হয়ে গেলে তোকে সব বল্‌ব বলে সই করিয়ে বিলাত যাব, এই রকমই আমি স্থির করেছিলাম। অফিসের সমস্ত কেরাণী, সাহেব তোর অধীনে থাক্‌বে। এই দেখ্ সেই খসড়া দলিল, তোর মঞ্জুরের জন্যে আজ এটর্ণি বাড়ী থেকে পেয়েছি। তুই পড়ে মঞ্জুর করে একটা শুধু সই করে দে, দেখ্!"

কথা শেষ করিয়া সাহেব কাগজের একটা দীর্ঘ বাণ্ডিল অরুণের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। ঐ কাগজ খানিতে অঙ্কের রাশি যেন অরুণের চোখের সম্মুখে একটা কুয়াশার সৃষ্টি করিয়া তুলিল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়।

তর্পণে।

হে ঋষি, হে পূজ্যতম ব্রহ্মর্ষি মহান্,
আজ তুমি কোন্ লোকে কর অবস্থান?
অবিনাশ খেলে কিগো সোণার নন্দনে,
যোগেন্দ্র কি বিভু প্রেমে আছে যোগাসনে?
চিরদুঃখী সুকুমারী আছে কি সেথায়,
মন্দাকিনী স্নিগ্ধ জলে জ্বালা কি জুড়ায়?
সেদিন যে উষা গেল আঁধারি ভবন,
ছলনার জাল কাটি মুক্ত সে এখন।
সপ্তলোকে তুমি কি গো পুণ্যাত্মা হৃদয়,
রসবৈসঃ রসে সিক্ত যোগানন্দময়?
তব সিদ্ধ সে কি বাণী স্মৃতির মন্দিরে,
দেশ বক্ষে রেখে গেছ চিরাঙ্কিত করে।

তুমি বলেছিলে ওগো জ্ঞানালোক দ্বারা,
অজ্ঞান অধর্ম্ম হ'তে মুক্ত হ'বে তারা।
মনুষ্য জাতির মধ্যে গণ্য জাতি হ'বে,
সত্য জ্ঞানে বিমণ্ডিত জাতীয় গৌরবে।
কি উচ্চ মহান্ তপ, হে তপস্বী তব,
প্রীতিই জাতীয় স্তম্ভ প্রচারিলে নব।
মহত্তর সে কি দান দিলে সন্তানেরে,
ব্রহ্মধ্যানে শোকতাপ দুঃখ যাবে দূরে।
ব্রহ্মজ্ঞানে সিদ্ধ ওগো ব্রহ্মর্ষি মহান্,
তোমার সুকৃতি ভবে চির বিদ্যমান।

শ্রীলীলা।

স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি।

Mr. Gandhi a man of high ideals,
Lord Crewe.

পোরবন্দর বা "শ্বেতনগর" গুজরাট প্রদেশের কাটিয়াবাড়ের অন্তর্গত পোরবন্দর রাজ্যের রাজধানী। পোরবন্দর পঞ্চাশটী গ্রাম লইয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহা একটী ক্ষুদ্র রাজ্য হইলেও ইহার অধীশ্বর রাণা সাহেব ভারতের একজন প্রথম শ্রেণীর সামন্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

পোর বন্দর একটী অতি প্রাচীন নগর। পুরাকালে কাঠিয়াবাড়ের অন্যান্য সহরের ন্যায় ইহাও চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত প্রস্থ ও তদুপযোগী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এখন আর সে উচ্চ প্রাচীর নাই। এখানকার গৃহসকল শ্বেত প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বিনির্ম্মিত। প্রস্তরখণ্ড গুলি অতীব শুভ্র ও কোমল। সেইজন্য প্রায় প্রতি গৃহদ্বারে ও প্রাচীর গাত্রে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য মুদ্রিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব প্রস্তর খণ্ড কোমল হইলেও যত বারিপাত ও সূর্য্যাতপ সহ্য করিতে থাকে ততই দৃঢ় হইয়া বহুকাল স্থায়ী হয়।

এই নগর নির্ম্মাণে স্থপতি বিদ্যার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানকার রাজপথগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইলেও বাজারগুলি সাধারণতঃ বহুজনাকীর্ণ হওয়াতে সহরের একটী বেশ মনোরম সৌন্দর্য্য রহিয়াছে।

সূর্য্যাস্ত গমনের সময় যখন লোহিতাভ সূর্য্যরশ্মি সমুন্নত শ্বেত প্রস্তরের প্রাচীর বেষ্টিত সুচারু গৃহ গাত্রে পতিত হইয়া প্রতিভাত হইতে থাকে তখন সমগ্র সহরটী এক অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর শ্রী ধারণ করে। যিনি এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি কখনই অতি সহজে ইহা ভুলিতে পারিবেন না।

পোর বন্দরে শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র বা ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষলতাদি অতীব বিরল। সেই … পোর বন্দরের নাগরিক সৌন্দর্য্য মনোরঞ্জক হইলে… সুস্নিগ্ধ শ্যামল বৃক্ষলতাদির অভাবে ইহার দৃশ্যপট… অলক্ষিতে মরুভূমের আবছায়া আসিয়া উপস্থিত হয়…

সমুদ্র প্রাচীর বেষ্টনীর পাদদেশ প্রচণ্ডবেগে… আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় রুদ্ধক্রোধে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে প্রধা…বিত হইতেছে। সময়ে সময়ে আপনার ক্রোধাবেগ… সংবরণ করিতে না পারিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া চতুঃপার্শ্বের নিম্ন জলাভূমিকে প্লাবিত করিয়া নগরটীকে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিণত করে। জলপ্লাবন সময়ে দেশান্ত… যাইতে হইলে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয় বলি… নিম্ন জলাভূমির উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে।

এই জলাভুমির অপর পারে, মহাদেশ ভাগে… বর্দ্দ পর্ব্বত পর্য্যন্ত এক অপ্রতিহত সমতল ভূমি… সংপ্রসারিত হইয়া ধূ ধূ করিতেছে।

এই সমতলভুমি মর্ম্মান্তিক ক্লেশদায়ক অতীত… স্মৃতিতে পরিপূর্ণ। এই সমতল ভূমেই স্বদেশ দ্রোহ… নল প্রজ্বলিত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে কলঙ্কি… করিয়াছে। এইখানেই মোগল মহারাষ্ট্র যুদ্ধ সংঘটি… হইয়া উভয় পক্ষকে হীনবল করিয়া ইউরোপে… বণিক সম্প্রদায়কে রাজ্যলাভলোভে প্রলুব্ধ করিয়া… ছিল। এইখানেই সমর লক্ষ্মী বীরকেশরী ক্লাইব ও… হেষ্টিংসের গলদেশে বিজয় মাল্য পরাইয়া দিয়া ভারত… লক্ষ্মীকে ব্রিটনেশ্বরীর অঙ্কে অর্পিত করিয়াছে… এবং এইখানেই ভারতীয় সৈন্য বিদ্রোহ (Indian mutiny) অভিনীত হইয়া ভারতের ভাগ্যচক্রকে… পরিবর্ত্তিত করিয়া ভারতের পরবর্ত্তী ইতিহাসে নব… পত্র সংযোজনা করিয়া দিয়াছে।

পোর বন্দরের এত সন্নিকটে এই সব ভাগ্য…

…র্য্যয় ঘটনা সংঘটিত হইলেও তাহাদের উষ্ণ ঝঞ্ঝা… নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নগরের অধিবাসী…কে বিপর্য্যস্ত করিতে না পারিলেও একাধিক …বিদ্রোহের দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া পোরবন্দরের …স্বভাব শান্ত প্রকৃতি অধিবাসীদিগের শীতল …ণিতকে উষ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। এক সময়ে …র বন্দরের সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতি দলবদ্ধ হইয়া …হাদিগের রাজ্যাধিপতি রাণা সাহেবের বিরুদ্ধে …মান হইয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া ভ্রাতৃরক্তে …নাদিগের গরীয়সী জন্মভূমিকে রঞ্জিত করিতে …ন নাই। এই আত্মদ্রোহে যদিও রাণা সাহেব …হইয়াছিলেন কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে …গুজরাটবাসীদিগের স্বাভাবিক কোমল প্রকৃতি …াইয়া গিয়া তাঁহাদিগকে এক অন্য ছাঁচে সংগঠিত …িয়া তুলিয়াছিল।

শুধু ইহাই নহে। সমুদ্র অতি সন্নিকটে থাকিয়া …মাতার ন্যায় অলক্ষিতে ইহাদের চরিত্রের উপর …নার বিশেষরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। …রাও সমুদ্রতটবাসী ফিনিসিয়ান নর্থম্যান জাতি…গর ন্যায় অসীম সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়া…লেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে পোরবন্দরবাসি… সমুদ্র মধ্যেও নানা প্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত …লেন। এখনও Zanzibar ও এডেন বন্দর হইতে …াদের নির্ম্মিত জাহাজসকল দেখিতে পাওয়া যায়। অসংযত ও উদ্দাম সমুদ্রজীবন ইঁহাদিগকে উৎ… স্বাধীনতাপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। সমুদ্র মধ্যে …নাগমন বশতঃ ইঁহারা বিভিন্ন দেশজাত দ্রব্যাদির …বিভিন্ন জাতির লোকচরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভি…তা লাভ করিয়াছেন।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইঁহারা সমুদ্রের …পারে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্য ও নানা প্রকার …কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

এই সব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে গান্ধি পরিবার পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

পোর বন্দরের রাজ পরিবার অতি প্রাচীন বংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা আপনাদিগকে বানর দেবতা হনুমান রাজের বংশধর মনে করিয়া গৌরব অনুভব করেন।

গান্ধি পরিবার বহুকাল হইতে এই রাজ সরকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। গান্ধিপরিবারের অন্যতম নেতা স্বর্গীয় উত্তমচাঁদ গান্ধি এই রাজপরিবারের রাণা বিক্রমজিত সাহেবের রাজত্ব কালে দেওয়ান সাহেবের পদে নিযুক্ত হন। উত্তমচাঁদ একজন সূক্ষ্মদর্শী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। রাণা বিক্রমজিতের চরিত্র নানা প্রকার বিপরীত ধর্ম্মাপন্ন ছিল। তিনি কখন দয়ালু কখন বা অতি কঠোর, কখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কখন বা লঘুচিত্ত, কখন সংযত কখন স্বেচ্ছাচারী কখন সরল কখন বা কুটিল।*

এরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ত রাজার অধীনে সত্য ন্যায় ধর্ম্মানুসারে কর্ত্তব্য সাধন করা যে কত দুরূহ ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এরূপ রাজ্যে চাকরী যেমন অস্থায়ী তেমনি আকস্মিক সাময়িক উত্তেজনাপূর্ণ। তবুও উত্তমচাঁদ এই রাজ সরকারে বহু বৎসর ধরিয়া প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। কেবল একবার মাত্র তিনি কোনও বিশেষ কারণে যুবরাজ বিক্রমজিতের সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজমাতার বিরাগভাজন হন। রাজমাতা উত্তমচাঁদের উপর এতটা ক্রুদ্ধ হন যে তিনি তাঁহাকে দেওয়ান সাহেবের উচ্চপদ হইতে অবসৃত করিয়া ক্ষান্ত না হইয়া সৈন্য সাহায্যে কামান দ্বারা তাঁহার প্রাসাদ ধুলিসাৎ করেন। উত্তমচাঁদ প্রাণ ভয়ে নিকটস্থ মুসলমান রাজ্য জুনাগড়ে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। জুনাগড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলে জুনাগড়ের

* জনৈক লেখক তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—
Firmminded, singularly chaste in morals keen sighted often cruel, so independent that he quarrelled with the political agent, so stubborn that he raised a Civil war so niggardly that his dependants were starved yet with compensating characteristics which won their affection.

নবাব সাহেব তাঁহাকে অতি সমাদরে আপন দরবারে আহ্বান করিলে উত্তমচাঁদ তাঁহাকে বাম কর দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। 'ইহাতে নবাবের পারিষদবর্গ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। অনেককেই এইরূপ অপমান-সূচক আচরণের জন্য স্বীয় মস্তক দান করিতে হইয়াছে। নবাব সাহেব উত্তমচাঁদের নিকট এইরূপ অপ্রত্যাশিত আচরণের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তমচাঁদ সবিনয়ে ও সসম্ভ্রমে দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন যে যদিও পোরবন্দরের রাজপরিবার কর্তৃক তিনি বিশেষরূপে অপমানিত ও নির্য্যাতিত হইয়াছেন তথাপি এখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত তাঁহাদের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।" নবাব সাহেব তাঁহার এই মহানুভবতা উপলব্ধি করিয়া যতদিন না সকল প্রকার ঝঞ্ঝাট কাটিয়া গিয়া পোরবন্দরে যাইবার জন্য আহ্বান আসিল ততদিন উত্তমচাঁদকে অতি সম্মানের সহিত প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

উত্তমচাঁদ পরলোক গমন করিলে তদীয় পুত্র করমচাঁদ পিতৃ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া পঁচিশ বৎসর পোরবন্দরের রাজ পরিবারে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনিও কোনও কারণবশতঃ আপন প্রভুর অসন্তুষ্টির কারণ হন। সেইজন্য তিনি সসম্মানে আপন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজকোটে চলিয়া যান।

পোরবন্দরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী অবসর গ্রহণ করিয়া রাজকোটে অতিথিভাবে বসবাস করিতেছেন জানিতে পারিয়া রাজকোটের অধীশ্বর ঠাকুর সাহেব তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আপন দেওয়ান সাহেবের পদে নিযুক্ত করেন। করমচাঁদ রাজকোটে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবার মানসে বাস গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের বন্দোবস্ত করেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাজনৈতিক রাজপ্রতিনিধি (Political agent) মহাশয় রাজকোটের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার আদেশ মত সকল কার্য্যই সম্পন্ন হইত। ঠাকুর সাহেবের কোনও অধিকার ছিল না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া যেটুকু অধিকার দিতেন তাহাতেই ঠাকুর সাহেবকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। এমন কি ... নিয়োগে বা অপসারণে রাজপ্রতিনিধি মহাশয়ের ইঙ্গিতই যথেষ্ট হইত।

একবার কোনও কারণে সহকারী (Political agent) মহাশয় রাজপুত্র সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। করমচাঁদ প্রভু পুত্রের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোরতর প্রতিবাদ করেন, ইহাতে সহকারী মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া করমচাঁদকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। করমচাঁদ কোনও মতে স্বীকৃত না হওয়ায় তাঁহাকে বন্দী করিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য বৃক্ষতলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহাতে ... সাধারণ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলে ক্ষমা প্রার্থনার দাবী ছাড়িয়া দিয়া আপোষে গোলমাল মিটান হয়। ইহার পর হইতে তাঁহারা বেশ সদ্ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন।

স্বদেশহিতে উৎসর্গীকৃত জীবন, বিদেশে ভারতবাসীর সম্মান রক্ষক এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় অত্যাচার নিগৃহীত ভারত সন্তানদিগের অদ্বিতীয় নেতা মহানুভব শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ইঁহারই তৃতীয় সন্তানরূপে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

দেওয়ান সাহেব করমচাঁদ পুত্রের জন্মোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া উৎসবান্তে আত্মীয়স্বজনের অনুমোদনে প্রিয়দর্শন পুত্রের মোহনদাস নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কুল জ্যোতিষী মহাশয় যতদিন না রাশি চক্র নক্ষত্রাদির স্থান গ্রহাবেশ গণনা করিয়া কোন অক্ষরানুযায়ী বালকের নামকরণ হইতে পারে তাহা স্থির করিয়া দিয়াছিলেন ততদিন কেহই বালককে মোহনদাস বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে জ্যোতিষী মহাশয়ের গণনানুযায়ী মোহনদাস নামকরণে কোন প্রকার আপত্তি না থাকায় দাক্ষিণাত্যের রীতানুযায়ী পুত্রের রাশি নামের পশ্চাতে পিতৃনাম সংযোজিত হইয়া বালকের নাম রাখা হইল "মোহনদাস করমচাঁদ।"

দেওয়ান সাহেব করমচাঁদ কেবল মাত্র ... পন্ন ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা নহে, ... জন ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত ...লেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আচার নিয়মগুলি ...তি যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেন। সমগ্র ...বৎগীতা কণ্ঠস্থ করিয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্ম নিষ্ঠার ...রিচয় দিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত ...কিতেন। তাঁহার সংসারাসক্তি বা অর্থলিপ্সা ...াদৌ ছিল না। কথিত আছে তিনি রাজকোটের ...সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, ঠাকুর ...হেব দীর্ঘকালব্যাপি কার্য্য নৈপুণ্যের পুরস্কার ...প তাঁহাকে ইচ্ছাগত ভূমি গ্রহণ অনুমতি করেন। ...মচাঁদ ইহাকে উৎকোচ গ্রহণের সমতুল্য মনে ...রিয়া সগর্ব্বে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে ঠাকুর ...হেব সস্নেহে বলিয়াছিলেন "তুমি তোমার সন্তান ...র জন্য কি রাখিবে, তাহাদের ত গ্রাসাচ্ছাদনের ...াবস্ত চাই, তাই বলিতেছি ইচ্ছামত ভূমি গ্রহণ ...।" করমচাঁদ বিশেষরূপ অনিচ্ছুক থাকিলেও ...ীয় স্বজনের অনুরোধে ও তিরস্কারে ইতস্ততঃ ...রিয়া চারিশত গজ দীর্ঘ এক খণ্ড ভূমি গ্রহণ ...রিয়াছিলেন।

করমচাঁদ আপন কার্য্যকালে যাহা কিছু সঞ্চয় ...রিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ দান ধ্যানে ব্যয় ...রিয়াছেন।

মোহনের মাতা করমচাঁদের দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন। ...নি অতীব নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। ধর্ম্মার্থে ...ন্ত কৃচ্ছ্র সাধন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না এমন কি অনেক সময় সপ্তাহকাল উপবাস ...রিয়া কঠোর সংযম ব্রত সাধন করিতেন। তিনি ...পন ধর্ম্মপ্রাণতা দ্বারা গৃহের হাওয়া বদলাইয়া ...য়াছিলেন। লোকে তাঁহাদের গৃহে আসিলে যেন ...র সুবিমল গন্ধ আঘ্রাণ করিতেন।

তিনি সন্তান প্রতিপালনাদি বিষয়ে কঠোর শাসনের পক্ষপাতিনী ছিলেন! কিন্তু কঠোর শাসন ...ত্বেও অত্যধিক দয়া ও স্নেহ প্রবণতাবশতঃ সন্তানেরা তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন।

গান্ধি পরিবারে বহুবিবাহ বা অবরোধ প্রথা ছিল না। মোহনের মাতা স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতেন। কাহারও কোন প্রকার অসুখ হইলে তিনি রাত্রিরপর রাত্রি জাগরণ করিয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতেন। প্রতিবেশী আশূদ্রব্রাহ্মণ কাহার কোনও প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হইলেই তিনি তাঁহার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।

প্রতিদিন প্রাতে বুভুক্ষিত অতিথিগণ মুষ্টি ভিক্ষা বা পান পাত্র পূর্ণ তক্র লাভে বঞ্চিত হইত না।

মোহনের মাতা অতীব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না নারী ছিলেন। তদীয় পতিদেবের মন্ত্রীত্ব কালে তিনি রাজান্তঃপুরে যাইয়া রাজ পরিবারস্থ মহিলাদিগের সহিত নানাবিধ রাজনীতির কূটতত্ত্ব সকল আলোচনা করিতেন। রাজকোটের রাজান্তঃপুরে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

মোহন পিতার শেষ অবস্থায় তাঁহার একমাত্র নিত্য সহচর ও সেবক হইলেও পিতাপুত্র মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধা থাকিলেও তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতৃদেবী সম্বন্ধীয় কোনও কথা বলিতে গেলে মোহনের স্বর নম্র হইয়া আসে এবং প্রেমভক্তিতে নয়নদ্বয় আপ্লুত হইয়া উঠে।

রাজকোটের দেশীয় বিদ্যালয়ে মোহনের বিদ্যারম্ভ হয়। পরে কাঠিয়াবাড় উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তিনি ১৭ বৎসর বয়ঃকালে আমেদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয় লইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাবনগর কলেজে ভর্ত্তি হন। যে মোহনদাস বাল্য বিবাহের ঘোরতর বিরোধী সেই মোহনদাসের অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল। ভারতের সমাজ সংস্কারকদিগের অধিকাংশেরই জীবনে এইরূপ বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বাল্যে বিবাহিতা অভিন্নহৃদয়া পত্নীর সমপ্রাণতায় ও প্রেমে সৌভাগ্যবান হইলেও মোহনদাস মনে করেন বাল্যবিবাহে পতিপত্নী কখনই সুখী হইতে পারেন না, এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে বাল্যবিবাহ যে কেবলমাত্র আমাদিগের জাতীয়

জীবনের জীবনী শক্তি নাশ করিতেছে তাহা নহে বাল্যবিবাহ আমাদিগের জাতীয় জীবনের সকল প্রকার দুর্গতির একমাত্র কারণ।

মোহন যখন উচ্চবিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ করিতেছিলেন তখন ধর্ম্ম বিশ্বাস লইয়া এক মহা সমস্যায় পতিত হন। এতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোনও প্রকার সংশয় তাঁহার মনোমধ্যে উপস্থিত হয় নাই। তিনি এতদিন সরল বিশ্বাসে বুঝিয়াছিলেন "মৃৎশীলা ধাতুদার্বাদি" যাহাই হউক না কেন সকলই দেবতা। কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন ও বিশ্বাস করিতেন যে যখন "লোষ্ট্রকাষ্ঠাদি" নির্ম্মিত প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাহারা ভগবৎ সত্ত্বায় পূর্ণ হয় এবং তিনি তখন যাহাকে পূজা করিতেছেন, তাহা স্বল্পাধারে অনন্ত স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নয় কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ধর্ম্মভাবাপন্ন সহপাঠিদিগের সংস্রবে আসিয়া এবং জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতে তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে মত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তাঁহার পূর্ব্বকার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি সংশয়বাদী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার জিজ্ঞাসু প্র… সকল বিষয়েরই যথার্থ তত্ত্ব জানিবার জন্য অতি… ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রত্যেক বিষয়েরই "কি" "কেন" "কোথা হইতে আসিল" জানিবার আকা… তাঁহার মনোমধ্যে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার সরল বিশ্… জাত মাতৃদত্ত ধর্ম্ম শিক্ষার সহিত তুমুল সংগ্রা… সৃজন করিল। তিনি পৌত্তলিক পূজাতে বিশ্বা… রাখিতে না পারিয়া তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখি… লাগিলেন। পৌত্তলিকবাদ এমনি ক্ষণভঙ্গুর, অ… বিচার শূন্য কুসংস্কার পূর্ণ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত… তাহাতে একবার সন্দেহ হইলে মানুষের অন্য গতি… থাকিয়া তাহাকে নাস্তিকতায় আনিয়া উপনীত করে… মোহনদাসের তাহাই ঘটিল, তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসবি… নাস্তিক হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে প্রাচী… রীতিনীতি, আচার ব্যবহার পূজা অর্চ্চনা একে এ… তাঁহার জীবন হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

মাতৃ দর্শনে।

স্নেহময়ি-ধাত্রি! আমরা তোমায় ভুলিব কি প্রকারে? তোমায় ভুলিলে আমাদের অস্তিত্ব কোথায় থাকে? যেদিন অবোধ শিশুর আঁখি তারকায় মোহন তুলিকা বুলাইয়াছিলে, সেদিন যখন ঐ বিমল পরশনে বিশ্ব সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব ছটা আমার নয়ন কোণে প্রথমে প্রতিভাত হইয়াছিল, তখনিত বুঝিয়াছিলাম, তোমার পূত চরণ-ধূলির প্রতি রেণুর সঙ্গে আমার অস্তিত্ব এক অপূর্ব্ব সম্মিলনে মিলিত হইয়াছে। পল্লী-বাটের সুশীতল স্বচ্ছ সরোবর তটে, নির্জ্জন বেতস কুঞ্জের ছায়ায়, পিকবর মুখরিত বকুল বৃক্ষতলে, আর বাসন্তী মলয়ের মৃদুল হিল্লোলে-জাত নব কিসলয় সমন্বিত বটবৃক্ষের আশ্রয়ে তোমারই স্নেহাঞ্চলের অভিনব দৃষ্টি দেখিতে পাই। জননি! আমরা তোমায় ভুলিব ও কথা আর বলিও না, বিশ্বের খে… প্রাঙ্গণে যখন দণ্ডায়মান হই, সেখানে সহ… সহানুভূতি কই? প্রতিযোগীতার ভীষণ কষা… শিশুর স্বাভাবিক সরলতা মাখা সম্ভাষণত খুঁ… পাই না? যোগ্যতমের জয়ের ক্ষেত্রে বুঝি ভ্রাতৃপ্রে… মাধুরী নাই। তাই যখন সন্ধ্যাসমাগমে স… আপন খেলায় মত্ত থাকিয়া অর্থহীন দৃষ্টিতেও আ… প্রতি চাহে না, তখন ধূসরিত অঙ্গে নয়নের … মা মঙ্গলা, তোমার ঝিল্লীমন্ত্র মুখরিত স্তিমিত প্র… লোকে উদ্ভাসিত পর্ণ কুটীরের স্মৃতি আমার … জাগিয়া উঠে। মাতঃ, তুমি পল্লীগ্রামের বৃক্ষের … রালস্থিত নির্জ্জন ক্ষুদ্র কুটীরে আছ, আবার … লায়িত কেশে, বরাভয় প্রদায়িনীরূপে স্মিত ব…

…নের মঙ্গল হেতু পিযূষ নির্ঝর ধারা বক্ষে ধারণ করিয়া হিমাদ্রির উন্নত শৃঙ্গে রাতুল চরণ স্থাপন করিয়াও আছ।

দেবি! তুমি বুঝি বিশ্বমানবের মাতা, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে অমৃতময় স্তন্যদানে পরিপুষ্ট করিতেছ। সুমঙ্গলে, তোমার ঊর্দ্ধে উন্নমিত গৌরব মণ্ডিত মস্তকে সর্ব্বদাই বিধাতার আশীর্ব্বাদ সূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত হইতেছে, পদতলে সিন্ধু তোমার জয় গাথা গাহিতেছে, মেখলা সদৃশা সিন্ধু ও জাহ্নবী অস্ফুট মধুর কলধ্বনিতে তোমার প্রাচীন কালের গৌরবময় বারতা জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিতেছে। স্নেহময়ি! স্নেহই তোমার বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান, তাই অবোধ বিশ্বসন্তানের আবদারকে মাতৃ স্নেহের প্রকট …মনে করিয়া বাৎসল্যের বাহুল্যে আরও বক্ষে টানিয়া তুলিতেছ। তোমারই স্নেহ হস্তের মঙ্গল পরশনে বুঝি সমগ্র বিশ্বের জটিল তত্ত্বের সমাধান হয়।

জননি! তুমি নিজে দেবী হইলে কি হইবে, তুমি যে মনুষ্য সন্তানের মাতা, তাই সেদিন তোমার পদ্মরাগ রঞ্জিত নয়নের শুভ দৃষ্টি পৃথিবীর বক্ষে পড়িয়াছিল। তোমার উষ্ণ শ্বাস আসমুদ্র হিমাচল অনুভব করিয়াছিল, আর কোটী কণ্ঠের আবাহন গীতি তোমার চরণ কিঙ্কিণী-ধ্বনির সঙ্গে ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে উঠিয়াছিল। সে দিন দেশের মধ্যে সাড়া পড়িয়াছিল, মা আসিবে; তোমার কত ভক্ত সন্তান পূজার অর্ঘ সম্ভার লইয়া বসিয়াছিল, আমিও আমার জীর্ণ কুটীর খানির কোণে তোমার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম। শুক্ল পক্ষের সপ্তমীর চন্দ্র সেদিন দূর ভাগিরথী বক্ষে স্বর্ণ সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিল, নৈশ সমীরণ নিশিথের নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া কৌমুদী পরিপ্লুতা রজনীগন্ধার কর্ণে তোমার অভিনব আগমনী বার্ত্তা জানাইতেছিল, আমি একহস্তে গন্ধদীপ ও অপর হস্তে চন্দন চর্চ্চিত কুসুমদাম লইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছিলাম। হঠাৎ দ্বারদেশে কাহার করাঘাত শ্রবণ করিলাম! ভাবিলাম, তুহিন সম্পাতে কাতরা প্রকৃতির ক্লেশময় পথ বাহিয়া মা বুঝি আজ গর্ভ-ধারিণী মায়ের মত সন্তানের দ্বারে উপস্থিত। ধূপ দীপ সমন্বিত অর্ঘপত্র ভূতলে রাখিয়া হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া মায়ের আহ্বানে চলিলাম। আমার ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে দেখি অসহায় জননী, শীতে কম্পমানা, ক্ষুদ্র আর্ত্ত শিশুকে অঙ্কে ধারণ করিয়া দীন নয়নের অবিরল ধারায় আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছেন। কে যেন অন্তরের গভীরতম স্থল হইতে ডাকিয়া বলিল, এইত আগমনীর সূচনা!

আমি ডাকিলাম, "এস মা আমার গৃহে এস! আজ যে বিশ্বের মাতা আমার গৃহে আসিবেন, আজ দেশ বিদেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর স্থান এখানে নাই, আজ হিংসা দ্বেষ নাই, এখানে সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই, করুণাময়ী আজ পাটে বসিবেন, আইস আমরা সকলে আজ তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করি।" অমনি হবি সংসৃষ্ট যজ্ঞ কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়া শিশু দেহে তাপ প্রদান করিলাম। গৃহ পার্শ্বে শয্যা প্রস্তুত করিয়া বলিলাম, "মাতঃ, শান্তিময়ী নিদ্রার কোলে আশ্রয় লইয়া ক্লেশ দূর কর।"

তখন রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, ঊষার ধূসর অঞ্চলের আভা পূর্ব্বাকাশে কেবল প্রতিভাত হইতেছে। বালার্ক কিরণের প্রথম ছটা তখনও ঊষা দেবীর সীমন্তে অঙ্কিত হয় নাই। কেবল শ্যামলা ধরিত্রীর বক্ষে চ্যুত কুসুম দাম সুগন্ধি বিতরণে বিহঙ্গকুলের প্রভাতী সঙ্গীতের পূর্ব্বভাগ সূচনা করিতেছিল। তখন তন্দ্রার সুখময় পরশনে অলসনেত্রে দেখিলাম, মা আমার আসিয়াছেন, আমার ক্ষুদ্র কুটীর আজ স্বর্ণমণ্ডিত হইয়াছে, প্রীতির মধুর হিল্লোলে আজ চারিদিক পুলকিত।

বলিলাম, "মা আজ তোমার আহ্বান চতুর্দ্দিকে, আজ তোমাকে ঘিরিয়া অগণিত সন্তান কোটী কণ্ঠে তোমার আহ্বান গীতি গাহিতেছে, তাই পর্ণকুটীরের দরিদ্র সন্তানের ক্ষুদ্র আয়োজনের কথা ভুলিয়াছ!" বিকচ দর্শনে অপূর্ব্ব জ্যোতির স্ফুরণ হইল, পর মুহূর্ত্তেই দেখি, মা যেন সেই ক্ষুদ্র শিশুকে অঙ্কে লইয়া আমারই ক্ষুদ্র গৃহের প্রান্তে পর্ণশয্যায় আসন বিস্তার করিয়া উপবেশন করিলেন। হর্ষে ও বিস্ময়ে আমি পুলকিত হইলাম। ভাবিলাম, মা কি সত্যই জীর্ণ

কুটীরে লক্ষ তাপসের বাঞ্ছিত পদ স্থাপন করিলেন? আমি বসুন্ধরায় মস্তক লুটাইয়া মা, মা, রবে গৃহখানি মুখরিত করিলাম।

তারপর—যখন নয়ন মেলিলাম, দেখি রন্ধ্রপথে রবির কিরণ মায়ের আননে পড়িয়াছে। গত রজনী[...] আগতা জননী যেন নিজ গৃহেই নিদ্রিতা, আর মা[...] ক্রোড়ে শিশু শিশিরস্নাত সেফালিকার মত শোভা পাইতেছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়।

ব্রাদার লরেন্সের পত্রাবলী।

[নিকোলাস্ হারমেন ফ্রান্সের অন্তর্গত লোরেনের অধিবাসী—এক অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে তিনি পাকশালা[...] পরিদর্শকের কার্য্য করিতেন। তৎপরে এক সৈনিকের পদে কিছুকাল কার্য্য করেন। সর্ব্বশেষে প্যারী নগরের "কারমেলাইট"[...] সম্প্রদায়ভূক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি ব্রাদার লরেন্স নামে জগতে পরিচিত।

কোন এক শীত ঋতুতে একটি বৃক্ষ দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তার উদয় হয়, এখন এই বৃক্ষটি কি প্রকার শ্রীহীন, পত্র না[ই] পুষ্প নাই, একেবারে শুষ্ক। কিন্তু বসন্ত সমাগমে পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইয়া বৃক্ষটি কেমন মনোরম শ্রীই না ধারণ করি[বে।] ভগবানের কি অসীম জ্ঞান ও শক্তি ইহার মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর।]

ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে বাস করা আমার পক্ষে সহজ হইয়াছে। এ যেন এখন আমার কাছে স্বাভাবিক কার্য্যের মধ্যে একটি কার্য্য। আমার এমন অবস্থা কারুণিক ঈশ্বরের করুণার বিশেষ দান বলিয়া স্বীকার করি। আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না আমি এ বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখি কিন্তু তোমার একান্ত অনুরোধ, আমার মনের এরূপ অবস্থা আমি কি উপায়ে লাভ করিলাম তাহা তোমাকে পত্র লিখিয়া জানাই। তাই আমার ঘোরতর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার ইচ্ছা প্রবল দেখিয়া আমি তোমার এই অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। সুতরাং তোমাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আমি চাই এ পত্র কেবল তুমিই পড়িবে—দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখাইবে না। যে পথ অবলম্বন করিয়া আমি ঈশ্বরের নিত্য সহবাসে দিন কাটাইতেছি তাহা এই—

ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার পন্থা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দর্শন করিয়া, আধ্যাত্মিক জীবনের সাধন প্রণালীর মধ্যেও দ্বন্দ্ব রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া আমার মনের ভিতরে এই চিন্তারই উদয় হইল যে, এই সকল গ্রন্থ দ্বারা আমি উপকৃত হইব না। আমি যাহার অন্বেষণে ছুটিয়াছি—কেমন করিয়া একেবারে ঈশ্বরেরই হইয়া যাইব—তাহা[র] পথ ঐ প্রকার গ্রন্থসমূহ সুগম করিয়া দিতে পারি[বে] না। পক্ষান্তরে উহারা আমাকে ঘোরতর বিপাকে ফেলিয়া দিবে। আমি সেইজন্য মনস্থ করিলাম আমার বলিবার যাহা কিছু আছে সকলই চিরকাল[...] জন্য ঈশ্বরকে সমর্পণ করিব। যাহাতে তিনি আমা[র] সমস্ত পাপ হরণ করিয়া লইবার সুযোগ পান[...] নিমিত্ত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই হাতে [...] করায় আমি এক নূতন জীবন লাভ করিলাম—[...] জগতে আর কেহই নাই কেবল তিনি আর আমি [...] যেন আমাদের মধ্যস্থলে অন্য কিছুই নাই, আমি[...] ভিতরে তিনি এবং তাঁহার ভিতরে আমি, এইভা[বে] দিন যাপন করিতে লাগিলাম। কোন কোন সময়[...] আমি নিজেকে আসামীর ন্যায় অপরাধী মনে করি[...] তাম আর ঈশ্বর যেন বিচারপতি। আমি তাঁহার[...] সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, তিনি আমাকে অপরাধের[...] জন্য উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন। আবার ক[...] কখন আমি তাঁহাকে আমার হৃদয়ের গভীরতম [...] প্রেমময় পিতার ন্যায় দর্শন করিতাম।

ঈশ্বর হইতে মন দূরে বিপথে ভ্রমণ করিতে[...] দেখিতে পাইলেই তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া[...]

[...]ত্তার মধ্যে নিমগ্ন করাইয়া দিতাম। এবং প্রাণের [...]বতাকে যতবার পারিতাম পূজার্চ্চনা করিয়া ধন্য [...]তাম। এই প্রকার কার্য্য করিতে আমাকে যার পর নাই শক্তি প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে—সহজে উহা সম্পন্ন হয় নাই। তথাচ ঈশ্বরের মধ্যে মনকে মগ্ন করিবার কার্য্য হইতে আমি ক্ষান্ত হই নাই, নানা প্রকার দুঃখ বিপদের মধ্যেও আমি ঐ পথ পরিত্যাগ করি নাই। [...] সময় মন যে ঈশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া আমার অজ্ঞাতসারে দূরে ভ্রমণ করিত তাহার জন্য আমি [কখ]ন উদ্বিগ্ন হই নাই, কখন প্রাণের শান্ত ভাব [হা]রাই নাই, কখন হতাশ হই নাই। সমস্ত সময়ে [প্র]তি ঘণ্টায় প্রতি মুহূর্ত্তে এমন কি কর্ম্মের ভয়ানক [...]ড়ের মধ্যেও আমার মন হইতে যাহা কিছু ঈশ্বর [চি]ন্তার পক্ষে অন্তরায় থাকিত সকলই দূর করিয়া [...]তাম। ইহাকেই আমি একমাত্র কাজ বলিয়া মনে [ক]রিতাম। যেমন প্রার্থনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঈশ্বর [...]র প্রতিকূলের সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া দেওয়া [আ]মার কার্য্য তেমনি সমস্ত দিনের মধ্যে ঐ প্রকার [কা]র্য্য করাই আমার কর্ত্তব্য বলিয়া জানিতাম। ইহাই আমার সহজ সরল উপায়। ধর্ম্ম জীবনের [...]বেশের আরম্ভ হইতেই আমি এইটি অভ্যাস করিয়া [আ]সিতেছি। যদিও আমি ভাল করিয়া এই পথে [...] আসিতে পারি নাই তবুও ইহা অবলম্বন [করি]য়া আমি প্রভূত উপকার পাইয়াছি। এই সকল [...]ণ, আমি খুব ভাল করিয়াই জানি, কেবল মাত্র [ঈশ্ব]রের করুণাতেই, কেবলমাত্র তাঁহার উদার প্রেমে-[...] সাধিত হইয়াছে। যেহেতু ঈশ্বরের শক্তি ব্যতি-[...]কে আমরা কোন কার্য্যই সম্পন্ন করিতে পারি [না]—বিশেষতঃ আমি যে অধমের অধম। আমরা [য]দি সকল সময়েই ঈশ্বরকে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে [স্থা]পন করিতে পারি তাহা হইলে অন্ততঃ জ্ঞাতসারে [এ]মন কোনই কার্য্য সম্পন্ন করিব না যাহাতে তিনি [অস]ন্তুষ্ট হইতে পারেন। আমরা যখন ঈশ্বরের সত্তার [ম]ধ্যে নিজেদের মনকে ডুবাইয়া রাখি তখন এমন [এ]কটি পবিত্র মুক্ত অবস্থা লাভ করি যাহার দরুণ ঈশ্বরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে প্রেমালাপ করিতে সক্ষম হই। তখনই তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিতে সাহস পাই,—যে করুণা ব্যতিরেকে আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না, যাহা একান্তই আবশ্যক—এবং তখনই প্রার্থনা ফলপ্রদ হয়।

উপসংহারে ইহাই বলিতে চাই যে বারংবার ঐ প্রকারের কার্য্য করিতে করিতে উহারা স্বাভাবিক হইয়া ওঠে। তখন মনে হয় না ঈশ্বরের জীবন্ত সত্ত'র বোধ আমরা বহু সাধনার ফলে লাভ করিয়াছি। তখন মনে হয় আমাদের জন্ম হইতেই আমরা এই বোধের মধ্য দিয়াই বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছি।

তিনি যে আমার ন্যায় পাপীর প্রতি এমন অসীম করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে আমার সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া তুমিও তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর। কেমন করিয়া যে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিব তাহা আমি কিছুই জানি না। তিনি আমার উপরে এতই প্রেম বর্ষণ করিয়াছেন যে, গুণ যতই কীর্ত্তন করি না কেন তাঁহার প্রেমের কার্য্যকে থর্ব্ব করিয়াই ফেলি।

জগতের সব কিছু ঈশ্বরের মহিমাই ঘোষণা করুক।

২

আমি যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতেছি সেই প্রণালী কোন গ্রন্থেই লিখিত নাই দেখিয়া উহার সম্বন্ধে তোমার অভিমত জানিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে তোমার পত্র পাইলে সুখী হইব। যদিও আমার নির্দ্দিষ্ট পথে জীবনকে চালনা করিতে এখন আমার কোনই কষ্ট বোধ হইতেছে না তবুও তোমার নিকট হইতে উহা যে ভাল প্রণালী এইটুকু মাত্র জোর পাইলেই আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

কিছুদিন পূর্ব্বে জনৈক ভক্তের সঙ্গে আমার ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হইতেছিল। তিনি বলিলেন আধ্যাত্মিক জীবন দাসের শঙ্কিত মন লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। তারপর অনন্ত জীবনের আশায় উহা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সর্ব্বশেষে পবিত্র প্রেমের

দ্বারা উহা পূর্ণতা লাভ করে। শঙ্কা, অনন্ত আশা এবং পবিত্র প্রেম এই তিনটির প্রত্যেকটির মধ্যে আবার ভিন্ন ভিন্ন ক্রম আছে। এই সকল ক্রমগুলি উত্তীর্ণ হইয়া তবে মানুষকে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনে উপনীত হইতে হয়। আমি কিন্তু এই সকল পন্থা অবলম্বন করি নাই। পক্ষান্তরে কেন জানি না, আমি দেখিলাম উহারা আমার আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নহে। ঐ সকল প্রণালী আমার অন্তর্নিহিত উৎসাহকে ভঙ্গ করিয়া দিল। এই কারণে ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভেই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার প্রেমের দানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিদান আমার ইহাই। ঈশ্বরের প্রতি আমার যে প্রেম তাহার জন্য অন্য সব কিছুকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

প্রথম বৎসর আমি আমার নির্দ্দিষ্ট প্রার্থনার সময়েতেই কেবল ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাহার মধ্যে নিজেকে মগ্ন রাখিতাম। আমার মন এই প্রার্থনার সময়ে দূরে ছুটিয়া যাইতে পারিত না, কারণ আমি তখন খুব নিবিষ্ট চিত্তে মৃত্যুর বিষয়, স্বর্গ-নরক এবং আমার পাপের বিষয়, সেই শেষ দিনের বিচারের বিষয় এই সমুদয় ধ্যান করিতাম। এইরূপে প্রথম বৎসর অতিবাহিত হইবার পর কয়েক বৎসর, তখন কেবল প্রার্থনার সময় নয়, কিন্তু সমস্ত দিবস ধরিয়াই এমন কি অত্যন্ত কর্ম্মের ভিড়ের মধ্যে পড়িয়াও আমি নিজেকে অতি সাবধানে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত রাখিতাম। তিনি আমার সঙ্গে রহিয়াছেন কেবল তাহাই নহে কিন্তু তাঁহার দ্বারা আমি বিধৃত হইয়া আছি ইহাই চিন্তা করিতাম।

কিছুকাল পরে আমি দেখিলাম প্রার্থনার সময়ে আপনা হইতেই আমার মন তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিত। বল প্রয়োগ করিয়া বাহির হইতে আমার মনকে তাঁহার সত্তার মধ্যে টানিয়া আনিতে হইত না। প্রার্থনা করিতে বসিলেই আমার অজ্ঞাতসারে আমার মন তাঁহার মধ্যে ডুবিয়া যাইত। এইরূপ অবস্থায় আমি বিপুল আনন্দ এবং শান্তিলাভ করিলাম। ক্রমে যতই এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল ততই বুঝিতে পারিলাম শুদ্ধমাত্র জ্ঞানে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা আমাদের যতই উজ্জ্বল হউক না কেন তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। একমাত্র অন্তরের ভিতরকার বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা তাঁহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। তিনি যে অনন্ত, তিনি যে সকল ধারণার অতীত, তাঁহাকে জ্ঞানে আমরা কেমন করিয়া লাভ করিব।

এমন করিয়া আমার ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হয়। এখানে অবশ্য একথা স্বীকার করিব যে, প্রথম দশ বৎসর আমি যার পর নাই যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। আমাকে অসহ্য অশান্তির মধ্যে দিন কাটাইতে হইয়াছে। যতদূর তাঁহার হইয়া যাইব বলিয়া বাসনা করিয়াছিলাম ততদূর তাঁহার হইয়া যাইতে পারি নাই বলিয়া, অতীতের পাপ রাশি মনের মধ্যে সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকিত বলিয়া যে সমস্ত অনুগ্রহ তিনি আমার উপরে বর্ষণ করিয়াছেন, আমার মত পাপী যাহার অধিকারী হইতেই পারে না, সেই সমস্ত দানের বিষয় অনবরত চিন্তা করিতাম বলিয়া আমার মন বড়ই বেদনা অনুভব করিত। এই সময়ে নিরাশায় আমি প্রায়ই মুহ্যমান হইয়া পড়িতাম; পরক্ষণেই আবার আশায় পূর্ণ হইয়া উঠিতাম।

ঈশ্বরের নিকট হইতে যে অশেষ করুণা লাভ করিয়াছি বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতেছি তাহা আমার মন-গড়া অহঙ্কার মাত্র, বাস্তবিক তিনি আমার প্রতি কোনই করুণা প্রকাশ করেন নাই—এইরূপ চিন্তা সময় সময় আমার মনকে উদ্বেলিত করিত। সময় সময় এই চিন্তার উদয় হইত, আমার জন্য ঈশ্বর মুক্তির ব্যবস্থা করেন নাই। আমি মুক্তি লাভ করিব বলিয়া বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছি উহা আমার একটা প্রকাণ্ড ভ্রান্তি। এই সমুদয় চিন্তার দ্বারা আমি মধ্যে মধ্যে বড়ই অস্থির হইয়া পড়িতাম।

যখন সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই চিন্তাতেই মগ্ন রহিলাম যে, যন্ত্রণার মধ্যেই আমার জীবনের অবসান হইবে—যদিও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস

আমার তখন পর্য্যন্তও তিলার্দ্ধও হ্রাস হয় নাই বরং অশান্তিতে বিশ্বাসের মাত্রা বৃদ্ধি লাভই করিয়াছিল—এমন সময় অকস্মাৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। আমার আত্মা, অন্তরের অন্তরতম স্থানে এক গভীর অনির্ব্বচনীয় শান্তি অনুভব করিল। এখন যেন তাহার আর কোন প্রকারের শঙ্কা নাই—সে যেন এখন এক নিরাপদ আশ্রয় ভূমি লাভ করিয়াছে। সেই অবধি আমি প্রেম, বিশ্বাস ও দীনতার সহিত ঈশ্বরের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছি। সেই অবধি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছি, যাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এমন কোন কার্য্য যেন আচরণ না করি, এমন কোন চিন্তা হৃদয়ে পোষণ না করি।

আমার দ্বারা যাহা সাধিত হইতে পারে তাহা যখন আমি সাধন করিতে পারিয়াছি তখন আমি আশা করি আমার জীবনে ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই তিনি সম্পন্ন করিয়া লইবেন।

বর্ত্তমানে আমার মনের যেরূপ অবস্থা তাহা বাক্যে আমি প্রকাশ করিতে অসমর্থ। এখন আমার বলিতে কোন কষ্টই নাই কারণ এখন আমার মধ্যে আমার ইচ্ছার মৃত্যু ঘটিয়াছে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছাই আমার ভিতরে ক্রীড়া করিতেছে। সকল বিষয়েতেই তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া চলিয়াছি। আমি আপনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে এমন ভাবেই ছাড়িয়া দিয়াছি যে, তাঁহার আদেশ ব্যতীত একগাছি তৃণও ভূমি হইতে উৎপাটন করিয়া লই না। তৃণই উৎপাটন করি আর যাহাই করি না কেন, সকল কাজই তাঁহার প্রতি আমার প্রেম হইতেই করিয়া থাকি। তাঁহার প্রেম হইতে বিচ্যুত হইয়া অন্য উদ্দেশ্য লইয়া কোন কাজই সম্পন্ন করি না।

আমার মন যেরূপ প্রার্থনা করিতে চায়, সেইরূপ প্রার্থনা ব্যতীত আমি অন্য সর্ব্ব প্রকারের প্রার্থনা পদ্ধতি এবং পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করা নির্দ্দিষ্ট প্রার্থনা সমূহ পরিত্যাগ করিয়াছি। কেবলমাত্র তাঁহার বিদ্যমানতার অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হইতেছি। ইহাই আমার একমাত্র কর্ম্ম। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমবশতঃ এবং বিশেষ মনোনিবেশের দ্বারা নিজেকে আমি তাঁহার সত্তার মধ্যে নিমজ্জিত রাখিয়াছি। ঈশ্বরের সহিত আমার এই যোগকে আমি সাক্ষাৎ 'যোগ' বলি। আমার কথাটাকে আরো একটু জোর দিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই—এই যোগের অর্থ পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে স্বাভাবিক কথোপকথন, অতি গোপনে এবং অতি নীরবে। এই যে অবস্থা ইহা আমার প্রাণের গভীরতম স্থানে বিপুল আনন্দের সঞ্চার করে। সময় সময় এই আনন্দ হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং কখন কখন উহার মাত্রা এতই অধিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠে যে, বাধ্য হইয়া আনন্দকে উপশম করিবার উপায় আমাকে অবলম্বন করিতে হয়। পাছে লোকের সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই নিমিত্ত উহাকে সাধ্যমত দমন করিয়া রাখি।

ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল আমার আত্মা পরমাত্মার সহবাস জনিত ভূমা আনন্দ লাভ করিয়া আসিতেছে; আমায় আত্মা পরমাত্মার মধ্যে বিহার করিতেছে। এই বিষয়ে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই। আমার পত্র পাছে তোমার কাছে একঘেয়ে হইয়া আসে, এই নিমিত্ত আমি বহু বিষয় বাদ দিয়া গেলাম কিন্তু ঈশ্বর, যাঁহাকে আমি প্রাণের রাজা বলিয়া স্বীকার করি তাঁহার সন্নিধানে নিজেকে আমি কিরূপ ভাবে দাঁড় করাই তদ্বিষয়ে তোমায় কিছু লেখা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

আমি নিজেকে নরাধম বলিয়া বিবেচনা করি, পাপীদের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাপী, আমার মধ্যে যতকিছু পাপের বোঝা। রাজার বিরুদ্ধে এমন কোন পাপ নাই যাহা আমি আচরণ করি নাই। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আমি আমার সকল দুর্ব্যবহার, সকল পাপ তাঁহার নিকট স্বীকার করি। কিছুই গোপন রাখি না। অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিজেকে পূর্ণ মাত্রায় তাঁহারই হস্তে অর্পণ করি। যেন তিনি আমাকে লইয়া তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

অসীম প্রেমের আধার ক্ষমাশীল আমার রাজা তখন আমার পাপের জন্য কোন প্রকার দণ্ডবিধান

না করিয়া বরং তাঁহার অভগ্ন বুকের মধ্যে আমাকে প্রেমের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের দ্বার আমার নিকট উদ্ঘাটন করিয়া দেন। প্রিয়তম সেবকরূপে তিনি আমার পরিচর্য্যায় রত থাকেন। অহর্নিশ আমার সঙ্গ লাভের মধ্যেই, আমার সহিত বাক্যালাপের মধ্যেই যেন তাঁহার সমস্ত আনন্দ নিহিত আছে, তাই তিনি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। ইহাতেই তাঁহার আনন্দ, ইহাতেই তিনি পরম কৃতার্থ হন।

ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে রহিয়া সময় সময় আমাদের যোগ আমি ঐ ভাবেই অনুভব করিয়া থাকি।

তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকা, সর্ব্ব প্রকার আড়ম্বরশূন্য হইয়া তাঁহাতেই মনোনিবেশ করা, তাঁহার প্রতি মনকে নিরতিশয় আসক্ত রাখা, ইহাই আমার অত্যাবশ্যকীয় পন্থা। মাতার বক্ষঃস্থলে শিশুসন্তান যেমন নিশ্চিন্ত মনে আনন্দ সম্ভোগ করে আমি তাহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে নিরাপদ থাকি, অধিক পরিমাণে আনন্দ লাভ করি যখনই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হই। আমার এই প্রকার যোগ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই যোগে আমার যে অবস্থা হয় তাহাকেই আমি ঈশ্বরের বক্ষে বিহারের অবস্থা বলিয়া ঘোষণা করি। ইহাকেই বলি শ্রেষ্ঠ লাভ। ইহাকেই বলি ব্রহ্মলাভ। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে অমৃত রসের আস্বাদন পাই তাহা সকল বর্ণনার অতীত। ইহাকেই নির্ব্বাণ বলিয়া জানি।

আমার নির্দ্দিষ্ট প্রার্থনার সময়ে আমি আর অন্য কোন প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের সাধন-ভজন করি না। দিনের অবশিষ্ট সময় যে সাধন প্রণালী, যে অভ্যাসের ভিতর দিয়া যাপন করি, প্রার্থনার সময়ও সে অভ্যাসকেই সজীব রাখি। প্রার্থনার সময়ে অনেকবার মনে করি আমি যেন একখানি প্রস্তর খণ্ড আর তিনি যেন ভাস্কর। তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া আছি কারণ তিনি এই প্রস্তর খুদিয়া তাঁহার মনের মতন একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন। ঈশ্বরের সম্মুখে এমন ভাবে নিজেকে স্থাপন করিয়া আমি তাঁহার নিকট ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার অন্তরাত্মার ভিতরে তাঁহার একখানি নিখুঁত প্রতিকৃতি প্রস্তুত করেন এবং যেন সম্পূর্ণরূপে আমাকে তাঁহার মত করিয়াই গড়িয়া তোলেন।

কখন কখন প্রার্থনার সময়ে এমনও মনে হয়, আমি কোন শক্তি প্রয়োগ করিতেছি না, অতি সহজে আপনা হইতেই কেমন করিয়া জানি, আমার প্রাণ মন আত্মা জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধে আসিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মই যেন আত্মার চির বিশ্রাম স্থল।

এই অবস্থাকে নিরুদ্যমের অবস্থা, জড়তার অবস্থা, একটা স্বপ্নাবেশের অবস্থা বলিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিয়া থাকেন আমি জানি। তাঁহারা বলেন, এই অবস্থা শুদ্ধমাত্র একটি আত্ম-প্রসাদের অবস্থা, ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাস্তবিকই তাই। আমিও স্বীকার করি এমন অবস্থাকে নিরুদ্যমের অবস্থাই বলা যায়। আত্মা যদি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় তবে সে আত্মপ্রসাদ লোভনীয় সন্দেহ নাই, কারণ আত্মা সেই শান্ত অবস্থায় সে আর পূর্ব্বের মত কর্ম্মের আঘাতে চঞ্চল হইয়া ওঠে না। যে কর্ম্মের ভিতরে পূর্ব্বে সে ব্যাপৃত থাকিত এখন আর সেই কর্ম তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে না।

এই অবস্থার নাম যদি স্বপ্নাবেশ দেওয়া হয়, ইহাকে যদি একটা ভ্রান্তির অবস্থা বলিয়া অশ্রদ্ধা করা হয়, তবে কিছুতেই উহা আমি সহ্য করিতে পারি না। কারণ ঈশ্বরকে এমন মিষ্ট করিয়া উপভোগ করিতেছে যে আত্মা, সে যে আর অন্য কোন বস্তুই প্রার্থনা করে না, ঈশ্বরই যে একমাত্র তাহার কামনার বস্তু। এই অবস্থা যদি আমার পক্ষে আত্ম-প্রবঞ্চনার অবস্থাই হয়, তবে স্বয়ং ঈশ্বরই ইহার প্রতিকার করিবেন। তাঁহারই হস্তে সেই ভার ন্যস্ত আছে। আমাকে লইয়া তিনি যাহা করিতে চাহেন, তাহাই করিবেন। আমার জীবনে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আমি কেবল তাঁহাকেই লাভ করিতে চাহি। আমি কেবল তাঁহারই হইয়া যাইতে চাহি।

এই বিষয়ে তুমি তোমার মতামত লিখিয়া আমাকে বাধিত করিবে। আমি তোমার মন্তব্যকে মূল্যবান বলিয়া জ্ঞান করি, যে হেতু তোমার প্রতি আমি অতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকি।

শ্রীহিমাংশু প্রকাশ রায়।

... by Shiva Prasad Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { মাঘ, ১৩২০। } ৭ম সংখ্যা।

তুর্কী বিদ্যালয় পরিদর্শন।

২রা জুন, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ দার্দ্দানেলিসের হাঁস...পাতালে চা বিস্কুট খাইয়া নিম্নশিক্ষার বিদ্যালয় পরি-...র্শন করিতে গমন করি। স্কুল ইন্‌স্পেক্টর সাহেব আমাদের সঙ্গে গমন করেন। আমাদের মিশনের ...ন্যতম সভ্য ডাক্তার মির্জ্জা রেজাও আমাদের সঙ্গে ...মন করেন। প্রথমতঃ আমরা একটী প্রাইমারী বিদ্যালয়ে গমন করি। স্কুলটী বেশ সুসজ্জিত। ...হের চতুর্দ্দিকের দেওয়ালে নানাপ্রকার জীবজন্তুর সুন্দর সুন্দর চিত্র এবং পৃথিবীর সকল দেশের মানচিত্র ...লান ছিল। এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৫০।৬০টী বালিকা এবং কয়েকটী বালক অধ্যয়ন করিয়া থাকে। কোমলমতি বালক বালিকাদিগের শিক্ষার ভার শিক্ষয়িত্রীদিগের হস্তে। দুইজন তুর্কী শিক্ষয়িত্রী এবং একজন ফরাসী শিক্ষয়িত্রী এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা দানে নিযুক্ত আছেন। বালিকাদিগের সঙ্গীত এবং আবৃত্তি অতীব চমৎকার এবং সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। আট বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা ফাতেমা যখন টেবিলে দাঁড়াইয়া স্বদেশের সন্তানদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক তেজঃপূর্ণ ভাষায় যুদ্ধে গমনের জন্য বক্তৃতা করিতে লাগিল; তখন বালিকার তেজস্বিতা, সজোরে এবং সদর্পে টেবিলে পদাঘাত, তীব্র উত্তেজনা, এবং তাহার মুখ চোখের প্রদীপ্ত ভাবে আমরা বিস্মিত হইয়া গেলাম! তাহার পরে শিক্ষয়িত্রী আরও দুইটী বালিকা এবং একটী বালকের স্বদেশপ্রেমের বক্তৃতা শুনাইলেন। তাহাও অতীব তেজঃপূর্ণ এবং সরস ও সারগর্ভ। এত কোমল বয়স্ক বালক বালিকাদের হৃদয় এত উত্তেজনাপূর্ণ, তাহা আমরা পূর্ব্বে কখনও ভাবিতে পারি নাই। জাতীয়ভাবে বালক বালিকাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ যেরূপ ভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে, তুর্কী জাতির সর্ব্বনাশ সাধনের

জন্য সমগ্র ইউরোপ ব্যাপিয়া যে ভীষণ ষড়যন্ত্রের চক্র ঘূর্ণিত হইতেছে, বল্কানপ্রদেশে তুর্কীদিগকে যেরূপ নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে; তাহা তুর্কী বালক বালিকাদের অন্তরে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

দেশের শিশুরা যাহাতে বড় হইয়া কালে ইউরোপকে উপযুক্ত প্রতিদান দিতে পারে, সেজন্য তুর্কী পিতামাতা স্ব স্ব সন্তানদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিতেছেন।

বালক-বালিকাদিগকে সামরিক কায়দায় ড্রিল এবং পারেড শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সূচীশিল্পও বালিকাদিগকে বেশ সুন্দরভাবে শেখানো হইয়া থাকে। সাধারণ ভূগোল, তুরস্কের ইতিহাস, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সহজগণিত প্রভৃতি নিম্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমি বালিকাদিগকে ভূগোল সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অতীব সন্তোষজনক উত্তর প্রাপ্ত হই। শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশের অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত বলিয়া বোধ হইল।

আমরা তিন ঘণ্টাকাল বালিকাদের শিক্ষাপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করি। এই তিন ঘণ্টাকাল কিরূপে অতিবাহিত হয়, তাহা আমরা ধারণা করিতেও পারি না।

অপরাহ্নে দার্দ্দানেলিস প্রণালীর পরপারে সুপ্রসিদ্ধ "কলিদন বহর" কেল্লার কাপ্তানের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য তথায় গমন করি। রফিকবে ও অন্যান্য কর্ম্মচারি এবং অফিসারগণ আসিয়া একটী প্রকাণ্ডকায় চানারবৃক্ষের মূলে রমণীয় স্থানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদের নৌকা তটে পৌছিবামাত্র তাঁহারা আমাদের আদর অভ্যর্থনা করেন। বিস্কুট চা এবং ফল মূল দ্বারা অতিথি সৎকার করেন। বাগান হইতে উৎকৃষ্ট গোলাপের তোড়া আনিয়া আমাদিগকে উপহার প্রদান করেন। তৎপর সৈন্যদিগের সহিত আমাদের রসি টানাটানি হয়। আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জয়লাভ করিতে পারি নাই। তুর্কীরা আমাদের অপেক্ষা যথেষ্ট বলশালী। তৎপর অফিসারদের সহিত রসি টানাটা[নি] করি, তাহাতেও আমরা পরাস্ত হই।

অতঃপর কিছুক্ষণ ফুটবল খেলা হয়। তাহাতে কোনও পক্ষই বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। খু[ব] জোরে বাতাস বহিতেছিল বলিয়া বেশীক্ষণ খে[লা] হয় নাই। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা দার্দ্দানেলিসের কর্ম্মচারী এবং অধ্যক্ষগণের নিকট হইতে বিদায় গ্র[হণ] করি। তাঁহারা গভীর অনুরাগ এবং প্রেমের সহিত আমাদিগকে বিদায় দান করেন। পুনঃ পুনঃ ব্যাকু[ল] ভাবে আমাদের করমর্দ্দন করেন। আমি "ঠাণ্ডা উর্দ্দি" অর্থাৎ গরমের দিনের উর্দ্দি পরিয়া গিয়া ছিলাম বলিয়া শীতল হাওয়ায় অত্যন্ত শীত বো[ধ] করিতে লাগিলাম।

৩০শে জুন, বুধবার।

অদ্য 'এদাদী' স্কুল পরিদর্শনে গমন করি[লাম]। ইহা আমাদের দেশের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সমান। মাইনর স্কুল পাশ করিয়া এখানে আসি[তে] হয়। ৩টী মাত্র শ্রেণী। "এন্‌মে-আখ্‌লাক" চরিত্র গঠন বিদ্যা অতি সুন্দর এবং বিশদভাবে এখানে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে! শিক্ষক, [মু]খে বলিয়া যান, আর ছাত্রগণ তাহার নোট লিখি[য়া] লয়। নোট লিখিবার পরে শিক্ষক পুনরা[য়] তাহা দেখিয়া দেন। এশিয়ার সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে অনেকগুলি ভৌগলিক প্রশ্ন করি। যথাযথ উত্তর পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা বলি। ছেলেরা বড় আহ্লাদি[ত] হয়। ভাষা জ্ঞানের অভাবে সাহিত্য সম্বন্ধে পরী[ক্ষা] করিতে পারি নাই। কোরাণশরীফের আবৃত্তি শু[নি]। একটী ছেলে আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দি[তে] পারে নাই। শিক্ষক তাহাতে দুঃখিত হইয়া ছেলে[টী]কে বলেন যে, "হে আফেন্দি! * তুমি তো[মার] হিন্দুস্থানের আফেন্দী ভ্রাতার সম্মুখে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে না; এ কিরূপ কথা!"

বালকটী এই কথায় কাঁদিয়া ফেলিল! তা[হার চক্ষু] বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। পরে অত্যন্ত [বি]নীত ভাবে বলিল যে, গত রাত্রে শরীর খারাপ [হ]ওয়ায় ভাল করিয়া পড়া শুনা করিতে পারে নাই! [আ]মি তুর্কী বালকের আত্ম-সম্মানের পরিচয় পাইয়া [মুগ্ধ] হইলাম। তৎপর জ্যামিতি গণিত এবং রসায়ণ [সম্ব]ন্ধে ছাত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করি। এখানে [ছে]লেরা ফরাসী ভাষাতেও কিছু জ্ঞানলাভ করিয়া [থা]কে।

এখানকার শিক্ষাপ্রণালী, আমাদের দেশের [অ]পেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হইল। বালকদিগের [মধ্যে] অনেককে দরিদ্র বলিয়া মনে হইল।

য়িহুদী বালিকা বিদ্যালয়।

দার্দ্দানেলিস নিবাসী আমাদের তুর্কী বন্ধু হোসেন [বে]বী এবং ডাক্তার সৈয়দ মহমুদ উল্লার সহিত ইহুদী[দি]গের বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে যাই। শিক্ষয়িত্রি[গ]ণ অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ [ক]রেন। একটি শিক্ষয়িত্রী বেশ ইংরাজী জানি[তে]ন, সুতরাং তাঁহার সাহায্যে আমরা প্রধান [শি]ক্ষয়িত্রীর সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করি। [বর্ত্ত]মান বল্কান যুদ্ধ এবং তুর্কী গবর্ণমেণ্টের বিপদের [বিষ]য়ের আলোচনার সময় প্রবীণা এবং প্রৌঢ়া শিক্ষ[য়]িত্রী গভীর দুঃখ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। [প্র]ধানা শিক্ষয়িত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন [যে] "তুর্কী ব্যতীত আমাদের আশ্রয় নাই। আমরা [তু]র্কী শাসনে এবং আশ্রয়ে পরম সুখে নির্ব্বিঘ্নে কাল[যা]পন করিতেছি। আপনি জানেন, তুর্কী গবর্ণমেণ্ট [আ]মাদিগকে আশ্রয় না দিলে পৃথিবীতে আমাদের [অ]স্তিত্ব থাকিত না। খৃষ্টানদিগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড [ও অ]মানুষিক অত্যাচার হইতে তুর্কীরাই আমাদের ধন [প্র]াণ রক্ষা করিয়াছে। তুর্কীর মঙ্গল ব্যতীত আমা[দে]র রক্ষা নাই।"

অতঃপর প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁহার এক পীড়িত [কন্যা]কে আমাদিগকে দেখান। ডাক্তার মহমুদ উল্লা তাঁহার এক প্রেস্‌ক্রপসন বা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেন। অনন্তর আমরা স্কুল পরিদর্শন করি। এখানে প্রাথমিক শিক্ষাও ফরাসী ভাষাতেই দেওয়া হয়। ফরাসী ভাষাই এখানকার ইহুদীদিগের মাতৃভাষা। ইহুদী জাতির জাতীয় ও ধর্ম্ম ভাষা হিব্রু, ইহারা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে! জাতীয় সঙ্গীত পর্য্যন্ত ফরাসী ভাষায় গীত হইল। একখানি হিব্রু হস্তলিপি পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় শিক্ষয়িত্রী অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিলেন যে, "আমরা কেহই উহা লিখিতে জানি না।" তবে একটী হিব্রু গান শোনা গেল। বালিকাদিগকে ভূগোল সম্বন্ধেও কিছু প্রশ্ন করিলাম। বেশ আশাজনক উত্তর পাওয়া গেল। ইহুদী বালিকাদিগকে তুর্কী বালিকাদিগের ন্যায় তেজস্বিনী এবং সুন্দরী বলিয়া বোধ হইল না। একটি বিবাহিতা বালিকাও ছাত্রীদিগের মধ্যে ছিল। তাহাকে অত্যন্ত নম্র ও লজ্জাশীলা বলিয়া বোধ হইল। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীগণের সহিত করমর্দ্দন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া ইহুদীদিগের উচ্চ বিদ্যালয় দেখিতে যাই। হেড্ মাষ্টার পরম সমাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করেন। আমি জল পান করিতে চাহিলে, তিনি অতি সমাদরে শ্রদ্ধাভরে জল দেন। তৎপর তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার স্কুলের সমস্ত ক্লাস এবং শিক্ষাপ্রণালী দর্শন করান। নিম্ন শ্রেণীতে বহুসংখ্যক শিশু বালক বালিকাকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা এক সঙ্গে যখন তালে তালে হাততালি দিতে দিতে ফরাসী ভাষায় গান করিতে লাগিল, তখন আমরা সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। প্রফুল্ল মেজাজবিশিষ্ট শিক্ষয়িত্রিগণ অত্যন্ত যত্ন এবং আদরের সহিত শিশুদিগকে শিক্ষাদান করিতেছিলেন। শিক্ষয়িত্রিগণ সহাস্যবদনে আমাদিগের সহিত করমর্দ্দন করিলেন। ছাত্রেরা আমাদিগকে বেশ কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে দেখিতে লাগিল। হেড্ মাষ্টার সাহেব গণিত এবং ভূগোল ও ইতিহাস সংক্রান্ত প্রশ্ন করিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের কৃতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন। নিম্ন শ্রেণীতে ক্ষুদ্র বালকদিগকে জীবজন্তুর চিত্র দেখাইয়া আমি তাহাদের নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। ভারতবর্ষের মানচিত্রের অনেক সহর ও প্রসিদ্ধ

* তুর্কীরা সকলকে বয়স এবং পদ নির্ব্বিশেষে "আফেন্দী" বা মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

স্থানের নির্দ্দেশ করিতে বলিলাম। অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরই সন্তোষজনক হইল। ভারতবর্ষের রাজধানী কি, জিজ্ঞাসা করিতে একটী বালক "কলিকাতা" বলিয়া উল্লেখ করিতেই আর একটী বালক তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "না, এক্ষণে দিল্লী।" এখানেও সমস্ত বিষয়ের শিক্ষাই ফরাসী ভাষাতে দেওয়া হয়। ইহুদী বিদ্যালয়ে কয়েকটি গ্রীক এবং ২৪ জন মুসলমান বালকও অধ্যয়ন করিয়া থাকে। স্কুল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ৪টা বাজিয়া গেল। তখন আমি হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে ছাত্রগণকে ছুটি দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। হেড্‌মাষ্টার সাহেবও স্মিতহাস্যে আমাকে ধন্যবাদ দিয়া স্কুল ছুটি দিলেন। অনন্তর আমরা হেড্‌মাষ্টার সাহেবের সহিত অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করিয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সিরাজী।

প্রভেদ বিস্তর।

১

শৈশবের সরলতা, হৃদয়ের পবিত্রতা,
অদম্য উৎসাহ ভরা সদানন্দ মন;
ছুটে ছুটে খেলা করা, গাছে চ'ড়ে আম পাড়া,
কোথায় সে দিন? সে যে স্বপন এখন!
কোথা সে বিশ্বাস-বল, কোথা সেই বন্ধুদল,
কোথায় সে শান্তি মাখা পবিত্র অন্তর?
সে সবের কিছু নাই, আছে শুধু স্মৃতিটাই,
সেই আমি, এই আমি, প্রভেদ বিস্তর!

২

শান্ত শৈশবের শেষে, কৈশোর লইল এসে,
হৃদয়ে নূতন কিছু করিল প্রদান;
আনি নূতনের মাঝে, সাজাইল নব সাজে,
শুনাইল কল্পনার অভিনব গান।
হৃদয়ের বৃত্তিচয়, ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়,
সংসারের শোভা ক্রমে হয় মনোহর;
সেদিন ছিলাম যাহা আজিও কি আছি তাহা,
সেই আমি, এই আমি, প্রভেদ বিস্তর!

৩

এ হৃদয় মাঝে আসি,' যৌবন বাজা'ল বাঁশী,
জীবনের সে যে এক স্মরণীয় দিন;
এ বিশ্ব সৌন্দর্য্যময়, উপাসক এ হৃদয়,
সৃষ্টি আর দৃষ্টি যেন সকলি নবীন!
নাহি মৃত্যু, নাহি জরা, সকলি অমৃতে ভরা,
কবিতায় মগ্ন যেন বিশ্ব চরাচর;
আছে বটে সেই সৃষ্টি, নাহি আর সেই দৃষ্টি,
সেই আমি, এই আমি, প্রভেদ বিস্তর!

৪

বুঝি নাই, প্রতিপলে, যৌবন গিয়াছে চ'লে,
প্রৌঢ় সেজে রঙ্গমঞ্চে করি অভিনয়;
শিথিল এ দন্তমূল, মাথায় পেকেছে চুল,
হইতেছে ইন্দ্রিয়ের শক্তি অপচয়।
চল্লিশ হ'য়েছে পার, সে উদ্যম কোথা আর?
এখন কেবল তা'র স্মৃতিই সুন্দর;
আয়ু যায় প্রতিক্ষণে, তবু নাহি ভাবি মনে,
সেই আমি, এই আমি প্রভেদ বিস্তর!

৫

এ প্রৌঢ়ত্ব হ'লে শেষ, ধরিব বৃদ্ধের বেশ,
উড়াইয়া জড়তার শিথিল নিশ্বাস;
প্রতি পদ সঞ্চালনে, দৌর্ব্বল্য বুঝিব মনে,
অবশ ইন্দ্রিয় দশ, আশাশূন্য প্রাণ।
এসো বন্ধু, ধর কর, আলিঙ্গনে অতঃপর
বুঝাও জগত মিথ্যা,—সকলি নশ্বর;
যে আমির পরিচয়, এখনও দিতে হয়,
সেই আমি, এই আমি, প্রভেদ বিস্তর!

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিব্যদেবী।

(২)

সেই নিমন্ত্রণই কিন্তু শ্রীসিংহ এবং দিব্যদেবীর কালস্বরূপ হইল। রাজা পদ্মসিংহ কয়েকদিন হইতে ভগিনী এবং ভগিনীপতির সর্ব্বনাশ সাধন করিবার নিমিত্ত সুবিধা খুঁজিতেছিলেন,—সেই সুবিধা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া যথাসময়ে রাণীকে লইয়া ভগিনীপতির বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিলেন। রাজা রাজড়ার কারবার, সঙ্গে কত লোকজন, চাকর চাকরাণী আসিল। কুমার শ্রীসিংহ এবং দিব্যদেবী মহাসমারোহে কুটুম্বদিগের অভ্যর্থনা করিলেন এবং নিজের ধনসম্পদের উপযুক্ত ভাবে সকলকে খাওয়াইলেন। নিমন্ত্রিত সকলেই খুব তৃপ্তির সহিত নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য, মিষ্টান্ন, ফলমূল ভক্ষণ করিলেন,—বহুমূল্য সুস্বাদু পানীয় পান করিলেন। পান ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে গীতবাদ্য, যাদুক্রীড়া, অগ্নিক্রীড়া প্রভৃতি আমোদ চলিতে লাগিল। অর্দ্ধ রাত্রির পর মহাসমারোহে এই মহাভোজ সমাধা হইয়া গেল এবং রাজা ও রাণী হাস্যমুখে কুমার শ্রীসিংহের প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। মুখে তাঁহারা খুব ভাব ভালবাসা দেখাইয়া গেলেন বটে, কিন্তু হিংসায় ও দুরাকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের হৃদয় পুড়িয়া যাইতেছিল। অতিশয় কষ্টে তাঁহারা নিজ নিজ মনের ভাব গোপন রাখিয়া মুখে খুব আদর আপ্যায়িত করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজকুটুম্বদিগকে বিদায় দেওয়ার পর কুমার শ্রীসিংহ ও দিব্যদেবী আপনাদের শয়ন ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রম ও ক্লান্তিবশতঃ শীঘ্রই উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িলেন। সহসা এক করুণ চীৎকারে দিব্যদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাদের গৃহের দ্বার দিয়া একজন বিকটবেশী পুরুষ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। উজ্জ্বল দীপালোক সেই ব্যক্তির মুখের পার্শ্বে পড়ায় তিনি উহাকে চিনিতে পারিলেন,—সেই ব্যক্তি তাঁহার ভ্রাতা রাজা পদ্মসিংহের প্রধান শরীর রক্ষক! দিব্যদেবী তখন স্বামীর শয্যার নিকটে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,—মাথা ঘুরিয়া গেল,—তিনি অবসন্ন ভাবে খট্টার এক দণ্ড ধারণ করতঃ বসিয়া পড়িলেন। বুদ্ধিমতী রাজকন্যার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতাই ঈর্ষ্যা ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের শরীর রক্ষককে দিয়া কুমার শ্রীসিংহের বধ সাধন করিয়াছেন। ঘাতকের ছুরিকা তখনও কুমারের বক্ষে আমূল প্রোথিত রহিয়াছে, তাঁহার রক্তে শয্যা ভিজিয়া গিয়াছে,—শ্রীসিংহের পরম সুন্দর মুখশ্রী একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে! দিব্যদেবী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তম পতি তাঁহাকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া গিয়াছেন,—কিন্তু তাঁহার যে দুর্ভাগ্য, তাহাতে স্বামী শোকে আচ্ছন্ন হইয়া সাধারণ স্ত্রীর মত ব্যবহার করিলে চলিবে না। তিনি বুঝিলেন যে, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তাঁহার ভ্রাতা আসিয়া অপুত্রক শ্রীসিংহের সমুদয় সম্পত্তি নিজ কোষভুক্ত করিবেন। কে তাঁহার সেই দস্যুবৃত্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারিবে? তাই তিনি এই দারুণ বিপদেও প্রগাঢ় ধৈর্য্য ধরিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। দেখ তাঁহার হৃদয়ের কি বল!

পরম বুদ্ধিমতী দিব্যদেবী আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার পরিচারিকা বিশ্বাসভাজন কয়েকজন ভৃত্য এবং কর্ম্মচারিকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদিগের সাহায্যে যাবতীয় মণিমুক্তা হীরকাদি রত্ন, নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও স্বর্ণরৌপ্য মুদ্রা এবং স্বর্ণরৌপ্যের সমুদায় পাত্র এবং মহার্হ পরিচ্ছদ তাড়াতাড়ি একত্র করিলেন এবং পুরুষ ও স্ত্রী সর্ব্বসমেত

এক শত বিশ্বাসী লোক সহিত স্বামীর মৃতদেহ ও ধনসম্পত্তি লইয়া অতি গোপনে অন্তঃপুরের গুপ্ত পথে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সখের জাহাজে গিয়া উঠিলেন। কুমার শ্রীসিংহের এক শত বাণিজ্য জাহাজ এবং একখানি সখের জাহাজ ছিল! সখের জাহাজখানি ভাসমান রাজপ্রাসাদ বলিলেই হয়। তাহাতে সর্ব্বসমেত ৫০০ পাঁচশত মানুষ নিজ নিজ আসবাব পরিচ্ছদাদি লইয়া পূর্ণ এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য সহিত সমুদ্র যাত্রা করিতে পারিত। আজকালকার "টাইটানিক" অথবা "ইমপারেটার" জাহাজের মত (১) বিশাল বিরাট জাহাজ সেকালে ছিল কি না বলিতে পারা যায় না,—না থাকারই সম্ভাবনা। এখনকার জাহাজের খোল ইস্পাতের পুরু পাত (যেমন তেমন পাত নহে,—৬ ইঞ্চ হইতে এক ফুট পুরু ইস্পাতের চাদর) দিয়া নির্ম্মিত হইতেছে,—পূর্ব্বে সমস্তই কাঠের ছিল। কেবল জাহাজের তলা তামা কি পিতলের পাত দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইত। যাহা হউক,—দিব্যদেবী নিঃশব্দে অত্যল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র লইয়া একশত পরিচারক পরিচারিকা এবং কর্ম্মচারী সহ, জাহাজে উঠিলেন। ঐ জাহাজে, উহাঁদের সুখের দিনে, যে গৃহে উভয়ে একত্র জলযাত্রা করিতেন,—ঐ গৃহে স্বামীর মৃতদেহ স্থাপিত করিলেন এবং রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই পোতাধ্যক্ষকে পশ্চিমদিকে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। এত গোপনে এই সকল কার্য্য সমাধা হইয়া গেল যে তাঁহাদের অধিকাংশ কর্ম্মচারী এবং দাসদাসী পর্য্যন্ত এই ব্যাপারের বিন্দুমাত্র কেহ জানিতে পারিল না।

এদিকে রাজা নিরতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত গুপ্তচরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, রাত্রি প্রভাত হইলেই শ্রীসিংহের অগাধ ঐশ্বর্য্য তাঁহার হইবে। শ্রীসিংহের পুত্রকন্যা নাই,—সুতরাং দেশের আইন অনুসারে তাঁহার সম্পত্তি রাজার। রাজা ভাবিতেতেছেন যে তাঁহার ভগিনী বা দেশের অপর কেহই বুঝিতে পারিবেন না যে তিনি শ্রীসিংহের মৃত্যুর কারণ। তিনি প্রাতঃকালে ভগিনীর কাছে গিয়া কেমন কপট ক্রন্দনে বুক ভাসাইবেন,—এবং কিরূপ কথা বলিয়া ভগিনীকে সান্ত্বনা দিবেন,—তাহা মনে মনে স্থির করিতেছেন। দিব্যদেবী এখনও বালিকা বলিলেই হয়,—সে সংসারের কি বুঝে?—তিনি যাহা বুঝাইবেন, সে বুঝিবে—তাহাই ভাবিতেছেন। অল্পদিন পরেই আবার কোন নিকটস্থ রাজপুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিবেন,—তাহাও চিন্তা করিতেছেন। শ্রীসিংহের বিশাল প্রাসাদ, তাঁহার অসংখ্য দাসদাসী, হয় হস্তী, যান বাহন,—তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন,—তাহারও একটা হিসাব করিতেছেন। রাণীকে তিনি এই সকল কথা কিছুই জানান নাই;—স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না,—যদি কোন প্রকারে গুপ্ত কথা বাহির হইয়া পড়ে,—এই ভয়ে তিনি তৃতীয় ব্যক্তির নিকট এই পরামর্শের রহস্য ভেদ করেন নাই। কেবল তিনি,—আর তাঁহার অস্ত্র স্বরূপ নররাক্ষস ভূষণ্ডী এই দুই ব্যক্তিতেই সকল পরামর্শ স্থির করিয়াছেন।

রাজা বিনিদ্র নয়নে এই সকল কথা ভাবিতেছেন,—সুখশয্যা তাঁহার নিকট কণ্টকময় বোধ হইতেছে,—উৎকণ্ঠায় কেবল ঘন ঘন পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছেন। এমন সময় শয়নঘরের গুপ্তদ্বারে মৃদু আঘাতধ্বনি হইল। সে কালের কেবল রাজা বাদশা নহেন,—প্রত্যেক বড়লোকের বাড়ীতেই নানাপ্রকার কল কৌশল থাকিত। গুপ্তগৃহ,—গুপ্ত দ্বার, গুপ্তসিঁড়ি, গুপ্ত সুড়ঙ্গ,—প্রভৃতি নানাপ্রকার কৌশল তাঁহারা করিতেন। আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এইরূপ নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইত। রাজা পদ্মসিংহের শয়নঘরের সহিত সংলগ্ন একটি গুপ্তগৃহ,—তাহার সহিত সংলগ্ন একটি সিঁড়ি ছিল। ঐ সিঁড়ি ঘুরিয়া ফিরিয়া একেবারে অন্তঃপুরের পশ্চাতের উদ্যানের মধ্যবর্ত্তী একটি ঘরে গিয়া উঠিয়াছে। ঐ ঘর রাজা এবং রাণী ভিন্ন আর কেহ ব্যবহার করিতে পারিত না। সিঁড়িটিও আবার প্রকাশ্য ভাবে ঐ ঘরে উন্মুক্ত হয় নাই;—ঘরে প্রবেশ করিয়া খুব ভাল করিয়া খুঁজিলেও কেহ উহা দেখিতে পাইবে না। উহার রহস্য যিনি না জানেন,—তিনি শত চেষ্টাতেও ঐ সিঁড়ির সন্ধান পাইবেন না। এই ঘর, সিঁড়ি এবং প্রাসাদের ভিতর শয়নঘরের সন্নিহিত গুপ্তগৃহ, ভাল মন্দ অনেক কাজেই লাগিত। শয়নঘরের পার্শ্বস্থ গুপ্তগৃহটি আরও নানাবিধ গুপ্তকৌশলে পূর্ণ ছিল।

যাহা হউক ঐ গুপ্তদ্বারে সংকেতধ্বনি শ্রবণ মাত্রেই রাজা নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করিলেন। দেখিলেন মহিষী অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তিনি অতি সাবধানে দ্বার খুলিয়া ঐ গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার প্রবেশ মাত্রেই ঐ দ্বার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। ঘরগুলির নির্ম্মাণ কৌশল এরূপ সংস্কার যে শয়নঘরের আলোক দ্বারাই গুপ্তঘরটিও আলোকিত হয়। রাজা ঐ গৃহে প্রবেশ মাত্রেই ভূষণ্ডী নিজ রক্তাক্ত ছুরি দেখাইয়া বলিল "এই দেখুন,—এই ছুরি শ্রীসিংহের বক্ষশোণিত পান করিয়া কেমন পরিতৃপ্ত হইয়াছে।" রাজা সভয়ে দেখিলেন যে প্রায় নয় ইঞ্চ পরিমাণ তীক্ষ্ণাগ্র ত্রিকোণ ও ত্রিশির ছুরিকা অগ্রভাগ হইতে মূলদেশ পর্য্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে। ভূষণ্ডী নিজের বাহাদুরী করিবার জন্য আরও বলিল "রাত্রির ভোজের সময় আমি কুমার বাহাদুরেরই একখানি ছুরিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম,—আমার নিজের এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রখানি উঠাইয়া লইয়া, সেখানি ক্ষতছিদ্রে আমূল বসাইয়া রাখিয়াছি। সেই ছুরির বাঁটে কুমারের নিজের নাম ও চিহ্ন আছে (১), কাজেই কাল প্রাতঃকালে লোকে ভাবিবে, যে কুমার নিজের কোন পরিচারকের দ্বারাই নিহত হইয়াছেন। তবে এই ছুরি তাঁহার বক্ষ হইতে তুলিয়া লইবার সময়ে রক্তধারায় আমার সমুদয় পরিচ্ছদ রক্তাক্ত হইয়া গিয়াছে।" রাজা পদ্মসিংহ প্রথমে পাষণ্ড ভূষণ্ডীর সাহস এবং সাবধানতার খুব প্রশংসা করিলেন। অবশেষে কহিলেন,—"ভূষণ্ডী, তুমি যেরূপ বিশ্বস্ত লোক,—তাহাতে তোমার এই পৃথিবীতে থাকা আর উচিত নহে। তোমার প্রাপ্য পুরস্কার আমি তোমার পুত্রকে দিব। যে ব্যক্তি সামান্য অর্থলোভে একটি নরহত্যা করিতে পারে, সে অধিক অর্থের জন্য আরও দুই চারিটি মানুষ মারিবে তাহাতে সন্দেহ কি? আর দেখ, এই ব্যাপারে তুমিই আমার বিরুদ্ধে এক সাক্ষী,—তোমাকে আমি কিছুতেই পৃথিবীতে রাখিতে পারি না,—অতএব এই তোমার পুরস্কার তুমি গ্রহণ কর। আমি রাজা, কাজেই তোমাকে দণ্ড দিবার অধিকারী।" হতভাগ্য ভূষণ্ডী রাজার বাক্যের অর্থ ভালরূপে বুঝিতে না বুঝিতেই রাজা পদ্মসিংহ তাহারই সেই ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতক অস্ত্র তাহার হৃদয়ে বসাইয়া দিলেন। ঐ অস্ত্র এমন তীক্ষ্ণাগ্র যে উহার অগ্রভাগ পাপাত্মার পৃষ্ঠদেশ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং সে কিছুমাত্র শব্দ বা চীৎকার করিবারও অবসর পাইল না,—একেবারে জড়বৎ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। রাজা তখন সেই গৃহতলের এক ভাগের কার্পেট উঠাইয়া একটি ধাতুময় ক্ষুদ্র বোতাম টিপিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই গৃহতলে একটি বৃহৎ অন্ধকারময় গহ্বর বাহির হইল,—তখন তিনি সেই হতভাগ্য নরহন্তার দেহ পদাঘাতে সেই গহ্বরে ফেলিয়া দিলেন। ঐ দেহ নিক্ষিপ্ত হইবার পর বহু নিম্নে "ঝপ" করিয়া একটি ক্ষীণ শব্দ হইল এবং সেই মুহূর্ত্তেই তিনি গহ্বর দ্বার রোধ করিয়া তাহার উপর কার্পেট ঠিক করিয়া দিলেন। যেরূপ দক্ষতার

(১) ইমপারেটার (Imperator) জাহাজখানি জার্ম্মানদের। উহা ৯২০ ফিট ৬ ইঞ্চ লম্বা, ৯৬ ফিট চওড়া এবং [illegible] গভীর এবং উহার ১১ তলা আছে। সোজা কথায় বলিতে গেলে উহা এগার তলা বড় রাজপ্রাসাদের মত। উহাতে বা[illegible] থিয়েটার, ব্যায়ামঘর, হোটেল, দোকান, সাঁতার কাটিবার ঘর বা পুকুর, নাচিবার ঘর, হাঁসপাতাল,—সবই আছে। ভোজ[illegible] গৃহটি ৩০০ ফিট লম্বা। একখানি জাহাজ না একটি সহর?

(১) এখনও রাজা রাজড়া এবং বড়মানুষ লোকে যেমন নিজ নিজ বংশমর্য্যাদার পরিচায়ক এক প্রকার চিহ্ন (যেমন আমাদের গভর্ণমেণ্টের সিংহ ও ইউনিকরণ ইত্যাদি) ব্যবহার করেন, প্রাচীনকালেও সে রীতি বর্ত্তমান ছিল। বীরপুরুষদিগের রণপতাকাতেও সেই চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত।

সহিত তিনি এই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা গেল যে ইহা তাঁহার প্রথম কার্য্য নহে। গুপ্ত গৃহের ভিতর কত হতভাগ্য যে এরূপ রাজপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক রাজা এই কার্য্য সমাধা করিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছেন ভাবিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে শয্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নিদ্রা হইল কি? কে জানে?

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা পদ্মসিংহ রাজসভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন এমন সময় তাঁহার প্রতীহারী একখণ্ড পত্র আনিয়া তাঁহার হস্তে দিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একেবারে ভগিনীপতির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া দেখিলেন, কুমার শ্রীসিংহের প্রধান কর্ম্মচারীবৃন্দ চিন্তামগ্ন ভাবে বসিয়া আছেন। রাজাকে দেখিয়াই সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট গিয়া গোপনে কি বলিলেন। তখন সেই প্রধান কর্ম্মচারীকে লইয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং অন্তঃপুরের প্রধান পরিচারিকা তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেল। রাজা দেখিলেন, কুমার শ্রীসিংহ, দিব্যদেবী এবং কতকগুলি দাস দাসী ও কতিপয় কর্ম্মচারী নাই। তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। তাঁহাদের অনুসন্ধানের জন্য রাজা চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন, শান্তিরক্ষকদিগের উপর ঐ বাড়ীতে কড়া পাহারা দিবার আদেশ হইল এবং সকল ঘরে বড় বড় তালাচাবি পড়িল। মধ্যাহ্ন সময়ে নৌ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী আসিয়া রাজার নিকট রিপোর্ট করিল যে কুমার শ্রীসিংহের সখের জাহাজখানি নাই এবং ঐ জাহাজের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কেহই নগরে নাই। অপর লোকে ব্যাপারের রহস্য বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, রাজা বুঝিতে পারিলেন যে দিব্যদেবী তাঁহাকে ফাঁকি দিয়াছে। যে দারুণ লোভে পড়িয়া তিনি এই পাপ করিলেন,—সে লোভ তাঁহার তৃপ্ত হইল না। দিব্যদেবী সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া কোন দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছেন।

ক্রমশঃ অনুসন্ধান শেষ হইয়া গেল, কিন্তু কোন স্থানে দিব্যদেবীর সংবাদ পাওয়া গেল না। রাজার মনে একটা দারুণ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, পাছে ভগিনী নিকটস্থ অন্য কোন প্রবলতর নরপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার কৃত অত্যাচারের কথা বলিয়া দেন! পাপীর মন স্বভাবতঃই ভীরু। কিন্তু যখন ছয় মাসেরও অধিক কাল দিব্যদেবীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন উপযুক্ত দাদা নিশ্চিন্ত মনে ভগিনীপতির জমি জমা, জাহাজগুলি, ঘর বাড়ী, হাতী ঘোড়া, গাড়ী পাল্কী, সকলই হস্তগত করিয়া লইলেন! তথাপি তাঁহার মনে সুখ নাই,—নগদ টাকা, হীরা মুক্তাদি জহরৎ ও স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার আসবাব পাওয়া গেল না! মানুষের লোভের ত আর সীমা নাই।

এই পর্য্যন্ত গল্প বলিয়া দাদা মহাশয় নাতি নাতিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বল দেখি, এই দাদা রাজা পদ্মসিংহ অধিক পাপী না সম্রাট আলাউদ্দীন?" সরোজসুন্দর এবং সরোজিনী উভয়েই বলিয়া উঠিল, "পদ্মসিংহই অধিক পাপী,—দাদা মহাশয়। উঃ! এমন দাদাও হয়!"

কিছু পরে আবার উভয়ে দাদা মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—"দিব্যদেবীর কি হইল?—আমাদের সেই কথা শুনাইতে হইবে।" দাদা মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন।

দিব্যদেবীর জাহাজ পাল তুলিয়া বায়ু ভরে হু হু স্বরে ছুটিতে লাগিল। কয়দিন ক্রমাগত এইরূপে দৌড়িয়া অবশেষে একপ্রভাতে জাহাজের মাঝি বা কাপ্তেন একটি অপরিচিত দেশ দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানে জাহাজ লাগাইবার পর একজন কর্ম্মচারী বলিলেন,—"এই দেশ আফ্রিকা;—জলদস্যুদিগের নগর টিউনিশ এখান হইতে বহুদূরে নহে; এখানে আমরা কি সুবিধা পাইব?" বুদ্ধিমতি দিব্যদেবী দেশের অবস্থা দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—তিনি ভয় ডর বড় একটা জানিতেন না! তিনি বলিলেন,—

"অবশ্যই আমরা এইখানে জাহাজ লাগাইব,—এইখানে নূতন নগর বসাইব,—জলদস্যুরা আমাদের সহায় হইবে, প্রজা হইবে,—আমাদের ভয় কি?"

দিব্যদেবীর আদেশে তাঁহার কর্ম্মচারিগণ তীরে অবতরণ করিয়া বস্ত্রাবাস প্রস্তুত করিল এবং মহাসমারোহে কুমার শ্রীসিংহের সমাধি ক্রিয়া সম্পাদন করিল। নিকটে যত অসভ্য লোকের বাস ছিল, তাহারা দলে দলে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিতে আসিল। দিব্যদেবী তাহাদিগকে ভাল ভাল কাপড় জামা, খাদ্যদ্রব্য ও টাকা পয়সা দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন! পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহার নিতান্ত অনুগত হইল।

ক্রমে ক্রমে এই অপরিচিত লোকদিগের কথা সেই দেশের রাজার কাণে গেল। তিনি দূত পাঠাইয়া আদেশ করিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে বিদেশী লোককে স্থান দিবেন না,—একদিনের মধ্যেই তাঁহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। এই আদেশ শুনিয়া দিব্যদেবীর লোকজন বড় ভয় পাইল।

দিব্যদেবী তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, "তোমাদের ভয় কি? আমি এই সুবিধাই খুঁজিতেছিলাম। এক্ষণে তোমরা কিছু উপহার লইয়া রাজার নিকট যাও এবং তাঁহাকে কি তাঁহার মন্ত্রীকে আমার নিকট লইয়া আইস।" দেবীর কথায় তাঁহার কর্ম্মচারিগণ কিছু স্বর্ণমুদ্রা, কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং একখানি ঢাকাই মস্‌লিন লইয়া রাজাকে উপহার দিয়া দাঁড়াইল। সে দেশের অসভ্য রাজা এরূপ দ্রব্য কখনও দেখেন নাই,—উপহার পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং দিব্যদেবীর কর্ম্মচারীদিগের কথায় সম্মত হইয়া নিজেই তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

বুদ্ধিমতি দিব্যদেবী উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং মদ্য দিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা খুব খুসী হইলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই বিদেশী লোককে রাজ্য মধ্যে স্থান দিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন যে, বিদেশী লোককে তাঁহার রাজ্যে স্থান দেওয়া সে দেশের নিয়ম বিরুদ্ধ, সুতরাং তিনি কিছুতেই তাঁহার প্রার্থনা শুনিতে পারিবেন না।

দিব্যদেবী তখন এক কৌশল করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার স্বামীর মৃতদেহ আপনার রাজ্যে সমাহিত করিয়াছি,—উহা ত আর তুলিয়া লইতে পারিব না,—কারণ তাহা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আপনি দয়া করিয়া আমার এই চর্ম্মাসন পরিমিত স্থান আমাকে দিন,—তাহার জন্য আপনি যত টাকা কর চাহিবেন, আমি দিব।"

রাজা দেখিলেন যে, দিব্যদেবী একখানি পরিষ্কৃত চর্ম্মের আসনে বসিয়া আছেন,—উহা দীর্ঘে আট হাত এবং প্রস্থে তিন হাতের অধিক হইবে না। এই টুকু জমি বিদেশীকে দিতে কি ক্ষতি? উহাতে উহারা ঘরবাড়ী কিছুই ত করিতে পারিবে না,—অথচ আমার প্রচুর আয় হইবে। এইরূপ প্রজা মন্দ নহে।" এই ভাবিয়া রাজা বলিলেন যে, দিব্যদেবীর চর্ম্মাসন দ্বারা যতটুকু ভূমি আবৃত হইবে, ততটুকু ভূমি তিনি বার্ষিক এক শত সুবর্ণ মুদ্রা ও এক জোড়া মস্‌লিন বস্ত্র করস্বরূপ পাইলে দিতে পারেন। এই প্রস্তাবে দিব্যদেবী প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে যেন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সম্মত হইলেন এবং তাঁহার আদেশে তৎক্ষণাৎ দলিল লেখাপড়া হইয়া গেল। রাজা ঐ দলিলে তাঁহার রাজচিহ্ন আঁকিয়া দিলেন এবং দিব্যদেবী প্রথম বৎসরের রাজকর তৎক্ষণাৎ অর্পণ করিলেন। আর রাজা যে নিজে তাঁহার বস্ত্রাবাসে আসিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন, তজ্জন্য একটি বহুমূল্য পরিচ্ছদ, উষ্ণীষ এবং মণিমাণিক্যখচিত তরবারী উপহার দিলেন। রাজা আশার অতিরিক্ত সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মূর্খ বিদেশিনীকে খুব ঠকাইয়াছেন ভাবিয়া খুব একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিলেন। এদিকে দিব্যদেবীর কর্ম্মচারীরা কর্ত্রীর কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। তাহারা ভাবিল, অতি শোকে দেবীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

সেই অশিক্ষিত বর্ব্বর, কাফ্রি রাজা চলিয়া গেলে দিব্যদেবী তাঁহার সেই চর্ম্মাসনকে চিরিয়া চিরিয়া খুব সরু সরু ফিতার মত করিবার জন্য কয়েকজন ভৃত্যকে আদেশ দিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত প্রধান কর্ম্মচারী কি

বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু কর্ত্রীর অঙ্গুলী সঙ্কেতে নীরব হইলেন। ভৃত্যেরা অনতিবিলম্বে সেই চর্ম্মাসনকে চর্ম্মসূত্রে পরিণত করিল। তোমরা দেখিয়াছ, ঠনঠনিয়ার চটী জুতা যেমন চামড়ার ফিতায় সেলাই হয়, মুচিরা যাহাকে "কাঁকর" বলে,—ঠিক সেইরূপ। কিন্তু খুব সরু সরু ফিতা বা সূতা অনেক হইল। সূতা হইবার পরে কর্ত্রী ঐ গুলি পরস্পর যোড় দিয়া এক দীর্ঘসূত্র করিবার জন্য আদেশ দিলেন। ভৃত্যেরা তাহাই করিল। তাহার পর কর্ত্রী আদেশ দিলেন, "সমুদ্র তীর হইতে অর্দ্ধাচন্দ্রাকারে ঐ সুতা দিয়া যতটুকু ভূমি বেষ্টন করা যাইবে, ততটুকু ভূমি তোমরা বেষ্টন করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও! অসভ্য রাজা দেখিবে যে আমি তাহার কথা মতই ভূমি গ্রহণ করিয়াছি।" দিব্যদেবীর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহার দাস দাসী কর্ম্মচারীবর্গ ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তাহারা তাঁহার উপদেশ মত অর্দ্ধ বৃত্তাকার বৃহৎ এক ভূমিখণ্ড ঘিরিয়া লইল ও প্রত্যেক সীমায় সীমাচিহ্ন স্থাপিত করিল। দিব্যদেবীর সুব্যবহারে নিকটস্থ গ্রামের অধিবাসিগণ সকলেই অতিমাত্র বশীভূত হইয়াছিল, তাহারা আনন্দে কুলী মজুরের কাজ করিতে স্বীকৃত হইল। দেশ বিদেশ হইতে নানাপ্রকার প্রস্তরাদি উপকরণ ও উত্তম উত্তম শিল্পী আনান হইল এবং দেখিতে দেখিতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাসমৃদ্ধিশালী কার্থেজ নগর প্রস্তুত হইয়া গেল। অসভ্য রাজা নিজের কথায় নিজে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে বার্ষিক শত সুবর্ণ মুদ্রা ও দুইখানি মসলিন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইল (১)। ক্রমে ক্রমে শিল্প, বাণিজ্য এবং বীরত্বে কার্থেজ সেই প্রাচীনযুগে জগদ্বিখ্যাত হইয়া উঠিল। এখনও লোকে কার্থেজের ইতিহাস মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া থাকে। তোমরাও উহা পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। (২)

দিব্যদেবী প্রকৃতপক্ষে কার্থেজের রাণী হইলেন। তাঁহারই বুদ্ধিবলেও বিপুল অর্থে কার্থেজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাঁহারই যত্নে উহার অদ্ভুত উন্নতি হইয়াছিল। নগরে ক্রমে ক্রমে বহু ধনশালী ব্যক্তি আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, সকলেই দিব্যদেবীর অধীনতা সানন্দে স্বীকার করিতে লাগিলেন। দিব্যদেবীরও নগর এবং নাগরিক উন্নতি ভিন্ন নিজের কোন স্বার্থ ছিল না, তিনি নিজে ব্রহ্মচারিণী বিধবা ছিলেন এবং পরলোকগত স্বামীর স্মরণ ও ধ্যান তাঁহার একমাত্র আনন্দ ছিল।

"চিরদিন কখনও সমান যায় না।" দিব্যদেবীর রূপলাবণ্য এবং গুণগ্রামের কথা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল! জ্যেষ্ঠল রাজ্যের মহাপরাক্রান্ত রাজা ঐরাবত একদা দূতমুখে তাঁহার সহিত দেবীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল। দূত আরও বলিল যে তাঁহার রাজার প্রস্তাবে যদি কার্থেজের রাণী সম্মত না হন, তাহা হইলে তিনি কার্থেজ আক্রমণ করিবেন এবং নগর ধ্বংস করিয়া দিবেন। এই দারুণ সংবাদে সকলেই মহাশঙ্কিত হইলেন,—নাগরিকদিগের মুখে বসিল। দেখ, এ সেই ঠিক পদ্মিনীর উপাখ্যানের যেন পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। সভা বসিল বটে কিন্তু ফিনিসীয়গণ ত আর যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ক্ষত্রিয় জাতির লোক নহে,—তাহারা যতই কেন বড় হউক না বাণিজ্যজীবী বণিক্। মহাপরাক্রান্ত ঐরাবত নাম শুনিয়া ত্রাসে উহাদের হৃৎকম্প হইতেই লাগিল। অবশেষে সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন রাণী দিব্যদেবীকে ঐরাবতের দূতের হস্তে প্রদান করা ভিন্ন আর উপায় নাই। কাপুরুষদিগের ঘৃণিত প্রস্তাব দিব্যদেবীর নিকট প্রেরিত হইল। দিব্যদেবী কি করিবেন? তিনি যতই হউন স্ত্রীলোক মাত্র। আরও তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, রাজা ঐরাবত ক্রুদ্ধ হইয়া কার্থেজ আক্রমণ করিলে উহার নাশ নিশ্চয় ঘটিবে। ফিনিসীয়গণ তখনও যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হয় নাই। (১) কাজেই অনেক চিন্তার পর তিনি সম্ভ্রান্ত নাগরিকদিগের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন যে নগরের মঙ্গলই তাঁহার মঙ্গল,—ইহাতে তাঁহার জীবন দিতেও কোন আপত্তি নাই, অতএব জ্যোষ্ঠলের রাজদূতকে যথাবিধি সম্মানপুরঃসর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আবাস স্থান দেওয়া হউক। তিনি এদিকে তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর আত্মার পরিতুষ্টির নিমিত্ত যথাসম্ভব সমারোহের সহিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া তাঁহার রাণীর নিকট যাত্রা করিবেন।

এই সংবাদে নাগরিকগণ আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, দিব্যদেবী যেরূপ পতিগতপ্রাণা মহিলা, তাহাতে কদাপি তিনি জোষ্ঠলরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। ভাল মন্দ লোকে বলিতে লাগিল, "স্ত্রীলোকের চরিত্র, দেবতারও অগোচর, মানুষের কথায় আর কাজ কি? ব্রহ্মচর্য্যের মহিমা মুখেই ভাল"—ইত্যাদি। কেহ কেহ দৃষ্টান্ত দিতে লাগিল। যাহা হউক কর্ম্মচারিগণ মৃত শ্রীসিংহের বিশেষ শ্রাদ্ধের নিমিত্ত শীঘ্রই নানাবিধ আবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহ করিল। ব্যয়ের কোন ত্রুটি হইল না। শ্রাদ্ধের দিন ও সময় ঠিক হইয়া গেল।

দিব্যদেবীর প্রাসাদের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এক উচ্চ বেদী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ঐ বেদীর উপর মহার্হ চন্দ্রাতপ খাটান হইয়াছে, নানাবিধ বহুমূল্য দান সামগ্রী সারি সারি সাজান আছে। মধ্যে রাণীর কুশাসন,—নিকটে পুরোহিতগণের আসন। বেদীর নিম্নে চারিদিকে উপযুক্ত আসনে নগরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারিগণ বসিয়া আছেন। অলিন্দের উপর মহিলাগণের বসিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রাদ্ধের ঘটা দেখিবার জন্য জ্যেষ্ঠলের রাজদূতকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তিনি রৌপ্যনির্ম্মিত একখানি অত্যুৎকৃষ্ট আসনে বসিয়া আছেন। পুরোহিতগণ নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া "ইহা আন, উহা আন, এ দ্রব্য নাই, সে জিনিস কোথায়"—এইরূপ আদেশ দিতেছেন এবং সজ্জিত দান সামগ্রীর উপর ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সমস্তই প্রস্তুত, কেবল দিব্যদেবী আসিলেই কার্য্য আরম্ভ হয়। তাঁহার এত বিলম্ব কেন? পরিচারিকা বলিল,—তিনি নিজ গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কি করিতেছেন, কাহারও তথায় যাইবার উপায় নাই।

নানাজনে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন,—এমন সময় দিব্যদেবী ধীরপদে সেই প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। দিব্যদেবী আজ প্রকৃতই দিব্যদেবীর ন্যায় আসিয়াছেন। কৈ, কার্থেজের কোন লোকই ত তাঁহাকে এ বেশে কখনও দেখেন নাই। সকলেই তাঁহাকে শুভ্রবসনাবৃতা অলঙ্কারমাত্র বিরহিতা ব্রহ্মচারিণীর বেশে দেখিয়াছেন,—তিনি যে এখনও যৌবন মধ্যবর্ত্তিনী, তাহা কেহ বুঝিবারই সুযোগ পান নাই। আর আজ এ কি বেশ! ফুল্লচম্পকদাম বৃষ্টি ধৌত হইলেও বুঝি তেমন মনোহর বর্ণ ধারণ করে না,—এরূপ অনুপম গৌরবর্ণ! দোষমাত্র বর্জ্জিত সুগঠিত দেহ,—নীলোৎপল যুগলতুল্য আকর্ণ বিস্তারি চক্ষুদ্বয়, প্রফুল্ল গোলাপের মত কপোলযুগল;—সে রূপ, সে লাবণ্য, সে মহিমার তুলনা নাই। তদুপরি তিনি আজি সুনীল আকাশনিভ সুন্দর নীলাম্বরের পরিচ্ছদ, রত্নজড়িত আভরণ এবং সর্ব্বাঙ্গের প্রসাধনে প্রকৃতই বৈকুণ্ঠবাসিনী কমলার ন্যায় আসিয়া সেই সভাকুট্টিমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পদযুগলে অলক্তক, চক্ষুতে অঞ্জন, সর্ব্বাঙ্গে গন্ধরস। আকারে, বয়সে, পরিচ্ছদে,

(১) অধুনা এ প্রকার ব্যবহার বঞ্চনা বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাচীনকালে উহা বিশেষ প্রশংসার কার্য্য গণ্য হইত। আর ফিনীসীয় জাতি প্রধানতঃ বণিকের জাতি ছিল বলিয়া উহাদের নৈতিক আদর্শ বড় একটা উচ্চস্তরের না। এখনও Punic honesty বঞ্চনারই প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে!

(২) কার্থেজ নগর।—৮৪৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে স্থাপিত এবং ১৪৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন। "কার্থেজ" শব্দের অর্থ নূতন নগর।

(১) পরে হইয়াছিল। কার্থেজের বীরপুরুষগণ আফ্রিকা এবং পশ্চিম ইয়ুরোপের স্পেন পর্টুগাল জয় করিয়াছিলেন। মহাবীর হানিবল আল্পস্ পার হইয়া ইটালী প্রবেশ করিয়া রোমনগরী অবরোধ করিয়াছিলেন। অবশেষে রোমের হস্তে কার্থেজের সর্ব্বনাশ ঘটে।

বেশভূষা ও প্রসাধনের পারিপাট্যে তিনি সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। কতজন কতরূপ ভাবিতে লাগিল। পুরোহিতেরা রাণীর বেশ দেখিয়া ভাবিলেন এই কি মৃত স্বামীর শ্রাদ্ধকারিণীর বেশ! নাগরিকেরা ভাবিলেন এই মহামহিময়ী মহিলা তাঁহা-দিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন! জ্যেষ্ঠলের রাজদূত ভাবিতেছেন,—রাজা ঐরাবত এই নারীরত্ন পাইয়া কতই আহ্লাদিত হইবেন, তাহাকে কত উচ্চ পুরস্কারে পুরস্কৃত করিবেন!

দিব্য বসন ভূষণ পরিহিতা দিব্যরূপধারিণী দিব্যদেবী উপস্থিত সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দকে যথারীতি প্রত্যভিবাদন করিয়া সুধীর পদবিক্ষেপে শ্রাদ্ধ বেদীর উপরে আরোহণ করিলেন। চরণের মঞ্জীরা রুণু রুণু শব্দে বাজিয়া উঠিল। সকলের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। শ্রীসিংহের শ্রীমতী সহধর্ম্মিণী মূর্ত্তিমতী শ্রীর ন্যায় সেই বেদীর উপর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কুশাসনে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং উর্দ্ধমুখে মুদিত-নেত্রে পরলোকগত পতি দেবতার ধ্যান করিলেন। তাহার পর বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি সূচীমুখ সুশাণিত ক্ষুদ্র ছুরিকা লইয়া বক্ষের বাম দেশে ঠিক হৃৎপিণ্ডের উপর আমূল বসাইয়া দিলেন। এই ভীষণ দৃশ্যে সেই উপস্থিত লোকসঙ্ঘের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যে সেই অস্ত্র প্রবেশ করিল! সকলেই ভয়বিস্ময়ে বিহ্বল,—কাহারও মুখে বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না! এদিকে সুসজ্জ দিব্যদেবী প্রতিমার মত ঢলিয়া পড়িলেন। তাহার নীলনলিনাভ নেত্র যুগল নিমীলিত হইয়া গেল।

নগরের সর্ব্বপ্রধান শ্রেষ্ঠী বিন্ধ্যাচল সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন এবং দ্রুতপদে রাণীর নিকটে আসিয়া চিকিৎসক ডাকিবার অনুমতি দিলেন। সেই শব্দে দিব্যদেবী একবার তাঁহার সেই অলৌকিক রহস্যপূর্ণ অমৃতমাখা চক্ষুদ্বয় মেলিলেন। বিন্ধ্যাচল রাণীকে চাহিতে দেখিয়া আশা অধীর হইয়া আবার চিকিৎসক ডাকিতে আদেশ দিলেন এবং জানু পাতিয়া রাণীর মুখের নিকট "মা মা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দিব্যদেবী মৃদুমন্দ হাসির সহিত অতি মৃদুস্বরে বলিলেন "আপনারা ব্যস্ত হইবেন না,—আপনারাই আমাকে আমার স্বামীর নিকট যাইবার নিমিত্ত সকলে মিলিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন,—তাই আমি আমার স্বামীর নিকট চলিলাম। কার্থেজকে বড় ভাল বাসি,—কার্থেজ আমার পুত্র কন্যা,—কার্থেজে আমার স্বামীর দেহ আছে, তাঁহার নিকটে আমাকে একটু স্থান দিবেন—কার্থেজকে দেখিবেন।"

চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বেই দিব্যদেবী দিব্যধামে পতির সহিত মিলিত হইলেন। রাজপুতকুলের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর ন্যায় দিব্যদেবী নিজ প্রাণ দিয়া কার্থেজ রক্ষা করিলেন।

কৃষ্ণকুমারীর কথা শুনিতে চাও? আচ্ছা আর একদিন বলিব। আজ তোমরা দিব্যদেবীর চরিত্র আলোচনা কর। সকল দেশেই ভাল লোক জন্মেন—সকল দেশেই মন্দ লোক থাকে। ... ভাল লোক সর্ব্বত্রই দুর্ল্লভ। কবি ঠিকই বলিয়াছেন,—

"চন্দনং ন বনে বনে মৌক্তিকং ন গজে গজে।"

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

---

(১) মুসো রোলিন প্রণীত "প্রাচীন ইতিহাস" গ্রন্থের অন্তর্গত কার্থেজের ইতিহাস হইতে উপাদান সংগৃহীত। নামগুলি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ঐতিহাসিক নামগুলি ও পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্ত দিলাম।

দিব্যদেবী—Elisa or Dido. পদ্মসিংহ—Pygmalion.

শ্রীসিংহ—Acerbas, Sicharabas or Sichæus. ঐরাবত—Iarbas. জ্যেষ্ঠল—Getulia.

মহাকবি ভার্জিলও স্বীয় মহাকাব্য "ইলিয়ড" গ্রন্থে ও সুবিখ্যাত জষ্টিন স্বীয় গ্রন্থে এই ঘটনার ন্যূনাধিক বর্ণনা করিয়াছেন। জষ্টিনের লিখিত উপাখ্যানের শেষে আছে "and with her last breath told the spectators, that she was going to her husband, as they had ordered her".

তবে পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, আমি গল্প লিখিয়াছি, ইতিহাস লিখি নাই! ঐতিহাসিক মূল অবলম্বনে লিখিত এরূপ গল্প অনেক দেখা যায় যাহাতে অনেক কাল্পনিক কথা যোগ দেওয়া থাকে। আমিও তাদৃশ লেখকদিগকে অনুকরণ করিয়াছি।

ধর্ম্মের জয়।

(১৬)

সুশীলার দিন কাটিতে লাগিল। অনেক দিকে তাঁহার সুবিধা হইল বটে, কিন্তু বাড়ীভাড়ার চিন্তায় তাঁহার মনে শান্তি ছিল না। প্রতিদিন ডাকের সময় তিনি পথ চাহিয়া থাকিতেন, যদি নির্ম্মলের চিঠি আসে, যদি পত্রে টাকার কথা থাকে, কিন্তু প্রতি-দিনই তাঁহাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইত। একদিন প্রাতঃকালে সুশীলা গৃহকর্ম্মাদিতে ব্যস্ত রহিয়াছেন এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া তাঁহাদের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল "চিঠ্‌ঠি হ্যায়।" সুশীলা অজিতকে পাঠাইয়া দিলেন, অজিত চিঠি আনিয়া হাতে দিল, বেয়ারিং চিঠি। সুশীলার হাতে পয়সা ছিল না, তিনি সুহৃদ্‌কে বলিলেন—

"যাওত বাবা উপরে বামার কাছ থেকে চারটে পয়সা নিয়ে এসো।"

সুহৃদ্ অনিচ্ছা সহকারে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল ও বারান্দা হইতে ডাকিল "বামা, বামা"।

বামা গৃহ মার্জ্জনা করিতেছিল, সমার্জ্জনী হস্তে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—

"বামা বামা কর্‌ছিস্, বামা তোদের চাকরাণী না? ফের বামা বলে ডাক্‌বি ত দাঁত ভেঙ্গে দেব। উপরে উঠ্‌তে কে বল্লে উপরে কে পাঠালে? শীগ্‌গীর পালা!"

সুহৃদ দাসীর মুখের এই মধুর ভাষায় ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গেল। বামা পুনরায় বলিল—

"কি বল্‌বি বল্‌না? আমি আর দাঁড়াতে পার্ব্বুনি বলে দিচ্ছি আমার সময় নেই।

সুহৃদ মৃদুকণ্ঠে বলিল—

"মা বলেছেন চারটে পয়সা দাও, মা এখুনি টাকা ভাঙ্গিয়ে দিবেন। ডাকওলা বেয়ারিং চিঠি এনেছে।"

বামা মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—

'ডাকওলা এসেছে তবেত আমায় রাজা করেছে, পালা বলছি এখুনি পালা, আর যদি শুনি বামা বামা বলে ডাকবি, অমনি গাল টিপে দেব। কোথাকার দুষ্টু অভদ্র ছেলে, পালা শীগ্‌গীর পালা"।

সুহৃদ ছলছল নেত্রে নীচে নামিয়া আসিয়া সুশীলাকে বলিল "মা বামা পয়সা দিলে না।" সুশীলা ত্বরিতপদে সৌদামিনীর নিকট হইতে পয়সা আনিয়া ডাকপিয়নকে দিয়া বিদায় করিলেন। তারপর পত্র-খানি খুলিয়া দেখিলেন একখানি দুইশত টাকার হুণ্ডি। নির্ম্মলচন্দ্র অনেক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, এতদিন-কার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে যাহা সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন, আজ তাহা ভগ্নির বিপদে পাঠাইয়া দিয়া-ছেন। সুশীলা সেই পত্রখানি ও হুণ্ডি হাতে লইয়া সেইখানে বসিয়া, ভগবানকে ডাকিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অবি-রল অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অজিতকে বলিলেন—

"আজই মিঃ রায়ের টাকা দিতে হবে। তাঁকে দেড়শো টাকা দিয়া আমার হাতে ৫০ টাকা থাকিবে তাহাই আমার সময় অসময়ের সংস্থান। গিন্নী যা বাড়ীভাড়া দেবেন, প্রতি মাসেই মিঃ রায়কে দিয়ে দেবো। তোমার মাহিনাতে ও আমার মোজা বোনার টাকায় সংসার চালাব।" তাঁহারা যখন কথা কহিতে-ছিলেন, তখন সুশীলা দূরে মিঃ রায়ের গাড়ী দেখিতে পাইয়া অজিতকে বলিলেন—

"ছুটিয়া গিয়া এই হুণ্ডি দিয়ে এসো, আর বাকি টাকাটা চেয়ে আনো।" অজিত হুণ্ডি হাতে ছুটিয়া গেল, তখন গাড়ী প্রায় তাহাদের দ্বারের কাছে আসিয়াছে; সে হাত তুলিয়া গাড়ী থামাইতে বলিল। গাড়ীতে মিঃ ও মিসেস রায় দুজনেই ছিলেন। কোচম্যান গাড়ী থামাইয়া ফেলিল, মিঃ রায় মুখ বাড়াইয়া অজিতকে দেখিতে পাইয়া ব্যস্তভাবে বলি-লেন—

"কি হইয়াছে?"

অজিত বলিল "আমার মা আমায় পাঠিয়েছেন"।

সে তাড়াতাড়িতে হুণ্ডির কথা বলিতে ভুলিয়া গেল।

মিঃ রায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আমায় কি ডাক্‌ছেন?"

অজিত বলিয়া ফেলিল "হাঁ।"

মিঃ রায় গাড়ী হইতে নামিয়া সুশীলার গৃহের সম্মুখে আসিলে সুশীলা আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সেই হুণ্ডিখানি অজিতের হাত হইতে লইয়া দিলেন ও বলিলেন—

"আপনার বাড়ী ভাড়া।"

মিঃ রায় মৃদু হাসিয়া বলিলেন—

"সেই জন্য এত তাড়া কিসের"?

সুশীলা বলিলেন "আমি এই মাত্র টাকা পাইলাম, আমার দাদা পাঠিয়েছেন। অজিতের হাতে দিয়া পাঠিয়েছিলাম, সে বুঝিতে পারে নাই আপনাকে কষ্ট দিয়া ডেকে এনেছে।"

মিঃ রায় বলিলেন "সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না, এ যে ২০০ টাকার হুণ্ডি, বাড়ী ভাড়াত ১৫০?"

সুশীলা বলিলেন "বাকি টাকা আপনি সুবিধা-মত দিবেন।"

মিঃ রায় বলিলেন "যদি সব ভাড়া একত্রে দিবার সুবিধা না হয়—"

সুশীলা ব্যস্ত ভাবে বলিলেন "না না তা হবে, আর এবার থেকে ভাড়া আমি ঠিক সময়ে দিব আর গোলমাল হবে না।"

মিঃ রায় তাঁহার পকেটকেস হইতে সাত খানি ১০, টাকার নোট বাহির করিয়া সুশীলার সম্মুখে দিয়া বলিলেন—

"আপনাকে আর ৫০ টাকা করে ভাড়া দিতে হবে না ৪০ টাকা দিলেই হবে, যে ভাড়া লইতে আসে তাকে আমি বলে দিব।"

সুশীলা মিঃ রায়ের এই দয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন—

"আপনার দয়ার জন্য আমি আর কি প্রকারে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাব। আপনি আমাদের প্রতি যথেষ্ট দয়া করেছেন। আপনি ২০ টাকা এতে বেশী দিয়েছেন অনুগ্রহ করে লইলে আমি সুখী হইব। যখন ৫০ টাকা করিয়া ভাড়া দিবার জন্য আমার স্বামী প্রতিশ্রুত ছিলেন আমার তাঁর কথা মত এই তিন মাসের দিতেই হইবে। আগামী মাস হতে আপনি যেরূপ বলিবেন আমি সেইরূপ দিব।"

মিঃ রায় দুইখানি নোট ফিরাইয়া লইয়া, অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত সুশীলাকে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন "যদি ভবিষ্যতে কিছু আবশ্যক হয় আমার জানাইতে একটুও ইতঃস্তত করবেন না।"

মিঃ রায় গাড়ীতে উঠিলে গাড়ী চলিতে লাগিল।

মিসেস রায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ডেকে ছিল?"

মিঃ রায় বলিলেন "ডাকেনি, ছেলেটি বুঝতে পারেনি বাড়ী ভাড়া দিতে এসেছিল।"

মিসেস রায় বলিলেন "বাড়ী ভাড়া সব দিলে?"

মিঃ রায় বলিলেন "হাঁ ১৫০ টাকাই সব দিয়াছে নির্ম্মলা, এরা যে কিরকম ভদ্র তোমায় কি বলিব এই স্ত্রীলোকের দিকে চাহিলেই মনে হয় ইঁহার পুণ্যের বলে ইঁহার সন্তানরা সর্ব্বসুখে সুখী হবে।"

মিসেস রায় বলিলেন "ছেলেরা পড়েত"—

মিঃ রায় বলিলেন "বড় ছেলেটি আমার আফিসে ছোকরা চাকরের কাজে কাল থেকে ভর্ত্তি হয়েছে কিন্তু ছেলেটির মুখ দেখলে মনে হয় তাতে তার বড় কষ্ট।"

মিসেস রায় বলিলেন "আহা ভদ্রলোকের ছেলে বামুনের ছেলে।"

(১৭)

সুশীলার কোনক্রমে দিন কাটিতে লাগিল। বাড়ী ভাড়ার ঋণ পরিশোধ করিয়া তিনি অনেক [illegible] হইলেন। যিনি তাঁহার বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন তিনি জাতিতে খৃষ্টান, নাম মিসেস স্যামুয়েল [illegible] তাঁহার সেই দাসী ভিন্ন সঙ্গে আর কেহই ছিল না। সেই একা বামাই সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

সুশীলা সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়াই মোজা [illegible] [illegible] বসিতেন। অজিতও প্রতি সপ্তাহে এক [illegible] টাকা করিয়া আনিত। বাড়ী ভাড়া যাহা লইতেন [illegible] তাহা হইতে দশটি টাকা বস্ত্রাদির জন্য জমা রাখিতে [illegible] হইত ও সময় অসময়ের জন্য সঞ্চয় করিতে হইত। [illegible] ও সুহৃদ প্রতিদিন নিয়মিত স্কুলে যাইত।

ইন্দুর শরীর কিন্তু ক্রমশঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। লেখাপড়ায় তাহার আর কোনও উৎসাহ [illegible] ছিল না, খেলাও করিতে চাহিত না। যেখানে সেখানে বসিয়া পড়িত। বিভা মধ্যে মধ্যে তাহাকে খেলিবার জন্য ডাকিতে আসিত। মিঃ রায়ের কন্যা [illegible] যখন বিভার নিকট বেড়াইতে আসিত, সেও ইন্দুকে দেখিতে আসিত।

বামার প্রথম হইতে ইন্দুর প্রতি বিশেষ স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। সে যখন তখন আসিয়া ইন্দুকে উপরে লইয়া যাইত। ভাল ভাল সুখাদ্য খাইতে দিত। সুশীলা প্রথম প্রথম একটু সঙ্কুচিত হইতেন ও লজ্জা বোধ করিতেন এবং দু এক বার ইন্দুকে উপরে যাইতে নিষেধও করিয়াছিলেন, কিন্তু বামার [illegible] আর সাহস হইত না। তার পর মনে করিলেন সবই ঈশ্বরের করুণা নতুবা বামার মনে কেন [illegible] স্নেহের সঞ্চার হইবে। দুর্ব্বল বালিকা একটু সুখাদ্য [illegible] তাত ভালই। ক্রমে ক্রমে এক বেলা ইন্দু উপরেই আহার করিতে লাগিল। তাহাতে সুশীলা বিশেষ আপত্তি করায় বামা কাঁদিয়া-কাটিয়া জিতিল [illegible] বলিল—

"ওই টুকু একটি মেয়েকে যত্ন কল্লেত তোমার [illegible] সয় না? আমি কখনো ইন্দুকে দুবেলা তোমার কাছে খেতে দেবো না, দেখছ না তার শরীরের কি অবস্থা, রোগা দড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাকে না মেরে ফেললে বুঝি তোমার সাধ মিটবে না?"

সুশীলা শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁর তখন যেন মনে হইল সত্যই ইন্দু শুকাইয়া যাইতেছে। তিনি বামার কথায় আর প্রতিবাদ করিতেন না, ভাবিতেন [illegible] পরিষ্কার বাতাসে উপরে থাকিবে তাহার পক্ষে [illegible]।

একদিন দুপুরে সুশীলা সেলাই করিতেছেন, ইন্দু কাছে বসিয়াছিল, কখন যে তাঁহার পাশে ভূমিতে শুইয়া পড়িয়াছে দেখেন নাই। এমন সময় বামা আসিয়া উপস্থিত, ইন্দুকে ভূমিতে দেখিয়া একেবারে সপ্তমে চড়িয়া উঠিয়া বলিল—

'হাঁ গা তোমার কি আক্কেল নাই?" সুশীলা চমকিত হইয়া চাহিলেন, কি করিয়াছেন বুঝিলেন না। বামা ইন্দুকে ভূমি হইতে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিল—

"এই রোগা মেয়েটাকে কি বলে ভুঁয়ে শুইয়ে রেখেছ বলত? তোমাদের জন্য দেখছি এর প্রাণ রক্ষা হবে না।"

সুশীলা হাসিয়া বলিলেন "এইজন্য, আমি ভাবলাম না জানি আবার কি হয়েছে? তা বাছা গরিবের ছেলে মেয়েরা মাটীতে শুলে কিছু হয় না।"

বামা বলিল "শোয়াওগে তোমার ছেলে গুলোকে"—

সুশীলা বলিলেন "ছি বামা আমার কাছে কি অমন করে বলে, আমার ছেলে মেয়ে সব সমান।"

বামা বলিল "তোমার সব সমান হতে পারে, আমার কাছে কখনো তা নয়, আমি কখনো ইন্দুকে মাটিতে শুতে দিব না, কেন ওর কিসের অভাব? ওকি উপরে থাকতে পারে না? ওর ছোট খাট-খানিতে আমি কেমন বিছানা করে রেখেছি। গিন্নিমা সেই পর্য্যন্ত ইন্দু ইন্দু কচ্ছে" তারপর সযত্নে ইন্দুকে তুলিয়া বলিল—

"চল মা উপরে চল।" ইন্দু কলের পুত্তলিকার মত বামার সহিত চলিয়া গেল। সুশীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন "ভগবান, তোমার দয়া না হলে আজ আমার কি দশা হইত। এই বামা, এর কি কঠিন কথা, কি কঠোর স্বভাব তবু ইহার প্রাণে কত মায়া। পরের মেয়ের জন্য কে এত করে? ইন্দু বেচারী ভাল খেতে পর্য্যন্ত পায় নি, এখন কত আদরে কত সুখাদ্য খেতে পায়। তার দুর্ব্বল শরীরের উপযুক্ত যত্ন ত আমি কিছুই করতে পারতাম না, সে সব যত্নই পাচ্ছে। তোমার দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি, তুমিই এদের রক্ষা কোরো।" সুশীলা

একমনে সেলাই করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় চিন্তায় অবসন্ন হইতে লাগিল।

বামা ইন্দুকে উপরে লইয়া গেল। বারান্দার সম্মুখে যেখানে রৌদ্র ও ছায়া সেইখানে তাকে একটি চেয়ারে বসাইয়া দিল, ও গেলাসে করিয়া এক গ্লাস দুধ আনিয়া দিল। প্রত্যহ সে একবার করিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইত। তারপর একটু ডালিম আনিয়া দিল। বামা তাহার গিন্নি মাকে বলিয়াছিল "আপুনি বড় রোগা হয় যাচ্ছেন একটু ডালিমের রস একটু আঙুর যদি খান বেশ গায়ে জোর হবে।" মিসেস দাসের বেশ অর্থ ছিল তিনি বামার কথা মতই চলিতেন, বামার বাক্য তাঁর বাইবেলের বাক্যের মত ছিল। কাজেই বামা আপনার ইচ্ছা মত সকল কার্য্যই করিত। বামা একদিন বলিল—

"দুধ অনেক পড়ে থাকে একটু ইন্দুকে দিব কি?" গিন্নীমা বলিলেন "যদি বেশী হয় কম করে নিলেই পার।" বামা হাত কচলাইতে লাগিল ও বলিল—

"তা ঐ টুকু বেশী হয় বইত নয়, আগে আমি খেতুম এখন আর সয় না, তা ওইটুকু ইন্দুকে দিব গিন্নিমা। আহা বেচারী দুবেলা খেতে পায় না, যে দস্যি ছেলেগুলো সব খেয়ে বসে থাকে ও বেচারি পিট পিট করে চেয়ে থাকে।"

গিন্নি মা বুঝিলেন, যদি মত না দেন অমতেও বামা দিবে। হাসিয়া বলিলেন "তা বেশত দিও।"

ইন্দুকে দুধ ও ডালিম খাওয়াইয়া, বামা তাহাকে শোয়াইয়া দিল। ইন্দু শুইতে না শুইতে ঘুমাইয়া পড়িল। বামা গৃহ কার্য্যে গমন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বামা আসিয়া দেখিল, ইন্দু ঘুমাইতেছে, কিন্তু শীতের দিনেও তাহার ললাটে ঘর্ম্ম বিন্দু, সে তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল ঈষৎ উষ্ণ। তাহার মনে হইল ইন্দুকে অত্যন্ত দুর্ব্বল দেখাইতেছে, চক্ষের কোলে কালিমা পড়িয়াছে। সে ধীরে ধীরে গৃহিনীর পার্শ্বে গিয়া বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

"হাঁ মা, আজকে কি দাঁতের ব্যথা বেড়েছে?"

সেদিন গৃহিণীর অত্যন্ত দাঁতের যন্ত্রণা হইয়াছে, তিনি মুখে ফ্লানেল জড়াইয়া বসিয়া আছেন, বামার কথায় অতি কষ্টে বলিলেন—

"বড় যন্ত্রণা, এ দাঁত নিয়ে আর পারিনে বা... কি করে রাত কাটাব তাও জানি না।"

বামা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তা' একবার যাই না, ছুটে গিয়ে ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনি তাঁর বাড়ী ত বেশী দুর নয়, যাব মা?"

গৃহিণী বলিলেন—"এই একটু দাঁত কনকনানি তার জন্য আবার ডাক্তার!"

বামা বলিলেন—"কি জান মা, এ বিদেশ বিভুঁই যদি রাত বিরাতে বেড়ে পড়ে আমি মেয়ে লোক আমি কি কর্ব্ব? তার চেয়ে বেলাবেলি ডেকে আনি না কি বল?"

গৃহিণী বলিলেন—"আচ্ছা ডেকেই আন, বড় যাতনা আর সহ্য হয় না।"

বামা আর অন্য কথা না কহিয়া, দ্রুতপদে নামিয়া গেল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বামা ডাক্তার বাবুকে লইয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাবু গৃহিণীর দাঁত দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন ও বলিলেন—

"এই লোসন দুবার দিলেই ব্যথা কমে যাবে আর মধ্যে মধ্যে ফোমেণ্ট করিবেন। আজ ... লঘু আহার করিবেন। দুধ বার্লি, সাবু, সুজি ... ইচ্ছা হয় খাইবেন।" ডাক্তার ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় বামা বলিল—

"ডাক্তার বাবু একবার দয়া করে এই মেয়েটাকে দেখে যান।" ডাক্তার বিস্ময়ে ইন্দুর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—

"কার মেয়ে?"

বামা বলিল—"আমাদের বাড়ীওলার মেয়ে ... মেয়ের বাপ নাই, সম্প্রতি মারা গেছেন। মেয়ে ... বড় কাহিল হয়ে যাচ্ছে,—একবার দেখুন ত ... আছে কি না।"

ডাক্তার ইন্দুর নিকটস্থ হইবার পূর্ব্বেই ইন্দুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, সে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়াছে। ডাক্তার তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখি... বলিলেন "জ্বর বেশ আছে, দেখি তোমার দেখি ...

... পর ফুস ফুস, হৃদপিণ্ড ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে ...লেন, পরে ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া ...কে বলিলেন—

"মেয়েটির শক্ত রোগ।"

বামার চক্ষের তারা যেন ঠেলিয়া উপরে উঠি... ...ছে—

"কি রোগ ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"তা এখন ঠিক বলতে ...ছিনে, ফুসফুস বড় দুর্ব্বল, কাশ রোগ হবার ...বনা। মেয়ের মা কোথায়?"

বামা ধীরে ধীরে বলিল "নীচে"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আচ্ছা চল তাঁর কাছে ...বলে যাই।" বামা অগ্রে নামিয়া গিয়া সুশীলাকে ...লিল—

"একবার শোনত গা।"

সুশীলা ঘরে অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া, বিস্মিত ...ভীত হইয়াছিলেন, ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া ...ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি বলছ, ইন্দু কোথায়?"

বামা বলিল—"ডাক্তার বাবু কি বলছেন শোন।"

সুশীলা অধিকতর ভীত ভাবে বলিলেন—

"ইন্দুর কি হয়েছে, সে কোথায়?"

ডাক্তার বাবুও এই বিষাদময়ী রমণীমূর্ত্তিকে ...য়া সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন—

"আপনার কন্যার উপস্থিত কোন বিপদ নাই, ...তার শরার বড় দুর্ব্বল, তার ফুসফুস বিকৃত হইয়াছে"—

সুশীলা বিস্মিত ভাবে উভয়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—

"আপনি কি এখন দেখলেন"?

ডাক্তার বামার প্রতি দেখাইয়া বলিলেন—

"এই ঝি দেখাইল, মেয়েটির এরোগ হবার কারণ আছে কি? বংশে কি কারো ক্ষয় রোগ আছে?"

সুশীলা নতমুখে বলিলেন "তার পিতার হয়েছিল।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ওঃ তবে সেই জন্যই হয়ত এরও ফুসফুস দুর্ব্বল হয়েছে। ভাল পথ্যে, ভাল ঔষধে, ও পরিষ্কার বাতাসে রাখিলে উপকার পাবেন। প্রত্যহ ব্রথ, ডালিম ও আঙ্গুরের রস দিবেন। তা ছাড়া আমি যে ঔষধগুলির নাম লিখে দিচ্ছি তাহাও সেবন করাইবেন। ঔষধগুলি একটু মূল্যবান, এখন অন্য উপায় নাই, এ ঔষধই প্রয়োগ করিতে হইবে। আমি আবার সপ্তাহ পরে এসে দেখে যাব।" বামা ডাক্তার বাবুর সহিত চলিয়া গেল।

সুশীলা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। এই সেদিন স্বামী হারাইয়া, অকূল সাগরে ভাসিতেছেন, তার পর এই একটি মাত্র কন্যা, সেও সেই কঠিন পীড়ায় পীড়িত। সুশীলা যেন এ বিপদের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। অবসন্ন হৃদয়ে দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রহিলেন। হৃদয়ের মধ্যে যেন তুমুল ঝটকা বহিতে লাগিল। কোন দিকে যেন কূল কিনারা নাই। কি করিবেন, কি করিলে ভাল হইবে বুঝিতে পারিলেন না। ঔষধ পথ্য কোথা হইতে হইবে, যাহা আয় তাহাতে ত অতি কষ্টে দিন চলিতেছে। আর কি উপায় আছে? যখন মানব হৃদয়ে এই অসহায়তার ভাব হয়, তখন সেই অসহায়ের সহায়কেই মনে পড়ে। তখন আর সংসারে কারো প্রতি চাহিলে বা কিছুর প্রতি চাহিলে মনে বল আসেনা। সুশীলা সেই অবসন্ন হৃদয়ের ভার লইয়া তাঁহারি চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। কতক্ষণ এভাবে বসিয়া আছেন মনে নাই, ইন্দু যে কখন আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াছে তাহাও জানেন না। তার পর সহসা দ্রুতপদ শব্দে তাঁর চমক ভাঙ্গিল। বামা গৃহে প্রবেশ করিয়াই ইন্দুকে ভূমিতে বসিতে দেখিয়া বলিল—

"আবার মাটিতে মেয়েটাকে বসিয়েছ, ওকে তোমরা বাঁচতে দেবে না দেখছি। ইন্দু শীঘ্র উঠে পড়ত মা, মাটিতে একবারও বোসোনা, তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। আমি গিন্নীমার কাছথেকে একটী মোড়া চেয়ে এনে দেবো।" সুশীলা ইন্দুকে ক্রোড়ে টানিয়া

লইলেন. সুশীলা যেন ইন্দুর মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না, যেন সাহস হইতেছিল না। বক্ষ বিদীর্ণ প্রায় হইতেছে, এই প্রাণাধিকা কন্যা বক্ষের রত্ন, ইহাকেও বিসর্জ্জন দিতে হইবে। মানবের পাষাণ প্রাণে সকলি সহ্য হয়। বামা হাতে কতকগুলি প্যাকেট আনিয়াছল সেগুলি ধীরে ধীরে ভূমিতে রাখিয়া বলিল—

"এই সব ইন্দুর ওষুধ, ডালিম আঙ্গুর সব এনেছি। যাই সে গুলো উপরে নিয়ে যাই, নিজেই আমি সব খাওয়াব। নইলে তোমার দস্যি ছেলেগুলো—"

সুশীলা কাতর কণ্ঠে বলিলেন—"ছি বামা ও কথা মুখে এনোনা, আমার ছেলেরা তেমন নয়, তারা তাদের রুগ্ন বোনের পথ্য হাত দিয়েও ছোঁবে না। এই ঔষধপত্রের কত দাম লাগলো?"

বামা বিরক্ত ভাবে বলিল—"সে সব কথায় তোমার দরকার কি বাপু?"

সুশীলা বলিলেন—"সে কি কথা বামা, কত টাকার ঔষধ ও ফল এলো, আমার জানবার দরকার নেই? আমি দাম দেব যে—"

বামা তীব্র কণ্ঠে বলিল—"উনি দাম দেবেন, কেন বল দেখি আমার ইন্দুর অসুখের জন্য তোমার একটিও পয়সা দিতে হবে না। যা লাগবে সব গিন্নীমা দেবেন, আমি দেব। ওর খাওয়াদাওয়া ঔষধ পত্তর সব আমরা দেখবো, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। এই নাও মোজা দুজোড়া আর ফেলানেলের একটা জামা এনেছি এখুনি পরিয়ে দাও আমি যাই গিন্নীমাকে বলে আরো দুটো জামা দরজী ডেকে কর্ত্তে দেব।"

সুশীলার দুই চক্ষুদিয়া রুদ্ধ অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, তিনি উঠিয়া বামার দুটি হাত ধরিয়া বলিলেন—"বামা তুমি আমাদের কত দয়া কর্‌ছ, আমরা তোমার কে যে তুমি এত কর্ব্বে?

বামার চোখেও অশ্রু তবু সে হাত সরাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—

"তোমরা আমার কেউ নও গো কেউ নও ইন্দু আমার সব, পরের মেয়ে হলে কি হয় ওর উপর আমার কত মায়া তোমরা তার কি বুঝবে। আমার প্রাণ দিয়েও আমি ওকে বাঁচাব। আয় ইন্দু, চল উপরে চল, ওষুধ খাইয়ে আজই সুরুয়ার ব্যবস্থা কার।" বামা ইন্দুকে লইয়া উপরে চলিয়া গেল। সুশীলা কর জোড়ে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। রুগ্না কন্যার ঔষধ ও পথ্যের ভাবনায় মন এত ব্যাকুল হইয়াছিল, আজ কোন্ অভাবনীয় উপায়ে সে অন্ধকার দূর হইল। এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি দাসীর মনে কে বাৎসল্য রস প্রবাহিত করিয়া দিলেন? সেই বুকে কে এ স্নেহের ধারা ছুটাইলেন? সুশীলা নারায়ণ সব সহ্য করিবেন কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও জীবনে অনন্ত অচিন্ত্য জগদীশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাক্, তবু অটল বিশ্বাসে তাঁহারই উপর সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া একান্ত ভাবে নির্ভর করিবেন। তিনি ভিন্ন আর সুশীলার গতি নাই।

ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কাশীমবাজারের ব্রাহ্মণ রাজবংশ।

ইতিহাস বিখ্যাত বৈদ্যরাজ আদিশূর কনোজ হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন দক্ষ তাহার অন্যতম। এই দক্ষের বংশে জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। জয়গোপাল বাঙ্গলার মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীনে কার্য্য করিয়া 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন—সে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কথা। সেই সময় হইতে জয়গোপালের বংশীয়েরা রায় উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এই বংশের দীনবন্ধু রায় কাশীম-বাজার রেশমকুঠিতে উচ্চবেতনে চাকুরী করিতেন।

সেই উপলক্ষেই তিনি কাশীমবাজারে বসতি নির্ম্মাণ করেন। রেশমকুঠির চাকুরীতে দীনবন্ধু যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র জগবন্ধুও প্রথমে কাশীমবাজারের কুঠিতে মুহুরির পদ প্রাপ্ত হয়েন। পরে কিছুদিন তিনি মেদিনীপুরে নিমক্ মহালে ও রেভিনিউ বিভাগে কার্য্য করিয়া অবশেষে মৈমনসিংহের কালেক্টরির সেরেস্তাদারের পদ লাভ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সমস্ত ধন জগবন্ধুই পাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার নিজের রোজগারও যথেষ্ট ছিল। সেই অর্থ দিয়া তিনি জমিদারী খরিদ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ভগবানের ইচ্ছায় ইহার এক সুবিধাও মিলিল। এই সময়ে সরাইল পরগণার ।/১২ গণ্ডা অংশের মালিক দেওয়ান নাগরালির সম্পত্তি বাকী খাজনার দায়ে নীলামে উঠিল। জগবন্ধু এই সম্পত্তি খরিদ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন; কিন্তু তিনি সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া নিজ নামে এ জমিদারী খরিদ করিতে না পারিয়া কৌশলক্রমে গঙ্গারাম চৌধুরী নামক জনৈক মোক্তারের নামে অল্পমূল্যে উহা খরিদ করিয়া লইলেন। তাহার তিন বৎসর পরে জগবন্ধু স্বীয় পুত্র রাম বাবু ও জয় বাবুর নাম আশ্চর্য্য উপায়ে সংযুক্ত করতঃ 'রামজয় রায়' নামে এই মোক্তার হইতে ঐ সম্পত্তি কবলা করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তির পূর্ব্ব-জমীদার নালাম রদের নালিশ করিয়া জেলা কোর্টে জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী আদালত বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্ করিয়া নীলাম বহাল করিয়া দেন। এই পরগণার বাকী অংশ জগবন্ধুর পৌত্র নৃসিংহ রায় ও অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজা আশুতোষনাথ রায়ের সময়ে খরিদ হয়।

জগবন্ধুর পৌত্র নৃসিংহ বাবুর নামে কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় তিন কোটী টাকা দাবী করিয়া এক ক্ষতিপূরণের মামলা আনয়ন করেন। নৃসিংহের ভগিনী ভুবনেশ্বরী দেবীও তাঁহার বিরুদ্ধে আর একটী মোকদ্দমা করেন। সৌভাগ্যক্রমে এই উভয় মোকদ্দমাতেই নৃসিংহ বাবু জয়লাভ করিয়াছিলেন।

নৃসিংহের মৃত্যুর পর নবকৃষ্ণ এবং রাজকৃষ্ণ নামক তাঁহার পুত্রদ্বয় সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। ভ্রাতৃদ্বয় পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির সদ্ব্যবহারই করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায় রাজকৃষ্ণই সমগ্র সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অন্নদাপ্রসাদ জমিদারীর মালিক হয়েন। কিন্তু অন্নদাপ্রসাদ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তিনি সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার জমীদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হস্তে থাকে। অন্নদাপ্রসাদ দানশীল ছিলেন। তাই গভর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়া এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করেন। অন্নদাপ্রসাদও এই সভায় যোগদান করিবার অভিপ্রায়ে কালকাতায় গিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজোপাধিতে ভূষিত করিবার পূর্ব্বেই ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কালকাতাতেই তিনি মানব লীলা সংবরণ করেন।

রায় অন্নদাপ্রসাদের মৃত্যুসময়ে তাঁহার একমাত্র পুত্র আশুতোষনাথ নাবালক থাকায় সম্পত্তি পুনরায় কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে যায়। নাবালক তাঁহার মাতা রাণী আন্নাকালী দেবীর কর্ত্তৃত্বাধানে পালিত ও শিক্ষিত হইতে থাকেন। রাণী আন্নাকালীর ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণা ও দানশীলা রমণী আজকালকার দিনে দুর্লভ। বহরমপুর সংস্কৃত টোল ও জেনেনা হাসপাতাল একমাত্র তাঁহারই অর্থে পুষ্ট হইয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিতেছে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আশুতোষনাথ কালকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সাবালক হইয়া কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে জমীদারী নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহা শাসন

সংরক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। পিতা ও মাতার ন্যায় আশুতোষ নাথও অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কলিকাতা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ ডাফরিণ হাসপাতালের অত্যন্ত অর্থাভাব ঘটিয়াছে—বাঙ্গলার তদানীন্তন লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর স্যর আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি বাহাদুরের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া—আশুতোষনাথ হাসপাতাল তহবিলে এক লক্ষ টাকা এক কালীন দান করেন! এই মহাপ্রাণতার পুরস্কার স্বরূপ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

রাজা আশুতোষ প্রজাবর্গের হিতার্থে নিজ জমীদারীর বিভিন্ন স্থানে চারিটী দাতব্য ঔষধালয় ও দুইটী ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিজেই তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি সাবালক হওয়ার পরে অতি অল্প সময় মধ্যে নানাবিধ সৎকার্য্যে আরও লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন।

আশুতোষনাথ একজন নিপুণ শিকারী ছিলেন। কোনও স্থানে হিংস্র জন্তু আসিয়া উৎপাত করিতেছে শুনিলে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই সেখানে উপস্থিত হইতেন এবং যেমন করিয়াই হউক সে হিংস্র জন্তুকে স্বীকার করিয়া ভীত জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিতেন।

দুঃখের বিষয় রাজা হইবার পর অতি অল্পদিন মধ্যেই আশুতোষনাথ মাতা, পত্নী ও শিশুপুত্রকে রাখিয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। রাজা আশুতোষের পুত্র কুমার কমলারঞ্জন এখনও নাবালক—তাই তাঁহার জমীদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি কুমার বাহাদুর দীর্ঘজীবি হইয়া নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ বংশের নাম ও গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থন হউন!

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন।

স্বজাতিবৎসল শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মোহনও তাঁহার সহপাঠিগণ এক একটী করিয়া প্রাচীন রীতি নীতি আচার অনুষ্ঠান সকল পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উদারতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া সকল জাতির সহিত আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রচলিত পূজা অর্চ্চনার পথ পরিত্যাগ করিলেন, দেবতা বিগ্রহদিগকে উপহাস করিতে ও অবশেষে অখাদ্য ভক্ষণে অভ্যস্থ হইয়া উঠিলেন। ইঁহাদের দলের প্রধান প্রধান সভ্যগণ অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত প্রমাণ করিতে লাগিলেন যে, ইংরাজ জাতি যে এত বলশালী ও দৃঢ় তাহার অন্যতম কারণ মাংসাহার। জনৈক মুসলমান বন্ধু আপনার বাগ্মীতা ও নানা প্রকার উদাহরণ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিধিমতে সমর্থন করিতে লাগিলেন। মাংস ভোজনে* ... তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সন্দেহ দোলায় দুলিতে ছিলেন, তখন তাঁহারা শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রতিদিন অবাধে মাংস ভোজন করিয়া থাকেন। ছাত্রগণের নিকট শিক্ষকের দৃষ্টান্ত সর্ব্বদাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই ... সর্ব্বত্রই সাধু প্রকৃতি, সচ্চরিত্র এবং ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষকের অভাব ও আবশ্যকতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

ইঁহারা এখন শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া মাংসাহারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতঃ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার মানসে সুযোগ ও সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোথায়, কোন স্থানে যাইলে তাঁহাদিগের ঈপ্সিত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া ইহা সুসম্পন্ন সহজসাধ্য মনে করিয়া তাঁহারা একদিন দলবদ্ধ হইয়া নদীসৈকতে গমন করিয়া শিক্ষক মহাশয়ের উপযুক্ত ভ্রাতার সাহায্যে মাংসাদি রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করিলেন। এই সর্ব্ব প্রথম, অত্যন্ত দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন মনে করিয়া তাঁহারা কম্পিত কলেবরে মাংসখণ্ডগুলি অতি শীঘ্র যেন তেন প্রকারেণ গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন। অনভ্যাস বশতঃ প্রথমতঃ মাংস ভোজন তাঁহাদিগের নিকট ঘৃণার উদ্দীপক বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু মাংসের অপ্রীতিকর আস্বাদন অপেক্ষা তাঁহারা যে এক অতীব গর্হিত কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, ইহারই ক্লেশদায়ক স্মৃতি তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা এক ঘোরতর পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন মনে করিয়া দুশ্চিন্তায় অভিভূত হইয়া অতি কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিলেন। রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত। তাঁহাদের মানসিক অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহারা এরূপ কার্য্যে আর কখন লিপ্ত হইবেন না বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু কুসংস্কারের ভয়ে তাঁহারা অবসাদগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়া লোকে পাছে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এই ভয়ে তাঁহারা সকল প্রকার মানসিক ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া আস্থির গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এবং ক্রমেই আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ক্রমেই লোকলজ্জা ভয় ও মানসিক ক্লেশ বিদূরিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যে সাহস পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা এতদূর সাহসী হইয়া উঠিলেন যে, আর কোনও কাজ করিতে তাঁহারা ভয় পাইতেন না। ক্রমশঃ তাঁহারা অতি সাহসী হইয়া উদারতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময় মোহনের মতি গতি যেরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছিল, যদি তাঁহার জীবনের কোন একটী সুদৃঢ় অবলম্বন না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার জীবনতরী আজ কোথায় ভাসিয়া গিয়া কোন ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ডুবিয়া যাইত, তাহা কে ইয়ত্তা করিতে পারে?

এই সঙ্কটকালে তাঁহার অসাধারণ সত্যপ্রিয়তা তাঁহাকে রক্ষা করিল। সত্যবাদিতা তাঁহার জীবনের অংশরূপে পরিণত হইয়াছিল, তিনি কিছুতেই মিথ্যা কথা বলিতে পারিতেন না। যখন এক একটী করিয়া জীবনের সকল বন্ধন ছিন্ন হইতে লাগিল, তখন তিনি কেবলমাত্র সত্যপ্রিয়তাকে দৃঢ় ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রাখিলেন।

তিনি অসত্য আচরণকে, প্রতারণাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। যদিও তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা সহপাঠিদিগের সহিত নানা স্থানে গমনাগমনের জন্য তাঁহার মাতার অনুমতি পাইয়াছিলেন, তথাপি কোথায় গিয়াছিলেন কেনই বা গিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি অতি সাবধানে নানা প্রকার ছলনার দ্বারা আবরণ করিয়া তাঁহাদিগকে গোপন করিতে হইত। মোহন দেখিলেন, তাঁহারা যে পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সে পথ অতীব বিপদসঙ্কুল, সে পথে সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিরাপদে গমনাগমন করা যায় না। তাঁহাদের নদী সৈকতে আনন্দ ভোজন বা অন্যান্য কোনও প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার কথা যদি তাঁহার জননী দেবী জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে কিরূপ দুর্বিসহ মর্ম্মান্তিক ক্লেশ পাইবেন, তাহা চিন্তা করিয়া মোহনের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। সেইজন্য অনেক সময় তাঁহাদের বিপথ গমনের কথা তাঁহার নিকট গোপন করিতে হইত। এইরূপ ভাবে গোপন করিতে গিয়া তিনি অত্যন্ত মানসিক কষ্ট পাইতেন। আপনাদিগের কার্য্যকলাপকে গোপন করিতে চেষ্টা করা বা অলীক যুক্তি কৌশলে উড়াইয়া দিবার প্রয়াস পাওয়া তাঁহার নিকট প্রতারণার রূপান্তর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এই সব চিন্তা যতই

* বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতের সর্ব্বত্রই উচ্চ জাতি মধ্যে মাংসাহার নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সমাজে মাংসাহার পাপ ... পরিগণিত হইয়া থাকে।

তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল, ততই তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, তিনি আর সহপাঠিদিগের সহিত মিলিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পথে বিচরণ করিবেন না। তিনি এখন হইতে তাঁহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সংযমের পথে ফিরিয়া আসিলেন। যে স্বাধীনতা মিথ্যাচরণ বা প্রতারণার দ্বারা লাভ করিতে হয়, সে স্বাধীনতায় তাঁহার কোনও প্রয়োজন রহিল না। তাঁহার অন্তরাত্মা যেন বলিয়া উঠিতে লাগিল ঃ—

"চাই না সভ্যতা চাষা হ'য়ে থাকি,
দেও ধর্ম্ম ধন প্রাণে পুরে রাখি।"

যদিও মোহন যথাসম্ভব প্রাচীন রীতি নীতির বন্ধনে আবার ফিরিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে যে স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা হ্রাস না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সকল যতই তাঁহার মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল, তিনি ততই প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অনেক সময় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা প্রকার জটিল প্রশ্ন দ্বারা তিনি তাঁহার মাতৃদেবীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। মাতা, পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া সময়ে সময়ে অবাক্ হইয়া যাইতেন।

মোহনের নিকট জীবন সমস্যা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি আধ্যাত্মিক প্রশ্ন সমূহের একটী সম্যক সমাধান পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি এ বিষয়ে যতই গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সচরাচর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া যাহা আচরিত হইয়া থাকে তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নয় তাহা দেশাচার মাত্র। প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল তাঁহার নিকট বালকোচিত এবং কোন কোনটী নীতি-বিগর্হিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি প্রচলিত ধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। ইহা অপেক্ষা পবিত্রতর এবং উন্নততর ধর্ম্ম লাভের জন্য তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি সত্যধর্ম্ম পাইবার জন্য বিশেষভাবে উন্মুখ হইয়া রহিলেন। হায়! আজ-কাল কত শত যুবকের প্রাণে জ্ঞানোন্ন... প্রকৃত ধর্ম্ম লাভের চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা ... থাকে। সত্যনিষ্ঠ, সরল, ধর্ম্মপ্রাণ, সৎসঙ্গের ... তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা দিন দিন হ্রাস ... তাঁহাদের জীবনকে হীনপ্রভ করিয়া তুলিতেছে ... তাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভে বঞ্চিত হইয়া ... বিশ্বাসীর মতন কতকগুলি অর্থশূন্য অলীক আচার ... অনুষ্ঠানে যোগদান করাকে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন ... করিয়া নাস্তিকের ন্যায় জীবন ধারণ করিয়া ... যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

মোহন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষালাভার্থ ভবনগর কলেজে ভর্ত্তি হন। ... কলেজের প্রথম অবকাশ সময় রাজকোটে ... করিবার জন্য তথায় গমন করেন। সেখানে তাঁহার একটী ব্রাহ্মণ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই ব্রাহ্মণ বন্ধু তাঁহাদের একপ্রকার কুলগুরু ছিলেন ... মোহনের রাজকোট গমনের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে এক ... যুবক বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া ... কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই দূরদর্শী ব্রাহ্মণ বন্ধু বিলাত প্রত্যাগত যুবকের ... উল্লেখ করিয়া মোহনকে উপদেশ দিলেন যে ... তিনি উন্নতি করিতে চান এবং তাঁহার পিতা, পিতৃ... মহের ন্যায় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি হইয়া সম্মান লাভ করিতে চান তাহা হইলে তিনি বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসুন। মোহনের এ উপদেশ মন্দ বলিয়া বোধ হইল না। মোহনের মনে বাল্যকাল হইতেই বিলাত ভ্রমণের একটী প্রবল ইচ্ছা ছিল। নানা দেশে যাওয়া, বহুবিধ দৃশ্য দর্শন করা, অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করা, বিভিন্ন অবস্থানুযায়ী উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা এবং মহৎ হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে মোহন বাল্যকাল হইতেই নানাপ্রকার কল্পনা জল্পনা করিতেন। এখন এই ব্রাহ্মণ ... উপদেশে তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিত বাসনা উদ্দীপ্ত ... উঠিল। তিনি যেন মানসচক্ষে আপনার ভবিষ্যৎ ... উন্নতির পথ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার ... হইতে লাগিল আজ যদি তাঁহার পিতৃদেব জী...

...বিতেন * তাহা হইলে তাঁহার কত সুবিধা হইত। ... জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতি ও ...মর্য্যাদা এবং তজ্জনিত বংশের পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ-...র কথা চিন্তা করিয়া কখনই তাঁহার প্রতিকূলা-চরণ করিবেন না বলিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ...নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার বিলাত গমনে প্রবল ...জানিতে পারিয়া এবং চক্ষুর সমক্ষে বিলাত-প্রত্যাগত যুবকের ক্ষিপ্র উন্নতি অবলোকন করিয়া ...বন্ধক হওয়া দূরে থাকুক তিনি অতি আহ্লাদের ...তে বিলাতে তাহার সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহের ... আপনাদিগের বিষয় সম্পত্তি এবং প্রয়োজন ...লে অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তত ...লেন।

... তাঁহার বিলাত গমনের প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন ...হার জননী দেবী। তাঁহার মাতার সম্মতি পাওয়া ...দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ...হার অন্তরদৃষ্টির সাহায্যে বিদেশ প্রবাস যে কত ...নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপদ আপদপূর্ণ তাহা পূর্ব্ব ...তে অনুমান করিয়াছিলেন। তিনি অতি পূর্ব্ব ...তেই লণ্ডন প্রবাসে পদস্খলনের যে সব সত্য ঘটনা ...কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার ...রাত্মা যেন কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ...সেই সব ঘটনা স্মরণ করিয়া যেন সঙ্কুচিত হইয়া ...উঠিল। তিনি কিছুতেই সম্মতি দানে প্রস্তুত হইতে ...তেছিলেন না। কিন্তু পুত্রের একান্ত অনুনয়ে ...বিলাত গমনাগমন সম্বন্ধে কয়েকদিন ধরিয়া দিবাভাগে ...নানাপ্রকার তর্ক বিচার, আলোচনা ও রাত্রিতে ...ময় বিধাতার আদেশ পাইবার জন্য প্রার্থনা ...পাদনা করিতেন। অবশেষে মদ্য মাংস ও বিলাসিনি-...গের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ...রাইয়া বিলাত গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। ...তার অনুমতি প্রদান কাল ও বিলাত যাত্রার দিনের ...মধ্যে অতি অল্প সময়ের ব্যবধান ছিল। সেই অল্প সময় মধ্যে তিনি পোরবন্দরে গিয়া পোরবন্দরের তৎকালীন ইংরাজ শাসন কর্ত্তা সার এফ, এস, পি লেলী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিলাত গিয়া অধ্যয়নের জন্য যে বৃত্তি ছিল তাহা সংগ্রহ করিতে মনস্থ করিলেন। উন্নতিশীল প্রতিভাশালী যুবক-দিগকে বৃত্তি দিয়া বিলাত প্রেরণ করিবার জন্য লেলী সাহেবের কয়েকটী বৃত্তি দিবার অধিকার ছিল। যদিও মোহন বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি পাইয়া-ছিলেন এবং স্কুলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন তবুও তিনি আপনার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দ্বারা শ্রীযুক্ত লেলী সাহেবকে সন্তুষ্ট করিতে না পারায় বৃত্তি পাইলেন না।

লেলী সাহেব তাঁহার অনুনয় বিনয়ে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার আবেদন পত্রে লিখিয়া দেন "না, এখন তুমি কিছুতেই বৃত্তি পাইতে পার না, বি,এ পাস করিয়া পুনরায় চেষ্টা করিলে তোমার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে।"

যদিও তিনি এখানে অকৃতকার্য্য হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত মহাশয়ের,—যিনি তাঁহার পিতৃদেব কর্ত্তৃক পোরবন্দরের দেওয়ানের পদে প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছিলেন —নিকট হইতে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছিলেন।

খুল্লতাত মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিলাষ অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইয়া সফল-তার জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার মনস্কাম পূর্ণ হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে রাজকোটে পাঠাইয়া দিলেন।

মোহনের বিলাত গমন তাঁহার একদল আত্মীয়ের নিকট অতীব অপ্রীতিকর বলিয়া বিবেচিত হইয়া-ছিল। ইঁহারা মোহনকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বিলাত যাইলে তাঁহাদের সমগ্র জ্ঞাতিবর্গ অপমানিত ও অপদস্থ হইবেন বলিয়া নানা প্রকার যুক্তি দেখাইতে লাগি-লেন। পরে গালি বর্ষণ এমনকি কঠোর দণ্ড দিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া যখন কৃতকার্য্য হইলেন না তখন বোম্বাইবাসী সমস্ত জ্ঞাতিবর্গকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করিলেন। যদিও মোহনদাস

* এই ঘটনার ৪ বৎসর পূর্ব্বে তাহার পিতৃদেব পরলোক গমন করেন।

রাজকোট এবং অন্যান্য সহরে অতি সম্মানের সহিত গৃহীত ও আদৃত হইয়া থাকেন তথাপি আজ পর্য্যন্ত তিনি পোরবন্দর ও বোম্বাইনিবাসী জ্ঞাতিবর্গের নিকট জাতিচ্যুত হইয়া রহিয়াছেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দুই জন ভারতীয় সহযাত্রীসহ মোহন লণ্ডনের ডকে (Dock) গিয়া উপস্থিত হন। কোন স্থানে যাইলে তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইতে পারে তাহা ঠিক করিতে না পারায় তাঁহারা ভিক্টোরিয়া হোটেলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোহনের পরিধানে অতি সাদাসিধা রকমের পোষাক ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তিনি সেই পোষাক পরিধান করিয়া ইংলণ্ডের ভদ্রসমাজে বেশ মিশিতে পারিবেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে পথের লোকজন তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদের দিকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে এবং তাঁহার ভিন্ন অন্য কাহারও সেই প্রকার পরিচ্ছদ নাই তখন তাঁহার অভিমানী মন কিছু ক্ষুন্ন হইয়া পড়িল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন তিনি সকল চক্ষুর অবশ্য দ্রষ্টব্য এক অদ্ভুত জীবে পরিণত হইয়াছেন। এই সব চিন্তাতে বিশেষতঃ কোনও বন্ধুবান্ধবকে নিকটে পাইয়া কিরূপ আচরণ অবলম্বন করিলে ইংরাজ ভদ্রসমাজে স্বচ্ছন্দে চলা ফেরা করিতে পারা যায় সে বিষয়ে যথাযথ উপদিষ্ট হইতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত অসুখী হইয়া পড়িলেন। সেই জন্য জনৈক বন্ধুকে তারযোগে আনাইয়া বিলাত প্রবাস বিষয়ক শিষ্টাচার সমূহ শিক্ষা করিয়া কতটা আশ্বস্ত হইলেন। বন্ধুবর মোহনকে একটি "পূর্ণমাত্রায় সাহেব সাজাইবার" ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তিনি সর্ব্বপ্রথমেই মোহনকে রিচমণ্ডের পোষাকালয়ে লইয়া গিয়া সাহেবোচিত পোষাক ক্রয় করাইলেন। অতঃপর কিরূপ ভাবে চলাফেরা করিতে হইবে সে বিষয়ে যথাবিধি উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুবর সযতনে পূর্ণ ভাবে সাহেবী আচার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া একজন "খাটী সাহেব" সাজিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে আসিয়া... মদ্য মাংস ভোজনে অভ্যস্থ হইয়া ধূমপান করি... শিক্ষা করিয়া নিজ কল্পনা মত একজন সম্ভ্রা... সভ্য লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি ... বুদ্ধিমান দয়াপ্রবণ ছিলেন। মোহনের জীবনে ... তাঁহার মাতার প্রভাব বিশেষ ভাবে কার্য্য ... করিত, তাহা হইলে বন্ধুবর মোহনকে পূর্ণ মাত্রা... সাহেব সাজাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি যে এ... বারে অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পা... যায় না।

মোহন তাঁহার প্ররোচনায় ভ্রান্ত আদর্শে... সম্মোহন আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রায় তিন মাসকা... যথেষ্ট অর্থ ও বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছিলেন।

মোহন প্রথমতঃ প্রকৃত সাহেব সাজিবার ... নৃত্য গীত ফরাসী ভাষা বক্তৃতাদি দিবার আ... কায়দা এমন কি বেহালা বাজান শিক্ষা করি... আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি তখন মনে করি... ছিলেন, এ সব না শিখিলে একজন প্রথম শ্রেণী... সাহেব হওয়া যায় না এবং যদিও তিনি বেশ জা... তেন যে এ সব শিক্ষা করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ, এ... কি অসম্ভব ব্যাপার, তবুও তিনি একবার চে... করিয়া দেখিতে মনস্থ করিলেন।

মোহন যদিও বিলাতে গিয়া প্রথমতঃ আধুনিক... সভ্যতার বাহিক চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কি... তিনি আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ফিরিয়া আসি... কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার চরি... মধ্যে যে এক দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার বল ছিল তাহা আ... তাঁহার সহপাঠিদিগের সঙ্গ পরিত্যাগকালে পরি... পাইয়াছি। তিনি যাহা একবার প্রতিজ্ঞা করি... তাহা হইতে তাঁহাকে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত করি... পারা যাইত না। তিনি তাঁহার মাতার নিকট ... প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার বন্ধুগণ ... চেষ্টা করিয়াও ভাঙ্গাইতে পারেন নাই। যখন তাঁ... বন্ধুবর শুনিলেন যে তিনি তাঁহার মাতার নিকট ... রোক্ত তিনটি জিনিষ হইতে বিরত থাকিবার প্রতি... করিয়া বিলাতে আসিয়াছেন তখন তিনি ক্রো...

...র হইয়া চিৎকার করিতে করিতে বলিতে লাগি... "শপথ! হাঁরে হতভাগ্য! শপথ করিয়া কেহ ...নও দিন বিলাতে আসিয়াছে? যদি শপথ করিবে ... কোন মুখে বিলাতে আসিয়াছ? যদি তুমি ...র সহোদর হইতে তাহা হইলে আজ প্রহারের ...টে তোমায় ঠিক করিয়া লইতাম।" মোহন ...সাদি খাওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া ...বর এতটা চটিয়াছিলেন!

বন্ধুবর প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই মোহন কি উপাদানে গঠিত হইয়াছিলেন, তাই ...ন তাঁহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার জন্য দুই চারি... বন্ধুসহ মোহনকে হলবর্ণ ভোজনালয়ে এক সমা... ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি মনে ...য়াছিলেন, সকলের সমক্ষে লজ্জা বশতঃ মোহন ...াদি সম্বন্ধে কোনও আপত্তি করিবেন না।

যখন ভোজনের প্রথম খাদ্য পরিবেশিত হইয়া ..., তখন মোহন পরিবেশনকারীকে আহ্বান ...য়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা ...সের সূপ। নিমন্ত্রণকারী বন্ধুবর নিমন্ত্রিত বন্ধুদিগের ...াতে মোহনকে খাদ্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে ...য়া ক্রোধভরে বলিলেন "তুমি ভদ্র সমাজের ...যুক্ত নও। যদি ভদ্রলোকের মতন ব্যবহার ...িতে না পার তবে এখনি চলিয়া যাও।" মোহন ...ার কথা শুনিয়া আনন্দে সেখান হইতে চলিয়া ...িলেন।

মোহন প্রথম হইতেই ব্যারিষ্টার হইবার উদ্দেশ্যে ...র টেম্পলে আইন পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হই... ...ও পাঠে বড় একটা মন দেন নাই। এখন হইতে ...া প্রকার শিক্ষালাভ করিয়া তিনি প্রকৃতভাবে ...ত্রজীবন যাপন করিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। ...নেক ছাত্রই বিলাতে গিয়া প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য ...তার বাহিক চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া যথার্থ অভি...বকের অভাবে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া আপনাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নষ্ট করিয়া সারাজীবন অতি ...ষ্টে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। তিনি নৃত্যগীতাদি পরিত্যাগ করিয়া এক দিকে যেমন আইন অধ্যয়নে মন দিলেন অন্যদিকে তেমনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা দিবার জন্য "প্রাইভেট ক্লাসে" পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এখন হইতে তিনি সকল প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়াএকটী কামরা ভাড়া লইয়া স্বহস্তে আপনার ভোজনোপযোগী অতি সামান্য আহার্য্য রন্ধন করিয়া আপনার সকল প্রকার ব্যয় ৬০ টাকার মধ্যে চালাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি কোন একটী নিরামিষ ভোজনালয়ে গিয়া ছয় পেন্স বড় জোর এক শিলিং খরচ করিয়া একটী করিয়া ডিনার খাইয়া আসিতেন।

মোহনের প্রাণে যে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা উত্থিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে এত দিন তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মনে করিয়াছিলেন পারিবারিক আচার অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মবিশ্বাসের হাত হইতে মুক্ত হইলে আপন জ্ঞান ও বিবেকানুমোদিত কার্য্য সকল নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিবেন। এখন সেই সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হওয়াতে তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে লাগিল যে তিনি কি এতটা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন যাহা দ্বারা তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন ধর্ম্মরহস্য সকল অবিজ্ঞেয়। তাঁহার মনে হইতে লাগিল প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই কি মানুষকে ঈশ্বরবিশ্বাস বিহীন নাস্তিক হইতে হইবে? তিনি ত এখন খৃষ্টধর্ম্মের আবহাওয়ার মধ্যে বসবাস করিতেছেন, ইহার সম্বন্ধেও কি এইরূপ মত পোষণ করিবেন? তাঁহার যৎসামান্য জ্ঞানে তিনি কি ধর্ম্মের ন্যায় গভীর বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ! যতই এই সব প্রশ্ন তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল তিনি ততই বিষণ্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

লেডি মার্গারেট হাঁসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার যোসিয়া ওল্ডফিল্ড তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন মোহনের চরিত্রের উপর আস্তে আস্তে প্রভাব বিস্তার করিতে ছিল। তিনি নিরামিষ সভার সভ্য হওয়াতে অন্যান্য অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। যদিও তাঁহারা বিশেষ

ভাবে ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন না তবুও নানা-প্রকার কথাবার্ত্তা আলোচনা তর্কবিচারে ধর্ম্মের কথা আসিয়া উপস্থিত হইত। এই সব আলোচনায় তাঁহারা মোহনের নিকট নানা প্রকার ধর্ম্মতত্ত্বের কথা শুনিবার আশা করিলেও মোহন ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে আপনার অজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া বড়ই লজ্জিত হইতেন। ডাক্তার ওল্ডফিল্ড যখন মোহন-কে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া খৃষ্টবিশ্বাসী হইবার জন্য অনুরোধ করিতেন তখনই মোহন বলিয়া উঠিতেন, আপন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ নাই। যদিও ডাক্তার সাহেব আপাততঃ নিরস্ত হইতেন বটে কিন্তু তিনি সময় ও সুযোগ পাইলেই তাঁহার নিকট খৃষ্টের উন্নত জীবন ও খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার উপদেশ দিতে ছাড়িতেন না।

এই সময় তিনি বুজরুগ্* সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমতী ব্লাভাটস্কির দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রণীত পুস্তকাদিও পাঠ করিয়াছিলেন এবং ব্লাভাটস্কিলজে গিয়া সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন। কিন্তু তিনি ইহাদের সম্পর্কে আসিয়া বিশেষ কোনও উপ-কার পান নাই। যে সব সাধুপ্রকৃতি সচ্চরিত্র ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু লোক ইহাঁদের সহিত বিশেষভাবে মিশিয়া-ছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নানা কারণে বীত-শ্রদ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। † বিজ্ঞান সম্মত প্রকৃতিতত্ত্বে বা ধর্ম্মতত্ত্বে অবিশ্বাস এবং কতকগুলি অস্বাভাবিক অতি অনৈসর্গিক উদ্ভ্রান্ত মত পোষণ ভিন্ন ইহাঁদের অন্য কোনও বিশেষত্ব নাই। বর্ত্তমানে কৃষ্ণমূর্ত্তি সংঘটিত মোকদ্দমায় প্রকাশ্য আদালতে যে সকল গুপ্তরহস্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই সম্প্র-দায়ের অনেকেই হাস্যোদ্দীপক এবং হাস্যাস্পদ জীব বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা কৃপার পাত্র।

মোহন আপন দেশের ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ করিতে লাগিলেন। [illegible] যতই এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন [illegible] প্রচলিত ধর্ম্ম অপেক্ষা পবিত্রতর, উন্নততর ধর্ম্মের আভাস পাইয়া উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বে কবিতা হিসাবে গীতা পাঠ করিয়া-ছিলেন। যে গীতাশাস্ত্র তাঁহার পূজনীয় পিতৃ[illegible] অতি ভক্তিসহকারে পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। সেই গীতাশাস্ত্র এখন তিনি অতি শ্রদ্ধাভক্তির সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব লাভের জন্য পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। যতই পাঠ করিতে লাগিলেন ততই ইহার [illegible] সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। [illegible] তাঁহার জীবনের নব অধ্যায় খুলিয়া দিল। [illegible] ধর্ম্ম বিষয়ে আলোক পাইলেন। তাঁহার জী[illegible] এক নবযুগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

এমন সময় ম্যানচেষ্টারবাসী জনৈক ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি মোহনের ধর্ম্মা[illegible] রাগ দেখিয়া তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে আনিবার জন্য বি[illegible] চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি একজন সরল [illegible] ধর্ম্ম বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে [illegible] যদি যত্নের সহিত বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করেন [illegible] হইলে তিনি নিশ্চয়ই খৃষ্টান হইবেন। সেই [illegible] তিনি মোহনকে অন্ততঃ তাঁহার খাতিরে এক[illegible] বাইবেল গ্রন্থখানি পড়িবার জন্য অনুরোধ ক[illegible] একখানি বাইবেল কিনিয়া দিলেন। মোহন পড়ি[illegible] প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু কোন কোন অংশ পড়ি[illegible] হইবে তাহা বলিয়া না দেওয়াতে মোহন [illegible] পরিচ্ছেদ হইতেই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। [illegible] কয়েক পরিচ্ছেদ বড়ই শুষ্ক বোধ হইল। [illegible] প্রাণে যে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা উত্থিত হইয়াছে তাহার [illegible] উত্তর না পাইয়া তিনি বাইবেল পড়া বন্ধ ক[illegible] দিলেন কিন্তু তিনি খৃষ্টধর্ম্ম বিরোধী হইলেন [illegible] তাঁহার ধর্ম্মপিপাসু প্রাণ যেখান হইতেই সত্যা[illegible] আসিবার সম্ভাবনা আছে সেই স্থানেরই জন্য [illegible] হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

[illegible] মোহন নিয়মিতরূপে গির্জ্জায় যাইতেন। তিনি [illegible] ও ডাক্তার ফারারের উপদেশ শুনিয়াছিলেন [illegible] তাঁহাদের অবলম্বিত যুক্তিমার্গ ভাল করিয়া [illegible] করিতে না পারিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মাদর্শ [illegible] করিতে পারেন নাই।

কিন্তু ডাক্তার পার্কার সম্বন্ধে তাঁহার অন্যভাব [illegible]। ডাক্তার পার্কারের সভাপতিত্বে সিটি [illegible] গির্জ্জায় প্রতি বৃহস্পতিবারের মাধ্যাহ্নিক [illegible] সভায় তিনি আগ্রহের সহিত যোগ [illegible]। ইহাতে মোহন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া-[illegible]। ডাক্তার পার্কারের উপদেশাবলী যুবক-[illegible] চিন্তাকে ধর্ম্মান্বেষণে উদ্দীপ্ত করিয়া তাঁহাদের জীবনে এমনি একটী প্রভাব বিস্তার করিত যে যুবকবৃন্দ তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পুনঃপুনঃ তাঁহার নিকট গমন করি-তেন। এই ধর্ম্মালোচনায় যোগ দিয়া মোহনের প্রভূত উপকার হইয়াছিল, তিনি যদিও কোনও একটী সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার বাল্যের নাস্তিক্য বুদ্ধি বিদূরীত হইয়া তিনি পরমেশ্ব-রের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন এবং পরম পিতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের জীবন্ত জাগ্রত সত্বাকে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

মাতৃ-আহ্বান

ভারতের দেব-দ্বারে শুনি শঙ্খধ্বনি ;
কাঁপাইয়া চরাচর উঠে রণরণি'
চিত্তে চিত্তে বিস্ময়ের রোমাঞ্চের মত,
অজ্ঞান অন্ধতা মূঢ় জড়তায় নত
সত্যধর্ম্ম ধ্বজা আজ উঠেছে জাগিয়া
সেবায়, কল্যাণে, জ্ঞানে লয়েছে মাগিয়া
ত্যাগের সুন্দর মূর্ত্তি। হইতেছে জ্বালা
অন্ধকার সে মন্দিরে বহু দীপমালা
আলোকিয়া দেবতার শান্ত মুখচ্ছবি,
যেথা হায়, বহুকাল সন্ধ্যা-তারা, রবি
দেয় নাই দেখা ; এই আকাশের আলো—
যেখানে কাঁদিত ফিরে, বাসিবারে ভালো
দেবতার পদযুগ ; করিতে বন্দনা
যেথা হতে ফিরে যেত পাইয়া লাঞ্ছনা
শত শত ভক্তবৃন্দ। ছন্দ, গীতি গাহি'
ভক্ত-ভৃঙ্গ সেথা ফিরে, বন্ধ আর নাহি
সুন্দর মন্দির-দ্বার। সেবকের দল—
বাহিরিল ওই হের, করি কোলাহল
হিমাচল-শিখরের নদী-ধারা সম
কাঁপাইয়া পাষাণের অসীম দুর্গম
সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পন্থা, তুলি' নব তান
অনন্ত-প্রশান্ত শান্ত বারিধির গান ;
আপনারে খরস্রোতে নিত্য দিয়া ঢালি'
মুছাইয়া স্বধর্ম্মের যত আছে কালি
ঝরাইয়া চির-স্তব্ধ তুষারের স্তূপ,
ভারতে "ভারত" করি দিয়া নবরূপ !

* * * *

শুধু কেন হেথা নাই পূজা আয়োজন ?
কোথা নারী—মাতৃমূর্ত্তি ? কেন সঙ্গোপন
অনন্ত সে শুচি স্নাত স্নিগ্ধ শোভাময়ী
দেবতার সেবিকারা ? কোথা আছ অয়ি
জননী রমণীগণ ! তোলো পূজা-ফুল
সাজাও এ পুষ্পপাত্র—যার সমতুল
বিশ্ব কোথা দেখে নাই। জ্বালো দীপাবলী,
নম্র, শান্ত, স্নিগ্ধ আঁখি, ধীর পদ ফেলি'
এসো গো দেউল দ্বারে, দাঁড়াও দাঁড়াও—
এই চির অন্ধকার কেড়ে নিয়ে যাও
তোমাদের দীপালোকে। ভরি' লয়ে সাজি
নিত্য ফুল তুলে রাখ, সযতনে মাজি'
সমগ্র সামগ্রী-ভার ! সেবকের দল
তোমাদেরি আশীর্ব্বাদে রবে নিরমল,
যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষতহীন বীর পুত্র সম ;
রমণীর আশীর্ব্বাদ হবে মনোরম !
আত্ম-বলি, পুরোহিত, আছে সবই, হায়—
শুধু ফুল তোলা নাই দেবতার পায়।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

---

* বুজরুগ্ (Persian) = তত্ত্বজ্ঞানী।

† Justice Sunder Iyer প্রমুখ ৩০০ শত মান্দ্রাজবাসী ভদ্রলোক নাকি ইহাদের সভ্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন

ব্রাদার লরেন্সের পত্রাবলী।

(৩)

ঈশ্বর পরম কারুণিক এবং আমাদের সকল অভাব জানেন—তিনি সর্ব্বজ্ঞ। আমি সর্ব্বদাই মনে ভাবিতাম, তিনি তোমায় বিপদের মধ্যে ফেলিয়া দিবেন। তিনি তাঁহার সময় বুঝিয়া তোমার মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হইবেন—যখন তুমি তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া আছ তখন নয়, কিন্তু যখন তাঁহার জন্য মোটেই প্রস্তুত নও। তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমার প্রতি যে সকল কৃপা প্রদর্শন করিতেছেন, বিশেষতঃ তোমার বিপদের মধ্যে তোমার দুরবস্থার মধ্যে তুমি যে তাঁহার কৃপায় ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিয়াছ, তাহার জন্য আমার সঙ্গে তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। তোমার প্রতি তিনি যে উদাসীন নহেন, তোমার জন্য তিনি যে যত্ন লইয়া থাকেন, তাহার প্রমাণ ইহাই যে তিনি বিপদের মধ্যে ফেলিয়াও তোমায় স্থির থাকিবার শক্তি প্রদান করিতেছেন, অতএব আশ্বস্ত হও। সকল অবস্থার মধ্যেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও।

আমি—এর সাহসকেও প্রশংসা করি। ঈশ্বর তাঁহাকে শান্ত ভাব ও শুভ ইচ্ছা দান করিয়াছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্তও সংসারাসক্তি তাঁহার একেবারে ছিন্ন হয় নাই। আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তাঁহাকে যে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাই ফলপ্রদ ঔষধ হইবে। ইহাতেই তিনি জাগ্রত হইয়া ঈশ্বরকে ভাল করিয়া লাভ করিবেন। বিপদ একটী আকস্মিক ব্যাপার, কিন্তু ইহার ভিতর দিয়াই তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাকেই—যিনি সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে থাকেন—জীবনের নির্ভর স্থল বলিয়া অনুভব করিবেন।

তিনি যত তাঁহাকে চিন্তা করিতে পারেন, ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গল। বিশেষতঃ ভয়ানক বিপদের অবস্থায়।

সংসার হইতে মনকে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতে পারিলেও যথেষ্ট। অল্প সময়ের জন্য ঈশ্বর… স্মরণ করা—সে যদি যুদ্ধ যাত্রার কালে হস্তে তরবা… ধারণ করিয়াও হয়—তাহাও প্রার্থনা। যত অ… ক্ষণের প্রার্থনাই হউক না কেন, মুহূর্ত্তের প্রার্থনা… ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয়। যুদ্ধের মধ্যে আসন্ন বি… দের মধ্যে অল্পক্ষণের প্রার্থনা যোদ্ধার প্রাণে ভ… সঞ্চার না করিয়া বরং তাহাকে নির্ভয় করিয়াই তো…

অতএব অল্প অল্প করিয়াই তিনি ঈশ্বরের চি… করিতে অভ্যাস করুন। এই চিন্তা অল্প সময়ের জ… হইলেও ইহা অতি পবিত্র চিন্তা। অন্য ব্যক্তির চ… এইরূপ প্রার্থনা ধরা পড়িবার কোনই আশঙ্কা না… দিনের মধ্যে বারে বারে অল্প অল্প করিয়া এই প্রা… প্রার্থনা বহুবার করা যাইতে পারে এবং ইহার… সহজ আর কিছুই নাই।

তিনি যত বেশী ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে পা… ততই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের কথা এবং আমার… সমস্ত মত এখানে আমি প্রকাশ করিলাম, এই স… বিষয় যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাঁহাকে জানাইতে পা…

এই ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা… প্রয়োজন। বিশেষতঃ কোন সৈনিকের প… যিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদের মধ্যে পড়িয়া জীব… হারাইতে পারেন।

তাঁহাকে এবং তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তি… ঈশ্বর সাহায্য করিবেন, আমার বিশ্বাস।

(৪)

ঈশ্বর তোমাকে রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত ক… এমন প্রার্থনা আমি করিব না। যতদিন… ইচ্ছা ততদিন তুমি রোগ ভোগ কর। কিন্তু ঈশ… নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই—তিনি… তোমায় রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিবার উপযুক্ত… ধৈর্য্য প্রদান করেন। যিনি তোমাকে কষ্টে… নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাকে লাভ করিয়া…

…শম কর, উৎফুল্ল হও। তাঁহার যখন ইচ্ছা হইবে, …যুক্ত সময় বুঝিয়া, তোমায় তিনি উদ্ধার করিবেন। …হারা তাঁহাকে অন্তরে ধারণ করিয়া যন্ত্রণা ভোগ …রেন, তাঁহারাই সুখী। দুঃখের মধ্যে তাঁহাকে …রিয়া থাকিবার অভ্যাস কর। তিনি যতদিন পর্য্যান্ত তোমাকে যে পরিমাণ কষ্ট দিতে চাহেন, তুমি ততদিন পর্য্যন্ত সেই পরিমাণ কষ্ট যাহাতে বহন করিতে পার, তাহার উপযুক্ত বল তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। সাধারণ লোকেরা আমার এই কথার …ত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ইহাতে আশ্চর্য্য …ইবার কিছুই নাই, কারণ তাহারা সংসারের লোক। …শ্বরকে দূরে রাখিয়া দিন কাটাইয়া থাকে, তাই …খে অভিভূত হইয়া পড়ে। রোগকে তাহারা দুঃখের …রণ বলিয়াই জানে। উহা যে ঈশ্বরের করুণার …শেষ দান এ জ্ঞান তাহাদের নাই। সেই জন্য তাহারা রোগের মধ্যে কেবল যন্ত্রণা, কেবল দুরবস্থাই …দেখে। কিন্তু যাঁহারা রোগকে ঈশ্বরের হাতের দান বলিয়াই জানেন—রোগ আর কিছুই নহে, ঈশ্বরের করুণার প্রকাশ, ইহার ভিতর দিয়াই তিনি মুক্তি …ন করিবেন,—তাঁহারাই রোগের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করেন, তাঁহারাই রোগকে পরম প্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন।

রোগের সময় তিনি যতটা আমাদের নিকটে থাকেন, আমাদের সঙ্গে থাকেন স্বাস্থ্যের মধ্যে ততটা নিকটে ততটা সঙ্গে থাকেন না, ইহা যেন তুমি উপলব্ধি করিতে পার, আমার তাহাই ইচ্ছা। অন্য …ান চিকিৎসকের উপর নির্ভর করিও না। কারণ আমার মনে হয়, তোমাকে রোগমুক্ত করিবার ভার তিনি অন্য কাহারও উপর না রাখিয়া নিজের হাতেই রাখিয়াছেন। অতএব পূর্ণ মাত্রায় তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। তাহা হইলে তুমি শীঘ্রই সুস্থ হইয়া এইরূপ নির্ভরের ফল দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরের উপর যতটা বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত, তাহা না করিয়া চিকিৎসক এবং ঔষধের উপরই অধিক মাত্রায় বিশ্বাস স্থাপন করি বলিয়াই আমরা অনেক সময়ে বিলম্বে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকি। তুমি যত ভাল ঔষধই সেবন কর না কেন, ঔষধের শক্তি নিতান্তই কম। ঈশ্বর যতটুকু ইচ্ছা করিবেন, তুমি সুস্থ হও, ঔষধ ততটুকুই কার্য্যকরী হইবে, ইহার বেশী কিছুতেই নহে। দুঃখ যখন ঈশ্বরের হস্ত হইতেই আসিয়া থাকে, তখন তিনি ব্যতীত অন্য কেহই উহাকে দূর করিতে পারিবেন না। ঈশ্বর প্রায়ই আত্মাকে তাহার ব্যাধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য দেহের মধ্যে ব্যাধির সঞ্চার করিয়া থাকেন। যেমন শরীরের ব্যাধির জন্য তেমনি আত্মার ব্যাধির জন্যও ঈশ্বরকেই সকলের চাইতে বড় চিকিৎসক জানিয়া তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া আশান্বিত হও। ঈশ্বর তোমাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিও। আমাকে তুমি যত বড় সুখীই মনে কর না কেন, আমি কিন্তু তোমার অবস্থাকে অতিশয় লোভনীয় বলিয়া স্বীকার করি। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া কষ্ট ভোগ করার মধ্যে কোনই কষ্ট নাই। সে কষ্টকে আমি স্বর্গ সুখ বলি। ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া যে আনন্দ লাভ, সে যদি খুব বিপুল আনন্দও হয়, তবুও আমি নরক যন্ত্রণাই ভোগ করি। ঈশ্বরের জন্য দুঃখ স্বীকারের মধ্যেই আমার শান্তি।

আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না—শীঘ্রই তাঁহার সহিত একত্র মিলিত হইব। আমি তাঁহাকে বিশ্বাস নেত্রে দেখিতেছি, ইহাই আমার এ জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা এবং এমন ভাবে তাঁহাকে দেখিতেছি যে, একদিন আমি খুবই জোরের সহিত বলিতে পারিব, আজ যে আমি শুধু তাঁহাকে বিশ্বাস করি তাহা নহে, আজ আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। বিশ্বাস যাহা শিক্ষা দিতেছে, আমি তাহা অনুভব করিতেছি এবং এই বিশ্বাসের উপরেই আমি তাঁহারই মধ্যে বাস করিব, তাঁহারই মধ্যে মরিব।

সর্ব্বদা ঈশ্বরের সহবাসেই থাক। যন্ত্রণার ভিতরে তিনিই শান্তি দিয়া থাকেন, তিনিই একমাত্র আশ্রয়। আমার সাধ্যের মধ্যে আমার যতটুকু কার্য্য আমি তাহাই করি, সে কার্য্য এই—তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা, তিনি যেন তোমার সহিত বর্ত্তমান থাকেন।

(৫)

আমরা যদি ভাল করিয়া ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের শারীরিক ব্যাধির যন্ত্রণা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া যাইত। আত্মাকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য আমরা কিছু কিছু কষ্টভোগ করি, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন কর। অবিরত তোমার বেদনা তাঁহাকে নিবেদন কর। নীরবে দুঃখ বহন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে বল ভিক্ষা কর। সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের সঙ্গ লাভের সুখ যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন সম্ভোগ করিতে পার, তাহার অভ্যাস কর এবং ঈশ্বরকে যত কম বিস্মৃত হইয়া থাকিতে পার, ততই উত্তম। দুর্ব্বলতার ভিতরে তাঁহার ধ্যান ধারণায় রত থাক। ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণ কর। অসহ্য যাতনার সময় তুমি যেন তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছাকে মিলাইয়া দিতে পার, সেই জন্য ভক্তিভাবে ও দীনভাবে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইও। সন্তান যেমন পিতার ইচ্ছাকেই শুভ জানিয়া নিজের ইচ্ছাকে পিতার ইচ্ছার অনুগামী করে তুমিও তেমনি করিও। আমি আমার সামান্য প্রার্থনার দ্বারা তোমাকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব। নানা পথ দিয়া ঈশ্বর তাঁহার প্রতি আমাদের মনকে আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের দেখা না দিয়া মাঝে মাঝে অন্তরালে থাকেন। কিন্তু বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ইহাকে ধরিয়া থাকিলেই একান্ত প্রয়োজনের সময় তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

ঈশ্বর আমার দ্বারা কিরূপে কোন্ কার্য্য করাইয়া লইবেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি সর্ব্বদাই প্রফুল্ল আছি। যদিও আমি জানি, আমার প্রতি কঠিন শাসনের আবশ্যক, তবুও আমায় তিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখ বিতরণ করিতেছেন এবং সে সুখ এতই গভীর ও অপর্য্যাপ্ত যে আমি কিছুতেই হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না।

তোমার দুঃখের কিয়দংশ আমি যেন ভোগ করিতে পারি, ইহা আমি আনন্দ মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। কিন্তু আমি জানি, আমি নিতান্ত দুর্ব্বল। তিনি যদি মুহূর্ত্তের তরেও আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যান, তবে আমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। আমি ইহা কিছুতেই কল্পনার মধ্যে আনিতে পারি না, যে তিনি কেমন করিয়া আমাকে একা দূরে ফেলিয়া রাখিতে পারেন। বিশ্বাস এবং জ্ঞান আমাকে এই কথাই জানাইয়া দেয় যে, যদি আমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করি, তবে তিনি কোন মতেই আমাদিগকে পরিহার করিতে পারেন না। অতএব এ ভয় যেন আমাদের মনোমধ্যে সর্ব্বদাই জাগরুক থাকে, আমরা যেন তাঁহাকে দূরে না রাখি—পরিত্যাগ না করি। সর্ব্বদাই যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারি। আমরা যেন তাঁহার সত্তার মধ্যেই বাস করি, সত্তার মধ্যেই মরিতে পারি।

আমি যেমন তোমার জন্য প্রার্থনা করি, তুমিও আমার জন্য সেইরূপ প্রার্থনা করিও—ইহাই আমার অনুরোধ।

(৬)

তোমায় এত দীর্ঘকাল ভুগিতে দেখিয়া আমার কষ্ট হইতেছে সত্য বটে, কিন্তু ইহার মধ্যেও আমি আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতেছি। তাহার কারণ রোগের যন্ত্রণা ঈশ্বরের প্রেমকেই প্রকাশ করিতেছে। রোগকে ঐ ভাবে দেখিবার অভ্যাস কর তাহা হইলে সহজেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবে। তোমার অবস্থা যেরূপ তাহাতে আমার মনে হয় আর ঔষধ সেবন না করিয়া, চিকিৎসকের অধীনে আর না থাকিয়া এখন সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ কর। হয়তো ঐ প্রকার আত্মসমর্পণ এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস দেখিবার জন্যই তিনি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। যেই মুহূর্ত্তে উহা দেখিতে পাইবেন সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তোমায় রোগ হইতে মুক্ত করিবেন। ঐ প্রকার অবস্থার উপরেই তোমার আরোগ্য নির্ভর করিতেছে, যেহেতু তোমার সমস্ত যত্ন-চেষ্টা সত্ত্বেও ঔষধে এপর্য্যন্ত কোনই উপকার দর্শায় নাই। তোমার রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই এখন যদি তুমি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারই হাতে নিজেকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারই নিকট মুক্ত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা কর তবে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা হইবে, এমন মনে করিও না—ইহার মধ্যে কোনই অন্যায় নাই। কারণ তোমার সাধ্যানুসারে তুমি যত্ন করিয়াছ।

আত্মার ব্যাধিকে দূর করিবার জন্য ঈশ্বর সময় সময় শরীরের মধ্যে ব্যাধির সৃষ্টি করিয়া থাকেন, একথা আমি গত পত্রে তোমাকে লিখিয়াছি। অতএব ভীত হইও না—ধৈর্য্য অবলম্বন কর। যাহা উপস্থিত হইবার তাহা উপস্থিত হউক। যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও না। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত যাহাতে বেদনা বহন করিতে পার তাহারই জন্য শক্তি ভিক্ষা কর, প্রেম ভিক্ষা কর। তিনি তোমায় যত যন্ত্রণা দিতে চাহেন দিন, যতদিন রুগ্ন রাখিতে চাহেন রাখুন, তোমার এই ইচ্ছাই তাঁহাকে জানাও।

এমন প্রার্থনা করা মানুষের পক্ষে কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু সকল প্রকার প্রার্থনা অপেক্ষা এই প্রকার প্রার্থনাই তিনি অধিক গ্রহণ করেন। এবং এই প্রার্থনাই যাঁহারা ঈশ্বরকে ভাল বাসেন, তাঁহাদের নিকট বড়ই মধুর।

প্রেম কষ্টকে মিষ্ট করে। ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে পারিলেই, তাঁহার সেবার মধ্যে যে কষ্ট স্বীকার তাহা আনন্দের সামগ্রী হইয়া উঠে। কষ্টকে তখনই সাহসের সহিত বহন করা যায়।

আমি প্রার্থনা করি তুমি ঈশ্বরকে প্রীতি করিয়া রোগকে আনন্দের সহিত বহন করিতে শিক্ষা কর। ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ হও। আমাদের সকল রোগকে দূর করিতে পারেন এমন চিকিৎসক একমাত্র তিনিই। ঈশ্বর সর্ব্বদাই আমাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনিই দুঃখার্ত্তদের, পীড়িতদের একমাত্র পিতা। আমাদের তিনি যত ভালবাসেন বলিয়া আমরা কল্পনা করি তিনি তাহা অপেক্ষাও আমাদের অধিক ভালবাসেন। তাঁহার প্রেম আমাদের প্রতি অনন্ত। অতএব তাঁহাকে প্রেম কর। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সান্ত্বনা লাভের আশায় অন্য কোন স্থানে গমন করিও না, অন্য কিছুর অন্বেষণ করিও না। আমার বিশ্বাস তুমি অবিলম্বেই শান্তি পাইবে। আমার প্রার্থনার তেমন বল না থাকিলেও আমি প্রার্থনার ভিতর দিয়াই তোমাকে সাহায্য করিব।

(৭)

যন্ত্রণা সহ্য করিবার বল ভিক্ষা করিয়াছিলে বলিয়া ঈশ্বর তোমাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি সুস্থ হইবার জন্য কখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি নাই, আমি প্রার্থনা করিয়াছি, যাহাতে আমি বল লাভ করিয়া সাহস এবং শক্তির সহিত সকল কষ্ট নীরবে বহন করিতে পারি। কষ্টের মধ্যেও যেন ঈশ্বরের প্রতি প্রেম আমার অক্ষুন্ন রহে। হায়! ঈশ্বরকে প্রাণে ধরিয়া যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটান কতই না সুখের ব্যাপার।

কষ্ট যত বেশীই হউক না কেন, উহাকে হৃদয়ের প্রেম দিয়াই বরণ কর। তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া যন্ত্রণা ভোগ করাকেই স্বর্গ-সুখ সম্ভোগ করা বলে। অতএব আমরা যদি ইহজীবনেই স্বর্গের শান্তি উপভোগ করিতে পারি তবে যাহাতে তাঁহার সহিত প্রেমযোগে ঘনিষ্টরূপে সংযুক্ত হইয়া আমাদের মধ্যে কথোপকথন চলিতে পারে তাহার অভ্যাস অবশ্য করিব। আমাদের আত্মা যেন ভুলেও ঈশ্বর হইতে দূরে গিয়া কখনও ভ্রমণ না করে। দূরে যাইবার কালেই আমরা যেন আমাদের আত্মাকে বাধা দিই।

আমরা যেন আমাদের অন্তরকে ঈশ্বরের মন্দির করিয়া তুলিতে পারি, যেখানে বসিয়া দিবারাত্রি অর্চ্চনা চলিতে পারে। আমাদের আত্মদৃষ্টি যেন সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে—তিনি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এমন কোন কার্য্য যেন আচরণ না করি, এমন কোন বাক্য যেন উচ্চারণ না করি, এমন কোন চিন্তা যেন মনের মধ্যে পোষণ না করি। যখন আমাদের হৃদয় এমনই করিয়া ঈশ্বরের দ্বারা অধিকৃত হইবে তখনই

দুঃখকে মঙ্গল বলিয়া জানিব এবং উহারই মধ্যে গভীর সান্ত্বনা লাভ করিব।

আমি জানি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে গেলে ইহার জন্য যে আরম্ভ তাহা অতীব কঠিন। কারণ শুদ্ধমাত্র বিশ্বাসেরই উপর দাঁড়াইয়া আমাদের কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। ইহা যদিও শক্ত সন্দেহ নাই তবুও আমরা জানি ঈশ্বরের কৃপায় সকলই সম্ভব হয়। এমন কিছুই নাই যাহা আমরা তাঁহার করুণায় করিতে না পারি। যাঁহারা সত্য সত্যই ব্যাকুল হইয়া কিছু করিতে চাহেন, ঈশ্বর তাঁহাদের দ্বারা সে কার্য্য করাইয়া লন। ব্যাকুল প্রার্থনা তিনি কোন দিনও অপূর্ণ রাখেন না। ব্যাকুল হইয়া যাহাই ভিক্ষা কর না কেন তাহাই প্রাপ্ত হই। আঘাত কর, আঘাত কর, বারংবার আঘাত কর, আঘাত করিতে বিরত হইও না। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি একদিন না একদিন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তিনি তোমার জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিবেনই দিবেন, এবং তোমায় এ যাবৎ তিনি যাহা প্রদান করেন নাই, এক মুহূর্ত্তে একই সঙ্গে সব কিছু অর্পণ করিয়া ফেলিবেন।

অদ্য তবে বিদায় হই। আমি যেমন তোমার নিকট প্রার্থনা করি তুমিও তেমন আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও। শীঘ্রই ঈশ্বরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে আশা করি।

(৮)

আমাদের পক্ষে কি প্রয়োজন তাহা আমরা যাহা জানি তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরই ভাল করিয়া জানেন। তিনি যাহা করিয়া থাকেন আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। তিনি যে আমাদের কত ভালবাসেন ইহা যদি আমরা বুঝিতাম তাহা হইলে তাঁহার হাতের দান, সুখ আর দুঃখ, উভয়কেই সমানভাবে গ্রহণ করিতাম একই চক্ষে দেখিতাম। তাঁহার হাত হইতে যাহা কিছু আসে সকলই আনন্দ সঞ্চার করিত। অসহ্য যন্ত্রণা তখনই অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়, সমস্ত ধৈর্য্যের সীমাকে অতিক্রম করে, যখন আমরা উহাকে ঈশ্বরের দান বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারি। যখন আমরা ইহা জানি, ঈশ্বরই যন্ত্রণার[...] প্রেরণ করিতেছেন, যখন আমরা ইহা বুঝি, আমা[...]দের দয়ালু পিতাই আমাদিগকে দুর্দ্দশার মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছেন, তখন আমরা দেখি আমার[...] যন্ত্রণার তীব্রতা হ্রাস হইয়া যায় এবং আমরা শান্তি লাভ করি।

আমাদের যত কিছু কার্য্য ঈশ্বরকে জানিবার জন্যই যেন আচরিত হয়। তাঁহাকে জানা ভি[...] আমাদের যেন অন্য কর্ম্ম না থাকে। ঈশ্বরকে যি[...] যত জানেন তিনি আরো তত তাঁহাকে জানিতে ই[...] করেন। আমাদের জ্ঞানেতেই ভালবাসার জন্ম[...] বলিয়া আমাদের জ্ঞান যতই প্রসারতা এবং গভী[...]রতা লাভ করিবে আমাদের ভালবাসাও সেই পরি[...]মাণে বৃদ্ধি পাইবে। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রীতি গভীর হইলে আমরা কেবল যে আনন্দের মধ্যে তাঁহাকে প্রেম করিব তাহা নহে, দুঃখের মধ্যে তাঁহাকে প্রেম করিতে পারিব।

আমাদের উপরে তাঁহার যে সমস্ত অনুগ্রহ, যে সমস্ত দান, ইহার জন্যই তাঁহাকে লইয়া [...] আমরা সন্তুষ্ট না থাকি। বিশ্বাসের একটি মাত্র কা[...] আমরা ঈশ্বরের যত নিকটে অগ্রসর হইতে পা[...] তাঁহার দান আমাদিগকে তাঁহার তত নিকটে ল[...] যাইতে সক্ষম হয় না। বিশ্বাসের ভিতর দি[...] আমরা প্রায়ই যেন তাঁহাকে অন্বেষণ করি। [...] আমাদের অন্তরেই আছেন। হৃদয় হইতে বাহি[...] গিয়া দূরে তাঁহাকে অন্যত্র অন্বেষণ করিও না।

ঈশ্বরই যদি একমাত্র ভালবাসার ধন হইলে[...] তবে কি ইহা আমাদের পক্ষে নির্দ্দয়ের কার্য্য [...] হইবে না, যদি আমরা তুচ্ছ পদার্থ লইয়াই মত্ত থা[...] যাহা তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহাকে কি আ[...] করা হইবে না, পীড়া দেওয়া হইবে না, যদি আ[...] পার্থিব ক্ষুদ্র নশ্বর জিনিস লইয়াই দিন অতিবা[...] করি! এইরূপ কার্য্য করিলে কি আমরা অপরা[...] হইব না? তুচ্ছ পদার্থগুলি একদিন না এক[...] আমাদিগকে ঘোর অনুতাপানলে দগ্ধ করিবে, [...]দিগকে বিপন্ন করিবে, তাহার জন্য ভীত হও।

এস আমরা প্রাণপণে লাগিয়া পড়ি, যাহাতে ভাল[...]করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মাইতে পারি। এস আমরা হৃদয় হইতে সকল আবর্জ্জনা, তিনি ছাড়া আর যাহা কিছু আছে, দূরে নিক্ষেপ করি। হৃদয় কেবল তাঁহার দ্বারাই পরিপূর্ণ থাক্। হৃদয় তিনিময় হইয়া যাক্। এস আমরা ঈশ্বরের [...]রণে এই কৃপাই ভিক্ষা করি।

যাহা আমাদের শক্তির ভিতরে আছে, তাহা যদি আমরা করি, তবে শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে, আমাদের মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং আমরা যাহা অভিলাষ করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে।

ঈশ্বর যে তোমাকে শান্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য যতই কেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই না, সবই অপ্রচুর হইয়া পড়ে।

তাঁহার কৃপাতে আশা করি, আমি অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত গিয়া একত্র মিলিত হইব। আমার প্রতি এই অনুগ্রহটুকু তিনি করিবেন।

এস আমরা উভয় উভয়ের জন্য প্রার্থনা করি।

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়।

প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিকগণ।

নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কালের কি বিচিত্র মহিমা! একদিন যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জগতের মধ্যে আদর্শ-স্থানীয় রাজনৈতিক ছিলেন, আজ তাঁহাদের বংশধরগণ গ্লাডষ্টোন বা লর্ড কর্জ্জনের রাজনৈতিক বুদ্ধি দর্শনে চমৎকৃত, বিস্মিত এবং মুগ্ধ!

আমরা মনে করি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আধুনিক সুসভ্য জাতির ন্যায় এমন সুশৃঙ্খলার সহিত বড় বড় রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন না অথবা তাঁহাদের দেশ শাসন বিষয়ক বুদ্ধি আদৌ ছিল না; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। একটু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসাদি অধ্যয়ন করিলে এইরূপ সন্দেহের অতি সহজেই নিরাকরণ হয়।

সম্রাট্ আকবর ষোড়শ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক। তাঁহার সহিত তদীয় সমসাময়িক ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের তুলনা করিলে [...]ন্তার হয় না। কিন্তু সম্রাট্ আকবর বিদেশী, সে জন্য ভারত তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারে না।

প্রকৃত ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টি মোগল শাসনের আরও কিছু পূর্ব্বে নিক্ষেপ করিতে হয়।

মোগল শাসনের পূর্ব্বে যে কয়েক বংশ ভারতে রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে মৌর্য্য ও গুপ্তবংশ এবং মহারাজ হর্ষের রাজত্বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিন বংশের রাজত্বকালে তিনজন বিদেশীয় পর্য্যটক ভারতে আগমন করেন তন্মধ্যে প্রথম জন গ্রীক ও দ্বিতীয়-তৃতীয় জন চীনদেশীয়। মৌর্য্যবংশ ভারতে খ্রীঃ পূর্ব্ব ৩২১ হইতে ৩৩২ পর্য্যন্ত, গুপ্তবংশ ৩২০ হইতে ৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এবং মহারাজ হর্ষ ৬০৬ হইতে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মৌর্য্যবংশ, চন্দ্রগুপ্ত (ছান্দ্রাকোটাস্) ও অশোকের নামে সর্ব্বত্র বিশ্রুত, দ্বিতীয় বংশ চন্দ্রগুপ্ত (২য়) ও সমুদ্রগুপ্তের নামে গৌরবান্বিত এবং শেষোক্ত রাজত্ব কেবল হর্ষেরই নামে সুপরিচিত।

মেগাস্থিনিস, পশ্চিম এসিয়ার অধিপতি সেলুকাস্ নিকোটরের প্রতিনিধিরূপে ভারতের প্রথম সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের দরবারের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তিনি অবসরকাল ভারতের তাৎকালিক অবস্থা সমূহ লিপিবদ্ধ করিতে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকখানির অস্তিত্ব কালের কুক্ষিগত হইয়াছে সত্য; কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ সেই পুস্তক হইতে যে সমস্ত বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠে অনুমান

হয়, তাঁহার লিখিত পুস্তকের অতি অল্প অংশই বিনষ্ট হইয়াছে।

কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে, ভারত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদাহরণ চন্দ্রগুপ্ত, মহাবীর আলেক্‌জান্দারের নিকট প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইরূপ অভিমতের মূলে যে কোনও রূপ ভিত্তি আছে, তাহা বোধ হয় না। কারণ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত পারস্য রাজ্য সাইরসকে আদর্শ করিয়া ভারত সাম্রাজ্য গঠন করিতে যত্নবান হন। এই সাইরসের সিংহাসনে স্বয়ং বীরকুল চূড়ামণি আলেক্‌জান্দার কতিপয় বৎসরের জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন। দারিয়াসের সময় হইতে ভারতীয় শাসকগণ পাশ্চাত্য দেশবাসীর সংশ্রবে আসিতে আরম্ভ করেন; সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত যে আলেক্‌জান্দারের নিকট রাজ্য গঠন প্রণালী শিক্ষা করেন, এ কথা কি করিয়া বলিব? সে যাহাই হউক, চন্দ্রগুপ্ত যে সাম্রাজ্য গঠন ও শাসন প্রণালী বিশেষরূপে জানিতেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাঁহার রাজত্বকাল ৩২১ খৃঃ পূঃ অব্দ হইতে ২৯৭ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। তিনি স্বকীয় অপরাজেয় শক্তি ও অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক কূট বুদ্ধির প্রভাবে মাসিদনীয় সৈন্যগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন, তিনি সেলুকাস্ নিকোটরের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন মগধ বা বর্ত্তমান বিহারে তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার সমসাময়িক কোন সম্রাট্ তাদৃশ বল বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারেন নাই অথবা তাদৃশ সুখৈশ্বর্য্য পূর্ণ, নিরাবিল শান্তিময় রাজ্যও সম্ভোগ করিতে পারেন নাই।"

সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় তদীয় পৌত্র অশোকও সাধারণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি ইজিপ্টের আদর্শে ভারতে জল বিভাগের স্থাপনা করেন। আধুনিক ভূম্যধিকারিগণ আপনাদিগকে জল-করভারে নিতান্ত প্রপীড়িত মনে করেন, কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে এই ভাবে জলকর দিতেন, তাহা তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন কি? তখন ইহাকে "উদক ভাগ" বলিত। মেগাস্থিনিস বলেন যে, মৌর্য্যবংশের সময় রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, মিউনিসিপালিটী স্থাপন প্রভৃতি প্রজাবর্গের হিতকর এরূপ কার্য্য সমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে, মৌর্য্যবংশের শাসনাধীন ভারতকে কোন অংশেই সম্রাট আকবর শাসনাধীন ভারত হইতে ন্যূন বলা যায় না। বস্তুতঃ তখনকার সমসাময়িক সিরিয়া, মাসিদনিয়া ও ইজিপ্টের সহিত ভারতের তুলনা শোভনীয় বই অশোভনীয় নহে।

মৌর্য্যবংশের পতনের পর ভারতবর্ষের উপর দিয়া আভ্যন্তরিণ গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হয়। কিছুদিন যাবত মধ্য এসিয়া হইতে আগত সিথিয়াবাসী একদল গোষ্ঠ ও কুশান সম্প্রদায় ভারতে রাজত্ব করে; কিন্তু তাঁহাদের রাজনীতিজ্ঞতায় আমাদের কিছু যায় আসে না।

তৎপর গুপ্ত বংশ ভারত সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই বংশ ৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে রাজত্ব করেন। এই বংশের সমুজ্জ্বল রত্ন সমুদ্রগুপ্ত শুধু উত্তর ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের বশ্যতায় প্রীত না হওয়ায় দক্ষিণ ভারতাভিমুখে অভিযান প্রেরণ করেন। অবশ্য তাঁহার দক্ষিণ ভারত বিজয় চিরস্থায়ী হয় নাই; কিন্তু তাহা হইলেও এরূপভাবে বিজয় লাভ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে!

সমুদ্র গুপ্ত সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। তবে সমুদ্রের পুত্র, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালীন অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ আমরা চীন পর্য্যটক ফাহিয়ানের লিখিত বিবরণী পাঠে জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন যে, "তখন উত্তর ভারতে এরূপ সুযোগ্য, সুদক্ষ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন যে তখন সমগ্র ইউরোপেও সেরূপ রাজা ছিল না।"

ফাহিয়ান ভারতবর্ষে তদীয় জীবনের চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই চতুর্দ্দশ বৎসর তিনি সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম্মতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেন। তাঁহার মন সর্ব্বদা ধর্ম্ম বিষয়ে অথবা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত, কাজেই তিনি সাংসারিক বিষয়ে বড় বেশী মনোযোগ দিবার অবসর পাইতেন না। তাঁহার লিখিত বিবরণী তদানীন্তন ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সুরঞ্জিত চিত্রপট। তিনি লিখিয়াছেন, আমি আমার দীর্ঘকালব্যাপী ভারত ভ্রমণের মধ্যে কোন দিন কাহারও দ্বারা প্রবঞ্চিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই। এই কথা বলিয়া তিনি আরও লিখিতেছেন, তখন অধিকাংশ অপরাধের জন্য কেবলমাত্র অর্থদণ্ড করা হইত, মৃত্যুদণ্ডের নামগন্ধও তখন কেহ জানিত না; বারংবার অপরাধের জন্য অপরাধীর দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তন করিয়া ফেলা হইত। মগধ সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন যে, তথাকার অধিবাসীরা যেমন ধনী, তেমনি উদার ও ধার্ম্মিক। তিনি তখন ভারতের সর্ব্বত্র হাঁসপাতাল দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই সমস্ত হাঁসপাতালে দুস্থ, নিরাশ্রয় রোগীরা সযত্নে চিকিৎসিত হইত। ফাহিয়ানের উল্লিখিত প্রশংসাসূচক অভিমত নিশ্চয়ই মূল্যবান ও বিশ্বাসযোগ্য। কারণ তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। এমতাবস্থায় চন্দ্রগুপ্তের (২) ও তদীয় কার্য্যকলাপের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ফাহিয়ানের পক্ষে স্বাভাবিক।

ইউরোপেও তখন অনেক পর্য্যটক ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের কেহই ত ইউরোপের তদানীন্তন অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে অত মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন নাই! কাজেই বুঝা যাইতেছে ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারতে এরূপ রাজনৈতিক ছিলেন, যাঁহারা কিরূপে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে হয় তাহা জানিতেন।

মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাটকাবলীতে গুপ্তবংশীয় শাসনাধীন ভারতের অবস্থা অনেক পরিমাণে জানা যায়।

ফাহিয়ানের ভারত ভ্রমণের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মধ্য এশিয়া হইতে "হুন" নামে এক অসভ্য জাতি ভারতবর্ষে আগমন করে, তাহাদের অত্যাচারে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ইউরোপীয় লেখকেরা তাহাদিগকে White Hun, এবং চীনেরা yetha বা Epthalites নামে অভিহিত করিয়াছেন। ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ভারতে প্রবেশ করে। হিন্দুরা তাহাদিগকে যথাশক্তি বাধা দেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বাধা স্রোতস্বিনীর মুখে বালুকার বাঁধের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু হিন্দুরাজগণ ভগ্ন-মনোরথ হইবার নহেন, তাঁহারা একত্র হইয়া, সম্মিলিত শক্তি লইয়া ৫২৮ খৃষ্টাব্দে হুন-নায়ক মিহিরকুলকে কাশ্মীরের সীমান্ত প্রদেশে বিতাড়িত করেন।

হুনদিগের পরাজয়ের পর হইতে ৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য রাজা ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বর ও কান্যকুব্জের রাজা হর্ষ ভারতের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি দ্বিচত্বারিংশৎ বর্ষ রাজত্বের সুখ-সম্ভোগ করিয়াছিলেন।

ফাহিয়ান যেমন গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস লেখক, আবার হুয়েন্‌সাং তেমনি হর্ষের ইতিহাস লেখক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হুয়েন্ সাং একজন চীন পর্য্যটক, তিনি এদেশে ৬৩০—৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন। হুয়েন্ সাং বলেন যে, হর্ষের রাজত্বকালে প্রজাবর্গ গুপ্ত শাসনের ন্যায় সুশাসন ভোগ না করিলেও এবং ততদূর সুখী ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন না হইলেও নিতান্ত অসুখে ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন, "মহারাজ হর্ষ স্বয়ং রাজকার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।" হর্ষই একপক্ষে ভারতের শেষ হিন্দু-সম্রাট্। অবশ্য রাজা ভোজ তাঁহার পর নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাকে রাজনীতিজ্ঞের মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। যেহেতু তাঁহার রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার কোনই পরিচয় আমরা পাই নাই।

তাহার পর মুসলমান শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নাই। মুসলমান শাসনকালে ভারত, কেবলমাত্র সম্রাট্ আকবরের অর্থসচিব টোডরমল্লের গর্ব্বে গর্ব্বিত। বস্তুতঃ টোডরমল্লই মোগল শাসনকালে ভারতের মুখ উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক মহারাষ্ট্র রাজ্য সংস্থাপক শিবাজীকে রাজনৈতিক বলিতে চান।

ইংরাজ শাসনকালে ভারতে যে কয়েকটি রাজনীতিজ্ঞের অভ্যুদয় হইয়াছে তাঁহাদের কথা ভবিষ্য ইতিহাস বলিবে। *

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার কর্ত্তব্যের বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু নারীজাতির কিরূপভাবে শিক্ষা হওয়া উচিত তাহার বহু মত প্রচলিত আছে। প্রকৃত শিক্ষার ফল জ্ঞান লাভ। জ্ঞান সত্য বস্তু। সুতরাং শিক্ষার ফল সম্বন্ধে কোন সম্প্রদায়ের মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। তবে শিক্ষার প্রণালী দেশভেদে অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বিশ্ব সংসার নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। মানবরাজ্যে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী একথা বোধ হয় বলা যাইতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষে বহুপূর্ব্বে সভ্যতা প্রচলিত হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে নারীশিক্ষা রীতিমত হইত। অতি প্রাচীন শাস্ত্র বেদ রচনার সময়ে কোন কোন বিদুষী রমণী তত্ত্ববিচার করিতেছেন কেহ বা পতির নিকট প্রশ্নোত্তর দ্বারা জ্ঞান লাভ কেহ বা পুত্রের নিকট ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতেছেন এরূপ বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। পৌরাণিক কালে সাবিত্রীর বিবরণে জানা যায় যে তাঁহার জ্ঞানের কথায় ধর্ম্মরাজকে চমৎকৃত হইতে হইয়াছিল। যদি ইহা উপন্যাস বা রূপক বলিয়া ধরা যায় কিন্তু সত্য ঘটনা না থাকিলে রূপকের ভাব আসিতে পারে না। সেকালে কন্যাকে পুত্রবৎ পালন করা হইত ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মধ্যবর্ত্তীকালে রাণী ভবানী, অহল্যা বাই প্রভৃতি মনস্বিনী মহিলা দ্বারা রাজ্য শাসন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তাঁহাদের উত্তমরূপ শিক্ষা না থাকিলে তাঁহারা কখন এরূপ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। সেকালের শিক্ষার পদ্ধতির সহিত এখনকার প্রণালী মিলে না। নানা প্রকার কারণে আমাদের সমাজ সেরূপ দৃঢ়বদ্ধ নাই সম্প্রদায় বিশেষে শিক্ষার ব্যবস্থা নানাপ্রকারের পূ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বঙ্গ সমাজে বিদ্যালয়ে ক পাঠাইয়া শিক্ষা দিবার রীতি ছিল না। গৃহে ক বধূগণকে মুখে মুখে ব্রতানুষ্ঠানাদির দ্বারা সদুপ দ্বারা নানা প্রকার কার্য্যপ্রণালীর দ্বারা শিক্ষিতা ক হইত। তাহা দ্বারা এদেশীয় কন্যা বধূগণ এক এক পরিবারের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া থাকিতেন। স্নেহ ভা দ্বারা সংসারকে শান্তিময় করিয়া রাখিতে পারিতে ক্রমে রাজ্য বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমা বিশৃঙ্খলা হইয়া পড়িল। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য পূর্ব্বভাব শিথিল হইয়া গেল। ইংরাজ অধিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভাষা শিক্ষা চলি লাগিল। প্রকৃত শিক্ষা অপেক্ষা অনুকরণ প্র প্রধান হইয়া উঠিল! বালিকারা মনে করিল, প সেলাই প্রধান শিল্প। দুচারটী কবিতা রচনা করি আ নাদিগকে জ্ঞানবতী ভাবিল। কিন্তু তাহাদের নাই, দোষ কালের। যখন নূতন ভাবের বন্যা আ তখন পুরাতন রীতিনীতি এইরূপেই ভগ্ন অ হইয়া ভাসিতে থাকে। পরে ক্রমে বিশৃঙ্খল নিবারিত হইয়া বিচারসহ প্রণালীগুলি স্বাধিকার করে। এখন যাঁহাদের হস্তে আমাদের স্ত্রীশি ভার তাঁহাদিগকে বিশেষ মনোযোগী, বিশেষ সাব হইয়া চলিতে হইবে। যেন আমাদের বালি বর্ণ পরিচয় শিখিয়া পত্র লেখাকে বিদ্যা মনে না ক নবেল পড়িয়া নবেলিয়ানা দেখাইয়া জ্ঞানের না রাখে। ভাষা শিক্ষা জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ।

* এই প্রবন্ধটী প্রসিদ্ধ East and West পত্রিকায় বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক মিঃ ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ মহোদয় লিখিত statesmen in ancient India নামক প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত—লেখক।

কর্ত্তব্যপালন সদ্ব্যবহার শিক্ষা সংসারের নানা প্রয়োজনীয় শিক্ষা দানও অবশ্য কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ যে শিক্ষায় নারীগণ সংসারের সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা নিবারণ করিতে পারে, যে শিক্ষায় মানব গৃহ সজীব সুন্দর থাকে যে জ্ঞানলাভে পিতা স্বামী পুত্রগণকে ভগবানের প্রেমাকর্ষণ অনুভব করান যায়, কন্যা বধূগণকে তাহারি যোগ্যা করিতে হইবে।

বিদ্যা বা জ্ঞান যে অনন্ত অপরিমেয় সমস্ত জীবনেও যে মানবের শিক্ষা ফুরায় না ইহা তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে। এই পবিত্র অথচ কঠিন, কষ্টসাধ্য অথচ আনন্দময় কার্য্যের ভার ভারত স্ত্রীমহামণ্ডল গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকে শত কোটী ধন্যবাদ। এখনো আমাদের পুরাতন ধর্ম্মনীতির ভাব লোপ পায় নাই এবং পাশ্চাত্য সদ্‌গুণগুলি ক্রমে আয়ত্তের মধ্যে আসিতেছে। তথাপি বলিতে দুঃখ হয় আমাদের দেশীয় নারীসমাজের অহঙ্কার হিংসাপরায়ণতা স্বার্থপরতা গুরুজনে অভক্তি বিলাসিতার প্রভাব বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? অবশ্যই আছে। কয়লাকে শত ধৌত করিলে তাহার মালিন্য দূর হয় না কিন্তু অগ্নিসংযোগে সুন্দরবর্ণ ধারণ করে। সেইরূপ জ্ঞানজ্যোতি একবার হৃদয় আলোকিত করিলে মনের তমোরাশি পলাইয়া যায়। বিদ্যা ও কর্ম্মের প্রবল অনুরাগ যদি একবার বদ্ধমূল করিতে পারা যায় শিক্ষার সার্থকতা অবশ্যই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে।

অনেকে বলেন পুরুষে বিদ্যা শিক্ষা না করিলে উপার্জ্জন করিয়া সংসার চালাইতে পারিবে না সুতরাং যত অর্থব্যয় হউক তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতেই হইবে। মেয়েদের প্রতি তার অষ্টমাংশ খরচ বৃথা ব্যয় মনে ভাবেন। কিন্তু যে নারীগণের উপর সংসারের সমস্ত সুখ শান্তি নির্ভর করে তাহাদের সুশিক্ষার জন্য রীতিমত ব্যয় কি অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? যদি এ বিষয়ে পুরুষগণ পশ্চাদপদ হন; আমরা যতটুকু পারি, যেমন করিয়া পারি বালিকাগণকে বধূগণকে মনুষ্য নামের উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিব। আজিকার এই নূতন যুগের দিনে সকল জাতি সকল সম্প্রদায় সমুদয় দেশ—বিশেষতঃ আমাদের অৰ্দ্ধমৃত বঙ্গদেশে চেতনার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। সর্ব্ব ঘটনার মূলাধার সর্ব্বশক্তিমান ভগবান আমাদের সহায় হইবেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই অনুপ্রাণিত হইয়া নারীগণ একত্রে একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। যদি এই মিলন, এই বন্ধন দৃঢ় থাকে, কার্য্যে সফলতা তাহার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার। যদি আমাদের বালিকাগণকে সৃষ্টির প্রধান মানবের পাশে মানবীরূপে স্থিত করিতে পারি আমাদের সকল উদ্যম সার্থক হইবে। আমরা করুণাময়ের কৃপালাভের জন্য একান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিব এবং অদম্য অধ্যবসায়ে মানাপমান বৰ্জ্জিত দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইব। যে সরিষা প্রমাণ বীজ কলিকাতায় রোপণ করা হইয়াছে কালে তাহা অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া সংসারের শ্রান্তিহররূপে বিরাজ করিবে, শত লাঞ্ছনার মধ্যেও ইহা আমাদের উৎসাহিত আনন্দিত রাখিবে।

বহু বৎসর পূর্ব্বে মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী যে মানসে সখিসমিতির সৃজন করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। শিক্ষা বিস্তার প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও আনুসঙ্গিক অভিপ্রায় নারীগণের মিলন ক্রমশঃ পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে। আজ মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সেই সঙ্গীতটী অলক্ষ্যে গীত হইতেছে ঃ—

আপনার মায়ে পেরেছি চিনিতে চিনিয়াছি ভাই ভাই।
তবে কেন দূরে দাঁড়াইয়ে এস প্রাণে প্রাণে মিশে যাই॥

ভগবানের কাছে প্রার্থনা যেন এই ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের কার্য্যকারীতা শক্তি অবশ্যই বৃদ্ধি হইবে। দুইটী ভিন্নমুখী প্রবাহ একযোগে এক উদ্দেশ্যে যেন স্বদেশের কার্য্যে জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে নিরত থাকে। যে ভগবৎ শক্তিতে সমস্ত জগৎ শক্তিময় তাহা আমাদের মধ্যেও আছে ইহাতে আমাদের বিশ্বাস ভক্তি অচলা থাকুক। *

শ্রীস্বর্ণলতা মল্লিক।

* ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের ৩য় ত্রৈমাসিক অধিবেশনে পঠিত।

স্বপ্ন।

যে যে স্থানে যে যে জিনিস লইয়া বাল্যকালে সুখানুভব করিতাম এবং অধিকাংশ সময় যেখানে বাল্যখেলায় দিন কাটাইতাম, এ জীবনে তাহা উপভোগ করিবার আশা বা সম্ভাবনা আর নাই। সে বাল্যকালও আর ফিরিবে না, সে অবস্থার সে সকল স্থানও আর মিলিবে না; কিন্তু বাল্যচিন্তা হৃদয় হইতে কদাচ অপসারিত হইবার নহে। মধ্যে মধ্যে মনে সেই চিন্তা উদিত হইয়া প্রাণকে পরম সুখে ভাসাইয়া তোলে এবং কেবলমাত্র স্বপ্নের মহীয়সী শক্তি—যে শক্তি মানবকে কখন ধনী, কখন নির্ধনী, কখন সুখী, কখন দুঃখী করিয়া থাকে, সেই শক্তির প্রভাবে মানব স্বপ্নাবস্থায় বিগত ঘটনা এবং ধারণার অতীত সুখ দুঃখ, তৃপ্তি অতৃপ্তি, ভয়ও নির্ভয়ের রাজ্যে বেড়ায়। তখন মানব অমূলক চিন্তা যে স্বপ্ন তাহারই সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়ে এবং স্বপ্ন যাহা দেখায় বা করায়, তাহাই করিতে বাধ্য হয়। আমার এই স্বপ্নের স্থান ও দৃশ্য বাল্যকালের হইলেও পরিণত বয়সে ইহা মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সঞ্চার করিয়াছে।

এক রাজবাড়ীর সুবৃহৎ ফটক। ফটকের বহির্ভাগে সুদীর্ঘ জনপদ। জনপদের যে দিকে রাজবাড়ী, সেইদিক ব্যাপিয়া বরাবর লোকজনের বসতি এবং অপর দিকে খুব লম্বা চওড়া শস্যক্ষেত্র। সেই শস্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে তাহার অপর দিকস্থ বাড়ীঘর দৃষ্টিগোচর হয় না। ফটক অতিক্রম করিয়া ভিতরে আসিলে গাড়ীবারাণ্ডা পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা। রাস্তার দুই পার্শ্বে সারি গাঁথা সমুন্নত, কর্ত্তিত মেঁদিগাছগুলি রাস্তা ও দুই পার্শ্বস্থ বাগানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ফটক হইতে গাড়ীবারাণ্ডা পর্য্যন্ত বামে ও দক্ষিণে বাড়ীর সীমা-প্রাচীরের কাছাকাছি পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে ফুল, পাতা, তরিতরকারি, শাকশব্জি ও নানা জাতীয় ফলের বাগানে সুশোভিত। আমরা কয়েকজন সমবয়সী প্রায়ই ঐ বাগানে বৃক্ষতলে অথবা বাগানে রক্ষিত বেঞ্চের উপর বসিয়া সংগৃহীত ফুল দ্বারা মালা গাঁথিতাম। সরল স্বভা... রাজার স্ত্রী, বালক বালিকাদিগের অত্যন্ত প্রিয়পা... ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের সঙ্গে যে... যোগদান করিতেন।

আশ্বিন মাস। আকাশ কখন পরিষ্কার, ... নও বা ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, কখনও গর্জ্জন, কখনও ... বর্ষণ; কখনও আবার প্রখর মার্ত্তণ্ডতাপে উত্তাপিত ... বর্ষান্তে শারদীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, মনে উল্লাসের স... করে, ইহা স্বাভাবিক। আমরাও এই ... আনন্দে মাতিয়া, বাগানে বেড়াইয়া, ফুল কুড়াইয়া ... এবং কোনও নির্জ্জন স্থানে বসিয়া তাহা দ্বারা মা... গাঁথিতে গাঁথিতে গুণ গুণ করিয়া গান গাইতাম।

এক পস্‌লা বৃষ্টির পর কয়েকজন সাথীর স... পূর্ব্বোক্ত ফটকের বহির্ভাগে সিঁড়ির উপর ব... সেফালিকা ফুলের মালা গাঁথিতেছি এমন ... রাস্তার পার্শ্বস্থ সেই শ্যামল শস্যক্ষেত্রের দিকে আ... দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলাম, বায়ুহিল্লোলে ... স্তীর্ণ ক্ষেত্রের ধান্যগাছগুলির অগ্রভাগ দুলিতে দুলিতে ... মহাসাগরের ঢেউয়ের ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া ক্ষেত্রের ... একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইয়া বিলীন ... তেছে; ততক্ষণে আবার আর একটা বায়ুপ্র... আসিয়া সবুজ গাছগুলির সুকোমল অগ্রভাগ ... আন্দোলিত করিয়া তুলিতেছে। ক্ষণকাল ... শোভা দেখিতে দেখিতে আমার মনে এক অ... ভাবের উদয় হইল। তখন আমার একটী ... গাহিতে ইচ্ছা হইল। আমি গাহিতে লাগিলাম;—

"তোমারি এ রাজ্য ধনধান্য পূর্ণ,
তোমারি মহিমা গায় নিখিল ভুবন।
সুভোগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি,

সবে পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল সাজে সজ্জিত কেন...

একাগ্রচিত্তে ক্ষেত্রের একদিকে চাহিয়া ... তেছি, এমন সময় আকাশমার্গে, ক্ষেত্রের এক ...

...তে সপ্তবর্ণে সুরঞ্জিত রামধনু উদিত হইতে দেখিয়া আমার দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। আমি মুগ্ধনেত্রে পাশাপাশি দুইটী ধনুর রঙের উজ্জ্বলতা ও ক্ষীণতা দেখিতে দেখিতে জগৎপ্রসবিতা বিশ্বনিয়ন্তার চিন্তায় ...আরও নিমগ্ন হইলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধ্যার আগমনে পৃথিবী তমসাচ্ছন্ন না হইল, ততক্ষণ আমি সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ক্রমে আকাশের শোভা পরিবর্ত্তিত হইয়া চন্দ্রমার কিরণ ...দিতে হাসিতে পৃথিবীকে হাসাইয়া তুলিতে লাগিল। চন্দ্রমার নবীন হাসি দেখিবার জন্য একটি দুইটি করিয়া নক্ষত্ররাজি আকাশমার্গে দেখা দিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতি দেবীকে, আরও মধুময় করিয়া তুলিল। আমার উচ্ছ্বসিত চিন্তাস্রোতও তখন চুপ করিয়া ...তে পারিল না। সেই স্রোত প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া ভাবের মহাসাগরাভিমুখে ধাবিত ...এবং ক্ষণেকের মধ্যে অতলস্পর্শ সাগরবক্ষে ...ত হইয়া সাম্যভাব ধারণ করিল। তখন আমি ...ভাবে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইলাম, এবং ...স্থানে বসিয়া গাহিতে লাগিলাম;—

"তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন,
নিরখি জুড়ায় নাথ যুগল নয়ন,
গগন থালে কেমন দীপরূপে অনুক্ষণ,
শোভিছে শশী তপন হে বিশ্বকারণ;
মুক্তামালা যেন তায় তারকা সমুদায়,
মরি কিবা শোভা পায় হে ভব-ভয়-ভঞ্জন।"

গানটির প্রতি কথা ও প্রতি পংক্তি আমার মনে ...পূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতে লাগিল। আমি গাওয়া বন্ধ করিয়া, আকাশের দিকে চাহিয়া ...য়াছি, এমন সময় দেখিলাম, উত্তরীয় স্কন্ধে এক ...কায় বৃদ্ধ পুরুষ একগাছি যষ্টী হাতে লইয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসিতেছেন। তখন আমার একাগ্রতা চঞ্চল হইয়া উঠিল, আমি সেই পুরুষ কোথায় ...ন তাহাই দেখিতে লাগিলাম। ক্ষণেকের মধ্যে তিনি আমার সম্মুখেই দণ্ডায়মান হইলেন। তখন আমার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল বটে; কিন্তু সে ভয় এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিল না। সেই মহাপুরুষ আমাকে মধুর বচনে বলিলেন, দেখ তোমার ঈদৃশ ভাব দেখিয়া আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তোমাকে আমার সঙ্গে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, যাইতে প্রস্তুত আছ কি? আমি বলিলাম,—মহাশয়, আপনি আমাকে যথায় ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারেন, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। তবে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস, বলিয়া মহাপুরুষ অগ্রবর্ত্তী হইলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিলাম। আমার সাথীরাও আমার সঙ্গে চলিল।

প্রথমতঃ এক সরল রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। খানিকদূর যাইয়া এক অসীম প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম। তথায় পদার্পণ করিবা মাত্রই সেই প্রান্তরের অসীমতা আমার প্রাণকে অনন্তের অনন্তভাবের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। আমার চরণ আর চলিতে চাহিল না। পথিক বলিলেন, এই সুদীর্ঘ প্রান্তর দর্শনে চলিতে ক্ষান্ত হইওনা। ইহা পার হইলে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে। পথটা যত দুর্গম মনে করিতেছ, বাস্তবিক তাহা নহে, মনের দৃঢ়তা থাকিলে অনায়াসেই পার হইয়া যাইতে পারিবে। মহাপুরুষের কথায় আমার মনে শক্তি সঞ্চার হইল। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। এই সময়—"আমার চরণ চলিতে নারে তবু নয়ন দেখতে চায়।" এই কথাটী আমার মনে জাগিয়া উঠিল।

চলিতে চলিতে দেখিলাম, এক সঙ্কীর্ণ পদদলিত রাস্তা। স্থানে স্থানে উহার সহিত আরও আঁকা বাঁকা রাস্তা মিলিত হইয়াছে। আমি মহাপুরুষের অনুগমন করিয়াই চলিতেছিলাম বটে, কিন্তু পথিমধ্যে এক এক বার তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া পথভ্রষ্টও হইতেছিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটা ঝাপটা বাতাসে এত ধূলা কুটা উড়িয়া আসিল যে, পথিক আমার দৃষ্টির অন্তরাল হইলেন এবং আমি পথ ভুলিয়া অন্যত্র যাইয়া পড়িলাম। তখন আমার ক্ষীণ দৃষ্টি ক্ষীণতর হইল। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। কয়েক পদ যাইতে না

যাইতেই আমি পদস্খলিত হইয়া কাদায় পড়িয়া গেলাম, অতিকষ্টে উঠিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতে পারিলাম না যে বিপথে আসিয়াছি। মনে মনে ভয়ও ছিল যে, চলিতে বিলম্ব হইলে মহাপুরুষকে দেখিতে না পাইয়া মহা বিপদে পড়িব। এই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি যাইতে যাইতে আমি এমন কর্দ্দম পূর্ণ রাস্তায় উপনীত হইলাম যে এক পদ উত্তোলন করিয়া অন্য পদাবক্ষেপে অসমর্থ হইতে লাগিলাম, এবং পদে পদে কর্দ্দমে প্রোথিত হইতে লাগিলাম। সেই কাদা কোথাও উষ্ণ এবং কোথাও শীতল বোধ হইতে লাগিল। তখন আমি সোজা রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া কখন দক্ষিণে কখনও বা বামে চলিতে লাগিলাম তাহাতেও আমার দুঃখ মোচন হইল না, বরং আরও বৃদ্ধি পাইল। আমি ক্রমশঃ উষ্ণ হইতে উষ্ণতর এবং গভীর হইতে গভীরতর কাদায় ডুবিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন বোধ হইল যেন কেহ আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া উঠাইল। কষ্টের লাঘব হইলে দেখিলাম, সেই মহাপুরুষ আমার সম্মুখে। তিনি আমার আপাদমস্তক একবার লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—বৎস, সাহস ও সহিষ্ণুতা ব্যতিরেকে কদাচ কাহারও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। তুমি দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়াছ, এখন আবার চল। তখন আমি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, আমার সাথীরা কেহই আমার সঙ্গে নাই। তাহারা যে কখন এবং কোথা হইতে আমার সঙ্গ ছাড়িয়াছে তাহা আমি জানিতে পারি নাই। যাহা হউক সঙ্গিহীন হইয়া আমার উদ্যমশীলতার হ্রাস হইল না। আমি এমন অভিনব ভাবে মুগ্ধ হইয়া এবং অপূর্ব্ব সাহসে নির্ভর করিয়া মহাপুরুষের পশ্চাৎগামী হইলাম যে তখন কোনরূপ সংশয় আমার মনকে অধিকার করিতে পারিল না।

কিছুদূর অগ্রসর হইলে আমার পিপাসা বোধ হইল। আমি তাহা প্রকাশ না করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। খানিক দূর যাইতে না যাইতে এক প্রকাণ্ড জলাশয় দৃষ্টি পথে পতিত হইল। দেখিলাম, মহাপুরুষও সেই দিকেই যাইতেছেন।

ইহাতে আমার মনে খুব আনন্দ উপস্থিত হইল
আমি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। জলাশয়ের নিক
উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, এক্ষণে ইহা পা
হইয়া অপর পারে চল। আমি যেন তাঁহার ক
শুনিতে পাইলাম না। ঐ স্থানে পৌঁছিবা মাত্র ম
উহার সুশীতল জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবৃত্তি ক
লাম। তৎপর তাঁহার পশ্চাতে তৃণবৎ সুক্ষ্ম
সাঁকোর উপর দিয়া চলিলাম; কয়েক পদ যা
আমি ডুবিতে লাগিলাম, তথাপি পশ্চৎপদ হই
না। তৎকালে আমার মনে—"যদি পড়বে অ
জলে ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলে, ব'লো কোথায়
ভবের কর্ণধার।" এই বাক্যটী সাহস দিল। ম
মনকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া আহ্লাদের
নবরাজ্য দর্শনাভিলাষে উৎসাহিত হইয়া চলি
কিন্তু আমার উৎসাহ পূর্ণ গতি অধিকক্ষণ কার্য্য
হইল না। আমি হঠাৎ অতল জলে নিমজ্জিত
গেলাম।

জলাশয়ের তলদেশে উপনীত হইয়া যে কি
অপরূপ দৃশ্য দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত।
তাহাই যে আমার গন্তব্যস্থান সেই নূতন
তাহাতে আর সংশয় থাকিল না। আমি বিস্ম
নেত্রে সেই অভিনব রাজ্যের দৃশ্য দেখিতে লাগি
কিন্তু কিছুর সহিত তাহার তুলনা করিতে পারি
না। তথায় বিশাল আকাশে নীলিমার ছটা, মে
ঘন ঘটা; বিপুল প্রতাপশালী দিগন্তব্যাপী দিবা
প্রখরতা, স্নিগ্ধতাপূর্ণ নিশাকরের মধুরতা;
ব্যাপী অগণ্য তারকারাজির ক্ষীণ দীপ্তি;
ফল-সুশোভিত শ্যামল উদ্ভিদরাজির শিরোপরি
হিল্লোলের নৃত্য কিছুই ছিল না; পশুপক্ষী কী
প্রভৃতির চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হইল না।
একবার মনে হইল, হয়ত ইহাই পাতাল প্রদে
প্রদেশে বাসুকী সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া এ
পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে অথবা যে
বৃষের শৃঙ্গোপরি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড স্থান পা
কিন্তু তদ্রূপ কোন দৃশ্যই দেখিতে পাইলাম
অকস্মাৎ আমার দৃষ্টির সম্মুখে এক জটাধারী, ধ্যা

ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষকে যোগাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম।
সেই সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে আমার মনে ভক্তির সঞ্চার
হইল। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি
অর্পণ করিলাম। আমার উপস্থিতিতে সহসা তাঁহার
ধ্যানভঙ্গ হইল। ইহাতে আমার মনে আতঙ্ক উপ-
স্থিত হইল বটে, কিন্তু তিনি অবিলম্বে আমার প্রতি
কৃপাদৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক বাৎসল্য পূর্ণ বাক্যে বলি-
লেন, বৎস তুমি এস্থানে কি প্রকারে আসিলে?
আমি তাঁহার কথার উত্তর দিতে সমর্থ হইলাম না।
হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।
ক্ষণেকের মধ্যে তিনি আবার বলিলেন, বৎস আশী-
র্ব্বাদ করিতেছি, তুমি অগ্রবর্ত্তী পথে অবিচলিত চিত্তে
অগ্রসর হইয়া সিদ্ধকাম হও। এই বলিয়া তিনি হঠাৎ
আমার নয়ন পথের অগোচর হইলেন।

তখন আমি সেই প্রদেশে একাকী দিক্‌বিদিক
জ্ঞান শূন্য হইয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলাম এবং
কোথায় যাইব কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। সেই
মহাপুরুষের দর্শন ও অন্তর্ধান এবং তাঁহার বাক্যাবলী
আমার প্রাণে এক নূতন আন্দোলন আনয়ন করিল।
সেই সময় আবার দেখিলাম আমার সম্মুখে সেই
শীর্ণকায় বৃদ্ধ পুরুষ আমাকে ঐ জলরাশির উপরি-
ভাগে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। আচম্বিতে সেই
মহা পুরুষের দর্শনে আবার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিল।
আমি তাঁহার কথামত আবার পশ্চাৎগামী হইলাম
এবং হাবুডুবু খাইতে খাইতে জলাশয়ের এক প্রান্তে
উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক বিস্তৃত প্রান্তর। প্রান্ত-
রের নিকটে বিশাল অরণ্য। সহসা অরণ্যের মধ্য
প্রদেশস্থ ক্ষীণরশ্মি বিশিষ্ট এক দীপ্তিশিখা আমার
দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ
নিবিড় অরণ্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া ভাবিলাম, এত
ক্ষীণ দীপ্তির সাহায্যে ইহার মধ্যদিয়া যাওয়া আমার
পক্ষে সহজ নহে। যাহা হউক আমার সাহসের হ্রাস
হইল না; আমি বৃদ্ধের পশ্চাৎ চলিলাম। বনে
প্রবেশ করিয়া অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছি
দেখিয়া, বৃদ্ধ বলিলেন, হতাশ হইও না। ঐ যে ক্ষীণ
রশ্মি দেখিতেছ, উহাই আমাদের উদ্দিষ্ট স্থান। বৃদ্ধের

কথা শুনিয়া আমার মনে সাহস ও উৎসাহ হইল। তখন আমি ক্ষিপ্রপদে চলিতে লাগিলাম। চলিতে চলিতে আমার বোধ হইল, ঐ রশ্মি অরণ্যের অপর দিকস্থ কোনও গ্রাম হইতে আসিতেছে।

কিছুদূর যাইতে না যাইতে বহুদিনের সুপরিচিত এক বন্ধুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে উভয়কে দেখিয়া চিত্র পুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। কাহারও মুখে বাক্য সরিল না। মহাপুরুষ চলিয়া যাইতে লাগিলেন; কিন্তু আমার পা যেন ঐ স্থানে অটল ভাবে জমিয়া গেল। কিছুক্ষণ ঐ ভাবে আছি, হঠাৎ সেই বন্ধু আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, প্রিয়বন্ধু, তুমি এখানে কেন? আমি অনেক দিন হইল তোমাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, এতকাল পরে আজ তোমার সহিত সাক্ষাতে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি তাহার হিমাঙ্গ স্পর্শে ও নাকা নাকা স্বর শ্রবণে ভীত হইলাম, এবং কি প্রকারে তাহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইব, তাহা ভাবিয়া আকুল হইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে এক প্রাসাদে আমাকে লইয়া গেল। তথায় কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার; কখনও বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকালব্যাপী আলোক আবার অন্ধকার। এইরূপ ভেল্কির মধ্যে, বহুসংখ্যক লোকের সম্মুখে, এক এক রাশ খাদ্যবস্তু এবং তাহা হইতে সকলের দুই হাতে যদৃচ্ছা ভক্ষণ দেখিতে পাইলাম। তাহাদের সকলেরই মস্ত মস্ত ভুঁড়ি এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও অস্বাভাবিক। অন্দর মহলে আবার অনেক খর্ব্বকায় স্ত্রীলোক অদ্ভুত গহনার ভারে ব্যাকুল। তাহারাও ক্ষীণ আলোকে বসিয়া পরস্পর নাকা নাকা স্বরে কি জানি কোন ভাষায় হাস্য পরিহাস করিতেছে। আমি বন্ধুর সহিত ঐ স্ত্রী পুরুষদিগের আচার ব্যবহার দেখিতেছিলাম। সেই বন্ধু ভিন্ন আর কেহই আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিল না। কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া আমাকে দেখিতে লাগিল। তথায় অবস্থিতিকালে, আমি এক একবার কদর্য্যবস্তুর আঘ্রাণে ব্যাকুল হইতেছিলাম। বন্ধু আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিল, এ যে আমাদের অতি সুস্বাদু খাদ্য।

যাহারা এখানে আসে তাহারাই এই সব খায়। এখন তুমিও ইহাই খাইবে; ইহাতে আর ঘৃণা কি? এই বলিয়া বন্ধু যেমনি একটু সরিয়া পড়িয়াছে, আমি সেই সুযোগে অন্য পথ না পাইয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহের খিড়কি দ্বার হইতে লাফাইয়া পড়িলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাকে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। খিড়কি হইতে লম্ফ দিবামাত্র হাওয়ার উপর আমার দেহভার ন্যস্ত হইল, আর আমি পাখীর ন্যায় উড়িতে লাগিলাম। বাতাসে দেহভার রক্ষণকালে, আমি জলে সাঁতার দিবার সঙ্কেতে হস্ত পদ সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। তখন আমার মনে হইল, ইহা আমার আত্মরক্ষার মন্দ সুযোগ নহে, এবং এইবার বুঝি আমি বিপদ-সঙ্কুল স্থান অতিক্রম করিয়া কোনও নূতন রাজ্যে যাত্রা করিয়াছি। কিছুদূর এইরূপে যাইয়া হস্ত পদ অবসন্ন হইল, আমি বেশী উর্দ্ধে থাকিতে পারিলাম না, নিম্নগামী হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। তখনও সেই নাকা নাকা স্বর আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল। আমি তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া হাওয়ার মহাসাগরে সাঁতার দিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সেই কলরব আমার এত নিকটে বোধ হইতে লাগিল যে তখন আমার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। আমি প্রাণপণে উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু আমার চেষ্টা নিস্ফল হইল। আমি অচিরে নিম্নগামী হইলাম এবং অনেকগুলি লোক কলহ করিতে করিতে ও লম্ফ ঝম্প দিতে দিতে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল। তারপর সকলে মিলিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। আমি তাহাদের জ্বালাতনে বিব্রত হইয়া পড়িলাম, এবং বলপ্রয়োগেও তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম না। অবশেষে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি ভাবিলাম এখন কৌশল ব্যতিরেকে কার্য্যসিদ্ধির উপায় নাই। তখন আমি সেই দলবলের মধ্যে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। তাহারাও খানিকক্ষণ বিকট কোলাহল করিয়া যে যার নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই সময় আর এক নূতন উপদ্রব উপস্থি হইল। খুব বড় একটা সাপ ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে আসিয়া আমার হাতে জড়াইতে লাগিল। আমি বার বার হাত ঝাড়া দিয়া সাপটাকে দূরে ফেলিয় দিতে লাগিলাম; কিন্তু সর্পটী যে কি অদ্ভুত জানোয়ার তাহা কিছু বুঝিলাম না। আমি যতবার হাত ঝাড় দিয়া সেটাকে দূরে ফেলিতে লাগিলাম; সাপটা খণ্ড হইয়া ততগুলি সাপে পরিণত হইতে লাগিল এই প্রকারে আমি সর্পের সহিত দ্বন্দে পরাজি হইয়া অবশেষে ক্রোধভরে সেগুলিকে সজোরে প দলিত করিতে লাগিলাম এবং নিকটস্থ এক বৃক্ষে আরোহণ করিতে প্রয়াস পাইলাম; কিন্তু বিপ বিপদের সাথী, এ ফিকিরও আমার অনুকূল হই না। আমি বৃক্ষের কিঞ্চিৎ উপরে উঠিতে না উঠিতে উহার শাখায় আশ্রিত বিহঙ্গকুল বিকট কিচিমি ধ্বনিতে বনস্থলী কম্পমান করিয়া তুলিল; সুতরা আমি আর উপরে উঠিতে না পারিয়া পুনরা উড়িতে লাগিলাম এবং পবনের বক্ষে স্থান পাই কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। ক্ষণকাল পরে বনস্থ পার হইয়া দেখি, আবার সেই মহাপুরুষ স্নেহবা প্রসারিত করিয়া আমাকে ধরিবার জন্য অগ্র হইতেছেন। তখন সেই দীপ্তি অতিশয় সন্নি বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও আমি ভ্রান্তিযোগে মৃগতৃষ্ণিকায় বিচরণ করিতে তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না। যাহা হউ আমি হৃষ্টচিত্তে সেই জ্যোতিটী লক্ষ্য করিয়া ম পুরুষের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলাম। এস্থানে আবার প পদবিক্ষেপে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া আমাকে কা করিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে এ কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক অতি উচ্চ সোপানের নিক উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধ তাহার ধাপে ধাপে উঠি লাগিলেন; কিন্তু, আমার চলৎশক্তি ঐ স্থানে কা নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, বৎস, এক্ষণে তুমি এত হীনবল হইলে কেন? উঠ। তখন আমি আবার শক্তিসম্পন্ন হইয়া প সদৃশ উচ্চ সোপানে উঠিতে লাগিলাম। প

উপরে উঠিলে দূর হইতে সুললিত গীতবাদ্যধ্বনি আমার শ্রুতিগোচর হইল। তখন হইতে আমার ক্লান্তি অপসারিত হইতে লাগিল এবং নূতন রাজ্যের শান্তির আভাস আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল। আমি বিহ্বলচিত্তে সমস্ত ধাপগুলি উঠিতে লাগিলাম; কিন্তু দুই এক ধাপ বাকি থাকিতে সেই মহাপুরুষ একটি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। তখন আবার সেই নিরাশা আমার হৃষ্টচিত্তে কুঠারাঘাত করিল! আমি আবার ভগ্ন হৃদয়ে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম। এমন সময় সেই মহাপুরুষ দ্বার খুলিয়া আমাকে এক গৃহে লইয়া গেলেন। সেই গৃহখানি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং তাহার সম্মুখস্থ একটি গৃহেই গীতবাদ্য হইতেছিল। দূর হইতে সেই মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি বোধ হইতেছিল না; সেই গৃহে যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। আমি উহার দ্বারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছি, এমন সময় অকস্মাৎ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল এবং মহাপুরুষ আমাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন।

ভিতরে যাইয়া দেখি, গৃহের মধ্যস্থলে একটি পত্রপুষ্প সুশোভিত বেদীর উপর এক পক্ক কেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী, বৃহৎকায় মহাপুরুষ নিমিলিত নেত্রে যোগাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া গৃহখানি দীপ্তিমান করিয়াছে। সে আভার প্রকৃত ব্যাখ্যা ভাষাতীত। গ্যাস ও বৈদ্যুতিক আলোক—যাহা সভ্য-জগতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছে, তাহাও উহার নিকট হীনপ্রভ। ধ্যানমগ্ন সিদ্ধপুরুষ যে বেদীতে বসিয়াছিলেন, তাহার চারিদিকস্থ নানাজাতীয় পত্র-পুষ্প লতায় উক্ত জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া সেগুলিরই যে কি সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও বর্ণনাতীত। গৃহখানি সুবাস ও সুমন্দ সমীরণে পরিপূর্ণ। সে সুমিষ্ট গন্ধই যে কোথা হইতে নির্গত হইয়া গৃহখানিকে এমন আনন্দপূর্ণ করিতেছিল; তাহাও আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি স্থির করিতে পারিল না। বেদীর চতুষ্পার্শ্বে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যসম্পন্না অপ্সরাগণ নানা-প্রকার বাদ্যসংযোগে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছিল। এক একটি গীত সমাপ্ত করিয়া তাহারা নানা ভঙ্গি ও গতিতে স্ব স্ব স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছিল। তাহাদের সেই স্থান পরিবর্ত্তনের গতি বা আমি কি বলিয়া ব্যাখ্যা করিব তাহাও আমার বুদ্ধির অগম্য। তথাকার সমস্তই আমার চিত্তাকর্ষক হইলেও সেই জ্যোতিষ্মান সিদ্ধপুরুষের প্রশান্ত মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। আমি অনিমেষ নেত্রে সেই পবিত্র দেবতাকে দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া গেলাম।

সেই শান্তিপূর্ণ পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া কেবল যে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম তাহা নহে, আমার উপস্থিতিতে অপ্সরাদিগের গীতবাদ্যেরও ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। তাহারা আমাকে দেখিয়া সহসা গীত-বাদ্য বন্ধ করিয়া দিল। সাধুপুরুষেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মিলন করিয়া পুণ্যহস্ত প্রসারিত করিয়া সস্নেহে আমাকে কাছে ডাকিয়া লইলেন। আমি তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র হইলাম এবং জীবন সার্থক মনে করিতে লাগিলাম। তারপর আবার পূর্ব্ববৎ গীতবাদ্য আরম্ভ হইল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শুনিতে লাগিলাম; কিন্তু এরূপ অভাবনীয় সুখভোগ আমার ন্যায় সামান্য মনুষ্যের ভাগ্যে বেশীক্ষণ ঘটিল না। হঠাৎ আমার কর্ণকুহরে প্রভাতের কাকলী প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি জাগ্রত হইয়া চক্ষু খুলিয়া কিছুই দেখিতে ও শুনিতে পাইলাম না; তথাপি আমার মোহ ভাঙ্গিল না। আমি একটু বিশেষ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম আমি যে গৃহে ও যে পালঙ্কে শুইয়াছিলাম তাহাতেই রহিয়াছি। তখন আমার মনে সংশয় হইতে লাগিল। মনে হইল তবে যে আমি এতক্ষণ অমানুষিক ভাবে নানাপ্রকার অবস্থার মধ্যে বিচরণ করিতেছিলাম এবং যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছিলাম, তাহা সমুদায়ই কি অলীক! যাহা হউক এ স্বপ্ন কদাচ আমার মন হইতে অপসারিত হইবে না।

শ্রীবিনোদিনী দেবী।

সমাজের অত্যাচারে নিপীড়িত বালিকার আত্মোৎসর্গ।

"—পীড়িত যবে ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাই,
সব চেয়ে প্রিয় নিজের যাহা
বলি দিতে হয় তাই।"

ইতিহাসে পড়িয়াছি, রাজস্থানের ফুল্ল-কুসুম কৃষ্ণকুমারী রাজ্যলোলুপ নরপতিদিগের রাক্ষসী ক্ষুধা হইতে পিতার রাজ্য রক্ষার্থ বিষপান করিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সমগ্র দেশে যে ভীষণ অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, সেই কুসুম-কোমলা বালিকার শোণিত তাহাতে আহুতি প্রদত্ত হইলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

রোম সাম্রাজ্যের বিলাসোন্মত্ত নরনারী নিরীহ দাসদিগের রক্তপান করিয়া উল্লসিত হইত। কলোসিয়ামের পাষাণ ভূমি মানব রক্তে রঞ্জিত দেখিতে দেখিতে তাহাদের হৃদয় পাষাণ, আত্মা বিবেকহীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যেদিন ঐ মানব শোণিতধারা-প্রবাহিত কলোসিয়ামের পাষাণ প্রাঙ্গণে এক মহাপ্রাণ পুরুষ আপনাকে বলিদান করিলেন, সেদিন হইতে সে পৈশাচিক দৃশ্যের অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। বসুন্ধরার বক্ষ হইতে এক ভীষণ কলঙ্ক ভার দূর হইল। অত্যাচারিত পদদলিত ক্রীতদাসদিগের যন্ত্রণা পীড়িত হৃদয় মথিত করিয়া যে করুণ ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইত, তাহা লক্ষ লক্ষ বিলাসী, পাষাণ-হৃদয় নরনারীর মধ্যে স্থিত ঐ আত্মত্যাগী, ঈশ্বরের ভৃত্যের মর্ম্মে সমবেদনার যে প্রচণ্ড তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা অন্ধ সমাজের যুগান্ত সঞ্চিত পাপের কালিমা একেবারে ধৌত করিয়া দিয়াছিল। একটি মহাপ্রাণ আত্মার অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জনের ফলে সহস্র সহস্র মানবের অপার দুঃখরাশি দূরীভূত হইয়াছিল। যুগ যুগ ধরিয়া নিপীড়িত মানবের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, যন্ত্রণামথিত হৃদয়ের কাতর আর্ত্তনাদ, দাসত্বের অসহায়তা, দেশের আকাশে বাতাসে যখন পুঞ্জীভূত হইয়াছিল,—যাহার জমাট অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া দেশকে ক্রমশঃ অধঃপতনের পথে দ্রুত টানিয়া নামাইতেছিল—তখন বিধাতার আহ্বানে তাঁহারই এক দাস আসিয়া আপনার বক্ষের শোণিত দিয়া দেশের সেই পুঞ্জীকৃত পাপ ভার লঘু করিয়া দিলেন।

নবম গুরু তেগ বাহাদুরের সময়ে পঞ্জাবে শিখ গণ অমানুষিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছিলেন বাদশাহের উপদ্রব তাঁহাদিগকে গৃহশূন্য করিয়াছিল তাঁহারা পশুর ন্যায় এক স্থান হইতে অন্য স্থা নিরন্তর তাড়িত হইয়া ফিরিতেন। দুর্দ্দশা যে চরম সীমায় পৌছিল, তখন একদিন গুরু তে বাহাদুর শিষ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভক্তগণ! দেশে পাপ ও অত্যাচার বৃদ্ধি পাইলে কোন প্রিয় বস্তু বলিদান করিয়া তাহা দূরী করণের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সম দেশের কি ঘোর দুরবস্থা তাহা তোমরা দেখিতে এমন দিনে তোমরা কোন্ প্রিয়তম বস্তু উৎস করিয়া তাহার উপশম করিবে?" তেগ বাহাদুরে পুত্র নবম বর্ষীয় বালক গোবিন্দসিংহ পিতার নিক উপস্থিত ছিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলে "পিতা, শিখগণ আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞা করে।" পুত্রের বাক্যে শিক্ষালাভ করিয়া তে বাহাদুর শিখ ধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিবার জ আপনার জীবন দান করেন। এই প্রকার আত্মো সর্গের ফলে শিখগণ এক সময়ে সমগ্র ভারতে প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়াছিলেন। বিধাতার রাজ্যে নিয়মই এই। মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া বি যাঁহাকে পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করে তাঁহার আত্মবিসর্জ্জনের ফল অক্ষয় হইয়া দে শক্তিশালী করে।

বঙ্গের সমাজ নানা প্রকার কুসংস্কারে, নি জালে, নিপীড়িত নারী সমাজের তপ্ত দীর্ঘ অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে। সমাজের অত্যাচারে গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, কুসুম-কোমলা, স্ত্রী নারীর জীবন আজ দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। যে নারী উপযুক্তরূপে জ্ঞানে ধর্ম্মে কর্ম্মে সুশিক্ষিতা হইয়া ঈশ্বরের ভক্ত সেবিকা, সংসারের আরামদায়িনী, সন্তানের শিক্ষা প্রদায়িনী স্বামীর উপযুক্ত সহযোগিনী, সমাজের হিতসাধিনী এবং স্বদেশের কল্যাণকারিণী-রূপে মানব জন্ম সফল করিতে সক্ষম হন আজ সমাজের অত্যাচারে তাঁহার জন্মে গৃহে গৃহে হাহাকার পড়িয়া যায়।

সমাজের বক্ষে পাপের পাষাণ ভার জমিয়া উঠিয়াছে দেশ অধঃপতনের পথে দ্রুত নামিয়া চলিয়াছে, তাই দেশের শোভাসম্পদময়ী নারী সমাজের অন্তর্গত, গৃহের প্রিয়তম বস্তুর বলিদান হইয়াছে। ইতিহাসে যাহা পড়িয়াছিলাম, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া দেহ রোমাঞ্চিত হইয়াছে। একটি অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপ, সমাজের প্রবল ঝঞ্চাবাতে দলিত হইয়া ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া গিয়াছে। চিতোর রাজলক্ষ্মীর ন্যায় বঙ্গসমাজ লক্ষ্মী বুঝি কোন্ এক নৈশ রজনীতে ঐ কুসুম-কোমলা বালিকার কর্ণে শুনাইয়াছিলেন, "ময় ভুখা হুঁ।" সমাজে যে শত সহস্র জ্ঞানাভিমানী, ধনী, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আছেন, যাহারা কেবল বাক্যের জাল রচনা করিয়াই আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল মনে করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের নির্জীব হৃদয়ে সমাজলক্ষ্মীর ঐ কাতর আর্ত্তনাদ পৌছায় নাই, কিন্তু তাহা পবিত্র-হৃদয়া, পুণ্যশীলা এক বালিকার মর্ম্মের তারে যে ঝঙ্কার তুলিয়াছিল, তাহাতে আকুল হইয়া সে আপনাকে বলিদান করিল। সমাজের রাক্ষসী পিপাসা কি এই একটি পুণ্য জীবনের শোণিত পান করিয়াই মিটিবে? না, তাহা সর্ব্বগ্রাসী হইয়া বলিবে, "আরো চাই, আরো চাই।"

নারীর প্রতি সমাজের অত্যাচারে যে পাপরাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা ধৌত করিতে হয়ত আরো কত এমনি পবিত্র, এমনি সুকোমল, এমনি আত্মত্যাগী জীবনের বলিদান আবশ্যক। তবে যদি দেশবাসীর চিত্ত মহৎ ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, অন্তর সত্যকে ধারণ করিতে শিক্ষা করে, দৃষ্টি উদার হয়। এমনি করিয়া রক্ত দান করিয়া দেশবাসীর অন্ধ চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে। মৃত সমাজ না হইলে কি এই মহা হৃদয়ের শোণিত দান এমন নির্ব্বিকার চিত্তে দাঁড়াইয়া দেখিতে পারে? মানব! তোমার জ্ঞান বিজ্ঞানের গৌরব কোথায়? তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মূল্য কি এই? যে শিক্ষায় তোমার হৃদয়কে উন্নত না করিল, নিপীড়িতের জন্য ব্যথিত না করিল, মহৎ চিন্তায় অনুপ্রাণিত করিয়া পরার্থে আত্মবিসর্জ্জনে উন্মুখ না করিল, সে কলেজি শিক্ষায় ধিক্! যে শিক্ষা মানবকে শিখাইল না, যে সত্যের সেবক হওয়াই মানব জীবনের সার্থকতা এবং পরার্থে আত্মোৎসর্গ করাই মানবের উচ্চতম আদর্শ, সে শিক্ষা অচিরে দেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যাক্। এমন বি-এ, এম-এর ফাঁস গলায় পরা অপেক্ষা জন্ম জন্ম মূর্খ হইয়া থাকা শত গুণে শ্রেয়ঃ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিষ্পেষণে আত্মার মহত্ব যদি দলিত হইয়া থাকে, তবে দূর করিয়া দাও এমন শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা যে আত্মাকে সবল, সুদৃঢ়, উন্নত, উদার, সত্যপিপাসু করিয়া তোলে। জীবনকে সরল, অমল, অটল করে। তেমন জীবন যখন দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে, তখন বলিতে হয় শিক্ষার কলঙ্কই হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে দেশের আশাস্বরূপ যুবকগণ রায়-চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া দিতেছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানে অদ্ভুত কৃতীত্ব দেখাইয়া বিশ্বকে চমকিত করিতেছেন, কিন্তু হায়, সে মনুষ্যত্ব কোথায়? সত্যের জন্য সেই অপূর্ব্ব আত্মবিসর্জ্জনের স্পৃহা কৈ? সে বৈরাগ্যের প্রাণ মাতান আদর্শ কোথায়? সে ঈশ্বর-প্রেমিক মানুষ কই, "যারে দেখ্‌লে প্রাণ জেগে উঠে, হরিনাম আপনি ফোটে।"

যুবকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভে যতই অগ্রগামী হইতেছেন, মহত্ব হইতে ততই দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। সুতরাং নিজেরা শিক্ষার সুফল ভোগ করিতে অক্ষম হইয়া, প্রকৃত শিক্ষা মানবকে দেবতায় পরিণত করে, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহারা নারীর স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া তাঁহাকে জ্ঞান-

লাভ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেছেন। নারীর শিক্ষা লইয়া দেশবাসী বাদ, প্রতিবাদ, কোলাহলে মত্ত হইয়া আছেন। কিন্তু সংস্কারের যদি প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে ঐ পুরুষের শিক্ষারই হইয়াছে। নিজেরা অন্ধ হইয়া বিপথে চলিয়া যাইতেছেন, অথচ অপরকে পথ দেখাইবার স্পর্দ্ধা রাখিয়া দেশে কি বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিতেছেন। এই সকল সংস্কারের ভার নারীকেই লইতে হইবে। দেশে মানুষ সৃষ্টি করিতে হইলে নারীকে কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। সমাজের এই অত্যাচার দূর করিবার ভার কেবল তাঁহারই ঐ কোমল অথচ সুদৃঢ় বাহু দুটিতে আছে। কবির কথায় আজ বলি ঃ—

"আর কারে ডাকি উঠগো ভগিনী,
উঠ মা আমার কারার বন্দিনী,
তোরা না জাগিলে দেশ যে জাগে না,
তোরা না উঠিলে দেশ যে উঠে না।"

একবার শক্তিরূপিনী মূর্ত্তি ধরিয়া খরকরবালি রূপে পাপাসুর দলন করিবার জন্য দেশের মা আসিয়া দাঁড়াও দেখি। সন্তানকে মহত্বে, আত্মত্যা সত্যপ্রাণতায়, বৈরাগ্যে দীক্ষিত কর দেখি। বিধা আশীষে দেশের ও সমাজের তমোরাশি দূর হই সত্য সূর্য্যের জোতিতে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইবে জানিয়া রাখিও, কেবল তোমারি মহত্বে দেশ আ মানুষে পূর্ণ হইবে।

লাইবেরিয়া।

শুধু বর্ণের উপর জাতীয়তা বা ক্ষমতা যে নির্ভর করে না তাহা অবিসংবাদী সত্য। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, জাতিবিশেষ এই মহাসত্য মানিয়া চলিতে কিছুতেই রাজী নহেন। শ্বেতজাতি মনে করেন কৃষ্ণকায় সকল জাতিই বুদ্ধি-বৃত্তি, নৈতিকবল, রাজনৈতিক ব্যাপার প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা হীন। কিন্তু সাধনা দ্বারা যে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী তাহা বারবার জগতে প্রমাণিত হইয়াছে। সেবার কৃষ্ণকায় কাফ্রি জনসনের নিকট মহাবলী শ্বেত পালোয়ান জেফ্রিসের পরাজয়েও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে শক্তিসাধনায়ও কৃষ্ণজাতি শ্বেতজাতিকে পরাজিত করিতে পারে। শক্তিসাধনা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সভ্যতার আলোক পাইলে অসভ্য বর্ব্বরেরও বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশ লাভ করে, বুদ্ধির বিকাশ পাইলে সে তখন নিজের ন্যায্য দাবী পাইতে সযত্ন হয়। যে নিজে চেষ্টা করে, বিধাতা তাহার সহায় হন। আমরা আজ এরূপ একটী জাতির বিবরণ দিব, যে জাতি বর্ব্বরতার গভীরতম গহ্বর হইতে চেষ্টা দ্বারা করুণাময়ের আনুকূল্যে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার শক্তি লাভ ক য়াছে।

পশ্চিম আফ্রিকার সিয়েরা লিয়নের ইং উপনিবেশ এবং French ivory coast এর ভূভাগে এই জাতির বাস। তাহাদের প্রিয় শের নাম লাইবেরিয়া। কৃষ্ণকায় কাফ্রি ইহা তাহারা বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতানুযায়ী নি স্বদেশ শাসন ও সংরক্ষণ করিতেছেন। বি সম্প্রদায়ের লোক লইয়া এই দেশের জন ১,৫০০,০০০। ইহার মধ্যে আফ্রোআমেরি বংশীয় লোক ১৫০০০। ইঁহারাই দেশ শাসন ক থাকেন। তাঁহাদের নিজেদের প্রেসিডেন্ট নিজেদের রাজকর্ম্মচারী আছে এবং রাজ্যস সবই নিজেদের। তাঁহারা নিজের পায়ের দাঁড়াইয়াই জগতে আত্মপরিচয় দিতেছেন। নাইটেড্ ষ্টেট্সের শাসনতন্ত্রের মত ইহাদের শাসন তেরজন সভ্য লইয়া একটী Lower House এ জন সভ্য লইয়া একটী সেনেট সভা আছে। নৌবলের মধ্যে মাত্র একখানি গানবোট এব বিষয়ে Militia প্রথা প্রচলিত। এই গানবো

লাইবেরিয়ান শিক্ষক ও তাঁহার ছাত্রবর্গ।

মনরোভিয়া লাইবেরিয়ার রাজধানী।

পূর্ব্বে কোনও এক ইউরোপীয় ক্রোড়পতির ছিল। বর্ত্তমানে অন্যান্য বিভিন্ন শক্তির সহিত যে প্রকার সন্ধি সম্বন্ধ থাকা উচিত তাঁহাদের সে সব আছে। পৃথিবীর সমুদায় শক্তি ইহাদিগকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাদের অনেকের সহিতই ইহারা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। দেশের সমুদ্রতীর ৩৫০ মাইল এবং সমগ্র দেশের বিস্তৃতি ৩০,০০০ বর্গমাইল। সমস্ত লাইবেরিয়া অসমতল; জলবায়ু পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশের মতই, উৎপন্ন দ্রব্য কফি, রবার এবং খনিজ অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়। কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ ও ব্যারাম পীড়া ইত্যাদিও পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশের সদৃশ।

কিরূপে এই কাফ্রিজাতি বর্ত্তমান সভ্যতালোকে আলোকিত হয়, তাহা বেশ কৌতুহলজনক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমেরিকার দক্ষিণপ্রদেশের রাজ্যসমূহের দাস ব্যবসায়ীগণ বিবেকের তাড়নায় অনেক দাসকে মুক্তি দিয়াছিলেন। কোনও কোনও দাসপ্রভু দাসগণের উপার্জ্জিত অর্থ বিনিময়ে অনেক দাসকে মুক্তি দেন। এই সকল মুক্ত, স্বাধীন, কর্ম্মঠ কাফ্রিরা জীবন সংগ্রামে শ্বেত জনসাধারণের সহিত পাশাপাশি ভাবে সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়া তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য দাবী করিয়া এক আন্দোলনের সূত্রপাত করিল। ফলে কলোনিজেসন সোসাইটী অব্ আমেরিকা নামক একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। এই সম্প্রদায় এই যুক্তি করিলেন যে, এই মুক্ত কাফ্রিদিগকে এমন এক যায়গায় পাঠান হউক যেখানে তাহারা নিজেরা স্বর্গ করিয়া জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকাই তাহাদের বাসোপযোগী বলিয়া স্থির করা হয়। বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া অমনি কার্য্য আরম্ভ করা হইল। ইউনাইটেড ষ্টেট্সের গির্জ্জায় গির্জ্জায় চাঁদা সংগ্রহ হইতে লাগিল। চাঁদা উঠিলও প্রচুর। এই উদ্দেশ্যে একখানি জাহাজ ভাড়া করা হইল। আসমান নামক জনৈক শ্বেত অধিবাসীর অধীনে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দেড়শত পরিবার আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের জন্য রওনা হইল। প্রথমে তাহারা যাইয়া সিয়েরা লিয়নে অবতরণ করিল কিন্তু তথাকার লোকেরা এই নবীন অতিথিদের আগমনে তত স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছে না দেখিয়া তাহারা সমুদ্রের ধার বাহিয়া সেণ্টপল নামক নদীর মুখে আসিয়া উপনীত হইল। এইরূপে তাহারা বর্ত্তমান লাইবেরিয়াতে আসিয়া পৌঁছিল। এই স্থানেই তাহারা বসতি স্থাপন করিয়া প্রেসিডেণ্ট মনরোর নামানুসারে মনরোভিয়া নামক একটী সহর স্থাপন করিল। তারপর উপার্জ্জনে মনসংযোগ করিল। আকের চাষ সুবিধা না হওয়ায় কফির চাষ আরম্ভ করিল।

আদিম অধিবাসীগণ ইহাদের আগমন ভাল মনে না করিয়া প্রথম প্রথম উপদ্রব করিতে লাগিল, এমন কি দুই একবার অস্ত্রশস্ত্র লইয়াও নবীন প্রাচীনে সংঘর্ষণ হইয়া গেল। কিছুদিন সংঘর্ষণের পর প্রাচীনেরা যখন দেখিল যে, নবীনেরা সে স্থান ত্যাগ না করিতে দৃঢ়সংকল্প তখন তাহারা তাহাদের সহিত ভাব করিয়া লইল। নবীনেরাও তাহাদিগকে সাদরে স্বদলভুক্ত করিয়া লইল এবং তাহাদের অনেক সুবিধা করিয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। এইরূপে সমুদ্রের ধার দিয়া আফ্রো আমেরিকান কাফ্রিরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তাহারা এই দেশের নাম রাখিল লাইবেরিয়া বা স্বাধীনতার দেশ।

আদিম অধিবাসীগণের সহিত সংঘর্ষে আগত জাতিরা বেশ বীরত্ব দেখাইয়াছিল। তখন কিন্তু লাইবেরিয়ায় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এখন পর্য্যন্ত "নিউপোর্টডে" নামক একটি পর্ব্ব দিবস সমগ্র লাইবেরিয়ায় পালিত হইয়া থাকে। এই পর্ব্ব দিবসের একটী ইতিহাস আছে।

একদিন আদিম ও নবীন কাফ্রিদের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল। মিসেস্ নিউপোর্ট নামক জনৈক বৃদ্ধা মনরোভিয়ার একটী পর্ব্বতের উপর বসিয়া এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। আদিমগণের সংখ্যা খুব বেশী ছিল—প্রায় চারি গুণ। একটী পুরাতন স্পেনদেশীয় কামানের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া বৃদ্ধা পাইপ টানিতেছিলেন। কামানটী ভরা ছিল। সভ্য কাফ্রিগণ অসভ্যগণের নিকট পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন আরম্ভ

করিল দেখিয়া বৃদ্ধা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া তিনি কামানে পাইপের অগ্নি সংযোগ করিলেন। ঘোরনিনাদে কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। হতভাগ্য অসভ্যগণ ভয়ে পলায়ন করিল। লাইবেরিয়া রক্ষা পাইল।

গল্পটী আবার কেহ কেহ আর অন্যরূপে বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, বৃদ্ধা নিদ্রিত হইয়া পড়ায় প্রজ্জ্বলিত পাইপের শিখার সহিত ঘটনাচক্রে কামানের সংযোগ হয় তাহারই ফলে কামান আওয়াজ হয়।

এইরূপ কোনও এক সময়ে বিজয়লাভ ঘটিলে হৃদয়ে সাধারণতঃ স্বাধীনতার বীজ আপনাপনি অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। বিজয়ী আফ্রো আমেরিকানগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া স্বাধীনতার এই ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। "লাইবেরিয়া লাইবেরিয়ানদিগেরই। সাধারণতন্ত্র লাইবেরিয়ার গবর্ণমেণ্টের সকল অধিকার ইহাতে আছে। তাহাদের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সাধারণতন্ত্র লাইবেরিয়ার অধিবাসীগণের ন্যায্য অধিকার আছে, এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সমস্ত সভ্যজগতের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিল।"

"লাইবেরিয়াবাসীগণের অন্যায্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই। তাহাদের রাজ্যবৃদ্ধির ইচ্ছা নাই। যাহারা অত্যাচারিত, প্রপীড়িত আশ্রয়শূন্য তাহাদের বাসস্থানের জন্য লাইবেরিয়া উন্মুক্ত।"

"এখানে আমরা সকলে স্বাধীন এবং আমরা স্বাধীনভাবেই স্বচ্ছমতে আমাদের সন্তানসন্ততিদিগকে শিক্ষাদান করিব—তাহাদের মনে বিশ্বপ্রেমিকতা, সৎগুণ, মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মের বীজ বপন করিব।"

"এখানে সকলেরই সুবিচার করা হইবে—অত্যাচার, অবিচার, পাপ প্রভৃতির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। সন্তানসন্ততির শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয়, সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় পরমেশ্বরের অর্চ্চনার জন্য গ্রামে গ্রামে গির্জ্জার প্রতিষ্ঠা আমাদের উন্নতির ও কার্য্যকারিতার দ্যোতকস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দেশবাসীরাও আমাদের সহিত একত্রে হাত ধরাধরি করিয়া এক দেবতার সম্মুখে প্রণত হইতেছে। আমাদের রাজ্যে দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদ হইয়াছে।"

"সেইজন্য ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, সংগুণ ও আমাদের স্রষ্টা সেই এক ভগবানের নামে আমরা অন্যান্য সভ্য জাতির সখ্যতা ও সহানুভূতি যাজ্ঞা করিতেছি।"

১৮৭৪ খৃঃ লাইবেরিয়ায় সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়। ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ প্রথম ইহাকে সাধারণতন্ত্র রাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সও পরে স্বীকার করিয়াছেন। শ্বেতজনসাধারণ এই রাজ্যসৃষ্টির প্রারম্ভে উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত উন্নতি তথাকার কাফ্রিরাই করিয়াছে।

তাহাদের বাহিক ও আভ্যন্তরিন উভয় প্রকার অসুবিধার সহিত লড়াই করিতে হইয়াছে। প্রথম প্রথম তাহারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে শ্বেতজাতির অনুকরণ করিত। আমেরিকার Colonsation Society প্রথম প্রথম তাহাদিগকে গির্জ্জার জন্য ধর্ম্মযাজক পাঠাইয়া দিতেন। সমস্ত গির্জ্জার ধর্ম্মযাজকগণের ম... বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই সমাজের কর্ত্তা হইতেন।

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরই সীমানির্দ্দেশ লইয়া ফ্রান্স গ্রেটব্রিটেনের সহিত গোলযোগ বাধে। এই বিষয় লইয়া নানারূপ যুক্তিতর্কের পর ১৯১০ খৃঃ উভয় শক্তিদ্বয়ের সহিত মীমাংসায় একটা সীমা স্থির হইয়া গিয়াছে।

লাইবেরিয়ায় ইংরাজের প্রতিপত্তি হওয়ায় অন্যান্য জাতিরা দেখিল যে, ইংরাজগণকে তথায় প্রভাব বিস্তার করিতে দিলে তাহাদের স্বার্থহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা। তাই স্থির হইল লাইবেরিয়ার অর্থ বিভাগ আমেরিকার অধীনে সমস্ত জাতির একটা বোর্ড দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। দেশের আয় সর্ব্ব কষ্টমবিভাগ হইতে পাওয়া যায়। এই অর্থ ইন্‌ভে... ষ্টারদের security স্বরূপ দেওয়া আছে।

লাইবেরিয়ার বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মিঃ বারক্লে। ইঁহার জন্মস্থান পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বারবাডোজ। ইনি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও দেশের উন্নতির জন্য যত্নপরায়ণ। এই দেশে চারি বৎসর অন্তর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

দেশে পাঁচটী সহর আছে,—মনরোভিয়া, কে... মাউণ্ট, গ্রাণ্ডবাসা, গ্রীণভাইল ও হারপার। ইঁহারা ইংরাজীতে সব কাজ করিয়া থাকেন। ইঁহারা এখনও ইউরোপীয় সভ্যতার ঘোরতর অনুকরণ করিতেছেন। তাঁহাদের সাহিত্য, সমাজ সমস্ত ইউরোপীয় ভাবপূর্ণ।

শ্রীনলিনীমোহেন রায় চৌধুরী।

স্নেহলতা

"রাজপুতানার মেয়ের মত, কর্ম্ম না হয় জহর ব্রত,
তারাও নারী, মোরাও নারী, নারীর হৃদয় দিয়ে!"

সাম্য-প্রেস, ৬নং কলেজ-স্কোয়ার, কলিকাতা।

Presented to the R.P.L. by Shiva Prasad Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের
জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { ফাল্গুন, ১৩২০। } ৮ম সংখ্যা।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের জন্ম কথা।

রো সাহেবের দৌত্যের ফল স্বরূপ ইংরাজ যে প্রকারে পর্টুগীজগণের ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করিয়া সুরাটে নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য কুঠি সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। ইহার কিয়দ্দিবস পরে ইংরাজ বণিকেরা দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবেদারের প্রীতি সাধনে সমর্থ হওয়াতে তাঁহারা গণ্ডা, ক্যাম্বে ও আহম্মদাবাদে তিনটি শাখা কুঠি স্থাপন করিবার আদেশ প্রাপ্ত হয়েন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা আজমীরে আর একটি কুঠি সংস্থাপন করেন। এই সময়ে সুরাট ও ঐ চারিটি কুঠি লইয়া একটি প্রেসিডেন্সী সংগঠিত হয়। সুরাট উহার কেন্দ্রস্থল (Head Quarters) নির্ব্বাচিত হওয়াতে উহার কুঠির প্রধান অধ্যক্ষ (agent) এডওয়ার্ডস্ সাহেব সমগ্র প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বময় কর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়া 'প্রেসিডেণ্ট' আখ্যা লাভ করেন। ইহার পর ইংরাজ বণিক যখন বোম্বাই লাভ করেন, তখন হেড কোয়ার্টার সুরাট হইতে ঐ স্থানে লইয়া যাওয়া হয় (১৬৮৭)। ইতঃপূর্ব্বে ইহা 'পশ্চিম প্রেসিডেন্সী' নামে অভিহিত হইত। এখন হইতে ইহা 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সী' নামে অভিহিত হইতে থাকে।

রোর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ক্যারী সাহেব তাঁহার প্রসিদ্ধ পুস্তক "The good old days of John Company"র এক স্থানে লিখিয়াছেন :—রোর ভারতবর্ষ ত্যাগের পর বিশ্বস্ত সূত্রে এমন কিছুই জানা যায় না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে সময়ের ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। তবে ইহা ধ্রুব সত্য যে, সে সময়ে সুরাট নগরে সুশাসনের পরিবর্ত্তে অরাজকতা এবং পাপের রাজত্ব ছিল।

ঐ সময়ে এ দেশের ইংরাজেরা কি ভাবে

অবস্থান করিতেন, তাঁহারা সামান্য অর্থের জন্য কি প্রকার নীচতা অবলম্বন করিতেন, দৈনিক জীবনে প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহারা প্রায় সকলেই কি প্রকারে তৎকালীন নবাবদিগকে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণ করিতেন প্রভৃতি কথা আমরা সবিস্তারে অন্যত্র বিবৃত করিব।

ঐ সময়ে অনেকগুলি বাণিজ্য কুঠি একত্র সম্মিলিত হইয়া একটি প্রেসিডেন্সী সংগঠিত হইত। প্রেসিডেন্ট সাহেব সর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন বটে, কিন্তু একা তাঁহার মতে কোনও কার্য্য হইত না। তিনি একটি বোর্ডের অধীন ছিলেন। সমগ্র প্রেসিডেন্সীর ২৪ জন প্রধান ইংরাজ বণিককে লইয়া ঐ বোর্ড বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইত। প্রেসিডেন্ট উহার সভাপতি ভাবে কার্য্য করিতেন মাত্র। প্রত্যেক আবশ্যকীয় বিষয় ঐ সভার মতানুসারে সম্পন্ন হইত। যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিষয়ে কিন্তু বোর্ড বা প্রেসিডেন্ট কোনও প্রকার কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। ঐ সকল বিষয়ে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরের অভিমত গ্রহণ করিতে হইত।

এই কোর্ট অব ডিরেক্টর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্ব্ব প্রধান সমিতি বলিয়া পরিগণিত হইত। বিলাতের কয়েকজন প্রধান প্রধান বণিককে লইয়া এই সভা গঠিত হইত। কোম্পানীর প্রথম সৃষ্টি হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সভাই উহার সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। বিশেষ বিশেষ স্থলে এই সভাকে বিলাতের মন্ত্রী সভার অধীন থাকিয়া কার্য্য করিতে হইত। এই জন্য ভারতের বাণিজ্য ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়েরা বিশেষ ভাবে লাভবান হইতেন। অনেক স্থলে ডিরেক্টর সভা স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডেশ্বরকে পর্য্যন্ত "নজর" দিতে বাধ্য হইতেন।

প্রত্যেক শাখা কুঠিতে একজন করিয়া সেক্রেটারী নিযুক্ত হইতেন। প্রেসিডেন্টের ন্যায় ইঁহাকেও এক সমিতির মতামত লইয়া কার্য্য করিতে হইত। সেক্রেটারী মহাশয়কে প্রত্যেক সপ্তাহান্তে আপন কুঠির সমস্ত সংবাদ প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিতে হইত। প্রেসিডেন্ট সাধারণতঃ ডিরেক্টর সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। অপরাপর সমস্ত কর্ম্মচারীকে প্রেসিডেন্ট মনোনীত করিতেন।

এইখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য ব্যাপদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সকল স্থান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে; (ক) যে সকল স্থান তাঁহারা খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন, তথায় তাঁহারা প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেন। ইংরাজ কোম্পানী যে যে স্থান ক্রয় করিয়া বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে এই সকল স্থান ভারতের প্রথম শ্রেণীর সহরে পরিণত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। (খ) কোনও কোনও প্রাচীন সহরে কোম্পানী কয়েক বিঘা জমি খরিদ করিয়া কুঠি ও নিজেদের আবাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ইংরাজ কোম্পানী প্রথম প্রথম এদেশে শাসন ও বিচার ক্ষমতা লাভ করেন নাই। স্থানীয় শাসনকর্ত্তারা ঐ দুই ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। কোম্পানীর অধিকৃত স্থানে কোনও দেশীয় ব্যক্তি কোনও প্রকার অপকার্য্য করিলে তাহাকে নিকটবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার নিকট প্রেরণ করা হইত। প্রথম প্রথম ইংরাজ অপরাধীকেও ঐ ভাবে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু দেশীয় বিচার পদ্ধতি তাঁহাদের নিকট নিতান্ত বিসদৃশ মনে হওয়াতে তাঁহারা অনেক অর্থ ব্যয় ও চেষ্টার পর ইংরাজ অপরাধীর বিচার ভার নিজেদের হস্তে গ্রহণ করেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ কিন্তু এখানকার ইংরাজদের হস্তে বিচার ভার প্রদান করিলেন না। সামান্য সামান্য অপরাধের বিচার প্রেসিডেন্ট সাহেব করিতেন বটে, কিন্তু কোনও ইংরাজ কোনও গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহাকে বিলাত পাঠান হইত।

সুরাট প্রেসিডেন্সী স্থাপিত হইলে পর কোম্পানীর কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি পাইল বটে, কিন্তু তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না। এক্ষণে তাঁহারা

চেষ্টা করিতে লাগিলেন, যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস প্রথম হইতে আলোচনা করিলে আমরা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, সৌভাগ্য লক্ষ্মী চিরদিন তাঁহাদের সহচরী। ভাগ্য বিধাতা প্রথম হইতে যেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, ভারতের রত্ন-সিংহাসনে তাঁহাদিগকে যে কোনও প্রকারে স্থাপিত করিবেন। ভারত ইতিহাসজ্ঞ জানেন যে, ইংরাজ কোম্পানী ভারতে সাম্রাজ্য সংস্থাপন ব্যাপারে যতবার ভীষণ বিপদের মুখে পড়িয়াছেন, ততবারই নিতান্ত বিস্ময়কর ভাবে তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন।

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী মসুলিপট্টনে এক কুঠি স্থাপন করেন। ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে ইহাই তাঁহাদের প্রথম বাণিজ্যাগার। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে উহার পার্শ্ববর্ত্তী আরামগাঁওএ আর একটি কুঠি নির্ম্মিত হয়। ইহার তিন বৎসর পরে মসুলিপট্টনের হিন্দু নৃপতি ইংরাজের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়াতে অবশেষে তাঁহাদিগকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, স্থানটা বিশেষ লাভজনক না হওয়াতে কোম্পানী স্বেচ্ছায় উহা ত্যাগ করিয়া যান। যাহা হউক, তাঁহারা কিন্তু আরামগাঁও ছাড়িলেন না। বরং উহার চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া উহাকে অনেকটা দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত করিয়া লইলেন। মসুলিপট্টন ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই ইংরাজ আরামগাঁও গড়বন্দি করিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, কোনও কারণবশতঃ স্থানীয় ভূপতির সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়াতে উভয়ের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হয়। ইংরাজকে কিন্তু শেষে পরাজয় স্বীকার করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিতে হয়। যাহাতে পুনরায় ঐরূপ বিপদে না পড়িতে হয়, তজ্জন্য তাঁহারা আরামগাঁওকে সর্ব্ব প্রথম সুরক্ষিত করিয়া ফেলেন। ইহাতেও কিন্তু তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন না। উহার মধ্যে ২০ জন সুশিক্ষিত সৈন্য রক্ষিত হইল। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, পূর্ব্ব উপকূলের এই সকল কুঠি সুরাট প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, তখনও পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের অস্তিত্ব ছিল না।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী গোলকুণ্ডাধিপতির অনুমতি লইয়া পুনরায় মসুলিপট্টনে এক কুঠি স্থাপিত করেন। এই ঘটনায় বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমবার ঐ স্থান ত্যাগ করিবার কারণ চিরদিন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিবে। তবে 'লাভজনক না হইবার' কথাটা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই ঘটনার অতি অল্প দিবস পরে এই নূতন কুঠি এ প্রকার উন্নতি লাভ করে যে, ঐ স্থানে এক নূতন প্রেসিডেন্সী স্থাপিত হয়। ডে সাহেব উহার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েন। এই প্রেসিডেন্সী সংস্থাপিত হইবার প্রধান কারণ এই, পূর্ব্ব উপকূলে তখন দুইটি কুঠি নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং অল্প দিনে উহাদের কার্য্যের প্রসার এমন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে যে, সুদূর সুরাট হইতে উহাদের সম্যক পর্য্যবেক্ষণ দিন দিন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ঠিক ঐ সময়ে মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী 'সেণ্ট থোম' নামক স্থানে পর্টুগীজগণের এক ক্ষুদ্র বাণিজ্য কুঠি ছিল। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোক্ত ডে সাহেব পর্টুগীজ-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেণ্টথোমে গমন করেন। ইংরাজের ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনই সুপ্রসন্ন। ঐ স্থানে ডের সহিত চন্দ্রগিরির রাজপুত নরপতির সাক্ষাৎ লাভ হয়। ইনি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বিজয় নগর রাজ্যের শেষ নরপতি রামরাজার বংশোদ্ভব। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে 'টেলিকোটার' কাল সমরে দাক্ষিণাত্যের পাঁচজন মুসলমান নৃপতির সম্মিলিত সৈন্যের নিকট বিজয়নগরাধিপ রাম রাজা নিহত হওয়াতে যখন ঐ রাজ্য চিরদিনের জন্য ধ্বংস হইয়া যায়, তখন তাঁহার এক পুত্র চন্দ্রগিরিতে আসিয়া এক ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ডে সাহেবের সহিত চন্দ্রগিরি রাজের বাণিজ্য সম্বন্ধে বহুবিধ কথোপকথন হয়। ইংরাজের পরাক্রমের কাহিনী তিনি পূর্ব্ব হইতেই বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন। এক্ষণে ডে সাহেবের সহিত আলাপ

পরিচয় হওয়াতে তিনি ইংরাজের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। তিনি বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে যে প্রকার অরাজকতার আবির্ভাব, তাহাতে ইংরাজের ন্যায় ক্ষমতাশালী বন্ধু লাভ করা বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। এই সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া তিনি ইংরাজকে স্বীয় রাজ্যে বাণিজ্য করিতে আহ্বান করিলেন। বলা বাহুল্য ইংরাজের ন্যায় বাণিজ্যপ্রিয় জাতি এমন মাহেন্দ্র সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। তদনুসারে ইংরাজ আরামগাঁওএর কুঠি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী "মান্দ্রাজপত্তনম্" নামক স্থানে এক নূতন কুঠি স্থাপন করিলেন। কেহ কেহ এই স্থানকে 'মদ্রসাপত্তনম্' নামে অভিহিত করিতেন। কুঠি স্থাপিত হইবার পর সনাতন নিয়মানুসারে ইংরাজ ইহাকে 'মান্দ্রাজ' বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিলেন।

তখন মান্দ্রাজের দৈর্ঘ্য ছয় ও বিস্তার এক মাইলের অধিক ছিল না বটে, কিন্তু তাহার জন্য ইংরাজকে বাৎসরিক ৬০০ পাউণ্ড কর দিতে হইত। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, ইংরাজ মান্দ্রাজ ক্রয় করেন নাই, লিস্ (lease) লইয়াছিলেন মাত্র। সহরের ঠিক সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। সহরের অবস্থা ঐ সময়ে এমন শোচনীয় ছিল যে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা 'সহর' নামে অভিহিত হইতে পারে না। পথ ঘাটের অস্তিত্ব ছিল না বলিলেও চলে। কয়েক ঘর দরিদ্র ব্যক্তি ভিন্ন উহার স্থায়ী অধিবাসী আর কেহ ছিল না। উহা ইংরাজের হস্তগত হইবামাত্র, সর্ব্বপ্রথম উহাকে উচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টন করা হয়। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত রাজপথ ও দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি অট্টালিকা সকল নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ স্থল অরাজকতায় পরিপূর্ণ। দক্ষিণ ভারতের বহুদূর হইতে নিপীড়িত ব্যক্তি সকল ঐ নবীন নগরে আসিয়া চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। বাণিজ্য ব্যাপদেশেও শত শত ব্যক্তি উহার মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যে নূতন সহর বেশ 'গুলজার' হইয়া উঠিল।

চন্দ্রগিরি অধিপতি শ্রীরঙ্গরাজ ইংরাজকে মান্দ্রাজ প্রদান করিবার সময় তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইলেন যে, ঐ স্থান তাঁহার নামানুসারে 'শ্রীরঙ্গরাজ পত্তনম্' নামে অভিহিত করিতে হইবে। ইংরাজকে অবশ্য ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। কিন্তু ঐ নাম অধিক দিন অবধি প্রচলিত ছিল না। চন্দ্রগিরি রাজের মৃত্যুর পর উহা পুনরায় মান্দ্রাজ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল।

ইংরাজের অভিপ্রায়ানুসারে মান্দ্রাজের লিজ পত্র একখানি হেম পত্রের উপর খোদিত হইয়াছিল। উহা বরাবর মান্দ্রাজেই রক্ষিত ছিল। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা যখন ঐ স্থান অধিকার করেন, তখন উহা অদৃশ্য হইয়া পড়ে। বহু অনুসন্ধানেও উহার কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চিঙ্গলিপুটপতি চন্দ্রগিরি অধিকার করিয়া লয়েন। তদনুসারে মান্দ্রাজ ও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তিনি আদেশ দেন যে, ভবিষ্যতে মান্দ্রাজ 'চেনাপত্তনম্' নামে অভিহিত হইবে। অবশ্য এ আদেশ প্রতিপালনে ইংরাজ বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তবে পূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের ন্যায় ইহাও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ সুরাট প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল। ইহার তত্ত্বাবধারণের জন্য একজন সেক্রেটারি নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহার বাণিজ্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়াতে ইহাকে একটি নূতন প্রেসিডেন্সিতে পরিবর্ত্তিত করা হয়। বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যায় যে সকল কুঠি স্থাপিত হইয়াছিল তাহা এই নূতন প্রেসিডেন্সির অধীন করা হয় (১৬৬৩)।

১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে সুরাট ভিন্ন অন্য কোনও প্রেসিডেন্সি ছিল না মসুলি পট্টনে এক প্রেসিডেন্সি স্থাপিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বঙ্গ দেশ, যুক্তপ্রদেশ, ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব্ব উপকূল স্থিত সমস্ত বাণিজ্য কুঠি সুরাটের অধীন ছিল

সে সময়ে গমনাগমনের অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। সংবাদাদি প্রেরণ করাও বিশেষ ব্যয় ও কষ্টসাধ্য ছিল। ইংরাজ বণিকগণকে দ্রব্যাদি আমদানি ও রপ্তানি করিতে নানাপ্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। ইহার জন্য তাঁহারা সাধ্যমত সমুদ্রতীরে বা কোনও বৃহৎ নদীর ধারে কুঠি নির্ম্মাণ করাইতেন।*

ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রব্যাদি অবশ্য এ সকল উপায়ে প্রেরণ করা সম্ভব ছিল না। তাহার জন্য সাধারণতঃ গো-শকট ব্যবহৃত হইত। সে সময়ে পথ ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল বলিয়া গাড়ীর সঙ্গে কয়েকজন পদাতিক সৈন্য থাকিত। অনেক সময় এ প্রকার সাবধানতা সত্ত্বেও পথিমধ্যে দস্যুরা সমস্ত দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লইত।

যাহা হউক, সংবাদাদি প্রেরণের এই প্রকার গোলযোগ নিবন্ধন ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতের সমস্ত ইংরাজ কুঠিকে দুইটি প্রেসিডেন্সীতে বিভক্ত করা হয়। দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সী মান্দ্রাজ নগরে স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে ইংরাজের কুঠি সকল যে প্রকার দূরে দূরে অবস্থিত ছিল এবং সংবাদ ও দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য যে প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তাহাতে দুইটি প্রেসিডেন্সীও পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় না। সে সময়ে সুদূর বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার কুঠি সকলের কার্য্য মান্দ্রাজের প্রেসিডেণ্ট যে কি প্রকারে সন্তোষজনক ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, তখনকার দিনে মফস্বলের কুঠি সকল নামমাত্র প্রেসিডেণ্টের অধীনে ছিল। অধিকাংশ কার্য্য যথেচ্ছা সম্পাদিত হইত।

এই স্থানে একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিদেশী লিখিত ইতিহাসে প্রায়ই শুনিতে পাই যে, মুসলমানদিগের সময় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা নামমাত্র দিল্লীর অধীনে থাকিয়া সম্পূর্ণ যথেচ্ছাচার করিতেন। ইহার জন্য ঐতিহাসিক মহাশয়েরা পাঠান ও মোগল সম্রাটদিগকে 'অকর্ম্মণ্য' 'আফিংখোর', 'অৰ্দ্ধ অসভ্য' প্রভৃতি সুমধুর বিশেষণে অভিহিত করিতে কোনও প্রকার কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। অতি বিস্ময়ের কথা! বৈদেশিক লেখকেরা নিজেদের দেশের ইতিহাস প্রণয়নে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য, দূরদর্শিতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দেন! কিন্তু ভারতের ইতিহাস লিখিবার সময় তাঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। তাঁহারা যদি ভারতের ঐ সময়কার সমস্ত অবস্থা বেশ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতেন, তাহা হইলে উপরোক্ত প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সে সময়ে এদেশে রেল বা টেলিগ্রাফের কোনও প্রকার অস্তিত্ব ছিল না। সেইজন্য দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের উপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা কোনও মতে সম্ভবপর ছিল না। তাঁহাদের সময় যদি এদেশে রেল ও তার থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা যে অন্য ভাবে শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিতেন না, এমত কথা অবশ্য কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। অনেকে হয় ত বলিবেন, এক সময়ে বিলাতেও ত রেল ও তার ছিল না, তবে সেখানে কি প্রকারে আমরা উন্নত প্রণালীর শাসন কার্য্য দেখিতে

* ঐ সময়ে নিম্নলিখিত উপায়ে পত্রাদি প্রেরণ করা হইত :—(ক) ডাক রণার—একটি লোক ডাকের দ্রব্যাদি লইয়া ১০ মাইল পথ পর্য্যন্ত গমন করিত। সেই স্থানে দ্বিতীয় একজন রণার অপেক্ষা করিত। প্রথম রণার দ্বিতীয়ের হাতে নিজের থলি প্রদান করিয়া তাহার হাতের থলি লইয়া ফিরিয়া আসিত। এইরূপ ১০ মাইল পথ হাতে হাতে গমন করিয়া সন্ধ্যার সময় যাত্রা বন্ধ হইত। যে স্থানে সন্ধ্যা হইত, সেখানকার প্রধানের হাতে থলি জমা করা হইত। (খ) ডাকের গাড়ী—সচরাচর ৮ মাইলের পর ইহার ঘোড়া বদল হইত। ইহা দিন রাত্রি সমভাবে চলিত। স্থান বিশেষে রাত্রিকালে গাড়ীর সহিত অশ্বারোহী প্রহরী গমন করিত। দেশের অর্থশালী ব্যক্তিরা এই ডাক গাড়ীতে গমনাগমন করিতেন। রণার প্রায় পত্রাদি বহন করিত। টাকা ও অন্যান্য দ্রব্য গাড়ীতে পাঠাইতে হইত। পত্রাদিও গাড়ীতে পাঠান হইত। কিন্তু তাহার জন্য অধিক মাশুল পড়িত। (গ) ডাক সওয়ার—ইহা অনেকটা প্রথমের ন্যায় চলিত। ১০ মাইলের পরিবর্ত্তে ১২ মাইল অন্তর সওয়ার ও অশ্ব পরিবর্ত্তন হইত। ইহা দ্বিতীয়ের ন্যায় দিবারাত্রি গমন করিত। বিশেষ আবশ্যকীয় সংবাদ এই উপায়ে প্রেরণ করা হইত। মুসলমানদিগের সময় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা (সুবেদারেরা) এই উপায়ে রাজকীয় সংবাদাদি সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিতেন।

পাই? তাহা সত্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রখর দৃষ্টি রাখা যেমন সহজসাধ্য, সুবিশাল ভারতে কথনও সেরূপ হইতে পারে না। এদেশে রেল ও তার না থাকিলে সুচারুভাবে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করা যে এক প্রকার অসম্ভব, তাহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে বেশ বুঝা যায়।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে পরিণত হইবার পর চন্দ্রগিরি রাজের অনুমতি লইয়া ইংরাজ তথায় এক অতি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করান। তাঁহাদের বাণিজ্য দেবতার নামানুসারে দুর্গকে তাঁহারা 'ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ' নামে অভিহিত করেন। ভারতের ইংরাজ বণিকের প্রথম ইতিহাসের অনেক কাহিনী এই দুর্গের সহিত জড়িত রহিয়াছে। ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপয়িতা ক্লাইভ এই দুর্গের এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া কোম্পানীর কেরাণীগিরি করিতেন—ভারতে ইহাই তাঁহার প্রথম কার্য্য। তাহার পর যখন ফরাসীরা মান্দ্রাজ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করেন, তখন কয়েকজন ইংরাজ কেরাণীকে লেখনী ত্যাগ করিয়া বাধ্য হইয়া অস্ত্র ধারণ করিতে হয়। ক্লাইভ তাঁহাদের অন্যতম। আবার যখন মান্দ্রাজ দুর্গ ফরাসীর হস্তে পতিত হয়, তখন 'মহাবীর' ক্লাইভই সর্ব্ব প্রথম দেশী সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিয়া ফোর্ট সেণ্ট ডেভিডে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মান্দ্রাজ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বটে, কিন্তু বন্দর হিসাবে ইহার বিশেষ সম্মান নাই। যে সকল বন্দর খাড়ীর (Bay or Gulf) উপর স্থাপিত, তাহাদিগকে সচরাচর প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়, কারণ ঝটিকার সময় জাহাজ সকল তথায় বিশেষ নিরাপদে অবস্থিতি করিতে পারে এবং তরঙ্গাঘাত উহাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। মান্দ্রাজে কোনও খাড়ী নাই—ইহা উন্মুক্ত সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। এইজন্য জাহাজ সকল এখানে নিরাপদে অবস্থান করিতে পারে না এবং তরঙ্গসমূহ এমন প্রচণ্ড বেগে তীরের উপর আসিয়া পতিত হয় যে, কোনও জাহাজই কূলের নিকট গমন করিতে পারে না। এই প্রবাহের শক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য ইংরাজ এখানে 'প্রবাহ-রোধক' (break-water) নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ সন্তোষজনক ফললাভ হয় নাই। এইজন্য মান্দ্রাজ দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দর বলিয়া পরিগণিত হয়। লোক সংখ্যা হিসাবে ইহা ভারতের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু বাণিজ্যে ইহার স্থান অনেক নিম্নে। ইহার কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—(১) ধান্য, গোধূম প্রভৃতি দ্রব্য মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে প্রচুর উৎপন্ন হয় না। যাহা হয়, তাহাতে এই দেশের অভাবও অনেক সময় মোচন হয় না। রপ্তানি করিবার জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। (২) বঙ্গদেশ ও বোম্বাইএর ন্যায় এদেশে পাট, শণ ও তুলার চাষ আদৌ হয় না। সুতরাং এখানে কল কারখানা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। (৩) এখানে অতি উৎকৃষ্ট লৌহের খনি আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কয়লার অত্যন্ত অভাব হওয়াতে ঐ লৌহ বিশেষ কাজে লাগে না। যদি বঙ্গদেশের মত এখানে কয়-লার খনি আবিষ্কৃত হইত, তাহা হইলে বাণিজ্য-জগতে মান্দ্রাজ অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিত।

যাহা হউক, এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও ইংরা-জের চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ে মান্দ্রাজ দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে। ইহার অর্থ ও লোক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। রেলওয়ে লাইন এই সহরকে ভারতের সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে ও দিতেছে। কল কারখানার সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। সভ্যতা ও উচ্চ শিক্ষায় মান্দ্রাজ কাহারও নিকট মস্তক অবনত করে না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বোম্বাই একটি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। কয়েকজন ধীবর ব্যতীত ঐ দ্বীপে আর কেহ স্থায়ী অধিবাসী ছিল না। তখন ভারতের পশ্চিম উপকূলে জলদস্যুর অত্যন্ত উপদ্রব! তাহারা উপকূলস্থ স্থানে অত্যন্ত অত্যাচার করিত। সময়ে সময়ে তাহারা সওদাগরদিগের বাণিজ্য জাহাজের বা মক্কাগামী যাত্রী জাহাজের উপর পতিত হইয়া সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত। মোগল ভূপতিরা চিরদিন সমুদ্র পথে নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন। রণপোতের বিশেষ আবশ্যক ছিল না বলিয়া তাঁহারা উহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। দস্যুগণের অত্যাচার কাহিনী মোগল শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ণগোচর হইত বটে, কিন্তু উপযুক্ত যুদ্ধ জাহাজ না থাকাতে তাঁহারা ঐ অত্যাচার প্রতিবিধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন না। সে সময়ে পর্টুগীজেরা পশ্চিম উপকূলে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। জলদস্যুরা মোগল শাসনকর্ত্তাদিগের উদাসীনতা দর্শনে শেষে এ প্রকার সাহসী হইয়া পড়িল যে, তাহারা পর্টুগীজগণের কয়েকখানা বাণিজ্য পোত লুণ্ঠন করিয়া লইল। তাহারা যে বিশেষ অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, তাহা তাহারা অবিলম্বে বুঝিতে পারিল। পর্টুগীজেরা দুই এক মাসের মধ্যে কয়েকখানা রণপোত সংগ্রহ করিয়া দস্যুগণকে এমন ভাবে ঘেরিয়া ফেলিলেন যে, দস্যুদিগের কয়েকখানা প্রধান জাহাজ ও কয়েকটি আশ্রয়স্থল তাঁহাদের হস্তগত হইল। ঐ সকল স্থানের মধ্যে বোম্বাই অন্যতম। উহা সাগরবেষ্টিত ও বন্দরের সম্যক উপযোগী বলিয়া দস্যুরা প্রায় মধ্যে মধ্যে তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিত।

পর্টুগীজেরা বোম্বাই হস্তগত করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, বোম্বাই শুধু যে সাগর বেষ্টিত তাহা নহে; ইহার তিন দিকে খাড়ী থাকাতে উহা প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত হইতে পারে। এই সময়ে পর্টুগীজদিগের মধ্যে কয়েকটি বিষম বিপদপাত হওয়াতে তাঁহাদের ঐ অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল না। ইহার অব্যবহিত পরে তাঁহারা ইংরাজের নিকট জলযুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে বোম্বাইএর কথাটা চাপা পড়িয়া যায়। তাহার পর আমার ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়াতে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার য়ুরোপ হইতে আগমন করিয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করিবার আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা কয়েক সপ্তাহ এই স্থানে অবস্থান করিয়া দেখিলেন যে, উহার জলবায়ু অত্যন্ত কদর্য্য। উহার সম্যক্ উন্নতি সাধন করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থ, অবকাশ ও চেষ্টার প্রয়োজন, সে সময়ে এদেশে পর্টুগীজদিগের মধ্যে তাহার অত্যন্ত অভাব ছিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে ঐ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে হইল।

১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডাধিপ দ্বিতীয় চার্লস্ পর্টুগালের রাজকুমারী ক্যাথেরিনের পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের প্রস্তাব হইবার সময় হইতে কোম্পানীর বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ চার্লস্‌কে পর্টুগালপতির নিকট হইতে বোম্বাই চাহিয়া লইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি বিবাহের পূর্ব্বে ঐ প্রার্থনা উপস্থিত করেন। পর্টুগালরাজ প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই, কিন্তু যখন বুঝিলেন যে, বোম্বাই কোনও দিন পর্টুগালের বিশেষ কোনও প্রয়োজন সাধন করিবে না, তখন তিনি উহা চার্লস্‌কে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে পৃথিবীতে পর্টুগালের অধীনে বহুবিধ উৎকৃষ্ট বন্দর ও নগর থাকা সত্ত্বেও বোম্বাইএর ন্যায় কদর্য্য একখানা ক্ষুদ্র গ্রাম গ্রহণ করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা কি নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন? ইহার উত্তর প্রদান করিতে হইলে আমাদিগকে আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক কথার অবতারণা করিতে হইবে।

সুপ্রসিদ্ধ আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের শীতল শোণিতে স্নান করিয়া ও পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া হিন্দুস্থানের রত্নময় ময়ূর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তিনি অবগত হইলেন যে, পর্টুগীজ জলদস্যুদিগের ভীষণ অত্যাচারনিবন্ধন পূর্ব্ববঙ্গের সমুদ্র তীরবর্ত্তী কয়েকটি জেলার প্রকৃতিপুঞ্জ এক প্রকার সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি ঐ দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিবার যথাসাধ্য আয়োজন করিলেন বটে, কিন্তু এই ঘটনায় তিনি সমস্ত য়ুরোপীয় বণিকদিগের প্রতি সাতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে তাঁহারা তাঁহার সাম্রাজ্যের কোনও স্থানে বিশেষ কোনও প্রাধান্য লাভ না করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংরাজ কোম্পানী

নবীন সম্রাটের এই অভিসন্ধির সন্ধান পাইয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঐ সময়ে বঙ্গদেশ, বেহার, উড়িষ্যা, আগ্রা, আজমীর, সুরাট, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে ইংরাজ অনেকগুলি বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত করিয়াছিলেন ও তথায় তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার চলিতেছিল। ইহার মধ্যে মান্দ্রাজ ও মসুলিপট্টম্ ব্যতীত অপর সমস্ত স্থানই মোগল সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। ঐ সকলের মধ্যে সুরাট প্রেসিডেন্সীর কেন্দ্রস্থল বলিয়া বিশেষ মুল্যবান বলিয়া পরিগণিত হইত। সমগ্র ভারতের মধ্যে এ প্রকার কুঠি ইংরাজের আর কোথাও ছিল না।

আর একটি বিশেষ কারণবশতঃ আওরঙ্গজেব ইংরাজকে সুরাট হইতে দূরীভূত করিতে বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। সে সময়ে মক্কাযাত্রীমাত্রকেই সুরাটে জাহাজে উঠিতে হইত। সকলেই জানেন, আওরঙ্গজেব কি প্রকার প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ছিলেন। সুরাটে ইংরাজের আধিপত্য দিন দিন প্রবল হইয়া পড়িতেছে বুঝিয়া সম্রাট নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ও যাহাতে ঐ বিদেশী বণিকদিগের সর্ব্বনাশ হয়, তদ্বিষয়ে সুযোগ ও কৌশল উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল সংবাদ যথাসময়ে ইংরাজের কর্ণগোচর হওয়াতে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, পূর্ব্ব হইতে সাবধান না হইলে তাঁহাদিগকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে—সময় থাকিতে সুরাট হইতে সরিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু উপযুক্ত স্থান কোথায়? পশ্চিম উপকূলে ইংরাজ বাণিজ্যের প্রসার তখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুরাট ছাড়িতে হইলে ঐ উপকূলেই এমন কোনও উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করিতে হয়, যাহা বাণিজ্যের সম্যক্ উপযোগী হইবে এবং মোগল সাম্রাজ্যের বহির্ভূত হইবে।

ইংরাজ বণিক যখন এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তখন বোম্বাই সহসা তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ঐ সময়ে ইংলণ্ড পর্টুগালের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ না থাকিলে ইংরাজ অনায়াসে উহা অধিকার করিয়া লইতেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইল। তাঁহারা প্রথমে বোম্বাই ক্রয় করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। পর্টুগীজেরা ইংরাজের পূর্ব্ব ব্যবহার অবশ্য এত শীঘ্র বিস্মৃত হয়েন নাই। তাঁহারা যখন জানিতে পারিলেন যে, ইংরাজের ঐ স্থান বিশেষ আবশ্যক, তখন তাঁহারা নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহা হস্তান্তর করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনই ইংরাজের সহচরী। ঠিক এই সময়ে দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ উপস্থিত হওয়াতে ইংরাজ কোম্পানী যে প্রকারে বোম্বাই হস্তগত করেন, তাহা আমরা বিবৃত করিয়াছি।

বোম্বাই স্বভাবতঃই সুরক্ষিত—ইহার চারিদিকে সমুদ্র; উপকূলের সহিত ইহার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নাই। এই দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে 'কোলাবা' অন্তরীপ ভারত মহাসাগরের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে। পশ্চিম প্রান্ত 'মালাবার' অন্তরীপে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই শেষোক্ত অন্তরীপ প্রকৃত পক্ষে আরব সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। এই দুই অন্তরীপের মধ্যে এক খাড়ী। দ্বীপের পূর্ব্ব দিকে 'ট্রম্বে' দ্বীপ। ট্রম্বে ও বোম্বাইয়ের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ 'বোম্বাই বন্দর' অবস্থিত। বোম্বাইএর উত্তর দিকে প্রাচীন সল্‌সেট্‌ দ্বীপ অবস্থিত। 'এলিফাণ্টা' বা 'হস্তী দ্বীপের' নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইহা বোম্বাই বন্দর ও ভারতের পশ্চিম উপকূলের মধ্যে অবস্থিত। প্রকৃত প্রস্তাবে বোম্বাইএর তিন দিকে তিনটি খাড়ী বা উপসাগর; এইজন্য ইহার ন্যায় বন্দর ভারতে আর নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে আওরঙ্গজেবের অত্যাচার আরম্ভ হইবার অনেক পূর্ব্ব হইতে ইংরাজের লোলুপ দৃষ্টি ইহার উপর পতিত হইয়াছিল। যখন ভারত মহাসাগরে পর্টুগীজেরা বিশেষ একাধিপত্যের সহিত বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তখন তিনখানি ইংরাজ ও ডচ্ রণতরী সুরাট হইতে বোম্বাই অভিমুখে রওনা হয়। ডচ্ সেনাপতি হার্‌মন্ ভ্যান্ স্পিউলট্ ঐ অভিযানের নায়ক নিযুক্ত হয়েন। পর্টুগীজদিগকে লোহিত সমুদ্র হইতে তাড়িত করিবার উদ্দেশে ইংরাজ ও ডচ্ মিলিত হইয়া ঐ অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু সহসা স্পিউলট্ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে ঐ অভিযান বিফল হয়।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে সুরাটের প্রেসিডেণ্ট বোম্বাই গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া ডিরেক্টরদিগকে এক সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। ডিরেক্টরেরা উহা বিলাতের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা ক্রমওয়েলের নিকট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু সে সময়ে তিনি নানা প্রকার গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে উহা কোনও সুফল প্রসব করে নাই।

দ্বিতীয় চার্লস বোম্বাই প্রাপ্ত হইবার পর আর্ল-অব-মার্লবরোকে পাঁচখানি রণতরীর সহিত উহা হস্তগত করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তদনুসারে তিনি খৃঃ ১৬৬১, ১৮ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই বন্দরে উপস্থিত হয়েন। পর্টুগীজেরা কিন্তু উহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে এবং মার্লবরোর সহিত উপযুক্ত সৈন্যবল না থাকাতে তিনি ইংলণ্ড ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়েন। যাইবার সময় তিনি কুক নামক জনৈক ইংরাজকে বোম্বাই সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিবার জন্য সুরাটে রক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মার্লবরোর নিকট সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া চার্লস্ পর্টুগালাধিপতিকে সমস্ত ঘটনা বিজ্ঞাপিত করেন। তাহাতে পর্টুগালরাজ ভারতের পর্টুগীজদিগকে অবিলম্বে বোম্বাই ইংরাজের হস্তে অর্পণ করিবার আদেশ দেন। তদনুসারে কুক সাহেব বোম্বাই গমন করেন। পর্টুগীজেরা কুককে নানা প্রকার পাকে চক্রে ফেলিয়া এমন করিয়া তুলিলেন যে, তিনি তাঁহাদের সহিত এক অতি লজ্জাজনক সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হয়েন। ইংলণ্ডপতি কুকের এ কার্য্যে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া লুকাস্ নামক একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে যথেষ্ট সৈন্যাদি সমভিব্যাহারে বোম্বাই প্রেরণ করেন (১৬৬৬)। তিনি আসিয়া নির্ব্বিবাদে উহা অধিকার করেন। এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে কাপ্তান গেরী তাঁহার পদে বোম্বাইএর প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়েন।

ইংলণ্ডাধিপ মনে করিয়াছিলেন, বোম্বাই হইতে তিনি বিশেষ লাভবান হইবেন।* কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বোম্বাইকে উৎকৃষ্ট বন্দর করিতে হইলে অপরিমিত অর্থের প্রয়োজন, তখন তিনি উহা কোম্পানির হস্তে প্রদান করিলেন। যে রাজকীয় সর্ত্তানুসারে, উহা প্রদত্ত হয় তাহার কিয়দংশ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল:—

In fee and common succage, as of the Manor of East Greenwich upon payment of annual rent of £10 in gold on the 30th of September in each year.

বাৎসরিক ১০ পাউণ্ড (১৫০ টাকা) খাজনায় চার্লস্ বোম্বাই নগর কোম্পানির হস্তে প্রদান করেন। বিস্ময়কর নহে কি? যে বোম্বাই আজকাল প্রত্যেক বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা উৎপন্ন করিতেছে, তাহার অবস্থা এক সময়ে কি শোচনীয় ছিল! যাহা হউক বোম্বাই কোম্পানির হস্তে প্রদত্ত হইবার পর সার জর্জ্জ অক্সেন্‌ডন্ উহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হয়েন।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে সিদ্দি নামক প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক দস্যু সম্প্রদায় বোম্বাই আক্রমণ করে, কিন্তু ইংরাজের আগ্নেয়াস্ত্রের নিকট তাহারা পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়ন করে। এই ব্যাপারে কোম্পানী বোম্বাইকে সুরক্ষিত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন। এই জন্য তাঁহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ডিরেক্টরেরা ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য আদেশ দেন যে, সুরাট প্রেসিডেন্সির সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারী সংখ্যা যেন অর্দ্ধেক হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক সৈন্য ও কর্ম্মচারীকে যে ডবল ভাড়া দেওয়া হইত, তাহাও বন্ধ করা হয়।

সুরাটের প্রধান সৌনক কর্ম্মচারী কেগউইন

* দ্বিতীয় চার্লস্ অতিশয় অর্থপ্রিয় ছিলেন। ডিরেক্টরদিগের প্রার্থনানুসারে তিনি বোম্বাই গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, বোম্বাই একদিন প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত হইতে পারে, তখন তিনি নানা প্রকার অছিলায় উহা কোম্পানীর হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হয়েন।

কর্ত্তৃপক্ষের এই ব্যবহারে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া বিলাত গমন করেন। এবং এ প্রকার যোগ্যতার সহিত উহার প্রতিবাদ করেন যে, ডিরেক্টরেরা পূর্ব্ব আদেশের অধিকাংশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়েন ও তাঁহাকেই পুনরায় সুরাট প্রেরণ করিলেন। কেগউইন্ সুরাটে ফিরিবার কিয়দ্দিবস পরে ডিরেক্টরেরা পুনরায় পূর্ব্বোক্ত আদেশ প্রদান করেন। কেগউইন্ কোম্পানীর এই কুটিল ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বোম্বাই গমন করিলেন ও প্রকাশ করিলেন যে, তিনি ও তাঁহার সৈনিকেরা ইংলণ্ডাধিপের অধীন, অতএব তাঁহারা কোম্পানীর আদেশ পালন্ করিতে বাধ্য নহেন। বোম্বাইএর অনেক ইংরাজ সওদাগর কেগউইনের এই বিদ্রোহ ব্যাপারে যোগদান করাতে সুরাটের প্রেসিডেণ্ট মহাশয় নিতান্ত ভীত হইয়া ঐ সংবাদ বিলাতে প্রেরণ করেন। ইংলণ্ডপতি কেগ-উইন্‌কে স্বহস্তে এক পত্র প্রেরণ করিয়া বিদ্রোহ ভাব ত্যাগ করিবার আদেশ দেন। তদনুসারে কেগউইন্ সার্ টমাস্ গ্রাণন্থামের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন (১৬৮৪, ১২ই নবেম্বর)। ইহার কিয়দ্দিবস পরে তাঁহাকে বন্দীভাবে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। তথায় তাঁহার কি অবস্থা হয় তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না।

কি প্রকারে প্রেসিডেন্সীর কেন্দ্রস্থল সুরাট হইতে বোম্বাইএ স্থানান্তরিত হয়, তাহার সবিশেষ কাহিনী আমরা বারান্তরে বিবৃত করিব।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

জন্মদিনে।*

হে বরেণ্য জন্মভূমির হে ঋষি প্রবর,
ব্রহ্মধ্যানে সিদ্ধ ওগো সত্যব্রত ধর।
গৃহ তপোবন হ'তে কি দিলে দেশেরে,
ঋষির সাধনা সিদ্ধ প্রচারি ওঙ্কারে।
মুক্তি পথ হেরে আহা দুঃখী তাপী জন,
জরা মৃত্যু অবহেলি লক্ষ্য মোক্ষ ধন।
ভেবনা হে সত্যব্রত ওগো মহাজন,
তোমার তপস্যা বৃথা হবেনা কখন।
তব মাতৃভূমি ওগো সত্যেতে মহান্,
এখানে যে ধর্ম্ম বীজ করে অর্ঘ্য দান।
তার কি সাধনা কভু বৃথা কি গো হয়,
সুজলা সুফলা ভূমি ব্রহ্মতেজোময়।
তোমার কঠোর তপ রয়েছে সঞ্চিত,
ভবিষ্য উজ্জ্বল ওগো গৌরব মণ্ডিত।

কত গার্গী কত মৈত্রেয়ী কত অরুন্ধতী,
রাবেয়া ও মীরা স্বাহা কত সত্যবতী।
যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি আর বশিষ্ঠ জনক,
কত শুকদেব ওগো ব্রহ্মজ্ঞ সাধক।
নবযুগে আসিছেন ব্রহ্মতেজোময়,
জগত সে শৌর্য্য হেরি মানিবে বিস্ময়।
উন্নত জাতির মাঝে বরণীয় হবে,
সত্য জ্ঞানে বিমণ্ডিত জাতীয় গৌরবে।
আনন্দিত হও ওগো শেষ সন্ধ্যাবেলা,
তোমার তপস্যা কভু হবে না বিফলা।
তপোনিষ্ঠ বিভুভক্ত সত্যের সেবক,
আজন্ম বিশ্বাসী তুমি দলি দুঃখ শোক।
বসন্তের পিকসম গাও বিভু যশ,
তোমার পশরা লবে ভবিষ্য তাপস।

শ্রীলীলা।

* ১৯এ মাঘ, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে পঠিত।

ইচ্ছাকুমারী।*

(১)

দিল্লু রাজার অতুল কীর্ত্তি দিল্লিনগরী। তাহার প্রনষ্ট গৌরব স্থাপনকারী বীলন দেব অনঙ্গ পালের শেষ বংশধর তুয়ার কেশরী জগদেব অনঙ্গপাল পীড়িত হইয়াছেন। জগদেব অনঙ্গপালের দুই কন্যা,—বিমলাবতী ও কমলাবতী, পিতাকে দেখিতে দিল্লি নগরে আগমন করিয়াছেন। বিমলাবতী জ্যেষ্ঠা, রাঠোর কুলতিলক বিজয়চন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। আজমীরাধিপতি সোমেশ্বর কমলাবতীকে বিবাহ করিয়াছেন। জগদেব অনঙ্গপাল অপুত্রক,—এই দুই কন্যাই তাঁহার বার্দ্ধক্য জীবনের সুখসন্দর্শন। সংযুক্তা,—বিজয়চন্দ্রের পৌত্রী, পিতামহীর সঙ্গে কান্যকুব্জ হইতে দিল্লী নগরে আগমন করিয়াছেন; আজমীরের যুবরাজ পৃথ্বীরাজও মাতার সঙ্গে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তা উভয়েই জগদেবের নয়নানন্দ পুত্তলী। কাজেই পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার মধ্যে গাঢ় ভালবাসার অভাব ছিল না; দুইজনে কত সময় জগদেবের গলা জড়াইয়া কত আনন্দ উচ্ছাসে উচ্ছ্বসিত হইয়াছেন।

পৃথ্বীরাজ প্রায় সকল সময়ই দিল্লী নগরে মাতামহের সন্নিকটে অবস্থান করেন, সংযুক্তা মাঝে মাঝে পিতামহীর সঙ্গে এ স্থানে আসিয়া থাকেন। আজ বহুদিন পরে দুই জনে একত্র হইয়াছেন, কিন্তু স্নেহশীল জগদেব অনঙ্গ পালের পীড়া নিবন্ধন দুই জনেই বিমর্ষ।

বিমলাবতী পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষায় লিপ্ত আছেন, এমন সময় জগদেব অনঙ্গপাল ক্ষীণ স্বরে বলিলেন,—পৃথ্বী কোথায় আছে, তাহাকে এখানে ডাকিয়া পাঠাও।

বহুক্ষণ অতীত হইল, পৃথ্বী আসিল না। অনঙ্গপাল পুনরায় বলিলেন,—পৃথ্বীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য এখানে কি কেহ নাই?

বিমলাবতীর হৃদয় নিহিত ঈর্ষা আজ পিতার সমক্ষে প্রধূমিত হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—বাবা, তুমি পৃথ্বীকে দেখিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ, কিন্তু জয়চন্দ্রকে কনোজ হইতে আনিবার জন্য তোমার কোন আগ্রহ দেখিতেছি না বরং জয়চন্দ্র স্বেচ্ছায় দিল্লী নগরে আগমন করিতে চাহিলেও তুমি বাধা প্রদান কর।

জগদেব অনঙ্গ পাল বলিলেন,—বিমল, তোমার এ প্রশ্ন কেমন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়, পৃথ্বী যেমন কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ক্ষত্রিয় গুণে বিভূষিত জয়চন্দ্র তেমন নয়। কাজেই আমি এ সময় আমাকে দেখিবার জন্য তাহার সসৈন্যে আগমন ভাল মনে করি না। উভয়েই আমার সমান স্নেহের; কিন্তু রাজ্যের কর্ত্তব্য কত গুরুতর তাহা তুমি কি বুঝিবে?

বিমলাবতীর ঈর্ষা এবার আরো উত্তপ্ত হইল। তিনি সবিষাদে বলিলেন—বাবা, তবে কি তুমি জয়চন্দ্রকে বঞ্চিত করিয়া পৃথ্বীকে তোমার উত্তরাধিকারী করিবে মনে করিয়াছ! আমি যে তোমার বড় কন্যা, পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠই যেমন রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তদনুরূপ আমি জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে ন্যায়তঃ কি এ সিংহাসন আমারই প্রাপ্য নয়? জয়চন্দ্রের প্রাপ্য ধন তুমি অন্যকে প্রদান করিয়া পাতকী হইতে চাও।

জগদেব অনঙ্গপালের মুখে চোখে কে যেন অগ্নিকণা মাখাইয়া দিল, তিনি ক্রোধ সংক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—বিমল, রাজ্য আমার, এ রাজ্য যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিয়া যাইব। সেই কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন পশুর করে কখনই আমি আমার রত্নসিংহাসন সমর্পণ করিয়া যাইব না। যে সিংহাসনের প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা

* ঐতিহাসিক পৃথ্বীরাসা, রাসমালা ও ভাটগাথা হইতে গৃহীত চিত্র।

করিতে সমর্থ হইবে, তাহাকেই এ সিংহাসন প্রদান করিব।

বিমলাবতী ঈর্ষা এবং অভিমানে আহত হইয়াছিলেন, তিনি উত্তেজিত ও গর্ব্বিত ভাবে বলিলেন—না, আপনাকে এ অন্যায় কিছুতেই করিতে দিব না!

জগদেব অনঙ্গপাল আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রোধ কম্পিত স্বরে বলিলেন,—এখনই তুমি আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে চলিয়া যাও। এ অভিশপ্ত মুখ যেন আর না দেখি।

সেই দিনই বিমলাবতী সংযুক্তাকে সঙ্গে লইয়া কনোজ যাত্রা করিলেন।

সেবার জগদেব অনঙ্গ পাল রোগমুক্ত হইলেন, এবং কিছুদিন পরে অতি সমারোহে পৃথ্বীরাজকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। অভিষেকের কিছুদিন পরে নিশ্চিন্ত মনে ভারতের বীর বরেণ্য জগদেব অনঙ্গ পাল স্বর্গারোহণ করিলেন।

মাতামহের রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইয়া জয়চন্দ্র স্বীয় মাতার প্ররোচনায় পৃথ্বীরাজের প্রতি বড়ই বিদ্বেষ ও ঈর্ষাপরায়ণ হইলেন। জগদেব অনঙ্গ পালের মৃত্যুর অল্পদিন পরে জয়চন্দ্র স্বীয় সৈন্যবাহিনী লইয়া দিল্লী সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজের দুর্দ্ধর্ষ সেনাবল প্রবাহে জয়চন্দ্রের সে চেষ্টা ভাসিয়া গেল।

ইহার কিছুকাল পর জয়চন্দ্র কয়েকটী দুর্গ লুণ্ঠন করিয়া কয়েক কোটী স্বর্ণমুদ্রার অধিপতি হন। সমস্ত উত্তর ভারতে তিনি একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অগণিত সৈন্যদল বহু সংখ্যক রাজন্যবর্গের ভীতিসঞ্চার করিয়া "দল পাঙ্গলা" নামে অভিহিত হইতে লাগিল; এবং এই "দল পাঙ্গলার" বিজয় গীতি ও সমৃদ্ধির কথা চাঁদকবি শত মুখে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কেবলমাত্র দিল্লীপ্রান্তে আসিয়া দল পাঙ্গলার বিজয় গর্ব্ব মন্ত্রৌষধি-মুগ্ধ সর্পের মত অবনত হইয়া পড়িত; তজ্জন্য পৃথ্বীরাজের প্রতি জয়চন্দ্রের ঈর্ষা শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

(২)

একদিন অনহিলপুর পাটনের রাজা ভোলাভীম-দেব রাজ সভায় বসিয়া আছেন, এমন সময় তীর্থযাত্রী একজন ভাট রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল।

রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তীর্থযাত্রা করিয়া তুমি কি কি দেখিলে?

ভাট ছন্দবদ্ধ করিয়া স্বীয় ভ্রমণ-কাহিনী গাহিতে লাগিল,—শেষে গাহিল—

"যাত্রা করতা ফরতা ফরতা
উতর্য্যা আবু দেশ;
চন্দ্রাবতী নু রাজা নানু,
বৈভব মাহি বিশেষ।
জেতশ্রী পরমারনে ত্যা
বরতে লীলা লের;
ইচ্ছারূপে অবতর্য্যাছে
লক্ষ্মী যেনে খের।
কুমু কুমু পগলা চালে পড়েছে
অঙ্গে বেকেছে বরাস;
চৌদ বরষণী চতুরাছে পণ
জানে সর্ব্ব বিলাস।
বহু বহু শু বরণবীএ এনু,
শেষণ পোচে রূপ;
সুবর্ণ জে হোয় সুগন্ধ
তেম রূপ গুণথী কুপ।

— তীর্থযাত্রা করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবু দেশে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। চন্দ্রাবতীর রাজা যদিও ছোট, কিন্তু তাহার বৈভব অশেষ। জেতশ্রী প্রম-রের ঘরে লীলা করিবার জন্য লক্ষ্মী ইচ্ছাকুমারীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন; চৌদ্দ বর্ষ বয়স্কা হইয়াও চতু- এবং সর্ব্ব বিলাস পরিজ্ঞাতা। তাঁহার চরণ ক্ষেপে কুঙ্কুম চিহ্ন অঙ্কিত হয় ও অঙ্গ হইতে রসাল ফুলের সুগন্ধ নির্গত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বর্ণনা করিব,—এ রূপের শেষ সীমা; সুবর্ণে যে সুগন্ধ হয়, এ তেমনি রূপ গুণের আধার।

ইচ্ছাকুমারীর এবম্বিধ রূপ গুণের বর্ণনা শ্রব- করিয়া রাজা মোহিত হইলেন এবং অবিলম্বে ইচ্ছা- কুমারীর পাণিগ্রহণ প্রার্থনাসহ অমরকোষের গ্রন্থক- অমরসিংহকে চন্দ্রাবতী নগরে প্রেরণ করিলেন।

অমরসিংহ চন্দ্রাবতীতে পৌঁছিয়া ভীমভোলার প্রার্থনা জেতশ্রী রাজার নিকট জ্ঞাপন করিলেন।

জেতশ্রী বলিলেন—আজমীরের যুবরাজ ও বর্ত্তমান দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের সহিত বাক্‌দত্তা, নতুবা গুর্জ্জরেশ্বরের করে কন্যা সমর্পণ ত গৌরবের কথা।

অমরসিংহ কহিলেন,—যখন গুর্জ্জরেশ্বর এ কন্যা চাহিয়াছেন, তখন তাঁহাকে এ কন্যা অর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত নতুবা গুর্জ্জরেশ্বরের করে আপনার কি দুর্দ্দশা হইতে পারে চিন্তা করুন। চন্দ্রাবতী ধ্বংস করিয়া ভীমদেব ইচ্ছাকুমারীকে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না; বিশেষতঃ আপনি তাহার অধীন রাজা।

জেতশ্রী ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন,—জেতশ্রী ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ভোলে নাই। অন্যের বাক্‌দত্তা কন্যাকে আমি কিছুতেই ভীমদেবের করে সমর্পণ করিতে পারি না; সামর্থ্য থাকে তিনি গ্রহণ করুন।

অমরসিংহ ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পাটনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ভোলাভীম দেবকে সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

ভোলাভীম দেব নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রাবতী আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

প্রমার রাজ জেতশ্রী অমরসিংহকে বিদায় দিয়া নিজ রাজ্য ও কুলমান রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; এবং সমস্ত সংবাদ আজমীরের রাজা সোমেশ্বরকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

সোমেশ্বর জেতশ্রীর পত্র পাইয়া যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিলেন এবং স্বীয় পুত্র পৃথ্বীরাজকে আজমীর রক্ষা ও সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান জাতির উৎপাত দমনের জন্য দিল্লীতে পত্র প্রেরণ করিয়া আবু রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

(৩)

এদিকে জেতশ্রী সোমেশ্বরের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া ইচ্ছাকুমারীকে অচলগড় দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন। অচলগড় দুর্গে আসিয়া ইচ্ছাকুমারী বড়ই চিন্তান্বিতা হইলেন। অবশেষে তিনি একখানি পত্র লিখিয়া একজন ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহা আজমীরে পৃথ্বীরাজের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পাঠাইবার পর অনেক দিন অতীত হইল, তবু উত্তর লইয়া ব্রাহ্মণ ফিরিতেছে না দেখিয়া ইচ্ছাকুমারী বড়ই চিন্তিতা হইলেন।

একদিন ইচ্ছাকুমারী দুর্গ প্রান্ত সান্নিধ্য মনোরম উদ্যানে বসিয়া নৈসর্গসুন্দরীর শোভা অবলোকন করিতেছেন; দিক্‌চক্রবাল মহাবলী অংশুমালী সর্ব্ব গৌরব বিগত মহারাজার ন্যায় পরিম্লান হইয়া ধূসর বসনে দেহ আবৃত করিয়া বাণপ্রস্থ যোগীর মত অরণ্যের ঘনচ্ছায়ার অন্তরালে প্রবেশ করিতেছিল, উদ্যান স্থিত সরোবর সলিলে কহ্লাররাজি মহাযোগীর শেষ সম্ভাষণ গ্রহণ করিতেছিল। ইচ্ছাকুমারীর অন্তঃকরণে প্রাকৃতিক এ সমস্ত দৃশ্য কিছুমাত্র প্রতিফলিত হয় নাই। তাঁহার মনে শত চিন্তা-ঊর্ম্মি কেবলি উঠিতেছিল। একটী অবলা নারী তাহার সমস্ত প্রাণ যাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে তিনি কি তাহা অবগত নন? হয় ত তাঁহার শত কাজ রহিয়াছে। সেজন্য কি তাঁহার বাক্‌দত্তা পত্নীকে বিপদ হইতে উদ্ধার করা তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তবে কি পৃথ্বীরাজ তাহার প্রতি অনুরক্ত নন। এমনি শত চিন্তা ইচ্ছাকুমারীর মনে তোলপাড় করিতেছিল।

এমন সময় ইচ্ছাকুমারী দেখিতে পাইলেন, তিন জন অশ্বারোহী পর্ব্বত পাদমূল হইতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন। কে তাঁহারা? মনে মনে নানা তর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনজন অশ্বারোহী দুর্গের সন্নিকট স্থানে উপস্থিত হইলেন। এতদিন যে চিত্রখানি ইচ্ছাকুমারীর মুগ্ধ হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিয়াছে, অগ্রবর্ত্তী সুঠাম সুন্দর যুবাপুরুষ তাহারই সজীব প্রতিকৃতি,—যুবরাজ পৃথ্বীরাজ,—কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তিনজন অশ্বারোহী সিংহদ্বার পথে অচলগড় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ইচ্ছাকুমারীর মনে শত আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইল। পৃথ্বীরাজ, চাঁদ কবি ও রাম রায় দুর্গে সাদরে গৃহীত হইলেন। দুরাশা স্বপ্ন মগ্ন অচলগড় দুর্গে আনন্দের কলরব বাজিয়া উঠিল।

সুশোভিত দরবার গৃহে অতিথি ত্রয়ের বিশ্রাম স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

পরদিন প্রভাতে একজন পরিচারিকা আসিয়া পৃথ্বীরাজকে রাজ অন্তঃপুরে আগমনের সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

পৃথ্বীরাজ অনতিবিলম্বে রাজ অন্তঃপুরে নীত হইয়া একটী রত্নখচিত আসনে উপবেশন করিলেন। ইচ্ছাকুমারী সহচরীবৃন্দসহ সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। সহচরীবৃন্দ সুললিত ভাষায় রাজকুমারীর আশু বিপদের সম্ভাবনা যুবরাজকে জানাইল।

পৃথ্বীরাজ উত্তর করিলেন, আমি যখন আসিয়াছি যথাবিহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব, চিন্তার কিছুই নাই।

সেই সুশোভিত কক্ষে অনেকগুলি চিত্র ছিল, একটী চিত্রের প্রতি পৃথ্বীরাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। চিত্রখানি—সুভদ্রার পরিণয়। রথোপরি অর্জ্জুন ধনুকে টঙ্কার দিতেছেন, সুভদ্রা দৃঢ় হস্তে অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; নক্ষত্রবেগে রথ ছুটিতেছে, বায়ুবেগে সুভদ্রার অঞ্চল ও কেশপাশ উড়িতেছে, সুভদ্রা ভ্রূভঙ্গীতে অর্জ্জুনের অদ্ভুত রণকৌশল নিরীক্ষণ করিতেছে, অর্জ্জুনের ওষ্ঠাধর টিপি টিপি হাসিতেছে আর দ্বিগুণবেগে ধনুকে শর যোজনা করিতেছে। রথস্তম্ভে দারুক বন্ধন দশায় অবস্থিত। রথ নিম্নে অগণ্য যাদব সেনানী, একা অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিতে পারিতেছে না। দূরে দ্বারকা নগরী দেখা যাইতেছে, দুর্গশিরে বিজয়কেতন উড়িতেছে।

পৃথ্বীরাজ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চিত্রখানি দেখিয়া সহর্ষে বলিলেন;—দেখুন, অর্জ্জুন কিরূপ কৌশলে প্রেমকে সফল ও কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, সুভদ্রার পরিণয় ও গান্ধর্ব্ববিধান সমন্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

এস্থলে পৃথ্বীরাজের সহিত ইচ্ছাকুমারীর তদ্রূপ পরিণয় সাধিত হইলে পৃথ্বীরাজ স্বীয় ধর্ম্মানুগত স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইতে পারেন, তাহাতে যুদ্ধের অনলও নির্ব্বাপিত হইতে পারে, তাহা জানাইলেন।

উভয়পক্ষই এ প্রস্তাবে সম্মত হইল, পরদি[ন] পৃথ্বীরাজের সহিত ইচ্ছাকুমারীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। অতঃপর পৃথ্বীরাজ স্বীয় সহধর্ম্মি[ণী] ইচ্ছাকুমারীকে স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া বন্ধুযুগল চাঁদ কবি ও রাম রায়ের সঙ্গে দিল্লী নগরে প্রত্যাগ[ত] হইলেন।

ইহার পর সীমান্তপ্রদেশ হইতে মুসলমান সৈন্য দিগকে বিদূরিত করিবার জন্য পৃথ্বীরাজ স্বসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সোমেশ্বর জেতশ্রী প্রমারকে রক্ষা করিবার জ[ন্য] আবুর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইতি পূর্ব্বেই ভোলা ভীমদেব বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া আবু ধ্বংস করি[য়া] সোমেশ্বরের সৈন্যবাহিনার সন্মুখবর্ত্তী হইলেন। ভোলা ভীমদেবের আহ্বানে তাঁহার অধীন বহু রাজন্য[বর্গ] আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন।

কিয়ৎ দিবসের মধ্যে এই বিপুল অনিকি[নী] আরাবল্লী পর্ব্বত পাদদেশস্থ হিন্দুগৌরব সূর্য্য মহা[...] নরপতি বিশালদেব প্রতিষ্ঠিত "বিশালকাতালাও" বিশাল সরোবরের তীরে শিবির সন্নিবেশ করিল।

এই স্থানে সম্বরের মহানুভব বৃদ্ধ নরপতি রাজন্য বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

আমরা হিন্দুজাতি বৃথা আত্মকলহ দ্বারা দুর্ব্বল নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছি; আমাদের পূর্ব্ব দুর্ব্বলতা[র] সুযোগে মাহ্‌মুদ গজনী ১৭ বার ভারত বক্ষে পদাঘাত করিয়া গিয়াছে। পুনরায় আমরা শক্তিসঞ্চয় [...] ক্ষমতাশালী হইয়াছি। ক্ষুদ্র গজনী নগরে পুন[রায়] মুসলমান জাতি বলবান হইয়া উঠিতেছে এবং লোলুপ নয়নে স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করি তেছে। আমাদের দুর্ব্বলতার সুযোগে পুনরায় তাহারা ভারতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিবে[...] এখন আমরা শক্তিশালী, একতার বলে আ[মরা] অনায়াসেই গজনী নগর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া হি[ন্দু] আধিপত্য ও গৌরব পুনঃ স্থাপন করিতে পারি[...] পূর্ব্বকালের ভীম, অর্জ্জুন, কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতির ক[থা] স্মরণ করুন। আমাদের সেই পূর্ব্বতন হিন্দু [গৌরব] ফিরাইয়া আনিতে হইলে আমাদিগকে একতার [...]

[...]ণী হইতে হইবে এবং সর্ব্বদা আত্মকলহ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু গৌরব স্থাপনে এক প্রাণ হইতে হইবে। আসুন আমরা নিরর্থক সোমেশ্বরের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলে সম্মিলিত হইয়া গজনী অভি-[মু]খে যাত্রা করি।

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত রাজন্য নীরব ও চতুর্দ্দিক গভীর নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন হইল। ভীমভোলা ভ্রূকুটী ও গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—বুঝিয়াছি, সম্বরের বৃদ্ধ রাজার আন্তরিক অভিপ্রায় সোমেশ্বরকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করা; কাজেই তাহার এই যুদ্ধে এত অনিচ্ছা।—সত্যই যদি তিনি আমাদের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া সোমেশ্বরের সহিত [মি]লিত হইতে চান, অবিলম্বে তাহাই করুন। কোন [রাজ]দ্রোহী নরপতিকে আমি স্বায় দলভুক্ত রাখিতে চাহি না। সম্বর নরপতি কি আমাদিগকে এতই দুর্ব্বল [ম]নে করেন, যে মুসলমান রাজারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। আমরা যে কোন সময় গজনী নগর আক্রমণ করিয়া মুসলমান [শ]ক্তি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করিয়া দিতে সমর্থ। আবশ্যক হইলে আমরা এই যুদ্ধের পরও গজনী নগর ধ্বংস করিয়া দিতে পারিব। বৃদ্ধ বয়সে নরপতির [যু]দ্ধে অনিচ্ছাও স্বাভাবিক, যদি তিনি এই যুদ্ধে [ভী]ত হইয়া থাকেন, সত্বর তিনি যুদ্ধ ভূমি পরিত্যাগ [ক]রিয়া সম্বরের রাজ-অন্তঃপুরে গমন করুন।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কয়েকজন রাজা উচ্চ [হা]স্য করিয়া উঠিলেন। কয়েকজন রাজা প্রকাশ্যে [ভী]মভোলার বাক্যের সমর্থন করিলেন। কয়েকজন [রা]জা সম্বর নরপতির মতানুবর্ত্তী হইলেও নীরব [র]হিলেন।

বৃদ্ধ সম্বরপতির মুখমণ্ডল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের [ন্যা]য় রক্তিম আকার ধারণ করিল। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে দরবিগলিত ধারে অশ্রুরাশি প্রবাহিত হইতে লাগিল

সম্বরপতি শোকাভিভূত কণ্ঠে উত্তর করিলেন,—বুঝিলাম, হিন্দুজাতির পূর্ব্ব গৌরব স্থাপনের আশা দুরাশা মাত্র। বুঝিলাম, হিন্দুজাতির পতন অবশ্যম্ভাবী—দুর্ভাগা ভারতবর্ষ! ভারত জননী! তোমার দুর্ভাগা সন্তাগণ।

ইহারপর সম্বরপতি দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন,—রাজন, বৃদ্ধ হইলেও আমায় শরীরের অণুতে অণুতে প্রকৃত ক্ষত্রিয় তেজ বিরাজিত। আপনাদের গর্ব্বোচিত বাক্যের কোন উত্তর দিতে চাহি না, সময় তাহা প্রত্যক্ষ করিবে,—আমি বৃদ্ধ। এই যুদ্ধে আমি ই প্রথম আক্রমণ করিব এবং প্রকৃত ক্ষত্রিয় তেজের সেখানেই পরিচয় পাইবেন।

এই বাক্য শ্রবণে ভোলা ভীমদেব * মনে মনে নিরতিশয় সুখী হইলেন। তৎপর দিবস নরপতি ভীমভোলা বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া সোমেশ্বরের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। উভয় পক্ষে তিন দিবস অনবরত যুদ্ধ চলিল; কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না, চতুর্থ দিনে সোমেশ্বর ভীম ভোলার সৈন্যদলের গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। সোমেশ্বর স্বকীয় স্থান হইতে ক্রমেই বিচ্যুত হইতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহার পরিরক্ষিত উচ্চ স্থান ভোলা ভীমদেব অধিকার করিলেন। অতঃপর উভয় দলে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। বীরপ্রাণ সোমেশ্বর যুদ্ধ করিতে করিতে রণাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করিলেন।

উভয় পক্ষে সৈন্য সংখ্যা বহুল হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। অগণিত নিহত সৈন্যে রণস্থল পূর্ণ হইল। যুদ্ধ বিজয় শেষে ভীমভোলা শুনিলেন, তাঁহার আশার কুসুম গলায় পরিয়া পৃথ্বীরাজ দিল্লি চলিয়া গিয়াছেন, তখন ভীম ভোলা আর অগ্রসর হইলেন না, নিরাশ মনে স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

* * * *

পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পৃথ্বীরাজ নিরতিশয় শোকাকুল হইলেন, এবং ভীমভোলাকে উপযুক্ত

* গুর্জ্জররাজ দ্বিতীয় ভীমদেব ইতিহাসে ভীমভোলা নামে প্রসিদ্ধ। ভোলা শব্দের অর্থ খামখেয়ালী বা পাগলা! এই প্রতাপান্বিত নরপতির দীর্ঘ রাজত্বকাল তাঁহার নানা খামখেয়ালী কার্য্যে পূর্ণ। তন্মধ্যে ইচ্ছাকুমারী লইয়া বিবাদ অন্যতম!

প্রতিফল দিয়া যুদ্ধ বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ এখন দিল্লি ও আজমীর উভয় রাজতক্তের ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। স্বীয় ভগিনী পৃথ্বার সহিত ইতঃপূর্ব্বেই চিতোরেশ্বর সমরসিংহের পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহ উভয়েরই পরম বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

(৪)

জয়চন্দ্র মাতামহের রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইয়া ও পৃথ্বীরাজকে বিদলিত করিতে অসমর্থ হইয়া ভারতীয় অন্যান্য রাজন্যবর্গের নিকট স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াসী হইলেন, এবং আত্মগর্ব্বে স্ফীত হইয়া নিজকে একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল, উক্ত পত্রে ইহাও লিখিত হইল, অলোকসামান্যা রূপবতী রাজকন্যা সংযুক্তা যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্নের পর স্বয়ম্বরা হইবেন।

চারিদিক হইতে রাজন্যবর্গ কনোজরাজ সভায় সম্মিলিত হইতে লাগিল। বহুবর্ষ পরে ভারতে এ দৃশ্য সম্ভবপর হইল। যেন পাণ্ডব গৌরব আজ বহু বর্ষ পরে ধূলি শয্যা বিমোচন করিয়া রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া বসিল। এবার উৎসব অন্তে জয়চন্দ্র ভারতের সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী রূপে পূজিত হইবেন; সহস্র রাজার সৈন্য অশ্ব গজ পতাকায় কনোজ নগরী এক অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে। যোজন যোজন ব্যাপী যজ্ঞশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। অসংখ্য রত্নরাজীতে মণ্ডিত হইয়া কনোজ রাজসভা ইন্দ্রপুরার ঐশ্বর্য্যকেও বুঝি পরাস্ত করিয়াছে।

অশেষ আয়োজন ও বিপুল আনন্দ উৎসব সহকারে যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন হইল। অগণিত রত্নমাণিক্য ঝালর সুশোভিত, পুষ্প-পল্লব গন্ধ বিলেপিত, রত্নসিংহাসনরাজির ঐশ্বর্য্য আলোকিত স্বয়ম্বর সভায় সমস্ত রাজন্যবর্গ আগমন করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন। সেই বিরাট মণ্ডপের দ্বারদেশে নিমন্ত্রণপত্র উপেক্ষক দুইজন রাজা,—মহারাণা সমরসিংহ এবং দিল্লী ও আজমীরপতি পৃথ্বীরাজের স্বর্ণমূর্ত্তি স্থাপিত করা হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারী সংযুক্তা অপূর্ব্ব রত্নসজ্জায় সজ্জিত হইয়া কুঙ্কুম, চন্দন, পুষ্পমাল্য ও বরণডালা লইয়া রাজ সভায় উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে কয়েকজন পরি চারিকা ও সখী। রাজকুমারী একে একে সম রাজার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বিরাট মণ্ডপ প্রদক্ষি করিলেন। ভাটগণ স্ব স্ব প্রভুর কুল যশ ও বীরত্ব অপূর্ব্ব ছন্দে বর্ণনা করিতে লাগিল। এদি রাজকুমারী একে একে সমস্ত রাজাকেই প্রত্যাখ্যা করিয়া চলিয়া গেলেন। শেষে দ্বারদেশে উপস্থি হইয়া সুবর্ণ নির্ম্মিত পৃথ্বীরাজের দ্বারামূর্ত্তির গলদেশে বরমাল্য পরাইয়া দিলেন!

সেই মুহূর্ত্তে পৃথ্বীরাজ সেই স্থানে উপস্থিত হই সংযুক্তাকে সঙ্গে লইয়া বহির্ভাগে সজ্জিত অ আরোহণ করিয়া বায়ুবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন।

নগরীর কিয়দ্দূরে পৃথ্বীরাজের কিছু সৈন্যমণ্ড সজ্জিত ছিল। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লইয়া যাদব সৈ তরঙ্গ ভেদ করিয়া বিদ্যুতের মত যেমন খেলি গিয়াছিলেন, পৃথ্বীরাজ ও তদ্রূপ সমস্ত রাজন্যবর্গে আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিল্লী অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

তন্মুহূর্ত্তে জয়চন্দ্রের রাজচক্রবর্ত্তীর নিশান খসি পড়িল। বিস্ময়স্তব্ধ রাজন্যবর্গ অবিলম্বে ক্রোধ সংক্ষুব্ধ হইয়া যুদ্ধার্থ মণ্ডপের বাহিরে আসিলেন।

কালীনদীতীরে পঞ্চ দিবস ব্যাপিয়া পৃথ্বীরাজে সৈন্যমণ্ডলীর সহিত সমস্ত রাজন্যবর্গের সম্মিলি সৈন্যের যুদ্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ সৈন্যের পরিচাল গিহ্লোট বংশীয় গোবিন্দ সিংহ এবং আশীর গ গম্ভীর সিংহ ও হামার সিংহ বীর ভ্রাতৃদ্বয় অ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে তবুও পৃথ্বীরাজের সৈন্য মণ্ডলী বিজয়ী হইয়া দিল্লী প্রত্যাগত হইল।

সার্ব্বভৌম নরপতির সমস্ত আশা অন্তর্হিত হই ক্ষুব্ধ অপমানিত জয়চন্দ্র প্রতিশোধ লইবার উ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

হায়! ভ্রাতৃবিচ্ছেদক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ!

(৫)

কনোজ বিজয়ের যজ্ঞফল আহরণ করিয়া পৃথ্বীরাজ ভারতের সার্ব্বভৌম নরপতিরূপে পরিগণিত হইলেন। কিন্তু ভারতের অন্তরক্ষেত্রে তপ্তঈর্ষার বীজ অতি সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। কনোজ রাজ ভারতের সমস্ত আশার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন;—স্বীয় কৃত যজ্ঞফল হইতে এমন হলাহল উঠিবে কে জানিত?

কালীনদী তীরের যুদ্ধে জয়লাভের কিছুদিন পরে পৃথ্বীরাজ জানিতে পারিলেন, জয়চন্দ্রের প্ররোচনায় গুর্জ্জর রাজ বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া আবু পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আজমীর আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন। অবিলম্বে পৃথ্বীরাজ স্বীয় সৈন্যবাহিনী লইয়া আবুর দিকে অগ্রসর হইলেন। গুর্জ্জর প্রান্তে উভয় দলে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ভীমভোলার বিশাল সৈন্যবাহিনী অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কয়েকদিন যুদ্ধের পর ভীম ভোলার সৈন্যদল পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইল। পৃথ্বীরাজ তাঁহার অনুসরণ করিয়া গুজরাত মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অগত্যা নিরুপায় হইয়া ভীমভোলা ভীষণ সমরের জন্য প্রস্তত হইলেন। পুনরায় সমর আরম্ভ হইল; উভয় পক্ষে অগণিত সৈন্য বিনষ্ট হইল; তৎপর ভোলাভীম দেব সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন, বন্দি হইবার ভয়ে পূর্ব্ব হইতেই তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ভীমভোলার যাবতীয় সৈন্য বিধ্বস্ত ও তাঁহার রাজপতাকা রাজহস্তী ও বহুমূল্য সাজসরঞ্জাম পৃথ্বীরাজের হস্তগত হইল।

পৃথ্বীরাজ ভীমভোলার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু ইত্যবসরে ভীমভোলা গুর্জ্জরের শেষ প্রান্ত কাচ্ছে উপনীত হইয়া নূতন সৈন্যবল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরিশ্রান্ত সৈন্যবাহিনী লইয়া পৃথ্বীরাজ আর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না; পৃথ্বীরাজ জয়ী হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রভূত সেনাবল হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, অবশিষ্ট সেনা লইয়া তিনি আজমীর ফিরিয়া আসিলেন।

চাঁদ কবি এই যুদ্ধ বর্ণনা-গীতি সুললিতচ্ছন্দে বর্ণনা করিয়া অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। চাঁদ কবি স্বীয় প্রভুর যশগাথা গাহিতে গিয়া ভোলাভীম দেবকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত করিয়া যশ গৌরব আরো বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজ গুর্জ্জর যুদ্ধ জয়ের পর আজমীর প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন, গজনী নগরের সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া পাঞ্জাব প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। পৃথ্বীরাজ অবিলম্বে পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সম্মিলিত সৈন্যসহ যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

তিরৌরীক্ষেত্রে উভয় দল সম্মিলিত হইল। সাহাবুদ্দিন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া আপন অনুচরের অদ্ভুত কৌশলে কেবলমাত্র দুইটী অঙ্গুলী বিসর্জ্জন দিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

পৃথ্বীরাজ বিজয় উল্লাসে উল্লসিত হইয়া দিল্লী নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ইহার দুই বৎসর পর সাহাবুদ্দিন পুনরায় সৈন্যবাহিনী লইয়া পাঞ্জাব প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পৃথ্বীরাজ পার্শ্বস্থ রাজন্যবর্গ সমভিব্যাহারে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

কাগার নদীর অপর তীরে সাহাবুদ্দিন স্বীয় সৈন্য মণ্ডলী সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ স্বীয় সৈন্যবাহিনীসহ নদীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সাহাবুদ্দিনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি জন্য তুমি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন ও এতগুলি সেনানীর রক্তে ধরাতল সিক্ত করিতে পুনরায় আসিয়াছ?

সাহাবুদ্দিন সানুনয়ে পৃথ্বীরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন,—এবার তাঁহার যুদ্ধ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, গজনী নগরে তিনি দূত প্রেরণ করিয়াছেন, আগামী কল্যই তাঁহার অভীপ্সিত উত্তর আসিয়া পৌছিবে, পত্র পাইলেই

তিনি জন্মের মত ভারত পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, প্রার্থনা, আজ যেন পৃথ্বীরাজ অনুগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধ স্থগিত রাখেন।

পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দিনের বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিলেন এবং নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে কাগারের অপর তীরে সৈন্যমণ্ডলী লইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। স্বল্প সলিলবাহিনী কাগার নদী মাত্র উভয় সৈন্যদলের মধ্যে ব্যবধান রহিল।

অন্ধকার রাত্রি—গভীর। পৃথ্বীরাজের সৈন্য সকল যখন সুপ্ত, তখন সাহাবুদ্দিন স্বীয় সৈন্যবাহিনী লইয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পার হইয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পৃথ্বীরাজের সুপ্ত সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলেন। আকস্মিক বিপ্লবে জাগরিত হইয়া অস্ত্রবিহীন অবস্থায় পৃথ্বীরাজের বহু সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল।

কয়েক ঘণ্টা এই প্রকার যুদ্ধের পর রাত্রির কুহেলিকা বিদূরিত হইয়া অরুণ জ্যোতিঃ রেখা পূর্ব্ব গগনে দেখা দিল।

সেই সময় পৃথ্বীরাজের সৈন্যদল কতক সংযত হইয়া এবং আত্মপক্ষ ও পরপক্ষ নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়া ভীষণ তেজে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ক্ষুধা তৃষ্ণা বিরহিত হইয়া উভয় দল সমভাবে যুদ্ধ করিল। পৃথ্বীরাজের সৈন্য শৃঙ্খলতার অভাবে দৃঢ় শ্রেণীবদ্ধ মুসলমান সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না।

একে একে সমস্ত বীরপ্রাণ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ একাকী একটী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সকলের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অসীমতেজে যুদ্ধ করিতেছিলেন; সারাদিনের যুদ্ধের পর তাঁহার সমস্ত অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইল এবং দরবিগলিত ধারে শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল; তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন এবং তদবস্থায়ই মুসলমান করে বন্দী হইলেন।

যোগীন্দ্র সমর সিংহের পুত্র যুবরাজ কল্যাণ সিংহ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাও পূজন অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরানলে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

অবশিষ্ট সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে স্বীয় প্রভুর অনুসরণ করিল।

এই যুদ্ধ জয়ের পর সাহাবুদ্দিন দিল্লী বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। ইচ্ছাকুমারী তদীয় পুত্র রণসিংহ সহ মুসলমান সমরে অবগাহন করিয়া নারী মহিমা সমুজ্জ্বল করিলেন।

সংযুক্তা ও পুরমহিলাগণ জহর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

* * * * * *

কয়েক বৎসর পর মুসলমান সৈন্য আজমীর আক্রমণ করিল। পৃথ্বীরাজের খুল্লতাত ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় আজমীরের দুর্ভেদ্য তারাগড় দুর্গ মুসলমান সৈন্যের করায়ত্ত হইল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

সময়।

চঞ্চল লহরী সম জীবনের ক্ষণ গুলি
যেতেছে ছুটিয়া,
মরনের দিনটীও এইরূপে ক্রমে ক্রমে
আসে ঘনাইয়া,
যে কয়েকটী দিন আজও বাকী আছে জীবনের
নাও ডেকে নাও—
প্রেমময় দেবতারে, তার অবসর শেষে
পাও কি না পাও। *

শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী।

* "তুলকি বাবরী" হইতে।

আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও সংস্কারের আবশ্যকতা।

পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেখিতে পাই, সেই সেই দিকের প্রতি জনপদে সৌভাগ্য-সূর্য্য বিরাজমান। তত্তৎ জনপদবাসিগণ সৌভাগ্য-সূর্য্যালোকে উৎফুল্ল হইয়া অদম্য উৎসাহে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কাণ পাতিয়া সেই সেই দেশের নব অভ্যুত্থানের মঙ্গলময় গীতিধ্বনি শুনিলে মন প্রাণ জুড়াইয়া যায়। ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ দেশের সৌভাগ্য-রবি বহুকাল অস্তমিত হইয়াছে। অধুনা ভারতের সর্ব্বত্র দুর্ভাগ্য-অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সে আঁধারে দিশাহারা হইয়া এ দেশের নরনারী পরপদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক নিরর্থক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে;—আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাদের মৌলিকতা ভুলিয়া পরানুকরণপরায়ণ হইয়া ক্রমশঃ অন্য ভাবাপন্ন হইতেছে। ভগবান জানেন, পরিণামে এ জাতির অস্তিত্ব থাকিবে কি না? ভারতবাসীর সবই ছিল, কিছুর জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হইত না। কার্য্যগুণে অভ্যুত্থান হয়, আবার কার্য্যদোষে পতন ঘটে। আমরা আমাদের কৃতকর্ম্মের দোষে ক্রমশঃ অধঃপাতের দিকেই চলিয়াছি।

যখন যে দেশে অশান্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তখন সে দেশের লোক সাতিশয় উদ্বেগের সহিত আত্মরক্ষা এবং নিজ নিজ পুত্র কন্যা স্ত্রী, ধন মান সংরক্ষণে ব্যস্ত থাকে; উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, বরং অবনত হইতে থাকে। আবার যখন শান্তি বিরাজ করে, তখন সকলেই নিশ্চিন্ত হইয়া আপনার উন্নতি আত্মীয়ের উন্নতি, দেশের উন্নতি চিন্তা করে এবং সামর্থ্যানুরূপ উন্নতি সাধন করে।

দীর্ঘকালব্যাপী অশান্তি এ দেশের নানাপ্রকার অনিষ্ট সংঘটন করিয়াছে। লোকে কলিকালের কল্পনা করিয়া, সেই সমস্ত অনিষ্টপাত অবশ্যম্ভাবী ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ইংরেজ ভারতে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। এখন বাহিঃশত্রু কর্ত্তৃক দেশ আক্রমণের সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। বর্গীরা আর দেশ লুণ্ঠন করে না, মগ ডাকাতের উপদ্রব নাই, পর্টুগীজ প্রভৃতি জলদস্যুর দল তিরোহিত হইয়াছে, দেশ মধ্যে যে দলবদ্ধ দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত ও লুঠেরার দল ছিল তাহাও একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন নিয়মের দিন; রাজনিয়মে সমাজ নিয়মিত। রাজদ্বারে যথাসম্ভব দোষীর বিচার হয় সুতরাং শাস্তির ভয়ে দুষ্কার্য্যের প্রসার ক্রমশঃই খর্ব্ব হইতেছে। বস্তুতঃ শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত জনসমাকুল বিশাল জনপদে যে পরিমাণ শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা, তৎপক্ষে কর্ত্তৃপক্ষ যত্নের ক্রটী করিতেছেন না।

এ হেন শান্তির দিনে আমরা কি করিতেছি, কোথায় যাইতেছি? দীর্ঘ নিদ্রার পর জাগিয়া উঠিয়া যদি কেহ সম্মুখে স্নিগ্ধোজ্জ্বল মনোরম নূতন আলোক দেখিতে পায়, তাহা হইলে তৎপ্রতিই তাহার অনুরাগের সঞ্চার হয়। আপনার ঘরের নির্ব্বাপিত প্রায় অনুজ্জ্বল আলোকে তৈলসেক করিয়া উজ্জ্বল করিবার আবশ্যকতা অনুভব করে না। আমাদের দশা প্রায় সেইরূপই হইয়াছে। সময়গুণে আমাদের জ্ঞান-পিপাসা বলবতী হইয়াছে, কর্ম্মে উদ্যম আসিয়াছে। কিন্তু আপনার ঘরে অন্ধকারে নিহিত অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন না করিয়া পরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বিমোহিত হইয়াছি। যেরূপ কাজ করিলে আমাদের ইহ পরকালের মঙ্গল হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছি। শিক্ষার্থী সুশিক্ষা পাইতেছে কি? কর্ম্মী কি অনবদ্য কর্ম্মে নিযুক্ত? যে শিক্ষার গুণে আত্মহিতে রত রহিয়া পরোপকার ব্রতপরায়ণ হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় এবং পরকালে সদ্গতি ঘটে, তাহার নাম সুশিক্ষা। আমাদের সেরূপ সুশিক্ষা

হইতেছে কি? যেরূপ শিক্ষা যে দেশের পক্ষে সম্যক্ উপযোগী, কৃপাময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় সেইরূপ শিক্ষা সেই দেশে স্বতঃই আবির্ভূত হয়। সুতরাং সুশিক্ষা অপৌরুষেয়। ঋষি বা ঋষিকল্প ব্যক্তিগণ শিক্ষনীয় ও করণীয় বিষয় সমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বেদ বেদাঙ্গ শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ আমাদের দেশের শাস্ত্র। আয়ুর্ব্বেদও শাস্ত্র। কিন্তু হায়, দীর্ঘকালের অনালোচনায়, যৎসামান্য আলোচনায় এবং অপ্রকৃত আলোচনায় উক্ত শাস্ত্রসমূহে নানা আবর্জ্জনা মিশিয়াছে, কোনো কোনো শাস্ত্রের একেবারেই রূপান্তর ঘটিয়াছে। আমরা অন্যান্য শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া আজ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের কথাই বলিব।

আয়ুর্ব্বেদ আমাদের জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র। পৃথিবীতে যে জাতির জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য কলা-বিজ্ঞান না থাকে, সে জাতি একটা জাতি বলিয়াই গণ্য হয় না। তজ্জন্য যে সকল জাতির স্বতন্ত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছিল না, তাহারা নানা দেশ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এবং আপনাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব তাহাতে যোগ করিয়া বিচিত্র চিকিৎসা শাস্ত্র গড়িয়া তুলিতেছেন। চেষ্টার বিরাম নাই, প্রাণপণ করিয়াও নিজেদের গঠিত শাস্ত্রের উন্নতি-সাধন করিতেছেন। আর আমরা দেশ-প্রকৃতি ও মনুষ্য-প্রকৃতির অনুকূল সর্ব্বাবয়ব সুসম্পন্ন এত বড় একটা বিরাট চিকিৎসা শাস্ত্রের শ্রাদ্ধের আয়োজন করিতেছি; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ঋষি-প্রণীত শাস্ত্র সমূহ অতি পুরাতন। এই শাস্ত্রের উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝাবাত চলিয়া গিয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও নানারূপ আবর্জ্জনার মিশ্রণ সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে,

> "Errors like straws upon the surface flow,
> He who would search for pearls must dive below."

বস্তুতঃ সমুদ্রের ন্যায় গভীর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ডুব দিলে যে সকল রত্নরাজি পাওয়া যায়, পৃথিবীতে তাহার তুলনাই হয় না। একথা যে কেবল আমরা বলি তাহা নহে, অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। ফিলাডেল্‌ফিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জর্জ্জ এইচ, ক্লার্ক এম্ এ, এম্ ডি, মহোদয় চরকের ইংরাজী অনুবাদ—যাহাতে গ্রন্থের গভীর অর্থ প্রস্ফুটিত হয় নাই,—পাঠ করিয়া বলিয়াছেন,—

"As I go over each fasciculus of charaka I always arrive at one conclusion and that is this :—

If the physicians of the present day would drop off from the Pharmacopia all the modern drugs and chemicals and treat their patients according to the methods of charaka there would be less work for the undertakers and fewer chronic invalids in the world."

অর্থাৎ চরকের প্রত্যেক খণ্ড পাঠ করিয়া আমি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই। সেই সিদ্ধান্ত এই,—যদি বর্ত্তমানকালের চিকিৎসকগণ, তাঁহাদের ঔষধ তালিকা হইতে, আধুনিক যাবতীয় ঔষধ ও রাসায়নিক পাক প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, রোগীকে চরকের মতানুসারে চিকিৎসা করেন, তাহা হইলে শববাহকের কার্য্য এবং পৃথিবীতে চিররোগীর সংখ্যা অনেক কমিবে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইলে জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র যাহাতে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার উপায় বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যদি আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা-প্রণালী দেশে সুপ্রচলিত না হয়, তাহা হইলে প্রাণের দায়ে আমাদিগকে অবশ্যই চিরকাল বিদেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রানুজীবীদিগের শরণাপন্ন হইয়া থাকিতে হইবে; বিদেশীয় ঔষধ পথ্য ক্রয় করিতেও হইবে। তাহা খুব ব্যয়সাধ্য; দরিদ্রের সাধ্যাতীত, মধ্যবিত্তের দুঃসাধ্য এবং ধনিগণের পক্ষেও একান্ত সুসাধ্য নহে। এখন দেশে দেশীয় চিকিৎসার প্রচলন আছে, তখন বিদেশীয় চিকিৎসার দায়ে যেরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে হইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইংরাজ আমাদের রাজা, তজ্জন্য রাজরুচি অনুসারে আমাদিকে বাধ্য হইয়া চলিতে হয়। সুতরাং ইংরাজ রুচি, সুন্দর, সুপ্রশস্ত, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারে ও আলোকমালায় সুশোভিত সুরম্য হর্ম্ম্যাভ্যন্তরে বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়; ততোধিক বিভবসম্পন্ন রোগীনিবাসে কর্ম্মাভ্যাস করিতে হয়। ইহার উপরে অধ্যাপনার ব্যয় আছে। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভারতবাসীকেই সেই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। তৎপরে চিকিৎসকের নিদারুণ অর্থ পিপাসা মিটাইতে হয়। বিদেশীয় চিকিৎসকের তো কথাই নাই, ভারতের ব্যয়ে পরিচালিত বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ব্যবসা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ভারতবাসীর অর্থ শোষণে দেশীয় ডাক্তারেও ত্রুটী করেন না। ইহার পর ঔষধ পথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। এত করিয়াও যদি আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইত, তাহা হইলেও মনকে প্রবোধ দিবার উপায় ছিল। কিন্তু কৈ, তাহাও তো হয় না! ভালো ভালো ডাক্তার ডাকিয়া, ঔষধ পথ্যাদিতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও অসাধ্য রোগের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা তো যায়ই না, দুঃসাধ্য রোগ চিকিৎসাতেও বিফল মনোরথ হইতে হয়, কচিৎ সুফল পাওয়া যায়। বরং দেখা গিয়াছে, অনেক স্থলে চিকিৎসার দোষে সুসাধ্য রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। রোগ চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য হইলে ডাক্তারেরা স্থান পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিয়া থাকেন। এ পরামর্শ শুনিয়া অনেককে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। মূল কথা, বিদেশীয় চিকিৎসার শরণ লওয়া দরিদ্র ভারতের অবস্থাতীত।

যেমন দেশের আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সকল ব্যবস্থা করিতে হয়. সেইরূপ দেশ-প্রকৃতি কাল-প্রকৃতি এবং নরনারী প্রকৃতির অনুকূল স্বাস্থ্যরক্ষা এবং চিকিৎসার বিধান করা উচিত। অন্যান্য দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণেতৃগণ ভারতের দেশ প্রকৃতি এবং নরনারী প্রকৃতি বিশেষরূপে অবগত নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের দেশের উপযোগী করিয়া স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান রচনা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য বিদেশীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান স্থান বিশেষে আমাদের অনিষ্ট সাধন করে। যাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত স্বাস্থ্য বিধানের সহিত অন্য দেশীয় স্বাস্থ্য-বিধানের তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, উভয়ের চিকিৎসা কৌশল মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিয়াছেন যে, এক দেশের বিধান অন্য দেশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অনুকূল নহে। এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে দেশীয় সুচিকিৎসার বহুল প্রচলন হয়, তাহার আয়োজন করা দেশবাসী সুধীগণের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

বহুকাল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রতিসংস্কার হয় নাই। প্রাচীনকালে মহামতি চরক মুনি একবার অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছিলেন। তদবধি সেই সংস্কৃত সংহিতা 'চরক' নামে প্রসিদ্ধ। সে বহুকালের কথা,—কতকাল তাহা নিশ্চয় করিয়া কেহই বলিতে পারে না। পরিবর্ত্তিত না হইয়া কিছুই চিরকাল এক ভাবে থাকে না, ইহাই কাল-মাহাত্ম্য। কালক্রমে লিপিকর-প্রমাদ এবং ভাষ্যকার-প্রমাদ প্রভৃতি কারণে সংস্কৃত আর্ষগ্রন্থও আংশিক বিকারগ্রস্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ অনতিক্রমণীয় কালমাহাত্ম্যে দেশপ্রকৃতি, মানব-প্রকৃতি, কাল-প্রকৃতি অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ব্যাধি-প্রকৃতিও চিরকাল একই ভাবে স্থির থাকে না। কালে নূতন রোগ দেশে আবির্ভূত হয়, হয় তো দুই একটি পুরাতন রোগ তিরোহিত হইয়া যায়। দেশ কাল বিশেষে বস্তু-প্রকৃতিরও ব্যতিক্রম ঘটে, কোনো দ্রব্য গুণহীন হয়, কোনো দ্রব্যে গুণান্তরের যোগ হয়। কালক্রমে কোনো কোনো দ্রব্য বা বিলুপ্ত হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সোমলতা এবং মেদ ও মহামেদ প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রয়োজনানুসারে চিকিৎসা শাস্ত্রের সংস্কার করিতে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের পুনঃ সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের অংশ বিশেষের উন্নতিসাধন করাও বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় অত্যুজ্জ্বল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোক আমাদের সম্মুখে দেদীপ্যমান থাকিয়া নূতন নূতন তত্ত্ব দেখাইয়া দিতেছে। সত্য বটে আমরা যাহা নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব বলিয়া মনে করি, তাহার মধ্যে অনেক তত্ত্ব আমাদের শাস্ত্রে গূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই সকল তত্ত্বের বিশদীকরণ আবশ্যক। আর যে সকল নূতন তত্ত্বের আভাস শাস্ত্রে পাওয়া যায় না, অথচ প্রয়োজনীয়, তাহাও শাস্ত্র মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া শাস্ত্রের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করা উচিত।

উচিত বটে, কিন্তু সে উচিত কাজ করে কে? সেরূপ যোগ্যতাই বা কাহার আছে? নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সে যোগ্যতা আছে। তাঁহারা উৎসাহী, দেশহিতৈষী, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের উদ্যম অপরিসীম। ব্যাপারটা ব্যয়সাধ্য হইলেও তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় তাহা সুসিদ্ধ হইতে পারে। অনেক রাজা মহারাজা, জমিদার এবং অপরাপর শ্রেণীর ধনাও নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা তাঁহাদের বাধ্য। নব্য শিক্ষিতদের এত গুণ ও যোগ্যতা থাকিলেও নানা কারণে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ও বৈদ্যক চিকিৎসায় আস্থাবান নহেন। তাঁহারা বিদেশীয় বা বিদেশীয় ভাবাপন্ন শিক্ষকগণের মুখে শুনিয়া আসিয়াছেন, হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ অবৈজ্ঞানিক। সেই বাল্য সংস্কার তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে। তারপর তাঁহাদের সহাধ্যায়ীর মধ্যেই কেহ কেহ য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা শিখিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদের উপরেই নব্য শিক্ষিতেরা আস্থা স্থাপন করিতে পারেন। কারণ তাঁহাদের বৈজ্ঞানিকবাদ বিজ্ঞানানুমোদিত কার্য্য তাঁহাদের সহজবোধ্য। আর কবিরাজের সহিত তাঁহারা অল্পই সংশ্রব রাখেন—আলাপেও সুখানুভব করেন না। আয়ুর্ব্বেদের যুক্তি, সিদ্ধান্ত এবং চিকিৎসা-কৌশল তাঁহাদের দুর্ব্বোধ্য, কাজেই কবিরাজী সিদ্ধান্ত বা থিওরি সকল absurd বলিয়াই তাঁহাদের অনেকের ধারণা। সুতরাং তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি ও সংস্কারকল্পে আপাততঃ কিছু করিবেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহারা এ কাজ হাতে না লইলে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবে না, আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসাও এদেশে সুচারুরূপে চলিবে না। তবে যখন তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল উপলব্ধি করিবেন, তখন অবশ্যই এ কাজে অগ্রসর হইবেন। বিধাতাই জানেন, সেদিন কবে আসিবে!

আমাদের কবিরাজ মহাশয়েরা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে নিশ্চেষ্ট। সম্ভবতঃ তাঁহারা এই কাজ আবশ্যক বলিয়াই মনে করেন না। তাঁহাদের চেষ্টাহীনতার ফলে শল্যতন্ত্রোক্ত চিকিৎসা পরের হাতে গিয়াছে। শালাক্যতন্ত্রোক্ত চিকিৎসাও অন্তর্হিত প্রায়, ধাত্রীবিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক বিভাগ তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়াছে, একমাত্র কায়চিকিৎসা তন্ত্রেই তাঁহাদের অধিকার আছে। তাহার প্রসাদে তাঁহাদের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়, তাহাতেই তাঁহারা তৃপ্ত থাকিয়া সুখে ঘুমাইতেছেন। এদিকে অন্য সম্প্রদায়ের চিকিৎসকেরা তাঁহাদের তন্ত্রোক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া লক্ষপতি—কোটীপতিও হইতেছেন। এখন এই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে কবিরাজ মহাশয়দিগের সহায়তার আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গের উপায় কি?

এখন দেখা যাউক, আয়ুর্ব্বেদের সংস্কার ও দেশীয় চিকিৎসার উন্নতি করিতে হইলে প্রধানতঃ কি কি করা আবশ্যক।

১। য়ুরোপীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া বিলুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় শারীরস্থান, ধাত্রীবিদ্যা এবং অস্ত্র চিকিৎসার প্রতি সংস্কার।

২। আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় স্থাপন এবং অধ্যাপনার সুব্যবস্থা।

৩। রোগী-নিবাস সংস্থাপন; তথায় শিক্ষার্থীগণের চিকিৎসা অভ্যাসের সুব্যবস্থা।

৪। পঞ্চকর্ম্ম প্রভৃতি অধুনা অব্যবহৃত চিকিৎসা কৌশলের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

৫। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভৈষজ্য সমস্ত চিনিবার ও জানিবার উপায় নির্দ্ধারণ।

৬। ঔষধ প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন এবং বিশুদ্ধ ঔষধ প্রস্তুতি শিক্ষার উপায় বিধান।

৭। পুস্তকালয় স্থাপন।

৮। ভিন্ন দেশীয় বিজ্ঞানবিদেরা যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রয়োজনানুসারে সেই সকল তত্ত্ব আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সন্নিবেশিত করা।

৯। ভিষক্-সমিতি সংস্থাপন। সময়ে সময়ে চিকিৎসকগণ তথায় সমবেত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বের সমালোচন এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রচার।

জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়ের কোনো কোনো বিষয় উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, অন্যত্রও কোনো কোনো কাজের অনুষ্ঠান চলিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল ফলিবে বলিয়া বোধ হয় না। ভরসা করি, দেশের কৃতবিদ্য সম্প্রদায় এই প্রস্তাবিত বিষয়ে মনোযোগ দিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন।

শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী।

পণ প্রথার ভীষণ পরিণাম—কুমারীর আত্মোৎসর্গ।

আজ এতকাল ধরিয়া সমাজের রক্তশোষিণী পণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অধঃপতন এতই বেশী হইয়াছে যে, সে আন্দোলন অরণ্যে রোদন মাত্র হইয়াছে। বক্তৃতামঞ্চে বক্তা উচ্চৈঃস্বরে এই ভীষণ প্রথার বিকটমূর্ত্তির বর্ণনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াই স্বকর্ত্তব্য পালিত হইল মনে করিয়াছেন, শ্রোতৃবৃন্দও করতালি ধ্বনিতে বক্তাকে সংবর্দ্ধিত করিয়াই স্বীয় স্বীয় শ্রোতৃকর্ত্তব্য সাধন করিলেন মনে করিয়াছেন। তারপর "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!" পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ আসিলে অনেক বক্তা এবং শ্রোতাই কন্যা পক্ষের রক্ত শোষণে বড় দ্বিধা বোধ করেন নাই। সমাজের শিক্ষতাভিমানী ব্যক্তিবর্গের ঈদৃশ বিগর্হিত ব্যবহার হৃদয়ে বড়ই বেদনা দেয়, কিন্তু এ বেদনা অনেকবার ভোগ করিতে হইয়াছে, ইহা সমাজের প্রশংসার কথা নহে। সম্প্রতি যে স্নেহলতা আত্মবলি দিয়াছে, তাহা এই ঔদাসীন্যেরই ফল! আমরা অর্থের মোহে এতই অন্ধ হইয়াছি যে, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছি। বিবাহ সভা হইতে বরকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া পর্য্যন্তও স্থানে স্থানে ঘটিয়াছে! দেশে পশু-ক্লেশ নিবারিণী সভা আছে, কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্তগণ বুঝি সমাজের নিকট পশুরও অধম, সেজন্য তাঁহাদের ক্লেশের প্রতীকার কল্পে কাহারও উদ্যোগ দেখা যায় নাই!

তাই এই মহানিদ্রাগত সমাজের উদ্বোধন কল্পে স্নেহলতা আজ স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে! শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের উদ্দেশ্যে দেবীর বোধন করিয়া স্বীয় নীলোৎপলনিভ চক্ষু দেবীর পূজায় প্রদান পূর্ব্বক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, আজ পূর্ব্ববঙ্গের কুমারী কন্যা স্নেহ-পালিতা স্নেহলতা পণ-প্রথা রাক্ষসীর উচ্ছেদ কামনায় চক্ষু নহে, হস্ত পদ নহে—সমগ্র দেহটিকেই তাহার পূজায় অর্পণ করিয়া সমাজের বোধন কামনা করিয়াছে—এ অলৌকিকী সাধনায় কি সে সিদ্ধিলাভ করিবে না?—তাহার এই তেজঃ, এই মনের বল দেখিয়া কি সমাজ উদ্বুদ্ধ হইবে না? এ কি দুরাশা? না—স্নেহলতার আত্মোৎসর্গ বিফল যাইবে না! তাহার এই অকাল মৃত্যু আজ সমাজের বক্ষে বড় বাজিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। সমাজের বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, বালক সকলেই যেন এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে চমকিত, বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া "ধিক্ আমাদিগকে! আর নয়!" বলিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন! এই যে দেখিতেছি, দলে দলে যুবকগণ ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন যে, "পণ গ্রহণে যৌতুক গ্রহণে পীড়ন আর নয়!" ওই যে

সমাজের শীর্ষস্থানীয়, নেতৃপদাভিষিক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী সর্ব্বত্র এক বাক্যে ঘোষণা করিতেছেন, "এই প্রথার সংস্রবে আর থাকিব না!"

যদি এই সব প্রতিজ্ঞা অসার বাক্যমাত্র না হয়, যদি ইহার অন্তরালে প্রকৃত প্রাণের স্পন্দন থাকে, তাহা হইলে স্নেহলতার আত্মবিসর্জ্জনে পণ প্রথার রাক্ষসী মূর্ত্তির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী এবং অতি নিকট!

'মানসী'তে এই পণ প্রথার অপকারিতা আলোচনা প্রসঙ্গে অতি বিস্তৃত ভাবেই ইহার দোষরাশি স্তরে স্তরে উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম! কিরূপ অবস্থায় ইহা সহনীয়, কিরূপ ভাবে ইহা আনন্দনীয় হয়, আর কিরূপ ভাবে ইহার বিকট মূর্ত্তি প্রকট হয়, সমস্তই আমি যথাসাধ্য খুলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। নিজ কন্যার বিবাহে অলঙ্কার তৈজস পত্রাদি দান করিতে কোন্ পিতামাতার অনিচ্ছা? তবে যেখানে সাধ্যের অতিরিক্ত হয়, সেখানেই কষ্ট! যে পিতামাতা অবস্থার পীড়নে বাধ্য হইয়া পাঁচ হরিতকী দ্বারা কন্যা সম্প্রদান করিতে বাধ্য হন, তাঁহারা যে সেজন্য প্রাণে গভীর বেদনা অনুভব করেন, সে কথা বলা অধিকন্তু! কিন্তু এইরূপ স্থলে যদি বর পক্ষের অযথা পীড়ন উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই কন্যা পক্ষের উদ্বাস্ত হইবার ব্যবস্থা হয়। যে কন্যা ভাবী স্বামী ও শ্বশুরের ঈদৃশ নৃশংস ব্যবহারের পরিচয় পায়, সে কি মনে প্রাণে তাঁহাদের উপর শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব আনিতে পারে?

তার উপর শ্বশুর কুলে ঈদৃশ দরিদ্র কন্যা বধূরূপে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করে। সুতরাং তাহার পক্ষে বিবাহ সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হয় এবং সে মনে করে যে, এতদপেক্ষা সে যদি পিতৃগৃহে কুমারী হইয়াও থাকিত, তাহা হইলে তাহার জীবন অনেক বেশী সুখের হইত!

কুমারী স্নেহলতা যে বিবাহের বরের পরিবর্ত্তে মরণকে বরণ করিয়াছে, সে এইরূপ অবস্থাতেই পড়িয়া! এইরূপে আরও কুমারী আত্মহত্যা দ্বারা পিতাকে তাহায় বিবাহ দায় হইতে মুক্ত করিয়াছে! তবে সে কথা এইরূপ ভাবে প্রচার লাভ করে নাই।

এখন বলুন দেখি যে সমাজে এইরূপ হৃদয়বিদারক ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়, সে সমাজের লোকের কি লজ্জা রাখিবার স্থান আছে? তাহারা কোন্ সাহসে উচ্চ শিক্ষার গৌরব করে, নিজ আর্য্যামির দোহাই দেয় আর জগতের গুরুর আসনে বসিবার স্পর্দ্ধা করে! আমি শতবার বলিব, পাশ্চাত্যের অর্থ স্পৃহার মোহই হিন্দু সন্তানের এই অধঃপতনের কারণ! ত্যাগের মহামন্ত্র সাধনা যে জাতীয় জীবনের লক্ষ্য, সে জীবনে এইরূপ অর্থ সংগ্রহের প্রতি উৎকট বাসনা দেখিতে পাওয়া যায় না!

যে কারণেই হউক, এই প্রথা সমাজ শরীরে এমনই ভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, তাহার ফলে অনেক দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সংসারে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, যদি স্নেহলতার চিতার অগ্নি প্রত্যেক বাঙ্গালী নিজ হৃদয়ে জ্বালাইয়া না লন এবং পণ প্রথার উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর না হন, তাহা হইলে আরও গুরুতর বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী! অনেক কুল-কুমারীই পিতাকে দায়মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে স্নেহলতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে বাধ্য হইবে এবং এই সব কুমারীগণের হত্যার পাপে বঙ্গসমাজ ভারাক্রান্ত হইবে! তাহার ভাবী ফল যে কি ভয়ানক, তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়!

কিন্তু আশা হয় যে, সে ভয়ের অবসর আর থাকিবে না। এখনও বঙ্গে মহাপ্রাণ যুবকগণের অভাব হয় নাই! দামোদরের বন্যাপ্লাবনে এই সে দিনও তাহার অসংখ্য পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—তাঁহাদের মহাপ্রাণতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া রাজপুরুষগণ পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের গুণগান করিয়াছেন, মুক্ত হস্তে তাঁহাদের মস্তকে প্রশংসা পুষ্প বৃষ্টি করিয়াছেন—সুতরাং দেশের আশা ভরসা এই যুবক দলের হৃদয়ে যদি এ স্নেহের আঘাত বাজিয়া থাকে, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইবেন! আমাদের এ আশা দুরাশা নহে!

পণ প্রথার উচ্ছেদই স্নেহলতার স্মৃতিরক্ষণে সর্ব্বোত্তম উপায়! ইহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নপর না হইয়া ইহাকে সমাজের বক্ষ শোণিত যথেচ্ছ শোষণ করিতে দিয়া আর যে কোন স্মৃতি চিহ্নই রক্ষিত হউক তাহাতে স্নেহলতার স্বর্গীয় আত্মার অপমান হইবে। আর যদি যে পণ যৌতুকের পীড়নের ভয়ে স্নেহলতার সুকুমার দেহলতা অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বর পক্ষের দানব অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছে তাহার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে আরও কোনরূপে তাহার পবিত্র স্মৃতির সম্মান করিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আমি প্রস্তাব করি যে স্নেহলতার নামে একটি ভাণ্ডার স্থাপিত হউক, তাহা হইতে যে সমুদয় দুঃস্থ পিতামাতা কন্যার বিবাহের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহনেও অক্ষম, তাঁহাদিগকে সম্ভবমত সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক। ইহা ঠিক স্নেহলতার ...নদানুযায়ী ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে। সমর্থ ব্যক্তি-গণ নিজ নিজ পুত্র কন্যার বিবাহের সময় অন্যান্য ...য়ের সহিত স্নেহলতার ভাণ্ডারের জন্যও যদি একটা ...যোগ করেন তাহা হইলে অনায়াসেই এই ভাণ্ডার পুষ্ট হইতে পারিবে। আশা করি সমাজ নেতৃগণ এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিবেদনটির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমি বহুদিন ধরিয়া এই প্রথার অপকারিতার বিষয় নানাভাবে চিন্তা করিয়াছি এবং নিজ ক্ষুদ্র শক্তিতে যথাসাধ্য ইহার উচ্ছেদে চেষ্টা করিয়াছি। সকলেই যদি স্বীয় স্বীয় ক্ষমতানুরূপ কার্য্য করিতে ব্রতী হন, তাহা হইলে এই প্রথার এই ভীষণ মূর্ত্তি আর বেশী দিন সকলে দেখিতে পাইব না। কিন্তু মনে প্রাণে কাজ করা চাই। কেবল লেখা বা বক্তৃতাতে কোনই কাজ হইবে না। তাই বলি ...তৃগণ, সকলে মনে প্রাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, ...হার যেমন সাধ্য, তিনি সেইরূপে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের ক্লেশ দূর করিতে বাধ্য থাকিবেন!

রমণী সংসারে ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু নহেন, রমণীর প্রাণ এতই তুচ্ছ, এতই হেয় নহে যে তাহার সহিত ধনরত্ন না পাইলে তাহার কোন গৌরব থাকে না তাহার কোন মূল্য থাকে না! রমণী সংসারের রক্ষাকর্ত্রী, পালয়িত্রী! মা জগদম্বা স্বয়ং প্রকৃতি স্বরূপিণী; মাতৃত্ব রমণীরই উপর ন্যস্ত! এই মাতৃত্বের গৌরবেই রমণীর গৌরব। স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া আমরা কন্যার পিতাকে ধন্য করিয়া নিজেরাই ধন্য হই!

এই স্ত্রীই সংসারে "গৃহিণী সচিব সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ!" এই রমণীই সংসারে তোমার সহধর্ম্মচারিণী, স্নেহে জননী, প্রীতিতে ভগিনী, ভক্তিতে তনয়া প্রেমেতে জায়া! ইহাকে ভরণ পোষণ করিবার জন্য তোমার সংসারের যে ব্যয় তাহার সহস্রগুণ উপকার তদ্বিনিময়ে তুমি প্রাপ্ত হও, তবুও এমন অকৃতজ্ঞ তুমি যে হিন্দুর শিক্ষা, হিন্দুর দীক্ষা, হিন্দুর সাধনা ভুলিয়া পবিত্র বিবাহ মন্ত্রের উচ্চার্থ ভুলিয়া এই দার সংগ্রহরূপ পবিত্র ধর্ম্ম ব্যাপারকে লেন দেন ব্যবসার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছ!

আর নয়। স্নেহলতা—চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার স্বর্গীয় আত্মত্যাগ দর্শনে নারীর সম্মান বঙ্গের হৃদয়ে হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠুক—অর্থের মোহ, বাহ্যরূপের মদির আকর্ষণ শিথিল হউক, হৃদয়ের রূপের প্রভায় উদ্ভাসিত বঙ্গকুমারীর লাবণ্য প্রত্যেকের হৃদয়ে একটা শ্রদ্ধার ভাব আনিয়া দিক যে, তাহাদিগের নিজ গৌরবের মাধুর্য্যেই আমরা তাহাদিগকে স্ত্রীরূপে, বধূরূপে স্বীয় স্বীয় গৃহে স্বাগত করিয়া হিন্দুর আদর্শ উজ্জ্বল করি! স্বর্গ হইতে স্নেহলতা সে দৃশ্য দেখিয়া সানন্দে বলুক—সার্থক আমার আত্মবলিদান! সকলে বলুন, "এবমস্তু, শান্তি! শান্তি! শান্তি!"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

ব্রাদার লরেন্সের পত্রাবলী।

(৯)

কেবল ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনাতেই তোমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া দাও। ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে বিশেষ কিছুই দাবী করেন না।

তোমার কাছে তিনি এই চান—সময় সময় তাঁহাকে তুমি অল্প একটু স্মরণ কর, তাঁহার অল্প গুণ কীর্ত্তন কর, সময় সময় তাঁহার কৃপার জন্য সামান্য একটু প্রার্থনা কর, তোমার কষ্টের কথা তাঁহাকে জানাও, সময় সময় বিপদের মধ্যে তিনি যে তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান কর, আর যতবার সম্ভব হয়, তাঁহার সহবাসে থাকিয়া সান্ত্বনা লাভ কর।

ঈশ্বরের দিকে তোমার হৃদয়কে তুলিয়া ধর—এমন কি যখন তুমি আহার করিতে বসিবে, এমন কি যখন তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের সহিত গল্প-গুজবে রত থাকিবে। তাঁহাকে স্মরণ যত অল্প সময়ের জন্যই হউক না কেন, তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন। খুব উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা না করিলেও চলে। আমরা যতটা মনে করি তিনি আমাদের নিকটে আছেন তাহা অপেক্ষাও তিনি আমাদের অধিক নিকটে বাস করেন।

ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিবার পক্ষে ভজনালয়ই একমাত্র স্থান নহে. সর্ব্বদাই যে ভজনালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা না হইলে ঈশ্বরের সহবাস লাভ করিতে পারা যাইবে না, এরূপ ভাবা ভ্রম। অন্তরকেই আমরা ভজনালয় প্রস্তুত করিয়া হইতে পারি। সেখানেই আমরা সময় সময় প্রবেশ করিয়া নম্র হৃদয়ে তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিতে পারি। মানুষমাত্রই ঈশ্বরকে আপনার জন জানিয়া তাঁহার সহিত সরল ভাবে আলাপ করিতে সক্ষম, একথা সত্য। তবে কি না এরূপ মধুর আলাপ কেহ কেহ হয় তো অধিক সময় ধরিয়া করিতে পারেন, কেহ কেহ হয় তো তেমন পারেন না,—অল্প সময়ের জন্য করিয়া থাকেন। আমরা কি করিতে পারি তাহা তিনি খুব ভাল করিয়াই জানেন, অতএব এস, আমরা আরম্ভ করিয়া দিই।

প্রতিজ্ঞাকে আমরা খুবই দৃঢ় করি, এইটাই তিনি আমাদের নিকট হইতে কেবল চান। সাহসের উপর উৎসাহের উপর ভর করিয়া দাঁড়াও। আমরা আর অধিক দিন বাঁচিব না, তুমি এখন প্রায় আটান্ন বৎসরের বৃদ্ধ। ঈশ্বরের মধ্যেই যাহাতে বাস করিতে এবং মরিতে পারি, এখন হইতেই এস আমরা তাহার জন্য সচেষ্ট হই। তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দিতে পারিলে সংসারের দুঃখ-তাপ আমাদের নিকট মধু বলিয়া বোধ হইবে, আর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি আনন্দ সম্ভোগ করিতে যাই, সে আনন্দ যত বড়ই হউক না কেন, আমাদিগকে দারুণ ব্যথাই দিবে, সে আনন্দ ভীষণ দণ্ডরূপেই পরিগণিত হইবে।

অতএব ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা করিতে যাহাতে অভ্যাস হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার চেষ্টা কর। তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে, কর্ম্মের ভিড়ের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে তোমার হৃদয় অর্পণ করিতে শিক্ষা কর। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তাঁহার দিকে তাকাইবে, যদি তাহা না পার তবে যেন সময় সময় হৃদয়কে তাঁহার দিকে তুলিয়া ধরা হয়।

অতিশয় যত্নসহকারে উপাসনার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর মধ্যেই নিজেকে সর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না। কিন্তু ঈশ্বরের উপর পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নম্র হৃদয়ে প্রীতির সহিত কার্য্য করিয়া যাইও।

তোমার মন অতিশয় চঞ্চল, ইহা লিখিয়া তুমি ...র কোন কিছু নূতন কথা আমায় জানাইলে এমন ...নে করিও না। কেবল তোমারই মনের অবস্থা ...ে ঐরূপ এমন নহে। আমাদের সবারই মন ...স্থির, উহা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অহরহ ধাবিত ...য়। মনের এই প্রকার অবস্থা হইলেও আমাদের ভিতরকার ইচ্ছাশক্তি সকল শক্তির উপর প্রভুত্ব করে এবং সবাইকে প্রতিহত করিয়া সংযত করিয়া আমাদের মনকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়, এই ...র শেষ কাজ।

কিন্তু ধ্যান-ধারণার প্রথম অবস্থায় মনকে উপ-...রূপে সংহত করিতে না পারায় উহা চারিদিকে ...রিয়া বেড়াইবার কু-অভ্যাসের মধ্যে পড়িয়া যায় ...ং তখনই ঐরূপ মনের উপর জয়লাভ করা ...তিশয় কঠিন হইয়া উঠে, এমন কি আমাদের শত ...চেষ্টার বিরুদ্ধেও মন সংসারের অসার পদার্থের উপর ...আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

যদি এমনই ঘটে তাহা হইলে একটি প্রতীকার ...হ—সরল মনে আমাদের ত্রুটি স্বীকার করা এবং ঈশ্বরের সম্মুখে নত হইয়া দাঁড়ান।

অধিক বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা করিতে আমি তোমাকে পরামর্শ দিই না, কারণ বহু বাক্য প্রয়োগে এবং দীর্ঘ আলোচনায় প্রায়ই মন চঞ্চল হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইবার সুযোগ পায়।

অসার জিহ্বা, বাক্যোচ্চারণে অক্ষম, এমন ভিখারী ধনীর দ্বারে যেরূপ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে অথচ সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহার ধনের প্রার্থনা জানায় তেমনি করিয়া বাক্যশূন্য মুখ লইয়া প্রার্থনার সময় ঈশ্বরের সম্মুখে ব্যাকুলচিত্তে উপস্থিত হইও। তাঁহারই সত্তার মধ্যে তোমার মনকে সচেতন রাখ, ইহাই কার্য্য হউক।

মন যদি ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া সময় সময় নানাদিকে ছুটিয়া বেড়ায় তাহা হইলে অধীর হইয়া পড়িও না। অতিমাত্রায় অস্থিরতা ব্যাকুলতা, মনকে তাঁহার দিকে চালিত না করিয়া বরং দূরে বিপরীত দিকেই লইয়া যায়। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই মনকে প্রশান্ত করিতে হইবে। এইরূপ কার্য্য করিতে যদি বদ্ধপরিকর হইতে পার তবেই ঈশ্বর তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইবেন।

যখন প্রার্থনা করিবে না তখন মনকে ঈশ্বর হইতে অনেক দূরে যাইতে দিও না, তাহা হইলেই মনকে অনেকটা শান্ত রাখিতে পারিবে, তাহা হইলেই প্রার্থনার সময়ে ঈশ্বর সন্নিধানে সহজে আসিতে পারিবে। তাঁহার বিদ্যমানতার ভিতরে মনকে নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে প্রাণপণ যত্ন করিও। ঈশ্বরকে প্রায়ই স্মরণ করিবার অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে প্রার্থনার সময় মনকে শান্ত রাখিতে বিশেষ কোনই কষ্ট পাইতে হইবে না, অন্তত খুব সহজেই বিক্ষিপ্ত মনকে নিজের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিবে।

এস আমরা যথার্থরূপে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিবার অভ্যাস যাহাতে লাভ করিতে পারি, তাহার জন্য সচেষ্ট হই। এস, আমরা পরস্পর পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করি।

সমাপ্ত।

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়।

স্নেহলতার আত্মবলি।

ঐ যে শিখা উঠেছে আজ ছুঁয়েছে আজ গগনতল
আগুন হয়ে ফুটেছে আজ ঐ যে হিয়া শতদল
    দেখিতে সবে পেতেছ নাকি
    মোদের ভালে বজ্র আঁকি
গভীর ঘন গরজে ডাকি বিধির ভীম রোষানল!
আগুন হয়ে ফুটেছে আজ ছুঁয়েছে ওই গগনতল!

অনলে যা পুড়ে গেছে ভস্ম হয়ে যায়নি সে!
প্রলয় শিখা উঠেছে তার দারুণ জ্বালা দশদিশে
    স্ফুলিঙ্গ যে উঠেছে আজ
    তারি ভিতর রয়েছে বাজ
ভীষণ রবে সবার মাঝ পড়বে ভেঙে এক নিমিষে।
আগুন হয়ে উঠ্‌ল জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়নি সে!

নীরব তাহার অভিশাপ তা'হার যাতনারি তরে
উঠ্‌বে শোকের করুণ রোদন আজকে না হয় দুদিন পরে!
    তাহার দাহ অগ্নিশিখা
    ফুটাবে সে কি ভয়াল লিখা
আঁধার ঘরের যবনিকা মন্ত্রবলে মুক্ত করে!
ভীষণ রোদন উঠ্‌বে তখন এ পাপ দেশের ঘরে ঘরে।

আজো তবে উপায় আছে আজো আছে প্রতীকার
আজো শান্ত হ'তে পাবে বিধির ক্রোধ দুর্ণিবার—
    আজো যদি স্বার্থ ভুলে
    ত্যাগের আলো ধর তুলে
আজো যদি পরাণ খুলে নাওরে শরণ সত্যতার—
আজ তা' হলে উপায় আছে আজো আছে প্রতীকার।

অসাড় যদি থাক পড়ে থাক বাঁধা মোহের জালে
প্রলয় বিষাণ উঠ্‌বে বেজে প্রলয় ভীষণ রুদ্রতালে
    সে তাণ্ডবে সে নর্ত্তনে
    ধরণী ভীম ভূকম্পনে
যোগ দিয়েরে তাহার সনে মৃত্যু দিবে দগ্ধ ভালে
প্রলয় বিষাণ বেজেছে ওই প্রলয় ভীষণ রুদ্রতালে।

মর্ম্মদহা স্মৃতি লয়ে নাম লয়ে আজ বিধাতার
আজ যদি পণ কর বরণ পাপের কারণ ঘুচাবার—
    আজ যদি সব মুক্ত প্রাণে
    কণ্ঠ যুড়ে গভীর গানে
দুঃখ-কাতর মায়ের পানে মুখ তুলে চাও একটিবার!
বিধির রোষ হয়রে শান্ত হয়রে পাপের প্রতীকার।

শ্রীক্ষীরোদকুমার রায়।

সুপ্ত ওরে বঙ্গবাসী সপ্ত কোটি হৃদয় হারা
একদিনে কি সপ্ত কোটির সকল গুলোই গেছিস্ মারা
বাপ মা সে মরে গেছিস্ মরে গেছিস্ ভাই ও বোন
স্বামীর সাথে মরে গেছিস্ ঘরের বধূ লক্ষ্মীগণ
ভস্ম হয়ে যাচ্ছে উড়ে তোদের গর্ব্ব অহঙ্কার
বেঁচে যদি থাকিস্ কেহ কুড়িয়ে নে অই ভস্ম ভার।

মায়ের মেয়ে যাচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে পুড়ে বাপের স্নেহ
ভস্ম হয়ে যাচ্ছে উড়ে ভবিষ্যতের প্রেমের গেহ
পুড়ে যাচ্ছে ত্যাগের ভিত্তি পুড়ে যাচ্ছে দেবের দান
নিজের মানের পায়ের তলায় যাচ্ছে পুড়ে মহৎ প্রাণ
পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে উড়ে মাথার মণি স্নেহের লতা
কুড়িয়ে নে অই যুগযুগান্তের ভস্ম করা সার্থকতা।

সর্ব্বশুচি শুচি তাহার অঙ্গ খানির সঙ্গে মিশে
ব্যগ্র বাতাস আস্‌ছে ছুটে—পায়ের ধূলোর ভিখারী সে
নত আকাশ টান্‌ছে তারে ধ্রুবতারার দেশের পানে
রবির বাহু নিজের বুকে টান্‌ছে তারে হাজার টানে
চন্দ্র তারা রবির দেশে পড়ে গেছে মহোৎসব
তোদের কাণেই পশেনি কি আত্মবলির জয়ের রব?

দগ্ধ তারে করেনি ত জ্বলন্ত অই অগ্নিশিখা
তোদেরি ভাল দগ্ধ করে রেখে গেছে কৃষ্ণ লিখা
ধর্ম্ম এরে সইবে নাকো মানুষ এরে সইবে না
নারীবলির এ পাপ ওরে হৃদয় সেও বইবে না
ভবিষ্যতের ইতিহাসে পড়ে গেছে কালির ছাপ
ছেলে কেঁদে কইবে ক্ষোভে—এরাই ছিল মোদের বাপ!

ধিক্কারের এ দুঃখ যদি বেজে থাকে প্রাণের তারে
অনুতাপের আঘাত চোখে জেগে থাকে বাষ্পাকারে
এ কালিমা মোছার লাগি শপথ আজি করবে তোরা
মেয়ে বলি যূপকাষ্ঠে থামিয়ে দে অই রক্ত ঝোরা
প্রেমের পূজায় নেইত জুলুম—সেথায় শুধু আত্মদান
আপনাদেরে বিকিয়ে ফেলে প্রাণের সাথে মিশায় প্রাণ।

দধীচি তার অস্থি দিয়া তৈরী করে গেছে বাজ
বাকী যেটুক বাকী আছে—নয়ত মোটেই কঠিন কাজ
আলোর সা'থে আঁধার আজি মিশিয়ে গেছে ভেদের দিন
কাঁদার দিন আজকে তোদের আজ্‌কে তোদের হাসার দিন
ত্যাগের রক্তে সমাজ ভিতে সৌধ আজি অই উঠে
সফল তোরা কে চাস্ হ'তে হৃদয় নিয়ে আয় ছুটে।

শ্রী—

ধর্ম্মের জয়।

(১৮)

অজিত মিঃ রায়ের আফিস ঘরে বসিয়া থাকে, তিনি যা বলেন তাই করে। তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, ললাটে চিন্তার ছায়া পতিত হইয়াছে। মাতৃভক্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ বালক, কর্ত্তব্য পালনার্থে আপনার মনের সকল উচ্চ আশা বিসর্জ্জন দিয়াছে। একদিন বৈকালে মিঃ রায় অজিতকে বলিলেন—

"অজিত এই চিঠিখানি আজকের ডাকে যাওয়া চাই, আজ মেল ডে, এটা বিলাতের চিঠি। তুমি নিজে গিয়ে পোষ্টাফিসে এই চিঠিখানি দিয়ে এসো। পথে খেলা কোরো না, মনে রেখো এখানি খুব দরকারী চিঠি।"

অজিত বলিল—"আফিসে আবার আসব?"

মিঃ রায় বলিলেন—"না তোমায় আর আসতে হবে না, ঐ পথে বাড়ী যেও।"

অজিত চিঠিখানা লইয়া পথে বাহির হইল। কিয়দ্দূর যাইবার পর দেখিল এক দল স্কুলের বালক আসিতেছে, ও একটি বালককে আর একজন বয়স্ক বালক প্রহার করিতেছে।

অজিত তাহাদের দূর হইতে চিনিতে পারে নাই, নিকটে গিয়া দেখিল তাহার ভাই সুহৃদকে মিঃ ব্যানার্জ্জির পুত্র সলিলকুমার প্রহার করিতেছে। সুহৃদের নাসিকা দিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। অজিত তাড়াতাড়ি চিঠিখানি পকেটে ফেলিয়া উভয়ের মধ্যস্থলে গিয়া বলিল—

"ছি ছি এতটুকু ছেলের সঙ্গে তোমার ঝগড়া করতে লজ্জা করে না? ছেড়ে দাও বলছি।"

সলিল উদ্ধতভাবে বলিল—

"নবাব পুত্তুর এসেছেন, কেন ছেড়ে দেব? সত্যি কথা বললে রাগ কিসের? বিসপস্ স্কুলে পড়তে এসেছেন, এদিকে বড় ভাই মিঃ রায়ের ছোকরা চাকর। চাকরের ভাইরা কেন আমাদের সঙ্গে পড়বে?"

অজিতের মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, তবু সে সংযতভাবে বলিল—

"তার ভাই চাকর বলে তোমাদের যদি লজ্জা হয়, তোমরা না হয় স্কুল ছেড়ে দাও।"

সলিলকুমার মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—

"আমরা বিসপস্ স্কুল ছাড়ব কি দুঃখে বলত? কি আদর মরে যাই। ইংরাজী স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা হয়, সে স্কুল আমাদের জন্য। তোমার ভাইকে ছাড়িয়ে চাকরদের স্কুলে ভর্ত্তি কর, তারা সেখানে বেয়ারা খানসামার কাজ শিখবে।" সলিলকুমারের দলে অন্য কেহ ছিল না, তারা দুই ভাই ছিল। অন্য বালকেরা এই কলহে যোগদান না করিলেও আনন্দানুভব করিতেছিল। অজিত বলিল—

"আর সুহৃদ আমরা বাড়ী যাই. এদের মত লোকের সঙ্গে কথা কহা উচিত নহে, ভদ্রলোকের ছেলের কি এই কাজ?" সলিল ক্রুদ্ধভাবে অজিতকে মারিতে অগ্রসর হইয়া বলিল—

"কিরে ছোট লোক, ভদ্রলোকের মর্ম্ম তোরা কি বুঝবি? ফের যদি কথা কইবি, তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।"

অজিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—"সাবধান হয়ে কথা কহিও, কে ভদ্রলোক, কে ছোট লোক ভাষায় ও ব্যবহারে তাহা বেশ প্রমাণ হচ্ছে।"

সলিলকুমার তাহার মুখে এক ঘুষি মারিল, সেই মুহূর্ত্তে একখানি রিকস আসিয়া তাহার সম্মুখে থামিল। রিকসতে মিঃ রায়ের পুত্র শিশিরকুমার কিয়ৎক্ষণ হইতে ইহাদের কলহ দূর হইতে দেখিতেছিল। সলিলকুমারকে হাত তুলিতে দেখিয়া রিকস অগ্রসর করাইয়া সম্মুখে থামাইল। ততক্ষণে অজিত বজ্রমুষ্টিতে সলিলের হাত ধরিয়া বলিয়াছে—

"ক্ষমা চাও, নতুবা হাত ছাড়িব না।"

সলিল জালবেষ্টিত ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিল—

"ছেড়ে দে বল্‌ছি, কোথাকার অসভ্য, বর্ব্বর, ছোট লোক বেহারা, তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমার হাত ধরিস।"

অজিত বলিল—"ক্ষমা না চাহিলে হাত ছাড়িব না, শক্তি থাকে ছাড়াও।"

সলিল ভ্রাতাকে বলিল—"অনিল দেতো ছোট লোককে দু ঘা বসিয়ে, জব্দ হবে।" অনিলও তাই চায়, পশ্চাত হইতে সহসা সজোরে এক ধাক্কা দিল, অজিত ভূমিতে পড়িয়া গেল। তাহার উপর সলিল-কুমার পুনরায় প্রহারে অগ্রসর হইল দেখিয়া শিশির-কুমার উচ্চ কণ্ঠে বলিল—

"কি ভদ্রলোক মরে যাই, এক ভাইতে হ'ল না, দুজনে মিলে যুদ্ধ হচ্ছে। আবার ভদ্রলোক বলে গর্ব্ব কত। ওঁকে ছুঁয়োনা বল্‌ছি।" সলিল শিশিরকে দেখিয়া ভীত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। মিঃ রায়ের পুত্রের সম্মুখে নিজের গুণের আর অধিক পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল না। অজিত ধূলি ধূসরিত অঙ্গে ভ্রাতাদ্বয়ের সহিত গৃহাভিমুখে গমন করিল। সলিল-কুমার ও অনিল আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া গেল।

শিশিরকুমার রাত্রে পিতার নিকট বলিল—

"বাবা, আজ সলিল আর অনিল একটি ছোট ছেলের সঙ্গে এমন ঝগড়া কচ্ছিল, তাকে মেরে ধরে একাকার। তোমার আফিসে যে ছেলেটি কাজ করে তারই ছোট ভাই। সে ভাই নাকি বিসপস্ স্কুলে পড়ে হাঁ বাবা, তা'হলে বড় ভাই কেন কাজ করে?"

মিঃ রায় বলিলেন—"বড় ছেলেটি বড় ভাল। মার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছে। তার ভাইরা যে বিসপস্ স্কুলে পড়ে তাত জানতাম না।"

অজিত ভাইদের লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। সুশীলা পুত্রদের নিকট সকল ঘটনা শুনিয়া দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

"অন্যে তোমাদের সহিত মন্দ ব্যবহার করিলেও তোমরা কখনো করিও না। আর এক কথা ইন্দুর বড় অসুখ, তোমরা একটু সাবধানে থেকো, সে যেন কষ্ট না পায়, সবাই মিলে তাকে খুব যত্ন কোরো, আবার হয় ত আমাদের সাম্‌নে ভীষণ পরীক্ষা আস্‌ছে।" তাহারা মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, ইন্দুর খুব অসুখ, নতুবা মায়ের মুখ এত বিষাদময় কেন! অজিত জিজ্ঞাসা করিল—

"মা, ইন্দু কোথায়?"

সুশীলা বলিলেন—"উপরে বামার কাছে আছে, বামা সব ঔষধ পত্র নিজে এনে তাকে খাইয়েছে। সে যা কচ্ছে, তার ঋণ এ জন্মে আমি পরিশোধ কর্‌তে পার্‌বো না। সে না হ'লে আজ আমার কি দশা হ'ত।"

আহারাদির পর অজিত, সুহৃদ ও ললিতকে লইয়া পড়িতে বসিল। হঠাৎ পকেট হইতে পেন্সিল বাহির করিতে গিয়া পকেটস্থ পত্রে হস্ত পড়িল। এই পত্রখানি মিঃ রায় ডাকে ফেলিতে দিয়াছিলেন ও বলিয়া দিয়াছিলেন যেন নিশ্চয়ই সে দিনের ডাকে যায়। সে ঘড়ির দিকে চাহিল, তখন ডাক বন্ধ হই-বার সময় হইয়াছে। তবু সে একবার ডাক ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিবে স্থির করিল! তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। পোষ্টাফিসে গিয়া দে'খিল, তখন ডাক বন্ধ হইয়া গেছে। সে বিষণ্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া জননীকে বলিল—

"মা আমি আজ বড় অন্যায় কাজ করেছি।"

সুশীলা বলিলেন—"কি করেছ বাবা?"

অজিত বলিল—"আজ মিঃ রায় ডাকে একটা দরকারী চিঠি ফেলিতে দিয়াছিলেন। আমি ডাকে চিঠি দিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু পথে সুহৃদকে সলিল-কুমার মারিতেছিল, তাই সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এখন কি হ'বে মা?"

সুশীলা বলিলেন—"কাল সকালে উঠিয়াই মিঃ রায়ের বাড়ী যেও, যদি খুব দরকারী হয়, তিনি টেলিগ্রাম করিবেন।"

অজিতের সে রাত্রিতে আর মনে শান্তি রহিল না।

অজিত পরদিন প্রভাতে পত্রখানি প্রথমে ডাকে দিল। তাহার পরে মিঃ রায়ের বাড়ীতে গিয়া উপ-স্থিত হইল। বারান্দায় শিশিরকুমার একখানি গ্রামার লইয়া পড়া করিতেছে, অজিত গিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। একজন হিন্দুস্থানী বেহারা জিজ্ঞাসা করিল—

"কেয়া বাবু, কুছ কাম হ্যায়?"

অজিত বলিল—সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

বেহারা বলিল—"সব আভি গোসল মে হ্যায়, থোড়া ঠহর যাও বাবু, বেরেন্তকে উপর বইট্ যাও।"

অজিত দাঁড়াইয়া রহিল। শিশির তখন গ্রামার মুখস্থ করিতে করিতে একবার অজিতের দিকে চাহি-তেছে, আবার পড়িতেছে—

"Pretty Prettiest Prettiest

Strong Strongest Strongest"

আবার একখানা কাগজে লিখিতে লিখিতে ইহাই বলিতে লাগিল। অজিত তখন ধীরে ধীরে বলিল—

"Comparativeএ Strongest আর Pre-ttiest ত হবে না।"

শিশির তাহার পিতার আফিসের এই ছোকরা চাকরের অসম সাহসিকতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল—

"Strongest হবে না ত কি হবে?"

অজিত বলিল—"Stronger আর Prettier হবে।"

শিশির বলিল—"বাবা আমায় বলে দিয়েছেন, তা' হলে তুমি আমার বাবার চেয়েও বেশী জান? তুমি কি গ্রামার পড়েছ?"

অজিত বলিল—"আমার এ সব অনেক দিন পড়া হ'য়ে গেছে, আমাদের ছোট ভাই ললিত সে'ও এর চেয়ে বেশী পড়ে। আপনি পড়ুন না, আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে আপনার শীগ্‌গীর পড়া মুখস্থ হ'য়ে যাবে।" এই বলিয়া সে একটু পড়ি-বার প্র[illegible]লী বলিয়া দিল।

শিশির তাহাকে বলিল—"তুমি একটু বোস, আমি এখনি আসছি।"

সে ধীরে ধীরে পিতার বস্ত্র পরিবর্ত্তনের কক্ষে গেল। পায়ে পক্ষাঘাত হওয়ায় সে দ্রুত চলিতে পারে না। পিতাকে গিয়া বলিল—

"বাবা তোমার ঐ আফিসের ছোকরা বয় ইংরাজী জানে, সে তোমার ভুল ধরেছে, বলেছে Strongএর Comparative Stronger হবে, আর Pretty Prettier হবে, আমি বল্‌লাম যে বাবা বলেছেন Strongest হবে, Prettiest হবে।

মিঃ রায় হাসিয়া বলিলেন—"সেই ঠিক বলেছে, আমিও তাই বলেছিলাম, তুমি ভুলে গেছ বোধ হয়।"

শিশির বিস্মিত ভাবে বলিল—"বাবা, ও যেমন গ্রামার পড়ায়, তুমিও তেমন পার না। কত শীঘ্র আমার মুখস্থ হ'য়ে গেল। ওর ছোট ভাই নাকি আমার চেয়েও বেশী পড়ে। কাল ওদের মিঃ ব্যানা-র্জীর ছেলেরা কি মারই মারছিল।"

মিঃ রায় বলিলেন—"সত্যি?" তারপর পুত্রের হাত ধরিয়া বাহিরে আসিলেন, অজিতের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এত সকালে যে, কি হয়েছে?"

অজিতের চিঠির কথা মনে করিতেই মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, সে রুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল—

"আমার বড় অপরাধ হয়েছে, কাল আপনি যে চিঠিখানি ডাকে দিতে বলেছিলেন দেওয়া হয় নাই।"

মিঃ রায় একটু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"খেল্‌তে খেল্‌তে ভুলে গেছ বুঝি? তা দাও সে চিঠিখানা, আজ এখনো সময় আছে, আমি সেই ভয়েই একদিন আগে ডাকে দি।"

অজিত বলিল—"আমি আজ সকালে তাহা ডাকে দিয়া তবে এখানে এসেছি। যদি তাতে আপনার কোন ক্ষতি হয়, সেইজন্য আপনাকে জানাতে এসেছি। এবার আপনি আমায় ক্ষমা করুন, ভবিষ্যতে আর এমন হ'বে না।"

মিঃ রায় বলিলেন—"কাল কেন ভুলে গেলে?"

অজিত বলিল—"পথে আসিতে আসিতে দেখিলাম, ছেলেরা আমার ভাইকে মারছিল—"

মিঃ রায় বলিলেন—"ওঃ সেইজন্য শিশির কাল বল্‌ছিল বটে। তা এবার তোমায় মাপ কর্‌লাম, কিন্তু দেখো আর যেন না হয়।"

অজিত কৃতজ্ঞ অন্তরে মিঃ রায়কে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

শিশির বলিল—"বাবা, বড় ভাল ছেলেটি। ওকে কেন অমন কাজ দিয়েছ ? ওকে আমার কাছে রাখ ত বড় ভাল হয়। আমার সঙ্গে কেউ খেলা করে না। সারাদিন একলা থাকি, তুমি ত বলছিলে আমার বয়সী একটি ছেলে পেলে রাখ্‌তে।"

মিঃ রায় বলিলেন—"আচ্ছা, সে কথা পরে হবে। এখন এসো কেমন পড়া করেছ দেখি" এই বলিয়া তিনি পুত্রের পাঠে মনোনিবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজকুমারা দেবী।

পরলোকগত ডাক্তার দুকড়ি ঘোষ

ও

তাঁহার সহধর্ম্মিণী রমাসুন্দরী।

যে পূতচরিত্র দেবোপম দম্পতীর পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, এই অভাজন তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে ও অশেষরূপে ঋণী। এই জন্য নিজের সম্পূর্ণ অসামর্থ্য সত্ত্বেও আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিবার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না।

ভক্তিভাজন ডাক্তার দুকড়ি ঘোষকে অনেকেই উত্তমরূপে জানিতেন ; সুতরাং তাঁহার পরিচয় প্রদানে অধিক বাক্যব্যয় অনাবশ্যক। ইংরাজী ১৮৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই মহাপুরুষ কলিকাতা মহানগরীর ঠন্‌ঠনিয়া নামক পল্লীতে সুবিখ্যাত শঙ্কর ঘোষের বংশে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু বংশমর্য্যাদার সঙ্গে তিনি কোনওরূপ ধন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন নাই। শৈশবেই পিতৃ মাতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার পিতৃব্যের উপর তাঁহার লালন পালন ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। টানাটানির সংসারে তাঁহার বিদ্যাভ্যাস সামান্য কষ্টে সম্পন্ন হয় নাই ; কিন্তু তিনি কোনও কষ্টেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। একান্ত অধ্যবসায় সহকারে ইংরাজি ভাষায় যথোচিত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি অবশেষে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। সে সময়ে উক্ত কলেজে এডওয়ার্ড গুডিভ প্রমুখ কতিপয় সুদক্ষ ও সহৃদয় অধ্যাপক বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক অধ্যাপনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। দুকড়ি বাবু নিজগুণে স্বল্পকাল মধ্যেই তাঁহাদের সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। শারীরস্থান বিদ্যা ও তৎসংক্রান্ত শবশরীর ব্যবচ্ছেদ ও অস্ত্রচিকিৎসা তাঁহার মনোযোগকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার এই বিষয়ে আগ্রহাতিশয় দেখিয়া কলেজের আউট্‌-ডোর ডিস্পেন্সারীর ভারপ্রাপ্ত এপথিকারি সাহেব নিজের শ্রমলাঘবাভিপ্রায়ে তাঁহার সাহায্যগ্রহণ করিতে ক্রুটি করিতেন না। তিনি মনের সাধে উক্ত ডিস্পেন্সারীতে অস্ত্রচিকিৎসা অভ্যাস করিতেন ; এতদ্ভিন্ন যথাক্রমে কলেজ হাঁসপাতালের রোগীদিগের পরিচর্য্যা করিতেন। এইরূপে তিনি অস্ত্রচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার এ সম্বন্ধে এরূপ অসাধারণ স্বাভাবিক নৈপুণ্য ছিল যে, প্রাচীন বয়সে তিনি অকম্পিত ও ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতেন। কলেজের শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দুকড়ি বাবু সব্‌ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্‌ (বর্ত্তমান এ্যাসিষ্টাণ্ট্‌) সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হন এবং কয়েক বৎসর রাজমহলে ও আরায় সরকারী চিকিৎসালয়ের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। এই সময়ে তিনি অস্ত্রপ্রয়োগ কৌশলে অনেক দুরারোগ্য রোগ হইতে বহুসংখ্যক রোগীকে মুক্ত করিয়া প্রচুর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

কলেজ ছাড়িবার পূর্ব্বেই কোন্নগর নিবাসী স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেবের প্রাণসমা কনিষ্ঠা কন্যা রমাসুন্দরীর সহিত দুকড়ি বাবুর বিবাহ হয়। শিবচন্দ্র বাবু সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া পাত্রের বিষয় বিভবের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠজামাতা ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই সুপাত্র নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। পঠদ্দশায় দুকড়ি বাবুর কোনরূপ বিলাস বা বেশভূষার দিকে লক্ষ্য ছিল না। বিবাহরাত্রে বরের মস্তকের সংস্কার-বর্জ্জিত কেশরাশি ও লাবণ্যবিহীন অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া নারী মহলে প্রথমে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা দিয়াছিল ; কিন্তু শিবচন্দ্র বাবু জামাতার উন্নত ও প্রশস্ত ললাট, আয়তলোচন, বিশাল বক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহু প্রভৃতি বীরোচিত সৌন্দর্য্য সৌম্য ও সারল্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহ দুকড়ি বাবুর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শুভকরী ঘটনা। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভাগ্যে এরূপ স্ত্রীরত্ন এবং এরূপ শ্বশুর শাশুড়ী লাভ হয়। শিবচন্দ্র বাবু ও তাঁহার ধর্ম্মশীলা পত্নী পিতৃমাতৃহীন দুকড়ি বাবুকে কেবল সন্তানের অধিক ভালবাসিয়া ক্ষান্ত হন নাই ; বস্তুতঃ তাঁহারাই দুকড়ি বাবুর আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল কারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দুকড়ি বাবুর সহধর্ম্মিণী রমাসুন্দরীর গুণের কথা আমি কি বলিব ? আমি একাধারে এরূপ প্রখর প্রতিভার সহিত এরূপ অলৌকিক ধর্ম্মভাবের ও নারীজনোচিত সর্ব্বগুণের সমাবেশ আর কোথাও দেখি নাই। রমাসুন্দরী অতি শৈশবকাল হইতেই বুদ্ধিমত্তা ও সাধুশীলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পিতামাতার আদরের কন্যা হইয়াও তিনি কখনও এমন কোনও দোষ করেন নাই যাহা দণ্ড বা তিরস্কারের যোগ্য। বালিকাস্বভাব সুলভ চাপল্যও কখনও তাঁহাতে দেখা দেয় নাই। তিনি কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন নাই ; তাঁহার পিতা স্বগৃহেই তাঁহার কন্যার শিক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রমাসুন্দরী যেরূপ মেধাবিনী ছিলেন তাহাতে তিনি যে মাতৃভাষায় অল্পদিনের মধ্যেই পারদর্শিনী হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। অল্প বয়সেই তিনি সুললিত বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য রচনা করিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন। তিনি একবার কাশীযাত্রা করিয়া তথায় যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা একখানি পদ্যময় পত্রে বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই পত্রখানি "বামাবোধিনী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত পত্রিকায় একবার উৎকৃষ্ট বামা-রচনার জন্য পুরস্কার প্রদানের বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। তদনুসারে যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটী প্রবন্ধ পুরস্কার যোগ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়। একটী রমাসুন্দরীর, অপরটি প্রসিদ্ধ গায়ক ৺রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা শৈলসুতা দেবীর রচিত। রমাসুন্দরী যেরূপ বিদুষী ছিলেন, তদনুরূপ কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই ; ইহার একমাত্র কারণ এই যে, তিনি স্বভাবসিদ্ধ বিনয়বশতঃ পুস্তক ছাপাইয়া খ্যাতিলাভ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। বস্তুতঃ বিদ্যার অভিমান এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই ; লজ্জাশীলতা, পতিপরায়ণতায়, স্নেহমমতায় ও দয়াদাক্ষিণ্যে তিনি এতদ্দেশীয় রমণীগণের আদর্শস্থল ছিলেন। ইংরাজি ভাষায়ও তাঁহার সামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মে নাই ; তিনি উক্ত ভাষায় লিখিত যে কোনও পুস্তক অনায়াসে পাঠ করিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। আমাকে ঘটনাক্রমে কিয়ৎকালের জন্য তাঁহার ইংরাজি শিক্ষায় সহায়তা করিতে হইয়াছিল। ঐ সূত্রে আমি তাঁহার অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতাম। যে পাঠ একবার বলিয়া দিতাম তাহার কখনও পুনরাবৃত্তি করিতে হইত না। আমার বঙ্গভাষায় তাদৃশ

অধিকার ছিলনা বলিয়া অনেক সময়ে ইংরাজি শব্দের অনুরূপ বাঙ্গালা শব্দ যোগাইত না, কিন্তু তিনি প্রকৃত অর্থের কথঞ্চিৎ আভাস পাইবামাত্র অভিলষিত শব্দটী নিজেই যোজনা করিতেন। তাঁহার বুদ্ধি শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ ছিল। আমি একবার ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্র হইতে কতকগুলি ভ্রান্ত অনুমানের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলাম; তিনি প্রত্যেক তর্কের অন্তর্নিহিত প্রমাদ সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানপিপাসা আজীবন বলবতী ছিল। আমি ইংরজো সাহিত্য হইতে অত্যুচ্চ ভাব ও চিন্তা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে শুনাইলে তিনি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিতেন, এবং আমাকে কত আশীর্ব্বাদ করিতেন।

রমাসুন্দরীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার কথা একমুখে ব্যক্ত করা যায় না। তাঁহার অচলা ভগবদ্ভক্তি ও ঈশ্বরের উপর অটল নির্ভর ঘোর বিপদে, উৎকট রোগ-যন্ত্রণায় বা দারুণ শোকেও কদাপি বিচলিত হয় নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রথম বয়সেই স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি বহু বৎসর ধরিয়া উৎকট শ্বাসরোগের দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রোগে পড়িয়াও সাধ্যমত কর্ত্তব্যপালন করিতে ত্রুটি করেন নাই। গৃহকর্ম্মের প্রতি তাঁহার যথোচিত আস্থা ছিল এবং অতিথি সেবায় তিনি আন্তরিক আনন্দানুভব করিতেন। কি স্বামী সেবায়, কি পিতৃমাতৃ সেবায়, কি সন্তান পালনে, সকল বিষয়েই তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি নিজে যেমন প্রথম যৌবনেও ভোগবিলাসপ্রিয় ছিলেন না, তেমনি সন্তান সন্ততিকেও সযত্নে বিলাসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেন। তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণা রমণী আমি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি প্রতিদিন তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের ন্যায় অন্যায় অতি কঠোর বিচারপতির ন্যায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিতেন। সন্তান সন্ততির শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে তাঁহার যেমন লক্ষ্য ছিল তাহাদের নৈতিক স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার তেমনি প্রখর দৃষ্টি ছিল। কোনও প্রকার মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বা নীচতা তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। আমি এই মহিমাময়ী দেবী... সদুপদেশ প্রভাবে কতবার কত নৈতিক বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইয়াছি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারি না... সংসারের নানাবিধ জটিল সমস্যায় পড়িয়া যখন... তাঁহার শরণাগত হইয়াছি তখনই তাঁহার নি... নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ানুমোদিত উপদেশ লা... করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। বাহুল্য ভয়ে আমি রমা... সুন্দরীর গুণকীর্ত্তন এইখানেই সাঙ্গ করিলাম।

দুকড়ি বাবু সাব্ এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হইবার কয়েক বৎসর পরে ঐ পদ পরিত্যাগ করি... কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং এখানে থাকি... স্বাধীনভাবে চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তি... ন্যূনাধিক পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া এই মহা... নগরীর একজন সর্ব্বজনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন... কিন্তু তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি যেরূপ হইয়াছিল, আ... সেরূপ হয় নাই। তাহার কারণ এই যে, তি... অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং আয় বৃদ্ধির দিকে ... একটা মনোযোগ দিতেন না। কয়েকটী সম্ভ্রা... পরিবারের তিনি পারিবারিক চিকিৎসক নিযু... হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিনা ভিজিটে অনে... দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করিতেন এবং স্বল্প... গৃহস্থের নিকটেও অনেক সময়ে অর্থ গ্রহণ করিতে... না। ফলতঃ তাঁহার ন্যায় দয়াশীল সহৃদয় চিকিৎসকে... অর্থোপার্জ্জন চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। কত অল্প... ব্রাহ্ম ও হিন্দু পরিবার তাঁহার নিকট ঋণী, তাহা... সংখ্যা কে গণনা করিতে পারে? যদিও পার্থিব ব্যা... তাঁহার অধিক টাকা জমে নাই, "বিধান ব্যা... তাঁহার সঞ্চিত ধনের সীমা কে নিরূপণ করি... পারে? দুকড়ি বাবুর পরিবারের সংখ্যা অ... ছিল না, এবং তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন ব... এরূপ অকাতরে পরোপকার ব্রত সাধন করি... ঋণগ্রস্ত হন নাই। তাঁহার গুণের বিশেষ পরি... আর কি দিব? তাঁহার তুল্য আড়ম্বরশূন্য ... প্রাণ সাধু মহাত্মা অতীব বিরল! তাঁহার কো... হৃদয় পর দুঃখ দেখিলেই কাতর হইত এবং ... সাধ্যমত সেই দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতেন।

...র প্রকৃতির লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৌম্য ...র্য্যের সহিত শিশুর সারল্য বিজড়িত ছিল। ...নি মানব প্রকৃতি উত্তমরূপে জানিতেন; মানুষের ...লতা, নীচাশয়তা, কপটতা, তাঁহার অবিদিত ছিল ... কিন্তু তিনি সকলকেই উদার দৃষ্টিতে দেখিতেন। ...নি মিতভাষী ও নির্ব্বোরোধী ছিলেন, কিন্তু অন্যায় অসত্যকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। অন্যায় ...য়ে অর্থোপার্জ্জন করিলে তিনি অনেক টাকা ...য়া যাইতে পারিতেন।

এ সম্বন্ধে একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিয়া ক্ষান্ত হইব। ...নি একজন ধনকুবেরের পারিবারিক চিকিৎসক ...ন। ঐ ব্যক্তির মুমূর্ষু ও অচৈতন্য অবস্থায় ...র কোনও কোনও আত্মীয় একখানি উইলপত্র ...ত করিয়া দুকড়ি বাবুকে বহু সহস্র মুদ্রা পুরস্কার ...নের প্রলোভন দেখাইয়া অনুরোধ করেন যে, ...নি কেবল এই কথাটী লিখিয়া দিন যে, সে সময় ...র জ্ঞান তিরোহিত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, ...ড়ি বাবু উক্ত অন্যায় প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন ...।

দুকড়ি বাবুর শরীরে আলস্য ছিল না; তিনি ...য় কর্ম্ম করিতে বড় ভালবাসিতেন; দাস দাসীর ...র বড় একটা নির্ভর করিতেন না। পুত্র কন্যার ... বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বেথুন ...জের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল; তিনি ঐ ...জের অবৈতনিক চিকিৎসক ছিলেন। তাঁহার ...ত্র কন্যা শ্রীমতী জীবনবালা দত্ত উক্ত কলেজে ...ন করিয়া "বি-এ" উপাধি প্রাপ্ত হন। দুকড়ি ... মিতাহারী ছিলেন এবং শারীরিক নিয়ম পালনে ...নও অবহেলা করেন নাই। প্রত্যহ প্রাতর্ভ্রমণে ...ত হইতেন; বাটী ফিরিবার পূর্ব্বে প্রায়ই ...স্বজনের তত্ত্ব লইতেন এবং দুই চারিটী রোগীও ...তেন। বাহিরের আমোদ প্রমোদে তাঁহার ...নও কালে আসক্তি ছিল না। তাঁহার বাসগৃহ ...ন্তির আলয় ছিল, সেখানে বাহিরের কোলাহল ...বিত্রতার একেবারে প্রবেশ নিষেধ ছিল। যিনি ...নও তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ পরিবার কাহাকে বলে, তাহা তাঁহার জানিতে বাকি নাই।

দুকড়ি বাবুর ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল। ৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন "বেঙ্গলী" সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন, সে সময়ে দুকড়ি বাবু উক্ত পত্রে সরকারী চিকিৎসা বিভাগ সম্বন্ধে কতকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভার কমিটির একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন এবং কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত দেশহিতৈষী ছিলেম এবং দেশের হিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানে তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, অবিশ্রান্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মত্যাগ মানবজীবনকে মহিমান্বিত করে। দুকড়ি বাবুর সমগ্র জীবন এই আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।

তিনি ইংরাজী ১৯০৩ সালের মধ্যভাগে একমাত্র পুত্র জ্ঞানচন্দ্রের ওকালতী সূত্রে নাগপুরে প্রবাসনিবন্ধন কলিকাতা পরিত্যাগ করেন এবং তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ চিকিৎসা কার্য্য হইতে এক প্রকার অবসর গ্রহণ করেন; কিন্তু তখনও তিনি নিঃস্ব অসহায় রোগীগণের চিকিৎসা করিতে বিরত হন নাই। পিতৃভক্ত পুত্রের গুণে দুকড়ি বাবুর জীবনের শেষ দশ বৎসর নাগপুরে পরম সুখে কাটিয়াছিল; সেখানেও তিনি পুত্রের নিষেধ না শুনিয়া সুযোগ পাইলেই বিনা ভিজিটে আতুরদিগের চিকিৎসা করিয়া নিজের পরার্থপরতা বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। বিগত ২রা এপ্রিল তারিখে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষের দুরন্ত মেহ রোগে মৃত্যু হয়। ইঁহার পতিপ্রাণা ভগ্নশরীরা সহধর্ম্মিণী রমাসুন্দরী দিবারাত্র স্বামীর শুশ্রূষা করিয়া স্বয়ং ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগাক্রান্ত হন এবং ৩রা এপ্রিল তারিখে তেষট্টি বৎসর বয়সে স্বামীর পথ অনুসরণ করেন। মৃত্যুর অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই তাঁহার সংজ্ঞালোপ হইয়াছিল, সুতরাং স্বামীর মৃত্যু সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। ধন্য সাধু দম্পতি! দুইজনের মধ্যে

কাহাকেও অপরের বিয়োগ যাতনা সহ্য করিতে হইল না। আদর্শ দম্পতী বিশ্বজননীর চিরশান্তিময় ক্রোড়ে এক কালে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহাদের পুণ্যোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যেকের জীবন পথের প্রদীপ হউক।*

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

আমাদের কর্ত্তব্য।

আমাদের প্রত্যেকেরই যে মাতৃভূমির প্রতি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে বর্ত্তমান নব জাগরণের যুগে আমরা অনেকেই তাহা অল্পাধিক পরিমাণে অনুভব করিতেছি। সংবাদপত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে দায়িত্ব বোধের পরিচয় প্রদানে অনেকদিন যাবতই কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু এতদিনে আমরা নিজ নিজ দায়িত্ব বাস্তবিকই প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতেছি। তাই এবারের অভিব্যক্তিতেও বিশেষত্ব আসিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই তাহা কার্য্যকরী হইয়া উঠিয়াছে। দেশীয় ভ্রাতাগণের স্বদেশপ্রীতি জাতীয় কর্ত্তব্যক্ষেত্রের যে কোন বিভাগেই সফলতা লাভ করুক না কেন আমাদের তাহাতে আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তবে আমাদেরও যে নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরের খবর এবং তাঁহাদের চিন্তা ও কাজের অংশ পাইতে আকাঙ্ক্ষা হয়, জাতীয় আনন্দ ও বিপদজনক ঘটনা সমূহের ভাব প্রবাহ আমাদের অন্তরকেও যে স্পর্শ করিতেছে, আমাদিগকে কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়াই যে আমাদের প্রতি তাঁহাদের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা প্রায় সকলেই ভুলিয়া আছেন। এদেশের যে সব সভা সমিতিতে রাজনীতি হইতে ম্যালেরিয়া পর্য্যন্ত কিছুরই আলোচনা বাদ যায় না তাহাদের সুদীর্ঘ কার্য্য তালিকা পাঠ করিলে এদেশে নারীজাতির অস্তিত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ভারতীয় নারীশক্তি অজ্ঞানতার কূপে ডুবিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সেজন্য ভারতহিতৈষীগণ তাঁহাদের স্বদেশোন্নতি চেষ্টা অঙ্গহীন হইতেছে বলিয়া মনে করিতেছেন না। আমাদের জীবন তাঁহাদের বিবেচনায় এত অবহেলার জিনিষ বলিয়াই, তাঁহাদের দেশহিতৈষণার সহিত আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরাও মনে করিতে পারিতেছি না। পারিবারিক হিসাবে একথা কোন কোন স্থলে ঠিক না হইতে পারে কিন্তু জাতীয় হিসাবে এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দু মুসলমানের অথবা নরম ও গরম দলের বিরোধ বাড়িয়া উঠিলে শক্তিক্ষয়ের ভাবনায় খাঁটি স্বদেশ প্রেমিকদের আহার নিদ্রা বন্ধ হয়, কিন্তু তাঁহারা যে শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার তুল্য শক্তি যে তাঁহাদেরই গৃহকোণে তাঁহাদেরই ঔদাসীন্য ও অবিবেচনার ফলে অপব্যয়িত হইতেছে, তাহার সদ্ব্যবহার করিলে তাঁহাদিগকে যে পদে পদে ভগ্নোৎসাহ হইতে হয় না, সমগ্র ভারতের কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে একথা ভাবিবার অবসর তাঁহাদের কোথায়? তাঁহাদের অবসর না থাকুক আমাদের ত আছে; তাঁহারা জগতের ভাবনায় ভারতের ভাবনায় ব্যস্ত আছেন, থাকুন, আমাদের ত অন্ততঃ নিজেদের ভাবনাটাও ভাবা উচিত। বহু শতাব্দী পর ভারতনারীর পক্ষে আত্মশক্তি উন্মেষ করিবার অনুকূল সময় আবার আসিয়াছে। স্বদেশীয় বিদেশীয় জ্ঞানীগণের জীবনব্যাপী সাধনার ফল জ্ঞানপূর্ণ চিন্তা ও সিদ্ধান্ত সমূহ, পরার্থপর আত্মত্যাগী উন্নতচেতা মহাপুরুষগণের এবং সেবাব্রতধারিণী প্রাতঃস্মরণীয়া পূতচরিত্রা দয়াময়ী মহিলাগণের জীবনীসমূহ জগতের সেবাক্ষেত্রে কর্ম্মশীল বিশ্বসেবক ও সেবিকাগণের আত্মদানের অপার্থিব দৃষ্টান্ত সমূহ আমাদের আত্মোন্নতির

* শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত হইবে বলিয়া লিখিত।

...দান স্বরূপ সজ্জিত রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত এ ...দেশের বর্ত্তমান উষর অবস্থায়ও ভারতবাসীর পক্ষে ...ভগবানের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ এমন দু চারজন মহাত্মা ...জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাদের কার্য্যকরী স্বদেশপ্রীতি, ...নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা, বিপন্নের জন্য আত্মদান, সর্ব্ব- ...শ্রেণীর লোকের হিতের জন্য প্রভূত পরিমাণে ত্যাগ- ...স্বীকার, বিবেকানুমোদিত কার্য্যে অসাধারণ নির্ভীকতা ...আর্ত্ত ও অনাথদিগের সহিত পিতৃবৎ এবং সর্ব্বসাধা- ...রণের সহিত মর্য্যাদার অভিমানশূন্য সরল সদয় ব্যব- ...হার প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে আমাদের অনুসরণীয়। ...ইঁহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার এবং ইঁহাদের ...পদাঙ্কানুসরণ করিবার চেষ্টা করিলে ইঁহাদিগকে ...জীবন স্রোতের ধ্রুবনক্ষত্র স্বরূপ জ্ঞান করিলে আমরা ...কখনও পথভ্রান্ত হইব না। স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে ...প্রসূত ঔদার্য্যমূলক ভারতীয় উচ্চ চিন্তা সমূহ, সাম্য- ...মূলক পাশ্চাত্য উচ্চ চিন্তার মিশ্রণে পাশ্চাত্যভাবে ...অনুপ্রাণিত বর্ত্তমান ভারতীয় সামাজিক জীবনে ...প্রতিফলিত হইবার উপযোগী হইয়াছে, ব্যক্তিগত ...জীবন সেই উন্নত ভাবসমষ্টির অনুকৃতিবৎ গঠিত ...করিবার ভার আমাদের প্রত্যেকের উপর রহিয়াছে। ...পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য যে আহ্বান বহু- ...দিন পূর্ব্বে এই পুণ্যভূমির নরনারীর প্রাণে ধ্বনিত ...হইয়াছিল, এতদিন পর আবার তাহা অপূর্ব্ব উদ্দী- ...পনার সহিত আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে, ...এই আহ্বানে বধির হইলে ভগবানের দৃষ্টিতে আমরা ...আত্মঘাতিনী হইব। আত্মোন্নতি হইলে আত্মবিসর্জ্জনের ...আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই আমাদিগকে ব্যাকুল করিবে। ...আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে আত্মনির্ভরই আত্মোন্নতির প্রথম সোপান। মুখাপেক্ষী হইব ...আমরা কাহার? এদেশীয় পুরুষদিগের? যাঁহারা শত ...সহস্র বৎসর ধরিয়া পরিচর্য্যার প্রতিদানে আমাদিগকে ...পদ দলন করিতেছেন, যাঁহারা পাশবিক শক্তি ও ...স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর সামাজিক বিধান দ্বারা কত ...লাঞ্ছনা অপমান অবিচার, কত অমানুষিক অত্যাচার ...নীরবে সহিতে আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছেন। যাঁহারা ...বলিয়া থাকেন "ঐ দেয়ালঘেরা আঙ্গিনাটুকুই তোমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও বাসের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আমাদের দাসত্ব ব্যতীত অন্য কাজে হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক ও অধিকার তোমাদের নাই। ভগবানেও তোমাদের প্রয়োজন নাই, কেন না আমরা তোমাদের দেবতা, কায়মনোবাক্যে আমাদের চরণ সেবা করিলেই তোমাদের সদ্গতি হইবে!" যাঁহারা নিজেদের একাধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যত্নের সহিত আমাদের শিক্ষা দীক্ষার পথ রুদ্ধ করিয়া আমাদের আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া প্রতিবাদে আমাদিগকে তাঁহাদের কৃপাভিখারিণী করিয়াছেন, যাঁহাদের প্রভুত্বপ্রিয়তা ও স্বার্থপরতার ফলে প্রাচীন ভারতীয় নারীসমাজের আদর্শ আমাদের সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়াছে, যাঁহাদের নিকট নিগৃহীত হইতে হইতে জগতের নারীসমাজে ভারতনারীর স্থান কোথায়, ইতর প্রাণীর সহিত আমাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়, ইহা স্থির করা অসম্ভব হইয়াছে। জগতের যাবতীয় চিন্তাশক্তি যে মহিমাময়ের মহান্ ভাব কণিকামাত্র ধারণ করিতে সক্ষম নয়, যিনি আমাদের অস্তিত্বের মূলে, যিনি আমাদের প্রাণের ভিতর বিরাজ করিয়া তাঁহার গচ্ছিত ধন জীবনীশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করিতেছেন, আমাদের নিকট তাঁহার স্থান অধিকার করিতে আসিয়া তাঁহার দিক্ হইতে আমাদের হৃদয়কে বিমুখ করিয়া কুসংস্কারের নাগপাশে যাঁহারা আমাদিগকে জড়িত করিয়াছেন, আমরা মানবোচিত মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিসাধন করিবার চেষ্টা করিলে যাঁহারা আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট ন্যায়সঙ্গত আচরণ প্রত্যাশা করিবার মত সময় আসিয়াছে কি? না—এখনও সেদিন বহুদূরে রহিয়াছে। এ সকল কথাও দেশীয় সমগ্র নারীসমাজের অবস্থা স্মরণ করিয়াই বলিতেছি।

এখন আমাদের কর্ত্তব্যের বিষয় ভাবা যাক্, নারীজাতির কর্ত্তব্য কেবল জল তোলা বাসন মাজা রান্না করা ও সন্তান পালন করা নয়! আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য দুইটী। প্রথমতঃ—আত্মোন্নতি করা; দ্বিতীয়তঃ—ভগবানের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে আত্মোৎসর্গ

করা। বি-এ এম্-এ পাশ করিতে না পারিলেই আত্মোন্নতির চেষ্টা পণ্ড হইবে এরূপ ধারণা ঠিক নয়। ইংরাজী ভাষা এবং ইংরাজী ভাবপুষ্ট বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা, নানাদেশীয় উন্নত চিন্তা ও বিশুদ্ধ ভাব নিচয় উপভোগের জন্য সর্ব্বদা আমাদের নিকটে উপস্থিত করিতেছে। সংগ্রহ করিতে শিখিলে তদ্দ্বারা আমরা অল্পায়াসেই হৃদয়মন্দির সুন্দররূপে সাজাইতে পারি। এই উপায়ে অন্তরের মলিনতা ধৌত করিতে আরম্ভ করিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের ভিতর ভগবানের ইঙ্গিত অবশ্যই অনুভব করিব। তখন আমরাও "যে পথ দিয়ে চলিয়ে যাব সবারে যাব তুষি।" এই চেষ্টার সহিত আমাদিগকে সমাজে স্বাধিকার লাভের চেষ্টাও অবশ্য করিতে হইবে। আমরা কোথায় ছিলাম আর ডুবিতে ডুবিতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি ভাবিলে হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হয়। তবে বর্ত্তমান দুরবস্থা হইতেও এরূপ সহস্র দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায় যে শিশুশিক্ষা পড়া বাঙ্গালী বালিকার হৃদয়ে যে প্রশস্ততা, উদারতা ও ত্যাগ স্বীকারের ভাবটুকু রহিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী এদেশীয় অনেকের প্রাণে তার শতাংশের একাংশও দুর্ল্লভ। কাজেই আমাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই, চরিত্র-বলও হৃদয়বলের সাহায্যে স্বস্থানে পুনরারোহণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত! এদেশীয় অধঃপতিত জরাজীর্ণ সমাজ সঞ্জীবিত করিবার ভারও আমাদের উপর রহিয়াছে। সংস্কারকগণের সহস্র চেষ্টা সত্বেও এ ক্ষেত্রে আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহা আমাদের উপস্থিতি ভিন্ন কখনও সাধিত হইবে না। অতএব আমাদিগকে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে এই মুমূর্ষু সমাজদেহে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য ভগবান আমাদিগকেই বিশেষভাবে আদেশ করিতেছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সব দেশের সমুদায় লোক নিজদের প্রয়োজন সারিয়া লইতে শিখিয়াছে সে সব দেশের পরিবর্ত্তে আমরা এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে জন্মিয়াছি। জন্মভূমির শোচনীয় অবস্থা আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনে সহায়তা করিবে সন্দেহ নাই।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের প্রণালী ও কেন্দ্রস্থল সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনে পরিষ্কার ধারণা থাকা আবশ্যক। এদেশীয় ভদ্রলোকদের মধ্যে সাধারণতঃ এই দেখা যায় যে যিনি যে পরিমাণে শিক্ষিত তিনি সেই পরিমাণে রাজনৈতিক। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কাজ যতই হউক আর নাই হউক, লোকের অভাব হয় না। কাজেই এ ক্ষেত্রে কাজকর্ম্মের অবস্থা যেরূপই হউক, কাজের লোকের ভিড় যথেষ্ট আছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করিবার মত শক্তি ও সুবিধা আমাদের প্রায় সকলেরই নাই। সর্ব্বতোভাবে আমাদের উপযোগী উন্নততর বিশালতর কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ না করিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রের বাক বিতণ্ডা বর্দ্ধিত করা আমাদের পক্ষে সমীচীন নহে। স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের সম্পাদন কল্পে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করা আমাদের অন্যতম কর্ত্তব্য। কিন্তু সুযোগ ও সামর্থ্যের অভাবে এবং অন্তরায় সমূহের প্রভাবে আমাদিগকে আপাততঃ তাহা হইতে ক্ষান্ত থাকিতে হইতেছে, আর মানবজীবনের চরম পার্থিব লক্ষ্য কেবল শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক হওয়াও প্রার্থনীয় নয়।

এ সমুদায় পর্য্যালোচনার ফলে নিসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে জগতের সেবাব্রত গ্রহণ করাই আমাদের অবস্থা ও সামর্থ্যের পক্ষে সম্ভবপর। ইহা অসম্ভব হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের কল্পনার প্রকৃতি মানব সন্তানের উপযুক্ত নয়। আমাদের এই প্রধান কর্ত্তব্য সাধন করা অসাধ্য ত নহেই দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করিবারও কোন কারণ নাই। কোন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিবে কি না সে বিষয়ে লোকে চিন্তা ও ইতস্ততঃ করে; আমাদের কাজ সংসারের ভ্রাতা ভগিনীদের চরণে আত্মোৎসর্গ করা; সুফল দেখিবার সময় হয়ত আমাদের জীবনে আসিবে না। এ স্থলে এ কথা বলা আবশ্যক যে এখন "আমাদের" শব্দটী অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রয়োগ করিতেছি। কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় কথাগুলি বর্ত্তমান অবস্থায় এদেশীয় নারীসমাজের সমুদায় স্তরে প্রযোজ্য নহে। ইতঃপূর্ব্বে ভারত

[ম]হিলায় প্রকাশিত "সমাজ সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে [ভ]ক্তিভাজন লেখক মহাশয় সহৃদয়তার সহিত যাঁহা-[দে]র চিত্র আঁকিয়াছেন, "জগতের উচ্চ চিন্তার সহিত [য]াঁহাদের পরিচয় হইয়াছে" ভগবানের ও তাঁহার [স]ন্তানগণের সেবাক্ষেত্রে আপনাকে দান করিবার [ব]াসনা যাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুল করিতেছে, যাঁহাদের [ম]নোভাব অন্যরূপ অথচ যাঁহারা সংসারের বন্ধনে [জ]ড়িত হইতে ইচ্ছুক নহেন, সেই অল্প সংখ্যক দেশীয় [ভ]গিনীগণের নিকট এই কয়েকটা কথা নিবেদন [ক]রিতে আসিয়াছি। প্রসঙ্গক্রমে একথাও মনে [হ]ইতেছে কালানলে যাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত [হ]ইয়াছে, ঈশ্বর-চিন্তার সহিত নরসেবাই বুঝি তাঁহাদের [শ]োকোপশমের একমাত্র উপায়।

আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত,—নারীজাতির সেবা ও অবনত জাতির সেবা। সমাজের [উ]চ্চ স্তরের নারীদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে [গ]েলে সেখানে এমন দু-চার জনকে দেখিতে পাওয়া [য]ায়, যাঁহারা হৃদয়ের কোমলতায়, স্বভাবের মধুরতায়, [প্র]াণের সমুদায় সৎপ্রবৃত্তির চরমোৎকর্ষে, ফলপূর্ণ [বৃ]ক্ষবৎ অবনত থাকিয়া স্ব স্ব পূতচরিত্রের স্বর্গীয় [স]ৌরভে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছেন।

ইহার পর "ভদ্রঘরের মেয়েদের" মধ্যে নানারূপ [ব]ৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা [অ]নেকেই নিজের সম্বন্ধে ভারী উচ্চ ধারণা পোষণ [ক]রেন। অথচ শিক্ষিত স্বামীর সুখে সুখী, দুঃখে [দু]ঃখী হইতে অথবা উভয়ের চিন্তা-প্রণালীর সামঞ্জস্য [স]াধন করিতে পারেন এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায় দেখা যায় [ন]া। জগদীশ্বর জানেন ইঁহারাও তাঁহার কত দয়ার [প]াত্রী, কিন্তু এ স্থলেই বা আমরা কিরূপে কাজ [ক]রিব তাহাও প্রণিধানের বিষয়। ইঁহাদের সমীপে [আ]মরা কিছু নিবেদন করিতে আসিলে অবশ্যই তাহা [আ]বর্ত্তময়ী ঝটিকার সম্মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় উড়িয়া [য]াইবে কারণ ইঁহাদের অজানা দুনিয়ায় আবার কি [আ]ছে? স্ব স্ব পর্ব্বত প্রমাণ অভিজ্ঞতা পরস্পরকে [বি]তরণ করিতে ইঁহারা ব্যস্ত আছেন। ইঁহাদের [নি]কট যে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হউক না কেন, ইঁহারা অমনি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বিজ্ঞোচিত ভাবে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলেন, "ঢের দেখেছি।" এই দুরারোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব প্রধানতঃ পল্লীগ্রামে ইহার চিকিৎসা করিতে হইবে, তবে কেবল আমাদের দ্বারা কুলাইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। জাতীয় কল্যাণাকাঙ্ক্ষী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এই ভদ্র সমাজেও আমরা দেখিতে পাই, খায়, ঘুমায়, সন্তান পালন করে লক্ষ লক্ষ নারী। কিন্তু তাঁহাদের স্বামীর সহিত মনের মিল নাই, আত্মার যোগ নাই, আছে কেবল একটা ঘরকন্নার সম্বন্ধ; তদুপরি অপমান লাঞ্ছনা প্রভৃতিত প্রাত্যহিক প্রাপ্য। ঈদৃশ গৃহ সুখে সুখী ভগিনীগণ কি ভাবে কালযাপন করিতেছেন, ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। ইঁহাদের যন্ত্রণা ও অশান্তি লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে সম্ভবপর সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে কাজ করিতে হইলে যে অটল অধ্যবসায় ও অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এবং উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহাও আমাদের অনেকেরই নাই; নাথাকুক, তবু জন্মগত সম্বন্ধ আমাদিগকে এই স্থান হইতে পাশ কাটাইয়া যাইতে দিবে না। আমরা যে কাজ করিব, তাহার খ্যাতি পল্লীব্যাপী হইবে, না দেশব্যাপী হইবে, সে হিসাব করিবার ইচ্ছা তো রাখি না, তবে আর আমাদের উৎকণ্ঠার কারণই বা কি? আমরা উপহসিত হই, বিড়ম্বিত হই ক্ষতি নাই, দেশীয় ভগিনীদের দুর্গতি মোচন কল্পে আত্মবিসর্জ্জন আমাদিগকে করিতেই হইবে।

বিধবাদের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা সর্ব্বপ্রথমে করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের জননীগণ ব্যতীত ইঁহারা প্রায় সকলেই জীবনের সুখ শান্তি, আশা, উৎসাহ বিসর্জ্জন দিয়া নিতান্ত দীন হীন কুণ্ঠিত ভাবে অন্যের গলগ্রহ হইয়া আছেন, সামাজিক সম্ভ্রম ও বিড়ম্বনার ভয়ে স্বাবলম্বনপ্রিয়তার পরিচয় দিতেও সক্ষম নহেন। জগতের কর্ম্মোচ্ছ্বাস, হর্ষোচ্ছ্বাস তাঁহাদের নিকট নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। অনুগ্রহের আনুষঙ্গিক অপমান

উৎপীড়ন প্রত্যহ তাঁহাদের হৃদয়বহ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছে, তদুপরি তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ভয়াবহ চিত্র দর্শনে অনেকেই জীবন ভার দুর্ব্বহ জ্ঞান করিতেছেন। মানবাত্মার মূল্য ও মানব জীবনের উচ্চতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে উজ্জ্বল ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। এই চেষ্টা ফলবতী করিতে হইলে তাঁহাদের নিকট নিবেদন করিতে হইবে যে, তাঁহারা যদি আপনাকে ভুলিয়া জগতের সেবায়, দেশীয় ভগিনীদের সেবায় নিজকে দান করেন, তাহা হইলে এমন সুখ এমন শান্তি পাইবেন, যাহা স্বামী সম্মানিতা পুত্র পূজিতাদের পক্ষেও লোভনীয়। শুধু নিবেদন করিয়া নিবৃত্ত থাকা আমাদের পক্ষে উচিত হইবে না, সেই নিবেদন তাঁহাদের নিকট সমাদৃত করিবার জন্য সাধ্যমত আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। কর্ম্মপ্রবাহে তাঁহাদের জীবনের তিক্ততা ধৌত করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের পক্ষে আমাদের সহযোগিনী হওয়া সম্ভবপর নয়, তাঁহারা যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, সেই চেষ্টাও আমাদের করা উচিত। কুলীন-কুমারী প্রভৃতি অন্যান্য বৈধব্যানুরূপ দশাপন্ন মহিলাদের প্রতিও আমাদের উপরি উক্ত কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

সমাজের নিম্নস্তরে নারীজাতির উপর বর্ব্বরতার অবশ্যম্ভাবী ফল—লোমহর্ষণ অত্যাচারের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইলেও অন্যান্য বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই প্রায় সমান হীনদশাপন্ন। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় যে, ভারতমাতার সর্ব্বস্ব কোটি কোটি নরনারী নিজেদের নিদারুণ দুরবস্থা হইতে উদ্ধার কামনায় তাঁহাদের মুখ চাহিয়া আছে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শুধু কয়েকজন সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন এবং দুই একজন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য—আপামর সাধারণের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয় পরমেশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন শ্রেণীর নরনারীর হৃদয়সম্ভূত অকৃত্রিম ভক্তির অপরিমেয় উচ্ছ্বাস তাঁহাদিগকে প্রীত করিতেছে। বস্তুতঃ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, এ দেশীয় অশিক্ষিত জনসাধারণের হৃদয় অত্যন্ত কোমল ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ। এত শতাব্দী ব্যাপী অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের একাধিপত্য সত্বেও তাহাদের হৃদয়ে যে সদ্গুণ কয়টী অবশিষ্ট রহিয়াছে, সে কয়টী আমাদের জাতীয় সম্পদ সন্দেহ নাই।

মানবমাত্রই উত্তরাধিকার সূত্রে হৃদয়ে সং অসৎ প্রবৃত্তির বীজ নিয়া জন্মগ্রহণ করে। সংসর্গ ও শিক্ষানুসারে পরিণত বয়সে সেগুলি পরিস্ফুট আকার ধারণ করে; আর সে সমুদয়ের সমঞ্জসীভূত চরিত্রের প্রতিবিম্ব সমাজ মুকুরে প্রতিফলিত হয়। একই মানবসংজ্ঞাধারী জীবসমূহের হৃদয়ে যে পরিমাণ বৈচিত্র্যের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝি ভগবানের সমুদয় সৃষ্টি খুঁজিলেও তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। শিক্ষার প্রকার ভেদই এরূপ বৈসাদৃশ্যের প্রধানতম কারণ। এই সব স্বতঃসিদ্ধ কথা স্মরণ রাখিতে পারিলে সমাজের নিম্ন স্তরে স্থলে স্থলে ইতর জীবোচিত মনোবৃত্তি সকলের পূর্ণ বিকাশ দেখিলেও আমরা নিরুৎসাহ হইব না; সবলের সক্ষমতা দুর্ব্ব লের অক্ষমতা ভিন্ন উচ্চ নিম্ন শ্রেণীতে অন্য কোন প্রকার বিষম বৈষম্য আমাদের দৃষ্টিগোচরও হইবে না। বিশ্বপিতার পুত্র কন্যাগণের মধ্যে যাহারা সংসারে প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অধিকতর মলিন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের প্রাণের মলিনতা ও ক্লান্তি বিদূরীত করিবার জন্য জ্ঞান ধর্ম্ম এবং আত্মসম্মান বোধে তাহাদের হৃদয় সমুজ্জ্বল করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। জাতিবর্ণ স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে কুসংস্কার দূর এবং দরিদ্রতা লাঘব করিবার উপায়ের প্রতি লোকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে হইবে। সেবাক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সভ্যসমাজচ্যুত এই বিকলাঙ্গ সমাজের বিগত সম্মান পুনরানয়ন করিবার ইহাই প্রধানতম উপায়।

অবনত জাতির সহিত আমাদের যে স্বার্থ আছে, তাহা ইহাদেরই চরণে লুটাইয়া দিতে হইবে; অন্যথায় আমরা ইহাদের স্নেহ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইব না, কাজেই ইহারা আমাদের কথায় কর্ণপাতও করিবে না। কর্ম্মক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিবার সময়ে আমরা ফলাফলের প্রতি দৃক্‌পাত করিব না সত্য, কিন্তু যে ভাবে কাজ করিলে আমাদের সাধনা ফলপ্রসূ হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিলে আমাদের কার্য্যপ্রণালী ভগবানের অভিপ্রায়ানুরূপ হইবে না। ইহাদের মনোভাবের সহিত আমাদের মধ্যে যাহার মনোভাবের যতটুকু পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য এবং তাহার মূল কারণ শিক্ষা ইহাদের মধ্যে বিতরণ করা আমাদের জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য ত আছেই, সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের সনাতন রীতি নীতি সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত ইহাদের চিন্তাপ্রণালী সম্প্রসারিত, বিশেষতঃ ইহাদিগকে জাতীয় স্বার্থের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করিতে হইবে। জাতিভেদ প্রভৃতি কুপ্রথার মূলোৎপাটনের চেষ্টা করিতে হইবে।

নিম্ন শ্রেণীর নরনারীদিগকে বুঝাইতে হইবে যে, যাহারা ইহাদের ছায়াস্পর্শ করিলে স্নান করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত শ্রেণীতে উন্নীত হইবার উপযোগী উপাদান ভগবান তাহাদের প্রত্যেকের প্রাণের ভিতর সঞ্চিত রাখিয়াছেন। যে কথা বুঝিলে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে, আপনার অবস্থা বিদূরীত করা সাধ্যায়ত্ত বলিয়া মনে হয়, সে কথা তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে সেই বুদ্ধি ইহাদিগকে আত্মম্ভরি না করিয়া মনুষ্যত্বে মণ্ডিত করে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহারা যাহাকে নিজেদের শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বলিতে পারে, তাহাকে যেরূপ সরল ভক্তি বিশ্বাসের সহিত অসঙ্কোচে আপনার জন করিয়া লয়, তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সমাজের উচ্চতম স্তরে নিতান্ত দুর্ল্লভ। ইহাদের মধ্যে কাজ করা (আমাদের প্রতি ভগবানের বিশেষ করুণার নিদর্শন স্বরূপ) আমাদের কোন কোন মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিবার উৎকৃষ্ট উপায়। ইহাদের মাঝে কাজ করিবার সময় ইহারা আমাদের ক্রিয়া কুতর্ক জালে আচ্ছন্ন করিবে না, আমাদের কার্য্যের দোষালোচনা করিয়া আমাদিগকে বিড়ম্বিত করিবে না, আন্তরিক আগ্রহ ও অখণ্ড নির্ভরের সহিত আমাদের অনুরোধ শ্রবণ এবং আদেশ জ্ঞানে তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নবান হইবে; এরূপ ভরসা করিবার মত অনেক কারণ ইহাদের স্বভাব ও অবস্থায় রহিয়াছে! এ ক্ষেত্রের অজ্ঞানান্ধকার ক্রমশঃ নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমাদের স্তম্ভিত হইবার কোন কারণ নাই, এখানে আত্মদানের আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজনানুরূপ প্রবল হইয়া থাকিলে আমরা কখনও হৃদয়বলের অভাব অনুভব করিব না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসী'তে লিখিত হইয়াছিল যে, "পতিতাদের মনোভাব যতটা কলুষিত বলিয়া আমাদের ধারণা, তাহাদের সকলের ঠিক ততটা নয়।" তাহা হইলে বাহ্য দৃষ্টিতে যাহাই প্রতীত হউক না কেন, স্বকীয় অধঃপতিত অবস্থার নারকীয় ভাব অন্তরের অন্তরতম স্থল সন্তপ্ত করিতেছে, ফলে অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, একটু অনাবিল আনন্দের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, ভরসা করি, তাহাদের ভিতর এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নয়। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ লেখক মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "কোনও সেবাব্রতধারিণী ভগ্নী প্রেম পরিপূর্ণহৃদয়া মহিলা ইহাদের উদ্ধার চেষ্টা করিলে অনেক পুরুষ তাঁহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন।" পতিতোদ্ধার চেষ্টাও আমাদের কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত, ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ দু চারজনের হৃদয়স্থিত লালসা বহ্নি প্রেমের উৎসে পরিণত করিতে পারিলেও কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা আমাদের বিশেষ উপকারে আসিবে। যাহাতে ইহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে যে, মানবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল, দুষ্প্রবৃত্তির পীড়নে সাময়িক ভাবে তাহার গতি প্রতিহত হইয়াছে বলিয়া স্থায়ীভাবে রুদ্ধ হয় নাই।

আমাদের মধ্যে যাঁহাদের সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার পক্ষে দুরতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, তাঁহাদের অকথ্য মানসিক যন্ত্রণার বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখা এবং ঈপ্সিত পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে তাঁহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমরা এমন দু একটী বালিকাকে বিশেষভাবে জানি, যাহারা দূরে বঙ্গের নিভৃত পল্লী

প্রান্তে গৃহ কোণে নিজেকে অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া জগতের সেবাক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিবার চির-পোষিত বাসনা সফল হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত দেখিয়া বিফল জীবনের যাতনায় হৃদয় বেদনায় অধীর হইয়া রাত দিন মৃত্যু কামনা করিতেছে। ইহাদের হৃদয়ের গভীর ক্ষত কালের প্রলেপে শুষ্ক হইবার নয়। যে যত দুর্ব্বল অথবা উপেক্ষিত হউক না কেন, তারও যে একটা অনুভব শক্তি আছে, সেও যে নিজের জীবন সমস্যার একটা সমাধান করিতে চায়, জীবনের ব্যর্থতা প্রতি পদে আঘাত করিলে তাহারও যে বাঁচিয়া থাকা দায় হয়, সে সব বিষয়ে ইহাদের হৃদয়হীন ভাগ্য বিধাতাগণের—যাঁহাদের নির্ম্মমতা ও স্বেচ্ছাচার ইহাদের জীবনব্যাপী বৈফল্যের মূলে বিরাজ করিতেছে—মনোযোগ কখনও আকৃষ্ট হইবে না, ইহাও স্থিরনিশ্চয়।

আমাদের মধ্যে যাঁহাদের গন্তব্য পথ পরিষ্কৃত আছে অথবা হইয়াছে বলিয়া ভরসা করিতেছি তাঁহাদের সম্মুখেও বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নয়। সহস্র অন্তরায় আসিলেও ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচার শক্তির সাহায্যে সে সমুদয় অপসারিত করিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। যেখানে বিপুল কর্ত্তব্য রাশি আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে, সেখানে উপনীত হইয়া স্ব স্ব রুচি সামর্থ্য ও সুবিধানুরূপ কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। এজন্য পারিবারিক প্রীতিবন্ধন ক্ষুণ্ণ হইলেও যেন আমাদের পদস্খলন না হয়। আর আমরা আত্মমর্য্যাদাশালিনী এবং সেবাব্রত গ্রহণের উপযুক্ত হইয়া থাকিলে লৌকিক মর্য্যাদা অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত লাগিল কিনা সে সব দিকে ভ্রূক্ষেপ ত স্বভাবতই থাকিবে না। আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া থাকিলে ভালই হইয়াছে, কারণ মানব-জাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আহার্য্য সংগ্রহ ব্যতীত জন হিতকর কোন কর্ম্ম "স্থিরবুদ্ধি" লোকদের দ্বারা প্রায় সাধিত হয় নাই। জগতের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিকৃতির নিদর্শন স্বরূপ প্রলাপ প্রাণের সহিত বকিয়াছিলেন বলিয়াই আজও মানবের মানবত্ব অব্যাহত রহিয়াছে। ঐশ্বরিক প্রতিভা[illegible] শালী মহাজ্ঞানীগণ তাঁহাদের উষ্ণ মস্তিষ্কেরই অভি[illegible] ব্যক্তি স্বরূপ জ্ঞানবর্ত্তিকা দ্বারা জগতের অজ্ঞানান্ধ[illegible] কার ঈষত্তরল এবং নৈসর্গিক নিয়ম সমূহ লোকলো[illegible] নের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কা[illegible] ইঁহাদের নিগ্রহের বিবরণ আমাদের পক্ষে অত্য[illegible] শিক্ষাপ্রদ।

দেখ ভগিনীগণ! কি বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের [illegible] সম্মুখে। আমাদের কর্ত্তব্য শুধু এখানে নিজের প্রা[illegible] টুকু ঢালিয়া দেওয়া; তাহাও যদি আমরা না পারি[illegible] তবে আমাদের বাঁচিয়া থাকায় কি ফল? এতদ্[illegible] কাজ করিতে হইবে অর্থাৎ এই সমুদয় কাজ আপ[illegible] কাজ জ্ঞানে নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টায় জীবন ব্যয় করি[illegible] হইবে। এই সকল গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে একটি[illegible] হয় ত আমাদের জীবন দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে না, কি[illegible] সেজন্য জড়বৎ নিশ্চেষ্ট থাকিয়া মাতৃভূমির অধো[illegible] দর্শন করাও মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। কর্ম্মফল [illegible] অতশত না ভাবিয়া জাতীয় কর্ম্মপ্রবাহে স্বকীয় জীব[illegible] স্রোতটুকু মিশাইয়া দিয়া খাটিতে খাটিতে ম[illegible] আমাদের সকল কর্ত্তব্যের সার—একমাত্র কর্ত্তব্য[illegible]

শিক্ষিতা ভগিনীদের মধ্যে যাঁহারা গতানুগতিক ভা[illegible] জীবন যাপন করিতে উৎসুক হইয়া ভাবী গা[illegible] জীবনের কল্পনাকুঞ্জ রচনা করিতেছেন, মানব [illegible] নের মহত্তর কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় কথাগুলি তাঁহাদে[illegible] নিকটেই বিশেষভাবে নিবেদন এবং তৎপ্রতি তাঁহাদে[illegible] মনোযোগ প্রার্থনা করিতেছি।

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট যে চেষ্টা [illegible] করিতেছেন তজ্জন্য ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ রা[illegible] শক্তির প্রতি কৃতজ্ঞ ভাব অন্তরে পোষণ ক[illegible] এবং সাধ্যানুসারে তাহা প্রকাশ করা আমা[illegible] পক্ষে একান্ত উচিত। অবশ্য ইঁহারা রাজনী[illegible] ক্ষেত্রে জেতাজিত ভাব সর্ব্বপ্রযত্নে সংরক্ষণ করি[illegible] ছেন, ভারতবাসীর বহুদর্শিতা ও আত্মসম্মানকে এ[illegible] আর কামনা করেন না, এমন কি ভারতীয় শি[illegible] বাণিজ্যের বিলোপ সাধন করা সত্বেও প্রতী[illegible] জ্ঞানালোক বিস্তার দ্বারা ভারতবাসীকে যে ঋণপা[illegible]

[illegible]ন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক অপরিশোধনীয়। [illegible] বেথুন প্রভৃতি আমাদিগকে সে ঋণের অংশ-[illegible]নী না করিলে আমরা সকলে মিলিয়া আরও [illegible]কাল ভূত ভয়ে ভীত ভাবে কাটাইতাম তাহা কে [illegible]তে পারে? ভারতে ইংরাজ রাজত্বের অভ্যুদয় [illegible] ইংরাজী ভাষার প্রচলন না হইলে ভারতের [illegible]তে ভাষাগুলি ভাবসম্পদে বর্ত্তমান মূর্ত্তি পরিগ্রহ [illegible] আমাদের অবসাদগ্রস্ত হৃদয় সঞ্জীবিত করিবার [illegible] মহৌষধের কার্য্য করিত না। জাতীয় উন্নতি [illegible] আমাদের প্রাণে জাগ্রত হওয়া দূরে থাকুক [illegible] অবনতি সম্বন্ধেও আমরা সম্পূর্ণ অচেতন [illegible]তাম। এদেশীয় যে কয়টী যথার্থ শিক্ষিত উদার-[illegible] লোক স্ত্রীশিক্ষা জাতীয় উন্নতির প্রধান উপাদান [illegible] অনুভব করিতেছেন তাঁহাদের চিন্তা প্রণালী [illegible] কার্য্যকলাপই ভাবী জাতীয় জীবনে গৌরবময় [illegible]র্ত্তনের সম্ভাবনা সূচিত করিতেছে। যাঁহাদের [illegible] ইঁহারা প্রাচীন ভারতীয় ঋষি বাক্যের সার-[illegible] হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমাদের [illegible] পরিমাণ আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর [illegible] করিতে পারিব। [illegible] সর্ব্বোপরি আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ধর্ম্মজীবন [illegible] করিবার জন্য সাধ্যমত সাধনা করা আমাদের [illegible]তোভাবে কর্ত্তব্য। প্রত্যেক বিষয়ে জাতীয় [illegible] ও অবনতি ব্যক্তিগত উন্নতি এবং অবনতির [illegible] মাত্র। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে [illegible]য়ের নিকট ভিন্ন অন্যত্রও মানুষের প্রার্থনা [illegible] হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। "যদ্দ্বারা অমৃতত্ব [illegible] হয় না তাহা লইয়া আমি কি করিব?" ঐশ্বরিক [illegible]জ্জ্বল চিত্তের এই প্রশ্ন আবেগপূরিত কণ্ঠে [illegible]ধ্বনিত করিয়া ভারত নারী (মৈত্রেয়ী) একদিন [illegible]র বৈভব পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। [illegible] তখনকার ভারত স্বর্গ-কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া-[illegible]। সে সমুদয় অমর জননী ভারতভূমির ক্রোড়েই [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহাদের শোণিত আমা-[illegible] ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, হৃদয়ের পঙ্কিলতা ও [illegible] পরিহার করিয়া ধর্ম্মপ্রাণতায় তাঁহাদের উপযুক্ত সন্তান হইতে পারিলে বিপদের উত্তাল তরঙ্গ—এমন কি সমগ্র পৃথিবীর প্রতিকূলতাও আমাদিগকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। সংসার সমক্ষে একথা বহুবার প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে ব্যক্তিত্ব ও আমিত্বের প্রসার সঙ্কুচিত করিয়া নিজকে সেই যন্ত্রীর হাতের যন্ত্রস্বরূপ এবং বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহারই অভিব্যক্তি স্বরূপ জ্ঞান করিতে পারিলে প্রাণে যে অনুভূতি আসে—চর্ম্ম চক্ষেই যে দৃশ্য দেখা যায় তাহার বর্ণনায় মানবের ভাষা অশক্ত—মানবের জ্ঞান এখানে বিস্মিত, মানবের কল্পনা এখানে স্তম্ভিতভাবে প্রণত হয়। যাঁহারা জীবনে অল্প কয়েক ঘণ্টাও ভগবানের ব্যাপকতা অনন্ততা প্রেম ও চৈতন্যময় ভাব ভাবিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহারাও জানেন তাঁহাতে নির্ভরশীল, তাঁহার দয়ায় আশাশীল হইতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণে কত আরামদায়ক নিশ্চিন্তভাব আসে। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার উপযোগী ব্যাকুলতা ও অধ্যবসায় আমাদের থাকিলে কর্ত্তব্যকে যথোচিতরূপে ভালবাসিলে আমরা প্রাণব্যাপী শান্তিলাভ করিব। তখন এই যে অনাদৃতা উপেক্ষিতা অশিক্ষিতা দীনাহীনা আমরা—তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদে আমরাই তখন অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদ ও অমিত হৃদয়বলের অধিকারিণী হইব।

উল্লিখিত জাতীয় কর্ত্তব্য সমূহ সাধন করিবার প্রথম ও প্রধান উপায় শিক্ষা বিস্তার। সমাজের শোচনীয় দশাগ্রস্ত শ্রেণী সমূহের অন্তর্গত জনবর্গ যদি নিজদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে ও তাহা সংশোধনে যত্নবান না হয়, তবে অন্যের আপ্রাণ চেষ্টাও তাহাদের বিশেষ হিতসাধনে সমর্থ হইবে না। যে জাতি আপনার সর্ব্ববিধ দৈন্য অনুভব করিতে পারে তাহার অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। দেশীয় জনসাধারণের হিতাহিত বোধ ও দায়িত্ব জ্ঞান উদ্দীপ্ত করিবারও একমাত্র উপায় শিক্ষা-বিস্তার। সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রচলন ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে জাতীয় দুর্দ্দশার চিত্র মুদ্রিত এবং জাতীয় উন্নতি কামনা বদ্ধমূল হইবে না, অপর পক্ষে দেশীয় নারীজাতির এবং উপেক্ষিত জাতিসমূহের আন্তরিক সহানুভূতি ও

সাহায্য না পাইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বদেশ প্রীতি দীর্ঘকাল প্রাণে বাঁচিবে না—কিছুদিনের জন্য বাঁচিলেও ভবিষ্যতে তাহার মূল্য সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসের চাইতে বেশী কিছু দাঁড়াইবে না। শিক্ষার সম্প্রসারণের উপরেই জাতীয় উন্নতি সম্যকরূপে নির্ভর করিতেছে। শিক্ষা ব্যক্তিগত জীবনে মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র উপায়, সামাজিক জীবন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংস্কৃত করিবার অদ্বিতীয় পন্থা এবং জাতীয় জীবনের পক্ষে সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলাধার স্বরূপ। সুশিক্ষা মানব হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তির মূলোৎপাটন, সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ ও চরমোৎকর্ষ সাধন করে। সুশিক্ষা প্রাপ্ত মানব নবজীবন লাভ করিয়া অনন্ত উন্নতির পথে অপ্রতিহত ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হয়। আমরা যেন বিবিধ কর্ত্তব্য পালন চেষ্টার সরল সমবায় স্বরূপ—শিক্ষাবিস্তার দ্বারা দেশীয় উপেক্ষিত ভ্রাতা ভগিনীগণের বাহ্যিক ও মানসিক অবস্থা সন্তোষজনকরূপে পরি-বর্ত্তিত করিতে পারি, ভগবানের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা।

শ্রী চপলা দেবী।

নারীর কার্য্য।

মহিলা শিল্প বাজার।

গত ১৪ই ডিসেম্বর ৮১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট, মহিলা ভাণ্ডার গৃহে মহিলা শিল্প বাজার খোলা হইয়াছে। এই বাজারে মহিলা, এবং বালক বালিকাদিগের প্রয়োজনীয় যাবতীয় স্বদেশী দ্রব্য সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মহিলাগণ বিক্রয়ের ভার লইয়াছেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের দ্রব্যাদি এই বাজারে বিক্রয়ার্থ দিয়াছেন। এখানে বেনারসি, ঢাকাই, মিলের ও তাঁতের সাড়ী, পটারি ওয়ার্কের দ্রব্যাদি, ফ্রেট ওয়ার্কের নানাপ্রকার সুচারু ফটো ফ্রেম খেলনা প্রভৃতি, আলুমিনিয়ামের বাসন, বার্ণ কোম্পানির মাটির তৈজসপত্র, মহিলাদিগের হস্তনির্ম্মিত বহুবিধ শিল্প দ্রব্য, নানাপ্রকার কাটা কাপড় প্রভৃতির ষ্টল বসিয়াছে। আরও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকান আসিতেছে। স্বদেশী মেলা যেরূপ বিবিধ স্বদেশী দ্রব্যের সম্মিলন স্থান, এই মহিলা শিল্প বাজারও সেইরূপ সমুদয় স্বদেশী দ্রব্যের মহামিলন ক্ষেত্র। স্বদেশী মেলা বৎসরে একবার হয় বলিয়া আমাদের দেশনায়কগণ স্বদেশী দ্রব্যের এইরূপ একটি সম্মিলন ক্ষেত্র স্থায়ী করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হন নাই। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, তাঁহাদের মানসী প্রতিমা আজ বাংলার লক্ষ্মীদিগের সেবানিপুণ হস্ত দ্বারা কল্যাণ-শ্রীমণ্ডিত হইয়া মূর্ত্তিলাভ করিল। বিধাতার কৃপায় আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। "ভূষণ বলে' গলায় ফাঁসি পরিবার নির্ব্বুদ্ধিতার হস্ত হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছি। নারীর হস্তে ইহার ভবিষ্যত নিহিত। তাঁহাদের সহায়তার এই অনুষ্ঠান সফলতা লাভ করুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী মহিলা শিল্প বাজারের সভ্যাগণের একটী সভাতে পঞ্জাব চিফ্ কোর্টের বিচারপতি সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী এই শিল্প বাজারের স্থায়ী সভানেত্রী মনোনীত হন। তিনি সমাগত মহিলাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

ভগিনীগণ! আজ আমরা ভগিনী শ্রীমতী মনোরমার আহ্বানে এখানে একত্রিত হইয়াছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা মহিলা শিল্প বাজারের জিনিষ পত্র ভাল করিয়া দেখিয়া লই এবং এরূপ একটি

বাজার থাকায় যে উপকার সম্ভাবনা তাহা উপলব্ধি করি।

আপনারা সকলেই জানেন যে পরের দ্বারা বাজার করিলে তৃপ্তি হয় না। কেন না যেরূপ সামগ্রী আপনার দরকার তাহা অনেক সময় অন্যে ঠিক বুঝিতে পারে না, এজন্য হয় তো ফেরাফেরি করিতে হয় নতুবা অসন্তুষ্ট মনে জিনিষ রাখিতে হয়। এমন একটী মহিলা ভাণ্ডার হইলে এবং মহিলাদ্বারা ইহার কার্য্য চলিলে আমরা আপনারাই আমাদের মনের মতন জিনিষ ক্রয় করিতে পারি অথবা প্রস্তুত করিবার ফরমাস দিতে পারি। ভগিনী শ্রীমতী মনোরমা এই বাজার খুলিয়া আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন এবং তিনি যে এত প্রকার আমাদের দরকারের সামগ্রী একস্থানে একত্র করিয়াছেন ইহাতে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। এত প্রকার সামগ্রী একত্র করাতেও তিনি আপনার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন স্বীকার করিতে হইবে। তিনি যে আমাদের মত স্ত্রীলোক হইয়াও এতগুলি টাকা এই কার্য্যে লাগাইতে সাহস করিয়াছেন, ইহাও শ্লাঘার বিষয়।

ভগিনীগণ! আপনারা বোধ হয় এখান হইতে জিনিসপত্র ক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আপনারা বোধ হয় সকলেই মনে মনে ইহাও কামনা করেন যে এই মহিলা বাজারটী যেন স্থায়ী হয়।

মহিলাদিগের শিল্পকার্য্যের উৎসাহ দান করাও এই বাজারের অন্যতম উদ্দেশ্য। গৃহস্থ মহিলারা যাহাতে তাঁহাদিগের পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিতোষিক, এবং উৎসাহ পান তজ্জন্য আমাদের শিল্পনিপুণ মহিলাদিগের শিল্পদ্রব্য আমদানি করা উচিত। যাহাতে তাঁহাদেরও দুপয়সা হয় এবং শ্রীমতী মনোরমার পরিশ্রম সার্থক হয় বিবেচনা করি! অতএব ভদ্র গৃহস্থ মহিলাদিগের নির্ম্মিত বস্তুসকল এই বাজারে রাখিয়া তাঁহাদের শিল্পোন্নতির চেষ্টা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। আশা করি খরিদ্দারেরাও সেই সকল জিনিষ লইয়া তাঁহাদের শ্রম সফলতার উদাহরণ দেখাইবেন। এক্ষণে ইহা নিতান্ত আবশ্যক যে মহিলা বাজারের উপকার বহুদূর পর্য্যন্ত এবং বহু সংখ্যক লোকের বোধগম্য হয় কেন না, যত খরিদ্দারের সংখ্যা বাড়িবে এবং যত বিক্রয় অধিক হইবে তত জিনিসপত্রের মূল্য সুলভ হওয়া সম্ভাবনা। কিন্তু খরিদ্দারের সংখ্যা বাড়াইতে গেলে আমাদিগের অধিকসংখ্যক মহিলার এই বাজার পরিদর্শন করা আবশ্যক কিন্তু অনেকে গাড়ী ভাড়া খরচ করিয়া এখানে আসিতে পারেন না এজন্য ভগিনী শ্রীমতী মনোরমা বিবেচনা করেন যে যদ্যপি ভদ্রমহিলাদিগের যাঁহাদের নিজের গাড়ী নাই তাঁহাদের জন্য একখানি গাড়ী রাখা হয়। আমার মতে এই প্রস্তাবটী আমাদের বিশেষ বিবেচনার যোগ্য। আপনারা ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখুন, কিরূপে এই প্রকার গাড়ীর সরবরাহ হইতে পারে। যদি ইহা হয় তবে সমগ্র মহিলা সমাজ উপকৃত হইবেন এবং এই বাজারও সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

তৎপরে শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায় বলেন :—

পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যদেশে লোকহিতকর সভা সমিতি ও ঐ সকল সভাসমিতির কার্য্যক্ষেত্র আছে। মার্কিণ বা ইউরোপীয়েরা মন্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সভার অধিবেশন করেন এবং তাহাই করিয়া ক্ষান্ত হয়েন না, মন্তব্যগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়েন ও বিবিধ উপায়ে সেইগুলিকে কার্য্যে পরিণত করেন। এই কার্য্যতৎপরতার ফলে তাঁহাদের দেশে সর্ব্বতোমুখীন উন্নতির ধারা অপ্রতিহত প্রভাবে ছুটিতেছে। এমন লোকহিতকর কার্য্য নাই যাহা ঐসকল দেশে অনুষ্ঠিত না হইয়াছে যেখানে যেটীর অভাব যেটী প্রয়োজন তজ্জন্য ইউরোপীয় নরনারী অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মত্যাগ করিতেছেন। সমাজের হিতকল্পে নারীগণ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন তাহা এদেশের প্রত্যেক নারীর শিক্ষার বিষয়। আমাদের দেশে বাগ্মীতার অভাব নাই—অভাব হইয়াছে নির্ব্বাক কার্য্যের, কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাধারণের সহানুভূতির। এদেশে গৃহী মাত্রেই নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু মাসিক

আয় ব্যয় হিসাব করিয়া সেই অনুপাতে লোকহিতকর কার্য্যের জন্য অর্থ বিভাগ করিয়া রাখেন না, অনেকের সে জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই। থিয়েটার বা আমোদ আহ্লাদে অর্থব্যয় করিতে আমরা কুণ্ঠিত নই; কিন্তু কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে অর্থব্যয় করিতে হইলে আমরা নিজেকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করি। এদেশে কেহ কোন সদনুষ্ঠান করিলে তিনি বড় উৎসাহ পান না, যাঁহারা সৌভাগ্যশালী ও ধনী, বিশেষ অনুরুদ্ধ না হইলে দান করেন না এবং সেই দানও অনুরোদ্ধার পদবী ও সম্মানের অনুপাতে ছোট বড় হইয়া থাকে, ফলে দানটা অনেক সময় অপাত্রে পড়িয়া যায়। দেশ বা লোকহিতকর কার্য্যে সকলেরই সহানুভূতি থাকা উচিত এবং একটা নূতন কিছু সেইরূপ হইলে ধনী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সকলের সাধ্যমত উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করা উচিত।

এইরূপ একটী ভাব যতদিন না এদেশবাসীর হৃদয়ে স্থান পাইবে, ততদিন এ দেশের উন্নতি কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এ সম্বন্ধে শুধু যে ধনীদিগের কর্ত্তব্য আছে তাহা নহে, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রেরাও সমভাবে দায়ী। দরিদ্রের তিল তিল অর্থ অনেক সময় একটী রাজকোষও পূর্ণ করিতে পারে এবং ধনীর বিরুদ্ধে একতরফা অনুযোগ করা কখনই সঙ্গত নহে। সকল কার্য্যেই ধনীরা সাহায্য করিবেন আর দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত একটুকুও ত্যাগ স্বীকার করিবেন না, ইহা হইতে পারে না। বস্তুতঃ শেষোক্তদিগের ত্যাগ স্বীকারে যে কোন কার্য্যে যতটা অর্থ ও শক্তি সংগৃহীত হইতে পারে তাহার সমষ্টি ধনী হইতে সংগৃহীত অর্থও শক্তি অপেক্ষা অধিক হওয়াই সম্ভব। মহামতি তিলকের একটী পাইস্ ফণ্ড আছে তাহার কল্যাণে যত শুভকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, বোধ হয় কেবল ধনীদিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তাহা হইত না। বিলাতে অনেক সময় কলের কুলি মজুরেরা এক পেনী হিসাবে অর্থ দান করিয়া বহুলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা একত্রিত করেন। আমরা যতদিন না এই একটী পেনী দান করিতে বা তদনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করিতে শিখিব ততদিন ভারতের মঙ্গল নাই। প্রত্যেক নরনারী যদি দেশ বিষয়ে চিন্তাশীল না হন, তাহা হইলে কি দেশের কোন কার্য্য হইতে পারে? "মহিলা শিল্প-বাজার" স্বদেশীয় দ্রব্য সংরক্ষণের ও বর্দ্ধনের নারীদিগের পক্ষ হইতে একটী প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান, কিন্তু যদি এই অনুষ্ঠান উৎসাহ অভাবে ম্লান হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহা কি বঙ্গীয় নারী সমাজের লজ্জার কথা নহে? আজ ইহা ক্ষুদ্র কিন্তু ইহা পরিপুষ্ট করিবার ভার তো আমাদেরই উপর। ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া, প্রত্যেকে যদি ইহাকে নিজের ভাবিয়া ইহার উন্নতি সাধনে যত্নবতী হন, তবে কি একদিন এই ক্ষুদ্র বীজ সুবৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইতে পারে না? দেশের প্রতি সদনুষ্ঠান যদি কোরকেই বিনষ্ট হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া জন্মভূমির উন্নতি সাধিত হইবে? ভগিনীগণ, একবার ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া আসুন, দেশের যেখানে যে সদনুষ্ঠান হয় তাহার প্রতি সহানুভূতি সঞ্চার করি এবং এই মহিলা শিল্প-বাজার নারীর বলিয়া আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম হওয়া উচিত এবং ইহাও মনে রাখা উচিত যে ইহার শিল্প সামগ্রীর অনেকগুলি নারীর হস্তে প্রস্তুত হয়। ইহাকে উৎসাহ প্রদান করিলে নারীর ভরণপোষণের সাহায্য করা হয়। সমস্ত বিধবার অর্থ ক্লেশ আপনাদিগের অর্থে মোচন করিতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এতদ্ব্যতীত নারীর মধ্যে স্বদেশ প্রীতি ও স্বদেশজাত শিল্পের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করিবারও ইহা একটী ক্ষেত্র, সুযোগ ও মিলন স্থান। যাঁহারা অর্থ ব্যয় করেন নারীর এই সম্মিলন স্থানও তাঁহাদের অর্থের কিছু দাবী করিতে পারে। কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে এখানে না আসিতে পারিলেও লোক মারফতে উহা এইখান হইতে ক্রয় করা উচিত এবং সকল আমোদ আহ্লাদে বাহির হইলেই দর্শন তালিকাতে মহিলা শিল্প-বাজার কথাটাও লিখিয়া রাখা উচিত।

পরিশেষে মহিলা শিল্প-বাজারের সম্পাদিকা শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার বলেন—

ভগবানের রাজ্যে যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায় সেইদিকেই একটা নিয়ম, একটা শৃঙ্খলার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক জগতে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকলেই একটা নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহার একচুল এদিক ওদিক হইবার সাধ্য নাই।

বৃক্ষ, লতাগুলি যেন সমস্ত বৎসর ভগবানের গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া আছে, যেই সময় আসিল অমনি ফল, ফুলে সুশোভিত হইয়া প্রেমময়ের চরণে মস্তক অবনত করিল।

জীব জগতেও এইপ্রকার একটা নিয়ম, একটা শৃঙ্খলার ভাব দৃষ্ট হয়। পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকলেই একটা নিয়মের দ্বারা বাধ্য হইয়া আপন কাজ করিয়া যাইতেছে।

কিন্তু বিধাতার এই নিয়মটী সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাওয়া যায় না কেবল শ্রেষ্ঠ প্রাণি, মানবের মধ্যে।

মানবের মধ্যে কতকগুলি কার্য্য বিধাতা নিজের হাতে রাখিয়াছেন এবং কতকগুলি তাঁহার জ্ঞানের সাপেক্ষ করিয়া সেইগুলির জন্য মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক মানুষের এই স্বাধীনতার স্থান কোথায়।

সভ্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় তাঁহারা স্বাধীনতা পাইয়া সেই স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত করেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত স্বাধীনতা পুনরায় বিশ্বপতির চরণেই অর্পণ করিয়াছেন।

জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা তাঁহারা কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়াছেন, এবং সেই কর্ত্তব্যকে এত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছেন, যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছেন। অসম্ভব কথাটাই যেন তাঁহাদের নিকট হার মানিয়া গিয়াছে।

ঘড়ির কাঁটাটীতে চাবি দেওয়া থাকিলে সেটী যেমন সমস্তগুলি ঘর ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ১২টার ঘরে যাইবেই যাইবে ইহাঁদের কাজগুলিও যেন সেই ভাবে হইয়া যাইতেছে।

এই সকল সভ্য জাতির প্রত্যেক কাজের পশ্চাতে ঘড়ির স্প্রীংএর মত সমগ্র জাতির একটা আন্তরিক টান, ঐকান্তিক উৎসাহ এবং কর্ত্তব্যের প্রতি দৃঢ়তা বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই ইহাদিগকে কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় মধ্য গঙ্গায় হাবুডুবু খাইতে দেখা যায় না।

এমন দিন ছিল যখন এ দেশের লোকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে যাইয়া ঈশ্বরকে ডাকাই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। এখন সকলেই বুঝিয়াছেন যে, ভগবান মানবকে বিনা উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আনেন নাই, তিনি মানবের দ্বারা অনেক মহৎ কাজ আদায় করিয়া লইতেছেন।

সভ্য দেশের নরনারীগণ কাজের মধ্যেই ভগবানকে দর্শন করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা কর্ম্মকে এত প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছেন।

এ দেশের রমণীগণের মধ্যেও ক্রমশঃ কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এখন আর আমরা অযথা গল্প, পরিহাস বা পরনিন্দায় সময় কাটাইতে রাজি নই।

দেশের আর্থিক অবস্থা দিন দিন যেরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহাতে নারীগণ অর্থাগমের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পুরুষদের সহায়তা না করিলে পুরুষদের পক্ষে সংসার চালান নিতান্তই কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে।

গত ১৬ই মাঘ তারিখের সঞ্জীবনীতে আপনারা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, পোষ্ট আফিসের কেরাণী বাবুরা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট বেতনে আর সংসার খরচ কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, বাসার ভাড়া বৃদ্ধি ও চাকরের বেতন বৃদ্ধি এই অনাটনের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া তাহারা ডিরেক্টর জেনারেলের নিকট বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়াছেন। ১৮৭৫ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত চাউল ও ময়দার মূল্য তিন গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকিলে আর দশ বৎসর পরে যে টাকায় ⁄২ সের চাউল বিক্রয় না হইবে,

তাহা কে বলিতে পারে? অন্নপূর্ণার পাত্রে অন্ন নাই অথচ লোক সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, এখন কি রমণীগণ পুরুষদের ঘাড়ে সমস্ত ভার চাপাইয়া নিজেরা অলসের ন্যায় সংসারের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে পারেন।

৬ই মাঘের পূর্ব্ব সপ্তাহের সঞ্জীবনীতে আর একটি সংবাদ প্রকাশিভ হইয়াছে যে, বহু টাকার কাপড় বাজারে মজুত রহিয়াছে, অথচ সেরূপ বিক্রয় নাই।

কাপড় লোকের না হইলে চলে না; ইহা সখের জিনিষ নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু অথচ সেরূপ বিক্রয় হইতেছে না কেন? ইহা দ্বারা কি এই অনুমান করা অসঙ্গত হইবে যে, লোকের আর্থিক অবস্থা হীন হইতেছে বলিয়া যাঁহার বৎসরে ১০ জোড়া কাপড়ের প্রয়োজন হইত, তাঁহাকে ৫ জোড়া কাপড়ে চালাইয়া লইতে হইতেছে।

আমরা যে মহিলা শিল্প বাজার স্থাপন করিয়াছি, অনেকে হয় ত ইহাকে একটা সাধারণ দোকান মনে করিয়া ব্যবসাদারী হিসাবে তাচ্ছিল্যের ভাবে ইহার প্রতি অবলোকন করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ইহার মধ্যে সত্যের প্রেরণা বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল মহৎ ভাব ও উচ্চ আদর্শ লইয়া ইহা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাগণের তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে অধিক সময় লাগিবে না।

ইহা নারীর কার্য্যক্ষেত্র বিশেষ, এই শিল্পবাজার নারীগণের মধ্যে নবযুগ আনয়ন করিবে। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এ দেশের রমণীগণও কর্ম্মের মধ্যে ও ব্যক্তিগত জীবনের স্বাবলম্বনে ভগবানকে দেখিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কর্ম্মী হইয়া উঠিবে।

ইহা শুধু কথার কথা নয়, এখনই ইহার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অনেক অসহায়া হিন্দু বিধবা তাঁহাদের-স্বহস্ত নির্ম্মিত শিল্পাদি এই বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেছেন।

রংপুর, কৃষ্ণনগর, বেনারস প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও এখানে শিল্পাদি আসিয়াছে।

শিল্পকর্ম্মনিপুণা যে সকল মহিলা তাঁহাদের প্রস্তুত শিল্পাদি বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে না পারায় হতাশ হইয়া সেই সকল কাজ ছাড়িয়া পরের গলগ্রহ হইয়াছিলেন, তাঁহারা পুনরায় স্বাবলম্বনের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন।

আপনাদের ন্যায় শিক্ষিতা মহিলাগণের নিকট ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিক কথা বলাই বাহুল্য।

এখানে মহিলাগণের শিক্ষার জন্য একটী তাঁত, ছোট ছোট কয়েকটী মোমবাতির কল ও জুতার ফিতা প্রস্তুতের একটী কল সংগ্রহ করা হইয়াছে, এই সকল কলের কার্য্যাদি তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

আমাদের সভানেত্রী মহোদয়াও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে একটী বিধবা আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এখানে ৩।৪টী বিধবা আসিয়াছেন। ইনি তাঁহাদের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেছেন এবং শিল্পকর্ম্মাদি শিক্ষা দিয়া স্বাবলম্বনের জন্য প্রস্তুত প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। এই বিধবা আশ্রমের মেয়েদের প্রস্তুত কিছু দ্রব্য আমাদের এই বাজারে বিক্রয়ের-জন্য আসিয়াছে।

বোম্বাইয়ের অন্তর্গত গিরগাও নামক স্থানে বনিতা বস্ত্রালয় নামে মহিলাগণের একটী দোকান স্থাপিত হইয়াছে. তথাকার রমণীগণের স্বাধীনতা আছে, তাঁহারা পুরুষদের দোকান হইতে অবাধে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু তাহা সত্বেও শত শত মহারাষ্ট্রীয় রমণী এই বনিতা বস্ত্রালয় হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকেন।

মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের মধ্যে তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম প্রেরণ করুন, আমরা যেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া এই সকল শুভ অনুষ্ঠানকে সফল করিয়া তুলিতে সক্ষম হই।

Presented to the K. P. L. by Shiva Prasad [illegible]

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { চৈত্র, ১৩২০। } ৯ম সংখ্যা।

সৌন্দর্য্যের বিকাশ।

আমাদের ধরিত্রী জন্মকালে ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত ছিল। সে সময় ইহার অঙ্গাভরণ কিছুই ছিল না—একটি ভীষণ অগ্নি গোলক মহা শূন্যে স্বীয় কক্ষে বিঘূর্ণিত হইতেছিল। ক্রমশঃ উত্তাপ প্রশমিত হইতে লাগিল। কত কাল পরে জল দেখা দিল। ক্রমে স্থল এবং তদুপরি 'সাক্ষীর' ন্যায় বিশাল দেহ পর্ব্বতরাজি দণ্ডায়মান হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে জলমধ্যে অতি ক্ষুদ্র বিন্দু আকারে প্রাণী সমাগম হইল। ক্রমে প্রাণী সমূহ প্রকট মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে জলচর, জলও স্থলচর এবং স্থলচর জীবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। এক সহস্র বৎসরে নহে—এক লক্ষ বৎসরে নহে—এক কোটি বৎসরে নহে; এরূপ হইতে কত কোটি বৎসর কাটিয়া গেল।

জগতের প্রথম অবস্থায় যে সকল জীব অভ্যুদিত হইয়াছিল, এখন তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ সৃষ্টিরাজ্যে নূতন নূতন জীবের শুভাগমন হইতে লাগিল। কেবল নূতন নহে, যাহা সৃষ্ট হইতে লাগিল, তাহাই অধিকতর সুগঠিত, সুঅবয়ব এবং সুশ্রী হইতে লাগিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, এই যে সুন্দর পক্ষীর পাখা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি—মেঘোদয়ে যখন ময়ূরগণ নৃত্য করিতে থাকে, তাহাদের বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত মনোহর পক্ষসঞ্চালন দর্শন করিয়া কবির হৃদয়-সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠে—এই প্রিয়দর্শন পক্ষীগণ সরিসৃপ জাতি হইতে উদ্ভব হইয়াছে। কি কদর্য্য জীব হইতে ইহারা জন্মলাভ করিয়াছে। ইহাদের আদিম অবস্থা আর বর্ত্তমান অবস্থায় কত পার্থক্য। পক্ষীকুল ধীরে ধীরে সুনিপুণ কারিকরের হস্ত দিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে। আদিম ঘোটক সমূহ খর্ব্বাকৃতি, হীনবল, দেখিতে ভেড়ার মত ছিল; ক্রমে সুন্দর ও সবল দেহ লাভ করিয়াছে। জন্তুর মধ্যে ঘোটক দেখিতে কেমন সুশ্রী!

এক দিকে বসুন্ধরা যেমন সাগর, পর্ব্বত, নদ, নদী, প্রস্রবণ, বনস্পতি দ্বারা পরিশোভিত হইতে লাগিল, তেমনি জীবগণ উন্নত হইতে উন্নততম অবস্থায় উপনীত হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও ধরণী-বক্ষ মানব-বাসের যোগ্য হয় নাই; তখনও মানব আগমনের কেবল আয়োজন হইয়াছে; তখন কেবল ইতর প্রাণীগণ অরণ্যে, প্রান্তরে, সাগরে বিচরণ করিতেছিল। ক্রমে বানর বংশের পর মানব বংশের সৃষ্টি হইল। বানর মানবের আদি পুরুষ।

আদিম মানব আর পশুতে সামান্য পার্থক্য ছিল। মানব, পশুর শ্রেষ্ঠ সংস্করণরূপে জগতে আসিয়াছিল। আদিম নরনারী নগ্নদেহে, বৃক্ষ-কোটরে অথবা ভূগর্ভে বাস করিত। ফলমূল কিম্বা পশু মাংস ভোজন করিত। নরমাংসও উপাদেয় খাদ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। তাহারা বন্যজন্তু হইতে আত্মরক্ষা এবং আহার্য্য অন্বেষণেই সমুদয় সময় ব্যয় করিত। ক্রমশঃ মানব উন্নতির পথে—সৌন্দর্য্যের পথে গমন করিতে লাগিল। যে সার্ব্বভৌমিক নিয়ম—মহাবিধানের ভিতর দিয়া মানবজাতি অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মে, অসুন্দর অবস্থা হইতে সৌন্দর্য্যে এবং পশুত্ব হইতে দেবত্বে গমন করিতেছে, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং কবিগণ সেই সনাতন বিধান-বেদ-গাথা অমৃতময় স্বরে গাহিতেছেন।

মানবের আদি প্রকৃতি বিভিষিকাময়ী এবং পাশবীয় ভাবে পূর্ণ ছিল। অরণ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামের দলপতিই রাজা। তাহার ইচ্ছাতেই গ্রামের কার্য্য সম্পাদিত হইত। কে কত শত্রু নিধন করিতে সমর্থ, তদ্দারাই দলপতির সামর্থ্যের পরিচয় হইত। মানবের এই অবস্থা চিরদিনের জন্য নহে। মানব ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল। উন্নতি-পথে গমনের নামই সৌন্দর্য্য-রাজ্যে প্রবেশ।

জনসমাজের মধ্যে দাম্পত্যজীবন বন্ধন রজ্জু অথবা মেরুদণ্ড স্বরূপ। এই দাম্পত্য-জীবন অতি অপূর্ব্বভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানবজাতির মধ্যে এমন এক সময় ছিল, যখন নিহত শত্রুর পত্নী কন্যাদিগকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এইরূপে যে ব্যক্তি যত স্ত্রী গ্রহণ করিতে সমর্থ হইত, তাহার ততই বাহাদুরী ছিল। ক্রমে বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। তখনও পাশবীয় ভাব একবারে বিদূরীত হয় নাই; এক একজন পুরুষ যথেচ্ছভাবে বহু দার গ্রহণ করিতে লাগিল। এই বহু বিবাহ প্রথা অদ্যাপি মানব-সমাজে বিদ্যমান থাকিয়া আদিম ক্ষতকে পোষণ করিতেছে; কিন্তু দাম্পত্য-জীবন কখনও কুৎসিত অবস্থায় থাকিতে পারে না; ইহা সুন্দর হইতে সুন্দরতম হইবার আয়োজন হইল। ধীরে ধীরে দাম্পত্য জীবনের উচ্চ আদর্শ—মোহন শোভা প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। যে মানব পিশাচ বিবাহ, গন্ধর্ব্ব বিবাহ, বহু বিবাহকে পারিবারিক সুখ জ্ঞানে মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, সেই মানবের দৃষ্টি উচ্চ আদর্শের প্রতি প্রধাবিত হইল।

দাম্পত্য জীবনের উন্নত আদর্শ আর্য্য কবি হরগৌরীর উপাখ্যানে প্রদর্শন করিয়াছেন। হরগৌরীর প্রসঙ্গ গল্পচ্ছলে দাম্পত্য জীবনের উপদেশ। হরগৌরী পতি ও পত্নী। উভয়ে কেবল হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত নহেন; কিন্তু দেহেও একীভূত। সেই মিলিত যুগল মূর্ত্তিতে অর্দ্ধেক হর, অর্দ্ধেক গৌরী; অর্দ্ধেক জটাজুট, অর্দ্ধেক বেণীবহুল; অর্দ্ধেক বাঘ ছাল, অর্দ্ধেক স্বর্ণ-বসন, অর্দ্ধেক শ্বেতবর্ণ, অর্দ্ধেক অতসী পুষ্পবর্ণা; অর্দ্ধেক স্বামী, অর্দ্ধেক স্ত্রী; দুইয়ে দাম্পত্য জীবনের পূর্ণতা। যে কবি মানস-নেত্রে এই দাম্পত্য জীবন দর্শন করিয়া কাব্যে অঙ্কন করিয়াছিলেন, দাম্পত্য জীবনের পূর্ণ আদর্শ তাঁহার গোচরীভূত হইয়াছিল। পশ্চিম দেশীয়া জনৈক উপন্যাস রচয়িত্রী দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন—পরমেশ্বর যেন জোড়া জোড়া আত্মা গড়িয়া থাকেন। সেই গঠিত এক এক জোড়া আত্মার মধ্যে একটি নর আর একটি নারী। জগতে সে সকল আত্মা জন্মগ্রহণ করিলে নারী ও পুরুষরূপে তাহাদের মিলন হয়; সেই মিলনের নামই দাম্পত্য সম্বন্ধ। বাস্তবিক দুইটি নদী একীভূত হইয়া যেমন সাগরে উপনীত হয়, তেমনি দুইটী আত্মা মিলিত হইয়া

ব্রহ্মসাগরে উপনীত হইয়া থাকে। কবিগণ এই দাম্পত্য জীবনের ব্যাখ্যায় প্রমত্ত হইলেন। দাম্পত্য জীবনের ভিতর দিয়া যেমন অপরূপ রূপ মাধুরী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, তেমনি পিতৃ-মাতৃ স্নেহ ভ্রাতৃ-প্রেম গুরুজনে ভক্তি প্রভৃতি পারিবারিক সম্বন্ধের মধ্যে ক্রমশঃ নব নব সৌন্দর্য্য বিকশিত হইতে লাগিল। এই মানব-পরিবার ঋষি-কথিত নৈমিষারণ্য, তপোবন এবং এই মানব-পরিবারই পুণ্যতীর্থ—স্বর্গ-নিকেতন। দম্পতির প্রেম, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার স্নেহ এবং পিতামাতার প্রতি সন্তানগণের ভক্তি কি সুন্দর দৃশ্য! কি আশাপ্রদ, শান্তিপ্রদ, আনন্দজনক! এই প্রেম পরিবার হইতেই জাতীয় জীবনে সৌন্দর্য্যধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ক্রমে ক্ষমতাপ্রিয় অমিতাচারী রাজাদিগের রাজ্যের অবসান হইতে লাগিল। দেশকে অশান্তি হইতে শান্তির কোমল ক্রোড়ে লইয়া যাইবার জন্য প্রতিনিধি শাসন-প্রণালী অভ্যুদিত হইল। দেশ আছে—দেশ সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে; কিন্তু রাজা নাই। রাজার ভোগবিলাস চরিতার্থতার জন্য যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত, সেই অর্থ দ্বারা রাজ্যের কত প্রকার হিতসাধন হইতেছে। এ রাজ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই রাজার অংশরূপে রাজ্যশাসনে—রাজ্য পালনে নিয়োজিত। ইহার মধ্যে সাম্য-স্বাধীনতা এবং মৈত্রীর দিব্য মূর্ত্তি প্রস্ফুটিত। এই ত্রিবিধ ভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কুসুমিত কুঞ্জকানন সদৃশ।

সর্ব্বপ্রকার উন্নতির উৎস কোথায়? ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির উৎস স্বরূপ। মক্কার বর্ত্তমান কাবা মন্দিরে অনেক দেব-মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। কাষ্ঠখণ্ড, শীলাখণ্ড প্রভৃতি দেবতারূপে পূজিত হইত। প্রধান দেবতা ছিল তিনজন—লাত, গোরি এবং মনাত। কাবা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে সুরাপান-মত্ত আরব নরনারী নৃত্য করিত। চুরি, দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতি কোন প্রকার দুষ্কার্য্য তাহাদের অকরণীয় ছিল না। এ সময় প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় মহাত্মা মহম্মদ উদিত হইলেন। তিনি এই পশুপ্রকৃতি জাতিকে একমাত্র পরমেশ্বরের নামে আহ্বান করিলেন। মক্কাবাসিগণ ধর্ম্মমণ্ডলী গঠন করিলেন। বৈরাগ্য, দীনতা, ব্যাকুলতা, প্রেম, পবিত্রতা নরনারীর হৃদয়ে—জনসমাজে স্থাপিত হইল। পাপান্ধকারের মধ্যে সত্য, মঙ্গলের স্নিগ্ধ আলোক প্রজ্জ্বলিত হইল। কেমন সুন্দর, মনোহর দৃশ্য!

আমরা মানব-চক্ষে দর্শন করিতেছি, ঐ খাদিজা মহম্মদের হৃদয়াকাশে সতী দেবীরূপে অবতীর্ণা হইয়া স্বামীকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিতেছেন; ঐ সিংহ বিক্রম ওমর উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে মহম্মদকে বধ করিতে গিয়া তাঁহার পদতলে মস্তক রাখিয়া চিরদিনের জন্য সত্যের দাস—ধর্ম্মের দাস হইলেন। ঐ পার্থিব সম্পত্তিবিহীন মহম্মদ উজু করিবার বদনা এবং নমাজ করিবার ছেঁড়া মাদুর মাত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। ঈশ্বর ভিন্ন কোন সম্পত্তির প্রতিই তিনি নির্ভর করিতেন না। আরবের মরুভূমিতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উৎস উৎসারিত হইল।

পরমেশ্বর বিশ্বজগতের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মানব জীবনে অধিকতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বর প্রেমিক নরনারীগণের সৌন্দর্য্যের তুলনা কোথায়? বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, ঋষি, সেইণ্ট, সুফী সকলেই মানসমোহন সৌন্দর্য্যের নিকেতন। যিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী, ঈশ্বরানুপ্রাণিত, ভক্ত, তিনি সুন্দর হইবেন না, তবে সুন্দর হইবে কে? প্রকৃত সৌন্দর্য্য কোথায়? বাহিরে নহে—ভিতরে; জড়ে নহে—চৈতন্যে; অনাত্মায় নহে—আত্মায়। অন্তরের সৌন্দর্য্য আভাই মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। মুখ হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। মুখরূপ দর্পণে হৃদয়ের অদৃশ্য প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এজন্যই যাঁহার হৃদয় সুন্দর, তাঁহারই মুখ সুন্দর। হৃদয় সুন্দর কাহার? যাঁহার হৃদয়ে প্রেম, জ্ঞান, পবিত্রতা এবং ব্রহ্মানন্দ বিরাজিত। যাঁহার হৃদয়ে রিপুর রাজত্ব নাই; প্রবৃত্তির উত্তেজনা নাই, ভোগ বিলাসের অদম্য উদ্যম নাই। সেই সুন্দর হৃদয়ের আলোকেই মুখমণ্ডল আলোকিত ও লাবণ্যযুক্ত হইয়া থাকে।

কুৎসিত কে? যিনি প্রবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়গণের অধীন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। মান

যখন ক্রোধের উদয় হয়, তখন মুখ কেমন আড়ষ্ট ও কঠোর হইয়া উঠে। তাহাকে দেখিবামাত্র সকলেই বুঝিতে পারেন, ইহার রাগ হইয়াছে; হৃদয়ের আগুন মুখে জ্বালিয়াছে। লোকে ক্রোধকে পুরুষকারের চিহ্ন ভাবিয়া আত্ম-প্রতারিত হয়। ক্রোধীকে যদি কেহ বলেন, "ভাই রাগ করিওনা," অমনি সে বলিয়া উঠিবে—"ইহা রাগ নয়—তেজ। আমি কি তেজহীন কাপুরুষ হইয়া থাকিব?" কিন্তু সেই রাগে রাগে তাহার সুন্দর কমনীয় মুখকান্তি যে আসুরিক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই।

হিংসাতে মানুষ আরও কদর্য্য হইয়া থাকে। মানুষকে ক্রোধী বলিলে সে যেমন গর্ব্বে স্ফীতবক্ষ হইয়া ক্রোধকে তেজের মধ্যে গণ্য করিয়া বাহাদুরী লইবার চেষ্টা করে; হিংসুক বলিলে তেমনি হয় না। কাহাকেও হিংসুক বলিলে সে ব্যক্তি শত প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহে যে, তাহার অন্য দোষ থাকিলেও হিংসা নাই; কিন্তু রিপুগণ এমনি পদার্থ যে, তাহাদিগকে কেহ লুকাইয়া রাখিতে পারে না। অন্তরের হিংসা, মুখে ধরা পড়ে। হিংসাতে মন অতি কুৎসিত হইয়া যায়। মুখে তাহার ছাপ পড়িয়া থাকে। যাহার হৃদয় হিংসার সর্পদংশনে ক্ষত বিক্ষত, সে কখনও মুক্তভাবে—প্রাণ খুলিয়া হাস্য করিতে পারে না। সে পরের সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া দেখিয়া মরমে মরিয়া গিয়াছে। হিংসুকের মুখ প্রফুল্লতাবিহীন, হাস্য বিহীন, আনন্দ বিহীন—অতি কুৎসিত। সে মুখ দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

যাহারা কুচিন্তা ও কুকার্য্যে রত তাহাদের মুখ কিরূপ বিকৃত দশাপ্রাপ্ত হয়, ঠগীদিগের ফটো তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তস্থল। তাহাদের ছবি দেখিলে প্রাণ শঙ্কিত হয়। অপর দিকে সাধু ভক্তগণের মুখচ্ছবি কেমন দেবভাবে পূর্ণ, দেখিলেই চিত্ত মোহিত হয়। ভক্তগণের প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে যে পুণ্য, আনন্দ, শান্তি, ভক্তি বিরাজিত থাকে, তাহাই বদন মণ্ডলকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করে। পতিতা নারীদিগের হৃদয়ের পাপকালিমা মুখকে কালীমাময় করিয়া দেয়। সে মুখ দেখিলেই পাপের কথা মনে হয়। এ জন্যই পতিতা নারীর মুখ অতি কুৎসিত। আবার ঐ সতী সাধ্বী ঈশ্বরপরায়ণা ভক্তিমতী নারীর বদনমণ্ডল কেমন অনির্ব্বচনীয় শোভার আকর; উহা নয়ন রঞ্জন, হৃদয় মনের স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, ধর্ম্মভাব উদ্দীপক। সতীনারীর কেবল মুখ নহে—তাহার কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত পবিত্রতায় মণ্ডিত। তাঁহার চালচলনে, কথা বার্ত্তা, হাব ভাব সকলের মধ্যে পবিত্রতা উজ্জ্বলতম রূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। এই পবিত্রতাই সৌন্দর্য্য। বাস্তবিক যে নারীকে দর্শন করিলে প্রাণের সদ্‌ভাব সমূহ প্রস্ফুটিত হয় এবং যাঁহাকে দেবীজ্ঞানে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়, তিনিই সুন্দরী নারী।

মন কদর্য্য হইলে মুখ কিরূপ কুৎসিত হয়, এ সম্বন্ধীয় একটি ঘটনা উল্লিখিত হইতেছে। একজন চিত্রকর একটি সরল, শান্ত, বিনীত সৌম্য ধার্ম্মিক যুবকের প্রতিকৃতি লইবার জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি একদা কোন পল্লীগ্রামে উপনীত হইয়া তাঁহার মনোমত একজন যুবককে দেখিতে পাইলেন। যুবকের কি মনোমোহন মূর্ত্তি! তাহার বদন মণ্ডলে নীতি ও ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকর তাহার ফটো গ্রহণ করিলেন। ফটোর নিম্ন ভাগে লিখিয়া রাখিলেন,—"সুন্দর মূর্ত্তি।" কিছুকাল পর চিত্রকরের প্রাণে এই চিন্তার উদয় হইল যে, তিনি যেমন সুন্দর যুবকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তেমনি একটি কুৎসিত যুবকের ফটো তুলিয়া সুন্দর ও অসুন্দরের মূর্ত্তি পাশাপাশি দেখাইবেন। চিত্রকর এই উদ্দেশ্যে কুৎসিত যুবক খুঁজিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে চিত্রকর রাজপথ দিয়া গমন কালে জেলখানার দ্বারদেশে কয়েদীদিগের মধ্যে একজন অতি কুৎসিত যুবক কয়েদীকে দেখিতে পাইলেন। যাহাকে দর্শন করিলে অজ্ঞাতসারে মানব-সমাজের প্রতিকূল ভাবসমূহ মানস-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, যুবক সেই জাতীয় জঘন্য মূর্ত্তি। তাহার নাক, চোখ, মুখ দিয়া যেন পাপের কালো বিষ দেখা যাইতেছে। সাপে কাটিলে মুখ ...ন বিবর্ণ, বিকৃত হইয়া যায়, পাপ সর্পের দংশনে ...হার মুখও তেমনি হইয়াছে। চিত্রকর তাঁহার ...ত কুৎসিত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া ফটো তুলিলেন। ...করের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যুবক যখন তাহার নাম ...বলিল, তখন তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি...লেন,—"যুবক, আমি কি সুন্দর ছবির ফটো তুলিতে ... তোমারই ফটো তুলিয়াছিলাম? তোমার নাম ...বাসস্থানের সহিত আমার সুন্দর যুবকের চিত্রের ...ও বাসস্থান মিলিতেছে।" তখন সেই যুবক ...লেন,—"হাঁ, আপনিই আমার ফটো তুলিয়াছিলেন। ... কুসঙ্গে পতিত হইয়া নানা পাপে এমন কদর্য্য ...য়াছি।"

আমাদের চক্ষের সম্মুখে এরূপ দৃষ্টান্ত কত রহি...। একটি যুবক স্কুলে পড়িত; সে দেখিতে ... ছিল। সে টেরি কাটিত না, গুছাইয়া কাপড় ...ত না; কিন্তু তাহার মুখে সরলতা, প্রসন্নতা, ...কতা দেদীপ্যমান ছিল। তাহাকে দেখিলেই স্নেহ ...তে, ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। যুবকের সলজ্জ ... বিনীত ব্যবহার, আনুগত্যের ভাব সকলের চিত্ত ...র্ষণ করিত। এই যুবক হঠাৎ কুসঙ্গীদিগের ... থিয়েটারে যাইতে লাগিল। রাত্রি জাগিয়া ...টার দেখা তাহার অভ্যাস হইল। পতিতা নারী-...র থিয়েটার স্পর্শে ক্রমশঃ তাহার পাপপথে যাই-... বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। এক বৎসরের মধ্যে ...দ খাইতে শিখিল এবং নানা পাপের হলাহল ... করিয়া সে এমনি বিকৃত হইল যে, তাহাকে ... চিনিতে পারা যায় না। তাহার সেই মুখ ...—সেই দিব্য মূর্ত্তি নাই সেই মনোহারী কোমল ... নাই। সে অতি জঘন্য হইয়াছে।

আবার আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। ...জন লোক মদ, গাঁজা, আফিং সমুদয় নেশা করি...; তিনি নানা পাপে জড়িত হইয়া কুস্থানে—...কে বাস করিতেন। ভগবানের কৃপায় এই ঘোর-... পাপী ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। নবজীবন ... অগ্রসর হইয়া তিনি এমনি উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করিলেন যে, জনসমাজে তিনি সাধু বা সেইণ্ট অথবা দরবেশ নামে অভিহিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া জগৎ অবাক হইয়া গেল। তাঁহার রূপ এমনি ফুটিয়াছে যে, তাঁহার পূর্ব্ব সঙ্গীগণ আর তাঁহাকে চিনিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্ম্মসমাজের ইতিহাসে—পাপীর নবজীবন লাভ অধ্যায়ে এরূপ কত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হৃদয়ের প্রেম, পবিত্রতা, আনন্দ, শান্তি, জ্ঞান, ভক্তি মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হয় বলিয়াই মুখ এত সুন্দর। ভগবানে চিত্ত সমাধান হইলেই হৃদয় আধ্যাত্মিক শোভা-সম্পদের আকর হইয়া উঠে এবং সেই সৌন্দর্য্য মুখে প্রতিভাত হইয়া থাকে। আয়েসা মহাপুরুষ মহম্মদের প্রিয় পত্নী ছিলেন। তিনি এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—উপাসনার সময় মহম্মদ যখন তন্ময় হইতেন, তখন তাঁহার বদন-মণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশিত হইত। অন্য লোক দূরে থাকুক, পত্নী আয়েসাও তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন না। উপাসনার সময় কেবল যে তাঁহার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইত, তাহা নহে; তাঁহার রক্তমাংস গঠিত মূর্ত্তি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইত। *

সৌন্দর্য্যের আর একটি দিক প্রাচীন গ্রীক জাতি এবং আধুনিক শ্বেতাঙ্গ জাতির মধ্যে বিকশিত হইয়াছে। তাহা এই, মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা সাধন দ্বারা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা। ব্যায়াম দ্বারা সেই সৌন্দর্য্য রচিত হইয়া থাকে। এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে স্বাস্থ্য ও শারীরিক বল লক্ষিত হয়। গ্রীক দেবদেবী এবং নরমূর্ত্তিতে আমরা এই সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি দর্শন করিয়া থাকি। এখানেও সৌন্দর্য্যের সহিত ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ বিরাজিত। হস্তপদের প্রকৃত ব্যবহার না করিলে—স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় অবলম্বন না করিলে দেহ অতি কুৎসিৎ মূর্ত্তি ধারণ করে। হাত পা কাটির মত, গলা সরু, অথচ পেটটি মোটা—এ মূর্ত্তি কুৎসিৎ। কেন এ মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয় না? এখানে স্বাস্থ্য নাই, বল নাই, তেজস্বিতা নাই, সুতরাং শ্রীবিহীন। আবার হস্ত পদ সঞ্চালন দ্বারা—ব্যায়াম

* শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত মহম্মদ-চরিত দ্রষ্টব্য।

দ্বারা যখন সর্ব্বাঙ্গ যথাযোগ্য উন্নতি প্রাপ্ত হয়, স্থূলোদর সঙ্কুচিত হয়, বক্ষ প্রসারিত হয়, তখন কেমন সুন্দর দেখায়।

সর্ব্বাঙ্গের সমঞ্জসীভূত উন্নতিসাধনই গ্রীক ব্যায়ামের উদ্দেশ্য। গ্রীক বীর হোরেসিয়স্ ককলিসের যে প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বাস্থ্য এবং বলের সজীব ছবি। স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম দ্বারা স্বাস্থ্য ও বল যে পরিমাণে লাভ হয়, দৈহিক সৌন্দর্য্যও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় চিত্রকরগণ গ্রীক সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রেম, ভক্তি, সরলতা, বৈরাগ্য, দীনতা, ধর্ম্ম তৃষ্ণা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণ মিলাইয়া যে আদর্শ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমরা যীশু, যীশু-মাতা এবং খ্রীষ্টান ভক্ত নরনারীর প্রতিমূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া থাকি। এবম্বিধ চিত্রে স্বাস্থ্য, বল এবং হৃদয়ের ধর্ম্মভাব একীভূত হইয়া প্রকাশিত। সুতরাং চিত্র-রাজ্যে ইহা উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে।

সৌন্দর্য্যের আর একটি দিক এই ঃ—সুন্দর শব্দের আভিধানিক অর্থ—"উত্তমরূপে,—আদর করা।" অর্থাৎ যাহা আমরা চাই, আকাঙ্ক্ষা করি, তাহাই সুন্দর। এজন্যই মানব প্রাণ পাপের মধ্যে সৌন্দর্য্য দর্শন করে না, কেন না পাপ মানবের বাঞ্ছিত বস্তু নহে। স্বার্থের মধ্যে সৌন্দর্য্য নাই, সৌন্দর্য্য পরার্থপরতায়। একটি পরিবার ধনে জনে পরিপূর্ণ; কিন্তু আর্ত্ত প্রতিবেশীর প্রতি সেই পরিবারের দৃষ্টি নাই; দুর্ভিক্ষের সময় সেই পরিবার হইতে এক মুষ্টি অন্নও বিতরিত হয় না। সে পরিবার কাহারও খোঁজ খবর লয় না, কেবল অলঙ্কারের বাক্স এবং কোম্পানীর কাগজের প্রতি নিবিষ্টচিত্ত। এরূপ পরিবার অতি কুৎসিত—চক্ষের পীড়াদায়ক। আর একটি পরিবারে দেখি, কেবল পরের জন্য ভাবনা। নিজেরা কি খাইবে, কি পরিবে, সে দিকে তেমন দৃষ্টি নাই; পরকে কি করিয়া সুখী করিবে, তজ্জন্য আগ্রহ। এই শ্রেণীর পরিবারই সংসার মরুভূমিতে জলাশয়-শোভিত কুসুমিত কুঞ্জকানন সদৃশ। এইরূপ পরিবারই মানব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিদ্যাসাগর জীবনের সৌন্দর্য্য কোথায়? ... পরার্থপরতায়। ত্যাগেই সৌন্দর্য্য,—ভোগে নহে।

দেবগণ দধীচি মুনির নিকটে গমন করিয়া বি... বদনে বলিলেন ঃ—"মুনিবর! দৈত্যগণ আমাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছে। আমরা স্বর্গ রক্ষায় অসমর্থ। আমাদের বাস-ভূ... এখন দৈত্যগণ বিহার করিতেছে। আমরা পলা... লাঞ্ছিত, অপমানিত। এখন স্বর্গ উদ্ধারের এক... উপায়—একমাত্র পথ আছে, তাহা নিবেদন করি... আপনার নিকটে আসিয়াছি। আপনার অস্থি... বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া তদ্বারা যুদ্ধ করিলে শ... পরাভূত হইবে—স্বর্গ পুনরায় আমাদের হ... হইবে।" দেবতাগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া প... সেবায় উৎসৃষ্ট-প্রাণ পুণ্যাত্মা দধীচি আপনার ... সহাস্যবদনে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার প... অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হইল। দেবগণ স্বর্গ উ... করিলেন। দধীচির আত্মত্যাগ কাহিনী মা... রাজ্যে কি সুন্দরতম দৃশ্য।

এখন বিষয়টিকে অপর দিক দিয়া দর্শন ... যাউক। সাধারণ মানব-চিত্ত প্রথমে জড়জগতের শোভারাশি দর্শন করিয়া বিস্মিত হয়। চন্দ্র ... গ্রহ, নক্ষত্র, সাগর, পর্ব্বত, কানন, প্রান্তর, নদ নদী... অনুপম দর্শনে একদিন মানব প্রাণ বলিয়া উঠিয়াছিল... ইহার ন্যায় শোভাসম্পদ আর কিছুই নাই। ... আদিম মানব-হৃদয় শিশুর ন্যায় অনিমেষ সৌ... প্রকৃতির অপরূপ শোভা দর্শন করিয়া মোহিত ... বিহ্বল হইয়াছিল। ক্রমে বিধাতা মানব-... জ্ঞানাঞ্জন প্রদান করিলেন, তখন মানবের নি... আর এক নূতন শোভার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ... শোভা, মানব-হৃদয়ের, মানব-মুখের, মানব-সমা... শোভা। এ সৌন্দর্য্যের কাছে প্রকৃতির সৌ... তুচ্ছ। কিন্তু মানব-চিত্তে সৌন্দর্য্য দর্শনের আকা... —সৌন্দর্য্য সুধাপানের তৃষ্ণা এতই প্রবল যে প্র... এবং ভক্তজীবনের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া সে ... থাকিতে পারে না। মানব প্রাণের এই বা... অবস্থায় তৃতীয় সৌন্দর্য্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ...

...গোলককে রমণীয় সৌন্দর্য্যে পরিণত করিয়া-...র, মানব জীবনকে বিশ্ব-সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আরো ...র করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সৌন্দর্য্যের আধার ...রা মানব-চিত্তে প্রকাশিত হইলেন। দিব্যজ্ঞান ...ঋষি দর্শন করিলেন, জগৎরূপ রমণীয় উদ্যানে ...হার পুত্র কন্যাদিগকে লইয়া তিনি সৌন্দর্য্য লীলা প্রকাশ করিতেছেন। ফুলের সুগন্ধে তাঁহারই ...রূপের গন্ধ; অনলে অনিলে বজ্র বিদ্যুতে তিনিই ...রূপে বিদ্যমান; তাঁহারই সৌন্দর্য্য আকাশের ...লিমা; স্বাদে দর্শনে স্পর্শে সকল দিকে সর্ব্বত্র ...হার সৌন্দর্য্য ধারা প্রবাহিত হইতেছে। "বিশ্ব-...নে নিরখি সতত সুন্দর তোমারে; চন্দ্র সূর্য্য ...ণে তোমার করুণা নয়নপাত"

নিখিল বিশ্বে তিনি সৌন্দর্য্যরূপী—শক্তিরূপী—...র্য্যরূপী; আরো উজ্জ্বলতমরূপে মানব-হৃদয়ে তিনি সুন্দর হইয়া প্রকাশিত। মানব-মুখের তুলনায় ...সূর্য্য এবং ধরণীর শোভা ম্লানীভূত। মানব সেই ...সীমের সজীব সসীম অনুপ্রকাশ। এজন্য বিশ্বভুবনে ...নব সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মূলে প্রবেশ করিলে - সৌন্দর্য্যকে ...শ্লেষণ করিয়া দর্শন করিলে অনন্তের সহিত পরিচয় ...। অনন্ত অর্থ পূর্ণ। পূর্ণতার মধ্যেই সৌন্দর্য্য ...হিত। অনন্তের দুইটি দিক; বহির্জগৎ এবং চৈতন্য জগৎ। এই জড় ও চৈতন্যকে একীভূত করিয়া ...বিচিত্রতা, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, নব নব প্রকাশ এবং আনন্দদায়িনী শক্তি বিকশিত।

...দুইজন মানবের মুখচ্ছবি, ভাষা, চালচলন এক ...কম নহে। জড় বস্তুর মধ্যেও দুইটি বস্তু এক ...কম নহে। অনুবীক্ষণ দ্বারা দৃষ্ট করিলে ক্ষুদ্রতম ...পদার্থেও কত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কি জড় জগৎ ...প্রাণীজগৎ সর্ব্বত্র বিচিত্রতা বিদ্যমান। অন-...ন্তের অনন্ত রূপই বিচিত্রতা এবং এই বিচিত্রতাই ...সৌন্দর্য্য। দ্বিতীয়—শৃঙ্খলা। এই জগতে একটির ...সহিত আর একটির কেমন সূক্ষ্ম যোগ। অনন্ত ...বিশ্ব একই নিয়মে, একই জ্ঞানসূত্রে গ্রথিত। জগতে ...বিশৃঙ্খলাই বিনাশ—শৃঙ্খলাই জীবন। বিশৃঙ্খল অবস্থায় কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। শৃঙ্খলা শূন্য হইবা মাত্র বিনাশ দশা প্রাপ্ত হয়। অনন্তের মধ্যেই শৃঙ্খলার অস্তিত্ব। তৃতীয়—সামঞ্জস্য। সামঞ্জস্যের মধ্যে একটি নিগূঢ় মিলন রহিয়াছে। যেটি যেখানে থাকিলে ভাল দেখায়, সেটি সেখানে থাকিয়া পরস্পর উৎকর্ষের পথে গমনেই সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। এক অনন্ত অখণ্ড সত্তাই সামঞ্জস্যের কেন্দ্র হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। চতুর্থ—নব নব বিকাশ। অনন্ত বিশ্বে নিত্য পুরাতনের অস্ত গমন এবং নবীনের অভ্যুদয় হইতেছে। কত গ্রহ উপগ্রহ সৌরজগৎ বিলুপ্ত হইতেছে, আবার কত নব নব গ্রহ উপগ্রহ, সৌরজগৎ অভ্যুদিত হইতেছে। নিত্য নবীন সৃষ্টি, নবীন রূপ, নবীন কার্য্য ইহা অনন্তেরই সজীব স্ফূর্ত্তি। এই নূতনত্বই অনন্ত। পঞ্চম—অনন্ত, আনন্দদায়িনী শক্তিরূপে প্রকাশিত। উপনিষদ বলিয়াছেন ঃ—আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। অর্থাৎ আনন্দ ও অমৃতরূপে যাঁহার প্রকাশ। ঋষিগণ বারম্বার বলিয়াছেন, ভূমাতেই আনন্দ। অল্পে, ক্ষুদ্রে, সসীমে আনন্দ নাই। অতএব অনন্ত বলিতেই সুন্দর, বাঞ্ছিত এবং বস্তু বুঝায়। অনন্ত নিরালম্ব, শূন্য, নির্গুণ নহেন। অনন্ত প্রতি মুহূর্ত্ত তাঁহার অপার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

এ স্থলে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে জগতের প্রাচীনকালের ধর্ম্মসম্প্রদায়ে সৌন্দর্য্য কত দূর অভিব্যক্ত হইয়াছিল? জগতে চারিটি প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়; হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীষ্টান এবং মুসলমান। ভারতীয় উপনিষদে পরমেশ্বর শিবসুন্দর বলিয়া কথিত হইয়াছেন; কিন্তু অদ্বৈতবাদ আসিয়া এভাবকে নিষ্পেষণ করিয়াছে—সৌন্দর্য্য দর্শনে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম অদ্বৈতবাদের অপর পৃষ্ঠা মাত্র; সুতরাং বৌদ্ধগণ জড় ও চৈতন্য জগতে সৌন্দর্য্য সুধা পানের জন্য লালায়িত নহেন। খ্রীষ্টানধর্ম্মে পিতা পুত্র-ভাব প্রস্ফুটিত। এ ধর্ম্মে বাৎসল্যভাব সাধিত হয়। পরমেশ্বর পিতা, মানব তাঁহার সন্তান। ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ অনুভব, ঈশ্বরের আদেশ পালনই সাধনার বিষয়। কোন কোন

খ্রীষ্টান সাধকের মধ্যে সৌন্দর্য্য সাধনের ভাব বিকশিত হইলেও সমগ্রভাবে খ্রীষ্টধর্ম্মে এ ভাব সাধনের বিধি-ব্যবস্থা হয় নাই। মুসলমান ধর্ম্মসাধনায় প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ সাধনই অধিকতর বিকশিত। কিন্তু কোন কোন মুসলমান তপস্বী—সুফীর প্রাণে পরমেশ্বরকে সুন্দররূপে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর সাধকগণের মধ্যে ভক্ত হাফেজের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। কেবল ভারতবর্ষে—বৈষ্ণব সমাজে ঈশ্বরকে সুন্দররূপে দর্শনের আয়োজন হইয়াছিল।

বৈষ্ণব সাধন-তত্ত্ব এই :—আকাশের নীল রং যেমন প্রীতিকর, স্বাস্থ্যপ্রদ, মনোহর এবং নিত্য স্থায়ী, বর্ণের মধ্যে এমন আর কিছুই নাই। আকাশে বনস্পতিতে, জলধিজলে ঐ নীল রং প্রকাশিত। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আরাধ্য দেবতাকে নীলবর্ণে অনুরঞ্জিত করিলেন! বৈষ্ণবের দেবতা কে? বিষ্ণু। বিষ্ণুর প্রতিরূপ কৃষ্ণ। কল্পিত কৃষ্ণের বর্ণ নীল। সেই বর্ণ দর্শনে চক্ষু জুড়ায়, মন পুলকিত হয়। কবি কালিদাসও শ্যামবর্ণের পক্ষপাতী ছিলেন। যক্ষ তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে মেঘকে বলিতেছেন :—"তাঁহার দেহ কৃশ, বর্ণ শ্যাম।* পক্ষীকুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ময়ূর। ময়ূরের গাত্রে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাহার পাখা। ময়ূরের পাখা কবিগণের লোভনীয় বস্তু। এই ময়ূর-পুচ্ছ কৃষ্ণের চুড়ায় স্থাপিত। উদ্ভিদ-জগতে ফুলের ন্যায় সুন্দর আর কি আছে? প্রস্ফুটিত কুসুম-শোভা দর্শনে কাহার প্রাণে না আনন্দের উদয় হয়? কৃষ্ণের গলায় সেই বনফুলের মালা। সকল ধ্বনির মধ্যে বংশীধ্বনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কৃষ্ণের মুখে সেই অমৃতরস-বর্ষী মুরলী। তাল তমালতলে যমুনার রম্য পুলিনে, পুষ্পিত কুঞ্জকাননে চন্দ্রালোক বিধৌত ব্রজধামে সেই দিব্যমূর্ত্তি বিহরিত। তাঁহার গলায় ফুলের মালা, চূড়ায় শিখি-পুচ্ছ এবং তিনি বংশী বাদনে রত। এই কবি-কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৃষ্ণমূর্ত্তি চিত্রের দিক দিয়া গ্রীক দেব দেবী অপেক্ষা রমণীয় ও বরণীয়। বিশ্বজগতের এবং ভক্তচিত্তের সমুদয় সৌন্দর্য্য আহ... করিয়া এই কৃষ্ণমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে।

কৃষ্ণমূর্ত্তি একদিকে যেমন রূপ রস শব্দময় জ...তের সমুদয় সৌন্দর্য্য আভরণে বিভূষিত হইয়াছে, তেমনি হৃদয়ের প্রেমের সৌন্দর্য্য তাঁহার মুখশ্রী... প্রতিফলিত। অমর সাহিত্যসেবী বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া... ছেন, "জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহাতে বর্ত্তমান... শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎ প্রবাহ পরিপূর্ণা ... সলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুম সুবাসিত কুঞ্জ বিহঙ্গ... কূজিত বৃন্দাবন-বনস্থলী এবং তন্মধ্যে অনন্ত সুন্দর... স্বশরীরে বিকাশ।" অন্তর বাহিরে সৌন্দর্য্যময় শোভন... মূর্ত্তি বৈষ্ণবের দেবতা। চিত্রের দিক দিয়া এ কল্প... অতীব কার্য্যকরী; কিন্তু ধর্ম্মের দিকে ইহা বি...জ্জনক। কৃষ্ণ মূর্ত্তি গৃহ সাজাইবার শ্রেষ্ঠ চিত্রবিশে... কিন্তু ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করিবার বস্তু নহে। ঋষিবাক্য সর্ব্বদা স্মরণীয় :—

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশ।"

(শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি)

অর্থাৎ তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ।

সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্বকে বিশোধন করিয়া জগতে ধর্ম্মে... এক নবমূর্ত্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেই ভাব এই... এক অনন্ত জ্ঞানময় সত্য সুন্দর দেবতার মোহন ম... মূর্ত্তি বিশ্ব-জগতে, মানব হৃদয়ে প্রকাশিত। তি... নিরাকার চিন্ময় অথচ ব্যক্তিরূপী ভগবান। তি... মানব অন্তরে সুন্দরতম রূপে প্রকাশিত। মান... স্বীয় অন্তরে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াই অমৃত ... গাহিয়া উঠেন :—

"তুমি সুন্দর, হৃদিরঞ্জন,
তুমি নন্দন ফুলহার;
তুমি অনন্ত নব বসন্ত
অন্তরে আমার।"

তিনি যখন চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বিশ্ব জগৎ দর্শন... করেন, তখন বলেন :—

"সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল,
সমুদিত প্রেমচন্দ্র অন্তর পুলকাকুল।
কুঞ্জে কুঞ্জে রাজিছে বসন্ত পুণ্য গন্ধ;
শূন্যে বাজিছে রে অনাদি বীণা রব।
অচল বিরাজ করে, শশী তারা মণ্ডিত
সুমহান সিংহাসনে ত্রিভুবনেশ্বর।"

নবযুগের সাধক অন্তরে বাহিরে সত্য শিব সুন্দরের বিকাশ দেখিয়া রূপসাগরে নিমগ্ন হন। নব যুগের সাধকের প্রাণের প্রার্থনা :—

"মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ!
শোভন-সভা নিরখি মন প্রাণ ভোলে।"

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

---

* মেঘদূত—উত্তর মেঘ। ২১।২২।১

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান।

পেরিপ্লাস—দ্বিতীয় পর্য্যায়।

৮। আভালাইটীস হইতে কিঞ্চিদ্দূরে ও আভালাইটীস নামক বন্দর অপেক্ষা সুবৃহৎ ও উত্তম মালাও (১) নামক একটী বন্দর আছে। পূর্ব্বোক্ত ...ন হইতে ইহা আটশত ষ্টাডিয়া দূরবর্ত্তী। নৌবন্ধনের ...টী উন্মুক্ত হইলেও পূর্ব্বদিক হইতে বহির্গত একটী ... অন্তরীপ দ্বারা রক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানের অধিবাসীবৃন্দ অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয়। পূর্ব্বোক্ত ...াদি ব্যতীত এই স্থানে নিম্নোক্ত পণ্যের আমদানী ...:—

বহুলপরিমাণে অঙ্গাবরণ
আর্সিনোর উৎপাদিত পরিচ্ছদ
মদ্যপাত্র
স্বল্প পরিমাণে অকঠিন তাম্র পত্র
লৌহ
অল্প পরিমাণে সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি এই স্থান হইতে রপ্তানী হয়।

গন্ধদ্রব্য (২)
ধূনা
উত্তম ও নিকৃষ্ট দুই প্রকারের দারুচিনি
গঁদ
বার্ণিস প্রস্তুত করণের ভারতীয় নির্য্যাস (৩)
জৈত্রী (৪) (?)

এই সকল পণ্যই আরব দেশে রপ্তানী হয়। এতদ্ব্যতীত স্বল্প পরিমাণে ক্রীতদাসও এই বন্দর হইতে অন্যত্র প্রেরিত হয়।

৯। মালাও হইতে জলপথে দুই কি তিন দিবস

---

(১) মালাও—বর্ত্তমান বর্ব্বরা। বর্ত্তমান ব্রিটিস সোমালিল্যাণ্ডের রাজধানী। কোন কোন ভৌগোলিক ইহাকে আরও ...মাইল দূরবর্ত্তী বুলহার নামক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু, এসম্বন্ধে বর্ত্তমানে আর কোন সন্দেহ নাই। ম্যাক্রিণ্ডল ...য়াছেন যে আভালাইটীস হইতে মালাওয়ের দূরত্ব আটশত ষ্টাডিয়ার অধিক।

(২) "Frankincense"—এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের পরবর্ত্তী ২৯—৩২ দ্রষ্টব্য।

(৩) ভারতীয় নির্য্যাস—(Copal) পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার পাদদেশস্থ বনভূমিতে এই প্রকার নির্য্যাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া ...। ইহাতে উৎকৃষ্ট বার্ণিস প্রস্তুত হয়। ওয়াট সাহেব তাঁহার "Dictionary of Economic Product" গ্রন্থে copal ... লিখিয়াছেন "a large ever-green of the forests at the foot of the Western ghats from Kanara to ...avancore, ascending to 4000 feet."

(৪) সম্ভবতঃ macir বা জৈত্রী। প্লিনিও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা যে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত ... তাহাও বলিয়াছেন। ওয়াট বলিয়াছেন যে ইহা ভারতবর্ষ ও বর্ম্মার সর্ব্বত্র পাওয়া যায় এবং বৃক্ষের ত্বক ও বীজ আমাশয় ... প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পর্ত্তুগীজগণ ইহাকে Herba Malabrica (মালাবার প্রদেশীয় ওষধি) নামে অভিহিত ...। "By the Portugese this was called Herba Malabarica, owing to its great merit in the ...atment of dysentry, they having found it on the Malabar Coast."

(১) ব্যবধানে মুন্দাস (২) বন্দর অবস্থিত। উপকূলের নিকটস্থ দ্বীপে জাহাজগুলি নিরাপদে নঙ্গর করিতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত দ্রব্যাদি এই স্থানে আমদানী হয় এবং উপর্য্যুক্ত পণ্যাদি ব্যতীত এই স্থানের উৎপাদিত "মোক্রোটো" (৩) নামক দ্রব্য রপ্তানী হয়। এই স্থানের বণিক্‌গণ কলহপ্রিয়।

১০। মুণ্ডাস হইতে পূর্ব্বদিকে দুই কি তিন দিবস অগ্রসর হইলে উপকূলস্থ মোসাইলামে (৪) উপনীত হওয়া যায়। এই স্থানে নঙ্গর করা কষ্টসাধ্য। পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্যাদি ব্যতীত এই স্থানে রৌপ্য পাত্র, যৎকিঞ্চিৎ লৌহ ও গ্লাস আমদানী হয়। এই স্থান হইতে এত অধিক পরিমাণে দারুচিনির (৫) আমদানী হয় যে এই বন্দরে বৃহদাকারের জাহাজের আবশ্যক হয়। এতদ্ব্যতীত, সুগন্ধী গঁদ, অল্প পরিমাণে কূর্ম্মের চাড়া, দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আনীত গন্ধদ্রব্য, এবং যৎসামান্য হস্তীদন্ত ও গন্ধরস রপ্তানী হয়। মুন্দাসের মোক্রোটো অপেক্ষা নিকৃষ্ট মোক্রেটোও অন্যত্র প্রেরিত হয়।

১১। (৬) মোসাইলাম পরিত্যাগ করিয়া উপকূলভাগ হইয়া অগ্রসর হইলে দুই দিবস পরে ক্ষুদ্র নীল নদীতে (৭) উপনীত হওয়া যায়। তথা হইতে একটী সুন্দর উৎস, ক্ষুদ্র পুষ্প কুঞ্জ (৮) এবং হস্তী অন্তরীপে (৯) পৌঁছিতে হয়। পরবর্ত্তী উপকূলভাগ উপসাগরে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে হস্তী নামক একটী নদী এবং আকানী (১০) নামক একটী সুবৃহৎ পুষ্প কুঞ্জ রহিয়াছে এবং কেবল এই স্থানেই উৎকৃষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে লভ্য সুগন্ধী পাওয়া যায়। (১১)

(১) ম্যাক্রিণ্ডল "Two days' sail" (দুই দিনের ব্যবধান) এবং সফ্ "Two days' sail or three" দুই কি তিন দিনের ব্যবধান বলিয়াছেন।

(২) মুন্দাস বা মুন্দো—টলেমি বলিয়াছেন যে, নিকটবর্ত্তী একটী দ্বীপও এই নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমানে টলেমি কথিত এই দ্বীপ মেয়েট দ্বীপ নামে পরিচিত। মুন্দাস বন্দরকে অনেকে বর্ত্তমান বন্দর হায়স বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্লেসার ইহাকে বারবরা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন!

(৩) মোক্রোটো (Mocrotu) ঠিক কি দ্রব্য তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই—তবে নিঃসন্দেহে ইহাকে কোনরূপ গন্ধ দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সফ্ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, "Mocrotu was probably high grade of Frankincense." গ্লেসার বলিয়াছেন যে, সোমালি দেশে প্রচলিত মোখর (mokhr) শব্দটী আরবী mghairot শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ গ্রীক ভাষায় ভাষান্তরিত হইবার কালে ইহার আরও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া ইহা মোক্রোটোতে পরিণত হইয়াছে।

(৪) অধিকাংশ টীকাকার বর্ত্তমান রাস হানট্রাকে মোসাইলাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেবল গ্লেসার পশ্চিমদিকে রাস খামজীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। খ্রীষ্টের জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে মিসরাধিপতি টলেমি ইউআরজেটীস এই পর্য্যন্ত অধিকার করেন!

ম্যাক্রিণ্ডল বলিয়াছেন যে, বন্দর ও অন্তরীপ উভয়ই মোসাইলাম নামে কথিত হইত। প্লিনিও (৬।৩৪) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এই স্থানে প্রচুর দারুচিনি পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, সিওষ্ট্রীশ যুদ্ধার্থ এই পর্য্যন্তই অগ্রসর হইয়াছিলেন।

(৫) বাইবেলে দারুচিনির আরকের উল্লেখ আছে। প্লিনি ও অন্যান্য গ্রন্থকারও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। দারুচিনি সম্বন্ধে কোরাইদীসও বলিয়াছেন যে, মোসাইলামের দারুচিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। হেরোডটস বলিয়াছেন যে, উৎকৃষ্ট দারুচিনি ভারতবর্ষে জন্মিত। এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। প্লিনির বর্ণনা দৃষ্টে সফ বলিয়াছেন যে, "There are true indications that the true Cinnamon was brought from India and the Far East to the Somali Coast." অর্থাৎ প্রকৃত দারুচিনি ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই সোমালি উপকূলে পৌঁছিত। প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মার্কপলো বলিয়াছেন যে মালাবার উপকূল ও লঙ্কায় দারুচিনি জন্মে।

(৬) ম্যাক্রিণ্ডল ও সফের অনুবাদে যৎসামান্য বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ম্যাক্রিণ্ডলের অনুবাদ এই :—

"After leaving Mosullon, and sailing past a place called Neiloptolemais, and past Tapatege and the Little Laurel-grove, you are conducted in two days to cape Elephant." আমরা সফের অনুবাদই গ্রহণ করিয়াছি।

(৭) মুলর ইহাকে টকউহনা নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৮) মুলর মুরিয়ে বন্দরে ক্ষুদ্র কুঞ্জের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৯) Cape Elephant—হস্তী অন্তরীপকে রাস-এল-ফিল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(১০) বন্দর উলুল্যা।

(১১) ম্যাক্রিণ্ডলের পাদটীকার মর্ম্ম—মোসাইলামের পরে হস্তী অন্তরীপ, কিয়দ্দূরে নিলোপটোলেমস, তৎপরে টাপাটেগি ও ক্ষুদ্র কুঞ্জ। অন্তরীপে একটী নদী আছে এবং আকানাই নামক সুবৃহৎ কুঞ্জ। ষ্ট্রাবো এই উপকূল ভাগের বর্ণনা কালে ...ন পোটেমিয়া নামক একটী স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই দুইটী স্থান খুব সম্ভব বিভিন্ন। হস্তী অন্তরীপ সম্বন্ধে ...সেট বলিয়াছেন, "পর্টুগীজদিগের মানচিত্রে ফেলিক্স" পর্ব্বত নামে একটী পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। (ফেলিক্স=হস্তী) ...সেট কুঞ্জ ও হস্তী অন্তরীপকে বর্ত্তমান মিটী ও সান্টাপেড্রো বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১২। এই স্থান হইতে উপকূল ভাগ দক্ষিণ ...কে বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ব্বদিকস্থ বর্ব্বার উপকূলের ...াংশে "সলাইসীচের" অন্তরীপে (১) ও হাটে (২) ...বেসিত হইয়াছে। উত্তর-বায়ুর প্রকোপের জন্য ...দ্রের আন্দোলন অত্যধিক এবং তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে ...স্থানে জাহাজ রক্ষণ করা বিপজ্জনক। এ স্থানের ...কটী বিশেষত্ব এই যে ঝটীকার পূর্ব্বক্ষণে গভীর ...ল অত্যন্ত পঙ্কিলভাবাপন্ন হয় এবং ইহার রং পরি-...র্ত্তিত হয়। এইরূপ ঘটিলেই তাহারা তাবি (৩) ...র বৃহৎ অন্তরীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। শেষোক্ত ...ান নিরাপদ। এই হাটে পূর্ব্বোক্ত পণ্যগুলিরই আমদানী হয় এবং এই স্থানে কয়েকপ্রকার দারুচিনি এবং গন্ধদ্রব্য উৎপাদিত হয়। (৪)

১৩। তাবি পরিত্যাগ করিয়া চারি শত ষ্টাডিয়া অগ্রসর হইলে পানো গ্রামে (৫) উপনীত হওয়া যায়। পরে, অন্তরীপ হইয়া চারিশত ষ্টাডিয়া নৌকাপথে অগ্রগামী হইলে ওপোন (৬) নামক বন্দরে পৌঁছান যায়। সামুদ্রিক স্রোত অগ্রসর হইবার সহায়তা করে। এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত পণ্যাদিরই আমদানী হয়। এতদ্ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি উৎপাদিত হয় (৭) এবং শ্রেষ্ঠতর ক্রীতদাস ও পাওয়া যায়। এই সকল ক্রীতদাস মিসরে প্রেরিত হয়

(১) Cape of Spices—বর্ত্তমান গুয়ার্দ্দাফুই বা রাস আসীর বন্দর।

(২) Market of Spices—গ্লেসার ইহাকে বর্ত্তমান ওলোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(৩) মুলর ইহাকে রাস চেনারীফ বলিয়াছেন।

(৪) ম্যাক্রিণ্ডলের পাদটীকা—গ্রন্থকার এই স্থানে আরোমাটা অন্তরীপের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা হস্তী পর্ব্বতেরই ...। আরবীতে ইহা জার্দ্দ হাফূন বা রাস আসীর নামে কথিত হয়। ষ্ট্রাবোর সময়ে গ্রীকদিগের জ্ঞান এই রাস আসীর ...ন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

নিম্নোদ্ধৃত ষ্ট্রাবোর বর্ণনার সহিত উপর্য্যুক্ত বর্ণনার তুলনা করা যাইতে পারে। "দীরীর পরবর্ত্তী প্রদেশে সুগন্ধি উদ্ভিদ ...। এই স্থানে পীচ, বাদাম ও মিসর প্রদেশীয় ডুমুরও পাওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী লীচ্চা প্রদেশ হস্তীর লীলাক্ষেত্র! এই ...পদের অনেক স্থানে বৃষ্টির জল জমিয়া থাকে। এই গুলি শুষ্ক হইলে হস্তীর শুণ্ড ও দন্ত দ্বারা গর্ত্ত খনন করিয়া জলের সন্ধান ...। এই উপকূলে পাইথোলাস অন্তরীপ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত দুইটী সুবৃহৎ হ্রদ আছে। একটীর জল লবণাক্ত; অন্যটীর জল ...ষ্ট, কিন্তু কুম্ভীর ও সিন্ধু-ঘোটক পরিপূর্ণ। ইহারই কূলে প্যাপাইরাস (কাগজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত নল) জন্মে। ...হারই সন্নিকটে ইবিস পক্ষী (Ibis) দৃষ্ট হয়। ইহারই পরবর্ত্তী প্রদেশে সুগন্ধি জন্মে। এই প্রদেশে একটী অন্তরীপ ও মন্দির ...ং পপলার বৃক্ষের কুঞ্জ আছে। জনপদের আভ্যন্তরীন্ প্রদেশে আইসীস ও নিলাস নামক নদীদ্বয়ের তীরবর্ত্তী প্রদেশে গন্ধরস ...সুগন্ধি পাওয়া যায়। একটী অগভীর হ্রদও আছে। ইহারই পরে পাইথানগেলাসের বন্দর। নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহে ও ... সকলের তীরে প্রচুর পরিমাণে গন্ধরস জন্মে। পরে অন্য একটী নদী ও ডাফনাসের মন্দির। আপলোর উপত্যকায়ও সুগন্ধি ...ত দারুচিনি পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীন্ প্রদেশে আরও প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি পাওয়া যায়। পরে এলিফাস পর্ব্বত, ...লাসের বন্দর, সাইনোসিফালী নামক স্থান ও নটুকেরাস নামক অন্তরীপ। ইহার পরবর্ত্তী সমুদ্রের উপকূলের বিষয় আমরা ...গত নহি।

...পেরিপ্লাসের মতে আরোমাটা অন্তরীপেই বার্ব্বেরিয়ার শেষ সীমা এবং আরোমাটা হইতেই আজানিয়ার আরম্ভ।

(৫) পানো—সম্ভবতঃ রাশ বিনা।

(৬) বর্ত্তমান রাস হাফুন।

(৭) সফ কয়েকজন গ্রন্থকার হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এ স্থানে দারুচিনি জন্মিত না। এই প্রসঙ্গে তিনি ...য়াছেন "If there was any aromatic bark produced near cape Guardafui and not merely transhipped there, it seems almost certain that it was an adulted ant added there to the true Cinnamon, ...t came from India." অর্থাৎ এস্থানে যদি বস্তুতঃ কোনপ্রকার সুগন্ধি জন্মিত তবে ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে ...ইহা ভারতবর্ষ হইতে আনীত প্রকৃত দারুচিনির সহিত মিশ্রিত হইত।

এবং সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কচ্ছপের খোলাও পাওয়া যায়। (১)

১৪। (২) জুলাই মাসের কাছাকাছি, জাহাজগুলি মিসর হইতে এই সকল দূরবর্ত্তী বন্দরে পৌছিবার জন্য যাত্রা করে। আমেরিকা এবং বারিগাজা হইতেও সমুদ্র মধ্য দিয়া জাহাজ এই সকল বন্দরে পৌছে এবং তাহাদের পণ্যসম্ভার এই সকল স্থানে আনয়ন করে। (৩, এই সকল পণ্য নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে :—

শস্য।

চাউল।

ঘৃত। (৪)

তিলতেল।

কার্পাসের বস্ত্র।

কোমর বন্ধ।

সাকারী নামক নল হইতে উৎপাদিত মধু। (১)

কেহ কেহ এই সকল বন্দরের পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য আগমন করে; কেহ কেহ এই উপকূল হইয়া গমনাগমনকালে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে। এই দেশ কোন রাজার শাসনের অন্তর্ভূত নহে; প্রত্যেক বন্দরে এক একজন স্বাধীন নায়ক কর্ত্তৃত্ব করেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

(১) ম্যাক্রিণ্ডলের পাদটীকা—তাবাই অথবা তাবী—(যে স্থান হইতে প্রাচীন গ্রীসীয়গণ ঝটিকা কালে পলায়ন করিত), নির্দ্ধারণে অনেক মতভেদ দেখা যায়। ভিনসেণ্ট এবং অন্যান্য কেহ কেহ ইহাকে অফু´ই অন্তরীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(২) সফ এই সম্বন্ধে দীর্ঘ পাদটীকা দিয়াছেন—

"The antiquity of Hindu trade in East Africa is asserted by Speke. The Purans described the mountaines of the Moon and the Nyanza lakes, and mentioned as the source of the Nile the "Country of Amara" which is the native name of the district north of Victoria Nyanza."

অর্থাৎ ভারতবর্ষের সহিত যে পূর্ব্ব আফ্রিকার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল, তাহা স্পীক দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে পুরাণে চন্দ্র পর্ব্বত এবং নিয়ানজা হ্রদের কথা আছে এবং অমর দেশ হইতে নীল নির্গত হইয়াছে কথিত আছে। ভিক্টোরিয়া নিয়ানজার উত্তরস্থ প্রদেশ অধিবাসীরা এই নামেই অভিহিত করে।

উইলফোর্ড নামক প্রত্নতাত্ত্বিক Asiatic Researchesএ বলিয়াছেন—

"Nothing was ever written concerning their country of the Moon, as far as we know, until the Hindus, who traded with the east coast of Africa, opened commercial dealings with its people in slaves and ivory, possibly sometime prior to the birth of Saviour, when associated with their name, Men of the Moon, sprang into existence the mountains of the Moon......... The Hindu Traders had a firm basis to stand upon, from their intercourse with the Abyssinians—through whom they must have heard of the country of Amora".

অর্থাৎ, হিন্দুগণ পূর্ব্ব আফ্রিকার সহিত যখন বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে, তখনই এই চন্দ্র পর্ব্বতের কথা মনুষ্যসমাজে জ্ঞাত হয়। খ্রীষ্টের জন্মের কিছু পূর্ব্বেই হিন্দুগণ এই দেশের সহিত ক্রীতদাস ও হস্তীদন্তের ব্যবসায় আরম্ভ করে।

সলট (salt) নামক অন্যতম গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"The common track followed by the Arab traders is as follows :—They depart from the Red Sea in August (before which it is dangerous to venture out of the gulf), then proceed to Muscat and thence to the coast of Malabar."

অর্থাৎ সাধারণতঃ আরব বণিক্‌গণ আগষ্ট মাসে লোহিতসাগর হইতে নির্গত হইয়া মস্কাটে উপনীত হয় এবং তথা হইতে মালাবার উপকূলে গমন করে।

(৩) ভারতীয় কি কি পণ্য সেই সময়ে রপ্তানী হইত, তাহার বিবরণ জানিবার জন্য পেরিপ্লাসের পরবর্ত্তী ৪১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। সফ্ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কৃষিজাত পণ্য কাম্বে উপসাগর হইতে ভারতীয় জাহাজেই রপ্তানী হইত। এই সকল জাহাজ পূর্ব্বোল্লিখিত গুয়ার্দ্দাফুই বন্দরে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া আরব উপসাগর পর্য্যন্ত পৌছিত। ইহার দূরে গমনাগমন করিতে ভারতীয়গণ আরবীয়গণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ ছিল। সফ্ আরও বলিতেছেন—

"Between India and Cape Guardafui they apparently enjoyed the bulk of the trade, shared to some extent by Arabian shipping and quite recently by Greek ships from Egypt; on the Somali Coast they shared the trade in an incidental way."

অর্থাৎ ভারতবর্ষ এবং গুয়ার্দ্দাফুই অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে ভারতীয় জাহাজগুলিই অধিক পরিমাণে পণ্য বহন করিত। অন্যত্র সফ্ বলিয়াছেন—

"At the time of the Periplus, owing to the conquest of Egypt by the Romans, the establishment of the Axumite kingdom and a settled policy in Rome of cultivating direct communication with India, this commercial understanding or alliance between Arabia and India which had existed certainly for 2000 years and much longer) is shown to be at the point of extinction."

অর্থাৎ পেরিপ্লাস যখন লিখিত হয়, তখন দুই হাজার বা তদূর্দ্ধ সময়ব্যাপী ভারতীয় ও আরবীয় বাণিজ্য সম্পর্ক প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল।

(৪) "Clarified butter"—ঘৃত সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লাসেন বলিয়াছেন—

"It would be very wrong to suppose that butter could have been brought from India, in this hot climate to the eastern coast of Africa."

অর্থাৎ এরূপ উষ্ণ প্রধান দেশে ঘৃত ভারতবর্ষ হইতে আনীত হইতে পারে না, সুতরাং এই স্থানে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে। উত্তরে অন্যান্য সকলে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে আফ্রিকা পৌঁছিতে ৩০ কি ৪০ দিন লাগিত, সুতরাং এত অল্প সময়ে ঘৃত নষ্ট হইবার কোনই কারণ নাই। লেফ্‌টেনাণ্ট ক্রুটেনডেন বলিয়াছেন যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কাম্বে হইতে ঘৃত পাত্রে করিয়া সোমালিতে প্রেরিত হইত।

(১) স্যাকারী Sacchari—চিনি পণ্যরূপে ব্যবহারের এই স্থানেই প্রথম উল্লেখ। প্লিনি চিনিকে ঔষধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত শর্করা হইতে স্যাকারী উদ্ভূত হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষেই চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল (It was produced in India, Burma, Anam and Southern China, long before it finds its way to Rome and seems to have been cultivated and crushed first in India'.

ম্যাক্রিণ্ডলের পাদটীকা—এই স্থান হইতেই বাৎসরিক বাণিজ্যের জন্য জাহাজ রওনা হইত।

শশিকলা-স্বয়ম্বর *

পৌরাণিকী কথা।

(১)

সেই পুরাতন কাহিনী,—সেই এক রাজা এবং দুই রাণীর উপাখ্যান। বিখ্যাত কোশল রাজধানী অযোধ্যা নগরে একদা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, সুরূপ, ভগবান, ধার্ম্মিক এবং প্রজারঞ্জক সূর্য্যবংশাবতংশ মহারাজ ধ্রুবসন্ধি প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চতুর্বর্ণের লোক নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনে তৎপর ছিল; কেহই অপরের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত না। রাজার সুশাসনের গুণে সেই সুবিস্তৃত-কোশল রাজ্যে চোর, ধূর্ত্ত, বঞ্চক, পিশুন, মূর্খ, দম্ভী অথবা কৃতঘ্ন ব্যক্তি বাস করিতে পাইত না। প্রকৃত পক্ষেই প্রজাগণ পরম সুখে বাস করিত।

প্রাচীন আখ্যায়িকায় সর্ব্বত্র যেরূপ হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই হইয়াছিল। রাজা ধ্রুবসন্ধির লক্ষ্মী সরস্বতীর ন্যায় চারুসর্ব্বাঙ্গী, মধুরহাসিনী, অতি বিচক্ষণা মনোরমা এবং লীলাবতী নামে দুই মহিষী ছিলেন। যদিও রাজার দুই রাণী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ সুয়ো এবং কেহ দুয়ো ছিলেন না। সুবোধ ব্যক্তির পক্ষে বুদ্ধি এবং স্মৃতি উভয়ই যেমন পরম প্রিয়,—তদ্রূপ এই দুই মহিষীই রাজার সমান প্রিয় ছিলেন। রাজা উভয় পত্নীকেই সমান ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া পরম সুখে গৃহে, উপবনে, ক্রীড়াপর্ব্বতে, দীর্ঘিকায় ও অন্যত্র নানাবিধ আনন্দ ভোগ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে এই রাজা বড় সুখেই কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

যথাক্রমে মহিষীদ্বয় শুভ মুহূর্ত্তে পুত্র মুখ সন্দর্শন করিলেন। আনন্দের তরঙ্গের উপর আনন্দের উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী মনোরমার পুত্র কয়েক দিনের বড় এবং কনিষ্ঠা মহিষী লীলাবতীর পুত্র কয়েক দিনের ছোট। শুভ নামকরণ উৎসবোপলক্ষে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের

* শ্রীশ্রীদেবীভাগবত পুরাণ হইতে সঙ্কলিত।

'সুদর্শন' এবং কনিষ্ঠের 'শত্রুজিৎ' নাম রাখিলেন। উভয় কুমারই তুল্যরূপ আদরে যত্নে লালিত পালিত হইতে লাগিলেন। কালে নৃপতি উভয় কুমারের চূড়াকরণ সংস্কারও যথাবিহিতরূপে সমাধা করাইলেন। উভয় কুমার ক্রমশঃ বড় হইতে লাগিলেন। অদৃষ্টক্রমে কনিষ্ঠ শত্রুজিৎই পিতার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার শোভন রূপ, সুমধুর বাক্য এবং অন্যান্য কারণে তিনি প্রজাগণের প্রিয় এবং অমাত্যমণ্ডলীর অভিপ্রেত হইয়া উঠিলেন। সুদর্শনের মন্দ ভাগ্য, তিনি উপেক্ষিত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদা রাজা ধ্রুবসন্ধি মহাসমারোহে নিজ রাজধানী হইতে কিছু দূরে গভীর কাননে মৃগয়া যাত্রা করিলেন। তিনি মৃগয়ায় অতিশয় পটু ছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বন মধ্যে প্রবেশ করতঃ মৃগ, রুরু, কম্বু, শূকর, গরক, মহিষ, খড়্গী ও শরভাদি নানা পশু হনন করতঃ সেই বিশাল বনসাগর যেন মন্থন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাজার সেই নিদারুণ পশু হনন জন্য সমস্ত কাননই সমন্তাৎ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল এবং প্রা ভয়ে পলায়মান পশু সকলের ব্যাকুল চীৎকারে এবং দ্রুত পদশব্দে এক মহা তুমুল নিনাদ উত্থিত হইল এবং সহসা সম্মুখস্থ ঘন বল্লরী সমাচ্ছাদিত এক নিকুঞ্জ হইতে ঘোরদর্শন ভয়ানক এক সিংহ স্বীয় করাল আস্য বিবৃত করিয়া হুহুঙ্কার করিতে করিতে রাজার সম্মুখীন হইল। সেই বিশাল শরীর কেশরীর সটাসমূহ ক্রোধভরে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, নয়নদ্বয় জ্বলন্ত অঙ্গার খণ্ডের ন্যায় প্রদীপিত এবং দীর্ঘ লাঙ্গুল পুনঃ পুনঃ ভূপৃষ্ঠে প্রহৃত হইতে লাগিল, এবং তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া রাজার মনে গিরিরাজদুহিতা মহাদেবীর বাহনের কথা উদিত হইতে লাগিল। তাহার সেই ভয়ানক আকার দর্শনে এবং হৃৎকম্পকারী, শ্রবণবিদারি ভৈরব গর্জ্জন শ্রবণে রাজার পার্শ্বচরগণ ভয়ে কে কোথা পলাইয়া গেল এবং রাজা একাকী সেই যমকিঙ্করসদৃশ পশুরাজের সম্মুখে রহিলেন। তিনিও নরসিংহ,—সুতরাং ভীত বা বিচলিত হইবার পাত্র নহেন,—সুতরাং অবিলম্বে নররাজ এবং পশুরাজের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা খড়্গাচর্ম্ম করে লইয়া অকুতোভয়ে সিংহের সম্মুখীন হইলেন দেখিয়া কতিপয় রাজসেবকও ধনুর্ব্বাণ লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইল। তাহাদের বাণসমূহ বৃষ্টির আকারে সিংহের শরীরে পতিত হইলেও সে সেই সকল শরাঘাতকে বিন্দুমাত্রও গ্রাহ্য না করিয়া এক লম্ফে নৃপতির উপর আপতিত হইল এবং তখন উভয়ে রীতিমত জড়াজড়ি হুড়াহুড়ি চলিতে লাগিল, সেবকেরা হাহাকার করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পশুরাজের নখর ও দন্ত প্রহারে রাজা এবং তাঁহার অসি প্রহারে সিংহ উভয়েই জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া যুগবৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। রাজানুচরগণ হাহাকার করিতে করিতে নগরে প্রত্যাগমন করতঃ এই নিদারুণ বার্ত্তা প্রচার করিল। অমাত্যগণ সমবেত হইয়া শাস্ত্রানুসারে নরপতির ঔর্দ্ধদৈহিক সংস্কার সমাধা করিলেন ;—অযোধ্যার রাজসিংহাসন শূন্য হইল।

(২)

রাজভক্ত প্রজাগণ, সুবুদ্ধি মন্ত্রীমণ্ডলী এবং ভূতভবিষ্যদ্বেত্তা পরম ধর্ম্মজ্ঞ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ, সকলেরই অভিমত হইল যে, সুদর্শন মৃত মহীপতির জ্যেষ্ঠ কুমার, গুণেও তিনি হীন নহেন, অতএব তিনিই রাজসিংহাসনে অধিকারী ;—তাঁহাকেই অচিরে অভিষিক্ত করা হউক। রাজ্য অধিক কাল অরাজক থাকা কোন মতেই উচিত নহে। সুদর্শনের মাতামহ, উজ্জয়িনীর অধিপতি পরম ধর্ম্মপরায়ণ মহাবীর বীরসেন, দৌহিত্রকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত নিজ চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সাকেত নগরে উপস্থিত হইলেন। সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক স্থির নিশ্চিত,—আবশ্যক দ্রব্যসম্ভার আহৃত হইতেছে, এমন সময়ে কনিষ্ঠ কুমার শত্রুজিতের মাতামহ, কলিঙ্গেশ্বর কূটনীতিপরায়ণ কূটযোদ্ধা যুধাজিৎ ; অমঙ্গলরূপী ধূমকেতুর ন্যায় সহসা অযোধ্যার রাজনৈতিক গগনে উদিত হইয়া উৎসব মহা বিষাদে পরিণত করিয়া দিলেন। তিনি নিতান্ত দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, তাঁহার দৌহিত্র পিতার প্রিয় পুত্র, সুতরাং তিনিই রাজত্বের অধিকারী। অযোধ্যার অমাত্যমণ্ডলী,

...ধান প্রধান নাগরিক এমন কি স্বয়ং বশিষ্ঠদেবও যুধাজিতের হঠকারিতার নিকট পরাস্ত হইলেন। তিনি গর্ব্বের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"নূনং যুদ্ধং করিষ্যামি তেন খড়্গাস্য মেদিনী।
ধারয়া চ দ্বিধা ভূয়াৎ, যুষ্মাকং তত্র কা কথা ?"

সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কলিঙ্গদেশীয় সৈন্য, উজ্জয়িনীর সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অযোধ্যার রাজসৈন্য ও যুধাজিতের কূটনীতিতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একপক্ষ জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের ও দ্বিতীয় পক্ষ কনিষ্ঠের পক্ষে যোগদান করিল। অযোধ্যার অদৃষ্টে ভয়াবহ রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইল। এই দুঃসময়ে, দেশ অরাজক এবং রাজসৈন্য আত্মবিবাদ গ্রস্ত দেখিয়া শৃঙ্গবের নিবাসী নিষাদগণ এবং দেশ দেশান্তরের সাহসিক তস্করগণ নগর লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ধনবান্ নাগরিকদিগের গৃহ, বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সজ্জিত বিপণি, এমন কি রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত নিগ্রহ ভোগ করিতে লাগিল। অযোধ্যার এরূপ বিপদের দিন বুঝি আর আসে নাই।

অযোধ্যার পরিখারূপিনী বেগবতী সরযূনদীর তীরে, নগরের উপকণ্ঠে, এই বিশাল প্রান্তরে উভয় পক্ষ নিজ নিজ সেনা সন্নিবিষ্ট করিলেন। সহসা সেই প্রান্তর নানাবর্ণরঞ্জিত বস্ত্রাবাসে পরিপূরিত এক অভিনব নগরের আকার ধারণ করিল। উভয় পক্ষীয় অগণ্য সেনা নিজ নিজ যানবাহনাদি সহিত তথায় একত্র হওয়ায় উহাদের খাদ্য সংগ্রাহক, পরিচারক, চিকিৎসক, ভারবাহক, প্রভৃতি দ্বারা জনস্রোত অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। যুদ্ধের উপকরণ এবং সেনা ও তাহাদিগের বাহনদিগের খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান নিমিত্ত রাজ্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পড়িয়া গেল। সর্ব্বত্র হাহাকার এবং অত্যাচারের মধ্যে এই লোমহর্ষণ আত্মবিগ্রহ চলিতে লাগিল। অযোধ্যার সেনা অযোধ্যার সেনার প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল,—অযোধ্যার ধন অযোধ্যার সর্ব্বনাশ সাধিত করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হইতে লাগিল। সুদর্শনের মাতামহ বীরচূড়ামণি বীরসেন অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য দেখাইতে লাগিলেন,—ক্রমশঃ যুধাজিতের জয়ের আশা লোপ পাইতে লাগিল। বিজয়শ্রী বীরসেনের করতলগত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় কূটযোদ্ধা কাপুরুষ যুধাজিতের প্রেরিত এক গুপ্তচর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বীরসেনের প্রাণবধ করিল। নির্দ্দয় যুধাজিৎ স্বয়ং উজ্জয়িনী নায়কের শিরচ্ছেদ করিলেন,—সুদর্শনের সৈন্যবৃন্দ প্রধান সেনানীর এবম্বিধ অবস্থা দর্শনে যুগপৎ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেল। যুধাজিৎ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। প্রভুভক্ত এক দূত বেগবান্ এক অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজান্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করতঃ গোপনে রাজ্ঞী মনোরমাকে সর্ব্বনাশের সংবাদ প্রদান করিল। মহিষী মনোরমা রাজনীতি শাস্ত্রে পরম পণ্ডিতা ছিলেন ;—তিনি ভাবিলেন তাঁহার পিতৃঘাতক যুধাজিৎ যদি তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রের সাক্ষাৎ পায়, তাহা হইলে আর জীবনের আশা থাকিবে না ; নিশ্চয়ই পাপাত্মা তাঁহাকে বন্দিনী করতঃ সুদর্শনের প্রাণবধ করিবে। তিনি রাজ্যলোভে শতক্রতু ইন্দ্র কর্ত্তৃক বিমাতা দিতির গর্ভস্থ শিশুর ছেদন,—সপত্নী কর্ত্তৃক গর্ভিনী সন্তানকে বিষ প্রদান এবং তদ্ধেতু মহারাজ সগরের স+গর (বিষ) নামের সার্থকতা, এবং কৈকেয়ী কর্ত্তৃক রাম বনবাস প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরা যতই স্মরণ করিতে লাগিলেন, পুত্রের কল্যাণ কামনায় ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা নিহত, ভ্রাতা সুদূর উজ্জয়িনী নগরে ;—বন্ধু বান্ধব অযোধ্যায় কে আছে ;—কে সাধু, কে অসাধু, কে মিত্র, কে শত্রু ; ইত্যাকার নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে ভর্ত্তার প্রিয় মিত্র বিদল্ল নামক অমাত্যের শরণাপন্ন হইলেন। প্রভুভক্ত বিদল্ল তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সপুত্র অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া বারাণসী নগরে মাতুল সুবাহুর আশ্রয় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন। রাজ্ঞী মনোরমা এই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বালক সুদর্শনকে এবং নিজ সৈরিন্ধ্রীকে সঙ্গে লইয়া রথে উঠিলেন এবং অতিগোপনে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে পিতৃ শিবিরে গমন করিলেন। তথায় নিজ পিতার নিমিত্ত অনেক বিলাপ করিলেন এবং যথাকথঞ্চিদ্‌রূপে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

সম্পাদন পূর্ব্বক ভাগিরথী পার হইয়া পলায়ম করিলেন। দুর্ভাগ্য সর্ব্বদাই দুর্ভাগ্যের প্রিয় সহচর। তাই পথে নিষাদেরা তাঁহার রথ, অশ্ব, অলঙ্কার ও যন্ত্রাদি লুণ্ঠন করিয়া লইল। তিনি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া নিতান্ত অনাথার ন্যায় শিশু পুত্র সঙ্গে সৈরিন্ধ্রীর হাত ধরিয়া ভারদ্বাজ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। প্রভুভক্ত বিদল্ল ও এই সময়ে সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঋষি এবং ঋষিপত্নীগণ বিদল্লের মুখে সপুত্রা রাজ্ঞীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া নিতান্ত সমাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। ধার্ম্মিক মানবের চিত্ত সর্ব্বদাই পরদুঃখে কাতর হয় এবং তজ্জন্য নিজের বিপদ্‌কেও বিপদ বলিয়া গ্রাহ্য করে না। রাজ্ঞী মনোরমা এইরূপে পুত্র এবং সৈরিন্ধ্রীর সহিত সেই পবিত্র আশ্রমে উটজগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। প্রভুভক্ত বিদল্ল প্রাণপণে তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

(৩)

এদিকে যুদ্ধজয়ী যুধাজিৎ বিজয় ঘোষণার সহিত নগরে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে রাজসিংহাসন নিজ হস্তগত করিলেন এবং অনতিবিলম্বে বিবিধ উৎসব ও আড়ম্বরের সহিত দৌহিত্র শত্রুজিৎকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। কিন্তু মনোরমা কোথায়? সুদর্শন কোথায়? সুদর্শন জীবিত থাকিতে ত শত্রুজিৎ নিষ্কণ্টক নহে। সুদর্শন এবং মনোরমার অনুসন্ধানের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে গুপ্তচরগণ ধাবিত হইল। হায়! রাজ্ঞী এবং রাজপুত্র আজ যেন মহা অপরাধে অপরাধী! তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য অযোধ্যার রাজপুরুষগণ নিযুক্ত! হায়! মানুষের ভাগ্য এমনই ক্ষণভঙ্গুর। যে রাজ্ঞী এবং রাজপুত্রের কণামাত্র প্রসাদের নিমিত্ত শত শত রাজসেবক নিতান্ত লোলুপ চিত্তে কত পরিচারক পরিচারিকার আরাধনা করিত, আজ তাহারাই তাঁহাদের সর্ব্বনাশের নিমিত্ত সচেষ্ট! কে পালায়িত কুমার ও রাজ্ঞীর সংবাদ সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিয়া রাজানুগ্রহ লাভ করিবে, তাহার জন্যই তাহারা ব্যস্ত! অযোধ্যার সাধু প্রকৃতিক রাজভক্ত ধার্ম্মিক প্রজাগণ এই দৃশ্য দেখিয়া গোপনে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। বশীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কখন কি হয় এই ভাবিয়া সকলেই ভীত চিত্তে সেই অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদা অযোধ্যার পুরবাসী প্রজাগণ সশঙ্কচিত্তে শুনিতে পাইল যে রাজমাতামহ যুধাজিৎ চরমুখে রাজ্ঞী মনোরমা এবং কুমার সুদর্শনের আশ্রয়স্থানের সংবাদ পাইয়া তদভিমুখে সসৈন্যে অভিযান করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং হয় হস্তী রথ সমন্বিত অনীকিনী ধ্বজপতাকা সহ তোরণদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া গেল। কূট কৌশলী যুধাজিত উৎকোচ প্রদান দ্বারা শৃঙ্গবেরপুরের নিষাদরাজকে বশীভূত করতঃ অগণ্য নিষাদ সৈন্যের বলবৃদ্ধি করিয়া ভরদ্বাজ আশ্রমের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রভুভক্ত বিদল্ল এই অভিযানের কথা শুনিতে পাইয়া সত্বর আশ্রমে আসিয়া মনোরমাকে আসন্ন বিপদের বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। মনোরমা এই ভয়ানক সংবাদ শুনিয়া পুত্রের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া মহামুনি ভরদ্বাজের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরম ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজ রাজ্ঞীকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া বলিলেন, "দেবী,—আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনার কুমারকে লইয়া আমার উটজে অবস্থান করুন, অন্যের কথা কি স্বয়ং ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্র ও আপনার পুত্রের কেশস্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে না। আমি দিব্য চক্ষুতে দেখিতেছি, এই সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত কুমার অচিরকাল মধ্যেই পিতৃরাজ্যে ছত্রধারী রাজা হইবেন।" ঋষির শ্রীমুখ হইতে এই অভয় বাণী উচ্চারিত হওয়ায় মনোরমা, পুত্রকে লইয়া সেই ঋষির কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক শত্রুর আগমন কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কপটহৃদয় যুধাজিৎ তপোবনের নিকটস্থ হইয়া শিষ্টাচার রক্ষার নিমিত্ত সমস্ত সৈন্য দূরে রক্ষা করতঃ অল্পমাত্র সচিব এবং অনুচর সমভিব্যাহারে বিনীত বেশে ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মহামুনি ভারদ্বাজকে যথারীতি অভিবাদন করিলেন। মহর্ষিও শিষ্টাচার স্মরণ করতঃ রাজা যুধাজিতের যথোচিত

সংকার করিলেন। কিয়ৎকাল পরস্পর কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং শিষ্টালাপের পর যুধাজিৎ মহর্ষির নিকট সপুত্রা মনোরমাকে প্রার্থনা করিলেন। তিনি কূট রাজনীতিতে সুনিপুণ ছিলেন,—তাই সরলহৃদয় তপস্বীকে বঞ্চনা করিবার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের হলাহল গোপন করিয়া মৃদু মধুর স্বরে ঈষদ্ধাস্যমুখে বলিতে লাগিলেন "তপোধন,—আপনি অবগত আছেন যে, রাজর্ষি ধ্রুবসন্ধি আমার জামাতা ছিলেন,—আমি নিজ কন্যা লীলাবতীকেও যেরূপ স্নেহ করি,—রাজ্ঞী মনোরমাও আমার তদ্রূপ স্নেহের পাত্রী। উভয়েই আমার কন্যা। কুমার সুদর্শন এবং মহারাজ শত্রুজিৎ উভয়েই আমার তুল্য আদরের দৌহিত্র। এরূপ অবস্থায় লীলাবতী নিজ পুত্রের সহিত প্রাসাদে বাস করিতেছেন—আর রাজ্ঞী মনোরমা আজন্ম সুখলালিতা হইয়াও তপোবনে তাপসীর ন্যায় বল্কলবসনে কালক্ষেপ করিতেছেন এবং রাজভোগ বর্দ্ধিত শিশু সুদর্শন কটুতিক্তকষায় বন্য ফলমূল ভোজনে দিনাতিপাত করিতেছেন দেখিয়া আমি লজ্জায় অযোধ্যার লোককে মুখ দেখাইতে পারি না। সকলেই মনে করে আমারই ভয়ে রাজ্ঞী কল্যাণী মনোরমা পুত্রের সহিত বনবাসিনী হইয়াছেন। আমার এই কলঙ্ক দূর করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা এবং যত্ন যে করিয়াছি, তাহা কি বলিব? এই ভারতবর্ষের প্রত্যেক মিত্র রাজার রাজ্যে, তীর্থস্থানে, নগরে প্রকাশ্য এবং গোপনে নানারূপ অনুসন্ধান করিয়াছি। অবশেষে ইষ্টদেবীর কৃপায় আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে। আপনি অনুমতি করুন, রথ প্রস্তুত আছে,—রাজ্ঞী পুত্রের সহিত স্বামীর রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া আজীবন রাজমাতার সম্মান ও সুখভোগ করুন এবং কুমার সুদর্শন ও শত্রুজিৎ উভয়ে রাম লক্ষ্মণের ন্যায় একত্রে পিতৃরাজ্য শাসন এবং সংরক্ষণ করুন। আমার কলঙ্ক দূর হউক।" দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন দৈবপ্রভাবশালী মহর্ষি ভরদ্বাজ কপটীর এই দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইলেন, তথাপি কোনও প্রকারে সেই মনোবৃত্তিকে দমন করিয়া বলিলেন "রাজন্,—আপনার বক্তৃতা শুনিলাম। আমার উত্তর এই যে রাজ্ঞী মনোরমা অচিরকাল মধ্যেই রাজমাতারূপে অযোধ্যায় প্রবেশ করিবেন, তজ্জন্য আপনাকে বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইবে না;—আপনি আশ্বস্ত হউন।" যুধাজিৎ দেখিলেন,—আর কপটতা নিষ্প্রয়োজন, তখন নিজ বদনের আবরণ ফেলিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায়ই বলিলেন,—

"মুনেমুঞ্চহঠং সৌম্য বিসর্জ্জয় মনোরমাম্।
ন চ যাস্যাম্যহং মুক্ত্বা নেষ্যাস্যত্ববলাৎ পুনঃ।"

ঋষি অবাত সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় নিস্তরঙ্গ এবং অচঞ্চল। তিনি নিজের শক্তি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, তাই ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"নয়স্ব যদি শক্তিস্তে বলেনাদ্য মমাশ্রমাৎ।
বিশ্বামিত্রো যথা ধেনুং বশিষ্ঠস্য মুনেঃ পুরা॥

ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

প্রীতিদা।

বিটপীর স্নিগ্ধ ছায়া,
রচিত কবিতা রাশি,
স্বাদু মাখা রুটী আর
মদিরার রক্ত হাসি।

চিন্তাতীত দেবতার
সুমহিম গীতিচয়,
মরুতে (ও) ফুটায়ে তুলে
স্বর্গ শোভা প্রীতিময়। *

শ্রীহরিকৃপ চৌধুরী।

* "তুজকি বাবরি" হইতে।

ধর্ম্মের জয়।

(১৯)

ইন্দু ক্রমে শুকাইয়া যাইতে লাগিল, প্রত্যহই জ্বর হইতে লাগিল, ইতঃপূর্ব্বে জ্বর হইত, কেহই লক্ষ্য করে নাই, এখন ডাক্তার দেখিয়া যাইবার পর সকলকারই তাহার প্রতি দৃষ্ট পড়িল। বামা যত শীঘ্র সম্ভব নিজের গৃহ কার্য্যাদি শেষ করিয়া তাহাকে লইয়া থাকিত। সুশীলাও প্রথম প্রথম তাহার পথ্যাদি কিনিবার ব্যয় দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহিণী বলিলেন যে, তাঁর ছেলে মেয়ে নাই, তিনি ইন্দুকে বড় ভালবাসেন, ইন্দুর বিষয়ে যাহা ব্যয় হইবে, তাহা তিনিই দিবেন। প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার আনিয়া দেখাইতেন। ডাক্তার আসিয়া কোনবারেই আশা দিতে পারিতেন না। সুশীলার বক্ষ পঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। নিজের সেই অসহায় অবস্থা, পুত্র তিনটি নিতান্ত বালক। অজিতের মনঃকষ্ট, সম্মুখে এই ভীষণ পরীক্ষা। সুশীলা আর যেন পারেন না। তিনি সেই নিরুপায়ের উপায়ের প্রতি সব ভার দিয়া অবসন্ন হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সে অবস্থায় যদি কেহ কথনো পড়িয়া থাকেন ত বুঝিতে পারিবেন। সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় পলে পলে হৃদয় চূর্ণ হওয়া বড়ই কষ্টের কথা।

অজিত একদিন প্রাতঃকালে মিঃ রায়ের আফিসে তাঁহার টেবিল পরিষ্কার করিয়া রাখিবার সময় একটি হাফ গিনি পাইল। সে তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া রাখিল। মিঃ রায় আফিসে আসিবার পর তাঁহার হস্তে দিল। তিনি বিস্মিত ভাবে বলিলেন—

"এ কোথায় পাইলে?"

অজিত বলিল—"আজ সকালে টেবিলে পাইলাম।"

মিঃ রায় বলিলেন—"তুমি যে বড় লইলে না, আমায় দিলে যে?"

অজিতের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, সে বলিল—"যাহা আমার নয় আমি কেন তাহা লইব?"

মিঃ রায় বলিলেন "তোমার কত দরকার থাকিতে পারে, মারবেল কেনা, লজেন্স খাওয়া, ঘুড়ি উড়ান—"

অজিতের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, সে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—

"মহাশয় আমরা ভদ্র ঘরের সন্তান! আমার বাবা আমায় নীতি বিষয়ে বিশেষ ভাবেই শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমার মা দরিদ্র হলেও আমাদের সৎপথে চালাইতেছেন। আমাদের প্রাণ যদি যায়, অনাহারে যদি মরি, তবু আমরা কেহই পরের দ্রব্য লব না।"

মিঃ রায় বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কি একবারও লইতে ইচ্ছা হয় নাই? একবারও কি ভাবনি এটি তোমার হলে ভাল হ'ত?

অজিতের মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইল, সে বলিল—

"হাঁ আমি একবার মনে করেছিলাম, এটি আমার হলে ভাল হইত। আমার ছোট বোনের খুব অসুখ, মা তার জন্য আঙ্গুর বেদানা কিনতে পারতেন—"

মিঃ রায় আনন্দের সহিত বলিলেন—"অজিত, তোমার সত্য কথার এই পুরস্কার। এটি তুমি নাও, এটি তোমার গিনি। তোমার বোনের জন্য যা ভাল মনে হবে কিনে দিও। আর এক কথা, কাল থেকে তুমি আর আফিসে এসোনা—"

অজিত ব্যস্তভাবে বলিল—'কেন, আমার কি কিছু অপরাধ হয়েছে, আমি ও গিনি নেবোনা।"

মিঃ রায় হাসিয়া বলিলেন—"না, না কোনও অপরাধ হয় নাই। এ গিনি তুমি নাও। তুমি এখানে না এসে প্রত্যহ সকালে আমার পুত্র শিশিরের কাছে যেও। সেখানে তার শিক্ষক আসেন, তুমি তার সহিত পাঠাভ্যাস করিও। বৈকালে তাহার সহিত খেলা করিও, ঐখানেই বৈকালে আহার করিও।"

অজিত বলিল—"এখানে যা পাই, তাহাতে আমার মায়ের উপকার হয়। আমি লেখাপড়া খুবই ভালবাসি, কিন্তু মায়ের যাতে ভাল হয়, তাই সব চেয়ে ভালবাসি। আপনার বাড়ী গিয়া খেলা বা পড়া করিলে ত এখানে যাহা পাই তাহা পাব না।"

মিঃ রায় বলিলেন—"তুমি এখানে যা পাও, তার বেশী পাবে। আমি তোমায় মাসে দশ টাকা করে দিব। তদ্ভিন্ন ক্রমে তোমার উন্নতির সঙ্গে তোমার মাহিনাও বাড়বে। ইহাও তোমার এক কাজ মনে রাখিও।"

অজিত কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

"আপনি আমাদের প্রতি যা দয়া কচ্ছেন, কথনো ভুলব না।"

মিঃ রায় আর সে কথা শুনিলেন না, গিনিটা তার হাতে দিয়া বলিলেন—

"আজ এখন বাড়ী যাও, কাল সকালেই শিশিরের কাছে যেও। সে তোমার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে।"

অজিত চলিয়া গেল। বাড়ী গিয়া সে তার মার কাছে এই সব কথা বলিয়া সেই হাফ গিনিটা দিল। তার মা সেই হাফ গিনি পাইয়া যত না আহ্লাদিত হইলেন, পুত্রের যে আর সেই ছোট চাকরী করিতে হইবে না, মিঃ রায়ের পুত্রের সঙ্গী হইয়া লেখাপড়া করিতে পারিবে, তাহাতেই তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল।

অজিত পরদিন প্রাতঃকালে শিশিরের কাছে গেল। শিশির তাহার অপেক্ষায় ছিল। অজিত যাইবার পর সে অজিতকে বসিতে একটি বেত্রাসন দেখাইয়া দিল। অজিত তাহাতে না বসিয়া বলিল—

"আমি দাঁড়াইয়া থাকি, কি বলিবেন বলুন।"

শিশির অভিমান করিয়া বলিল—

"তুমি আমার আপনি কেন বলিতেছ?"

অজিত বিস্ময়ে বলিল—

"আপনি আমার প্রভুর পুত্র আপনাকে আপনি বলিব না?"

শিশির অজিতের হাত ধরিয়া বলিল—

"না তাহা হইবে না। আমি তোমায় 'অজিত' বলিয়া ডাকিব তুমি আমায় 'শিশির' বলিয়া ডাকিবে। আমি কথনো কারো সঙ্গে ভাব করি নাই, তুমি আমার বন্ধু হইবে। বন্ধু কথনো কি বন্ধুকে 'আপনি' বলে?"

অজিত হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা তাহাতেই যদি তুমি সুখী হও আমি তাই করিব, আমি তোমায় 'শিশির' বলিয়াই ডাকিব।"

শিশির পুনরায় তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করায় সে আসন গ্রহণ করিল। ক্রমে তাহাদের শিক্ষক আসায় পাঠে মনোনিবেশ করিল। সন্ধ্যার সময় প্রফুল্ল মুখে শিশির তাহার পিতাকে বলিল—

"বাবা, আজ আমার দিনটা কি ভাল লেগেছে। রোজ দিন কি বড় মনে হয় যেন কাটে না। আজ কোথা দিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। অজিত কি ভাল, ওকে আমার একটুও ছাড়তে ইচ্ছা করে না। অজিতের বাবা এই বিসপ্স কলেজেই পাস করেছেন। তিনি স্কুলের মাষ্টার ছিলেন। অজিত লেখা পড়া সব তার বাবার কাছে শিখেছে।"

মিঃ রায় পুত্রের শুষ্ক মুখে হাসি দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। এদিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দুর অসুখ খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। সুশীলা সন্ধ্যার পর রান্না ঘরে গিয়া ছেলেদের আহারাদি করাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ইন্দু অচেতনের মত ভূমিতে পড়িয়া আছে। তিনি অজিতের সহিত ধরাধরি করিয়া তাহাকে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইলেন ও বামাকে সংবাদ পাঠাইলেন। বামা ইন্দুর প্রাণপণে যত্ন করিতেছে, ইন্দুর পীড়ার চিন্তায় তাহার মুখ সর্ব্বদা বিষণ্ণ, সে এখন আর সে প্রকার উচ্চ কণ্ঠে কলহ করিবার জন্য ছুটিয়া আসে না বা অজিতদের

কাহাকেও কিছু বলে না। সে অজিতের নিকট সংবাদ পাইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া অজিতকে বলিল, "যাও বাবা ছুটে গিয়ে ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনগে মেয়ের আমার কি হল, ছুটে যাও বাবা।" তার পর সে নীরবে আসিয়া ইন্দুর কাছে বসিয়া তাহার দেহে হাত বুলাইতে লাগিল, তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু আসিতেছে, সে কোনরূপে সামলাইতেছে। অজ্ঞান নারী নিঃস্বার্থ ভালবাসায় উচ্চ আদর্শস্থানীয়া হইয়াছ। পরের প্রতি কয়জনের এমন স্নেহ? আর সেই দুর্ভাগিনী জননী সুশীলা—তাঁহার হৃদয় যেন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, কি করিবেন ভাবিয়াও পাইতেছেন না। স্বামীর শোক যেন দ্বিগুণ ভাবে জ্বলিয়া উঠিতেছে। শৈশবের সেই মাতৃক্রোড় মনে পড়িতেছে, সুশীলার জীবন শ্রান্ত হইয়াছে, আর যেন পারেন না। সহিবার শক্তি যেন হ্রাস হইতেছে। মস্তক যেন ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেছে, হৃদয়ে যেন আকুল ক্রন্দন উঠিয়াছে। মানুষের জীবনে যখন এমন অসহায় ভাব আসে, তখন সে হৃদয় ক্ষণকাল দুঃখে বিচলিত হইয়াও আবার সেই অনন্ত আশ্রয়, অনন্ত সহায়ের দিকে ধাবিত হয়। সুশীলার হৃদয়ও সেই চরণে লুটাইয়া পড়িল।

অজিত কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার বাবুকে লইয়া আসিল। তিনি আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলেন। তার পর বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মস্তক দোলাইয়া বামাকে বলিলেন "অবস্থা ভাল নহে, এখনি একটু ব্রাণ্ডি দাও, হাত পা ঠাণ্ডা হলে গমের ভুষিতে সেঁক দাও; দেখ তাহাতে কি হয়। যদি আজকের রাত কাটে, তবে কাল সকালে এসে যা হয় ব্যবস্থা করিব।" বামা ডাক্তার বাবুর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল— "দোহাই ডাক্তার বাবু আমার মেয়েকে বাঁচাও, তুমি যা চাবে আমি তাই দিব, ডাক্তার বাবু ইন্দুকে বাঁচাও।"

ডাক্তার বাবু শশব্যস্তে তাহাকে সরাইয়া দিলেন। অজিত বামাকে তুলিল, সুশীলার চক্ষের অশ্রু আর বাধা মানিতেছে না তবু নীরবে রোদন করিতে করিতে অজিতকে দিয়া ডাক্তার বাবুর ফি দিতে দিলেন। ডাক্তার বাবু তাহা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল। সেই অসহায়া নারীর ধৈর্য্য, ক্ষুদ্র শিশুগুলির শুষ্ক মুখ বামার ক্রন্দনে তাঁহার চক্ষে জল আসিতেছিল তিনি বলিলেন—

"না, একি ফি নেবার সময়? আমি আবার কালই আসবো। তবে দরকার হলে আবার সংবাদ দিও। আশা ত কিছুই দেখছিনে।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সারারাত সুশীলা ও বামা সেই শয্যা পার্শ্বে মুমূর্ষু কন্যাকে বক্ষে লইয়া বসিয়া রহিলেন। অজিত অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছিল, সুশীলা তাহাকে শুইতে পাঠাইলেন। সে কি ভীষণ রাত্রি! প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তান তাহাকে বাঁচাইবার কোন সাধ্য নাই, তাহার জীবনের অবসান এখনি হইবে সেই আশঙ্কায় যে জননী সেই ভাবে কখনো বসিয়াছেন তিনি বুঝিবেন যে সে কি ভীষণ অসহনীয় যাতনা। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে মানবের কত সাধ কত আশা! এই যে জীবন পদ্মপত্রে জলের মত এই আছে এখনি নাই, এ জীবনকে যদি সৎপথে রাখিয়া সৎকার্য্যে নিয়োজিত করা যায় তবেই মঙ্গল। নতুবা সংসারের মায়ায় ক্রমাগত বদ্ধ হইলে কি যন্ত্রণা। শেষের কি পরিণাম।

রাত্রি অবসানের সহিত ইন্দুর ক্ষুদ্র জীবনপ্রদীপ নিভিয়া গেল, বামা মূর্চ্ছিতার মত শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। সুশীলা স্তম্ভিতা হইয়া বসিয়া রহিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই বিভা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"পিসিমা ইন্দু কেমন আছে? পিসিমা আমায় শীঘ্র জিজ্ঞাসা করে আসতে বলিলেন।"

সুশীলা শুষ্ক কণ্ঠে বলিলেন—

"ইন্দু আর আমার কাছে নাই মা, সে সুখের রাজ্যে তার বাবার কাছে চলিয়া গেছে।"

বিভা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বর্ত্তমান যুগে স্ত্রীজাতির উন্নতির উপায়।*

অদ্য এই নারী সমিতিতে আমায় কিছু বলিবার জন্য মাননীয়া ভগিনী শ্রীমতী কমলা বসু আমাকে অনুরোধ করায় আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। সভাস্থিতেতে বলিবার মত ক্ষমতা আমার কিছু নাই, যাহাতে আমি যে মনের সকল ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব তাহাও বোধ হয় না। তবে তাঁহার অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমি কয়েকটি কথা বলিতে অগ্রসর হইয়াছি, ইহাতে যদি কোনও ভুল ও ত্রুটি হয়, আশা করি দয়া করিয়া সকলে মার্জ্জনা করিবেন। আমি এই কয় দিনের জন্য এখানে আসিয়া অনেকের সহিত পরিচিত হইয়া, অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। বাঙ্গালী মহিলাদিগের ভিতর, এই প্রীতির ভাব যাহাতে স্থায়ী হয় ও প্রসারিত হয় আমাদের সকলকার তাহা করা কর্ত্তব্য। যে যে দেশে আমরা যে যেথানে আছি, সকলে একত্র হইয়া, যদি মধ্যে মধ্যে এই প্রকার মিলিত হই এবং সকলে আপন আপন মনের ভাব প্রকাশ করিয়া যাহাতে পরস্পরের সাহায্য করিতে পারি তাহা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। এই প্রকার পরস্পরের সহিত মেলা মেশায় মনের সঙ্কীর্ণতা অনেক পরিমাণে দূর হইয়া যায়। এই প্রকার মেলা মেশায় মনের ভিতরকার গর্ব্বের ও মানের ভাবও দূর হয়, পরস্পর যেন আপনারজন হইয়া উঠে। পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে সমাজ বা সংসারের কল্যাণ সাধিত হয় না। সমাজ বা সংসার সুধু এক সংখ্যা লইয়া হয় না। পরিবারে পরিবারে মিলিত হইলেই সমাজও বাড়িবে, এবং পরস্পরের মিলিত হইলে প্রীতির ভাব বাড়িবে। আমাদের দেশে এখন এমন এক সময় আসিয়াছে, তাহাতে সকলকারই মনের গতি সমুদ্রের তরঙ্গের মত চঞ্চল হইয়াছে। কোন দিকটা ধরা উচিত, কোনটা পরিত্যাগ করা উচিত, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়াছে। কেহবা নূতনের পক্ষপাতী হইয়াছেন, কেহবা সবলে পুরাতনকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। এখন আমাদের দেশে এমন সময় আসিয়াছে, ঠিক পুরাতন প্রথা, আচার ব্যবহারে কেহই তৃপ্ত হইতে পারেন না। পূর্ব্বে বসিবার নিয়ম ছিল হয় তক্তাপোষ, নয় মাদুর বা সতরঞ্চ, এখন ত প্রতি শিক্ষিতের বাটীতেই চেয়ার টেবিল রহিয়াছে, বাটীর স্ত্রীলোকেরাও তাহাতে বসিতে সঙ্কুচিত হন না। পূর্ব্বে চেয়ারে বসিলেই মেম সাহেব পদবী পাওয়া যাইত। পূর্ব্বে আহারের নিমন্ত্রণে ভাত ডাল সুক্ত ঘণ্ট চড়চড়ি ডালনা, ভাজাভুজিতে শেষ হইত, পরমান্ন পিষ্টকে তৃপ্ত হইত। এখন পোলাও কালিয়া কোপ্তা কাবাব না হইলে নিমন্ত্রণের অঙ্গহানি হয়। পূর্ব্বে বিবাহের নিমন্ত্রণে ভাত হইত, এখন মাছের কালিয়া ও পোলাও না হইলে কিছুতেই হইবে না। যদি আচারে ও আহারে এত ব্যতিক্রম ঘটে তবে অন্য বিষয়ে কেন হইবে না? পূর্ব্বে সোডাওয়াটার কয়জন বঙ্গরমণী পান করিতেন? এখন কয়জন আছেন যে পান করেন না? সোডাওয়াটার হিন্দু বাড়ীতে প্রস্তুত হয় না। পূর্ব্বে কত রমণী ডাক্তারি ঔষধ পর্য্যন্ত পান করিতেন না, এখন সে ভাব কয় জনের আছে? পূর্ব্বে একমাত্র পরিধানেই লজ্জা নিবারণ হইত, এখন সে ভাবে কয়জন লজ্জা নিবারণের জন্য অগ্রসর হইবেন? পূর্ব্বে বাউটির সুট পরিয়া, নাকে নথ দিয়া, পায়ে মল দিয়া, লোকে কত সুখী হইত। এখন বিবাহের সময় মাথায় টায়রা, গলায় নেকলেস, হাতে ব্রেসলেট, ব্রোচ পিন না হইলে কয়জনের চলে? আজ কালের দিনে সমস্ত পুরুষেরাই আধুনিক ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদের মনের গতি, ইচ্ছা এখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে, তাঁহারা সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়াই চলেন।

* রাঁচী নারী সমিতিতে পঠিত!

নারীজাতির মনের মধ্যে যদি কোনও উচ্চাশা জাগিয়া উঠে, তাহা নিন্দনীয় কেন হইবে? স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী হইতে হইলে স্বামীর হৃদয়ের সকল ভাব বুঝিয়া সেই অনুযায়া চলিতে হইবে। সেইজন্য স্ত্রীলোকের মানসিক শিক্ষার উন্নতি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমি সে শিক্ষার কথা বলিতেছি না, যে শিক্ষায় স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া, সংসারের কর্ত্তব্যে উদাসীন হইয়া, শুধু বিলাস লালসায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন, বা পটের পুতুলের মত শুধু সাজিয়া গুজিয়া চেয়ারে বসিয়া নভেল নাটকে দিন কাটাইবেন। স্ত্রীলোকের দায়ীত্ব অনেক, গৃহের যিনি গৃহকর্ত্রী তাঁর দায়িত্ব তদোধিক। সংসারে স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, অর্থাৎ ধর্ম্ম পথের সহায় হইবেন। সহকর্ম্মিণী অর্থাৎ কর্ম্মে সাহায্য করিবেন। উভয়ে উভয়ের মন বুঝিয়া যাহাতে সংসারের ও পরিবারের কল্যাণ হয় তাহাই করিবেন। সেইজন্য আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। শিক্ষা ব্যতিরেকে মানবের মনে উচ্চ ভাব বিকাশের সুযোগ হয় না। মনের পূর্ণ বিকাশ হইলে, হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরিত হইলে, মানবের সংসার স্বর্গে পরিণত হয়। সেইজন্য জীবন পথে পদার্পণ করিবার সময় হইতেই যাহাতে মনে ধর্ম্মের অঙ্কুর বপন করা হয় তাহা সকলকার দেখা কর্ত্তব্য। মানবের জাবন পথে, পদে পদে পরাক্ষা, আজ হয়ত সুখসাগরে ভাসিতেছি, কাল হয়ত দুঃখের পাথারে ডুবিয়া মরিব। আমাদের মনে যদি ধর্ম্মভাব জাগ্রত না থাকে কি করিয়া মনে ধৈর্য্য লাভ হইবে? এই জীবনে সকলি ক্ষণভঙ্গুর, আজ যাহা আছে, কাল হয়ত তাহা থাকিবে না আমরা শুধু সংসারবেলায়, বালুকার ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই কত আশা, বিশ্বাস স্থাপিত করিতেছি। একবারও মনে হয় না একটু ঝড়ে বা বাতাসে সাধের ঘর ভাঙ্গিয়া যাইবে, কে কোথায় গিয়া পড়িব তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। তাই এই অনিত্য সংসারে, যাহাতে আমাদের মনে স্বর্গীয় ভাবের বিকাশ হয় তাহাই চেষ্টা করিতে হইবে। স্ত্রীজাতির শিক্ষা বলিলেই যে শুধু পুস্তকের বিদ্যা বা বিদ্যালয়ের শিক্ষা বুঝিতে হইবে তাহা নহে। জ্ঞানের জন্য বিদ্যাশিক্ষা আবশ্যক, সাংসারিক জ্ঞানের জন্য কর্ম্ম শিক্ষা আবশ্যক। কিন্তু মনের যে জ্ঞান তাহা বিনা বিদ্যাতেও লাভ করা যায়। যেমন পরোপকার করিবার ইচ্ছা। অপরের মঙ্গলের জন্য নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ। প্রতিবাসীর মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা, রোগে শোকে, বিপদে অপরকে সাহায্য করা। আত্মীয়স্বজন বন্ধুগণের প্রতি প্রীতির ভাব। এইগুলি যখন আমাদের জীবনের সার হইবে, তখনি আমাদের জীবন ব্রত সার্থক হইবে। এ ভাব কি করিয়া আসিবে? মনে ধর্ম্ম বল না থাকিলে মন আপনিই ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর হইয়া পড়ে। ধর্ম্মভাব প্রবল না হইলে এ ভাব হৃদয়ে বিকশিত হয় না।

এই যে আজ আমরা পরস্পরে সম্মিলিত হইলাম আজ যদি আমাদের মনের ভাব পরস্পরকে পরিষ্কার রূপে বুঝাইতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে কত ভাল। আমাদের পরস্পরের কত ব্যবহারে কত ভুল, কত ত্রুটি আছে যদি তাহা নিজের ভগিনী জ্ঞানে মনে ধরি তা হলে কত শান্তি পাইব। এই যে পরস্পরের উন্নতির জন্য প্রবল চেষ্টা ইহা ক্রমশঃ সার্থক হইবে। ক্ষুদ্র নারী সমিতির দ্বারা যদি দেশের একজন নারীরও কল্যাণ সাধিত হয় তাহা হইলে কতটা শ্রম সফল হইল। যদি আমরা সকলেই মনে করি এ কাজ আমাদের নিজের কাজ, একজনের বলিয়া সমস্ত ভার একইজনের নিকট ফেলিয়া না দিয়া যদি পরস্পরে খানিকটা করিয়া তুলিয়া লই কাহারও ভারবহ হইবে না। যেন মনে করি এটা আমাদের সাধের ফুলের বাগান, এখানে যাহা কিছু সুন্দর ফুল ফল হবে, আমাদেরি পরিশ্রমের ও যত্নের পুরস্কার, তাহলে কি আমাদের সকলকার মনে বিমল আনন্দ হইবে না? একা কোন কাজ করিতে নাই—

> "দশে মিলে করি কাজ
> হারি জিতি নাই লাজ"

সকলে মিলিয়াই কাজ করা ভাল। এই প্রকার নারীসমিতি যদি প্রতি দেশে, প্রতি পল্লীতে হয়, এবং সকলেই কারো উন্নতির জন্য চেষ্টা করি তাহা হইলে আমাদের দেশের অনেক উন্নতি হইবে। আমার কথায় যেন কেহ বুঝিবেন না, যে আমার মতে নারীরা পোষাক পরিচ্ছদ আঁটিয়া পথে পথে ঘুরিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইবেন, আমি সেই পরামর্শ দিতেছি। আমি অন্তঃপুরবাসিনীদের কথাই বলিতেছি। অন্তঃপুরের বাড়ীর সীমার বাহিরে যাইবার কোনও আবশ্যক নাই। অন্তঃপুরের মধ্যেই শিক্ষার প্রসার হওয়া আবশ্যক সেই কথার বিষয়ই আলোচনা করা আজিকার উদ্দেশ্য। অনেকে বলিতে পারেন আমাদের সংসারে কাজ কর্ম্ম আছে, ছেলে মেয়ে আছে গুরুজনদিগের প্রতি সম্মান দেখানর জন্য সমিতি ইত্যাদিতে যোগ দিবার আবশ্যক নাই। সমিতি করিয়া কি হইবে? সমিতি তিনটি ক্ষুদ্র অক্ষর, তাহার উপরে নারী সমিতি দুর্ব্বল অজ্ঞ বঙ্গ রমণীদিগের উন্নতির উপায়। ইহাকে ভয় করিবার কিছু নাই। কোনও বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে পরস্পরের সম্মিলন হইলেই হইল সমিতি। এই বঙ্গনারী সম্প্রদায়ের ভিতর নানা শ্রেণীর সমাবেশ। হিন্দু ব্রাহ্ম খ্রীষ্টীয় মাহলা-দিগের মেলামেশায় কিন্তু জাতিপাতের ভয় নাই। যদি হইত ইংরাজ রাজ্যে পুরুষেরা যেখানে কর্ম্ম করেন সেখানেও তাঁহাদের নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিতে হয়। তাঁহাদের যাদ জাতি না যায় আমাদের কেন জাতি যাইবে? আর ধর্ম্ম বা জাতি মাটির পাত্র নহে যে ছুঁইলেই নষ্ট হইবে। আমাদের ধর্ম্ম নিজের কাছে। যাঁহারা অপরের ধর্ম্ম বা জাতি লইয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের সভয়েই থাকা ভাল। আমরা বাঙ্গলা দেশের সকল সম্প্রদায়ের মহিলারাই আমাদের আপনার জন, আমরা যেন এইটুকু মনে করিয়া লইতে পারি। কাহারও ধর্ম্মে আঘাত না দিয়া, কাহারো স্পর্শ না করিয়া যেন অসঙ্কোচে মেলামেশা শিখি, ক্রমে আমরা সকলেই এই মেলামেশার বুঝিতে পারিব ও তখন আর কোনপ্রকার থাকিবে না। সংসারের কাজ আমাদের সকলকেই করিতে হয়, সকল সম্প্রদায়ের মহিলা-

দিগকেই স্বামী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনের পরিচর্য্যা করিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা মাসান্তে একবার বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া প্রীতি সম্ভাষণ করিব না? সেটাও কি আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নহে? মধ্যে মধ্যে এই প্রকার মিলিত হইয়া পরস্পরের মনের ভাবের আদান প্রদানে, মন ও উন্নত হয় ও অনেক শেখা যায়।

আজকাল বিদ্যা শিক্ষা সকলকার একান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান যুগে প্রায়ই নিরক্ষর কেহ নাই। সকলেই আপন আপন পুত্র কন্যাকে পাঠাভ্যাস করাইতেছেন। জননীদেরও সেই সঙ্গে শিক্ষার একান্ত আবশ্যক। স্বামী কর্ম্মস্থানে গিয়াছেন, পুত্র বিদ্যালয়ে আছে, বা বিদেশে গিয়াছে এমন সময় যদি একখানি টেলিগ্রাম আসে, পড়িতে না জানিলে, তাহার জন্য অন্যের সাহায্য আবশ্যক হইবে। একখানি চিঠি রেজিষ্টারী করিতে বা ইন্‌সিওর করিতে হইলে, বা কোথাও একটি মণি-অর্ডার পাঠাইতে হইলে অন্যের বাটীতে ছুটিতে হইবে। এ সকলের আবশ্যক কি? বঙ্গরমণীদের কি সে শক্তি নাই যে তাঁহারা এ সকল বিষয়ে সুদক্ষ হইবেন? আজকালকার পুরুষেরা নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন, চারি দিকে বাঙ্গলী জাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা বাড়িতেছে, বঙ্গরমণীরা কেন স্বইচ্ছায় ও চেষ্টায় নিজের মানসিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে না? লেখাপড়া শিখিলেই যে নিজেদের সমাজ ছাড়াইয়া যাইতে হইবে বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে এমন কথা কোনও শাস্ত্রে নাই। আমরা অন্তঃপুরবাসিনী—অন্তঃপুরকে স্বর্গ করিবার যে সকল উপায় আছে আমরা সেইগুলিই অবলম্বন করিতে চাই। যাঁহার যেমন অভিরুচি তিনি আপনার স্ত্রীকে সেই পথে চাইবেন, স্ত্রীলোকমাত্রেই আপনার স্বামীকে জীবনের প্রদর্শক জানিয়া, তাঁহারই চালিত পথে চলিবেন। হয়ত অনেক স্থলে কত স্বামীর ইচ্ছা স্ত্রীকে মনেরমত গান বাজনা শেখান, একটু স্বাধীন ভাবে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন, কিন্তু সমাজের সে সকল মনের ইচ্ছা মনেই থাকিয়া যায়। নিজের ইচ্ছামত কার্য্য না করিতে

পারিলেই জীবন অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠে। সংসার কারাগার তুল্য মনে হয়। কত স্ত্রীলোক চিরকালের অভ্যাসের দরুণ স্বামীর মতানুযায়ী চলিতে পারেন না, লজ্জায় তাঁহাদের সে পথে পদ অগ্রসর হয় না। ইহাতে আমি কত যে দেখিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই, ক্রমে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এত ব্যবধান আসিয়া পড়ে যে আর কিছুতেই তাহা ঠিক হয় না। এই একটা উদাহরণ দেখুন। একজন বিলাত ফেরত শিক্ষিত হিন্দু যুবা এ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার বাপ মা স্ত্রীকে ভাঁড়ার দেওয়া রান্না শেখান ছাড়া অন্য কিছুই শেখান নাই। আহারে এমন বাচ-বিচার যে বলিবার কথা নহে। তিনি যখন তাঁহার স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা করিয়া নিজের মনের মত সঙ্গিনী করিতে চেষ্টা করিলেন, কোনমতে পারিলেন না। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার খাদ্য দ্রব্য পর্য্যন্ত স্বইচ্ছায় প্রস্তুত করিতে পারিতেন না, ম্লেচ্ছ খাদ্যে বড়ই ঘৃণা ছিল। তাহাতে কি ফল হইল? স্বামী ক্রমে ক্রমে ভদ্রসমাজে আর মিশিতে পারিতেন না, কারণ আজকালকার নব্য সমাজে সকলেই স্ত্রী লইয়া বাহির হন, তাহা না হইলে সে সমাজে তাঁদের আদর থাকে না। কাজেই তাঁহাকে কুসঙ্গীর সহিত থিয়েটার ইত্যাদিতে আমোদ প্রমোদে যোগ দিয়া, নিজের জীবনকে এমন দিকে লইয়া গেলেন যে আর উন্নতির বা সুপথে ফিরিবার কোন আশা রহিল না। এ স্থলে স্ত্রী যদি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতেন, সতী স্ত্রীর মত স্বামীর সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন কত সুখের হইত। আমাদের দেশে অর্থাৎ হিন্দু রমণীরা যদি গান বাজনা করেন তাহা বড়ই দূষনীয়, গান যে কেন দূষনীয় তাহা বুঝাইতেও পারেন না। আমি কত বাড়ীতে দেখিয়াছি বালিকা বধূ খুব ভাল গান গাহিতে জানেন। শ্বশুরবাড়ীতে বধূ গান গাহিতে পারেন জানিলে শ্বশ্রূমাতা বলিয়া উঠিবেন "বাপরে সেকি হয়" সে যেন কত কলঙ্কের কথা। কিন্তু পয়সা দিয়া থিয়েটারে গিয়া সেই সকল ঘৃণিতা রমণীর গান শোনা ত নিন্দনীয় নহে। কত পুরুষের যে গান শোনার স্পৃহা প্রবল তাহার সংখ্যা হয় না, এই গানের জন্যই যে কত লোক কুপথে গিয়াছে তাহারও সংখ্যা নাই। সেই গান যদি সকলে এত ভাল-বাসে; কেন বধূ বা কন্যা গান শিখিবে না? আজকাল ছেলেদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ উঠিয়াই যাইতেছে, মেয়েদের ও বয়স হইয়া বিবাহ হইতেছে। সেই চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বৎসরের কন্যাকে ইচ্ছা করিলেই নানা-বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। যদি আপন আপন সংসারের সুখ শান্তি ও আরামের আশা করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সমাজেরও যাহাতে উন্নতি হয় তাহা করিতে স্ত্রীলোকমাত্রকেই যত্নবতী হইতে হইবে। আমাদের পুরাকালের ইতিহাসেও ত রমণী-দিগের চিত্রাবস্থা গীত শিক্ষা শাস্ত্র পাঠ গণিত শিক্ষার কথা শোনা যায়। যদি পূরাকালে এসকল দূষণীয় না হইত, তবে এখন হইবে কেন? আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে রমণীগণ স্বাধীন ছিলেন, তখন এত অবরোধ প্রথা ছিল না। মহাভারত ও রামায়ণ পাঠ করিলেই হিন্দুজাতির আদর্শ ইতিহাস পাওয়া যায়, সে সকল কি ভূল? মহাভারতে রাজকন্যাগণের স্বয়ম্বরের কথা লিখিত রহিয়াছে। পথে পথে বনে বনে বিচরণের কথা লিখিত রহিয়াছে, তাহাতে কি বুঝায় যে যখন সীতা সাবিত্রী বা দময়ন্তী পতির সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন তখন পাল্কীতে ঘেরাটোপ দিয়া গিয়াছিলেন বা যখন তাঁহারা আসিয়া রাজসভায় দাঁড়াইতেন তখন তাঁহারা মুসলমান মহিলাদিগের মত মুখে বোর্খা দিয়া আসিতেন? কুন্তী রাজরাণী হইয়াও ত পুত্রদের সহিত স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়াছেন, দ্রৌপদী, সীতা বন হইতে বনান্তরে ঘূরিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের সহিত পাল্কী গাড়ী ছিল না, সে কথারত উল্লেখ নাই। পূর্ব্বে এসব কিছুই ছিল না।

এই অবরোধ প্রথা আমাদের মুসলমানের রাজত্ব হইতেই আসিয়াছে, কারণ সে সময়ের অত্যাচারে নারীজাতির মানসম্ভ্রম রক্ষা হইবার অন্য কোনও উপায় না থাকায় সকলকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমি তাই বলিয়াই আজ সকলকে বলিতেছি না যে অবরোধ প্রথার শৃঙ্খল ছিন্ন করি[য়া] সকলকেই দ্রুত স্বাধীন হইয়া পথে পথে বিচ-[রণ] করিয়া বেড়াইতে হইবে। বাহিরের স্বাধীনতার [আ]বশ্যক না থাকিলেও, আমাদের মনে স্বাধীনভাব [ও] তেজ থাকা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এখন [প্রা]য় সকলেই ট্রেণপথে বিচরণ করেন বা স্বামীর [স]হিত তাঁহার কর্ম্মস্থানে যাইতে হইলে দেশ হইতে [দে]শান্তরে গমন করেন। পূর্ব্বে বিদেশ যাইবার [না]মেই ত "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" হইত, এখন সে [দি]ন নাই। রেঙ্গুন হোক, বা আসাম হোক, বা [ব]োম্বাই, মান্দ্রাজ হোক সকলেই আপন কর্ম্মস্থলে [প]রিবার লইয়াই যাইবেন। সুতরাং স্ত্রীলোকদের [এক]টু সাহসী হওয়া আবশ্যক, একটু প্রত্যুৎপন্নমতিতা [আ]বশ্যক, ট্রেণে কত ঘটনা ঘটিতে পারে সেজন্য [সাহ]সে দরকার। স্ত্রীলোকের মনে স্বাধীন ভাব [থাকি]লে বা তেজস্বিনী হইলে যে লজ্জা ভয় থাকিবে [না], এ কথা কেহ বলিতে চায় না। স্ত্রীলোকের [লজ্জা] না থাকিলে কোনও সৌন্দর্য্য থাকিবে না। [সা]ক্ষাতে তেজস্বিনী নারীর মুখের ভাবে মন্দ লোকও [তফ]াতে চলিয়া যায়। তেজস্বিনী নারীর মুখের ভাবে [দেখি]লেই সম্ভ্রম করে। স্ত্রীলোককে কুসুমের মত [কো]মল হইয়াও সময়ে বজ্রের মত কঠিন হইতে [হ]ইবে।

আমাদের দেশে প্রথমে যে কেহ একটা কাজ [ক]রিবেন তাহাতেই হাসির ঘটা উঠিবে ও চারিদিক [হ]ইতে নিন্দার স্রোত বহিবে। তবে যে কোনও [ব্য]বহার ও আচরণ হউক না কেন, সীমার বাহিরে [যা]ইবার কাহারও আবশ্যক নাই। হিন্দু রমণীরা [ক]খনও কিছুতেই নিজেরা স্বাধীন হইয়া ইংরাজ [রম]ণীর মত বিচরণ করিতে পারেন না, আমাদের [দে]শে সে সময় আসে নাই এবং দেশ কাল পাত্র ভেদে [তা]হা শোভাও পাইবে না। যাঁহারা শুধু ইংরাজ [মহি]লার আচার ব্যবহার অনুকরণ করিয়া সেই ভাবে [জী]বন কাটাইতেছেন তাঁহারাই যে খুব সুখী তাহাত [ম]নে হয় না। আমাদের এখন সময় আসিয়াছে যে [আ]মরা সকল সমাজের ভাল টুকু যদি গ্রহণ করি, যদি [নী]র ছাড়িয়া শুধু ক্ষীরটুকু গ্রহণ করি তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। ইংরাজ রমণীর গৃহশিক্ষা, গৃহের পরিচ্ছন্নতা কার্য্যকুশলতা সন্তান পালন এ গুলি আমাদের শিক্ষা পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইংরাজ রমণীর প্রতিদিনের গৃহস্থালীর কার্য্যকলাপ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মিশনারী মহিলা হইতে আমি সিবিলিয়ানের স্ত্রী পর্য্যন্ত দেখিলাম, তাঁহারা এক মুহূর্ত্ত বৃথা কাজে সময় নষ্ট করেন না। সময় ও ঘড়ি তাঁহাদের যেন এক নিয়মে বদ্ধ। সকাল হইতে উঠিয়া রাত্রিতে শয়নের সময় পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক নিয়মে চলিতেছে। অবশ্য অনেক ইংরাজ মহিলা আছেন যাঁহারা আমোদ প্রমোদে তাস খেলায় অনেক সময় নষ্ট করেন, কিন্তু সেই কয়েকজন ইংরাজ মহিলার আচরণ দেখিয়া সমস্ত ইংরাজ মহিলার চরিত্রের বিকাশ দেখা যায় না। আমি একজনের প্রতিদিনের দৈনিক জীবনের ঘটনার কথা বলিতেছি তিনি একজন সিবিলিয়ানের স্ত্রী। তাঁহার কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়া যাই। তিনি স্বহস্তে নিজের গৃহস্থালীর সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। নিজের হাতে সকালে উঠিয়া ভাঁড়ার দেওয়া, রন্ধনের ব্যবস্থা করা, পুত্র কন্যার আহারের ব্যবস্থা, স্নান করান, বাগান দেখা, ঘোড়া গরু দেখা কোন কার্য্যেই অলসতা নাই। ঘড়ি দেখিয়া কাজ করিলে যে কাজের কত শৃঙ্খলা হয় তাহা আমি বিশেষভাবে নিজের জীবনে জানি বলিয়াই, সেই অনুযায়ী কাজ করায় সুবিধা মনে করি। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শুধু ভাঁড়ার ও খাওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে কি করিয়া অন্য কাজ হইবে? বাড়ীর সকল ছেলে মেয়েরা যদি যখন যাহার ইচ্ছা আহার চায়, স্নান করিতে যায়, তাহা হইলে দাসী চাকরেরও অসুবিধা, নিজেদেরও অসু-বিধা। ঠিক এক সময় স্নানের আহারের ও ভাঁড়ারের জন্য রাখাই ভাল। ইংরাজ মহিলাদিগের সন্তান পালন ও শাসন আমাদের অনুকরণীয়। তাঁহাদের সন্তানেরা বৃথা আবদার করিয়া কিছুই পায় না। আমি যে ইংরাজ মহিলার কথা বলিলাম তাঁহার সন্তানদিগের শিক্ষাও চমৎকার। বড় লোকের সন্তান বলিয়া গর্ব্ব নাই, খাওয়া দাওয়ায় পর্য্যন্ত নিজের ইচ্ছা চলে না। পুত্র

একদিন কোনও এক মিষ্টান্ন লইয়া বলিল "এটা রোজ রোজ খাব না।" জননী গম্ভীরভাবে বলিলেন "নিশ্চয়ই খাবে।" পুত্র ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তিনি কি পুত্রকে স্নেহ করেন না? পুত্রের মঙ্গলার্থে তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বালকের মঙ্গলের জন্য সেই সুদূর ইংলণ্ড ভূমিতে তাঁহারা তাহাদের শিশুকাল হইতে ছাড়িয়া রহিয়াছেন। সেই পুত্রের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী। গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম করিয়া বৈকালে স্বামীর সহিত বেড়াইয়া বেড়ান, খেলা করেন, আমোদ প্রমোদ করেন। তাঁহাদের জীবনে এই সকল আদর্শ কি আমাদের অনুকরণীয় হইলে দূষিত হইল? ইহাতে সংসারের যে কত উন্নতি হয় তাহা বলিবার নয়। বাঙ্গালী মহিলারা যাহা করেন অতি নিন্দনীয়, কিন্তু পুরুষরা কি করেন না? তাঁহারা বাটীতে যাহা না পান, তাহা বাহিরে গিয়া চরিতার্থ করেন। ইংরাজী প্রথায় আহার করিতে প্রায় সকলেই ভালবাসেন, বাড়ীতে তাহা হইবে না, তাঁহারা হোটেল ইত্যাদিতে গিয়া কতকগুলা কুখাদ্য খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়েন, হোটেলে গিয়া খাইতে অভ্যাস করিয়া ক্রমেই পানদোষ জন্মায়। বাড়ীতে ইচ্ছামত সব দ্রব্য না পাইলেই, ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য সকলে নানা উপায় অবলম্বন করে। আমাদের সংসার ও সমাজ কাহাকে লইয়া? যদি নিজের গৃহে শান্তি না থাকিল, অন্য উন্নতি কি প্রকারে হইবে? আমরা ইংরাজ মহিলাদিগের মত ব্লাউস জ্যাকেটের কাট লইতে বা কোন প্রকার ফ্যাসান শিখিতে অনিচ্ছুক নই, মেয়েদের ছেলেদের ইংরাজি পোষাকে সজ্জিত করিতে অগ্রসর। মাথায় হ্যাট দিতে রিবণ বাঁধিতে খুবই সাধ, তবু এত বাঁধাবাঁধি কেন যাঁরা বলেন যে, আমরা খুব খাঁটি ভাবে হিন্দুয়ানী মানিয়া চলি, তাঁদের বাড়ীর ছেলে মেয়েরা কি ফ্রক পরে না, পায়ে জুতা দেয় না? আমরা ইংরাজ সমাজের যে টুকু ভাল তাহাই শিখিতে চাই। তাঁদের নাচ শিখিবার বা ঘোড়াচড়া শিখিবার আমাদের আবশ্যক নাই। তাঁহাদের যা ভাল, যেটুকু আবশ্যক সেটুকু জানিলেই আমাদের ভাল। শিখিবার যে কত আছে, তার সংখ্যা বলিয়া কত শেষ করিব। আমাদের দেশের মধ্যে এখন এমন অবস্থা আসিয়াছে যে যাহা করিতেছেন, তাহা সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছেন। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী, তাঁহারা হয় ত এত সে দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন যে, তাঁহারা নিজের দেশের দিকে বা দেশবাসীর দিকে চাহিতে লজ্জা বোধ করেন, হয় ত নিজেকেও বাঙ্গালা দেশবাসী বলিয়া পরিচয় দিতেও চাহেন না। আবার যাঁহারা এদিকে ঝুঁকিয়া আছেন, তাঁহারা নিজের সীমা ছাড়াইয়াও এত ঝুঁকিতেছেন যে ঠিক থাকিতে পারিতেছেন না। পরস্পরের মধ্যে শুধু সংঘর্ষণ চলিতেছে। যাহা করিতে হইবে, কাঁটার ওজনেই হওয়া ভাল। যেদিকে বেশী ঝুঁকিবে, সে দিকের দড়ি ছিঁড়িবে। অতি কোন দ্রব্যই ভাল নয়। অতি বাড় বাড়িলে ঝড়ে উড়িতে হইবে, আবার অতি নীচে পড়িলেও ছাগলে মুড়িয়ে খাবে। অতএব অতি কিছুই ভাল না। সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা ফেরা করাই উচিত। স্ত্রীজাতির উন্নতির বিষয়ে সকলকারই বিভিন্ন প্রকারের মত থাকিতে পারে। আমাদের বাংলা দেশের মধ্যে বাংলা জাতির মধ্যে অভিশাপ আছে। দুজন পুরুষের মতই এক হয় না। আর আমরা অজ্ঞান দুর্ব্বল অশিক্ষিত রমণী আমাদের মতের মিল কি প্রকারে হইবে? আমাদের মধ্যে যদি একতা সংস্থাপিত হয়, পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব বাড়ে তবেই আমাদের দ্বারা কিছু কাজ হইবে। তবে স্ত্রীজাতির দ্বারা যে কোন কাজ হয় না, এ কথার আমি পক্ষপাতী নই। আমাদের দেশে শুধু স্ত্রীজাতির দুষ্ট বুদ্ধিরই কথা আগে প্রকাশ হয়। এই একান্নবর্ত্তী পরিবার এখন প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। সকলে বলিবেন যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মিল না হওয়ায় এই ঘটিল। বাড়ীতে হয় ত মধ্যে মধ্যে অবনিবনাও হইল, স্ত্রীলোকেরই দোষ হইল। কেন স্ত্রীলোকেরা শুধু এই অপবাদই লইয়া থাকিবেন, স্ত্রীলোক যদি ভাঙ্গিতে পারে ত নূতন কারয় কেন গড়িবে না? সমাজের একটা কল্যাণকর

...কর অনুষ্ঠানে কেন যোগ দিবে না? বাঙ্গালী ...দের দুর্ব্বলচিত্ততার কথা ও স্ত্রীর বশীভূত হওয়ার কথা কিছু নূতন নহে। যদি তাঁরা স্ত্রীর কথায় ...নায় কাজগুলিকে প্রশ্রয় দেন ত, কেন সদনুষ্ঠানে ...নুমতি দিবেন না? তবে তাঁরা বলিবেন যে, সমি...র দ্বারা কি সদনুষ্ঠান হইবে, যদি তাহা না হয়, ...হারাই বা ক্লবে কি সদনুষ্ঠান করিতেছেন? ...জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া, পাঁচ রকমের কথা ...লোচনা করিয়া, সদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনের ...ধ্যে অনেক ভাব পাওয়া যায়। শুধু গোয়ালে ...বদ্ধ গাভীর মত, সংসার শৃঙ্খলের ভার চাপা... একই ভাবে জীবন কাটান, তাহাত বাঞ্ছনীয় ...। স্ত্রীলোকেরা কেহই একথা হয় ত স্বীকার ...রিবেন না যে "একলা বেশ থাকি, দরকার কি মেলা ...শার?" যিনি একথা বলিবেন তাঁর দরকার নাই; ...ন্তু একথা কয়জন বলিবেন? যদি কেহ কখনো ...আমার বাটীতে না আসে, আমি যদি কখনো বাহিরে ...হারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে না যাই, কারাগারে ...দীর মত সেই একই গৃহে আবদ্ধ থাকি, থাকিতে ...পারিব কি? তাহা ত মনে হয় না। স্ত্রীলোক ...স্ত্রীলোকের সহিত মেলামেশা করিবে, বিশুদ্ধ আমোদ ...উপভোগ করিবে, ইহাতে বাধা দিবার কি আছে? ...দের যখন স্বামীর উপর আধিপত্য প্রবল আছে, ...খন তাঁহারা অন্য সকল কার্য্যেই তাঁহাদের অনুমতি লইয়া করিতে পারেন, যেমন থিয়েটারে যাওয়া, সার্কাস দেখা, এ সকল কাজে ত কেহ বাধা দেন ...। তখন মাসান্তে এই প্রকারে যাহাতে মিলিত হইতে পারেন, সে বিষয়ে যত্নবতী হইতে চেষ্টা করিবেন এবং আপনার সমস্ত বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়দিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া ইহাতে যোগদান করিয়া ইহাতে জীবন সঞ্চার করিবেন।

ক্রমে আমার প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, ...আর দু একটি কথা বলিয়াই ইহা সমাপ্ত করিব। স্ত্রীজাতির উন্নতির পথ দেখান কি প্রকারে সহজ ...য়, তাহা বুঝাইয়া বলা কঠিন। আমি হয়ত নিজেই এ বিষয়ে অজ্ঞ, তবে আজ যে সাড়া পাইয়া এ বিষয়ে বলিতেছি, তাহাতে আমার মনে হয়, আমাদের দেশের মধ্যে ধর্ম্মের বন্ধন বড়ই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মের ভয় ও শাসন বড়ই কমিয়া আসিতেছে, তাই আমাদের দেশের দুরবস্থাও বাড়িতেছে। পূর্ব্বে লোকে জাতিনাশের ভয়ে অনেকটা সংযত হইতে চেষ্টা করিত, এখন সে ভয়টা ইংরাজী শিক্ষার সহিত চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মের শাসন কিছুই বাড়িতেছে না। আমাদের সমাজের মধ্যেও ছেলেদের আদতেই ধর্ম্ম শিক্ষা নাই, যদিও মধ্যে মধ্যে পূজা পাঠ হয় বটে, তবু ছেলেদের ঠিক ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে সকলকারই একটু দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যক। মাতার চরিত্রে সন্তানের জীবন বিকাশ হয়, মাতা ধার্ম্মিকা হইলে সন্তান সেই প্রকার হয়। ইংরাজের ছেলেরা প্রত্যহ শয়নের পূর্ব্বে ক্ষুদ্র প্রার্থনা করিয়া শয়ন করে ও ঈশ্বরকে হৃদয়ের ধন্যবাদ জানায়, রবিবারে গির্জ্জায় যায়। আমাদের দেশে যিনি যে সমাজের মধ্যে আছেন, তিনি যদি আপন আপন মতানুযায়ী কোন নিয়ম করেন যে, ছেলেরা একটি শ্লোকে কবিতায় বা কোন প্রকারে ঈশ্বরকে ডাকিতে পারে, তাঁহাকে চিনিতে শেখে, তাহা হইলে বড়ই ভাল। ছেলেদের বাল্যকাল হইতে এই শিক্ষা হইলে, তাহারা অন্যায় কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে শিখিবে। তদ্ভিন্ন তাহাদের জীবনের পথ সহজ ও সরল হইবে।

ধর্ম্মের পরই প্রীতির ভাব, প্রীতি দ্বারাই ধর্ম্মকে আকর্ষণ করা যায়। প্রীতি দ্বারাই আমাদের সকলকার মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ় হয়। তারপর ইচ্ছা—"সাধু যার ইচ্ছা, ঈশ্বর তার সহায়।" এই বাক্যটির মূল্য যে কত, আমি তাহা বিশেষভাবে জানি। যিনি এই ক্ষুদ্র বাক্যটিকে সহায় করিয়া কোনও সৎকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে ও তিনি জীবনে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেরই জীবন নানা পরীক্ষায় ও শোকের আঘাতে চূর্ণ হইয়াছে। এই শোকের মধ্যে আমরা যদি বাহিরের কাজ তুলিয়া লই, অপরের কাজে জীবন উৎসর্গ করি, তাহা হইলে

শোকসন্তপ্ত প্রাণে কত সান্ত্বনা পাওয়া যায়। সংসারে মনের অবস্থা যখন বড়ই নিরাশজনক হয়, তখন যদি অন্য কোন শোকার্ত্ত জীবনের জন্য কোন একটা কাজ করি, তাহা হইলে জীবনের সার্থকতা হয়। যাঁহাদের সংসারের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যদি অপরের মঙ্গলের জন্য কোন একটা কাজ তুলিয়া লন, তাহা হইলে তাঁহাদের শূন্য জীবন পূর্ণ হইবে। পাশ্চাত্য দেশে রমণীদিগের অনেক কাজ, আমাদের দেশে তাহা নাই। তাঁহাদের মধ্যে সেবার কাজ আদর্শ কাজ। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা—যাঁহাদের সংসারের বন্ধন নাই, যদি প্রতিবাসীদিগের বা আত্মীয়স্বজনদিগের সেবার কাজ গ্রহণ করেন, কত ভাল হয়। এখনো আমাদের সময় যায় নাই, যদি এখন হইতে সকলে কোন কাজ করি, অন্ততঃ একটি প্রতিবাসীরও মঙ্গলার্থে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ কিছুমাত্র ত্যাগ করি, তাহা হইলেই ত খানিকটা কাজ হইল। আমাদের মধ্যেই সকলকার মত এক নহে, কার্য্য করিবার ক্ষমতাও সকলকার একপ্রকার নহে। যে যেদিকে পারিবেন, সেই দিকে কাজ করিতে চেষ্টা করিবেন। আমাদের জীবনে এখন এই সময় আসিয়াছে যে, আমরা মুখে কিছু কথা না বলিয়া কাজ করিয়া দেখাই। প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতায় কিছু হইবে না। কাজ চাই, কাজ দেখাইতে হইবে। মান অভিমান, আত্মমর্য্যাদা, পদ-গৌরব, এ সকল ভুলিয়া অপরের দ্বারে যাইতে হইবে। পরস্পরের যাহাতে মিলন সুদৃঢ় হয়, তাহাই করিতে হইবে। ক্ষুদ্র হইয়াই এই বৃহৎ কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিতে হইবে। নারী হইয়া যাহাতে নারী-জাতির সম্মান বজায় থাকে, তাহাই আমাদের করিতে হইবে। এই জগতে যে কয়দিন আছি, ধর্ম্মপথে থাকিয়া ঈশ্বরের চরণে মতি রাখিয়া সংপথে সৎকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। আমাদের জীবনের কার্য্যেই আমাদের চরিত্রের বিকাশ দেখা যাইবে ও "মরে নারী উড়ে ছাই, তবে তাহার গুণ গাই।" এই কথার সার্থকতা জীবনান্তে প্রকাশ পাইবে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

জালিম মাঠ।

তীরে নৌকা বাঁধিয়া আমরা ভাটার অপেক্ষা করিতেছিলাম, হঠাৎ নদীতে ভাটার টান পড়িল। বৃদ্ধ মাঝি রূপমল্ল "বদর" "বদর" বলিয়া নৌকার বন্ধন রজ্জু খুলিয়া দিল। ভাটার প্রবল আকর্ষণে নিমেষ মধ্যে তরণীখানি মাঝ গঙ্গায় পড়িয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। গঙ্গার দুই পার্শ্বে অনন্ত প্রসারিত শ্যামল প্রান্তর, আর তাহারই মাঝে কোটরাগত পূত সলিলা ভাগীরথী তরঙ্গ ভঙ্গে উন্মাদিনীর ন্যায় নাচিয়া চলিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হইতে আর বেশী দেরী নাই। রাঙা রবি পশ্চিমাকাশের দিগ্‌ বলয়ের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। মেঠো সুরে গোপালগণ গান ধরিয়াছে। দলে দলে গাভীগণ গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। নীল জলের উপর তাহাদের প্রতিবিম্ব পড়িয়া এক মনোহর দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। আমি এতক্ষণ প্রকৃতির এই শোভায় মুগ্ধ ছিলাম। হঠাৎ বন্ধু প্রবরের চীৎকার ধ্বনিতে চমকিয়া উঠিলাম। "বন্ধু, ঐ দেখ সেই জালিম মাঠ।"

"জালিম মাঠ কি, বন্ধু ?"

বন্ধু তখন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "জালিম মাঠের কথা আজও শোন নাই ? তবে শোন :—

"তখন সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার নবাব। তাঁহার অত্যাচারে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্রের পর্ণ কুটীর হইতে ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। রাজা যদি অত্যাচারী হন, তবে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল রাজ্যে অরাজকতা; এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম হইল না। দেশের ... ব্যক্তিগণ ষড়যন্ত্র করিয়া আলীবর্দ্দী খাঁর ...পন্ন হইলেন। চতুর আলীবর্দ্দীও তখন বাঙ্গালার সিংহাসনের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়াছিলেন। ...এই অপ্রত্যাশিত সাহায্যপ্রাপ্তিতে তাঁহার হৃদয়ে ...লিপ্সা দ্বিগুণতর বেগে জ্বলিয়া উঠিল।

১৭৪০ সাল। আজ বঙ্গের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের ...অঙ্ক অভিনীত হইবে। প্রভাত হইতে সরফ...রাজ ও আলীবর্দ্দীর সৈন্য গিরিয়া প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অগণিত সৈন্যের উন্মাদ চীৎকারে, ...মামা ও ভেরীর তূর্য্যনাদে যুদ্ধক্ষেত্র সরগরম হইয়া ...উঠিল। হস্তীর বৃংহিত, অশ্বের হ্রেষারবে সেই ...স্থল কোলাহল দ্বিগুণতর ধ্বনিত হইল। পূর্ব্ব...আকাশের উদয়োন্মুখ প্রাতঃরবির প্রথম রশ্মির সহিত ...একসঙ্গে শত কামান ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ...উঠিল। ইহাই তাহাদের প্রথম প্রভাত বন্দনা। ...তারপর ঐ সঙ্গে সহস্র সহস্র তরবারি যুগপৎ ঝন্ ...করিয়া রক্তপানের জন্য লোলুপ হইয়া উঠিল। ...সূর্য্যের কিরণ তাহাদের তরবারির উপর দিয়া যেন ...খেলা খেলিয়া গেল। তাহার পরই ভাগ্যলক্ষ্মীর ...পরীক্ষা। হিন্দু ও রাজপুতগণ "জয়রণচণ্ডী মায়কী জয়" মুসলমানগণ "দীন, দীন" রবে সেই রণসাগরে ...ঝাঁপাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ যুদ্ধ চলিল। কিন্তু জয় পরাজয়ের ...চিহ্নমাত্র প্রকাশ পাইল না। কখনও আলীবর্দ্দীর ...সঞ্জীবনী বাক্‌শক্তির প্রভাবে, তাঁহার সৈন্যগণ সরফরাজের বাহিনীকে মথিত করিয়া চলিল; আবার কখনও বা সরফরাজের ওজস্বিনী বাক্‌চাতুর্য্যে ও ...অসীম রণনৈপুণ্যে তাঁহার সৈন্যগণ শত্রুগণকে দলিত করিতে লাগিল। হঠাৎ বিজয়লক্ষ্মী সরফরাজের প্রতি বাম হইয়া দাঁড়াইলেন। শত্রু সৈন্যের এক ...যথার্থ লক্ষ্যে সরফরাজ খাঁ হস্তী পৃষ্ঠে ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে হাহাকার উঠিল। ...অপর দিকে আলীবর্দ্দীর সৈন্য হুঙ্কার দিয়া উঠিল। ...সেই আক্রমণের ফলে একে একে সরফরাজ খাঁর প্রভুভক্ত ভৃত্যগণ প্রাণত্যাগ করিল। এবার সরফরাজ খাঁর ...অনুগত প্রাণ বীরেন্দ্র সিংহের পালা। বীরেন্দ্র সিংহ ক্ষত্রিয়। তিনি যখন দেখিলেন, বিপক্ষের সৈন্যের আঘাতে তাঁহার প্রভু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি নবমবর্ষীয় পুত্র জালিমকে সঙ্গে লইয়া একেবারে আলীবর্দ্দীর হস্তীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত ভীম বল্লম সৌরকরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বীরেন্দ্র সিংহ কৃতান্তের ন্যায় আলীবর্দ্দীর প্রতি বল্লম লক্ষ্য করিলেন। আলীবর্দ্দী প্রমাদ গণিলেন। একবার মনে মনে ইহজন্মের মত আল্লার নাম স্মরণ করিলেন। ভীমবেগে বল্লম ছুটিল। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যাঁহার প্রতি সদয়, তাঁহাকে পরাজয় করে কে ? বল্লম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। বিপক্ষের অন্য এক বর্শা আসিয়া বীরেন্দ্র সিংহের বক্ষ বিদীর্ণ করিল। বীরেন্দ্র সিংহ ভূলুণ্ঠিত হইলে, আলীবর্দ্দীর মুখে আঘাতকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তিনি আদেশ করিলেন, "আমি ঐ কাফেরের মুণ্ড চাই।" হুঙ্কার দিয়া সৈন্যগণ সেই মস্তক আনিতে ছুটিল। কিন্তু বীরেন্দ্র সিংহ তখনও তরবারি ঘুরাইয়া সৈন্যের গতিরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর কতক্ষণ ? অতিরিক্ত রক্তপাতে তাঁহার বল ক্রমশঃ হীন হইতে লাগিল। বালক জালিম দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিতেছিল। শৈশব হইতেই বালক জালিম শিখিয়াছিল,—

"পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

বালক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার সম্মুখে তাহার পিতার প্রতি এই অত্যাচার! বালক বুঝিল তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত, তথাপি তিনি শান্তিতে মরিতে পারিতেছেন না। অগণিত শত্রু সেনায় তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। তখনই জালিম হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—

"শোনরে শোনরে ওরে পিতৃ শত্রুগণ
পিতার ও দেব দেহ,
কভু না ছুঁইও কেহ,
ছুঁইলে তোদের কিন্তু নিকট মরণ!
ক্ষত্রিয় শিশুর শুন প্রতিজ্ঞা ভীষণ।"

কিন্তু বালকের কথা কে শুনে? তখন সেই নবমবর্ষীয় জালিম সিংহ ক্ষুদ্র তরবারী হস্তে লইয়া শত্রু সৈন্যের গতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল। সেই ক্ষুদ্র বালকের অস্ত্রচালনা নৈপুণ্যে অনেক শত্রু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। আবার তাহাদের মধ্যে কেহবা বালকের এতাদৃশী শক্তিতে আপনাকে উদ্বোধিত করিয়া দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ করিল। বালকের কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহার সর্ব্বশরীরে অস্ত্র-লেখা। সর্ব্বশরীর রক্তাক্ত। তখনও সে কেবল ভাবিতেছিল,—হায়! এই অকিঞ্চিৎকর দেহ দিয়া যদি সে তাহার পিতাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে? জালিম ডাকিল "পিতা!" পুত্রের এই অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া বীরেন্দ্র সিংহ সেই আসন্নকালেও একবার কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"সাবাস বেটা, সাবাস!" সেই কথায় যেন বালকের বলহীন দেহে এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইল। বালক আবার ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার পরে বালক দেখিল, পিতার দেহে আর প্রাণ নাই। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"পিতা! পিতা!!" কিন্তু আর কোন উত্তর নাই।

তখনও যুদ্ধ চলিতেছিল, হঠাৎ শৃঙ্গরবে দিগন্তর ধ্বনিত হইল। উভয় পক্ষীয় সৈন্য ক্ষণেকের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করিল। তাহারা দেখিল, শান্তির পতাকা উড়িয়াছে। স্বয়ং আলীবর্দ্দী সেই পতাকা নিয়ে দণ্ডায়মান। আলীবর্দ্দী সঙ্কেতে যুদ্ধ থামাইয়া বালকের কাছে আসিয়া বলিলেন—"বালক, আজ হইতে জানিলাম, রাজপুতের এক বিন্দু রক্তও উপেক্ষার জিনিস নহে। তুমি কি চাও?" নির্ভীকচিত্তে অথচ বিনয়বচনে বালক বলিল,—"জাঁহাপনা, আমি অন্য আর কিছু চাই না। কেবল পিতার সৎকার করিতে চাহি। আপনি আদেশ করুন যেন, এই পূতদেহ কোন বিধর্ম্মী স্পর্শ না করে।" আলীবর্দ্দী তৎক্ষণাৎ বালকের সেই আদেশ তাঁহার সৈনিকবৃন্দের মধ্যে প্রচার করিলেন। তখন শত্রু কি মিত্রপক্ষীয় উভয়দলেরই রাজপুতগণ জালিমের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া গঙ্গা তীরে বীরেন্দ্র সিংহের সৎকার করিলেন। চিতার অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া অবশেষে ভস্মমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া নির্ব্বাপিত হইল। জালিমের পূত অশ্রুতে সেই চিতাভস্ম জাহ্নবী সলিলে মিশিয়া গেল।"

বন্ধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গল্প শেষ করিলেন। আমরা তখন জালিম মাঠ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তথাপি সন্ধ্যার ঘনান্ধকারের মধ্যেও জালিমের সেই অদ্ভুত বীরত্ব ও পিতৃ ভক্তির ছবিখানি যেন সজীব চিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।*

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

মা ও ছেলে।

ছেলে—ভাব যদি দিলে মাগো
ভাষা কেন দিলে না?
অনুভূতি দিলে যদি
শব্দ কেন মিলে না?
মা— সুধাময় ভাব দিছি
ভাষা কিগো দিতে আছে,

স্বরগের পূত ভাব
মসিমাখা হয় পাছে!
ভাষা দিছি আঁকিবারে
চিন্তা কল্পনায়,
ভাব শুধু বয়ে যাবে
হিয়ায় হিয়ায়।

* শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত "মুর্শিদাবাদ কাহিনীর" একটি ক্ষুদ্র কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।

সহৃদয় গুজরাত।

তপঃক্লিষ্টা গৌরীর মত গ্রীষ্মের বিশুষ্ক বালুশয্যা-তলবাহিনী বিশীর্ণ নদীগুলির স্ফটিক জলধারা প্রখর রৌদ্রতপ্ত গুজরাতের তৃষিত চিত্তকে যেন শীতল করিতেছে। তীরে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষরাজি ও উপবন সদৃশ প্রান্তর,—কোথাও বহু বৃক্ষলতা সমাচ্ছাদিত কুঞ্জকাননবৎ স্থান, কোথাও কর্ষণকৃত শ্রী শ্যামল শস্য শোভা, কোথাও প্রান্তরের পল্বল তীরে সারস, বক ও শালিকের মেলা, কোথাও অলস প্রান্তর ভরিয়া বিবিধ গুল্ম বৃক্ষাদি, কোথাও বহু বিহগবেণু অভিনন্দিত ছায়া ঢাকা অবগুণ্ঠিতা পল্লীগুলি,- যেন একখানি জীবন্ত ছবি, মুগ্ধ ও মনোরম, প্রকৃতির নীলাকাশ তলে চিত্রিত রহিয়াছে।

গুজরাত নদীর মধ্যে নর্ম্মদা, তাপ্তীই সম্বৎসর প্রচুর সলিল বহন করে। সাবরমতী, রূপায়ন সরস্বতী, ভাদর, মাহী এই সমস্ত নদীগুলিই বর্ষার দু' মাস মাত্র ঘন আবিলা উচ্ছ্বাসময়ী তরঙ্গিণী, অন্য সকল সময়ই শুভ্র সূক্ষ্ম রজতহারের মত বালুকাকণ্ঠ-মালিনী। আম, জাম, রাণ প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ এবং নিম, অশ্বথ, বাবলা প্রভৃতি ছায়াবান বৃক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিদৃষ্ট হয়।

শস্যোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বাজরা, যব ও কার্পাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তদ্ভিন্ন মকাই, ভূট্টা, কলাই, মটর, অরহর ইত্যাদি বিবিধ শস্তই উৎপন্ন হয়।

গুজরাতের অধিকাংশ স্থানই খুব উর্ব্বর; তবে সুরত, ভরোচ ও নড়িয়াদ জেলা সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর বলা যাইতে পারে।

গুজরাতের একটী কৃষি সম্পূর্ণ বর্ষার জলের উপর নির্ভর করিলেও বৎসরের অন্য দুটী কৃষির ফসলই কৃষকেরা একমাত্র কূপ জল সিঞ্চনে উৎপন্ন করিয়া লয়।

গুজরাতের কৃষি ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিলেও কৃষকের অবস্থার তাদৃশ উন্নতি ঘটে নাই। বঙ্গের পাট ও গুজরাতের কার্পাস উভয়ের জন্যই কৃষকেরা সমধিক যত্ন লয়। বঙ্গে পাটের দর কমিয়া গেলে যেমন কৃষকের দুর্দ্দশা,—গুজরাতেও তদ্রূপ তুলার দর হ্রাস হইলে হাহাকার উপস্থিত হয়।

বহু দিন হইতে গুজরাতের কৃষকগণ উত্তমর্ণের করতলগত থাকায় কৃষকের দুর্দ্দশার কিছুতেই পরিমোচন হইতেছে না। গুজরাতে নানা শিল্প বাণিজ্যের স্রোত প্রবাহিত হওয়ায় গুজরাতের ধনী ও মধ্যবিত্তের অবস্থা ক্রমাগতই উন্নতির পথে চলিয়াছে।

গুজরাতের সকল শ্রেণীর লোকই ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত; তন্মধ্যে জৈন শ্রাবক ও বণিক সম্প্রদায়ই প্রভূত ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে।

গুজরাতের সমস্ত নগরীগুলিই আজকাল বহু কলকারখানায় পূর্ণ; চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া এই সমস্ত কলে কাজ করিতেছে। এই সমস্ত কল-কারখানার জন্য লোকের মধ্যে প্রচুর উদ্যম, নানা রকম উৎসাহ ও অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা বিপুল বেগে বাড়িয়া গিয়াছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে সেয়ার বিক্রি, সেয়ার ক্রয়, অর্থ সংগ্রহের নানা রকম ফন্দি, শঠতা ইত্যাদি নানা চেষ্টায় অবিশ্রান্ত হট্টগোল যেন লাগিয়াই আছে। কলের চিমনীর ধূঁয়ায়, লোকের কোলাহলে বড় বড় নগরীগুলির শান্তি যেন একেবারে অন্তর্হিত।

এই সমস্ত হইতে একটু দূরে সরিয়া আসিয়া একটী পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, শান্তি সেখানে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। হয় তো স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে আহারে বসিয়াছে, কিম্বা স্বামী স্ত্রীকে নরসিংহ মেহেতা ও প্রেমানন্দের কবিতা পড়িয়া শুনাইতেছে; কোথাও বা ঘরের ভিতর যে দোলনা আছে তাহাতে বসিয়া সকলে মিলিয়া দোল খাইতেছে। মন্দিরে ভাগবত বা পুরাণ পাঠ চলিতেছে;—শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষ। শারদায় রাত্রে বহুসংখ্যক মহিলা একত্র সম্মিলিত

হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া করতালি দিতে দিতে নাচিয়া গাহিয়া আনন্দ করিতেছে, সেখানেও পুরুষ দর্শকের অভাব নাই।

জাতীয় সাহিত্য দ্বারাই জাতীয় চরিত্র কতকটা উপলব্ধি করা যায়। গুজরাতি সাহিত্য বড় কোমল ও প্রেমভাব পূর্ণ।

দেবতা রণছোড় (শ্রীকৃষ্ণ) মথুরার রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় আসিয়া প্রেম তরঙ্গে ভাসমান। বালগোপাল পূজায়ও প্রেম ও বাৎসল্য রস ছাড়া কিছুই নাই। অন্ধ বিশ্বাসে ইহার মধ্যে নানা প্রকার কলুষতা আসিয়া জুটিয়াছে। জাতীয় সাহিত্য রচয়িতা নরসিংহ মেহেতা ও প্রেমানন্দ ভাট আমাদের দেশের বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

তাহাদের যে কয়েকখানি কাব্য সমুদয়ই সুকোমল প্রেম করুণ রসে আর্দ্র। তারপর জৈন তীর্থঙ্কর গাথা ও উপদেশাবলীও সকরুণ রসে আপ্লুত, কাজেই গুজরাতবাসীর জাতীয় অন্তস্থল যে কোমলতা, সহৃদয়তা, প্রেম, দয়া দাক্ষিণ্য গুণে পূর্ণ হইবে, তাহা সুনিশ্চিত।

গুজরাতবাসীরা খুব অর্থলিপ্সু ও সঞ্চয়ী হইলেও সামাজিক আমোদ উৎসবাদিতে তাহারা বড় মুক্তহস্ত। গুজরাতবাসীর দেশবোধ অপেক্ষা :সমাজবোধই অত্যন্ত প্রবল। তাহারা স্ব স্ব "নাথের" জন্য অর্থ ব্যয়ে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। "নাথ" বলিতে, সমাজের ক্ষুদ্র অংশকে বুঝায়। এক ব্রাহ্মণসমাজ হয় তো ৮২টি "নাথে" বিভক্ত। এক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ লইয়া এক একটী নাথের সৃষ্টি। এই বিভিন্ন নাথের স্বতন্ত্রতা এত বেশী যে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এক নাথের ব্রাহ্মণ অন্য নাথের ব্রাহ্মণের জল অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা একে অন্যের জল পর্য্যন্ত পান করেন না। বিবাহাদি সম্পর্ক তো আদৌ নাই। কিন্তু ইহা দেখা যায় যে, গুজরাতের প্রত্যেক শ্রেণীই স্ব স্ব নাথের উন্নতির জন্য ব্যয়ে মুক্ত হস্ত। এই প্রকারে প্রত্যেক নাথের লোকেরা স্ব স্ব সমাজের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টার ফল খুবই ফলিতেছে; কিন্তু ইহা দ্বারা একটী মহৎ অনিষ্টের ও সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। এই স্বতন্ত্র চেষ্টা জন্য এক নাথের লোকেরা অন্য নাথের প্রতি ভয়ানক বিদ্বেষপরায়ণ; এই দ্বেষ এবং স্বতন্ত্রতা এমন বদ্ধমূল যে, আমি গুজরাতের বহু স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এক নাথের ছোট ছোট বালক বা যুবকেরা, এমন কি স্কুল কলেজের উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রেরা পর্য্যন্ত অ নাথের ছেলেদের সঙ্গে মেশে না, অধিক কি, খেলা মাঠে পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করি চলে। এই জন্যই সমস্ত গুজরাতে দেশব্যাপী কো চিন্তা বা চেষ্টার ভাব খুব ক্ষীণ। আমার বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন বহু চেষ্টার পর একটী সাহিত্য পরিষদ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন।

গুজরাতের প্রত্যেক সহরেই বিভিন্ন নাথের লোক পরস্পরের মধ্যে খুব দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলে এমন কি এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে ত্রুটী করে না। বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোল গুজরাতবাসীর অন্তঃকরণে একটা নূতন বোধ এব চেতনা আনয়নে সমর্থ হইয়াছিল। এই ভাব খুব দৃঢ় ভাবে তাহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইলে গুজরাতে এই সমস্ত অনিষ্ট ভাব বিদূরিত করিতে সমর্থ হইত এবং তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টাগুলিকে সম্মিলিত করিয়া গুজরাতের মহদুপকার সাধনে কার্য্যকারী হইত।

গুজরাতের প্রতি সহরেই দেখিয়াছি. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা নাথের বালকদের জন্য সভাসমিতি রহিয়াছে; কিন্তু একে অন্যের সভাস্থল কখনো প্রদক্ষিণ করে না।

আমি বহুসংখ্যক গুজরাতি বালককে তাহাদের এই ভাবের জন্য প্রশ্ন করিয়া উত্তর পাইয়াছি—এ নাথের লোকেরা বড় খারাপ, তাহাদের সঙ্গে আমাদের কিছু বনে না।

এই প্রকার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারূপ করিয়া পরস্পর মিলিত হইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে।

আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র এক সঙ্গে এক ভাবে

থাকিতাম দেখিয়া গুজরাতের প্রাচীন ও বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ তেন। তাঁহারা বলিতেন, আমাদের দেশে দুই দুইটী লোক দুই দিন একত্র থাকিবার পূর্ব্বেই হয় ঝগড়া বিবাদ হইয়া যায়।

বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলন যে গুজরাতে মঙ্গলের সূত্রপাত করিয়াছিল, বাহিরের লোকে কিছুমাত্র অবগত নহে। এই অত্যল্পকাল আমরা তাহাদের ভাবের ও চিন্তার মধ্যে একটা বিপুল পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়াছিলাম, সত্যই বিস্ময়কর। তখন বিভিন্ন নাথের বালক-মধ্যে পরস্পর সখ্যভাব দেখা গিয়াছিল; কিন্তু কাল মধ্যেই বাংলার স্বদেশী বোম্বে ও গুজরাত-অন্তরে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। কি কুক্ষণে র নির্ম্মল স্বদেশী ভাবের মধ্যে নানা প্রকার ভাব আসিয়া জুটিল, অমনি গুজরাতবাসীর বাঙ্গালীর ভাবের ও মনের যোগ সহসা রুদ্ধ ক্রমশঃই বিলীনতায় স্থান প্রাপ্ত হইল।

দি ক্রমাগত কয়েক বৎসর বাঙ্গালীর ভাব ও র সহিত গুজরাতবাসীর যোগ সংস্থাপিত তবে ইহা সুনিশ্চিত ছিল যে, বহু বিষয়ে দুটী প্রকৃতির জাতি একই জাতীয় জীবনে পরিণত ।

বাঙ্গালী ও গুজরাতি অনেকাংশে এক জাতি অনেকে হয় তো সন্দিহান হইবেন, সেজন্য দ্ধে দু একটী মাত্র কথা বলা উচিত মনে

প্রথমতঃ বাঙ্গলার যে ব্রাহ্মণ সমাজ, তাহার অধি-ই বাঙ্গলার বদান্য মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক কুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান। উচ্চ সম্প্রদায়েরও তদ্রূপ অবস্থা। কাজেই বাংলার এক ষষ্ঠ অধিবাসী কান্যকুব্জের লোক ও চলে।

দ্রূপ গুজরাতেও কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সিংহ শ্রী গুর্জ্জরেশ্বর মূলরাজ কান্যকুব্জও বারাণসী এক শত জন ব্রাহ্মণ আনিয়া গুজরাতে স্থান দান করেন। তাহাদের সন্তানাদি দ্বারাই গুজরাতের লোক সংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ গঠিত। কাজেই গুজরাত এবং বাংলার বহু অধিবাসী এক রক্ত সম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহা সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয়তঃ বাংলার জাতীয় সাহিত্য—বৈষ্ণব যুগের উত্থান কাল যদ্রূপ, গুজরাত সাহিত্যও অবিকল তাহা বলিলেও চলে।

তৃতীয়তঃ বাংলার সামাজিক কতক পদ্ধতি, উৎসব নিয়মাদি ও ব্রত পূজার ধূম কতকাংশে গুজরাতেরই মত বলা যাইতে পারে।

এই কয়েকটী কারণেই গুজরাতবাসী ও বাঙ্গালী-দিগকে এক বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, গুজরাতিরা সামাজিক ব্যয় ইত্যাদিতে বড় মুক্ত হস্ত, তৎসম্বন্ধে এ স্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আমি যখন বরোদায় ছিলাম, তখন আমার বন্ধু রতনলালের বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রশস্ত সরাই রাস্তায় একটা সামাজিক ভোজের আয়োজন ও নিমন্ত্রণ ছিল।

স্ত্রী পুরুষ সকলেই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সেই ধূলিপূর্ণ রাস্তায় মূল্যবান বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া একটী ক্ষুদ্র পত্রের উপর উপবেশন করতঃ সম্মুখস্থ একটী পত্রে ভোজ্য দ্রব্যাদি লইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। লাড়োয়া পুরি, প্রচুর ঘি, ভজি, ডাল, শিখন, রাবড়ী ইত্যাদি নানাপ্রকার খাদ্য। কিয়দ্দূরেই বহুসংখ্যক মেথর মেথরাণী বসিয়া হল্লা করিতেছিল, নিমন্ত্রিতেরা পত্রত্যাগ করিবা মাত্রই কিরূপে উচ্ছিষ্ট পত্রগুলি অধিকার করিবে। সহরের বহু সংখ্যক কুকুর তাহাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি মনুষ্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে আশঙ্কা করিয়াই যেন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া উচ্ছিষ্টগুলি অধিকারের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল।

নিমন্ত্রিতের মধ্যে যাহারা খাদ্য দ্রব্যাদি অর্দ্ধেক ভোজন করিয়া উদরে স্থান অভাবের জন্য আক্ষেপ করিয়া তাহা রাখিয়া দিতেছিল, পরিবেশনকারীরা সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আবশ্যক স্থলে অন্য নিমন্ত্রিতের পাতে দিতেছিল এবং অধিকাংশই পরবর্ত্তী

নিমন্ত্রিতের দলের জন্য ভাণ্ডারের অন্য খাদ্য দ্রব্যের সহিত রাখিয়া দিল।

উচ্ছিষ্ট—কে বলে তুমি অস্পৃশ্য!

যেই নিমন্ত্রিতেরা ভোজন শেষ করিয়া পত্রত্যাগ করিয়া উঠিল, অমনি সেই পত্রগুলি অধিকারের জন্য তাহাদের স্থান ত্যাগের সময় না দিয়াই মেথর মেথরাণী ও কুকুর দলের মধ্যে কাড়াকাড়ি মারামারি লাগিয়া গেল। নিমন্ত্রিতগণ খাইয়া এখন প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিলে হয়, এই ভাবে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

সেই সময় আমার বন্ধু একটী পরিবেশনকারী যুবককে দেখাইয়া বলিলেন,—এই যুবকের পিতা তাহাদের সমাজে বিশেষ ধনশালী ও প্রতিষ্ঠাবান লোক ছিলেন। তিনি এই একমাত্র পুত্রের বিবাহের সময় এমন প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন যে, গুজরাত-বাসী তাহা কখনো চক্ষেও দেখে নাই। গুজরাতের বহু দুর্লভ দ্রব্য তিনি বহু ব্যয় করিয়া নানা স্থান হইতে আনাইয়াছিলেন। এমন কি গুজরাতের দুর্লভ পদ্মের মৃণালের তরকারীও তাহাতে বাদ যায় নাই। বোধ হয় তিনি উহা লক্ষ্ণৌ কি কাশী হইতে আনাইয়াছিলেন। এই এক বিবাহেই তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার সমস্ত বাড়ি ঘর ঋণের দায়ে নিলাম হইয়া গেল। ভিক্ষা বৃত্তিই নবদম্পত্তির এখন এক প্রকার জীবনোপায় হইয়াছে।

গুজরাতবাসীর বিশেষত্ব এই যে, তাহারা বিবাহ ইত্যাদির সময় তাহাদের আয় অপেক্ষা ১০ গুণ বেশী ব্যয় করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায় এবং সেই ভাবে খরচ করিতে যাইয়া অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হয়।

এস্থলে গুজরাত বিবাহের একটী চিত্র অঙ্কিত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আঁমাদের শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেসাইর ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে আমরা সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম।

বিবাহের দিন ভোরে আমাদিগকে কন্যাকর্ত্তার বাড়িতে যাইতে হইল। সেখানে বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা মধ্যস্থলে ঘট ও নারিকেল রাখিয়া তামা তুলসী ও তিল দ্বারা বাক্‌দান কার্য্য সমাধা করিলেন। এই বাক্‌দান কার্য্য অনেক সময় বিবাহের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও সম্পন্ন হয়। অনেক সময় পুত্র কন্যা জন্মের পরই পিতা মাতা দ্বারা বাকদত্তা হয়। বাকদত্ত বরকন্যা ভাবী শ্বশুর শ্বাশুড়ীদিগের নিকট হইতে সর্ব্বদাই উপহারাদি পাইয়া থাকে। বালকের উপনয়নের সময়ও কোন কন্যা উক্ত বালকের সহিত বাকদত্তা হয়।

বাকদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে আমরা বর পক্ষের নিকট হইতে ফুলের তোড়া, আতর পান ও ছুটী করিয়া নারিকেল উপহার পাইলাম। নারিকেল ছুটী কিছুতেই রাখিয়া আসিতে পারিলাম না, কারণ নারিকেল শুভ লক্ষণ, কাজেই সকলকেই ও ছুটী বহন করিয়া বাড়ী পর্য্যন্ত আনিতে হইল।

গোধূলি লগ্নে বর কন্যালয়ে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দোলায় না চড়িয়া অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া আসা এদেশের রীতি। বরের সঙ্গে আসিল একদল পুরুষ বরযাত্রী ও একদল কন্যা বরযাত্রী।

বর শ্বশুরালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র একটী কুলায় ধূপ, দীপ, সিন্দুর, পল্লব সজ্জিত করিয়া কন্যা ও একদল কন্যাযাত্রী বরকে বরণ করিয়া লইতে আসিল। বরের মাথায় ঐ কুলাটি ঠেকাইয়া মহিলারা বরের হাত ধরিয়া পুরুষ ও মহিলা বরযাত্রীদিগকে সমাদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন।

বিবাহের একটী সুন্দর মণ্ডপ সজ্জিত করা হইয়াছিল। চতুষ্কোণে চারিটী কদলীতরু, দুইদিকে সুন্দর রূপে চিত্রিত কতকগুলি হাঁড়ি উপর্য্যোপরি সজ্জিত।

বর ও কন্যা পাশাপাশি বসিল। পুরোহিত ও কন্যাকর্ত্তার মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা যথারীতি সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

তারপর বর পক্ষীয় একদল মহিলা একটী গান করিলেন, তৎপর কন্যাপক্ষীয় একদল মহিলা আর একটী গান করিয়া তাহার উত্তর দিলেন। এই প্রকারে কিছুক্ষণ উভয় পক্ষে সঙ্গীত যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে

বর এবং কন্যাকে অন্য প্রকোষ্ঠে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেও উভয় পক্ষের মহিলারা যাইয়া নানা বাগ-বিতণ্ডা ও গল্পে প্রবৃত্ত হইলেন।

পর দিবস প্রত্যুষে বাড়ীয় দরজার সম্মুখে যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন হইল। সেই যজ্ঞের হব্যান্ন ও পায়েস বর কন্যা একত্র ভোজন করিল। তারপর বর কন্যার মধ্যে একটা সেদেশী মেয়েলী খেলা সমাপ্ত হইল। ইহার পর জামাতা বাবাজী শ্বাশুড়ীর অঞ্চল ধরিয়া বসিলেন এবং যে পর্য্যন্ত না পুরস্কারের মাত্রা

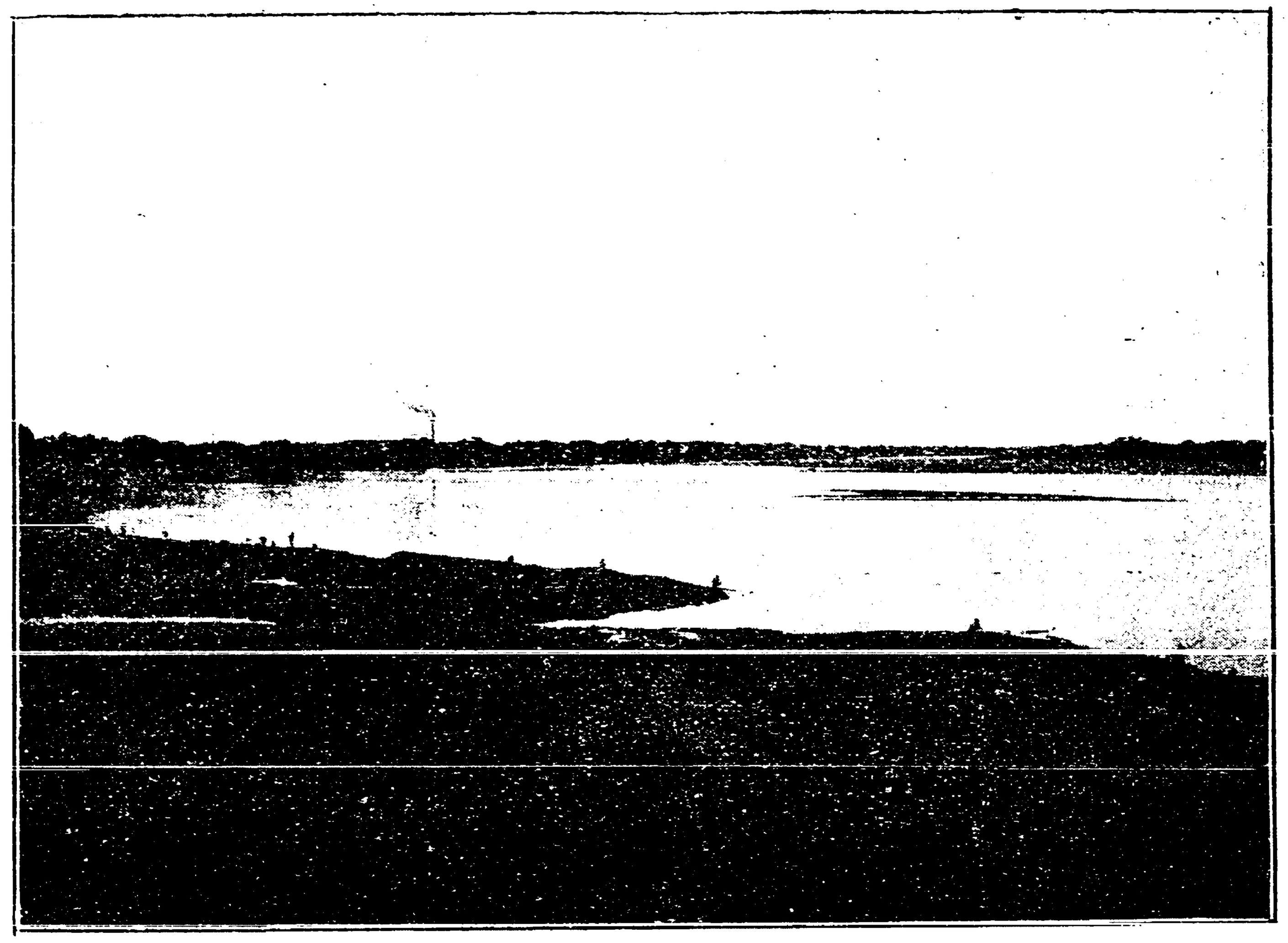

সাবরমতী নদী।

আশানুরূপ প্রাপ্তি ঘটিল সে পর্য্যন্ত অঞ্চল পরিত্যাগ করিলেন না।

এইখানে পুরমহিলা ও আত্মীয় স্বজনেরা বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এই ভাবে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যা এক প্রকার স্বীয় পিতৃগৃহেই বাস করে। তবে সহর ইত্যাদি স্থলে কিম্বা শ্বশুরালয় নিকটবর্ত্তী হইলে কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইয়া কাজকর্ম্মাদি সম্পন্ন করে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পিত্রালয়ে পুনরাগমন করে। প্রায়ই একটী সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত মহিলারা স্থায়ীরূপে স্বামী গৃহে বাস করে না।

গুজরাতি মহিলারা সৌজন্য ও কোমলতার প্রতি-মূর্ত্তি হইলেও স্থান বিশেষে দৃঢ় সঙ্কল্পশীলা ও বীর্য্য-বতী।

গুজরাত ইতিহাসে যে চারিটী সাধ্বী ও বীর্য্যবতী মহিলার জীবন চরিত আছে, তাহাই সমস্ত গুজরাত মহিলার আদর্শস্বরূপ। এই চারিটী মহিলার সতীত্বোজ্জ্বল ছবি সমস্ত গুজরাতীর প্রাণে মহিমা বিকীর্ণ করিতেছে। তাঁহাদের নাম, রাণীক দেবী (১) বিমল দেবী (২) ইচ্ছাকুমারী (৩) ও যশমাসতী। এই চারিটী মহিলাই সতীত্ব রক্ষার জন্য অদ্ভুত সাহস, বীর্য্য একাগ্রতার পরিচয় দিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

গুজরাতি নারীর অন্তঃকরণ কিরূপ শুদ্ধ স্বচ্ছতা,

(১) রাণীক দেবীর ইতিহাস দ্বিতীয় বর্ষের সুপ্রভাতের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।
(২) বিমল দেবীর ইতিহাস ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।
(৩) ইচ্ছাকুমারীর উপাখ্যান গত মাসের সুপ্রভাতে প্রকাশিত হইয়াছে। (ফাল্গুন, ১৩২০)

সৌজন্য ও সহৃদয়তায় পূর্ণ নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

বাংলা দেশে বা ভারতের বহু স্থানে গৃহাগত অতিথি কিম্বা একটু দূরসম্পর্কান্বিত আত্মীয়স্বজন কোন ভদ্রলোকের বাড়ি কিম্বা অন্য আত্মীয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে একমাত্র বাড়ীর কর্ত্তার শিষ্টাচার লাভ করিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তাহাকে অবস্থান করিতে হয়। গৃহকর্ত্তার অবর্ত্তমানে তাহাকে কি প্রকার দূরবস্থায় পতিত হইতে হয় তাহা অনেকেই জানেন। কারণ মহিলারা স্বভাবতঃই সামাজিক শিষ্টাচার হইতে দূরে অবস্থান করেন; কিন্তু গুজরাতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ। গুজরাতে কাহারো গৃহে উপস্থিত হইলে কোন প্রকার অসুবিধা বা কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। গৃহকর্ত্তার স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলেই অতিথির প্রতি স্নেহ যত্নের জন্য সর্ব্বদা উন্মুখ থাকেন।

প্রথম প্রথম অনেক সময় আমি বন্ধুকে খুঁজিতে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে না পাইয়া তৎক্ষণাৎই চলিয়া আসিয়াছি, দু' একবার এইরূপ হইবার পর তৃতীয়বার যখন বন্ধুর বর্ত্তমানে তাঁহার বাড়ীতে অনেকক্ষণ অবস্থান করিয়াছি, তখন পুর-মহিলারা হয়তো আমার পুর্ব্ব ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া বন্ধুকে বলিয়াছেন, "তুমি থাকিলেই তিনি এ বাড়ীটি আপনার মনে করেন, কিন্তু তুমি না থাকিলেই তিনি আর একরকম মনে করেন; তুমি ছাড়াও যে এ বাড়ীতে আমরা তাঁহার ভাই ভগ্নী আছি, সে কথা তিনি মনেই করেন না।"

এই ভাবে আমাকে প্রথম কয়েকবার কিরূপ লজ্জিত হইতে হইয়াছিল, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

স্ত্রী ভগ্নীদিগকে সর্ব্বদা পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া বাঙ্গালী সমাজ চরিত্রের মর্য্যাদা ও দৃঢ়তা এতটা ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন যে, অনেক সময়ই তাঁহারা চরিত্রবতী মহিলাদের স্বাধীন ভাব ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

আমি যখন বরোদায় ছিলাম, তখন আমার বন্ধুটী তাঁহার কোন আত্মীয়ার শঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা শুনিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি আমার বাসায় আসিয়া তাঁহার গমনের কথা ও অন্ততঃ তিন দিন অনুপস্থিতির সম্ভাবনা জানাইয়া গেলেন।

এই তিন দিন আমি কয়েকটি স্থান পরিদর্শনে ব্যস্ত থাকায় বন্ধু গৃহে যাইবার আর অবসর পাই নাই। চতুর্থ দিন বন্ধু গৃহে গিয়া দেখিলাম, বন্ধু আত্মীয়াকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

আমাকে দেখিয়াই বন্ধু পত্নী হাসিয়া তাঁহার স্বামীকে বলিলেন,—দেখ, তোমার বন্ধুটীর কাণ্ড—এই তিন দিন কিন্তু দু' চার মিনিটের জন্যও আমার সংবাদ নিতে আসেন নাই। তুমি আসিয়াছ, কাজেই আজ আসিয়াছেন।

বন্ধু আমাকে বলিলেন—কি তুমি আস নাই? আমি যে তোমাকে বলে গেলুম, তিন চার দিন আমার দেরী হবে! আমি মনে করেছিলুম, দিনে ২।৪ বার এসেও সংবাদ নিতে পারবে; সেই জন্য আমি অন্য লোক রেখে যাই নাই।

আমি সবিনয়ে মার্জ্জনা চাহিয়া বলিলাম—'বেন' যে একলাই থাকবে, তা কি আমি জানতুম।

ইহা হইতেও এদেশী লোকের স্বচ্ছ অকপট হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার আমরা সারা দিনের ভোজ্যভার, রুটী ইত্যাদি পকেটে পুরিয়া পল্লী ভ্রমণে বাহির হই। দূরবর্ত্তী একটা পুরাতন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করাই সেই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। শেষ রাত্রিতে যাত্রা করিয়া ১০টার পূর্ব্বেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। একদিকে ঘন বাবলা গাছের ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তর, অন্য দিকে কৃষি প্রান্তর। প্রান্তরের সমতল ভূমি হইতে কয়েক ফিট উচ্চ একটী প্রকাণ্ড স্থান জুড়িয়া বহুসংখ্যক হর্ম্মাবলী; হর্ম্মাবলীর মধ্যস্থ পাষাণ সোপানাবলী পরিবেষ্টিত একটী পুষ্করিণী। স্থানটীর নাম সারখেজ; গুজরাতের মুসলমান সম্রাট মহম্মদ বেগেড়া এই প্রমোদ নিবাসটী নির্ম্মাণ করান। পুষ্করিণীর এক দিকে একটী প্রকাণ্ড রোজা। মহম্মদ বেগেড়া পুরমহিলা সহকারে প্রতি শুক্রবার

রাজধানী আহমেদাবাদ হইতে এই স্থানে আগমন করিতেন।

স্থানটী খুব সুন্দর ও ভাবোদ্দীপক। আমরা সারাদিন সেই স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি সমুদয় দেখিতে লাগিলাম।

অপরাহ্নে আমরা পল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কারণ ইহার পূর্ব্ববারে আমার বন্ধুদের আগমন সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় পল্লীর আবালবৃদ্ধ নরনারী তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিল। পল্লীতে উপস্থিত হইবামাত্র সকলে আমাদিগকে সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিল, সকল গৃহস্থই আমাদিগকে তাহাদের গৃহে লইয়া যাইয়া কৃতার্থ হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিল এবং সেদিনকার মত সেখানে থাকিয়া যাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। আমরা আর একবার আসিয়া অবস্থান করিব স্বীকার করিয়া তবে ফিরিতে পারিয়াছিলাম।

আমি যখন একাকী ব্রোচ বা ভরোচে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেখানেও বহুসংখ্যক গুজরাতি আমাকে আদর আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। নগরীর যাহারা

আহ্‌মেদাবাদের দৃশ্য।

আমার আগমন সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল, সকলেই তাহাদের গৃহে আতিথ্য স্বীকারের জন্য যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিল। গুজরাতি সমাজের রীতি নীতি পারিবারিক সুখ দুঃখ প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করা সম্বন্ধে আমার প্রথমাবধিই যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তদ্দ্বারা আমি তাঁহাদের প্রকৃত চরিত্রও কতকটা অবগত হইতে পারিয়াছিলাম।

আমার বাসস্থানের সন্নিকটবর্ত্তী একটী যুবক ভরোচের বিশিষ্ট গাইয়ে বাজিয়েদের একত্র করিয়া একদিন পার্টি দিয়াছিলেন। তিনি একলাই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত গুজরাতি সঙ্গীত গল্প গুজবাদি চলিয়াছিল। নর্ম্মদা নদীতটে আমার মত নিতান্ত স্বল্পভাষী ও তাহাদের উৎফুল্ল সংসর্গে মুখর হইয়া উঠিত।

সুরত পরিভ্রমণে যাইয়া তথায় এক বন্ধু গৃহে উপস্থিত হই। বন্ধু এবং বন্ধু পত্নী দুইজনই বিশিষ্ট গুজরাতি লেখক। বন্ধুটী একজন প্রতিষ্ঠাবান ডাক্তার, কাজেই তাঁহার অবসর কম। বন্ধু পত্নী একলাই সমস্ত লিখিবার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া একটী

সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। এই পত্রিকাটী গুজরাতি ভাষার মধ্যে উৎকৃষ্ট ও শক্তিশালী লেথার জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

আহ্মেদাবাদের তিনটি প্রবেশ তোরণ।

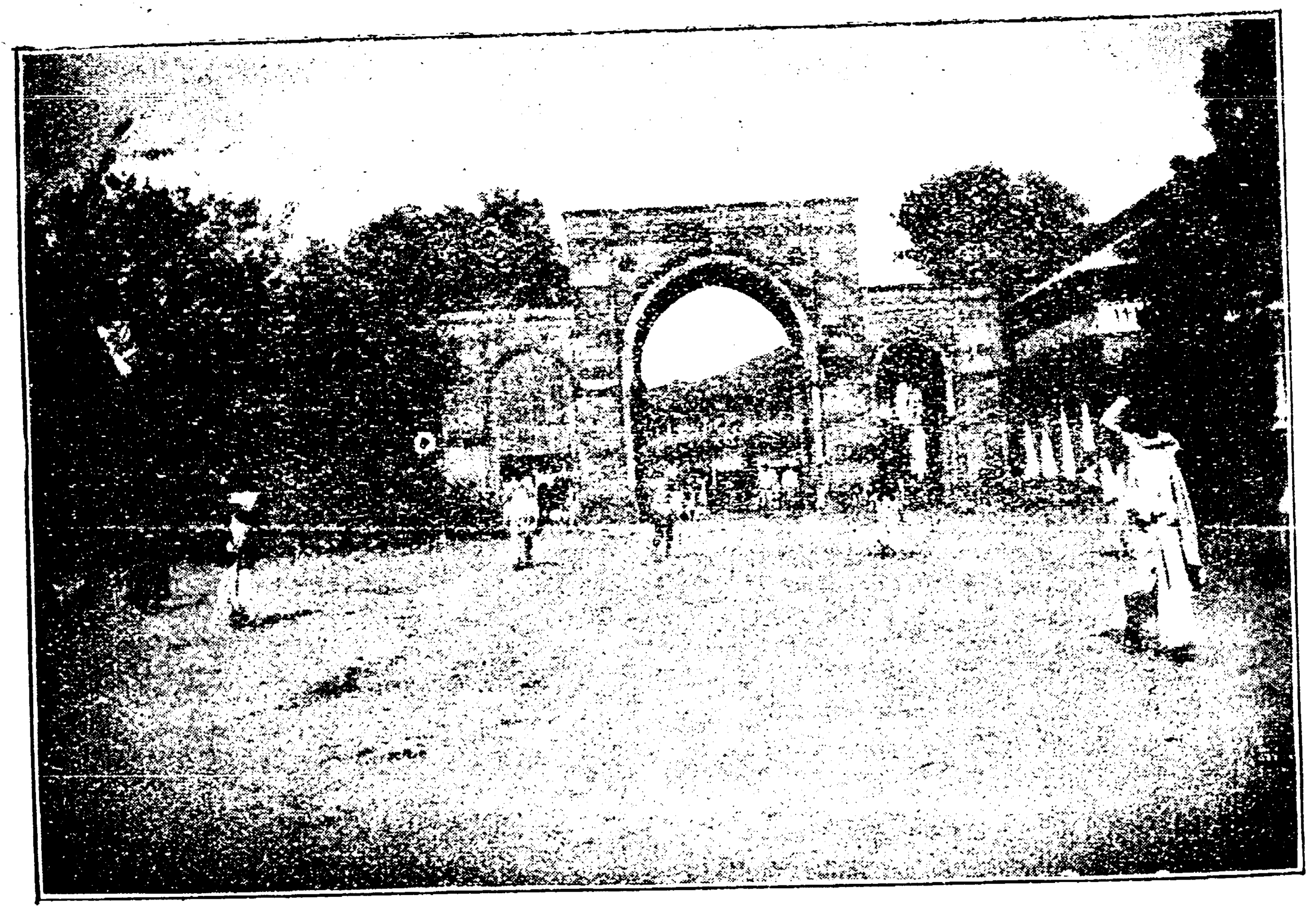

পাচকুয়া আহ্মেদাবাদের প্রবেশ দ্বার।

সেই পত্রিকার নাম ছিল শক্তি, সম্পাদকের নাম, এম, এম, বায়জী। এই পত্রিকা পরিচালকের নিকট গবর্ণমেণ্ট কয়েক সহস্র মুদ্রা জামিন প্রার্থনা করায় পত্রিকাটী বন্ধ হইয়া যায়।

যদিও আমি বন্ধু পত্নীর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ও বিদেশী ছিলাম, কিন্তু এই মনস্বিনী মহিলা আমার নিকট কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করিতেন

না। তাঁহাদের প্রাণপূর্ণ স্নেহ ও যত্ন আমি কথনো বিস্মৃত হইতে পারিব না।

গুজরাতি লোকের অকপট ও সরল হৃদয়ের জন্য অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের নিবিড় বন্ধন অনুভব করা যায়।

আমি আমার পরম বন্ধু বরেণ্য ও বিথ্যাত সাহিত্যসেবী পণ্ডিত শিবপ্রসাদ দলপত রামের সঙ্গে যথন জুনাগড় পরিভ্রমণে গিয়াছিলাম, তথায় অত্যল্প কাল মধ্যেই তদীয় বন্ধু উমিয়াশঙ্করের সহিত নিবিড় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলাম।

ভাদ্রা দুর্গ।
(আহ্মেদাবাদ)

রাজকোটে গুজরাতের সুপ্রসিদ্ধ "ললিত" কবির সহিত যথন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, আপনি গুজরাতি ও কাঠিওয়ারী-দের চরিত্রের বিশেষত্ব কি লক্ষ্য করিলেন?

আমি বলিলাম,—সব চেয়ে বেশী সৌজন্যতা ও সরলতা।

"ললিত" কবি বলিলেন,—সত্যই আপনি অনুভব করিয়াছেন। আমাদের জীবনের বহু বৎসরের অভিজ্ঞতাও এই কথাই বলিতেছে। বস্তুতঃ এই দুটী গুণেই তাহারা প্রকৃত গুণী, অন্য গুণ কিছুমাত্র নাই বলিলেও হয়।

গুজরাতি লেথকগণের প্রায় সকলেই কাব্য প্রবন্ধাদি লিথিবার সময় প্রকৃত নাম গোপন করিয়া স্বীয় নির্ব্বাচিত একটী নাম প্রদান করেন। সেইজন্য কেহ ললিত, কেহ সাগর কেহ বা অন্য নামে পরিচিত।

আমার পরম বন্ধু পণ্ডিত শিবপ্রসাদই বাঙ্গালীদের সহিত গুজরাতির মিলনের প্রকৃত পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী মহাপুরুষগণের জীবন-চরিত লিথিয়া গুজরাতি পাঠকবর্গকে আপনার বলিয়া উপহার দিতেছেন। তাঁহার লিথিত "মহাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর", "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" ও "দেবী অঘোর কামিনী" এই তিনথানি গ্রন্থ গুজরাতের কি যে মহা উপকার সাধন করিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তিনি আরও কয়েকটী বাঙ্গালী মহাপুরুষের জীবনচরিত লিথনে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এইভাবে সহজেই বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তা গুজরাতের আদরের ও

প্রাণের জিনিস হইয়া উঠিবে। তখন সত্যই গুজরাতি বাঙ্গালীকে আপনার বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করিবে না।

শিবপ্রসাদের এই দান ভবিষ্যৎ গুজরাতি ও বাঙ্গালী সমাজ কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে।

পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত ব্যক্তিগত ভাবই গুজরাতবাসীর সাধারণ চরিত্রে পর্য্যবসিত হইতে পারে; কারণ গুজরাতবাসীর সামাজিক ও পারিবারিক চরিত্রে সর্ব্বত্রই এই ভাব প্রচুর পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহাদের স্বাভাবিক শিষ্টাচার, সৌজন্যতা ও সহৃদয়তা তাঁহাদের বহুকাল সঞ্চিত পৈতৃক সম্পত্তি। পাশ্চাত্য আলোক হইতে দূরে অবস্থিত নিতান্ত গণ্ড পল্লীগ্রামেও তাহাদের স্বাভাবিক শিষ্টাচার ও সৌজন্যের পরিচয় প্রচুর পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান গুজরাতবাসীগণ সতর্ক বাণিজ্য-প্রবণ বুদ্ধিবশতঃই মিতব্যয়ীতার প্রখর গণ্ডী অতিক্রম করেন না, কিন্তু সামাজিক উৎসবাদিতে তাঁহারা বড় মুক্তহস্ত। তাঁহাদের এই ভাব দেশহিতের দিকে ধাবিত হইলে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইবে, আশা করা যায়।

গুজরাতিরা যেমন সরল ও সৌজন্যসম্পন্ন এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়ই জীবন সংগ্রামে পরস্পর সাহায্যকারী, উন্নত ভাব এবং শিক্ষা তাহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে সহজেই তাঁহারা উন্নত স্থান অধিকারে সমর্থ হইবেন।

এইখানেই আমার সহৃদয় গুজরাত চিত্রের উপসংহার করিলাম। (১)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

"স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যা"র আলোচনা।

গত পৌষ সংখ্যার সুপ্রভাতে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী লিখিত "স্ত্রী-শিক্ষা সমস্যা "প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথার আলোচনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। শ্রদ্ধেয়া লেখিকার প্রবন্ধটির লেখার ভাবটি আমার কাছে অতি সুন্দর বলিয়াই মনে হইয়াছে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া তিনি তাহার দোষ গুণ বিচারের জন্য উৎসুক হন নাই, কিন্তু সমাজের এই অবস্থাতে কন্যার শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহারই আলোচনা করিয়াছেন; ইহাতেও তাঁহার সুক্ষ্মদর্শিতাই প্রকাশ পাইয়াছে। বাস্তবিকই আমাদের মত ক্ষুদ্র নগণ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে কোনটা শ্রেয়ঃ, কোন পথ অবলম্বনীয় তাহার বিচার করিতে যাওয়া বাতুলতা বলিলেই চলে। আর তাহা কতকটা নিষ্প্রয়োজনীয়ও বটে। কারণ আমরা যেটা শ্রেয়ঃ বলিব সেইটাই যে সমাজের সকলে মানিয়া লইবেন তাহা নহে। সমাজ আপনাপনিই আপন অবলম্বনীয় শ্রেষ্ঠ পন্থা বাছিয়া লইবেন। জলের মধ্যে যখন আবর্ত্ত উপস্থিত হয় তখন তাহার সঙ্গে ধূলা, মাটি, অনেক মিশিয়া থাকে, আলোড়নটা যেমন ক্রমে থামিয়া যায়, জলও তেমনি ক্রমে ধূলা মাটি নিচে ফেলিয়া, খড়কুটা উপরে ভাসাইয়া নিজের নির্ম্মলভাব ধারণ করে কিন্তু ঐ ধূলা মাটির মধ্যে যদি জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবার মত কিছু থাকে (যেমন চিনি) তবে সেটা আলোড়নের অভাব হইলেও জলের সঙ্গেই মিশিয়া থাকিয়া তাহার মিষ্টত্ব সম্পাদন করে।

আমাদের সমাজেও ধীরে ধীরে যুগধর্ম্মানুযায়ী অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; প্রাকৃতিক নিয়মবশে আরও হইবে। তবে নিজের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রস্তাব করিবার অথবা পরামর্শ দিবার অধিকার সকলেরই আছে কিন্তু সেই পরামর্শটা মিষ্টভাবে

(১) চিত্রগুলির জন্য আমার প্রবাস সুহৃদ শ্রীযুক্ত নিখিলকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী।

হওয়া উচিত। চিনির উপর কুইনাইনের প্রলেপ দিয়া কাহাকেও খাইতে দিলে সহজে সে তাহা গ্রহণ করিতে চাহিবে না কিন্তু কুইনাইন চিনির প্রলেপ মণ্ডিত করিয়া আমরা অহরহই খাইতেছি ও অন্যকেও দিতেছি!

শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবীও তাঁহার এই প্রবন্ধটি অতি মিষ্টভাবে জিজ্ঞাসুর ন্যায় অতি বিনয়ের সহিতই লিখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অন্তর্নিহিত মাতৃভাবের পরিচয়ই পরিস্ফুট। কন্যার ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তাজনিত উৎকণ্ঠায় তাঁহার মাতৃহৃদয় আতঙ্কিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারাই তিনি এই প্রস্তাব করিতে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন।

সমাজের এইরূপ বিশৃঙ্খলার মধ্যেই ত কন্যাগণকে জীবন যাপন করিতে হইবে। যতদিন সমাজের একটা শৃঙ্খলা না হয় তত দিন তো কন্যাগণকে কুমারী অবস্থায় আমরা ঘরে রাখিতে পারিব না; তাহাদিগকে পাত্রস্থা করিতেই হইবে। * সুতরাং তাহাদিগকে কিভাবে শিক্ষিত করার দরকার, কি ভাবে তাহাদের চরিত্র গঠন করা প্রয়োজন, শিক্ষা দীক্ষা, চাল চলন কি ভাবে হওয়া উচিত সে একটা সমস্যা বই কি? মাননীয়া লেখিকা দুই পক্ষের দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সমস্যাটিকে সুন্দর পরিস্ফুট করিয়া সকলের সমক্ষে ধরিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত যে আজকাল বাস্তব জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক পিতা মাতাকেই যে কন্যার বিবাহিত জীবনের এইরূপ অশান্তি ও কষ্টের জন্য বেদনা পাইতে হয় তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

সুতরাং এই সমস্যাটির সমাধান যে আবশ্যকীয় তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। মাননীয়া লেখিকা এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মত সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সমন্ধে আমার নিজ ধারণানুযায়ী যে দুই চারিটি বক্তব্য আছে তাহা সসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেছি।

সুপ্রভাত স্তম্ভে এই আলোচনাতে আর আর পাঠক পাঠিকগণও ইহার দোষগুণ বিচার করিতে পারিবেন সেটাও এ প্রবন্ধ প্রকাশের অন্যতর কারণ।

শ্রদ্ধেয়া লেখিকা বলিতেছেন যে, মেয়েদিগকে বর্ত্তমানকালে প্রাচীন হিন্দুভাবে শিক্ষিতা করিয়া শেষে বিলাতীভাবে শিক্ষিত পাত্রে বিবাহ দিলেও যেমন কন্যার ভাগ্যে অসুবিধা কষ্ট ও অশান্তি ঘটা অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ প্রতীচ্য ভাবে শিক্ষিতা করিয়া আচার নিরত ঘরে বিবাহ দিলেও তাহার সেইরূপই কষ্ট ও অশান্তির কারণ হয়। সুতরাং কন্যাদিগকে দুই ভাবেই শিক্ষিতা করার প্রয়োজন; তাহা হইলে সে যে ভাববহুল ঘরেই পড়ুক নিজেকে সামলাইয়া চলিতে পারিবে। কিন্তু এই দ্বিভাবে তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে বেশী সময়ের আবশ্যক। অতএব বাল্য বিবাহ রহিত করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কারণ কন্যাদিগকে বাল্যে বিবাহিতা না করিলে তাহাদিগকে উভয়ভাবে শিক্ষিতা করিয়া তুলিবার অবসর পাওয়া যাইবে।

এই তাঁহার প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার। এক্ষণে আমার বক্তব্য কথা কয়টি বলিতেছি। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহোদয়ার পরিচয় কিছুই অবগত নহি, সুতরাং তিনি নিজে প্রাচীন হিন্দু, নব্য হিন্দু, বিলাত ফেরৎ হিন্দু অথবা ব্রাহ্ম তাহাও আমি অবগত নহি। তাঁহার প্রবন্ধটি এরূপ ভাবে লিখিত যে তাহা হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তিনি যেন সাধারণভাবেই ঐ সমস্যার অবতারণা এবং তাঁহার নিজ বিবেচনানুযায়ী মীমাংসা করিয়াছেন।

ইহাতে এই সমস্যা সমাধানে আমার কিছু খট্‌কা বোধ হইতেছে; এটা একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক আমিও আমার বিশ্বাস ও ধারণানুযায়ী স্বীয় ক্ষুদ্র মত প্রকাশ করিয়া যাইতেছি। ইহার ভিতরে যদি কোন অসংলগ্নতা থাকে তবে সুধিগণ তাহা প্রদর্শন করিবেন আশা করি।

* এই 'করিতেই হইবে" হইতে সমাজে পণপ্রথার উৎপত্তি হইয়াছে। পুরুষের বিবাহ ইচ্ছাধীন কিন্তু নারীর তাহা নহে, নারীকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিবাহ করিতেই হইবে।. সুতরাং পুরুষের কৃপাপ্রার্থী হইয়া, তাহাকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। সুঃ সঃ

মোটামুটি ভাবে এই সমস্যাটা যাঁহারা কোনও বিশেষ সম্প্রদায় ভুক্ত নহেন তাঁহাদের নিকটই বেশী জটিল বলিয়া বোধ হয় এবং কার্য্যতঃ ও তাঁহাদের কন্যাগণকেই এই সমস্যাসম্ভূত অশান্তিও কষ্ট বেশী ভাবে ভোগ করিতে হয়।

কারণ যাঁহারা প্রাচীন হিন্দু রীতি নীতির পক্ষপাতী, তাঁহারা কথনই স্বপ্নেও বিলাত ফেরৎ অথবা অথবা সম্পূর্ণ হিন্দু আচার বিগর্হিত পাত্রে কন্যা সম্প্রদানের কল্পনা করিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাদের কন্যাগণকে টেবিলে বসিয়া খাওয়া, জুতা পায় দিয়া বেড়ান ইত্যাদি প্রতীচ্য রীতিতে গঠিত করিবার কোন প্রয়োজনই উপলব্ধ হয় না।

যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভাবেরই কতক কতক সম্মিলন আছে বটে কিন্তু তাঁহাদের সে সম্বন্ধে অনেকটা পরিস্কার জ্ঞান থাকাতে স্বীয় সমাজোপযোগী ভাবে ও রীতি পদ্ধতি অনুসারেই তাঁহারা কন্যাগণকে গঠিত করিতে পারেন। আর তাঁহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহের উপসর্গ নাই। সুতরাং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে উভয় ভাবেই কন্যাগণকে শিক্ষিতা করিয়া তুলিতে পারেন। বাস্তব জগতেও দেখা যায় যে তাঁহারা অনেকেই কতকটা সেইরূপই করিয়া থাকেন।

বিলাত ফেরৎদিগের মধ্যেও যাঁহারা প্রকাশ্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহাদেরও এজন্য কোন অসুবিধা নাই।

আবার যাঁহারা বিলাত ফেরৎ ‘হিন্দু’ তাঁহাদেরও এ সম্বন্ধে যথেষ্টই স্বাধীনতা আছে সুতরাং তাঁহাদের নিকটও এ সমস্যার জটিলতা প্রতিভাত হয় না। এখন গোল বাধিতেছে তথা কথিত ‘নব্য হিন্দু’ সম্প্রদায় লইয়া। এই নব্য হিন্দু সম্প্রদায়টা যে কি তাহার একটা সংজ্ঞা স্থির করাই একটা বিষম সমস্যা।

যাহা হউক মাননীয়া লেখিকা মহোদয়া যখন বাল্যবিবাহ রহিত করিবার প্রস্তাবকেই স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মুখ্য কল্পরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন তখন হিন্দু সম্প্রদায়ই যে তাঁহার লক্ষ্যস্থল তাঁহাদের নিকটই যে তাঁহার এ আবেদন তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রাচীন হিন্দু আচার নিরত গৃহস্থের যে এ সমস্যা সমাধানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবার আবশ্যকতা অতি-কম তাহা আমি পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি।

তবে একটা কথা হইতে পারে যে, ঐরূপ হিন্দুর ঘরের মেয়ের বিবাহ হইয়া যাইবার পরেও তো তাহার স্বামী বিলাত যাইতে পারেন অথবা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়া যাইতে পারেন; তখন কন্যার তো অসুবিধা হইবে! ভবিতব্যের কথা কেহ বলিতে পারে না, সুতরাং তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অষ্টম বর্ষীয়া গৌরী কন্যা ইংরাজী শিক্ষানিরত পঞ্চদশ বর্ষীয় কিশোরের সহিত বিবাহিতা হইবার পরে তাহার স্বামী হয় ত বিংশ বর্ষে বিলাতে গমন করিতে পারেন, অথবা ইংরাজী হোটেলে খানা খাইতে পারেন, এটা অসম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ স্থলে সে কন্যার স্বামী ছন্দানুবর্ত্তন করিতে অভ্যস্তা হইবার যথেষ্ট সময় থাকে। স্বামী বিলাত গমন করিলে স্ত্রীও পাশ্চাত্য রীতি নীতির শিক্ষা অভ্যাস করিতে পারেন। অবশ্য হিন্দু আচারের শ্বশুরের ঘরে কি পিতার ঘরে নিতান্ত বিসদৃশ অহিন্দু ব্যবহারের শিক্ষা পাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন অথবা অসম্ভব হইতে পারে, এ কথা স্বীকার করি। তবে তিনি মনে মনেও সে ক্ষেত্রে ঐরূপ ভাবের আলোচনা করিলে মনের গতি ও প্রবৃত্তিটা সেদিকে নিশ্চয়ই ফিরাইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

এইরূপ পরিবারে এরূপ ঘটনা তত বেশী হয় না, সুতরাং লেখিকার প্রস্তাবিত সাধারণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তথায় বড় নাই।

যাঁহারা বিলাত প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্য সমাজ বা অন্য কোন সমাজের অধীন হন, তাঁহারা তত্তৎ সমাজানুযায়ী রীতি পদ্ধতি অনুসারেই নিজ নিজ আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করেন, তাঁহাদের কন্যারাও তদনুরূপ শিক্ষাতেই শিক্ষিতা হন। তাঁহাদের সম্বন্ধে এরূপ প্রশ্ন বা সমস্যা উঠিতেই পারে না।

সাধারণ ভাবে বিচার করিতে গেলে দেখা যায় যে, পিতামাতার নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষাই কন্যাগণও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে পিতা গরীব ভদ্রলোক, তিনি সাধারণতঃ নিত্য প্রয়োজনীয় গৃহ-

স্থালীর কাজই আগে কন্যাগণকে শিখাইবার ব্যবস্থা করেন, আর অবস্থানুসারে কন্যাগণকে বাধ্য হইয়াও ঘর দোর ঝাড়া, বাসন মাজা, পান সাজা, বিছানা করা, শিশু পালন, কাঁথা, বালিশের খোল সেলাই করা, রান্নাবান্নার কাজ করা ইত্যাদি সব কাজ করিতে হয়। ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যবস্থাও তদনুসারেই হয়। যে পিতামাতা কোন দিনই পূজা পাঠের কাছ দিয়াও যান না, তাঁহাদের কন্যাগণ পূজার সাজ করা কোথা হইতে শিখিবে? মাননীয়া লেখিকা যে দুই প্রকার বিরুদ্ধ ভাবের শিক্ষাই কন্যাগণকে দিতে চাহেন, সেটা কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব বলিয়া আমি মনে করি না।

যাঁহারা সমাজ ছাড়া, সেইরূপ জনকতক লোক হয় ত নিজ নিজ বাড়ীতে তাহা কতকটা চালাইতে পারেন, কিন্তু ব্যাপক ভাবে তাহা চলা কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দু সমাজের মধ্যে যাঁহারা উচ্চ বেতনভোগী কর্ম্মচারী অথবা রাজা জমিদার সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহাদের কন্যাগণকে দরিদ্রের ঘরে বা মধ্যবিত্ত অবস্থার ঘরে পড়িলে সময় সময় অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু মাতা এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিলে তাহার অনেকটা নিরাকরণ হইতে পারে।

আমি একজন রাজা উপাধিধারী ব্যক্তির কন্যার বিষয় অবগত আছি। তিনি কুলের অনুরোধে মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহস্থ ঘরে বিবাহিতা হন, কিন্তু নিজগুণে শ্বশুর ঘরের দাসীর করণীয় কার্য্যেও পটুতা প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রশংসাভাগিণী হইয়াছেন। কারণ তাঁহার মাতৃদেবী রাণী হইয়াও কন্যার ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বাবু করিয়া রাখেন নাই। গৃহস্থালীর কাজেও তাঁহাকে পরিচিতা করিয়াছিলেন।

আমার একটি স্নেহ পাত্রী মধ্যবর্ত্তী অবস্থার পরম হিন্দুর মেয়ে। ১১।১২ বৎসরে নব্য ভাবাপন্ন ধনী পরিবারে বিবাহিতা হয়; সেখানে তাহাকে জুতাও পরিতে হয়, নব্য চাল চলনেও চলিতে হয়, কিন্তু তাহাতে সে বিশেষ অসুবিধা বোধ করে নাই, অথচ যখন পিত্রালয়ে আসিয়াছে, তখন পিত্রালয়ের ধরণেই চলিয়াছে!

আমার বিবেচনায় যিনি যে ভাবে চলার পক্ষপাতী কন্যাকেও সেই ভাবেই শিক্ষিত করিবেন আর তাহার বিবাহের সময়ও সেইরূপ ভাবের ঘর ও বরই অনুসন্ধান করিবেন। বিবাহে তুল্যশীল হওয়াটাই প্রশস্ত।

আমার কোন পরিচিত ব্যক্তি ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন, পূজার্চ্চনা প্রভৃতির উপর বিশেষ বিদ্বেষ ছিল, দেবদেবীর মূর্ত্তিকে নানারূপ গালি দিতেন এবং ঠাট্টা তামাসাও করিতেন; আহারাদিতেও অনাচার ছিল। তাঁর একটি কন্যা ছিল, সেও পিতার শিক্ষায় ঐ ভাবেই শিক্ষিতা হয়। কন্যা যখন বিবাহযোগ্যা হইল, তখন তাহার বরানুসন্ধান চলিতে লাগিল। আমি বন্ধুকে বলিলাম যে, কোনও ব্রাহ্মের সহিত অথবা বন্ধুর ন্যায় ভাবাপন্ন বরের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত কিন্তু বন্ধুর সাহসে কুলাইল না বোধ হয়, তিনি এক হিন্দু পরিবারেই কন্যাকে বিবাহ দিলেন; তাহাতে কন্যাটির অবস্থা কিছুকাল লেখিকার দৃষ্টান্তের ন্যায়ই কতকটা হইয়াছিল বটে, শেষে মা লক্ষ্মী নিজগুণে সব সামলাইয়া লইয়াছিলেন।

হিন্দু সমাজে কন্যাকে অহিন্দু আচার ও হিন্দু আচার উভয়ে দীক্ষিতা করাও যেমন অসম্ভব, ব্রাহ্মসমাজে হিন্দু আচার ও ব্রাহ্ম আচার উভয় শিক্ষা দেওয়াও তেমনি।

সুতরাং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী শিক্ষা দেওয়াই নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়. আর বিবাহের সময়ও সেইরূপ ঘর ও বর নির্ব্বাচন চেষ্টাই সমীচীন।

অনেকে মেয়েকে উল, কার্পেট প্রভৃতি নানারূপ সূচী শিল্প শিক্ষা দেন, কিন্তু কাঁথা সেলাই, পেনীফ্রক, সেমিজ তৈয়ারী প্রভৃতি সে জানে না, অথচ সংসারে তারই প্রয়োজন বেশী। দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত অবস্থার ঘরে ঐ সব গুলিরই সর্ব্বদা প্রয়োজন এবং উহা জানিলে সংসারেরও অনেকটা ব্যয় লাঘব হয়। প্রত্যেক গরীব ভদ্রলোকই যদি মনে করেন যে, মেয়ে মাজিষ্ট্রেট গৃহিণী হইবে, সুতরাং এই সব শিক্ষাই দরকার, তাহা হইলে সেটা ঠিক বলিতে পারি না।

মেয়েকে সূক্ষ্ম সূচী শিল্প শিক্ষা দেওয়ার আমি বিরোধী নহি, কিন্তু আগে তাহাকে কাঁথা সেলাই শিখান; পরে কার্পেট বুনিবে; আগে পেনী, সেমিজ, বালিশের খোল, লেপের খোল তৈয়ার করুক, তারপর জ্যাকেট, বডিস্ ইত্যাদি শিখুক, এই আমার বক্তব্য।

পূজার সাজ আগে করিতে শিখুক, তারপর ড্রয়িংরুম সাজান শিখুক, আপত্তি নাই। শয্যা রচনা, তাম্বুল রচনা, ঘর দোর ঝাড়া ইত্যাদি তাকে আগে শিখিতে হইবে। রন্ধনাদির কাজ আগে, পরে সময় ও সামর্থ্য হইলে পিয়ানো বাজাতে শিখিতে পারে। রাঁধা বাড়াতেও ভাত, দাল, চচ্চড়ি, মাছের ঝোল, অম্বল প্রভৃতি নিত্য আহার্য্য প্রস্তুত করা আগে, তারপর পিঠে পুলি পায়স, তার পরে সন্দেশ, রসগোল্লা, পোলাও কালিয়া।

তবে টেবিলে খাওয়া, জুতা পায় দিয়া চলা বা জুতা পায়ে রন্ধন শালায় যাওয়া প্রভৃতির শিক্ষা হিন্দুর ঘরে হইতে পারে না। যদি কন্যা ভাগ্যবশে সেইরূপ ঘরেই পড়ে তবে স্বামীর মনোরঞ্জনার্থে সে সব শিক্ষা করিয়া লইতে তাহার বেশী বেগ পাইতে হইবে না।

এসব গুলির জন্য বড় আসিয়া যায় না কিন্তু যেগুলি গুরুতর সে গুলি এতই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন যে তাহাদের শিক্ষা এক সঙ্গে হওয়া অসম্ভব। পরম হিন্দুর কন্যার মুসলমান বাবুর্চ্চির খানা খাওয়া স্বামীর সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনায় তাহাকে সেই ভাবে শিক্ষিত করা কি কখনও সম্ভব?

আর সেরূপ সম্বন্ধ অতি কমই হয়। তবে বিবাহের পর স্বামী ঐরূপ অহিন্দু আচারী হইয়াছেন, সর্বংসহা হিন্দুর মেয়ে সে স্বামীর সঙ্গে নির্ব্বিবাদে সংসার করিয়াছেন এরূপ একাধিক দৃষ্টান্ত আমি নিজেই দেখিয়াছি।

এ পর্য্যন্ত আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি তাহা হইতে বোধ হয় মাননীয়া লেখিকা মহাশয়া আমার বক্তব্য বুঝিয়াছেন। তাঁহার সহিত আসলে আমার বিরোধ নাই, বরং সমবেদনাই আছে। তবে তিনি যে উপায় বলিয়াছেন, সমাজে অর্থাৎ হিন্দু সমাজে অবিকলভাবে তাহা চলা কার্য্যক্ষেত্রে অসম্ভব; আর তিনি যতটা আশঙ্কা করিয়াছেন, কোন সম্প্রদায় বিশেষ ভুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ততটা আশঙ্কার কোন কারণ নাই ইহাই বলা আমার অভিপ্রেত। বাল্য বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে আমার মতামত আমি 'মানসী' পত্রিকায় "সামাজিক সমস্যা" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলীর একটিতে বিশদ ভাবেই বলিয়াছি। তবে আমাদের সমাজে ১৩।১৪ বৎসরের বেশী বয়স পর্য্যন্ত কন্যা অবিবাহিতা রাখিবার সময় কখন আসিবে কিনা সন্দেহ। * অবশ্য দায়ে পড়িয়া ১৫।১৬ কি ১৭ বৎসর পর্য্যন্তও কখন কখন কন্যা অবিবাহিতা থাকে বটে কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ ভদ্রঘরের কন্যারা ১৩।১৪ বৎসরের মধ্যেই বিবাহিতা হয়। সে যাহা হউক কন্যাকে শিক্ষা দিবার জন্য আন্তরিক যত্ন থাকিলে ইহারই মধ্যেও তাহা অনেকটা দিতে পারা যায়। তবে এই সব শিক্ষা দিবার কালে আমাদের নিজ নিজ সমাজের রীতিনীতির প্রতি যেন কতকটা দৃষ্টি থাকে। কন্যার বিবাহের সময় যদি সেই সমাজের ধার ধারিতে হয় তাহা হইলে শিক্ষার সময়ও তাহাকে একেবারে অবহেলা করিলে চলিবে না। আর যিনি যে শ্রেণীর লোক, তাঁহার কন্যা সেই শ্রেণীতেই বিবাহিতা হইবে এইটা ধরিয়াই তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এটা যেন আমরা না ভুলিয়া যাই। আমার মত যাহারা স্বীয় মাতৃভূমি বঙ্গের ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশে আছেন, তাঁহাদের বাঙ্গালী সমাজের সাধারণ রীতিনীতি সতত

* এই ব্যবস্থার বিষময় ফল "পণ প্রথা" সে সময় আনিয়া দিয়াছে। কন্যাকে ১৩।১৪ বৎসরের মধ্যে পিতৃ গৃহ হইতে বিদায় করিতেই হইবে, সমাজের এই অলঙ্ঘনীয় আদেশের ফলে বিবাহের বাজারে বরের দর এত চড়া এবং সেই জন্যই তাঁহাদের এত স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। পিতৃগৃহে কন্যা ভারস্বরূপ বলিয়া, পুরুষেরাও সুযোগ বুঝিয়া সে ভার লাঘব করিবার জন্য মূল্য চাহিয়া বসিতেছেন। নারীর গৌরব, নারীর মহিমা, নারীর মনুষ্যত্বের কোন মূল্য নাই, যত আদর ঐ রৌপ্য মুদ্রার! কন্যার পিতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও ঐ রৌপ্য মুদ্রা সংগ্রহ করিতেছেন, কারণ তাঁহার স্কন্ধ হইতে এই দুর্ব্বিষহ ভার নামাইবার একমাত্র উপায়ই ঐ অর্থ! সুঃ সঃ

চক্ষের উপর রাখিয়া কন্যাকে শিক্ষা দিতে হইবে, হিন্দুস্থানী, কি মারহাট্টি কি মাদ্রাজি হিন্দুর রীতিতে শিক্ষা দিলে চলিবে না। সময় সময় এরূপ দৃষ্টান্তও দেখিতে হইতেছে, এজন্যই একথাটা বলিতে হইল।

আমি গরীব লোক, আমার কন্যাকে প্রথমে গরীবের ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহেই আগে শিক্ষিতা করিতে চেষ্টা করিব; তার পরে যদি পারি তবে তদপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর উপযোগী শিক্ষাও কিছু কিছু দিব কিন্তু আগে নিজ অবস্থার উপযোগী শিক্ষা না দিয়া তাহার চেয়ে উচ্চ অবস্থার মত শিক্ষা দিলে সেটা ঠিক হইবে না; কারণ সাধারণতঃ অর্থ, সামর্থ্যাদি বিবেচনায় স্বীয় অবস্থানুরূপ ঘরেই কন্যা বিবাহিতা হইবে এইরূপ ধারণাই লোকে করিয়া থাকে।

আবার যাঁহারা ধনী তাঁহারাও কন্যাকে স্বীয় শ্রেণীর উপযুক্ত শিক্ষাতো দিবেনই তার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত ঘরের উপযোগী শিক্ষাও দেওয়া দরকার বিশেষতঃ যাঁহারা কুলীন তাঁহাদের পক্ষে এটা আরও দরকার কারণ কুলের অনুরোধে সময় সময় তাঁহাদিগকে নিম্ন অবস্থার ঘরেও কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়।

যেরূপ শিক্ষাই দেওয়া হউক মাতৃগণের নিকট নিবেদন তাহা যাহাতে ভারতীয় শিক্ষা হয়, আমাদের বাঙ্গালীর শিক্ষা হয় সর্ব্বদাই যেন সকলে সেইদিকে দৃষ্টি রাখেন। পাশ্চাত্যের মধ্যে যাহা ভাল সে শিক্ষাও যেন প্রাচ্যভাবে প্রাচ্য আবরণে কন্যাগণের সম্মুখে ধরা হয়—তাহারা যে ভারতীয়—তাহারা যে বাঙ্গালী ইহা যেন সর্ব্বদা তাহাদের হৃদয়ে জাগরুক থাকে।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

আগমনী।

১

এস শুভে এস,
প্রেমের উৎসব মাঝে,
শারদ লক্ষ্মীর সাজে,
সিঞ্চিয়ে প্রীতির ধারা
স্নিগ্ধ ছায়ে বস।

২

এস রাণী এস,
তব আগমন তরে,
ওই যে সাহানা সুরে,
প্রকৃতি গাহিছে গান
অনাদী উচ্ছ্বাস।

৩

এস রাণী এস,
দুই হৃদয়ের নদী,
একত্র মিলিল যদি,
কল্যাণেতে নিরবধি
দিকে দিকে ভাস!

৪

রাণী হ'য়ে বস,
মিলনের মহামন্ত্রে,
বিশ্ব অভিষেক ছত্রে,
বাঁধি হাত প্রেম সূত্রে
রাণী হ'য়ে বস।

৫

এস শুভে এস,
নব জীবনের পথে,
তোমার কর্ত্তব্য রথে,
প্রেমের নিশান দোলে
প্রীতি পরকাশ।

৬

এস শুভে এস,
বঙ্গ গৃহ ধর্ম্ম তরে,
মনে রেখো চির তরে,
মর্ত্ত্যের কলুষ সব
সদর্পে বিনাশ।

৭

এস শুভে এস,
সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব
পতি কুলে হও ধ্রুব,
নব প্রেম উৎস ধারা
কল্যাণে উদ্ভাস!

৮

ক্ষুদ্র গৃহে নয়,
তোমার বিশাল ঘর,
তাপিত তৃষিত পর,
সিঞ্চিয়ে মহত্ত্ব সুধা
বিশ্ব প্রেমে ভাস।

৯

এস রাণী এস,
ছিলে ওগো প্রিয় কন্যা,
এবে পত্নী হও ধন্যা,
সুবন্ধু সুমাতা হ'য়ে
ধরাকে উল্লাস।

১০

শুভে রাখি আশা,
মাতৃভূমি অতি দীনা,
তুমি যে গো তার কন্যা,
সে কথা স্মরণ করি
তারে ভালবাসা!

১১

আরো করি সাধ,
সেই যে অনন্ত প্রেম,
আত্মার উজ্জ্বল হেম,
বিবেকে উৎকর্ষ করি
অনন্তে প্রয়াস।

১২

কোটি প্রাণ খুলে,
বিভূর চরণে আজি,
শুভাশীষ সবে যাচি,
গার্গী মৈত্রেয়ীর সমা
অমরত্বে ভাস। *

শ্রীলীলা।

নারীর কার্য্য।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণী।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের তৃতীয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে মহামণ্ডলের সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়া নিম্নলিখিত কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন :—

মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল সমিতি চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিল। শিশুকে যেমন প্রথম পাঁচ বৎসর অত্যধিক যত্ন ও সাবধান সহকারে লালন পালন করিতে হয়, কোন মহৎ অনুষ্ঠানের পক্ষেও সেইরূপ সর্ব্বদা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা তাহার দেহ পুষ্ট না করিলে তাহাকে সজীব রাখা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যাঁহাদের অর্থে ও সামর্থ্যে এই সমিতি তিন বৎসর পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং যাঁহাদের উৎসাহ ও যত্নে সমিতির কার্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া সমিতির কলিকাতা শাখার তৃতীয় বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

তিন বৎসর পূর্ণ হইল আমাদের বঙ্গদেশে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই স্বল্পকালের মধ্যে প্রায় ছয় শতাধিক অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা যে ইহাতে যোগদান করিয়াছেন, ইহা প্রভূত আনন্দের বিষয়। সমিতির উদ্দেশ্য নারীজাতির চরিত্র গঠন ও উন্নতি সাধন। উন্নতি সাধনের পথ বিদ্যাশিক্ষা—অতএব যাহাতে বঙ্গবালিকাগণ বিদ্যালাভ করিয়া বাস্তবিকই শিক্ষিতারূপে সকল জাতির মধ্যে নিজ স্থান অধিকার করিতে পারে, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল সমিতি সেই ব্রতে ব্রতী হইয়াছে। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ গৃহস্থালীর কার্য্যের সহিত বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন, ইহাই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। পুরুষ ও নারী উভয়কে লইয়া সমাজ গঠিত। সমাজের উন্নতিতে দেশের উন্নতি, অতএব পুরুষের মত প্রত্যেক রমণীরও যে শিক্ষালাভ করা একান্ত আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক মাসিকপত্রে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমাদের অভিভাবকগণ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইলেও, আরও চাই। ৩৮ বৎসর পূর্ব্বের প্রবন্ধ লেখক এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাব

* কোনো বিবাহ উপলক্ষ্যে রচিত।

অনুভব করিয়া যে আক্ষেপ করিয়াছেন, আজও আমরা সেই আক্ষেপ করিতেছি, তাই আজ আমার প্রার্থনা যে, অশিক্ষিতা বলিয়া যেন আমাদের অভিভাবকগণকে আক্ষেপ করিতে বা লজ্জা পাইতে না হয়। আমরা অশিক্ষিতা বলিয়া যেন স্বদেশী বিদেশী কাহাকেও হা হুতাশ না করিতে হয়। আমরা যেন পরস্পরের সহায়তায় ও নিজেদের চেষ্টায় শিক্ষালাভ করিতে সক্ষম হই।

গত ১৯১১ সালে যখন শ্রীমতী সরলা দেবী কলিকাতায় ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের শাখা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে নারী সভা আহ্বান করেন, তখন ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান নব যুগের প্রেরণায় এই কঠিন কার্য্য অনায়াসসাধ্য হইয়াছে। সর্ব্বত্রই স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে এবং এই ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল-সমিতি হইতে শিক্ষয়িত্রী লাভের সুযোগ পাইয়া অনেকে সাগ্রহে তাহা গ্রহণ করিতেছেন। গত ১৯১৩ সালে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ১৫০ দেড় শত বাড়ীতে শিক্ষাদান করা হইয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ দূরবর্ত্তী অঞ্চলে বা স্বল্পবেতনে কাজ করা সমিতির পক্ষে এখন সম্ভবপর নহে ; এই অভাব দূর করিতে পারিলে অধিকতর সুশৃঙ্খলরূপে ও সামান্য বেতনে কার্য্যের বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

গত ১৯১৩ সালের ১২ই জানুয়ারী ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। এই সভায় ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত ও কবিতা আবৃত্তি হয় এবং বিদ্যালয় ও অন্তঃপুর শিক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পঠিত হয়।

গত ৬ই এপ্রেল সমিতির ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী (লেডি চাটার্জ্জি) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহাতে তিন মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব এবং স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধ দুই জন সভ্য কর্ত্তৃক পঠিত হয়। লেডি চাটার্জ্জি অন্তঃপুরিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন ও শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য পাঠান্তর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বিধবাশ্রমের বিষয়ও উল্লেখ করেন। সেখানে নিরাশ্রয় ভদ্র বিধবারা আশ্রয় ও ব্রহ্মচর্য্যের সুযোগ পাইবেন। তিনি এই বিধবাশ্রম খুলিয়া হিন্দু বিধবাদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন।

গত ২৭এ জুলাই ভবানীপুর অঞ্চলে সমিতির ষাণ্মাসিক অধিবেশন হয় ; তাহাতে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহাতে গত ছয় মাসের কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব পঠিত হয় এবং শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, ও শ্রীমতী অনুজানন্দিনী রায় মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

গত ১৪ই ডিসেম্বর সমিতির শেষ ত্রৈমাসিক অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাহাতে গত নয় মাসের আয় ব্যয় পাঠ ও নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

এই স্থলে বিশেষরূপে উল্লেখ করা আবশ্যক যে সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

গত বৎসরের মধ্যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার চারিটি অধিবেশন হয়, তাহাতে সমিতির পরিচালন কার্য্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসা হয়। গত আগষ্ট মাসে 'মহিলা ভাণ্ডার' কর্ত্তৃক যে শিল্প মেলার অনুষ্ঠান হয়, তাহাতে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল নারীর কার্য্যক্ষেত্র প্রসার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সাহায্য করেন ও সমিতির কয়েকজন সভ্য সপ্তাহ কাল উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এতদ্ব্যতীত 'স্বদেশী মেলাতে'ও সমিতি কর্ত্তৃক একটি 'ষ্টল' খোলা হইয়াছিল, তাহাতে আর্থিক লাভ না হইলেও কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই, অধিকন্তু বহু মহিলার শিল্পদ্রব্য বিক্রীত হইয়াছিল। এই

কার্য্যেও সমিতির কয়েকজন সভ্য অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে সাহায্য করায়, সমিতি তাঁহাদের নিকট বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ।

গত বৎসরে চারিবার শিক্ষয়িত্রী সম্মিলনী হইয়াছিল। একবার শ্যামপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে, একবার ময়ূরভঞ্জের মহারাণীর বাটীতে এবং দুইবার শিয়ালদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে।

গত নভেম্বর মাসে জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয় হইতে আগত পাঁচটী পাঞ্জাবী মহিলাকে সমিতির পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা করা হয় এবং অন্য কয়েকটি সমিতির সহিত যুক্তরূপে বন্যাপীড়িত নরনারীর সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন ও দক্ষিণ আফ্রিকানিবাসী ভারতবর্ষীয়গণের বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ ও চাঁদা সংগ্রহ করেন।

বৎসরের প্রারম্ভে ৮৩ জন ছাত্রী ও ১৮ জন শিক্ষয়িত্রী এবং বৎসর শেষে ৯০ জন ছাত্রী ও ২৩ জন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজাবকাশের অনতিপূর্ব্বে বহুসংখ্যক ছাত্রী দুই তিন মাসের জন্য বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য চলিয়া যাওয়াতে সমিতিকে প্রতি বৎসর বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, ইহার আশু প্রতিকার না হইলে সমিতিকে ক্রমশঃই ঋণজালে জড়ীভূত হইতে হইবে।

আয় ব্যয়ের যে বিস্তারিত বিবরণ মুদ্রিত হইল, তাহা পাঠ করিলে দেখা যায় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সহিত তুলনায় সমিতির আয় গত বৎসর সহস্রাধিক মুদ্রা অধিক হইয়াছে, কিন্তু উপরোল্লিখিত কারণে এবং কতক পরিমাণ চাঁদা এখনও পর্য্যন্ত অনাদায় থাকায় আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় প্রায় ১৩০০৲ টাকা ঋণ হইয়াছে। আশা আছে যে, বাকি চাঁদা আদায় হইলে ঋণভার কিয়দংশ কমিয়া যাইবে, তথাপি যে ঋণ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা লাঘব করিতে না পারিলে সমিতি কর্ত্তৃক আশানুরূপ কার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে। এক্ষণে সহৃদয় বঙ্গবাসী ও বঙ্গমহিলার প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে যাহাতে এই সমিতি স্থায়ী হইয়া উত্তরোত্তর নারীজাতির কার্য্যক্ষেত্র প্রসার করিতে সক্ষম হয়, সে বিষয়ে যেন কৃপাদৃষ্টি করেন।

গত বৎসর শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার যে মহিলা ভাণ্ডার খুলিয়াছিলেন, এ বৎসর তাহা আরো বড় করিয়া 'মহিলা শিল্প বাজার' করা হইয়াছে, তাহাতে মহিলারা স্বচ্ছন্দে গিয়া নিজ নিজ ইচ্ছামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারেন।

বসন্ত আহ্বান।

হে নব বসন্ত তুমি,
লয়ে শান্তি সুধাধারা
হৃদয় নিকুঞ্জে মোর
এস ওগো মন-হরা!
উঠুক গুঞ্জন গীতি
অবশ হৃদয় তলে
পাষাণ দ্রবিয়া যাক
আকুল নয়ান জলে।
হৃদি কিশলয়ে হোক
মুঞ্জরিত ফুল দল,
সুপ্তি ঘোর ভেঙ্গে যাক
লভি স্পর্শ নিরমল।
শুচি শোভা থরে, থরে,
বিকশিত হোক ধীরে,
হে মহৎ মহীয়ান,
তোমার আরতি তরে।
আমার এ হৃদয়ের
উচ্ছ্বসিত প্রেম ধারা
লভিবে পরাণ নব
তোমার পরশে তারা।

শ্রীসরলা দত্ত।

সপ্তম বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

Presented to the K.P.L.
by Shiva Prashad Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের
জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { বৈশাখ, ১৩২১। } ১০ম সংখ্যা।

মহৎ চিন্তা ও মহত্ত্ব লাভ।

অন্ধকার রজনীর অবসানে প্রতিদিনের সূর্য্যালোক নয়নে প্রতিভাত হইবা মাত্র জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নূতন জীবন আরম্ভ হয় সত্য, কিন্তু পয়লা মাঘের প্রভাতের আলোক যখন সুপ্ত জগতকে ঘুম ঘোর হইতে জাগাইয়া ধরণী পৃষ্ঠ রঞ্জিত করিল, বিহঙ্গের কলতানে আকাশতল মুখরিত হইয়া উঠিল, আর নরনারীর কর্ম্ম কোলাহলে বিশ্বসংসার সজাগ হইল, তখন যে জাগরণ আসিল, তাহা ত বৎসরের অন্য কোনো দিনের মত নয়। সে দিনের তরুণ তপন পুণ্য ও পবিত্রতায় হৃদয় ভরিয়া দিয়া বলিল, আজিকার এই জাগরণ ত সামান্য নয়। আজি যে তিমির রজনীর অবসান হইল, তাহা সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে অন্তরে দেখিবার জন্যই হইল। বিশ্বের অধিপতির সহিত ক্ষুদ্র মানবের যে মহা মিলন হইবে, মানবের মলিন অন্তর লইয়া পুণ্যস্বরূপ পরমেশ্বর যে লীলা করিবেন, সেই মহোৎসবের দিন যে সমাগত, সে দিনের প্রাতঃসমীরণ হৃদয়ের তারে তারে মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া তাহা জানাইয়া দিয়াছে। সে দিনের বিহঙ্গম দল সুস্বর লহরী তুলিয়া এই আশার বার্ত্তা প্রচার করিয়াছে—মানব, সম্বৎসর ধরিয়া তুমি এই সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ পুণ্যের সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছ, কত উত্থান পতনের ঘাত প্রতিঘাতে তোমার অন্তর বেদনাহত হইয়াছে, কত আশা নিরাশার দারুণ দাবদাহে হৃদয় দগ্ধ হইয়াছে, কত বিচ্ছেদের ব্যথায়, শোকের ক্রন্দনে মর্ম্মাহত হইয়াছ; আজি একবার ধূলিশয্যা ছাড়িয়া উঠ, এই কর্ম্মকোলাহলময় পৃথিবীর নিষ্ঠুর আঘাতের কথা বিস্মৃত হও, সংসার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে মর্ম্মন্তুদ সন্তাপের বোঝা বহন করিয়া করিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, ঐ দেখ, তোমার সকল ব্যথা জুড়াইয়া দিতে, সকল তাপ মুছিয়া লইতে বিশ্বের অধিপতি তোমার হৃদয় দ্বারে দণ্ডায়মান। এই মহামিলনের দিনে তুমি আর

দ্বার রুদ্ধ করিয়া থাকিও না। এই শুভ উৎসবে তোমার হৃদয়ের সকল জানালা দরজা উন্মুক্ত করিয়া দাও, পত্রে পুষ্পে তাহাকে সুশোভিত কর, আলোকে সঙ্গীতে তাহাকে আনন্দ মুখর করিয়া তোল, হৃদয় পাতিয়া দাও, তাঁহার করুণাধারা অবিরল ধারে সেখানে ঝরিয়া পড়ুক। তাঁহার করুণায় সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহার মধুর স্পর্শে নবজীবন লাভ করিয়া অন্তরে যে শক্তি সঞ্চিত হইবে, তাহাই তোমাকে সম্বৎসর ধরিয়া এই সংসারের সংগ্রাম ক্ষেত্রে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরিতে বল প্রদান করিবে।

অনেকে বলিতে পারেন, ঈশ্বরের পূজা ত কোনো দেশ কালে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কোনো বিশেষ স্থানে, কিংবা কোনো বিশেষ সময়ে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার জগৎব্যাপী বিরাট মন্দিরকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেশের যে অধঃপতন হইয়াছে; অনন্তকে ক্ষুদ্র গৃহ কোণে সীমাবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ তাহার পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়া সকল সম্পদ হইতে চ্যুত হইয়া যে জগতের দাসীরূপে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে; ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষকে তাহার এই শোচনীয় পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে কি তাহা ভারতবাসীর মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করাইবার জন্য যে উদ্ভূত হইয়াছেন, তাহা কি এই বিশেষ মাসের কয়েকটা দিন উৎসব করিয়া সিদ্ধ হইবে? ব্রাহ্মসমাজ কি আবার "সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং"এর পূজার দিন সীমাবদ্ধ করিয়া সঙ্কীর্ণতার দৃষ্টান্ত দেখাইবেন? মাঘ মাসের এই কয়েক দিনই কি কেবল ভগবানের করুণা আবির্ভূত হয়, মলিন মানবের সহিত বিশ্বপতির মিলন হয়, অন্য কোনো সময়ে হয় না?

হয় বৈ কি। কিন্তু স্মরণীয় দিনের কি একটা বিশেষত্ব নাই? মানব যেদিন পৃথিবীতে আগমন করে, বৎসরের পর সেদিন যখন ঘুরিয়া আসে, সে যে কি মহান্ দায়ীত্ব ভার, কি পবিত্রতা, অতীতের মলিন জীবনের জন্য কি ঘোর অনুশোচনা, জীবন দেবতার চরণে আত্মনিবেদনের কি আকুল আকাঙ্খা বহন করিয়া আনে, তাহা যিনি সেদিনটা সংসারের আবর্ত্তময়, নানা ঘাত প্রতিঘাতে আহত সমগ্র বৎসর হইতে পৃথক করিয়া আত্মপরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন, তিনিই অনুভব করিয়াছেন। আর যে সময়ে, যে দিনে ভারতবর্ষের জল স্থল কম্পিত করিয়া, সেই অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন যুগের কুসংস্কার এবং জড় পূজার জাল জঞ্জাল ছিন্ন করিয়া, নবশক্তি সঞ্চারিণী গম্ভীর ওঁকার ধ্বনি ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল, সেদিন পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ভারতবর্ষের সেই তমসাচ্ছন্ন যুগে যিনি একাকী জ্ঞানের বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া স্বদেশবাসীকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এ সময়ের উৎসব সেই যুগ প্রবর্ত্তনের স্মৃতিকে ভারতবাসীর অন্তরে চিরাঙ্কিত করিয়া দিবার জন্য। ঘনঘোর ঝঞ্ঝাময় রাত্রির অবসানে এই সময়েই পূর্ব্বাশায় নবোদিত সূর্য্যের আলোক, দেশবাসীকে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব দেখাইয়া দিয়াছিল। ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ রসপানই যে ভারতবর্ষের একমাত্র সম্পদ ছিল, সে দেশের অধঃপতন বিধাতার অভিপ্রেত নহে বলিয়া তাঁহারই করু ার অপূর্ব্ব নিদর্শন স্বরূপ সেই তিমিরান্ধকারময়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে রাজর্ষি রামমোহন রায়ের এ পৃথিবীতে আগমন। সেই জাতিভেদ, সেই দলাদলি, সেই হীনতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, অকম্পিত হস্তে একমেবাদ্বিতীয়মের পতাকা ধরিয়া সেই অদম্য বীর অপরাজিত চিত্তে প্রচার করিলেন, **ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব।** অনন্তকে ক্ষুদ্র গৃহ কোণে আবদ্ধ করিয়া, মিথ্যা মূর্ত্তির মধ্যে সেই অমূর্ত্তকে পূজা করিতে করিতে যাহারা ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা এই সার্ব্বভৌমিক আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথা শুনিয়া চমকিত হইল। কেন না, তখন তাহারা বিস্মৃত হইয়াছে যে, এই দেশেরই তপোবন হইতে বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, তস্যভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি," সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানেরই প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকলে দীপ্তি পাইতেছে। তাহারা তখন ভুলিয়া গিয়াছে, এই দেশেরই ঋষিগণ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, "...হ অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই ...মিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে জানিয়াছি।" ...ারতবর্ষের এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মোপলব্ধির তত্ত্ব বিস্মৃতির ...তল তল হইতে তুলিয়া রাজর্ষি দেখাইলেন, ভারত...বর্ষের পূর্ব্ব গৌরবের মূল কোথায় ছিল। শত শত ...বৎসর কুসংস্কার ও মিথ্যার দাসত্ব করিয়া ভারতবর্ষের ...যে অধঃপতন হইয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তিলাভের ...সোপানই যে এই ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ রস...পান, তাহা নির্ভীক হৃদয়ে ঘোষণা করিয়া স্বদেশ...বাসীর লাঞ্ছনা মস্তকে তুলিয়া লইয়া তিনি এই ব্রাহ্ম...সমাজের প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঋষিদিগের তপস্যালব্ধ ...ব্রহ্মজ্ঞানের মধুর ধারা তিনি এই সমাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা ...ভারতবর্ষের মরুপ্রান্তরে প্রবাহিত করিয়া দিলেন।

জীবনপ্রদ জলধারার যে উৎস পাষাণ প্রাচীরে ...আবদ্ধ হইয়া কেবল পঙ্কিল আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতে...ছিল, তাহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া তিনি তাহা খরস্রোতা ...স্রোতস্বিনীরূপে সমগ্র দেশে প্রবাহিত হইবার পথ ...উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। তিনি বুঝি দিব্যদৃষ্টিতে ...দেখিয়াছিলেন যে, এই স্রোতস্বতী যখন দুই কুল ...প্লাবিত করিয়া উভয় পার্শ্বের সকল প্রকার জাল ...জঞ্জাল ধুইয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে ছুটিতে ...থাকিবে, তখন ভারতবর্ষ পূর্ব্ব মহিমায় আবার দীপ্তি...শালী হইয়া উঠিবে, ভারতবর্ষ তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদে ...আবার সম্পদশালী হইবে। তাই ব্রহ্ম পূজা ও ব্রহ্ম ...সাধনার জন্য এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ...নূতন যুগের উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভারত...বর্ষের তপোবন হইতে মানব সমাজের অন্তরে ব্রহ্মের ...সিংহাসন রচনা করিবার জন্য জাতি, বর্ণ, নর, নারী ...সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে **এক ঈশ্বরের** উপাসনা প্রচার ...করিলেন। সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মসাধন হয় না, ...তাঁহাকে পাইতে হইলে সন্ন্যাসী হইয়া বনে গমন ...করিতে হয়, এই ভাব ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জাগত ...ছিল। ইহার ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছিল যে, ...যাঁহারা সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন ক্লেশ স্বীকার করিয়া তপস্যায় নিমগ্ন হইতেন, ...তাঁহাদেরই মধ্যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং"এর পূজা আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। আর ঐ যে লক্ষ লক্ষ নরনারী সংসারের দারুণ তাপে ক্লিষ্ট হইয়া, অন্তরের জ্বালা জুড়াইবার জন্য সেই পরম শান্তিস্থল খুঁজিতে গিয়া বিপথে পড়িয়া ক্ষত বিক্ষত হইত, তাহাদের অবস্থা হীন হইতে হীনতর হইতেছিল। অন্তরে অনন্ত স্বরূপকে ধরিতে না পারিয়া বাহিরের আচার অনুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম জানিয়া তাহাকেই মোক্ষ সেতু স্বরূপ বিশ্বাস করিয়া পরমেশ্বরের পূজা হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া পড়িল। জীবন যতই অপবিত্র থাকুক না কেন, নিজের স্বার্থের জন্য অপরের সর্ব্বনাশ সাধন যতই করি না কেন, মিথ্যার মধ্যে ডুবিয়া যতই অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হই না কেন, একবার গঙ্গায় ডুব দিলে যখন কোটি জন্মের পাপ ক্ষালন হইবেই, এই বিশ্বাসে যখন ধর্ম্ম আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাজা রামমোহন রায়, দেশের সমস্ত অধর্ম্ম ও সংস্কারের জাল ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিলেন, "এস, এস, এখানে ব্রাহ্মণ চণ্ডালে ভেদ নাই, হিন্দু মুসলমানে বিবাদ নাই. নরনারীর সমান অধিকার। সকলে প্রীতিসূত্রে মিলিত হইয়া সার্ব্বভৌমিক ভাবে মহান্ পরমেশ্বরের পূজায় রত হও।"

একমাত্র নিরাকার ঈশ্বর আমাদের পিতা, সমস্ত নরনারী তাঁহারই সন্তান। এখানে জাতিভেদের স্থান কোথায়? ঈশ্বরকে যখন পিতা বলিয়া ডাকিয়াছি, তখন ত তাঁহার ঐ চণ্ডাল পুত্রকে ঘৃণা করিয়া বলিতে পারি না, "তুই আমার গৃহ প্রাঙ্গণে কেন? যা, তোর স্থান ঐ পথের ধূলায়, ঐখানে আমাদের যে উচ্ছিষ্ট পড়িয়া আছে, তাহাই তোর সম্বল।" নারীকে বলিতে পারি না, "তোমার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক, তুমি পরমুখাপেক্ষী, তুমি ভীরু অতএব তোমার উচ্চ জ্ঞান লাভের ক্ষমতা নাই, স্বাধীন চিন্তার অধিকার নাই। তুমি চিরকালই সবলের অধীন হইয়া তাহার ইঙ্গিতে উঠিয়া বসিয়া জীবন কাটাইয়া দিবে।"

রাজা রামমোহন রায় যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন দেশের নারী সমাজ এমনি ভাবে সমাজ কর্ত্তৃক অত্যাচরিত হইত। একবার সতীদাহের কথা ভাবিয়া দেখুন। আত্মার কতদূর অধোগতি

হইলে মানুষ এমন করিয়া উৎফুল্ল চিত্তে নারী হত্যা করিতে পারে। জলন্ত চিতা হইতে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় নারী যখন গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিতে যাইত, আত্মীয় পুরুষগণ কি নির্ম্মম ভাবে তাহাকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া, তাহার করুণ কাতরোক্তি অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে দগ্ধ হইতে বাধ্য করিত। দেশের লোক যখন অন্ধ সংস্কার বশতঃ নারীর এই মর্ম্মন্তুদ ব্যথার ক্রন্দনে বধির ছিল, তখন রাজার বিশাল হৃদয় তাহাদের দুঃখে গলিয়া গিয়াছিল। দেশের সেই শোচনীয় অবস্থার সময় সেই সব কুসংস্কার জনিত বিশ্বাসে নিষ্ঠুর হৃদয় স্বদেশবাসীদিগের হস্ত হইতে সমগ্র নারী সমাজকে উদ্ধার করিবার জন্য, তখন তাঁহারই ন্যায় মহা শক্তিশালী, বিশ্বজনীন প্রেমে পূর্ণ, উদার, বিশাল হৃদয় মহাপুরুষেরই প্রয়োজন ছিল। তিনি নারীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার প্রণীত সহমরণ বিষয়ক গ্রন্থের এক স্থলে বলিয়াছেন :—

"স্ত্রীলোকেরা শারীরিক পরাক্রমে পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহারদিগকে আপনা হইতে দুর্ব্বল জানিয়া যে যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবতঃ যোগ্যা ছিল, তাহা হইতে উঁহারদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন; পরে কহেন যে, স্বভাবতঃ তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্যা নহে; কিন্তু বিবেচনা করিলে তাহারদিগকে যে যে দোষ আপনি দিলেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা ব্যক্ত হইবেক।"

"প্রথমতঃ বুদ্ধির বিষয়। স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়, আপনারা বিদ্যাশিক্ষা, জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালীদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগ রূপে বিখ্যাতা আছে। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।"

"দ্বিতীয়তঃ, তাহাদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, ইহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন যে, তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।"

এইরূপ মহানুভবতার সহিত রাজা রামমোহন রায় পদদলিত নারী সমাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাদিগকে সবলের অত্যাচার হইতে উদ্ধার করেন। উপনিষদকার ঋষিদিগের পুণ্য পদধূলি রঞ্জিত দেশের অধিবাসীদিগের এমনি দুর্দ্দশা হইয়াছিল। আর গার্গী মৈত্রেয়ীর ন্যায় ব্রহ্মবাদিনী কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত ভারতের নারী সমাজ এমনি দুর্ব্বল, এমনি অজ্ঞান, এমনি অত্যাচারে নিষ্পেষিত হইতেন।

ব্রাহ্মসমাজ প্রচার করিলেন—

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

ব্রাহ্মসমাজের এই উদার, বিশ্বজনীন বাণী সমগ্র ভারতের মর্ম্মে মর্ম্মে কি বিপুল স্পন্দন আনয়ন করিল। আর জাতি বিচার নাই, পণ্ডিত মূর্খ নাই, ধনী নির্ধন নাই। যাহার ভক্তি আছে, সেই মুক্তি পাইবে। দেশাচারের নিগড়ে আবদ্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত দেশে এই সার্ব্বভৌমিক বাণী কি এক নূতন আশার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। জমাট অন্ধকারের ঘন যবনিকা ভেদ করিয়া কি এক মহা আলোকের প্লাবনে সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়া গেল। নরনারী উপলব্ধি করিল, ঐ পাষাণের পূজা করিতে করিতে তাহারাও পাষাণ হইয়া গিয়াছে। দেবতা যেমন নির্জ্জীব, প্রাণহীন, তাহারাও তেমনি নিস্পন্দ, জড় হইয়া গিয়াছে। তাহারা ত সামান্য নয়, তাহারা যে অমৃতের পুত্র। তাহারা বুদ্ধির সর্ব্বশক্তিমান, বিশ্বাধিপতির সিংহাসন তাহাদের অন্তরে। মুক্তি আসিবে অন্তর হইতেই, বাহিরের কিছুতেই তাহার স্থান নাই। তখন তাহারা সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইল। ধূলিশয্যা ছাড়িয়া রাজাধিরাজের চরণ তলে আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল। বিশেষতঃ এই মুক্তির সমাচার অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, পিঞ্জরাবদ্ধ নারীজাতির সম্মুখে কি বিশাল, উজ্জ্বল, মহারাজ্যের আভাস প্রদান করিল। নারীর আত্মাও যে বিধাতার দান, তাহারও জীবনের গৌরব যে তাঁহাকে পাওয়া, আত্মবোধই যে তাহার পৃথিবীতে আগমনের চরম সার্থকতা, এই মহাবার্ত্তা ব্রাহ্মসমাজ আবার তাহার নিকট ঘোষণা করিলেন। সকল প্রকার জ্ঞানলাভ, সকল প্রকার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যই যে ঐ পরম পদকে অন্তরে ধারণ করা, এই বোধ তাহার জীবন ধারণ, তাহার সকল কর্ম্ম মধুময় করিয়া দিল।

আত্মোন্নতি সাধন করিয়া, সমস্ত মিথ্যার জঞ্জাল অন্তর হইতে দূর করিয়া সেই সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া বিশ্বের কার্য্যের অংশ ভার মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য নারীর চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ কয়েদী যেমন ঐ অন্ধকারের নিবিড়তার মধ্যেই আপনার আশ্রয় খোঁজে, বাহিরে যে সুন্দর উজ্জ্বল আলোকে ধরা প্লাবিত হয় তাহা ভুলিয়াই যায়, তেমনি শত শত বৎসরের পরাধীনতার অন্ধকারে পীড়িত ভারতবাসী ভুলিয়া গিয়াছিল যে, তাহার দেশ কি অতুল গরিমায় গৌরবান্বিত ছিল, তাহার নারীসমাজ জ্ঞানে কর্ম্মে কি উজ্জ্বল মহিমায় দীপ্ত হইত।

ঐ অন্ধকার ঘরের একটি রন্ধ্রপথ দিয়া যেদিন সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিল, সেদিন সে বিস্ময়চকিত হইয়া বিমুগ্ধ স্বরে বলিল, এ কি অপার্থিব জিনিস? এ কি মহাশক্তি? এ কোন্ নূতন রাজ্যের আভাসে আমাকে উন্মনা করিয়া তুলিল যে! এতদিন জানিতাম অন্ধকারেই আমার জীবনের সার্থকতা, এখন ঐ আলোকের মহারাজ্যে ছুটিয়া যাইতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিরাট সমাজ এই বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

অন্ধকারে বাস করিতে করিতে যাহাদের দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, যুগ যুগ মিথ্যার জালে জড়িত থাকিয়া থাকিয়া যাহাদের সত্য স্বরূপের বোধ বিলুপ্ত হইয়াছে, বাহিরের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্ম্মকে দেখিতে অভ্যস্থ হইয়া যাহাদের অধ্যাত্ম দৃষ্টি হীন হইয়াছে, নিরন্তর ক্ষুদ্রের পুজা করিতে করিতে যাহারা অনন্তকে হারাইয়া ফেলিয়া দেশের, সমাজের কোন কার্য্যেই আর উদার বিশ্বজনীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিতেছে না, তাহাদের নিকট এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাহাদের নারী সমাজের এই সর্ব্বোচ্চ উন্নতিলাভের স্পৃহা, অবনত জাতির এই উত্থান চেষ্টা আকাশ কুসুমের ন্যায় হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জিনীষ ত হইবেই! কিন্তু এমন করিয়া আলোক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অন্ধকারে চক্ষু মুদিয়া অতীতের স্বপ্ন দেখিলে ত চলিবে না।

সমগ্র বিশ্ব উন্নতি পথে কি দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে! জীবন্ত মানব সমাজ কি বিরাট প্রাণের স্পন্দনে আন্দোলিত হইয়া অসাধ্য সাধন করিতেছে। দিকে দিকে নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সে প্রচণ্ড তরঙ্গের আঘাত মৃতপ্রায় জাতি সমূহকেও আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত করিয়াছে। জীবন্ত জাতি প্রতি মুহূর্ত্তে যে উন্নতির সোপানে উঠিতেছে, যে নব নব তত্ত্বের উদ্ভাবনে সমগ্র বিশ্ব চমকিত করিতেছে, যে অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিতেছে তাহা আমাদিগকে বিস্ময় চকিত করিয়া তুলিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ তাঁহাদের আদর্শ ক্ষুদ্র নয়, তাঁহাদের দৃষ্টি পশ্চাতে নিবদ্ধ নহে। অনন্ত উন্নতি তাঁহাদের লক্ষ্য, উন্নততর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি। তাঁহারা জগৎকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, অনন্ত উন্নতি লক্ষ্য হউক, ক্ষুদ্র আদর্শ কাহারও সম্মুখে ধরিও না। তাহা হইলে ক্ষুদ্রের জালে জড়াইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে হইবে! তাঁহাদের নারী সমাজের সম্মুখেও এই

অনন্ত উন্নতির আদর্শ। তাই তাঁহারা বর্ত্তমানে তৃপ্ত না থাকিয়া কেবলই সম্মুখে ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের এই তরঙ্গের আঘাত সর্ব্ব দেশীয়, ঘুমন্ত, মৃতপ্রায় নারী সমাজকেও জাগাইয়া তুলিয়াছে।

তুরস্ক, পারস্য, ইজিপ্ট, চীন, ফিলিপাইন, সুমাত্রা, জাভা, প্রভৃতি দেশের নারীগণ আপনাদের উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আলস্য এবং বিলাসিতায় ডুবিয়া গিয়া যে তুরস্ক পরপদতলে দলিত ও লাঞ্ছিত হইত, আজ তাহার নারী সমাজ সে বিলাসিতার পাশ সবলে ছিন্ন করিয়া কর্ম্মের কঠোর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সমগ্র তুরস্কের নারীদিগের মধ্যে আত্মোন্নতি সাধনের একটী প্রবল উত্তেজনা জন্মিয়াছে তুর্কী নারীগণ এ পর্য্যন্ত অল্প বিদ্যাতেই তৃপ্ত থাকিতেন। নিজের ভাষা শিক্ষা, প্রচলিত প্রণালীতে উপাসনা করিতে শিক্ষা, ইহাতেই তাঁহাদের সকল বিদ্যার পরিসমাপ্তি হইত। এই অল্প শিক্ষা তাঁহাদিগকে সংসারে তৃপ্ত রাখিয়াছিল কিন্তু তাহা হৃদয়ে প্রসারতা দান করিতে পারে নাই, দেশের সন্তানদিগকে কোনো মহৎ ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিতে পারে নাই, পরার্থে আত্মোৎসর্গে পুরুষের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতে পারে নাই, উদার বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে কোনো কার্য্য দেখিতে শিক্ষা দেয় নাই। সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে তাঁহারা আবদ্ধ ছিলেন। এখন শত শত নারী সকল প্রকার উচ্চ জ্ঞান লাভে নিযুক্ত হইয়াছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছেন, রাজনীতির জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধে লেখনী চালনা করিতেছেন। উন্নত দেশের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বিদেশে গিয়া কত রমণী তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। দুইশত তুর্কী রমণী চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া দেশের নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তুরস্কের এক রাজকুমারী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোরাণ অধ্যয়ন করিয়া বলিয়াছেন, কোরাণে এমন কিছুই নাই যাহা বলিয়া দিতেছে যে নারীকে গৃহ কোণে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবেই।

এই সকল রমণী স্বদেশে বিদেশে যে জ্ঞান আহরণ করিতেছেন তাহা স্বদেশেরই হিতার্থে নিয়োজিত করিতেছেন। মৌমাছি যেমন ফুলে ফুলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুচক্র রচনা করে, ইঁহারা তেমনি বিধাতার এই বিশ্বরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া স্বদেশের কার্য্যে লাগাইতেছেন। বিদেশীর উৎকৃষ্ট গুণ সকল আয়ত্ব করিয়া বিজাতীর জ্ঞানভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি চয়ন করিয়া তাঁহারা দেশের নারী সমাজকে সম্পদশালী করিয়া তুলিতেছেন। কারণ তাঁহারা জানেন, নারীর হৃদয় সঙ্কীর্ণ, অনুদার, ক্ষুদ্র, মিথ্যার জালে জড়িত, অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকিলে দেশের ভবিষ্যতও তমসাচ্ছন্ন। সত্যের সেবক হওয়াই যে মানব জীবনের সার্থকতা এবং পরার্থে আত্মোৎসর্গই যে মানবের উচ্চতম আদর্শ, এই আকাঙ্ক্ষা জননীর হৃদয়ে না থাকিলে, এই শিক্ষা মাতার নিকট হইতে না পাইলে কেমন করিয়া সে সত্যের পূজক, উন্নত, উদার, তপস্বী, ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইবে? নারীকে যে পরিমাণে ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, যে পরিমাণে তাঁহাকে অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে, যে পরিমাণে তাঁহার আত্মার স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া দিবে, মানব, নিশ্চয় জানিও, তুমিও ঠিক সেই পরিমাণে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব অধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পড়িবে। বিধাতার যাহা দান তাহাকে বিকলাঙ্গ করিবার অধিকার তোমার কোথায়?

শত শত বৎসরের যথেচ্ছাচার শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে তুরস্ক যে উন্নত আদর্শ লাভ করিয়াছিল, তাহাও ঐ নারীর আত্মোৎসর্গের ফল। তুরস্কবাসীগণ তাহাদের নারীজাতির এই স্বদেশ প্রেম ও আত্মোৎসর্গে বিমুগ্ধ। পার্লামেণ্ট গঠনে তুর্কিনারীদিগের সহায়তা অতুলনীয়। কত রমণীকে সুলতান আবদুল হামিদের রোষানলে পতিত হইয়া মরিতে হইয়াছে, কত রমণীকে স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু তাঁহাদের একাগ্র নিষ্ঠা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শত অত্যাচারের মধ্যেও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য পথে স্থির রাখিয়াছিল। আমাদেরি দেশের ন্যায় তুরস্কের অধিবাসীগণ এই মনে করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে উচ্চ জ্ঞান লাভে তুর্কি নারীগণ বিলাসিনী, গৃহ সংসারের প্রতি উদাসীনা হইয়া উঠিবেন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিতা তুর্কি নারীদিগের বিলাস বিমুখ সংসারযাত্রা প্রণালী, পারিবারিক শৃঙ্খলা, মিতব্যয়িতা, সংসারের নীতিপূর্ণ পবিত্র ভাব দেখিয়া তুর্কিগণের সকল শঙ্কা দূর হইয়াছে।

বর্ত্তমান তুর্কি গবর্ণমেণ্টের মস্তক স্বরূপ কোনো উচ্চ কর্ম্মচারীর পত্নী অতি অল্প আয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। ইনি স্বরাষ্ট্র সচিব কিন্তু রাজকোষ হইতে সংসারের জন্য অল্প মুদ্রা গ্রহণ করেন। তাঁহার গুণবতী ও স্বদেশ হিতৈষিণী পত্নী স্বইচ্ছায় এই দীনতা অবলম্বন করিয়া শিক্ষিতা নারীর বিলাস বিমুখতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রকৃত শিক্ষা নারীকে এমনি মহীয়সী করে। শিক্ষা অর্থ দুই পাতা গ্রন্থ পাঠ নহে। যে শিক্ষায় মানব মনের উচ্চ বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়, হৃদয় উন্নত হয়, দৃষ্টি উদার হয়, সার্ব্বজনীন প্রেমে অন্তর ভরিয়া উঠে, মিথ্যার জঞ্জাল হৃদয় হইতে দূর হইয়া যায়, ঈশ্বর ও মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহাই শিক্ষা। এমন শিক্ষা যে রমণী লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকেই শিক্ষিতা বলি। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহাদের উচ্চ শিক্ষিতা নারী সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা আছে, বলিতে হয় তাঁহারা শিক্ষার সুফল নিজেরা উপলব্ধি করেন নাই। কাহাকেও ইহার সুফল উপভোগ করিতে দেখেন নাই। ইহা তাঁহাদের অজ্ঞতাপ্রসূত মন্তব্য মাত্র। চৌদ্দ বৎসরের বোধোদয় পড়া বালিকার শিক্ষা দেখিয়া এবং এমন "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী"র কুফল প্রতিনিয়ত সংসারে ভোগ করিয়া তাঁহাদের যে-অভিজ্ঞতা জন্মে, শিক্ষিতা রমণী সম্বন্ধে তাহাই তাঁহাদের একমাত্র ধারণা। নারী যখন বিধাতার অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারে দাঁড়াইবার অধিকারী হন, তখন তাহার ঐশ্বর্য্য সম্ভার তাঁহার হৃদয়ে সত্যম্‌কে জানিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে, মিথ্যার মধ্যে আর তৃপ্ত থাকিতে দেয় না, অন্তরে দীনতার সঞ্চার করে, সকল পার্থিব ভোগ সুখে বৈরাগ্য আনিয়া দেয়, ত্যাগের মহান্ ভাবে সমগ্র জীবন অনুপ্রাণিত করে, চিত্তশতদলকে একমাত্র সেই সত্য সূর্য্যের দিকে উন্মুখ করিয়া তোলে। সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া নারী তখন সেই পরম পিতাকেই অন্তরে ধারণ করিতে ব্যাকুল হন। সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, মিথ্যা সংস্কারের জালে জড়িত করিয়া, নারীর আত্মায় স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইলে তাহার যে কুফল তাহা যেমন বর্ত্তমান বংশীয়দিগকে ভোগ করিতে হয়, তেমনি তাহার অপরাধ ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের জন্যও সঞ্চিত থাকে। ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই।

তুরস্ক যেমন নব জাগরণের স্পন্দনে উদ্বেলিত লইয়া উঠিয়াছে, ইজিপ্টের রমণী সমাজেও সে আঘাত আসিয়া লাগিয়াছে। ইজিপ্টের এক রাজকুমারী নারীজাতির সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনার্থ নানাপ্রকার আন্দোলন উপস্থিত করিয়া সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। নারীর উন্নতি সাধনের জন্য কাইরো নগরে একদল মিসরী রমণী আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। পারস্যের বাহাই ধর্ম্ম তথাকার প্রচলিত ধর্ম্মের কুসংস্কার ও পৌরহিত্যের পাশ ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। পারস্যের অধিকাংশ লোক সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। তাঁহারা এতদূর ধর্ম্মোন্মত্ত ছিলেন যে, স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকদিগকে অপবিত্র ও বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাঁহাদের সহিত সামাজিক ভাবেও মিশিতেন না। এমনি ঘোর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বাহাই ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, **সার্ব্বভৌমিক প্রেম, বিশ্বমানবের সেবা।** দেশবাসিগণ এতদিন ক্ষুদ্র, পঙ্কিল, কর্দ্দমাক্ত জলাশয় দেখিয়াই তৃপ্ত ছিলেন, যেদিন ঐ মহাসাগরের গম্ভীর তরঙ্গ গর্জ্জন শুনিলেন, সেদিন জীবন, ধন তুচ্ছ করিয়া এই উদার মুক্ত ধর্ম্মের জন্য আত্মসমর্পণ করিলেন। জগতের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রচলিত কুসংস্কার, অধর্ম্ম, দুর্নীতি মিথ্যার উপাসনা, সঙ্কীর্ণতার

গণ্ডী হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য যাঁহারা দণ্ডায়মান হইয়াছেন তাঁহাদিগকে সমগ্র দেশের অশেষ লাঞ্ছনা, অত্যাচার, বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বহন করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা বিধাতার আহ্বানে মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের মঙ্গলের জন্য নিজেরা এই সব যাতনা অপরাজিতে চিত্তে সহ্য করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বাহাই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকেও দেশবাসীর শত অত্যাচারে ক্লিষ্ট হইয়া প্রাণ দিতে হইয়াছিল।

সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য শুধু যে পুরুষেরাই প্রাণ দিয়াছেন তাহা নহে, সত্যালোকে উদ্ভাসিত সহস্র সহস্র রমণীও তাঁহাদের জীবন অর্পণ করিয়াছেন। মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া সত্যের আলোক হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে তাহা রমণীর কোমল হৃদয়ে যে সুদৃঢ় সিংহাসন রচনা করে তাহাকে শত ঝঞ্ঝা বাতের বিক্ষোভ বিলোড়ন আর টলাইতে পারে না। সত্যের আস্বাদ পাইয়া, অনন্তকে লক্ষ্য করিয়া কুড়ি সহস্র বাহাই নরনারী দেশবাসীর নিপীড়নের তলে আত্মবলি দান করিয়াছেন। মহৎ চিন্তায় মানুষ সত্যভাবে উদ্দীপিত হইলে আত্মদান এমনি সহজ হয়। অনন্ত স্বরূপের অনন্তরূপে উন্নত আদর্শ মানুষকে এমনি করিয়া পাগল করিয়া তোলে।

ক্ষুদ্রতার মধ্যে ডুবিয়া, কুসংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া চীনদেশ অধঃপতনের পথে কি দ্রুত নামিয়া যাইতেছিল। স্বদেশের আত্ম-কলহে পীড়িত আর বিদেশী কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়া তাহারা খণ্ড খণ্ড হইয়া চীন সাম্রাজ্যের নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত করিয়া দিতেছিল। সহসা এই পতনের স্রোত বাধা প্রাপ্ত হইল। আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া চীনের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

অল্প দিনের মধ্যেই যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সাধিত হইল, যে অপূর্ব্ব শক্তির বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রাণে প্রাণে বহিতে লাগিল তাহার উৎস কোথায় তাহা আমরা কঠিন দেশাচারের নিগড়ে আবদ্ধ, মিথ্যার জালে জড়ীভূত, দেশের পূর্ব্ব গৌরব বিস্মৃত, শত বৎসরের আধ্যাত্মিক ও মানসিক স্বাধীনতা বর্জ্জিত ভারতবাসী—আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কাটাইয়া, খণ্ডবিখণ্ডের ভাব অন্তর হইতে দূর করিয়া এক উদার, উন্নত, চির অগ্রসরশীল আদর্শ সম্মুখে রাখিলে যে মানুষ এমন অসাধ্য সাধন করিতে পারে তাহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। চীনের মনীষিগণ বলিলেন, "দাও, দাও সকল প্রকার উন্নতির দ্বার উন্মোচন করিয়া দাও, নরনারীর পার্থক্য বিচার করিও না। সকলকে আত্মার স্বাধীনতা উপভোগ করিতে দাও। নয়ন রুদ্ধ করিয়া আলোক হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখিবার দিন চলিয়া গিয়াছে।" এই উদার সার্ব্বভৌমিক, স্বাধীনতার মহাবাণী ঘোষিত হইবার পর চীন এমন অপূর্ব্ব শক্তিতে শক্তিশালী হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আপনার অস্তিত্ব অটুট রাখিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। তাঁহারা দেশের যেখানে অন্ধ সংস্কার দেখিতেছেন সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতেছেন, যেখানে অধীনতা দেখিতেছেন সেখানে স্বাধীনতা দান করিতেছেন। রমণীগণের নিকট বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচিত হইয়াছে; মহৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা আত্মোন্নতি সাধন করিয়া দেশের উন্নতিতে পুরুষের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়াছেন। চীনের প্রজাতন্ত্র সংগঠনে চীনা নারীর সাহায্য অপরিসীম। কত শত রমণী দেশের হিতার্থে জীবন, ধন অর্পণ করিয়াছেন! তাঁহাদের এই মহান্ আত্মোৎসর্গে মুগ্ধ হইয়া প্রজাতন্ত্রের নেতাগণ তাঁহাদের নবগঠিত বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় চীনারমণীদিগের প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, পুরুষেরা পুরুষ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং নারীগণ কর্ত্তৃক নারী নির্ব্বাচিত হইবেন। ইহার ফলে নয়টি রমণী কোয়াংটং প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। ক্যানটন কোয়াংটঙের রাজধানী। ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিতা। চীনের রমণীগণ দলে দলে শিক্ষালাভ করিতেছেন, বহুসংখ্যক রমণী জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে গমন করিয়াছেন।

রমণীগণ সমগ্র দেশে বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। দেশের সর্ব্বত্র জ্ঞানলাভের জন্য বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বত্রই কেবল **অগ্রসর হও, অগ্রসর হও** এই আহ্বান ধ্বনি উঠিয়াছে। তাই চীন মরিয়াও নবজীবনের স্পন্দনে জাগরিত হইয়াছে।

সমগ্র বিশ্বের এই দ্রুত উন্নতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া যদি উন্নত হইতে আকাঙ্খা থাকে—এই যোগ্যতমের জয়ের ক্ষেত্রে যদি ভারতবর্ষের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে প্রাণ আকুল হয়—যদি ভারতবর্ষের সেই ঋষিদিগের ভগবৎ স্তোত্র মুখরিত তপোবনের স্মৃতি প্রদীপ্ত রাখিবার মহৎ চিন্তায় হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে—তবে **অগসর হও, অগ্রসর হও।** মহান্ **ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব** স্বীকার করিয়া এক উদার, উন্নত, অনন্ত, সত্য, সার্ব্বভৌমিক আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া উন্নতি পথে ছুটিয়া চল। স্বার্থান্ধ হইয়া, আত্মকলহে মূর্চ্ছিত হইয়া, ক্ষুদ্র পঙ্কিল, জলের কৃমি কীটে আচ্ছন্ন হইয়া সেই চিরকালের দলাদলি লইয়া থাকিলে জগতের ঐ ...র উন্নতিকামী যাত্রীর দল মহাযাত্রা পথে ধাবমান হইতেছে তাহাদিগের পদতলে দলিত হইয়া লাঞ্ছিত হইয়া মরিতে হইবেই। তখন ভীরু কাপুরুষের একমাত্র সহায় অশ্রুজলের দিকে কেহ দৃকপাতও করিবে না। অপমানিত হইয়া নিজের হস্তে সেই অপমানের প্রতিকার করিবার শক্তি যদি তোমার ঐ সবল বাহু দুটিতে না থাকে তবে ধূলায় পতিত ...নের করুণ কাতরোক্তি কেহ গ্রাহ্যই করিবে না। ...দি স্বদেশে বিদেশে ভারতবর্ষের গৌরব প্রতিপন্ন করিতে চাও, তবে সব রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দাও, সকল সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছিন্ন কর, সত্যের জ্যোতিঃর দিকে মুখ ফিরাও। কাহারও উন্নতি পথে বাধা দিও না। যে ...ঠিতে চাহিতেছে তোমার সুদৃঢ় বাহুতে যদি বল থাকে তাহার দুর্ব্বল হাত দুখানা ধরিয়া তোল। তোমার ঐ অবনত ভাইকে বলিও না, জ্ঞানভাণ্ডার তোমার জন্য উন্মুক্ত নহে, উন্নত আকাঙ্খা তোমার ...ন্তরে স্থান পাইবার যোগ্য নহে, সত্যকে জানিবার তোমার অধিকার নাই। এই যে রেখা কাটিয়া দিলাম, ইহার মধ্যে যাহারা থাকিবে, কেবল তাহারাই উন্নতির অধিকারী হইয়া দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিরকালই গণ্য হইবে। নারীকে বলিও না, সংসার চালাইবার উপযোগী যেটুকু হিসাবের প্রয়োজন, যেটুকু জ্ঞানের দরকার শিক্ষার সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তোমার স্থান। ইহার বেশী চাহিও না। মানব যে নব নব জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে জগতকে উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে, সত্যের জন্য যে মহান্ আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্তে নরনারী মহিমাময় হইতেছে, তাহার শিক্ষা গ্রহণ করিও না। তোমার স্থান ঐ ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্র জ্ঞানের মধ্যে, ঐ ক্ষুদ্র স্থানে বাসই তোমার জীবনের সার্থকতা।

বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগকেও সামান্য শিক্ষা দিবার জন্য যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, তেমনি বিধাতার দেওয়া এই সংসারকে উত্তমরূপে চালাইতে হইলে নারীর কেবল ক্ষুদ্র জ্ঞান, সঙ্কীর্ণ আদর্শ, মলিন দৃষ্টি থাকিলে চলিবে না। এই সংসার পরিচালনে যে ভগবৎ বিশ্বাস, যে সংযম, যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, যে ধৈর্য্য, যে বিশাল জ্ঞান প্রয়োজন, তাহা ঐ হীন আদর্শ দ্বারা সিদ্ধ হইবে না। বিধাতার অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, মিথ্যা সংস্কার হইতে তাঁহার অন্তরকে মুক্ত করিতে সাহায্য কর, অনন্ত, উদার, সার্ব্বজনীন, আধ্যাত্মিক আদর্শ তাঁহার সম্মুখে স্থাপন কর। তাঁহার জীবনের এই মহৎ লক্ষ্য হউক—যাহাতে তাঁহার সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস, মানবে প্রেম, চরিত্রে সংযম, কর্ত্তব্য কার্য্যে দৃঢ়তা হয়। সঙ্কীর্ণতা মিথ্যার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া তাঁহার উন্নতি পথে পাষাণ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিও না। তাঁহার আত্মার স্বাধীনতা হরণ করিয়া লইয়া তাঁহার আত্মাকে বিকলাঙ্গ খর্ব্ব করিয়া তুলিতেছ বলিয়াই ভীরু, কাপুরুষ, অমানুষে দেশ ভরিয়া যাইতেছে। দাও, নারীকে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা দাও, মহত্ত্বের প্রাণমাতান ভাবে তাঁহাকে অনুপ্রাণিত কর, বৈরাগ্যের আদর্শে তাঁহাকে দীক্ষিত কর। তুমি জাননা ত, তাঁহাকে কোন্ যুধিষ্ঠির যাজ্ঞবল্ক্য, কোন্

গার্গী মৈত্রেয়ী, কোন্ ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডী, কোন্ রাজা রামমোহন বিদ্যাসাগরের জননী হইতে হইবে। অবনত ভাই ভগিনীকে বল, উঠ, উঠ, এই আমি তোমার হাতখানা ধরিলাম আর পড়িয়া থাকিও না। জগতের সর্ব্ব প্রকার উন্নতির দ্বার তোমার জন্য খোলা রহিয়াছে।

যদি জগতে বাঁচিতে চাই, তবে সকলকে বক্ষে ধরিয়া ঐ অনন্তের পথে ছুটিতে হইবে। সত্যম্‌কে ভুলিয়া, অনন্তম্‌কে হারাইয়া আমাদের অন্তর দেবতা মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে জাগাইতে হইলে আত্ম-বিসর্জ্জনের যে মহা যজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে, তাহার সমিধ রাশি যোগাইবার ভার, হে তরুণ তাপস, তোমাদেরই উপর ন্যস্ত আছে। তোমাদের তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ভারত আবার তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী হউক।

"বল, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ,
স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হ'তে, সে কখনো
শেখেনি বাঁচিতে,
মহা বিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে
নাচিতে নাচিতে,
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে
করিয়া ধ্রুবতারা।

* * * * *

সম্মুখে দাঁড়াতে হবে
উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই
লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক!"

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে স্বরে মহান্ পরমেশ্বরের স্তোত্র গীতি গাহিয়া ভারতাকাশ মুখরিত করিয়া তুলিতেন, আজি আবার সেই উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হইতেছে শুন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রতপ্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

হে জীবগণ, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে উত্থান কর জাগ্রত হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া পরমাত্মাকে জ্ঞাত হও। *

* গত ১৭ই মাঘ ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত।

প্রেম—পরিণামে।

১

হিসাং-দ্বেষ, ঘৃণা-দ্বন্দ্ব আদি—
পরিণামে কিছু না রহিবে;
সদানন্দ-প্রেম-পদে সবে
আপনায় মিশাইয়া দিবে!

২

অবহেলে জীবন মৃত্যুরে;
মৃত্যু করে ভ্রূকুটি জীবনে;
ঘৃণা-হিংসা ভুলি' শেষে দোঁহে
বদ্ধ হয় প্রেম-আলিঙ্গনে!—
জীবন মৃত্যুরে করে প্রেমে—
আত্ম-সমর্পণ!
প্রতিদানে, মুগ্ধ মৃত্যু করে—
জীবনে নূতন!

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

ধ্রুব-লক্ষ্য।

জীবনের লক্ষ্য ওগো! ওগো মোর প্রিয় ধ্রুবতারা!
কত দূরে রহি তুমি ঢাল নিত্য স্নিগ্ধ রশ্মি-ধারা!
ব্যাকুল হৃদয় মোর! অবিশ্রাম দ্রুত ছুটে যায়!
কোন্ মহা শুভক্ষণে তোমারে বিলাবে আপনায়!

কখন শৈশবে তুমি উদেছিলে মোর চিদাকাশে
জ্যোতির্ম্ময় অন্ত-হীন! পূর্ণ প্রাণ মদির উল্লাসে!
তোমারে বাসিনু ভাল! মনে হল তুমি যে আমার!
জন্ম-জন্মান্তের ধ্যেয়—আশীর্ব্বাদ মহা দেবতার!

পাশরিনু বসুন্ধরা! পাশরিনু ক্ষুদ্রত্ব আপন!
তুমি যার ধ্রুব-লক্ষ্য সেত কভু নহে অকিঞ্চন!
রাখে না সে আশা কিছু—জানে না সে অন্য সাধ আর—
তুমি শুধু ধরা দিবে—ভকতেরে নিবে উপহার!

এ সাধ এ আশা মোর জানি সত্য হবে না বিফল,
লভিতেই হবে তোমা—মুছিতেই হবে আঁখি-জল!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

পুরাতন পল্লীচিত্র।

চিত্রখানি কেবল পুরাতন নহে,—অদৃশ্য; যে বর্ণে গন্ধে সুখ প্রীতিতে তাহা বিজড়িত ছিল, তাহা কাহিনীতে মাত্র পরিণত। চিত্রখানি যাহাদের লইয়া তাহারা ক্ষীণ-সমষ্টি ও অস্তনদীর তীরে দণ্ডায়মান; দুদিন পরে এ চিত্রখানির প্রমাণ নির্ব্বাক প্রস্তর মূর্ত্তির বাক চেষ্টার ন্যায় নিষ্ফল প্রতীয়মান হইবে। চিত্রখানি যে স্থানে ছিল, তাহার ছায়াস্নিগ্ধ শীতল কুঞ্জবন হইতে তৃপ্তির ধারা প্রবাহিত হইত—লুব্ধ হইয়া তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাহা একান্তই শুষ্ক ও প্রখর রৌদ্রজ্বরে শীর্ণ ও ক্ষুধিত। এরূপ শুষ্ক চিত্রটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা মাত্রই মূঢ়তা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু বিলাস ভবনের দেয়ালে একটী অতীত চিত্রের ক্ষীণ পরিচয় ঝুলাইয়া রাখিলে তাহা আনন্দ দান না করিলেও অতীত বলিয়া কথঞ্চিৎ কৌতুহল বাড়াইতে পারে, এবং চিত্রের বর্ণপটের মধ্য দিয়া দেখিলে আমাদের দেশের প্রাচীন জীবনের উৎস রেখার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে লাভ কি ক্ষতি হইবে, উন্নতি কি অবনতি হইবে তাহার বিচার করিবার স্থান এ নহে;—তবে পরিবর্ত্তনের স্রোত জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবাহিত হয়, তাহার গতি কেহ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে না। কিন্তু উন্নতি অবনতির পরিচয় জাতি মাত্রকেই দিতে হয়; কাজেই পুরাতন চিত্রগুলি কেবল মাত্র কৌতুহলের সামগ্রী নয়, ভাবরাজ্যের বিশ্লেষণের সামগ্রীও বটে।

* * * * *

৫০।৬০ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। তখনও পল্লীগুলি এক একটী আনন্দ নিকেতন ও শান্তির আশ্রম ছিল। চতুর্দ্দিকে ছায়াবন—আম্র, পনস, কদলী, বদরী, গুবাক, নারিকেল, জাম, কালজাম, কামরাঙা প্রভৃতি নানাবৃক্ষ সমাচ্ছন্ন। তাহার মধ্যে শান্তি যেন অলস দেহ ভার এলাইয়া দিয়া গভীর নিদ্রার বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন। বৃক্ষকুঞ্জের কোন নির্জ্জন গুহা হইতে ঘুঘুর করুণ নিঃস্বন বহির্গত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। বসন্ত দিনে আম্রমঞ্জরীর সুগন্ধ বিকীর্ণ হইল, কচি পল্লবজাল দোলাইয়া বায়ু তপ্তদেহ শীতল করিয়া দিল। কোকিল কোন শুভ অবসরের প্রতীক্ষায় এতদিন নীরব ছিল,—পঞ্চম তারে আবার সুর বাজিয়া উঠিল-কু উ-কু উ। শ্রাবণের বারি ধারায় সিক্ত হইয়া পল্লীর চতুর্দ্দিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তর শস্যস্তবকে পূর্ণ হইলে শারদ শশাঙ্ক জ্যোতিতে সমস্ত পল্লী প্রান্তর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

এস আমরা সেদিনের শুভ অবসরে পল্লীর প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী পথের রেখা ধরিয়া শ্যামল শোভায় ঢাকা পল্লী নিকুঞ্জের মধ্যে গমন করি।

পল্লীর অভ্যন্তরে বহু পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকা,—জল স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ। পল্লীর গৃহ সংখ্যা হইতে পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকার সংখ্যা অনেকস্থলে অধিক দৃষ্ট হয়। পুণ্য কামনায় এ পুষ্করিণীগুলির প্রতিষ্ঠা, কাজেই বংশ-পরম্পরায় এগুলির সংখ্যাও বর্দ্ধিত হইয়া যাইত। পুষ্করিণীগুলির নামও বিভিন্ন, যথা—ঠাকুরাণীর পুষ্করিণী, রাম রায়ের দীঘি, উদয় রায়ের দীঘি, বিন্দি-দাসীর পুষ্করিণী,—প্রতিষ্ঠা কর্ত্তার নামেই এ গুলির নামকরণ হইয়াছে। আবার কতগুলি পুষ্করিণীর অদ্ভুত নামও শোনা যায়—যেমন, ছাপরবন্ধের পুকুর, লালদীঘি, গলাচিপা দীঘি, পত্নীশের দীঘি (পত্র নবিশ, নির্ম্মাণ কর্ত্তার পদবী) ইত্যাদি।

পল্লীর সর্ব্বত্র সন্তোষ এবং আনন্দ যেন মূর্ত্তিমান।

সৌহৃদ্য ও সন্তোষ।

প্রতি বাড়ীতে গোয়াল ভরা গাই—গৃহকর্ত্তা ও গৃহলক্ষ্মীদের অজস্র স্নেহের অধিকারী। গো বিড়াল প্রভৃতি জন্তুর পরিচর্য্যা হইতে গৃহ দেবতার পূজা পর্য্যন্ত তাঁহারা সমান উৎসাহ ও সন্তোষ সহকারে সম্পন্ন করেন। গৃহলক্ষ্মীগণ যেন মূর্ত্তিমতী করুণা,—তাঁহারা

শেষ রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পারিবারিক গৃহকর্ম্মাদি, অতিথি অভ্যাগত আত্মীয় পরিজনের সেবা শুশ্রূষা, দুঃখী ভিখারী বৈষ্ণব সকলকে সাহায্য প্রদান, পুত্রকন্যাদের যথারীতি প্রতিপালন, গৃহদেবতার আচার নিষ্ঠা পূজা অর্চ্চনা ইত্যাদি নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। গৃহ ধর্ম্মের পবিত্রতা ও শান্তি সেকালে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হইত না; তাহার শীতল ছায়ার তলে মানব জীবনে স্বভাবতঃই কোমলতা, সহৃদয়তা, পরদুঃখকাতরতা ও গভীর আত্মত্যাগের ভাব অঙ্কুরিত হইত, কাজেই ঐক্য, বন্ধনের দৃঢ় ব্যবস্থার মধ্যে প্রীতির অক্ষয় রস সঞ্চিত থাকিত। তখন লোকের মনের মধ্যে আত্মত্যাগের মহৎ ভাব বড় আকার ধারণ করিয়াছিল; সেজন্য স্বীয় সুখ চেষ্টা, দশজনকে বঞ্চনের চেষ্টা মনের ত্রিসীমানার মধ্যে অতি অল্পই আসিত। গৃহলক্ষ্মীগণ জানিতেন পরোপকার ও দশজনের সেবা শুশ্রূষাই তাঁহাদের প্রকৃত ধর্ম্ম; কাজেই পারিবারিক ব্যবস্থাও তাঁহারা প্রাণ দিয়া সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা পরিবারের ভিতরে যে সুকোমল পরিতৃপ্তি বর্ষণ করিতেন, তাহা দ্বারা গৃহ সমাজের সকলে সুখভোগ করিত। তাঁহারা কেবল রাঁধিতেন ও গৃহ কার্য্য করিতেন এমন নহে,—অন্নপূর্ণার মত দুর্লভ আনন্দধারাও বিতরণ করিতেন। রমণী গৃহে লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা; মাতৃ-গৌরবে ঐশ্বর্য্যময়ী ভগবতী; তিনি একাধারে সমস্ত আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। তিনি করুণাময়ী মা, প্রতিপালিকা ধাত্রী, পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী ও দীন দুঃখীজনের পক্ষে মূর্ত্তিমতী করুণা।

তৎকালে মহিলারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতেন,—বৃদ্ধা, গৃহিণী, বধূ ও কন্যা।

বৃদ্ধাদের তখন অসামান্য সম্মান ছিল। পাকা চুলের সঙ্গে সমস্ত জাতিভেদ, এমন কি প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ পর্য্যন্ত দূর হইয়া যাইত। বর্ত্তমান কালের নবীনা গৃহিণীরা এ কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই হাসিবেন, কিন্তু সে সব দিনে পল্লীর সমস্ত নবীন, এমন কি প্রৌঢ়া গৃহিণীরা পর্য্যন্ত বৃদ্ধা দাসীর ভয়ে যে প্রকার জড়সড় থাকিতেন, আজকাল জজের সম্মুখে দুর্দ্দান্ত আসামীও ততদূর ভয়গ্রস্ত হয় না। বৃদ্ধা দাসী কি বলিবে এই ভয়ে গৃহিণীদের পান থেকে চূন টুকু খসিবার জো ছিল না। বৃদ্ধা দাসী আসিয়া দেখিয়া ফেলিবে বলিয়া তাঁহারা সকল কাজই অতি সতর্ক ভাবে সম্পন্ন করিতেন এমন কি স্বীয় আহার্য্য দ্রব্য পর্য্যন্ত গোপনে আহার করিতেন। যদি কোন গৃহিণীর ভুল চুক বা পারিবারিক কর্ত্তব্যের ত্রুটী বৃদ্ধা দাসীর চক্ষে পড়িত তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না।

“কি গো খোকার মা, ছেলেটা কাঁদছে আর তুমি এখানে বসে?” কিংবা “কি গো তোমার রান্না হয় নাই ছেলেরা খাবে কখন?”—দাসী এইরূপ একটা ভূমিকা করিয়া গৃহিণীকে তিরস্কারের চোটে চোখের জলে নাকের জলে এক করিত।

বৃদ্ধা দাসী যে কেবল শাসনেই প্রবলা ছিল এমন নহে,—তাহার স্নেহের কথা গুণের কথা বলিতে গিয়া আজও বৃদ্ধা গৃহিণীদের চক্ষে জল আসে। তাঁহারা বলেন, আজকাল আর সেরূপ লোক হয় না, যাহারা পরের জন্য প্রাণ দিতে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত।

অনেক দুর্লভ দ্রব্য গৃহিণীরা দাসীর দ্বারাই পাইতেন। সকল বাড়ীর ভাঁড়ার ঘর নানা প্রকার শাক সব্জীতে পূর্ণ থাকে এই চেষ্টায় দাসীর অবসর থাকিত না। তখনকার দিনে জঙ্গলে নানা প্রকার সুস্বাদু শাক পাতা ওল জন্মাইত, পল্লীবাসীরা তাহা অতি আনন্দ সহকারে আহার করিত। দাসী সে সমস্ত দ্রব্য অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া গৃহিণীদের হাতে দিত।

যদি কোন বধূর দুঃখ দাসীর কর্ণগোচর হইত তবে বৃদ্ধা দাসী ‘বউর’ স্বামী বা অভিভাবককে এমন ভাবে শাসাইয়া আসিত যে দ্বিতীয় বার আর তাঁহারা এমন কার্য্য করিতে সাহসী হইতেন না। এই সমস্ত দাসীর প্রভূত পরাক্রমের কথা আজকাল বৃদ্ধারা সবিস্তারে বলিয়া থাকেন।

অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত তেল পোড়াইয়া কোন গৃহিণীই আঁধার রাত্রি আলো করিতে সাহসী হইতেন না, কারণ দৈবাৎ বৃদ্ধা দাসীর নয়নগোচর হইলে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত। ৮০ বৎসর বয়সেও

দাসীর দৃষ্টিশক্তির প্রখরতার হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই দেখিয়া গৃহিণীরা আক্ষেপ করিতেন। সকল গৃহিণীই দাসীকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন; বিপদে আপদে, সেবা শুশ্রূষায় বৃদ্ধা দাসীর মত অক্লান্ত পরিশ্রমী তাঁহারা কাহাকেও পাইতেন না। সকল বাড়ীরই সুখশান্তি পরিবর্দ্ধনের নিমিত্ত দাসীর সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টি ছিল। বুড়ীকে লইয়া গৃহিণীরা আমোদ আহ্লাদ করিতেন, আবার ভয় ও করিতেন। ভয় টুকু কর্ত্তব্য ত্রুটীর জন্যই বেশী।

এখন পর্য্যন্ত বলাই হয় নাই বৃদ্ধা দাসীরা কোন্ বাড়ীতে চাকরী করিত। তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে চাকরী করিত না. সকল বাড়ীর গৃহকার্য্যই তাহারা সম্পন্ন করিয়া দিত, কিন্তু কোন বাড়ী হইতেই পারিশ্রমিক বাবদ বেতন গ্রহণ করিত না।

এই সমস্ত দাসীরা জীবনের প্রথম অবস্থায় বৈধব্য দশায় পড়িয়া পল্লীর কোন বাড়ীতে দাসী বৃত্তি গ্রহণ করিত অথবা কোন পল্লীবাসী চাকরীর জন্য যখন বিদেশে যাইয়া অবস্থান করিত. তখন কোন বিদেশিনী অনাথা তাঁহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিত। এই সকল পল্লীবাসী যখন প্রৌঢ়াবস্থায় পল্লীবাসে পুনঃ প্রত্যাগত হইতেন, তখন স্নেহ মুগ্ধ দাসীও স্বজন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গী হইত।

দাসীও তৎকালে পরিবারের আপনার জন বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রায়ই গৃহস্থ অন্তিম যাত্রার পূর্ব্বে এই দাসীদিগকে তাহাদের জীবনোপায়ের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা জমী ও বাসস্থানের ঘর ইত্যাদি প্রদান করিয়া যাইতেন। তদ্দ্বারাই দাসীর জীবনোপায় স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। এই সমস্ত দাসীরাই পল্লীর সকল গৃহে কাজ কর্ম্ম করিত, তজ্জন্য কোন অর্থ দিতে গেলেও তাহারা বিরক্তি সহকারে তাহা প্রত্যাখ্যান করিত।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সকলের কাছেই আদর ছিল। তাহারা ছুটাছুটি লাফালাফি করিয়া বেড়াইত, তাহাদের দোষ ধরিবার কেহ ছিল না; সতেজ আনন্দ মূর্ত্তি; সকলের আনন্দ কোলই তাহাদের জন্য প্রসারিত থাকিত। কিন্তু ১০।১২ বৎসর বয়সে মেয়েরা যখন বধূ হইয়া উঠিত, তখন শ্বশুর-বাড়ীতে তাহাদিগকে বড় সাবধানে সতর্ক হইয়া চলিতে হইত। কিন্তু দাদাশ্বশুর ও বৃদ্ধা শাশুড়ী প্রভৃতি সকলে বালিকা বধূকে অনেক সময় কোলে লইয়া আপনার মেয়েটীর মত আদর করিতেন। দাদাশ্বশুরের সঙ্গে খেলা তৎকালে বধূদের বিশেষ লোভনীয় ও প্রীতির সামগ্রী ছিল।

বালিকারা বৃদ্ধাদের সঙ্গে মিলিয়া নানা রকম ব্রত করিত, তাহাদের নিজেদেরও অনেক রকম ব্রত ছিল,—সেগুলি অফুরন্ত; সপ্তাহে দুই চারিদিন এই প্রকার ব্রত হইত।

পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে সদ্ভাব যে কি তাহা সেই সব দিনের লোকেরাই জানিতেন। আজকাল সে প্রকার সৌহৃদ্য এক প্রকার অজ্ঞাত; এখন লোকে তাহা ভাবিতেও পারে না। কোন পল্লীগ্রামে এখনও তাহার ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান আছে।

পাড়া পড়শীদের মধ্যে দ্রব্য সামগ্রীর আদান প্রদান চলিত। ছোট ছোট মেয়েরা কোন জিনিস অন্য বাড়ীর গৃহিণীদের দিয়া বলিত—মা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। অনেক সময় দরিদ্র প্রতিবেশীর নানা জিনিসের সংস্থান প্রতি বাড়ী বাড়ী হইতেই হইত। কোন বাড়ীতে কোন জিনিসের অসংস্থান হইলে বলিবার পূর্ব্বেই তাহার গৃহে সে দ্রব্য আসিয়া পৌঁছিত।

স্নানের ঘাটে গৃহিণীদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইত। তখন তাঁহারা পরস্পরের রন্ধন দ্রব্যের তালিকা লইতেন। যদি কাহারও ঠিক পুরাপুরি রান্না না হইত, তবে সকলেই তাহাকে অনুযোগ দিয়া বলিত—কি গো একটু বলে পাঠালেই ত হতো। সেই দিন প্রত্যেকের বাড়ী হইতে প্রচুর দ্রব্য যাইয়া তাহার ঘর পূর্ণ করিত।

বৃদ্ধেরা ছোট ছোট মেয়েদের ধরিয়া বলিতেন, বল্ তো তোর মা আজ কি কি রান্না করেছে—এই ভাবে তাঁহারা সকল বাড়ীর রন্ধনশালার খোঁজ লইতেন। কোন বাড়ীতে দ্রব্যাদির অনাটন না হয়, সেজন্য সকলেরই দৃষ্টি ছিল।

তখন একটী পল্লী একটী সংবদ্ধ পরিবার বলিয়াই মনে হইত। পল্লীর কোন গৃহে কোন নূতন দ্রব্য আসিলে প্রতি বাড়ীতেই তাহার অংশ ভাগ করিয়া দেওয়া হইত।

বৃদ্ধা বিধবাদের প্রসাদ চতুর্দ্দিকে বিতরিত হইত। সর্ব্বদাই দু চারজন বুড়ি মায়ের প্রসাদ ভিখারী হইত। কেহ হয়ত বলিল—বুড়ি মা, তোমার পাতের প্রসাদ অনেক দিন খাই নাই। "তবে একটু বোস" বলিয়া বৃদ্ধা তাহাকে আশ্বস্ত করিতেন। বুড়ি মার প্রসাদভিখারী অনেক জুটিত বলিয়া বুড়ি মা পূর্ব্বেই প্রস্তুত থাকিতেন।

অনেক নিম্ন শ্রেণীর লোক বুড়ি মার দুয়ারে আসিয়া বসিত। হা বুড়ি মা, এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার পাতের প্রসাদ না খেলে আমার ব্যায়রাম সারবে না। বস্তুতঃই বুড়ি মার প্রসাদের মধ্যে রোগারোগ্যের অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে বলিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই ঔষধ বিতরণের ফলে বুড়ি মার বিশেষ ক্ষতি ছিল বলা যায় না,—কারণ আরোগ্যের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হইয়া যাইত, বুড়ি মার উঠানও নানা প্রকার শাক সব্জীতে ভরিয়া উঠিত, তাহা সকল বাড়ীতে বিলাইলেও ফুরাইত না।

তখনকার দিনে মহিলারা নানা বিষয়ে ছড়া রচনা করিতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। সেগুলি বহুদিন পল্লীভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিয়া আনন্দ ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করিত। এই সকল ছড়া হইতে কোন্ গোয়ালা দুধে জল মিশাইত এবং পাতলা দৈ সস্তা দরে বিক্রয় করিত তাহার ইতিহাসও জানা যায়। দৈবাৎ রাঙামাটীর পিচ্ছল রাস্তায় পড়িয়া তাহার ঠ্যাং ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

এ সব ছড়ায় হাস্যরস উছলিয়া উঠিত; ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্র নিষ্ঠুরতা বা অসহৃদয়তা ছিল না।

গোয়ালা দাদা খাঁটি মানুষ
দুধে মিশায় জল।
গোয়ালা দাদার পাতলা দৈ
করে টল মল॥
বৃষ্টি পড়ে রাঙা মাটীর
পিছ্‌লে হলো পথ।
দুধের কাঁড়ি কাঁধে করি
নিয়ে আপন রথ॥
পায়ের পাতা পিছ্‌লে গেল
দুরুম করে কি?
গোয়ালা দাদা উল্‌টে পড়ে
মাথায় মাখে ঘি॥
ষাট ষাট গোয়ালা দাদা.........ইত্যাদি।

গোয়ালা দাদা কিন্তু দৈ লইয়া প্রতিদিনই হাজির হইত। কোন বাড়ীর মাসীকে, কোন বাড়ীর পিসিকে, কোন বাড়ীর ঠাকুরদিদিকে দৈ দিয়া যাইত, দুধ বড় কেউ রাখিত না, কারণ প্রতি বাড়ীর গোশালাই গরুতে পূর্ণ ছিল। তবু পল্লীবাসীরা দইর ব্যাপারটা গোয়ালার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত। পল্লীবাসীরা আপন গোয়ালের গায়ের দুধ দধিতে পরিবর্ত্তিত করিত না; বোধ হয় ইহাতে তাহারা কোন কুসংস্কারের বশবর্ত্তী ছিল। গোয়ালা দৈয়ের পরিবর্ত্তে যে অর্থ গ্রহণ করিত তাহা নহে, অধিকাংশ সময়ই তাহারা ধান, চাউল, সুপারী কিংবা অন্য কোন গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিনিময়ে দৈ দিত।

আহার ও রাত্রিতে শয়নের সময় ব্যতীত বাড়ীর কর্ত্তারা বড় বাড়ীর ভিতর আসিতেন না, দিবাভাগ তাঁহারা বহির্ব্বাটীতেই কাটাইতেন; কাজেই অন্তঃপুরে মহিলারাই একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেন।

প্রৌঢ়া হইয়াও গৃহিণীরা বধূত্বের অবগুণ্ঠন ঘুচাইতে চাহিতেন না, তদপেক্ষা কোন বর্ষীয়সী মহিলা,—বয়সে কিম্বা সম্মানে—উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অবগুণ্ঠন দীর্ঘ হইয়া পড়িত। অবগুণ্ঠন প্রদান সম্মান প্রদর্শনের একটা অঙ্গ ছিল।

অন্তঃপুরে গৃহিণীদের স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব পুরুষের দ্বারা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না, কারণ তাঁহারা জানিতেন, অন্তঃপুরে মহিলারাই একমাত্র কর্ত্রী, পুরুষদিগের ব্যবস্থা সেখানে খাটাইতে গেলে গৃহের পরিপূর্ণ শান্তি ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা; অচঞ্চলা লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ অধিকারই সেখানে একান্ত প্রয়োজন।

সে সব দিনে বাঘের সঙ্গে মানুষের বড় একটা সম্প্রীতি ছিল। একটা বাঘ শারীরিক বলে একটা মানুষ অপেক্ষাও হীন ছিল!

দৈহিক সবলতা।

কাজেই বাঘ অনেক সময় পালের গরু ছাগল কিংবা গোয়াল ভাঙ্গিয়া গরু চুরি করিয়া আহারের যোগাড় দেখিত, কিন্তু তাহাতেও বাঘের নিস্তার ছিল না, অর্দ্ধভুক্ত গরু বাঘের মুখ হইতে ছিনাইয়া আনিতে কোন লোকই পরাঙ্মুখ হইত না। ইহার বহু গল্প আজ পর্য্যন্ত শোনা যায়। বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ মানুষের একটা স্বাভাবিক কাজ ছিল। সে সব দিনে অরণ্য সমাকীর্ণ রাস্তায় পথিক গলার 'হেকর' দিয়া বাঘকে পথ ছাড়া হইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে অনুজ্ঞা করিত। বাঙ্গালী বলশালী নহে ও ভীরু এ অপবাদ সে সব দিনে নিতান্তই অদ্ভূত শুনাইত।

সে সব দিনে বাঙ্গালী অঙ্গরাগরূপে কি ব্যবহার করিতেন, তাহার সংবাদ আজকালের বিলাস প্লাবিত দিনে নিতান্ত কৌতুহলের সামগ্রী

অঙ্গরাগ।

হইতে পারে। সেকালে রমণীরা সবিশেষ প্রসাধন প্রিয় ছিলেন; অঙ্গরাগ রূপেও তাঁহারা নানা দ্রব্য ব্যবহার করিতেন; কিন্তু কোনটীই বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিপুষ্টি কামনা করিত না. সকলগুলিই তাঁহারা গৃহের আশে পাশে হইতে সংগ্রহ করিতেন। তৎকালে গৃহিণীরা রন্ধনাদি গৃহকার্য্যে যেরূপ নিপুণা ছিলেন, শরীরের যত্নেও তাঁহাদের সেইরূপ মনোযোগ ছিল। বেশবিন্যাস ও অঙ্গরাগের সুনিপুণ পদ্ধতি মহিলা মাত্রই অবগত ছিলেন।

কেশপাশের সুন্দর সুনিপুণ রচনা তৎকালে যে প্রকার প্রচলিত ছিল, অধুনা তাহার এক দশমাংশও পরিলক্ষিত হয় না। সেকালে লোকের মনের মধ্যে প্রকৃত আনন্দ ছিল, আজকালের কৃত্রিম আনন্দ নহে,—আজকালের হাস্যবিকশিত দন্তপংক্তি দেখিলে প্রাণে গভীর আনন্দের উচ্ছ্বাস না হইয়া কেমন আকস্মিক ভীতির পরিচয় প্রদান করে। তৎকালে রমণীদের মধ্যে প্রসাধনপ্রিয়তা খুব বেশী ছিল, তাহাও তাঁহাদের সহজ আনন্দ পূর্ণ হৃদয়ের পরিচয়; কিন্তু কোনটীই মূল্যবান ছিল না এবং অধিকাংশগুলিই অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে হইত না;—কাজেই সেই প্রসাধন ফলে স্বামী দেবতাটীর ভিটে মাটি উচ্ছন্ন যাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তৎকালে পুরুষেরা তাঁহাদের অঙ্গরাগ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন; সেইজন্য মহিলারাও বেশবিন্যাসে যত্নবতী ছিলেন। এখন চিন্তাক্লিষ্ট স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কোন প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, কাজেই স্ত্রীকে প্রসাধন ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, কোন প্রকারে সেগুলি তাঁহাদিগকে ছাড়াইতে পারিলে তাঁহার অর্থ সঙ্কটের কঠোরতা বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে পারে।

তৎকালে পল্লীগ্রামে সাবান আসিয়া দেখা দিয়াছে মাত্র। চর্ব্বি মিশ্রিত বলিয়া অনেকেই তাহা স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেন না। হরিদ্রা কুঙ্কুম তৈল দিয়া তাঁহারা অঙ্গের ময়লা দূর করিতেন, এবং আমলকি বা খিলা বাটা দিয়া কেশ পাশ ধৌত ও পরিষ্কৃত করিতেন। খৈলচূর্ণ ও রাঙা মাটী দিয়া ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কেশপাশ ধৌত ও পরিস্কৃত করিত। তখন পল্লী মহিলারা হস্ত ও পদ মেহেদি দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া রঙ্গীন এবং মাথাঘসা, আমলা ও মেথি দ্বারা কেশতৈল সুরভিত করিতেন। উশীর এবং অগুরু তাঁহাদের প্রিয় সুগন্ধি দ্রব্য ছিল; প্রিয়জন সমাগমে তাঁহারা এ দুটীর সমধিক আদর করিতেন। দেহ সৌষ্ঠবের প্রভাবে মহিলাদের শ্রী ও কান্তি দুই উজ্জ্বল ছিল, তাঁহাদের ভালে ও সিমন্তে সিন্দূর বিন্দু গৃহলক্ষ্মীর উদার জ্যোতিঃ বিকশিত করিত। বৃদ্ধা হইয়াও গৃহিণীদের সিমন্তে সিন্দূর পরিবার সাধ বিদূরিত হইত না,—কারণ তাহা কল্যাণের একটী চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত।

সে সব দিনে নানা প্রকার সাড়ীর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। দেশের জোলা তাঁতিরা অতি উৎকৃষ্ট সাড়ি তৈয়ার করিতে পারিত, নানা ছিটের

সাড়ীরই সমধিক আদর ছিল; তদ্ব্যতীত বাণারসী সাড়ী অতি মুল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত।

কেশপাশের জন্য মহিলা মাত্রেরই আন্তরিক যত্ন ছিল; পদতল চুম্বিত কুঞ্চিত কেশপাশ তৎকালে সৌভাগ্যের পরিচায়ক ছিল। খাটো কেশপাশ নিতান্ত শ্রীহীন ও দুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিত। সেদিনে সকলেরই দন্তমূল দৃঢ় ও শুভ্র ছিল; বৃদ্ধ বয়সেও তাহাদের দাঁতের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকিত। দাঁতের জন্য দাঁতন ও নানা প্রকার মাজন ও প্রচলিত ছিল।

অলঙ্কার।

মহিলা মাত্রকেই অলঙ্কার বহনের কষ্ট সহ্য করিতে হইত, ওজনে ভারি অলঙ্কারই সম্ভ্রমের পরিচয় দিত। অলঙ্কারের ভার সে সব দিনে বড় গুরুতর ছিল, কিন্তু অলঙ্কার প্রিয়তার জন্যই বোধ হয় সে ভার তাঁহাদের নিকট অকিঞ্চিৎকর মনে হইত। আজকাল বিহার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায়। পায়ের মলে 'গোচ্ছা গোচ্ছা' আঙুরী গোটা থাকে, অল্প বয়স্ক মহিলারা সেই সমস্ত মল পায়ে দিয়া অতি কষ্টে পা উত্তোলন করিতে সমর্থ হন। অলঙ্কারের একটা তালিকা প্রদত্ত হইল। গলায়—হার দোসুতি, তেসুতি মতিহেম, চন্দ্রহার কণ্ঠমালা; নাসায়—বেশর, নাকফুল, নথ, করেতে—কঙ্কন, বাজুবন্দ, ছড়া টার বাউলী; কটিতে—কিঙ্কিণী, পেঁচ; পদাগ্রে—পাসুলি ঝাঁপাঝুরি; কর্ণে—কাণফুল মাকড়ী—এগুলি ছিল পোষাকী গহনা, বিবাহোপলক্ষ্যে কোন কাজকর্ম্ম বা উৎসব আনন্দে ও আত্মীয় গৃহে গমন উপলক্ষ্যে এগুলি পরিধান করিয়া যাইতেন।

মহিলা মাত্রেই হস্তে শাঁখা পরিধান করিতেন, শাঁখা পবিত্র ও কল্যাণের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত। উল্কি পরিধান তৎকালে একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু টিপের স্থানে উল্কি পরিধান করিলে কি প্রকার মনোরম দেখায় আধুনিক নব্যা গৃহিণীদের অনেকেই তাহা অবগত নহেন।

নয়নে কজ্জল পরাও তৎকালে বেশী প্রচলিত ছিল না। জননীরা শিশুদের নয়নেই কজ্জল পরাইতেন। *

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

* বাংলার প্রবীন সুলেখক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় তদীয় "পল্লীচিত্র" ও "পল্লীবৈচিত্র্য নামক গ্রন্থদ্বয়ে বাংলা দেশের অনেক হারাণ-কথা ও পল্লীমাধুর্য্যের রস চিত্রগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গদেশবাসী মাত্রকেই কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন,—তাঁহার এই চেষ্টা ও কৃতিত্ব বাংলার ভাণ্ডারে চিরকাল অমর ও অক্ষয় হইয়া থাকিবে,—তাহা নিঃসন্দেহ।

আমি বাংলার পল্লীর দু চারিটী মাত্র পুরাণ কথা, যাহা আমাদের পল্লী বৃদ্ধাদের মুখে বহুবার শুনিয়াছি,—তাঁহাদের স্বীয় জীবনের কাহিনী—তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। যাহা দীনেন্দ্র বাবুর পুস্তকে স্থান পাইয়াছে তাহা বাদ দিয়া অলিখিত অংশটুকু কথঞ্চিৎ পুরণে অগ্রসর হইয়াছি। আমার মত লেখকের পক্ষে ইহা ধৃষ্টতা হইলেও বৃদ্ধা পল্লীমহিলাদের জীবন মাধুর্য্য ও পরিতৃপ্তি এবং অতীত দিনের সুমঙ্গল ছায়াগুলি—যাহা বিংশ শতাব্দীর সহানুভূতি শূন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার নিষ্ঠুর আলোকে বিলীন হইয়া গিয়াছে—তাহার একটি ক্ষীণ চিত্র অঙ্কিত করিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছে। অক্ষমতা বশতঃ এ কার্য্যে যে ত্রুটি লক্ষিত হইবে, তাহা পাঠকবর্গের নিকট অমার্জ্জনীয় হইবে না ভরসা করি।

উপকরণগুলি সামান্য ও যৎকিঞ্চিৎ, কিন্তু অতীতের শ্রদ্ধার ও প্রীতির সামগ্রী বলিয়া আমার নিকট আদরণীয় হইয়াছে। পাঠকবর্গের নিকট তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ মনে করিব। লেথক।

শশিকলা-স্বয়ম্বর।

(৪)

মহর্ষি ভরদ্বাজ রাজ্যলোলুপ, অধর্ম্মাচারী অধর্ম্ম-যুদ্ধে দক্ষ যুধাজিৎকে স্পষ্টভাষায় বলিলেন, "যদি তোমার ক্ষমতা থাকে,—তাহা হইলে আমার আশ্রম হইতে সপুত্রা রাজনন্দিনী মনোরমাকে লইয়া যাও,—আমি ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে ঘাতকের হস্তে তুলিয়া দিব না।" মহর্ষির এই তেজোগর্ভ স্পষ্টবাক্যে কাপুরুষ যুধাজিৎ ভীত হইয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত এই বিষয় লইয়া অনেক পরামর্শ করিলেন এবং অবশেষে সুদর্শনকে পরিত্যাগ করতঃ অযোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন; গাধিরাজ বিশ্বামিত্রের ন্যায় তিনি ব্রহ্মতেজের সহিত ক্ষাত্র বলের প্রতিযোগিতা করিতে সাহস করিলেন না। রাজপুত্র সুদর্শন মাতার সহিত ঋষির তপোবনে ঋষিকুমারগণের সহিত প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই দুই শক্তিরই রহস্য অবগত ছিলেন। তিনি যৌবনে রাজ্য শাসন এবং প্রজাপালন করিয়া শেষ বয়সে তপোবন আশ্রয় করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের এক বিশেষ সমৃদ্ধ শাখা এই ঋষিরাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে;—অপরদিকে ভরদ্বাজ গোত্রের ব্রাহ্মণগণেরও তিনি আদিপুরুষ। (১) এই পরম জ্ঞানী মহর্ষি রাজকুমার সুদর্শনের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। একাদশ বৎসর বয়সের সময় সুদর্শন যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া (২) ক্ষত্রিয় রাজকুমারের উপযোগী নিখিল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন। শাস্ত্র জ্ঞানের সহিত কুমারের শস্ত্রশিক্ষাও যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহা করিতেও ঋষিশ্রেষ্ঠ ত্রুটি করিলেন না। ইক্ষ্বাকুবংশের অলঙ্কারস্বরূপ দুর্লভরূপ-গুণভূষিত কুমার সুদর্শন সর্ব্ববিধ শিক্ষায় ও সামর্থ্যে বস্তুতঃই অন্বর্থনামা পুরুষ হইয়া উঠিলেন। ক্ষত্রিয় রাজকুমারোচিত বলবীর্য্য এবং ঋষিজনোচিত বিদ্যা, জ্ঞান, সংযম ও তপস্যায় তিনি অনন্যসাধারণ অধিকার লাভ করিলেন। সর্ব্বোপরি ভগবানের শক্তি এবং কৃপার প্রতি তিনি অতিশয় বিশ্বাস এবং ভক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। নিজ জননীর সদৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার তরুণ হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির যে বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন, ক্রমশঃই তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অচিরে শাখাপল্লব ফুলফল-সমন্বিত মহা মহীরূহে পরিণত হইয়া উঠিল। প্রকৃত পক্ষে কুমার সুদর্শন সর্ব্ব প্রকারেই আদর্শ স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

গুণের এমনই প্রভাব যে সে কদাপি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না। অতল সমুদ্রগর্ভে থাকিয়াও মুক্তা প্রবালাদি রত্ন কদাপি আত্মগোপন করিতে পারে না;—মনুষ্যের চেষ্টা যত্ন তাহাকে সর্ব্বদাই লোকসমাজে আনয়ন করতঃ যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত করিতেছে। রাজকুমার সুদর্শনও তদ্রূপ জনসমাগম বিরল তপোবনে বাস করিয়াও সুখ্যাতির প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নানাবিধ অমানুষ গুণগ্রামের ও অলৌকিক রূপ-লাবণ্যের কথা ভারতের নগরে নগরে প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং অনতিকাল পরেই তাঁহাকে শাস্ত্র সম্পদ মুনিজনের আশ্রম পরিত্যাগ করতঃ রাজধানীতে

(১) ঋষি ভরদ্বাজ মহারাজ দুষ্মন্ত পুত্র ভরতের কৃতকপুত্র মহারাজ বিতথ নামে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি একাধারে ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই ছিলেন। মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণে এই অদ্ভুতকর্ম্মা মহাপুরুষের জন্ম ও কর্ম্মের বিবরণ অনুসন্ধেয়।

(২) গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥ মনুসংহিতা, দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৩৬শ শ্লোক।

আগমন করিতে হইল। এইবার আমরা সেই কথাই বলিব।

যে সময়ের কাহিনী আমরা কহিতেছি, সেই সময়ে কাশী প্রদেশে সুবাহু নামে এক মহাবাহু নৃপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। যদিও কাশিরাজের রাজ্যের বিস্তার বিশেষ অধিক ছিল না, অথবা তাঁহার অধীন সৈন্যগণও সংখ্যা অথবা বিক্রমে পৃথিবী জয় করিতে সক্ষম ছিল না,—তথাপি একটি বিষয়ের জন্য কাশী রাজ্য তৎকালে ভারত বিখ্যাত হইয়াছিল। ক্ষীরোদ মহাসাগর মন্থনোদ্ভূতা লোকলোচনানন্দ স্বরূপা সুনীল-গগন-মণ্ডলস্থিতা শশিকলার মত কাশী রাজ্যের রাজদম্পতির অকৃত্রিম প্রেম পারাবার সমুত্থিতা অলৌকিক রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম বিভূষিতা শশিকলা নাম্নী দুহিতাই এই খ্যাতির কারণ। রাজনন্দিনী শশিকলা স্বীয় রূপলাবণ্যে লোকমাতা রমাকে এবং গুণগরিমায় মহামহিমময়ী বাগ্‌দেবীকেও যেন অতিক্রম করিয়াছিলেন। লাবণ্য সরোবর সম্ভূত এই স্বর্ণকমলের সৌন্দর্য্য এবং সৌরভের সুখ্যাতি ভারতের প্রতি নগরে, প্রতি রাজধানীতে এবং রাজান্তঃপুরে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতের কোন্ ভাগ্যবান্ রাজনন্দনের অদৃষ্টে এই জ্যোৎস্নারূপিণী অমৃতময়ী ললনা লাভ ঘটিবে,—তাহার ভাবনায় রাজকুমারগণ দিবারাত্রি চিন্তাসহ থাকিতেন। কুহকিনী আশা সকলেরই কর্ণে সফলতার গীতি গান করিত। ভারদ্বাজ তপোবনে বনবাসী, রাজ্যভ্রষ্ট, অমাত্য দুর্গ কোশবল রহিত, সহায় সম্পত্তিহীন কুমার সুদর্শনও কাশিরাজ তনয়ার অলৌকিক রূপগুণের কথা শুনিলেন। কালের কুটিলগতির বশে তিনি সূর্য্যবংশের অলঙ্কার হইয়াও আজি স্বস্থানচ্যুত;—স্থানচ্যুত ব্যক্তির বা বস্তুর আদর কোথায়? তাই নরলোকে সুদুর্লভ রূপগুণবান সুদর্শন স্বীয় হৃদয়ে এই দুর্লভ নারীরত্ন লাভের আশাকে স্থান দিতে পারিলেন না।

(৫)

রাজনন্দিনী শশিকলা ক্রমশঃ কৈশোর পরিত্যাগ করত যৌবনে পদার্পণ করিলেন। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে আরণ্য প্রকৃতির ন্যায় যৌবনাগমে রাজবালার দেহ এবং মন যুগপৎ পল্লবিত এবং কুসুমিত হইয়া উঠিল। তাঁহার স্বভাবসুন্দর রূপরাশি যৌবনের প্রদত্ত অঙ্গরাগ পাইয়া সহস্রগুণ অধিকতর সুন্দর হইয়া উঠিল। রাজনন্দিনী শশিকলা রূপে কমলার ন্যায় এবং বিদ্যা ও মনস্বিতায় সরস্বতীর তুল্য,—তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে যৌবনের প্রভাবে দেহের সেই রূপ এবং মনের সেই উচ্চভাব আরও বিকসিত, পূর্ণায়ত্তও সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিকালে মানব এবং মানবীর মনে যে অননুভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসিয়া থাকে,—রূপসী এবং বিদুষী শশিকলার হৃদয়ও তাহার প্রভাবের অধীন হইয়া পড়িল। তিনি জীবনের দীর্ঘপথে উপযুক্ত সহচর নির্ব্বাচন করিতে উৎসুক হইলেন।

সেকালে ভারতের নারী নিতান্তই অবরোধ-বাসিনী, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গীর ন্যায় পরাধীনা ছিলেন না। রাজকুলের কুলবালাগণ শৈশবে এবং কৈশোরে হৃদয় মন এবং চরিত্রের উন্নতির একমাত্র হেতুস্বরূপ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ব্যায়াম, মৃগয়া, ক্রীড়া কৌতুক, নৃত্যগীত,—ইত্যাদি সভ্যজনোচিত সমুদায় শিক্ষাই তাঁহারা পাইতেন। মহাকবি কালিদাস স্বীয় অমর কাব্যে তরুণী সহধর্ম্মিণীর যে চারু চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—

"গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলা বিধৌ।"

তাহা বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে। সুপ্রথিত নাম্নী পুণ্যশ্লোকা সাবিত্রী সুভদ্রা রুক্মিণী প্রমুখ মহিলা নিজ চরিত্রে তদানীন্তন আর্য্য নারীর শিক্ষা দীক্ষা, আচার ব্যবহারের সুন্দর নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। রাজকুমারী শশিকলাও সেই ক্ষত্রিয় রাজকন্যা, তাঁহাতেও সাবিত্রী সুভদ্রার ক্ষাত্রতেজ বর্ত্তমান। তিনও তাই মনে মনে স্বাভিপ্রেত বরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সমসাময়িক কালের ভারতের প্রত্যেক রাজপুত্রের রূপগুণের পরিচয় তিনি উত্তম রূপে জানিতেন,—তাই সেই অসংখ্য রাজপুত্রের ম[illegible] তাঁহার ন্যায় নারীরত্নের সমুচিত পুরুষোত্তম এক-জনকেও পাইলেন না। চিন্তায় তাঁহার চিত্ত জর্জ্জর হইতে লাগিল।

কুমারী শশিকলার হৃদয়ের অবস্থা যখন এইরূপ, একদা নিশীথকালে তিনি স্বপ্নে এক আশ্চর্য্য দর্শন করিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন এক অলৌকিক রূপ জ্যোতির প্রভায় তাঁহার গৃহের অত্যুজ্জ্বল রত্ন-দীপ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে,—যেন এক অসামান্য অঙ্গসৌরভে তাঁহার কক্ষের গন্ধাধারে রক্ষিত বিবিধ গন্ধরসের সুগন্ধ এবং চন্দ্রাতপ বিলম্বিত দুর্লভ পুষ্প-মাল্যের সৌরভ নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন- তাঁহার সম্মুখে সহাস্যবদনা সুচারু পঙ্কজ ত্রিনয়না, ষোড়শী অত্যদ্ভুত সৌন্দর্য্য-শালিনী বিবিধ বিচিত্র বেশভূষা সমালঙ্কৃতদেহা এক দিব্যস্ত্রী দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন। সেই অমৃতময়ী দৃষ্টির প্রভাবে তরুণী রাজ-বালার হৃদয়ের তলদেশ পর্য্যন্ত যেন কি এক শান্তিপূর্ণ আরামে ডুবিয়া গেল!—তিনি বিস্ময়াপ্লুত হৃদয়ে শয্যাত্যাগ করত সেই দেবী মূর্ত্তিকে অভিনন্দন করিতে চেষ্টা করিলেন,—কিন্তু কি এক মোহে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিল, সুতরাং তিনি অনন্যোপায় হইয়া কেবল চিত্রার্পিতার ন্যায় সেই দেবীর প্রফুল্ল পদ্মতুল্য মুখমণ্ডলের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। দেবী সেই গৃহের এক ভিত্তির দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করায় রাজকুমারী সবিস্ময়ে দেখিলেন যে তাঁহার গৃহভিত্তিতে বিলম্বিত দীর্ঘ দর্পণের ভিতর এক অদৃষ্টপূর্ব্ব, অলৌকিক,—তাপস যুবার মোহিনীমূর্ত্তি বিম্বিত রহিয়াছে। সেই যুবকের শালপ্রাংশু দীর্ঘ দেহ, বৃষভের ন্যায় স্থূল স্কন্ধ, আকর্ণ বিস্তারি নীলোৎপলদলতুল্য নেত্র, পাটল কুসুমদ্বন্দ্বি সুলোহিত সরস ওষ্ঠাধর,—সুমার্জ্জিত স্বর্ণ দর্পণতুল্য বিশাল ও বিস্তৃত বক্ষস্থল,—সকল অঙ্গই পুরুষোত্তমোচিত; অথচ সেই বীরোচিত, রাজ-পুত্রোচিত দেহ তাহার যোগ্য বাসভূষাহীন;—মস্তকে কিরীট নাই,—বক্ষে কঞ্চুক বা বর্ম্ম নাই, প্রকোষ্ঠে মণিবলয়, বাহুতে অঙ্গদ এবং কর্ণে মণিতাটঙ্ক নাই। তাহার পরিবর্ত্তে পরিধানে বল্কলবসন ও বল্কল উত্তরীয় কেশরাজি অযত্নরক্ষিত এবং রুক্ষ,—পদদ্বয়ও উপা-নদবর্জ্জিত। বিশাল বক্ষের উপর শ্বেত উপবীত কৈলাসবক্ষে স্বর্গঙ্গাধারার ন্যায় শোভা পাইতেছে। ক্ষত্রিয়রাজকুমারের উপযুক্ত দেহশোভা ব্রাহ্মণ যুবকো-চিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া এক বিচিত্র মনমোহিনী শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। জ্ঞান বেদ ও ধনুর্ব্বেদ, শৌর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য, জ্ঞান ও কর্ম্ম ব্রহ্মবিজ্ঞান এবং ক্ষাত্রতেজ এবং সত্ত্বগুণ ও রজোগুণ যেন একত্র অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশ্রিত হইয়া এই যুবকের দেহে আশ্রয় লাভ করত পরস্পর পরস্পরের পুষ্টিসাধন করিয়াছে! প্রশান্ত এবং গভীর সাগরবক্ষে গগনের শশিকলা যেমন আপনার প্রতিচ্ছবি দেখিয়া আহ্লাদে আত্ম-হারা হয় এবং সেই সঙ্গে সাগরকেও আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করে, কাশিরাজ্যের শশিকলাও তদ্রূপ দর্পণস্থ এই অপরিচিত বীরত্বখণি ও সৌন্দর্য্যধাম যুব-কের বিশাল হৃদয়সাগরে আত্মদর্শন লাভকরতঃ আন-ন্দের বিপুল উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন এবং সেই শুভ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সমগ্র দেহ মনে সমন্তাৎ নিখিল সাত্ত্বিক বিকারের উদয় হইয়া গেল। কখন যে তাঁহার কলেবর নবীননীরদের গুরু গর্জ্জনে বিকচ কদম্ব কুসুমের মত পুলক-কণ্টকিত হইয়া উঠিল,—তাঁহার স্বভাবারক্ত কপোলযুগল কোন সময়ে যে সরমের গাঢ় রঙ্গে রঞ্জিত ও পুনঃ পুনঃ স্বেদবারিতে স্নাত হইয়া উঠিল,—এক কথায় কখন, কোন্ মুহূর্ত্তে যে তিনি আত্মহারা হইয়া দর্পণবিম্বিত পুরুষমূর্ত্তির পদতলে আত্মদান সম্পন্ন করিয়া ফেলি-লেন, তাহা বুঝিতেই পারিলেন না। স্বর্গীয় দিব্য-বীণাধ্বনিবিনিন্দিত সুমধুর ও সস্নেহ গাঢ়স্বরে সেই দেবী রাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"বরং বরয় সুশ্রোণি মম ভক্তঃ সুদর্শনঃ।
সর্ব্বকামপ্রদস্তেহস্তু বচনান্মম ভামিনি॥"

এই বাক্য বলিয়াই মহাদেবী অন্তর্হিত হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শশিকলার নেত্রযুগল হইতে সেই মায়া দৃশ্য সকলই অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। এই সুখস্বপ্ন দ্বারা তাঁহার অশান্ত মন সুশান্ত হইয়া গেল। দরিদ্রজন রত্ন প্রাপ্ত

হইলে যতদুর আনন্দিত না হয়, রাজকন্যা শশিকলা তাঁহার ভাবী সুদর্শন বরকে স্বপ্নে দেখিয়া ততোধিক আনন্দিত হইলেন। তাঁহার দেহলাবণ্যে বিশাল অক্ষিদ্বয়ে, প্রফুল্ল মুখে,—রক্ত ওষ্ঠাধরে, রক্তিম কপোলযুগলে, গতিতে, হাস্য, বাক্যে, দৃষ্টিতে,—হৃদয়ের সেই আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। পিতা মাতা পুত্রীর এই আকস্মিক অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। হৃদয়ের এই আনন্দে রাজকুমারীর রূপ আরও যেন সহস্র গুণে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেশে দেশে তাঁহার রূপলাবণ্যের যশঃসৌরভ বিস্তৃত হইতে লাগিল।

(৬)

শশিকলা এই অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শনের কথা পিতা মাতাকে বলিতে পারেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার প্রিয়তমা সখী মন্ত্রীদুহিতা সুচারুহাসিনীকে সেই আনন্দের কথা বলিয়াছিলেন। মানবহৃদয়ের এক বিচিত্র স্বভাব এই যে সে দুঃখের সময় নীরবে একা দুঃখ ভোগ করিতে ভালবাসে বটে, কিন্তু সুখের সময়ে একজনকে সুখের অংশ না দিতে পারিলে, তাহার পরিতৃপ্তি ঘটে না। মন্ত্রীনন্দিনী শ্রীমতী সুচারুহাসিনী স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে স্বয়ং মহামায়াই কৃপা করিয়া এই মণি কাঞ্চনের যোগের সূত্রপাত করিয়াছেন এবং তিনিই তাহা সুসম্পন্ন করিবেন। জগৎপ্রপঞ্চের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্রী অঘটনপটীয়সী ত্রিগুণময়ী ত্রিলোচনার কৃপায় সখী শশিকলা নিশ্চয়ই সুখিনী হইবেন—এই কথা তিনি নিজ মনে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন এবং সেই বিশ্বাসের আশ্বাস প্রদান করিয়া সখীকে শান্ত করিতে লাগিলেন। শশিকলা জানিতেন যে সুদর্শন ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ কোশল রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী হইয়াও কলিঙ্গাধিপতি প্রবঞ্চক যুধাজিতের ছলনায় সম্প্রতি রাজ্যহীন, সহায়হীন, ধনহীন, মাতার সহিত বনবাসী। যে অলৌকিক রূপলাবণ্যের লোভে ভারতের শত শত শক্তিশালী নরপাল লালায়িত হইয়া রহিয়াছেন,—স্বয়ম্বরের সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্রেই যে তাঁহারা নিজ নিজ দলবল সমভিব্যাহারে শলভের ন্যায় কাশী নগরী আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবেন,—দুর্ব্বল কাশীরাজ কিরূপে সেই সকল রূপতৃষা বিমুগ্ধ ক্ষত্রিয় বীরদিগকে বিমুখ করিয়া তনয়াকে তাহার অভীপ্সিত পাত্রের করে সমর্পণ করিতে সক্ষম হইবেন,—কোশবলহীন নিরস্ত্র সুদর্শনই বা একাকী সে রণসমুদ্র কিরূপে পার হইবেন,—এই দারুণ চিন্তায় তন্বাঙ্গীর চিত্ত যখন জর্জ্জরিত হইত, সুচারুহাসিনী মহামায়ার কৃপার কথা কহিয়া তাঁহার তাপিত প্রাণকে শীতল করিতেন। শশিকলা তাঁহার এই অভিন্ন হৃদয়া সোদরাপ্রতিম সখীকে অহর্নিশ সঙ্গে লইয়া রাজপুত্র সুদর্শনের রূপ গুণের অনুধ্যানেই নিমগ্ন থাকিতেন। একত্র স্নান ভোজন, একত্র ভ্রমণ এবং একত্র শয়ন,—শশিকলা সর্ব্বদাই সুচারুহাসিনীর সহিত একত্র দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন অপরাহ্নে শশিকলা প্রিয় সখী সুচারুহাসিনীর সহিত অন্তঃপুরসন্নিহিত কুসুমোপবনে বায়ু সেবন করিতেছিলেন এবং সুদর্শনের রূপ গুণের সম্বন্ধে প্রীতিপ্রদ বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিলেন,—এমন সময়ে দেখিলেন যে, একজন সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণ ত্বরিত পদে উদ্যান সন্নিহিত রাজমার্গ দিয়া তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছেন। রাজকুমারী ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করার পর তাঁহার সহিত কথোপকথন ব্যপদেশে জানিতে পারিলেন যে, আগন্তুক ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম হইতে আসিতেছেন। ভরদ্বাজ আশ্রমের নাম শুনিয়াই শশিকলার হৃদয় কৌতুহলে নাচিয়া উঠিল,—সেই আশ্রমই যে তাঁহার প্রিয়তমের নিবাস। তিনি নিতান্ত আগ্রহ সহকারে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহাভাগ, আপনি ভরদ্বাজ ঋষির পরম পবিত্র আশ্রম হইতে আগমন করিতেছেন,—তবে বলুন দেখি,—সেই আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অলৌকিক বস্তু কি আছে? এমন কি বস্তু তথায় আছে, যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত নিখিল নরনারীরই হৃদয়ে ব্যগ্রতা জন্মে?"

ব্রাহ্মণের পক্ষে এই প্রশ্নের মর্ম্মোদ্ভেদ করা বিশেষ কঠিন হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "রাজকুমারী,—আপনি ভরদ্বাজাশ্রমের সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় উৎকৃষ্টতম বস্তুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—সে বস্তু অযোধ্যাধিপতি স্বর্গগত মহারাজ ধ্রুবসন্ধির পুত্র যথার্থনামা সুদর্শন। তিনি প্রকৃতই পুরুষোত্তম। শুভদর্শন রাজকুমার সুদর্শনকে যে না দেখিল, তাহার চক্ষু নিষ্ফল সন্দেহ নাই। বিধাতা যেন কৌতুহলবশতঃ সর্ব্ব প্রকার রূপ গুণের একত্র সন্নিবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই নররত্নকে গঠন করিয়াছেন! আপনি যেমন নারীকুলের শিরোমণি, তিনিও তদ্রূপ পুরুষকুলের শীর্ষভূষণ;—মণি এবং কাঞ্চনের সংযোগ যেরূপ বাঞ্ছনীয় এবং প্রীতিপ্রদ, সেই পুরুষোত্তমের সহিত আপনার সংযোগও তদ্রূপ সুবিহিত; অধিক কি, এই সুবিশাল ধরণীতলে সেই কুমার সুদর্শনই আপনার একমাত্র যোগ্য বর।" এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ নিজ গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন। রাজকুমারী অপ্রত্যাশিত ভাবে কুমার সুদর্শনের অলৌকিক রূপলাবণ্য এবং গুণগ্রামের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি আরও অধিকতর অনুরাগিণী হইয়া উঠিলেন। সুদর্শন ভিন্ন আর কোন রাজকুমারকে তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন না—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহার হৃদয়ে চির মুদ্রিত হইয়া গেল।

(৭)

কাশিপতি মহাবাহু সুবাহু তনয়াকে যৌবনমধ্যস্থা এবং বিবাহের উপযুক্তা জানিতে পারিয়া স্বীয় কুলক্রমাগত বিধান অনুসারে স্বয়ম্বরের আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বয়ম্বর ত্রিবিধ, প্রথম ইচ্ছা স্বয়ম্বর,—যে স্বয়ম্বরে কন্যার নিজ স্বাধীন ইচ্ছানুসারে সমাগত রাজন্যবৃন্দ হইতে বর নির্ব্বাচিত হন,—যেমন কালিদাস বর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর; দ্বিতীয় পণ স্বয়ম্বর,—যেরূপ শ্রীমতী জানকী এবং দ্রৌপদী দেবীর স্বয়ম্বরে হইয়াছিল;—তৃতীয় শৌর্য্যশুল্ক স্বয়ম্বর,—যে ক্ষেত্রে সমাগত রাজপুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শৌর্য্যশালী বলিয়া প্রমাণিত ব্যক্তিকে স্বয়ম্বরা কন্যা পতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। কোন কোন গ্রন্থকার পণস্বয়ম্বরকে শৌর্য্যশুল্ক স্বয়ম্বরেরই প্রকার ভেদ বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক, মহারাজ সুবাহু স্বীয় দুহিতা শশিকলার ইচ্ছা স্বয়ম্বর করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাজ্যের সুদক্ষ শিল্পিগণ সুবিশাল এবং সুগঠন সভামণ্ডপ এবং তন্মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে মঞ্চমণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তর, ইষ্টক, দারু, বস্ত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিবিধ মণিমুক্তা দ্বারা সেই সভামণ্ডপ গঠিত ও সুশোভিত হইতে লাগিল। রাজকুমারী শশিকলার স্বয়ম্বর মহোৎসবের মহান্ আয়োজনের বার্ত্তা রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বত্র লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। রাজধানীর সর্ব্বত্র পরিষ্কৃত, পরিমার্জ্জিত, সংস্কৃত হইতে লাগিল। প্রাসাদ সমূহ নূতন বর্ণে রঞ্জিত, ধ্বজপতাকায় সুশোভিত এবং রথ্যাসমূহ সলিল সিঞ্চিত হইতে লাগিল। রাজভক্ত নাগরিকগণও রাজার আনন্দে পরম আনন্দিত হইয়া মনঃপ্রাণ খুলিয়া এই মহোৎসবে যোগ দিতে লাগিল। নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য, বিলাসোপকরণ এবং চিত্তবিনোদনের সামগ্রী সম্ভার নানা দিগ্‌দেশ হইতে নিত্য নিত্য সমাহৃত হইতে লাগিল। আসন্ন প্রায় মহোৎসবের আয়োজনে রাজা প্রজা সকলেই অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু যাঁহার সুখের জন্য এত আয়োজন,—সেই লোকললামভূতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শশিকলার সংবাদ কি? বিবাহের এই সমারোহ ও ঘটা দেখিয়া তাঁহার মন বিষাদসাগরে ডুবিয়া গেল। হায়! তিনি যে বহুদিন পূর্ব্বেই স্বয়ম্বরা হইয়াছেন,—এ কথা এতদিন জনক জননীকে বলেন নাই কেন? এখন এই মহামহোৎসবের মহা আয়োজন হঠাৎ কিরূপে স্থগিত করা যাইবে? লোকে তাহা হইলে কি বলিবে? যাহা হউক, আর ত বিলম্ব করা অসম্ভব। তাই তিনি প্রাণের সখী সুচারুহাসিনীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সই, তুমি ত সকলই জান;—আমি যে আমার মনে মনে মহারাজ ধ্রুবসন্ধি নন্দন সুদর্শনকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; স্বয়ং মহামায়া কৃপা করিয়া সেই পুরুষরত্নকে আমার জীবন মরণের স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন,—আমি কদাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কাহাকেও বর

বলিয়া বরণ করিতে পারিব না। তুমি আমার মাকে নির্জ্জনে এই সব কথা খুলিয়া বল,—আমার প্রাণ-রক্ষা কর।"

সখী সুচারুহাসিনী কাশিরাজ মহিষী বৈদর্ভী দেবীর চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক শশিকলার কথিত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া আসিলেন। রাজ্ঞীও যথাসময়ে এই বার্ত্তা স্বামীসমীপে জানাইলেন। রাজা কন্যার এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু নিজ সংকল্প হইতে চ্যুত হইলেন না। তিনি রাণীকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ,—সুদর্শন রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত—নিঃস্ব, হতভাগ্য বালক। তাহাকেই রক্ষা করিতে গিয়া তাহার মাতামহ বীরশ্রেষ্ঠ বীরসেন কলিঙ্গরাজ যুধাজিতের হস্তে নিহত হইয়াছেন। যুধাজিৎ এখনও সুদর্শনের প্রাণ বিনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিয়াছে। করাল কৃতান্ততুল্য দুদ্ধর্ষ যুদ্ধদুর্ম্মদ যুধাজিৎ যাহার প্রাণনাশে কৃতসঙ্কল্প, সেই নির্ধন, নিঃসহায়, ভ্রষ্টরাজ্য হতভাগ্য বালককে কেমন করিয়া তুমি কন্যাদান করিবে? প্রিয়ে,—তুমি অবোধ বালিকাকে এই সকল কথা বুঝাইয়া বল। স্বয়ম্বর নিশ্চয়ই হইবে এবং তাহার আর অধিক বিলম্বও নাই।"

পতিব্রতা বৈদর্ভী পতির বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তনয়াকে পিতৃনিদেশ শুনাইতে গেলেন। শশিকলা এবং তাঁহার জননীর মধ্যে যে সকল কথোপকথন হইল,—আমরা বারান্তরে তাহা বলিব।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

আমাদের ভুল।

আজকাল আমরা অনেকেই দেশের কথা ভাবিতেছি, জাতীয় স্বার্থকে অনেকটা আপনার জিনিস বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি। দেশের শুভাশুভ প্রত্যেকটী ঘটনার উপর যে আমাদের প্রত্যেকের শুভাশুভও বহুল পরিমাণে নির্ভর করে তাহা বুঝিয়াছি। দেশোন্নতির অসংখ্য কল্পনা জল্পনা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র চলিতেছে, কিন্তু প্রকৃত দেশোন্নতির ভিত্তি কোথায়, সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই উদাসীন। দেশীয় কলকারখানাগুলির উন্নতি হউক, ভদ্র সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের পথ সুগম হউক, ইহা দেশহিতৈষী মাত্রেই আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু কেহই আশা করিতে পারেন না যে, এই সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলেই ভারত আবার জাগিবে। ভারতের কোটি কোটি নরনারী অজ্ঞানতার কূপে ডুবিয়া রহিয়াছে, দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছে, কত শত অন্যায় সামাজিক অনুশাসনে তাহারা শৃঙ্খলিত, কত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে তাহারা জড়ীভূত, নিজেদের নিদারুণ দুরবস্থার পরিমাণ কিছুই তাহারা জানে না। ভাবে, সমাজের উচ্চ স্তরের সহিত তাহাদের এই বিষম বৈষম্য ভগবানেরই বিধান! তাহারা জানে না, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি, মানবাত্মার সার্থকতা কোথায়; তাহারা জানে না তাহাদের জীবনেও কত বড় দায়ীত্ব রহিয়াছে। মাতৃভূমি তাহাদেরই মুখ চাহিয়া রহিয়াছেন, তাহারা মনুষ্যত্ব লাভ করিলে জগতের সভ্য দেশের তালিকায় আবার ভারতের নাম উঠিবে।

ভারত নারী জানে না যে, শুধু বিবাহ, সন্তান পালন ও পুরুষের পরিচর্য্যা করিবার জন্য ভগবান তাহাকে পৃথিবীতে পাঠান নাই, সে যে ঈশ্বরের সন্তান, সে যে ভারতমাতার কন্যা, তাঁহার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত না সে সেই কর্ত্তব্য ভার স্বহস্তে তুলিয়া লইবে, ততদিন তাহার মাতৃভূমি অনাদৃতা, উপেক্ষিতা, পরানুগ্রহ প্রত্যাশিনী হইয়া থাকিবেন। ভারতের কৃষক জানে না যে, সে যতদিন পর্য্যন্ত না জাতীয় উন্নতি

চেষ্টায় যোগদান করিবে, ততদিন জাতীয় দুর্গতি দূর হইবে না। সে জানে না যে, কংগ্রেসের সভাপতি, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইবার যোগ্য—হয় ত ততোধিক শক্তি ভগবান তাহাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু সমাজও প্রতিকূল ঘটনাপুঞ্জ তাহাকে সেই বিধিদত্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া এই শোচনীয় অবস্থায় আনিয়াছে। ভারতের নারীসমাজ ও কৃষক সমাজ নিজেদের দুর্গতির পরিমাণ বুঝিতে না পারিলেও সে বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের সংখ্যা আজকাল এদেশে নিতান্ত অল্প নয়। তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, ভদ্রসমাজের গণ্ডীর বাহিরে দাঁড়াইয়া ঐ যে ভারতের সর্ব্বস্ব অশিক্ষিত মূক, অগণ্য নরনারী বর্ত্তমান, তাহাদের হৃদয় আছে, ফুটিতে পাইল না, শক্তি আছে সদ্ব্যবহার করিতে পাইল না, মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ জগত ইহাদিগকে দিল না, পশুবৎ জীবন যাপন করিয়া নীরবে ইহারা দলে দলে দুর্ভিক্ষ মহামারী ও ম্যালেরিয়ায় ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে। এখানে কত রবীন্দ্রনাথ, কত বঙ্কিমচন্দ্র, হয় ত কত বিদ্যাসাগর কত রামমোহন রায় তাহাদের ঐশ্বরিক প্রতিভা লইয়া কঠোর দারিদ্র্যের পেষণে লোকচক্ষুর অন্তরালে কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল।

কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"দেব-তেজে তেজীয়ান্ কোন মহাজন,
হ'তে পারে অনাদরে নিহিত হেথায়,
সক্ষম যে রাজ্যভার করিতে বহন।
কিম্বা জাগাইতে রাগে জীবন্ত বীণায়।
চির সুসঞ্চিত নিজ রতন ভাণ্ডার
ভারতী তাদের তরে না খুলিলা হায়,
সে উষ্ণ প্রতিভা আর আবেগ আত্মার
বিষম দারিদ্র্য হিমে হ'ল মৃতপ্রায়!"

আর ভদ্রসমাজের গণ্ডীর ভিতরে যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতসন্তান দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই "কোম্পানীর কাগজ, গৃহিণীর গহনা ও মাছের ঝোল" ভিন্ন চতুর্থ বিষয়ের ধার বড় একটা ধারেন না। বাকী কয়েকজন স্বায়ত্তশাসন সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিষয় লইয়া একটু মাথা ঘামাইতেছেন বটে কিন্তু তাঁহারাও লিখিয়া লিখিয়া বক্তৃতা করিয়া করিয়া হয়রাণ হইয়া পড়িতেছেন। কারণ তাঁহাদের আবেদন নিবেদনের প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর গবর্ণমেণ্টের প্রায় হইয়া উঠে না। কিন্তু ইহাতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না, যদি তাঁহাদের চেষ্টার পশ্চাতে ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের অখণ্ড সহানুভূতি থাকিত। কিন্তু কোথায় তাহা? ভারতের কোটি কোটি লোক তাঁহাদের চেষ্টা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গও জানিতে পায় না। যাহারা জানিতে পায়, বুঝিতে পারে তাহাদের মধ্যে অনেকেই দিব্যজ্ঞানে জানিয়া রাখিয়াছে যে ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে স্বদেশ প্রীতির সহিত যে সমুদয় অনুষ্ঠান হইতেছে সেই সমুদয়ই "হুজুগে কাণ্ড"।

এ ভাবে জগতে কোনকালে কোন দেশ জাগে নাই। আমরা যদি আমাদের জাতীয় ভুলগুলি সংশোধন করিতে না পারি তবে আমাদের এই স্বদেশোন্নতি চেষ্টা সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসের ন্যায় আবার ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইবে সন্দেহ নাই, কারণ দেশের সুদিনে জন্মিলে যাঁহারা স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিতেন তাঁহারা দেশের এই দুর্দ্দিনে জন্মিয়াও দেশ সেবা করিতে আসিয়াছেন সত্য কিন্তু চারিদিকের অবসাদ ভরা হাওয়ায় তাঁহাদেরও "উৎসাহ অনল" নিষ্প্রভ হইয়া যাওয়া সম্ভব।

এখন দেখা যাক আমাদের জাতীয় ভুল কোনগুলি। স্বদেশ সেবার অনেকগুলি শাখা আছে—যেমন রাজনৈতিক আন্দোলন, স্বদেশীয় শিল্পাদির পুনরুদ্ধার চেষ্টা, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি। এই সমুদয়ের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া প্রায় সকল ভারতহিতৈষীই এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। আজ কাল স্বদেশ প্রেম হইতে যে সমুদয় লেখার সৃষ্টি হইতেছে তার বার আনা রাজনৈতিক কথায় পূর্ণ। অবশ্য দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলন অত্যাবশ্যক কিন্তু এদিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়াও আমাদের একটী জাতীয় ভুল। তারপর বিষয়ের কাঠিন্যের অনুপাত অনুসারে আমাদের আগ্রহও কমিয়া আসিয়াছে।

দেশীয় শিল্পোন্নতির চেষ্টা ও তাহার ফল আমাদের অভাবের পক্ষে যথেষ্ট না হউক এত পরাজয়ের মধ্যেও যতটুকু চেষ্টা ও উন্নতি হইয়াছে তাহা আমাদের হৃদয়ে আশার উদ্রেক করে। সমাজ সংস্কারও স্থানে স্থানে এক আধটুকু হইতেছে কিন্তু তারপর শিক্ষাবিস্তারে পৌঁছিয়া আর আমাদের স্বদেশপ্রেমের সাড়া, পাওয়া যায় না। অনেকেই হয়ত একথাটার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন কেন না অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্যও গবর্ণমেণ্টকে অনেক করিয়া বলা হইতেছে। এই স্থলেও আমরা একটা ভুল করিতেছি, শিক্ষাবিস্তারের দিক্ দিয়া স্বদেশোন্নতির চেষ্টা করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পন্থা সন্দেহ নাই কিন্তু তা' বলিয়া কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকাটাও আন্তরিক আগ্রহের পরিচায়ক নয়। অপর পক্ষে শিক্ষাবিস্তার জাতীয় উন্নতিকর সমুদয় চেষ্টার মূল। শিক্ষাবিস্তার হইলে এই জরাজীর্ণ মুমূর্ষ বিশাল ভারত সমাজ আপনিই সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। যুগযুগান্তের কুসংস্কার কুরীতি আত্মঘাতী ভেদবুদ্ধি সকল সংস্কারকের সাহায্য ব্যতিরেকেই পরিহার করিতে পারিবে। সমাজের একপক্ষ অন্যায় সামাজিক অনুশাসন পদদলিত করিয়া অপর পক্ষকে আভিজাত্যের অভিমান ও স্বার্থের মোহ অনেকটা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। ফলে ভারত সন্তান সাম্যমূলক একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরাধীনতার অনেকগুলি শৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে,। কিন্তু কোথায় সেদিন ? এ যে আগাগোড়া কল্পনা, কার্য্যতঃ আমরা কেবলই পাশ কাটাইয়া যাইতেছি। জিজ্ঞাসা করিলে বলি "টাকা কোথায় ?" টাকার অভাবটাও গুরুতর সন্দেহ নাই কিন্তু টাকা প্রভৃতি কিছুরই তত অভাব নয়, সদিচ্ছার যত অভাব। দুই একটী ত্যাগী পুরুষের জীবন একথার সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিতেছে টাকা তাঁহাদেরে সামান্যই আছে। আছে শুধু আত্মোৎসর্গের স্পৃহা, সদাকাঙ্ক্ষা আর ভগবানে অসীম নির্ভর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা প্রায় রিক্তহস্তে সমাজপতিগণের অস্পৃশ্য কতকগুলি বালকবালিকার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ তাঁহাদের চেষ্টার আশাতিরিক্ত সুফল দেখিয়া আমাদের হৃদয় আনন্দ উৎফুল্ল হয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের আর কেহইত বক্তৃতামঞ্চ হইতে নামিয়া তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিলেন না !

আমাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমাদের একটা বিশেষ কর্ত্তব্য স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহা আমরা যতদিন পর্য্যন্ত না সুসম্পন্ন করিতে পারিব ততদিন গবর্ণমেণ্টও আমাদের বিশেষ কোন উপকার করিতে সমর্থ হইবেন না। গবর্ণমেণ্ট অর্থ সাহায্য করিতে পারেন, বড় জোর আইন করিয়া পুত্র কন্যাকে স্কুলে পাঠাইতে পিতামাতাকে বাধ্য করিতে পারেন। আমরা যদি আমাদের কর্ত্তব্য পালন করি তবে গবর্ণমেণ্টকে আমাদের দাবীতে আস্থাবান্ হইতেই হইবে। আমরা কি করিতে পারি ? এই যে আমাদের রুগ্ন কঙ্কালসার শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্রপরিহিত দুঃখে কষ্টে বিকৃত মূর্ত্তি ভ্রাতাভগ্নিগণ রৌদ্রে মোট বহিতেছে, রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, বৃষ্টিতে মাঠে পড়িয়া খাটিতেছে ইহাদের জন্য আমরা কি করিতে পারি ? কি করিব ? আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিড়াল, কুকুর ছুঁইলে জাত যায় না কিন্তু ইহাদের পার্শ্বে গেলে জাত যায়। যাক সে কথা, তবু দেখি আমরা ইহাদের জন্য কি করিতে পারি। আমরা,—যাহারা সন্তর্পণে ইহাদের সংস্পর্শ এড়াইয়া ভদ্র সমাজের গণ্ডীর ভিতর দাঁড়াইয়া আছি ইচ্ছা করিলে একজনে অন্ততঃ ইহাদের দশ বারজনের মঙ্গল চেষ্টা করিতে পারি। অমনিই প্রশ্ন উঠিবে আমাদের সময় কোথায় ? সুবিধা কোথায় ? সময় সুবিধা সকলের না থাকিতে পারে কিন্তু অনেকে রত আছে। যাহাদের আছে তাহাদের প্রাণে যদি এতটুকু আগ্রহ থাকিত তবে এতদিনে দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইত। আমাদের দেশে এমন অনেক ভূমাধিকারী আছেন যাঁহাদের পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনও সেগুলি পরিচালন করা

কিছুমাত্র কষ্টকর নহে। কিন্তু দেশের পক্ষে ইহাঁদের অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, একদল হৃদয়বান্ লোকের।

বুঝি এক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা নারীরই প্রয়োজন বেশী। আজকাল আমাদের দেশে এমন অনেক শিক্ষিতা নারী দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা দেশ বিদেশের অনেক খবরই রাখেন, ইহাঁদের নিকট একটুকু দায়িত্ব জ্ঞানের আশা করা দুরাশা নয়। ইহাঁদের মধ্যেও কেহ কেহ ঘরকন্না লইয়া অল্পাধিক পরিমাণে ব্যস্ত আছেন বটে কিন্তু যাঁহাদের সে সব গোলমাল নাই, তাঁহাদের নিতান্ত সময়াভাবের কথা প্রত্যক্ষদর্শী স্বীকার করিতে পারেন না। তবে পরের জন্য খাটিতে গেলে প্রথম প্রথম একটু না একটু অসুবিধা বোধ হইবেই ; আমাদের মধ্যে যাঁহার হৃদয়ে আগ্রহের যত অভাব তাঁহার নিকটে অসুবিধার গুরুত্ব তত বেশী। দেশীয় ভগিনীগণের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষার অভিমান রাখেন, মানব জীবনের দায়িত্ব বোঝেন তাঁহাদের উচিত নয় ছোটখাট অসুবিধাগুলিকে বড় করিয়া দেখা। ছোটখাট অসুবিধা শুনিয়া হয়ত অনেকেই হাসিবেন। কিন্তু সে অসুবিধা ছোটখাটই। আমি এবিষয়ে আরও কয়েকটা কথা বলিয়া আমার বক্তব্য পরিষ্কার ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমাদের দেশে অর্থ সাহায্য করিবার মত লোকের একান্ত অভাব নাই। আমরা কোনও সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে গবর্ণমেণ্টও অর্থ সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। কিন্তু টাকার আগে চাই একদল হৃদয়বান্ লোক যাঁহারা হাতে কলমে কাজ করিবেন। ইহাঁদের অসুবিধা কি প্রকার তাহাই এখন দেখিব। যাঁহাদের নানাপ্রকার অন্তরায় আছে তাঁহাদের অসুবিধার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা সংসারের বন্ধনে জড়িত নহেন, যাঁহাদের খাটিবার শক্তি ও সুবিধা আছে তাঁহাদের সংখ্যাও দেশে নিতান্ত অল্প নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ নরনারী শিক্ষার প্রয়োজনীতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহাদের প্রাণে শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। যদি কয়েক দল সহৃদয় পুরুষ ও নারী এদেশীয় দরিদ্র অধিবাসীদের পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া জ্ঞানের প্রতি ইহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন তবেই প্রকৃত প্রস্তাবে নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষা বিস্তারের ভিত্তিস্থাপন করা হয়। যাঁহারা দরিদ্র পল্লীর গৃহে গৃহে যাইয়া অশিক্ষিত দেশবাসীদের হৃদয়ে জ্ঞান লাভের বাসনা জাগ্রত করিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহাদের যদি স্বার্থের মোহ, আভিজাত্যের অভিমান ও শরীর বাঁচাইয়া চলিবার ভাব না থাকে তবেই অসুবিধাগুলি ছোটখাট অসুবিধা হইয়া আসিবে। অবশ্য নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষা বিস্তার আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও গুরুতর জাতীয় কর্ত্তব্য, ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে প্রাণে যথেষ্ট ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা শক্তি ও ত্যাগ স্বীকারের ভাব থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা যে ইহা সম্পন্ন হইতে পারে না সে কথা হইতেছে না, কথা হইতেছে শুধু সূত্রপাত অথবা পথ প্রদর্শন করিবার। তারপর সাধ্যানুসারে ইহাদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য এই কোটি কোটি লোকের শিক্ষার ভার কোন জাতি একদিনে গ্রহণ করিতে পারে না। দুই এক স্থলে সেই চেষ্টা আরম্ভ হইলেও অর্থাভাবে পণ্ড হইয়া যাইবার আশঙ্কা যথেষ্ট থাকিবে কিন্তু সেই ভয়ে চিরকাল নিশ্চেষ্ট থাকিলে কখনও আমাদের জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে না। নিম্ন শ্রেণীতে শিক্ষাবিস্তারের ব্যয়সাপেক্ষ আয়োজনের পূর্ব্বে যেটুকু করা প্রয়োজন তাহাতে যদি আমরা হস্তক্ষেপ করি তবে গবর্ণমেণ্টের ও দেশীয় ধনীব্যক্তিগণের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হইতে পারে।

আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা নিজেদের সমাজে কখনও যাহা দেখে নাই, যাহা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের শত সহস্র বৎসরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহাতে সম্মত হইতে প্রথমতঃ অবশ্যই একটুক ইতস্ততঃ করিবে, কিন্তু যাঁহারা ইহাদের সহিত মিশিয়াছেন তাঁহারাই জানেন ইহাদের হৃদয় কত সরল ও বিশ্বাসপ্রবণ। যাঁহাকে একবার ইহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া বুঝিতে পারে তাঁহার হস্তে নিজেদের মঙ্গলামঙ্গলের ভার অর্পণ করিতে

বসাইতে হয়। উহা পাইয়া লোকে কার্পাসকে ঢাকিয়া রাখে, সেই আশা ও ভয়ের দিবসে কৃপাময় পরমেশ্বর সদ্‌গুণ দেখিতে পাইলে কাহারও দোষভাগ গ্রহণ করেন না। আমার রচনা সম্বন্ধে তাহাই করিও। সহস্র পংক্তির ভিতরে যদি অন্ততঃ একটি পংক্তি তোমার ভাল লাগে, দোষোৎঘাটনের জন্য চেষ্টা করিও না।

পারস্যদেশে আমার রচনা খুটানের মৃগনাভির ন্যায় লোকে সম্মাননা করে। সাদি গোলাপের সহিত আনন্দ আনিয়া দেয়। তাহার পদাবলী শর্করা প্রলিপ্ত খর্জ্জুরের ন্যায়। ছাড়াইয়া দেখিলে উহার ভিতরে কঠিন বীজ দেখিতে পাইবে।

রাজার প্রশংসা করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও আমি একজনের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিতে চাই। ধার্ম্মিকেরা পরে বলিবে যে সাদি যিনি বাগ্মিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তিনি সাদের পুত্র আবু বকরের সময়ে জীবিত ছিলেন। যতদিন আকাশে চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে তাঁহার (ঐ রাজার) স্মৃতি লোপ পাইবে না। অসংখ্য তাঁহার সৎগুণ। জগৎ তাঁহার বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিন, আকাশ তাঁহার সহায় হউন, স্রষ্টা তাঁহার রক্ষক হউন।

প্রথম অধ্যায়।

ঈশ্বরের মঙ্গলভাব আমাদের কল্পনারও অতীত। জিহ্বা তাঁহার সুখ্যাতির কথা কতটুকু বলিয়া উঠিতে পারে।

ভগবন্! রাজা আবুবকরের সিংহাসনকে সুদৃঢ় কর। তাঁহার ছায়ায় কত লোক রক্ষা পাইতেছে। তাঁহার অন্তরকে তোমার অভিমুখীন কর। তাঁহার আশা-বৃক্ষকে সফল কর। তাঁহার যৌবন সুদীর্ঘ কর। তোমার দয়ায় তাঁহার মুখ অলঙ্কৃত কর।

রাজন্! প্রার্থনার সময় রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিও না। ফকিরের মত হইয়া প্রার্থনা কর, বল, হে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান তুমি; আমি রাজা নহি, আমি তোমার দরবারের কাঙ্গাল, তুমি যদি আমাকে বল না দাও, আমার হস্ত কি করিতে পারে? আমাকে সুবুদ্ধি দাও, তাহা না হইলে আমি কেমন করিয়া প্রজাগণের হিতসাধন করিতে পারিব।

দিবসে যদি রাজকার্য্য করিতে হয়, রাত্রিকালে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, দিবাভাগে কত অমাত্য তোমার দ্বারের নিকটে প্রতীক্ষা করে, তোমাকেও তেমনি প্রার্থনাভরে অবনত মস্তকে ঈশ্বরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

পুত্রের প্রতি উপদেশ।

দরিদ্রকে রক্ষা কর; তোমার নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইও না। ব্যাঘ্র মেষদলে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া মেষপালক নিদ্রা যায় না। যাহারা অভাবগ্রস্ত তাহাদের সহায় হও। রাজা প্রজাদিগের জন্যই মুকুট পরিধান করেন। প্রজাবর্গ শিকড়; আর রাজা বৃক্ষ। বৃক্ষ শিকড় হইতেই বল লাভ করে। যিনি রাজ্যের কল্যাণ চান, তিনি প্রজাগণকে উৎপীড়িত করেন না। যাহারা অহঙ্কারী যাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না, তাহাদিগকে তুমি ভয় করিয়া চলিও।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

নিবেদন।

চাহি না হইতে প্রস্তর ফুল
সুন্দর রূপ ধরে,
অনিন্দ্য, চারু অলিন্দ পরে
বিরাজিতে চিরতরে।
হ'তে চাই দেব ক্ষুদ্র কুসুম
স্নিগ্ধ শ্যামল বনে,
নিঃশেষে ঢালি বুকভরা বাস
ঝরিব ফুল্লমনে।

রঞ্জিত করি রক্ত আভায়
শারদ গগন কম,
চাহি না হইতে সিন্দুরে মেঘ
সুন্দর মনোরম।
হ'তে চাই আমি প্রাবৃট গগনে
কৃষ্ণ জলদ সুখে,
ঢালিতে তপ্ত ধরণী বক্ষে
বারিধারা হাসিমুখে!

শ্রীযতীশচন্দ্র বসু।

বিবাহ-গাথা।*

(বৈদিকী)

রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসীন্যোচনী।
সূর্য্যায়াভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি পরিস্কৃতম্ ॥ ১ ॥
চিত্তিরা উপবর্হনং চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্।
দৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্যদয়াৎ সূর্য্যাপতিম্ ॥ ২ ॥
সোমো বধূয়ুরভবদশ্বিনাতামুভাবরা।
সূর্য্যাং যৎপত্যৈ শংসন্তীং সবিতা মনসা দদাৎ ॥ ৩ ॥
মনো অস্যা অন আসীদ্ দ্যৌরাসীদুতচ্ছদিঃ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎ সূর্যা গৃহম্ ॥ ৪ ॥
শুচীতে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনোমনস্ময়ং সূর্য্যারোহৎ প্রযতীপতিম্ ॥ ৫ ॥

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ মন্ত্র।

মর্ম্মানুবাদ।

"সূর্যা" বধূ "চন্দ্র"বর যায় যবে নিজঘর,
"ঋক" সখী "নারাশংসী" দাসী।
রূপে আলো চারিপাশ, বধূর সুন্দর বাস
"গাথা" নিজে হইলেন আসি ॥ ১ ॥
"সূর্যা" বধূ পতি ঘরে "বিচার"বালিশ'পরে
রাখে নিজ অঙ্গ সুকুমার!
"দিব্যদৃষ্টি" সুশোভন চক্ষুর দিব্য অঞ্জন,
নব বিবাহিত বালিকার।
দ্যৌ দীপ্তি-পূর্ণ-অতি বসুপূর্ণাবসুমতী
দম্পতীর অক্ষয় ভাণ্ডার ॥ ২ ॥
"সূর্যা"বধূ "চন্দ্র" পাত্র, "অশ্বিদ্বয়"বরমাত্র"
সবিতা পুরোধা শ্রেষ্ঠ হন।
কত উপদেশ দিলা কত যত্নে ফিরাইলা
স্বামী প্রতি বালিকার মন ॥ ৩ ॥
"মনো"রথে করি ভর "সূর্যা" যায় স্বামী ঘর
"অন্তরীক্ষ" দৃঢ় যুগন্ধর।
সূর্য্য চন্দ্র দুই জন বৃষভ রথ-বাহন
বহে রথ অতি দ্রুততর ॥ ৪ ॥
"মনো"রথে করি আরোহন
যায় "সূর্য" পতির ভবন,
"পবিত্রতা" রথ চক্র "বায়ূ" তার দৃঢ় অক্ষ
ধায় রথ বেগেতে আপন,
যায় সূর্যা পতির ভবন ॥ ৫ ॥

লৌকিকী গাথা।

রাঘবেন্দ্রে যথা সীতা বিনতা কশ্যপে যথা।
পাবকে চ যথা স্বাহা তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ১ ॥
অনিরুদ্ধে যথৈবোষা দময়ন্তী নলে যথা।
অরুন্ধতী বশিষ্ঠেচ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ২ ॥
সুদক্ষিণা দিলীপেতু বসুদেবে চ দেবকী।
লোপামুদ্রা যথাহগস্ত্যে তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৩ ॥
শন্তনৌ চ যথা গঙ্গা সুভদ্রা চ যথার্জ্জুনে।
ধৃতরাষ্ট্রে চ গান্ধারী তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৪ ॥
গৌতমে চ যথাহহল্যা দ্রৌপদী পাণ্ডবেষু চ।
যথা বালিনি তারা চ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৫ ॥
মন্দোদরী রাবণে চ সুকন্যা চ্যবনে যথা।
পাণ্ডুরাজে যথা কুন্তী তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৬ ॥
সংবরে তপতী যদ্বদ্ দুষ্যন্তে চ শকুন্তলা।
মেরুদেবী যথা নাভৌ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৭ ॥

---

* বিবাহ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে বর কন্যাকে শিলারোহণ করাইবার সময় বরের "গাথা" গান করিবার ব্যবস্থা বিবাহ পদ্ধতিতে দেখা যায়। এই গাথা দুই প্রকার, বৈদিকী এবং লৌকিকী। বৈদিকী গাথায় সূর্য্যা কন্যার সহিত চন্দ্র বরের বিবাহ উল্লেখ আছে। ঋগ্‌বেদের দশমমণ্ডলের ৮৫ সূক্তে এই বিবাহের বিষয় কথিত হইয়াছে। ইহার আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। দুঃখের বিষয় বৈদিক সাহিত্যে আমরা লব্ধপ্রবেশ নহি, সুতরাং ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া "সাহস" করিতে চাহি না। যাঁহারা প্রাচীনকে ভক্তি করেন বলেন, তাঁহারা দেখিবেন,—বিবাহের আদর্শ কত উচ্চ ছিল। ঋক্ = ঋঙমন্ত্র। নারাশংসী = বেদের যে অংশে মানবমানবীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। গাথা = ঐতিহাসিক পদ্যময়ী বর্ণনা।

কর, আমি তোমাদের কি করে মানুষ কর্‌ব ? দেখছ ত তোমাদের দাদাকে কি ভাবে খাটতে হচ্ছে, সে লেখা পড়ার সুযোগ পর্য্যন্ত পেলে না—”

ললিত কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—“না মা আমি যাব না।” এমন সময় বিভার সহিত ইলা সেই ঘরে আসিয়া সুশীলার নিকট নীরবে দাঁড়াইল। সুশীলা তাহাকে বলিলেন—

“এইখানে বস মা, সব ভাল ত ?”

সুশীলার সেই স্থির গম্ভীর মুখ দেখিয়া ইলার প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল, সে সেইখানে বসিল। সুশীলা ললিতকে বলিলেন—

“যাও বাবা চিঠি লিখে দাও যে পড়ার ক্ষতি হবে কাল যেতে পার্‌বে না, রবিবার দিন অমনি বেড়াতে যেও।”

ললিত চিঠি লিখিতে চলিয়া গেল।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল—“কিসের চিঠি পিসিমা ?”

সুশীলা বলিলেন—“ডাক্তার বাবুর ছেলে ফণী ওকে কাল কোথায় বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিল, স্কুল কামাই করে যেতে মানা করিলাম। অন্য দিন বেড়াতে যাবে।”

বিভা বলিল—“আহা যেতে দিন না পিসিমা, না হলে ওর মনে কষ্ট হবে।”

সুশীলা বলিলেন—“কষ্ট হলে কি হবে মা, এখন কষ্ট করিতে শিখুক। পরে ভগবান ওদের ভালই কর্‌বেন।”

ইলা ভাবিল কি রকম ভাল মা, তাই ছেলেরা এত ভাল। এমন মা না হলে কি ছেলেরা এমন ভাল হয়।

ফণী যখন ললিতের পত্র পাইল তার মনে ভারি দুঃখ ও রাগ হইল। সে তাড়াতাড়ি উত্তর লিখিয়া পাঠাইতেছিল, এমন সময় তাহার পিতা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

“ফণী কাকে চিঠি দিচ্ছ দেখি ?”

ফণী পত্রখানি পিতাকে দিয়া বলিল—

“দেখনা বাবা, কাল ললিতকে অজন্তা দেখাতে নিয়ে যাব বলে আসতে লিখেছিলুম, তা সে আস্‌বে না লিখেছে, তার মা তাকে স্কুল কামাই কর্ত্তে দিবেন না। আমি তাই লিখিলাম যে, “তা হবেনা আস্‌তে হবেই।” ডাক্তার বাবু ফণীর পত্র পড়িলেন।

ভাই ললিত,

তুমি কেনো আশবে না ? তোমার মার ভারি ওন্যায় যে তোমায় এমন ধারা করে আশতে দিতে চান না। তুমি নিশ্চই এশো, ইস্কুলে ছুটি নিও ও চলিয়া এশো। যদি না এশো, আমি আর ভাব করিব না আড়ি দিব।

তোমার বন্ধু
ফণি।

ফণীর পিতা পুত্রের এই প্রকার বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—“দেখি ললিতের চিঠি কই, আন ত। ফণী তাড়াতাড়ি ললিতের পত্র আনিয়া দিল, ললিত লিখিয়াছে—

ভাই ফণী,

তোমার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম, কিন্তু ভাই কাল যাইতে পারিব না। যদিও তাহাতে দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু মা বলিয়াছেন, স্কুল কামাই আর করা হইবে না। তুমি বেড়াইয়া আসিলে তোমার নিকট সব গল্প শুনিব। মা বলিয়াছেন, রবিবারে তোমাদের বাড়ী বেড়াইতে যাইতে পারি। কিছু মনে করিও না ভাই।

তোমার বন্ধু
ললিত।

ফণীর পিতা দেখিলেন, ললিতের পত্রে একটিও ভুল নাই, আর তাঁহার পুত্রের শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও পত্রে এত ভুল ! তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

“ললিতের পড়া কে বলিয়া দেয় ? তাহার মাষ্টার আছে কি ?”

ফণী বলিল—“ওদের মার কাছে বসে পড়া করে। ওদের মাষ্টার নেই। বাবা, ওদের অবস্থা মোটে ভাল নয়। ওদের দাদা মিঃ রায়ের কাছে চাকরের কাজ করিত ; আজকাল শিশিরের কাছে থাকে, তার সঙ্গে পড়ে। সে কিন্তু শিশিরের চেয়ে ঢের ভাল পড়া জানে।”

বিবাহ-গাথা।*

(বৈদিকী)

রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাশংসীন্যোচনী।
সূর্য্যায়াভদ্রমিদ্বাসো গাথয়ৈতি পরিস্কৃতম্ ॥ ১ ॥
চিত্তিরা উপবর্হনং চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্।
দৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্যদয়াৎ সূর্য্যাপতিম্ ॥ ২ ॥
সোমো বধূয়ুর ভবদশ্বিনাতামুভাবরা।
সূর্য্যাং যৎপত্যৈ শংসন্তীং সবিতা মনসা দদাৎ ॥ ৩॥
মনো অস্যা অন আসীদ্ দ্যৌরাসীদুতচ্ছদিঃ।
শুক্রাবনড্বাহাবাস্তাং যদয়াৎ সূর্য্যা গৃহম্ ॥ ৪ ॥
শুচীতে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ।
অনোমনস্ময়ং সূর্য্যারোহৎ প্রযতীপতিম্ ॥ ৫ ॥

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৮৫ সূক্ত ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ মন্ত্র।

মর্ম্মানুবাদ।

“সূর্য্যা” বধূ “চন্দ্র”বর যায় যবে নিজঘর,
“ঋক” সখী “নারাশংসী” দাসী।
রূপে আলো চারিপাশ, বধূর সুন্দর বাস
“গাথা” নিজে হইলেন আসি ॥ ১ ॥
“সূর্য্যা” বধূ পতি ঘরে “বিচার”বালিশ’পরে
রাখে নিজ অঙ্গ সুকুমার।
“দিব্যদৃষ্টি” সুশোভন চক্ষুর দিব্য অঞ্জন,
নব বিবাহিত বালিকার।
দ্যৌ দীপ্তি-পূর্ণ-অতি বসুপূর্ণাবসুমতী
দম্পতীর অক্ষয় ভাণ্ডার ॥ ২ ॥
“সূর্য্যা”বধূ “চন্দ্র” পাত্র, “অশ্বিদ্বয়”বরমাত্র”
সবিতা পুরোধা শ্রেষ্ঠ হন।
কত উপদেশ দিলা কত যত্নে ফিরাইলা
স্বামী প্রতি বালিকার মন ॥ ৩ ॥
“মনো”রথে করি ভর “সূর্য্যা” যায় স্বামী ঘর
“অন্তরীক্ষ” দৃঢ় যুগন্ধর।
সূর্য্য চন্দ্র দুই জন বৃষভ রথ-বাহন
বহে রথ অতি দ্রুততর ॥ ৪ ॥
“মনো”রথে করি আরোহন
যায় “সূর্য্য” পতির ভবন,
“পবিত্রতা” রথ চক্র “বায়ু” তার দৃঢ় অক্ষ
ধায় রথ বেগেতে আপন,
যায় সূর্য্যা পতির ভবন ॥ ৫ ॥

লৌকিকী গাথা।

রাঘবেন্দ্রে যথা সীতা বিনতা কশ্যপে যথা।
পাবকে চ যথা স্বাহা তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ১ ॥
অনিরুদ্ধে যথৈবোষা দময়ন্তী নলে যথা।
অরুন্ধতী বশিষ্ঠেচ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ২ ॥
সুদক্ষিণা দিলীপেতু বসুদেবে চ দেবকী।
লোপামুদ্রা যথাঽগস্ত্যে তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৩ ॥
শন্তনৌ চ যথা গঙ্গা সুভদ্রা চ যথার্জ্জুনে।
ধৃতরাষ্ট্রে চ গান্ধারী তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৪ ॥
গৌতমে চ যথাঽহল্যা দ্রৌপদী পাণ্ডবেষু চ।
যথা বালিনি তারা চ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৫ ॥
মন্দোদরী রাবণে চ সুকন্যা চ্যবনে যথা।
পাণ্ডুরাজে যথা কুন্তী তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৬ ॥
সংবরে তপতী যদ্বদ্ দুষ্যন্তে চ শকুন্তলা।
মেরুদেবী যথা নাভৌ তথা ত্বং ময়ি ভর্ত্তরি ॥ ৭ ॥

* বিবাহ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে বর কন্যাকে শিলারোহণ করাইবার সময় বরের “গাথা” গান করিবার ব্যবস্থা বিবাহ পদ্ধতিতে দেখা যায়। এই গাথা দুই প্রকার, বৈদিকী এবং লৌকিকী। বৈদিকী গাথায় সূর্য্যা কন্যার সহিত চন্দ্র বরের বিবাহ উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের দশমণ্ডলের ৮৫ সূক্তে এই বিবাহের বিষয় কথিত হইয়াছে। ইহার আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি সুন্দর। দুঃখের বিষয় বৈদিক সাহিত্যে আমরা লব্ধপ্রবেশ নহি, সুতরাং ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া “সাহস” করিতে চাহি না। যাঁহারা প্রাচীনকে ভক্তি করেন বলেন, তাঁহারা দেখিবেন,—বিবাহের আদর্শ কত উচ্চ ছিল। ঋক্ = ঋঙমন্ত্র। নারাশংসী = বেদের যে অংশে মানবমানবীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। গাথা = ঐতিহাসিক পদ্যময়ী বর্ণনা।

কর, আমি তোমাদের কি করে মানুষ কর্‌ব? দেখছ ত তোমাদের দাদাকে কি ভাবে খাটতে হচ্ছে, সে লেখা পড়ার সুযোগ পর্য্যন্ত পেলে না—"

ললিত কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—"না মা আমি যাব না।" এমন সময় বিভার সহিত ইলা সেই ঘরে আসিয়া সুশীলার নিকট নীরবে দাঁড়াইল। সুশীলা তাহাকে বলিলেন—

"এইখানে বস মা, সব ভাল ত?"

সুশীলার সেই স্থির গম্ভীর মুখ দেখিয়া ইলার প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল, সে সেইখানে বসিল। সুশীলা ললিতকে বলিলেন—

"যাও বাবা চিঠি লিখে দাও যে পড়ার ক্ষতি হবে কাল যেতে পার্‌বে না, রবিবার দিন অমনি বেড়াতে যেও।"

ললিত চিঠি লিখিতে চলিয়া গেল।

বিভা জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের চিঠি পিসিমা?"

সুশীলা বলিলেন—"ডাক্তার বাবুর ছেলে ফণী ওকে কাল কোথায় বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিল, স্কুল কামাই করে যেতে মানা করিলাম। অন্য দিন বেডাতে যাবে।"

বিভা বলিল—"আহা যেতে দিন না পিসিমা, না হলে ওর মনে কষ্ট হবে।"

সুশীলা বলিলেন—"কষ্ট হলে কি হবে মা, এখন কষ্ট করিতে শিখুক। পরে ভগবান ওদের ভালই কর্‌বেন।"

ইলা ভাবিল কি রকম ভাল মা, তাই ছেলেরা এত ভাল। এমন মা না হলে কি ছেলেরা এমন ভাল হয়।

ফণী যখন ললিতের পত্র পাইল তার মনে ভা'রি দুঃখ ও রাগ হইল। সে তাড়াতাড়ি উত্তর লিখিয়া পাঠাইতেছিল, এমন সময় তাহার পিতা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

"ফণী কাকে চিঠি দিচ্ছ দেখি?"

ফণী পত্রখানি পিতাকে দিয়া বলিল—

"দেখনা বাবা, কাল ললিতকে অজন্তা দেখাতে নিয়ে যাব বলে আসতে লিখেছিলুম, তা সে আস্‌বে না লিখেছে, তার মা তাকে স্কুল কামাই কর্ত্তে দিবেন না। আমি তাই লিখিলাম যে, "তা হবেনা আস্‌তে হবেই।" ডাক্তার বাবু ফণীর পত্র পড়িলেন।

ভাই ললিত,

তুমি কেনো আশবে না? তোমার মার ভারি ওন্যায় যে তোমায় এমন ধারা করে আশতে দিতে চান না। তুমি নিশ্চই এশো, ইস্কুলে ছুটি নিও ও চলিয়া এশো। যদি না এশো, আমি আর ভাব করিব না আড়ি দিব।

তোমার বন্ধু
ফণি।

ফণীর পিতা পুত্রের এই প্রকার বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"দেখি ললিতের চিঠি কই, আন ত। ফণী তাড়াতাড়ি ললিতের পত্র আনিয়া দিল, ললিত লিখিয়াছে—

ভাই ফণী,

তোমার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া সুখী হইলাম, কিন্তু ভাই কাল যাইতে পারিব না। যদিও তাহাতে দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু মা বলিয়াছেন, স্কুল কামাই আর করা হইবে না। তুমি বেড়াইয়া আসিলে তোমার নিকট সব গল্প শুনিব। মা বলিয়াছেন, রবিবারে তোমাদের বাড়ী বেড়াইতে যাইতে পারি। কিছু মনে করিও না ভাই।

তোমার বন্ধু
ললিত।

ফণীর পিতা দেখিলেন, ললিতের পত্রে একটিও ভুল নাই, আর তাঁহার পুত্রের শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও পত্রে এত ভুল! তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

"ললিতের পড়া কে বলিয়া দেয়? তাহার মাষ্টার আছে কি?"

ফণী বলিল—"ওদের মার কাছে বসে পড়া করে। ওদের মাষ্টার নেই। বাবা, ওদের অবস্থা মোটে ভাল নয়। ওদের দাদা মিঃ রায়ের কাছে চাকরের কাজ করিত; আজকাল শিশিরের কাছে থাকে, তার সঙ্গে পড়ে। সে কিন্তু শিশিরের চেয়ে ঢের ভাল পড়া জানে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"তা তোমার বাংলা ভাষায় এত ভুল কেন? এত বড় হয়েছ, এখনো এস লিখতে হলে তালব্য 'শ' লিখিবে, এত বড় আশ্চর্য্য কথা।"

ফণী লজ্জিত ভাবে বলিল—"আমাদের স্কুলে ত বাংলা পড়ান হয় না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"তুমি ললিতকে তাহলে রবিবারে নিমন্ত্রণ কর।"

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ফণী পুনরায় ললিতকে পত্র লিখিল—

ভাই ললিত,

তোমার চিটি পাইলাম, তুমি রোবিবারে নিশ্চয়ই এস। আমার বাবা তোমায় দেখীতে চান, তুমি এলে শুখি হব।

তোমার বন্‌ধু
ফণি।

ললিত ফণীর পত্র পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইল। সুশীলা তাহাকে রবিবারে যাইতে অনুমতি দিলেন।

(২১)

ললিত রবিবারে ফণীদের বাসায় আসিল। ফণী আসিয়া তাহাকে লইয়া আপনার পাঠ গৃহে গেল। ফণীর মা তাহাদের জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন করিয়াছিলেন, ফণী তাহা আনিয়া ললিতের সহিত একত্রে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। তাহারা দুইজনে যখন নানা প্রকার কথা ও খেলায় ব্যস্ত, এমন সময় ফণীর পিতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—

"এই যে ফণী তোমার বন্ধু ললিত এসেছে, দুজনে কি করা হচ্ছে?"

ললিত বয়োজ্যেষ্ঠকে প্রণাম করিতে হয়, এ শিক্ষা বাল্যকাল হইতে পাইয়াছে, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া ফণীর পিতাকে প্রণাম করিল। ফণীর পিতা বালকের সেই নম্র নত মুখ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন—

"থাক্, থাক্, আশীর্ব্বাদ করি ভাল ছেলে হও।"

ফণী—"ললিত তোমার কালকের পড়া হ'য়ে গেছে?"

ললিত—"তা হয়েছে বই কি, না হ'লে কি আজ আস্‌তে পারি? আমি সব পড়া করে এসেছি।"

ফণীর পিতা বলিলেন—"তোমাদের কে পড়া বলে দেয়? মাষ্টার আছে?"

ললিত অপ্রতিভ ভাবে বলিল—"মাষ্টার কোথা থেকে থাকবে; আমাদের ত তেমন অবস্থা নয়। আমরা নিজেরাই পড়ার বই ও মানের বই দেখে পড়া করি। দাদাও আমাদের পড়া বলে দেন, মা আমাদের কাছে বসে থাকেন।"

ফণীর পিতা—"তোমার মা কি ইংরাজী জানেন?"

ললিত—"নাইবা জানলেন, তবু তিনি সব বুঝতে পারেন। আমরা পড়া কচ্ছি কি না সেটা তিনি বুঝে নেন, ভুল হলেও ধরে দেন।"

ফণীর পিতা—"বাংলা কে পড়ান?"

ললিত—"মা পড়ান। আমার দাদা মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন, মা সংস্কৃতও বেশ জানেন, তিনি আমাদের সংস্কৃতও পড়ান।"

ফণীর পিতা—"ফণীর বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখে আমি বড় লজ্জিত হয়েছি, তোমার মাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো ত তিনি যদি অনুগ্রহ করে ফণীকেও বাংলা পড়ান ত আমি বিশেষ উপকৃত হব।"

ললিত—"ফণী কি বই পড়ে?"

ফণী—"আমি শিশুশিক্ষা পড়ি, এই ত সেদিন বাংলা ধরেছি।"

ললিত হাসিয়া বলিল—"আমাদের ওসব কোনকালে হয়ে গেছে, আমরা এখন চারুপাঠ পড়ি। আচ্ছা আমি মাকে গিয়ে বল্‌বো, তিনি কি বলেন, স্কুলে ফণীকে বলে দেবো।"

ফণীর পিতা চলিয়া যাইবার পর উভয়ে কিয়ৎক্ষণ খেলা করিল। তাহার পর ললিত বিদায় লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিয়া গেল।

ললিত বাড়ীতে আসিয়া সুশীলাকে বলিল—

"মা ডাক্তার বাবু কি বল্‌ছিলেন জান? তিনি ফণীকে আমাদের বাড়ী পড়াতে পাঠাবেন, তুমি কি ফণীকে বাংলা পড়াবে?"

এত দুঃখেও সুশীলার হাসি আসিল, বলিলেন—

"আমি পড়াব? আমি পড়ার কি জানি যে আমি পড়াতে পারব?"

ললিত মায়ের গলা জড়াইয়া বলিল—

"তুমি আবার পড়াতে পারবে না নাকি। তুমি ত আমাদের পড়াও।"

সুশীলা—"আচ্ছা, এ কথার জবাব পরে দেব।"

সেই দিন রাত্রে ডাক্তার বাবু অভয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—

"ললিতের লেখাপড়া দেখে আমি বড়ই সুখী হয়েছি, আশ্চর্য্য হয়েছি যে, মাষ্টার নাই, তবু তার মায়ের কাছে কেমন ভাল পড়া করে। আমার ছেলেটিকে যদি ললিতের মা বাংলা পড়া বলে দেন ত বড় ভাল হয়। সে রোজ এসে পড়া করে যাবে, আমি এর জন্য মাসে মাসে কিছু দেব।"

অভয় বাবু—"ও কথা এখন বল্‌বেন না! দেখি ললিতের মা রাজী হবেন কি না। আজ আমি তাঁকে জানাইব। তিনি কি উত্তর দেন, তা আপনাকে পরে জানাইব। আপনি যদি তাঁহার সাহায্য করতে ইচ্ছা করেন, টাকা না দিয়া অন্য কোন প্রকারে করতে পারেন। তিনি বড় কষ্টে সন্তান কয়টিকে পালন করছেন, দেখলে বড় কষ্ট হয়।"

ডাক্তার বাবু—"ওই ছেলেরাই মানুষ হবে, আপনি তা দেখে নেবেন। কষ্ট না পেলে মানুষ হওয়া যায় না। ও ছেলেদের মুখের দিকে চাহিলেই বেশ বোঝা যায় যে ওরা একদিন না একদিন মানুষ হবে।"

অভয় বাবু—"তাই হোক মশায়, আপনি তাই আশীর্ব্বাদ করুন। সেদিন স্বামীকে হারালেন, আবার দেখতে দেখতে মেয়েটিও গেল। কি কষ্ট, মনে হলে জ্ঞান থাকে না। আচ্ছা আমি তাহলে আজ রাত্রেই তাঁকে জানাব।"

সৌদামিনী রাত্রে গিয়া সুশীলাকে বলিলেন—"ললিতের বন্ধুর ভারি সখ যে বাংলা পড়ে; তা দাদা বলছিলেন আপনি যদি পড়ানত ডাক্তার বাবু খুব সুখী হবেন। ডাক্তার মানুষকে হাতে রাখা ভাল।"

সুশীলা—"আমি কি পড়াতে পারব দিদি? আমার এমন কি বিদ্যা আছে তা বল? হিন্দু ঘরের মেয়ে কতই বা জানি, তবে বাংলাটা ও সংস্কৃত বাবা নিজে আমায় শিখিয়েছিলেন—"

সৌদামিনী—"যখন তোমায় শিখিয়েছিলেন, তখন তাহা কেন বৃথা নষ্ট করবে। বেশত ভালই হবে, দুচারিটি বাঙ্গালীর ছেলেকে যদি পড়াও, প্রতি ছেলের জন্য মাসে ৪।৫টি টাকা পাও মন্দ কি?"

সুশীলার মুখ আরক্ত হইল, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—

"টাকা নিয়ে পড়াব?" এখন সুশীলা ও সৌদামিনীর ঘনিষ্ঠতা গাঢ় হওয়ায় নিকট সম্পর্কীয়ের মতই কথাবার্ত্তা কহিতেন।

সৌদামিনী—"কিছু ভেবোনা বোন, অজিতের কথা মনে কর সে যখন মিঃ রায়ের কাছে কাজ শিখতে গেল, ভেবে দেখ সেওত তোমারি ছেলে [illegible] সে কত কষ্ট করে তোমার কথা রেখেছিল।"

সুশীলার বক্ষে যেন কে পাথর চাপাইয়া দিল [illegible] ধীরে ধীরে বলিলেন—"দিদি তোমরা যা বলিবে আমি তাই করিব। এ জগতে এখন আমার তোমরা ভিন্ন আমার আপনার বলিবার আর কেহ নাই, কো[illegible] সহায় বা ভরসা নাই। তোমরা যদি মনে কর আমি পড়াতে পারব আমি তাই করব। যে কোন উপায়ে হোক তোমরা আমার মত দুর্ভাগিনীর সন্তান কটিকে মানুষ করবার উপায় করিয়া দাও। দুর্ভাগিনী বলিতে দিদি বুক কেমন করে, আমি কি সত্যই দুর্ভাগিনী? আমার মত অদৃষ্ট কয়জনের ছিল! অমন দেবতার মত স্বামী এমন রত্নের মত সন্তান অমন দেবকন্যার মত মেয়ে, কিন্তু সব কি হয়ে গেল, আমি ভাবি আমি কি করে আছি। বাবার শোকে মা আমার এক বছরও রইলেন না আর আমি [illegible] সহ্য করে আছি। আমি যদি যাই আমার এই [illegible] হায় ছেলে তিনটির দশা কি হবে, তাই ভেবে [illegible] দুঃখে কষ্টেও ধৈর্য্য ধরে রয়েছি শুধু ভগবানকে ডাকছি, কি করে বাছাদের মুখে দুবেলা দু[illegible] অন্নের জোগাড় করে দেব। আমি আর কি [illegible]ই তিনি করছেন। এত দুর্ভাগ্যের মধ্যে যে তাঁর [illegible] হতে এক মুহূর্ত্ত বঞ্চিত হইনি তাই সব সহ্য কর্ত্তে পেরেছি।"

সৌদামিনী—"তোমার দুঃখ দেখলে বোন, পাষাণেরও বুক ফেটে যায়। আমার ত সর্ব্বদাই মনে হয়, কতক্ষণে কাজ সেরে একবার তোমার কাছে আসব। [illegible] দাদাকে গিয়ে বলি, তুমি পড়াতে পারবে কি বল?"

সুশীলা—"আচ্ছা দেখি, যদি না পারি তখন না [illegible] বল্‌ব, কাল থেকে পাঠাতে ব'লো।"

সৌদামিনী—"কখন আস্‌বে?"

সুশীলা—"হয় সকালে নয় সন্ধ্যায়।"

সৌদামিনী—"সকালে কাজ কর্ম্ম সেরে কি পারবে?"

সুশীলা—"আমি ত রাত থাক্‌তে কাজ সেরে নি[illegible], তা না হ'লে কি ছেলেদের কাছে থাকতে পারি?"

সৌদামিনী—"ভগবান তোমায় এর পুরস্কার নিশ্চয়ই দেবেন। আশীর্ব্বাদ করি, ছেলে তিনটিকে নিয়ে সুখী হও।"

সৌদামিনী চলিয়া গেলেন। সুশীলা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ভাবে সেইখানে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় অজিত আসিয়া ডাকিল—

"মা কোথায়?"

সুশীলা—"এই যে অজিত আমি এখানে" বলিয়া গৃহের মধ্যে তাহাদের নিকট গমন করিলে অজিত বলিল—

"মা আজ আমি কি শিখেছি জান?"

সুশীলা—"কি শিখেছ বাবা?"

অজিত—"লাটিন শিখেছি, শিশিরের মাষ্টার তাহাকে পড়ায়, আমি তাই শিখেছি।"

ললিত—"দাদা আমিও শিখব, আমি ত মনে করেছি, পৃথিবীর সব ভাষা শিখে নেব।"

সুশীলা—"তোমরা যা ভাল পাবে দেখে শুনে শিখে নাও। দেখছ ত আমার দশা। তোমাদের যাতে ভাল হয় তাই করিও।"

সুশীলা তাহাদের সকলকে খাইতে দিলেন। সেই সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত হইয়া যে যার শয্যায় শয়ন করিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ভাবনার দেশ।

(গল্প)

ইন্দু অনেক দিন হইতে আশা করিয়া আসিতেছিল,—"আহা, আমার যদি একটী ছোট ভাই থাকিত।"

বালিকার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন হঠাৎ একদিন ভগবান তাহার অনেক দিনের আশা পূর্ণ করিলেন;—ইন্দুর একটী ভাই হইল। বালিকার আনন্দ আর ধরে না!

বালক যখন মাতৃ অঙ্কে শুইয়া কচি কচি নিটোল গালে 'টোল' পড়াইয়া, দন্তহীন মুখে হাস্য করিত, নবনীত কোমল হাত পা গুলি নাড়িয়া নাড়িয়া খেলা করিত, দ্বারপ্রান্তে থাকিয়া ইন্দু তখন ভাব-মোহিতার মত তাহা দেখিতে থাকিত। আবার সে যখন সদ্য নিদ্রাভঙ্গ হইলে কাঁদিতে থাকিত, তখন ইন্দুরও প্রাণের মধ্যে হাহাকার করিয়া উঠিত।

রাত্রে মধ্যে মধ্যে ইন্দুর মনটা খারাপ হইয়া যাইত। সে ভাবিত,—'কেন আমি ভাই চেয়েছিলুম মরতে, ভাই এসে ত আমার ভারি লাভ হ'ল। মা তাকে নিয়ে আলাদা ঘরে থাকে, একবারও

আমায় কোলে নেয় না, ভাত খাইয়ে দেয় না, খেতে খেতে রাজপুত্তুরের গল্প বলে না, কিচ্ছু করে না আর। আর হয় ত মা আমায় ভালবাসে না, কেবল খোকাকেই ভালবাসে। আচ্ছা—আচ্ছা!”

দেখিতে দেখিতে একুশ দিন ঘুরিয়া গেল। সেদিন ষষ্ঠী পূজা। ইন্দু স্থির করিল, আজ মা তাহাকে নিশ্চয়ই কোলে করিবেন, তেমনি করিয়া ভাত খাওয়াইয়া দিবেন, তেমনি ভাবে রাজপুত্রের ও সাত চোরের গল্প বলিবেন।

ইন্দুর মা তখন স্নান করিয়া নব-প্রসূত শিশুকে লইয়া বসিয়াছিলেন। খোকাকে কাজল পরাইতে যখন তিনি ব্যস্ত, সেই সময় ইন্দু মাতার নিকট আসিল। কিন্তু তাঁহার তখন মুখ তুলিবার অবসর নাই, পাছে খোকার চোখে লাগিয়া যায়।

ইন্দুর এবার অত্যন্ত অভিমান হইল। সে নিকটে আসিলে মাতা একবার মুখ তুলিয়াও দেখিলেন না,—কি অন্যায়! বালিকার অভিমান অশ্রুর আকারে ঝরিয়া পড়িল। সে জননীর পশ্চাৎ দিকে নীরবে শয়ন করিয়া অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে কখন অজ্ঞাতে ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বপ্নে দেখিল একজন রমণী তাহার নিকটে আসিয়া বসিলেন। অঙ্গে তাঁহার সূর্য্যের মত আভা, রামধনুকের মত একখানি রঞ্জিত বস্ত্র তাঁহার পরিধানে! বালিকা একটু বিস্মিতা হইল। সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“কেগা তুমি?”

রমণী জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ হাস্য করিয়া বলিলেন,—“আমি কে তুমি চিন্‌তে পারবে কি? লোকে আমায় স্বপ্নদেবী বলে!”

বালিকা একটু উৎকণ্ঠিতা হইল, বলিল,—“তা আমার কাছে কেন?”

রমণী তেমনি ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—“তুমি কাঁদছিলে কেন মা?”

বালিকা বলিল,—“বা রে! কাঁদব না? মা আমায় আর ভাত খাইয়ে দেয় না, গল্প বলে না!”

“তাই তুমি ভাবছিলে, তিনি বুঝি তোমায় একটুও ভালবাসেন না, সবাই তোমার ওপর অসন্তুষ্ট, আর যত ভালবাসে সেই এতটুকু ছোট খোকাটীকে, কেমন না? সেই জন্যেই বুঝি তুমি মনে কর্‌ছিলে যে সেই নতুন খোকা না এলেই ভাল হ’ত, অ্যাঁ?”

ইন্দু লজ্জায় মরিয়া গেল!

“হা হতভাগি! তা তুমি ত আর তাদের দেখনি, কাজেই এ রকম ভাবনাকে মনে আস্‌তে দাও, কিন্তু তাদের যদি একবার দেখ, তাহ’লে আর তাদের মনে কর্‌তে কখনও চাইবে না।”

“তাদের কাকে?”

“এই যাদের ভাব, সেই ভাবনাদের!”

“যাঃ! তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্‌চ! ভাবনাদের নাকি দেখা যায়?—কই এতদিন আমি কত কথা ভেবেছি, কখনও ত তাদের কাকেও দেখতে পাইনি!”

“আমি তোমায় দেখাতে পারি!”

“হ্যাঁ তা বই কি! ইঃ, তা আর কর্‌তে হয় না! আচ্ছা মা ত বলে ভাবনাগুলো কিছুই নয়, তার কোন আকার নেই! তবে?”

“না সত্যি বল্‌ছি আমি দেখাতে পারি, তবে এখানে নয়; দেখতে চাও ত আমার সঙ্গে সেখানে যেতে হবে। যাবে তুমি?”

সাগ্রহে ইন্দু লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—“হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাঃ বাঃ! কি মজা! সত্যি বল্‌ছ?—এ্যাঁ? আমি যা ভাবি সব দেখাতে পারবে? সত্যি—সত্যি ত?”

“হ্যাঁ, নিশ্চয়!”

রমণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর ইন্দুর হাত ধরিলেন। সহসা বিস্মিত ইন্দু দেখিল, তাহাদের বাটীর দ্বারপ্রান্তে একখানি সুন্দর ছোট রথ দাঁড়াইয়া আছে, তাহা টানিবার জন্য একটী সবল সুস্থকায় অশ্ব! পৃষ্ঠে তাহার রামধনুকের মত বিচিত্র বর্ণের পক্ষ। ইন্দু মুগ্ধ নেত্রে সেই অশ্বটী দেখিতেছিল। অকস্মাৎ স্বপ্ন দেবীর আহ্বানে তাহার মোহ কাটিয়া গেল। স্বপ্ন দেবীর হাত ধরিয়া সে রথে উঠিল।

সুন্দর ক্ষুদ্র রথখানি বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিল।

কত বন, পর্ব্বত, নদী, নগর পশ্চাতে ফেলিয়া রথ আকাশের দিকে উড়িয়া চলিল।

ইন্দু যখন রথে উঠিয়াছিল, তখন রাত্রিকাল। পথে যাইতে যাইতে পূর্ব্ব দিক লোহিতাভ হইয়া উঠিল। ক্রমে সে লালিমা গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। তাহার পর ইন্দুর মনে হইল, পূর্ব্ব দিকে বুঝি আগুন লাগিয়াছে! উঃ, কি ভয়ানক লাল! এত লাল আকাশ ইন্দু ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখে নাই! ক্রমে সে লালিমা ভেদ করিয়া সপ্তাশ্ব বাহিত স্বর্ণচূড় রথে সূর্য্যদেব দেখা দিলেন। ইন্দু বিস্মিত নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। উঃ! কি দীপ্তি! ঘরে বসিয়া ত একদিনও সে সূর্য্যকে এমন করিয়া দেখে নাই—তাঁহার এত দীপ্তি লক্ষ্য করে নাই!

ইন্দুর বিস্ময় দূর হইলে সে স্বপ্ন দেবীকে প্রশ্ন করিল,—“এ আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চ?”

“স্বপ্নর দেশে,—ভাবনার দেশে!”

নির্ব্বাক বিস্ময়ে ইন্দু তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

“সে আবার কোথায়?”

“বেশী দূর নয়, এই আমরা এসে পড়লুম বলে।”

“সেখানে কেন? কে আছে সেখানে?”

“সেইখানেই তোমার ভাবনারা থাকে। তুমি এই যে ভাবনা দেখতে চাইলে!”

“হ্যাঁ; আচ্ছা সেখানে কি শুধু আমারই ভাবনা আছে?—আর কারুর নেই এ্যাঁ? আচ্ছা, তাদের দেখতে কেমন?”

“এই আমরা এসে পড়েছি, এখুনি দেখবে তারা দেখতে কেমন। সেখানে শুধু তোমার ভাবনা নয়, জগৎ শুদ্ধ সকলের ভাবনাই আছে।”

“আমার মার আছে,—বাবার—পিসিমার—নতুন খোকার, সবাইয়ের ভাবনাই আছে ত? আমি সবাইকেই দেখতে পাব?”

“হ্যাঁ; এস, নাব।”

এই সময়ে রথখানি আসিয়া একটী শ্বেত মর্ম্মরের উচ্চ প্রাচীরের পার্শ্বে দাঁড়াইল। ইন্দু স্বপ্ন দেবীর হাত ধরিয়া রথ হইতে নামিয়া দেখিল, মর্ম্মর প্রাচীরের এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র দ্বার। স্বপ্ন দেবী তাহাকে লইয়া সেই দ্বারপথে প্রবেশ করিলেন। ইন্দু দেখিল, তাহারা একটী নূতন স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নির্ম্মল আকাশে স্নিগ্ধকরোজ্জ্বল সূর্য্য হাসিতেছিল। সারা নগরী বিমল সৌরকর-স্নাত! সম্মুখেই বিস্তৃত রাজপথ। তাহার উপর দিয়া অসংখ্য নরনারী ছুটিয়া চলিয়াছে! পরিধানে তাহাদের সুন্দর পরিচ্ছদ, মুখে সরল হাসি! সারা রাজপথ তাহাদের প্রাণখোলা হাসির শব্দে মুখরিত!

“বারে! এরা কেমন হাস্‌চে দেখ! এরা কারা দেবী?”

“ওরা কাজের লোকের আর সুখী লোকের ভাবনা!”

তাহারা দুইজনে কিয়ৎক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। ইন্দু দেখিল, সব পথই লোকে ভরা! তবে তাহারা সাধারণ মানুষের মত নহে, তাহা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্রাকৃতি! সে আরও লক্ষ্য করিল, সেই ভিড়ের মধ্যে কাহারও কাহারও মুখ দুঃখ-মলিন, কেহ কেহ বা অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ! কিন্তু সকলেই দ্রুতপদে ছুটিয়া চলিয়াছে;—এত দ্রুতপদে চলিয়াছে যে, চক্ষের পলক ফেলিলে আর সে লোককে দেখা যায় না, ততক্ষণে সে বহুদূরে অন্তর্হিত!

বহুক্ষণ অবধি এই সকল দেখিয়া দেখিয়া ইন্দু স্বপ্ন দেবীকে জিজ্ঞাসা করিল,—“আচ্ছা ছোট ছেলেদের ভাবনাও এখানে থাকে?”

“হ্যাঁ আছে, তুমি দেখবে?—চল।”

স্বপ্ন দেবী তাহাকে লইয়া একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; সেখানে স্তরে স্তরে নানা আভরণ ভূষিত পুতুল খেলনা প্রভৃতি শিশু সুলভ সামগ্রী সজ্জিত! দেওয়ালের গায়ে নানারূপ রঙ্গিন ছবি, প্রজাপতির রঙ্গিন প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি ঝুলিতেছিল।

ইন্দু কতক্ষণ লুব্ধ দৃষ্টিতে সে সব দেখিল। তাহার পর স্বপ্ন দেবীকে প্রশ্ন করিল,—“ছেলেদের ভাবনার এই শেষ?—আর কিছু ভাবে না তারা?”

স্বপ্ন দেবী বলিলেন,—“না আরও আছে।”

তাহার পর ইন্দুকে একখানি ছবি দেখাইলেন। বিস্মিত নেত্রে ইন্দু দেখিল, সে তাহারই প্রতিমূর্ত্তি! তাহার মুখে স্বার্থপরতা ও কোপের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছে!

ইন্দু বলিল—"না, আমি কখন……." হঠাৎ স্বপ্ন দেবীর মুখের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল; দেখিল তিনি বিস্ফারিত নেত্রে তাহারই দিকে চাহিয়া আছেন! বেচারী ইন্দু লজ্জা ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল, যে কথা বলিতে যাইতেছিল, তাহা আর বলা হইল না!

অবশেষে ইন্দু বলিল,—"এবার মা'র চিন্তা দেখব!"

স্বপ্ন দেবী তাহাকে লইয়া একটী সুন্দর স্বর্ণচূড় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দির মধ্যে কোন এক অজ্ঞাত পদার্থের বিমল আলোক প্রবেশ করিতেছিল; সুন্দর ফুলের গন্ধে স্থানটী আমোদিত; কোন এক অজ্ঞাত হস্ত-নিনাদিত বীণার সুস্বরে পূর্ণ। তাহার মধ্য দিয়া কতকগুলি ঈষৎ অস্পষ্ট মূর্ত্তি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। বিস্মিত ইন্দু দেখিল, তাহাদের অধিকাংশই তাহার পরিচিত; বাটীতে তাহাদের সে অনেকবার দেখিয়াছে!

ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে ইন্দু দেখিল, প্রাচীর গাত্রে একখানি সুন্দর ছবি! ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই সে বুঝিতে পারিল, তাহাতে চিত্রিত আছে তাহার পিতা মাতা ও সে! পিতার পদতলে নতজানু হইয়া তাহার মাতা স্বামীর পদ পূজা করিতেছেন! যেন শিবের ধ্যানমগ্না গৌরী! আনন্দে তাহার বালিকা হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

আবেগভরে সে বলিয়া উঠিল,—"বাঃ বাঃ! কি সুন্দর!"

স্বপ্ন দেবী বলিলেন,—"হ্যাঁ মা, ভারি সুন্দর; কিন্তু কেন জান? তিনি তোমার মত আপনার কথাই ভাবেন না। তোমাদের কথাতেই তাঁর মন পূর্ণ! তোমার, তোমার বাপের কিসে ভাল হয়, কি কর্‌লে তোমরা সুখী হও, তাই ভাবতেই তিনি সারাদিন কাটিয়ে দেন। তোমার মতন কেবল আপনার কথা ভেবে, কিসে আপনি সুখী হব ভেবে, বা এটা নেব সেটা নেব ভেবে তিনি দিন কাটান না। আর দাস দাসী প্রভৃতি সকলকেই তিনি স্নেহ করেন, যত্ন করেন ভালবাসেন তাই তাঁর চিন্তাও এত সুন্দর এত সুখী!"

ইন্দু মুগ্ধনেত্রে সেই ছবিখানির দিকে দেখিতেছিল। অকস্মাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, তাহারা একখানি ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কুটীরের এক কোণে একটী বৃদ্ধ রুগ্ন শয্যায় শায়িত, আর তাহার পার্শ্বে বসিয়া এক বর্ষীয়সী রমণী তাহার সেবা করিতেছে। ইহা কি ইন্দু বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসু নেত্রে স্বপ্ন দেবীর দিকে চাহিল।

স্বপ্ন দেবী বলিলেন—"এ হচ্চে তোমাদের বাড়ীর রামা চাকরের ভাবনা। ঐ বুড়া তার বাপ, আর ঐ যে মেয়েমানুষটী ব'সে বুড়ার সেবা কর্‌ছে, ও হচ্ছে রামার মা। আহা বেচারা মা বাপের কথা ভেবেই সারাদিন অস্থির হয়, তার ওপর আবার তোমার দুর্ব্যবহার আছে! বোঝ দিকি বেচারাকে কত কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়!"

ইন্দুর বালিকা হৃদয় বেচারা রামার দুঃখে অভিভূত হইয়া গেল; সে সহানুভূতি পূর্ণ করুণ স্বরে বলিল -"না দেবী, আমি আজ থেকে আর তার ওপর কোন দুষ্টুমি কর্‌ব না। বেচারা বড় দুঃখী।"

ক্রমে সে দৃশ্য চলিয়া গেল। তাঁহারা দুইজনে আবার রাজপথে আসিয়া পড়িলেন।

ইন্দু বলিল,—"এবার আমার নিজের ভাবনা দেখাও। সেও এখানে আছে?"

"হ্যাঁ; কিন্তু তা দেখে তুমি বিশেষ সুখী হবে না; তা হোক, তুমি যখন দেখতে চাইছ, তখন আমি দেখাব এস।"

স্বপ্ন দেবী তাহাকে লইয়া একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তাহার দিকে দিকে নানা বর্ণের নানা জাতীয় কুসুম স্তবকে স্তবকে ফুটিয়াছিল। কিন্তু সারা বাগানেও একটুও পুষ্প গন্ধ নাই! একটাও লোক নাই!

"ভারি সুন্দর ত! কিন্তু এখানে কেউ নাই কেন?"

"তুমি কখনও কারো কথা ভাবনি তবে কে থাকবে? চিরকাল কেবল একলা সবটা নেব ভেবে এসেছ সেই জন্যেই তোমার এই সাজা!"

ইন্দু কুপিত হইয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মুখ তুলিয়া দেখিল সেখানে কেহই নাই!

সে আপন মনে বলিতে লাগিল—"ওঃ! কেউ না রইল ত বড় বয়েই গেল! নাইবা রইল কেউ, আমি একাই গাদা গাদা ফুল তুল্‌ব মাথায় পরব গায়ে প'রব, হাতে প'রব, পায়ে প'রব। সেত ভালই, কেউ থাকলেই আবার ত তাকেও ভাগ দিতে হবে! এ বরং তার চেয়ে ঢের ভাল!"

ইন্দু ফুল তুলিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ তাহার কাণে একটা বিকট হাস্যধ্বনি প্রবেশ করিল। চমকিয়া ইন্দু ফিরিয়া চাহিল।

দেখিল বাগানের বেড়ার পাশে কতকগুলা ক্ষুদ্রাকৃতি বিকট মুখ বিশিষ্ট লোক দাঁড়াইয়া আছে। ইন্দুর বড় ভয় হইল। সে অন্তিম সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমরা? আমার কাছে কেন?"

তাহারা তাহার কথার কোন উত্তর দিল না।

একজন অন্য সকলকে বলিল,—"কি বলিস্ ভাই, এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়, ওকে ধরি কেমন?"

সকলে সে কথায় সম্মতি দিল।

তৎক্ষণাৎ তাহারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাগানে প্রবেশ করিল এবং একটী লতা দিয়া ইন্দুর কচি কচি হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল; ইন্দু ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"একি? তোমরা আমায় বাঁধচ কেন? আমি ত তোমাদের কাছে কোন দোষ কখনও করিনি! ওগো আমায় ছেড়ে দাও,—ছেড়ে দাও!"—ইন্দু কাঁদিয়া ফেলিল!

দলের মধ্যে একজন বলিল,—"হ্যাঁ, ছেড়ে ত দিলুম! তুমিই আমাদের এমন বিকট মূর্ত্তি করেছ—কেন করেছ?—আজ তার সাজা দেব।"

ইন্দু বলিল—"সেকি? আমি ত এই প্রথম তোমাদের দেখছি! তবে আমি কি কর্‌লুম? ওগো না না আমায় ছেড়ে দাও!"

সে লোকটা ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া বলিল,—"আমাদের আর কখনও দেখনি? তা দেখবে কেন? আমরা যে তোমারই চিন্তা—স্বার্থপর ও ক্রূর চিন্তা আমরা। কেন তুমি আমাদের এমন কর্‌লে?"

"ওগো আর করব না—কখনও না—কখনও না। এবারের মত আমায় ছেড়ে দাও।"

অকস্মাৎ সেই স্থানে দেবতার মত সুন্দর জ্যোতিষ্মান এক পুরুষ আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিকট মূর্ত্তিগুলা সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি বলিলেন,—"ইন্দু! একা আমার জন্যেই আজ তুমি বেঁচে গেলে। আমি কে জান?—আমি তোমার বালিকা হৃদয়ের ভক্তি! একদিন তোমার মার অসুখ হয়, সেদিন তুমি নিজের আহার নিদ্রার কথা ভুলে তাঁর কাছে বসেছিলে, তাঁর সেবা করেছিলে তাই আমি হ'য়েছি! ওঠ ইন্দু! তুমি মুক্ত!"

আনন্দে বালিকার হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

* * * * * *

মাতা ডাকিলেন,—"ইন্দু. অ-ইন্দু! কাঁদছিলি কেন?"

ইন্দুর স্বপ্ন টুটিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল মাতার সম্মুখে ভূমে শয়ন করিয়া আছে, আর করুণাময়ী জননী তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন।

ইন্দু বলিল,—"মা, আমি ভাবনার দেশে গেছলুম। ওঃ! সেখানে কত রকম আশ্চয্যি জিনিস দেখলুম। আর কিন্তু আমি দুষ্টুমি করব না মা, এবার থেকে তোমায় ভালবাসব।"

মাতা বুঝিলেন কন্যা স্বপ্ন দেখিয়াছে!

সেই দিন হইতে ইন্দুর স্বভাবের কিন্তু ঘোর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্মিলন।

পবিত্র জাহ্নবী-ধারা 'কুলু'-'কুলু' তানে।
যেথা নিত্য বয়ে যায় সিন্ধুর সন্ধানে
অমৃত-তরঙ্গ তুলি' বিনাশি' বিশ্বের
ত্রিতাপ সন্তাপরাশি ঘোষিয়া ভক্তের
সুমঙ্গল-জয়-গাথা, সে পুণ্যভূমির
স্নিগ্ধ ছায়াতলে আজি আনন্দে গভীর
উৎসর্গিতে ভক্তি-প্রীতি সহস্র হৃদির
মিলিয়াছি ভ্রাতৃগণ! নাহি দৈন্য আজ
নাহি দ্বিধা ব্যবধান ক্ষুদ্র বড় আজ
কোটি প্রসাধিত চিত্তে গাঁথিয়া সুন্দর
ফুল্ল ফুল-মালা এক সকল অন্তর
মাতৃ-পদ-কোকনদে অর্পিয়া যতনে
মাগিতেছে আশীর্ব্বাদ!
পড়িতেছে মনে
কত কথা অতীতের, স্মৃতি বৃন্দাবনে
মোহন মুরলী মরি! মধুর স্বননে
কে যেন বাজায় আজি!
এই গঙ্গা-তীরে
ঊষায় সন্ধ্যায় নিত্য মৃদুল সমীরে
জাগিত কি পুণ্য-গীতি! আর্য্যঋষিগণ
মন্দাকিনী-সুধা-স্রোতে করিয়া গাহন
সদ্য স্নাত তপস্তেজদীপ্ত কলেবরে
উদার অম্বর হেন উদার অন্তরে
করিয়া নিখিল বিশ্বে পূত মধুময়
করিতেন বেদ-গান! সহস্র হৃদয়
সহস্রার সম বুঝি কোন্ সে অজ্ঞাত
সহস্র কিরণ পানে হর্ষে অকস্মাৎ
উঠিত গো বিকশিয়া! কোথাও অদূরে
জ্বলিত গো হোমানল,-ঊর্দ্ধে সুরপুরে
মরতের বার্ত্তা লয়ে হবির্ধূমরাশি
লক্ষ বাহু প্রসারিয়া উঠিত উচ্ছ্বাসি
কল্যাণ কামনা সম! ঋষি-পরিবার—
পতি-পত্নী পুত্র-কন্যা শিষ্যবৃন্দ আর
সৌরমণ্ডলীর হেন উদ্ভাসি জগত
রহিতেন অনুক্ষণ আনন্দে নিরত
কি অপূর্ব্ব শাস্ত্রালাপে!
হয় মোর মনে
যুগ-যুগান্তর পরে মহাশুভক্ষণে
মাতৃ-যজ্ঞভূমে আজি তেমতি সুন্দর
ঘটেছে এ সম্মিলন! মিলি পরস্পর
সেই মত প্রাণে প্রাণে আত্মায় আত্মায়
ভাই-ভগ্নী এক সাথে জাহ্নবী-বেলায়
রচিছে পূজার অর্ঘ্য,—মায়ের আহ্বান
অন্তরে পশেছে কবে!
মহর্ষি-সন্তান
বরণীয় সুধী-শ্রেষ্ঠ প্রধান ঋত্বিক
মাতৃ-যজ্ঞশালে আজ! স্তব্ধ দশদিক
সুমহান্ মাতৃ-মন্ত্রে হইতে দীক্ষিত
মহর্ষি-তনয় পাশে! অমিয় বর্ষিত
হবে বুঝি বসুধায়! পুলক সঞ্চারি'
উদ্গাতা প্রস্তোতা আর প্রতিহারকারী
চৌদিকে মিলিলা কত! প্রাণের প্রবাহ
শান্ত করি সংসারের যত দাব-দাহ
চরণ সরোজ মার করিয়া চুম্বন
উথলিছে ক্ষণে ক্ষণে! বিমুগ্ধ ভুবন
নিরখে নির্ব্বাক্ হয়ে!
স্বদেশ আমার!
জননী জনমভূমি! সর্ব্বতীর্থ সার!
উপাস্য বাঞ্ছিতা মোর! আজিকে তোমার
জ্ঞানী গুণী সুতবৃন্দ বাগ্দেবী-পূজার
বিচিত্র সম্ভার লয়ে তোমারি প্রাঙ্গনে
কি আনন্দভরে হের মিলি প্রাণে মনে
গাহেন বন্দনা-গীতি! হেন সম্মিলন
কে দেখেছে কবে আর! অতীতে কখন
ছিল "নবরত্ন" সভা, সহস্র রতন
মিলিয়াছে দ্বারে তব! কি দুঃখ তোমার

জননী গৌরবময়ী! আজি একবার
চাহ মা প্রসন্ন মুখে, সব আশা-সাধ
পূর্ণ হোক মুহূর্ত্তেকে!
কর আশীর্ব্বাদ
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু হে চির-সুন্দর
ভুবন-অন্তরযামী-ভুবন-ঈশ্বর
কৃপাময় প্রাণাধার! মাতৃ-যজ্ঞ আজ
সার্থক সফল হোক্ বসুন্ধরা মাঝ
মহা করুণায় তব! পূজারিসমাজ
পাশরিয়া চিরতরে দুঃখ-দৈন্য-লাজ
নব কর্ম্ম-প্রেরণায় হয়ে সঞ্জীবিত
হউন কৃতার্থ ধন্য! তৃষ্ণাতুর চিত
তৃপ্ত হোক্ পূর্ণ হোক্ লভি প্রাণময়
যজ্ঞ-শেষ প্রেম-চরু অমৃত অক্ষয়! *

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

নিবেদন।

মাননীয়া মাতৃগণ, প্রিয় ভগিনীগণ ও স্নেহের কন্যাগণ, মনে হইতেছে আজ অতি শুভদিন। এ ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র জীবনে এরূপ শুভযোগ এরূপ মধুর মিলন সৌভাগ্য যত অধিক ঘটে, ততই আমাদের মঙ্গল, ততই আমাদের কল্যাণ।

যদি বলেন আমরা যে ঘটনা উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে ব্যথিতের অশ্রুজল, শোকার্ত্তের হাহাকার, ক্ষুধিতের আর্ত্তনাদ আকাশ ভেদ করিতেছে, অতএব তাহাকে শুভকার্য্য এবং তাহার কথঞ্চিৎ প্রতীকারোপলক্ষে উপস্থিত হওয়াকে শুভযোগ বা শুভ সম্মিলন কিরূপে বলা যায়? তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন, বাস্তবিক ইহা শুভকার্য্য কি না? কোন নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে, কোন সভা সমিতি বা উৎসবে কিম্বা কোন মাঙ্গলিক ক্রিয়া কলাপে সমবেত হওয়া যেমন শুভকার্য্য, ইহা তাহার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়, বরং অধিকতররূপে কল্যাণপ্রদ। প্রকৃত শুভকার্য্য তাহাকেই বলি যাহাতে আত্মার কল্যাণ হয়, মনের পবিত্রতা বর্দ্ধিত হয় ও হৃদয়ের বিকাশ সাধিত হয়। তাহা হইলে মনে করুন, ইহার অপেক্ষা শুভকার্য্য আর কি আছে? ব্যথিতের অশ্রুজলের সহিত অশ্রুজল মিশান, দুঃখীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, ক্ষুধিতের মুখে এক মুষ্টি অন্ন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তুলিয়া দেওয়া ইহার অপেক্ষা মহৎ কার্য্য, ইহার মত শুভ সংঘটন আর কি আছে?

সাধক কবি গাহিয়াছেন—

"দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া নিত্য কল্যাণ কাজে হে;
ফিরিব আহ্বান মানিয়া তোমারি রাজ্যের মাঝে হে।
অনেক নৃপতির শাসনে, না রহি শঙ্কিত আসনে,
ফিরিব নির্ভয় গৌরবে, তোমারি ভৃত্যের সাজে হে।"

যেখানে এই কল্যাণ কাজের সুযোগ পাওয়া যায়, যেখানে বিশ্বেশ্বরের ভৃত্যের সাজে দাঁড়াইবার আহ্বান আসে, যেখানে স্বর্গের ফুলের মত পবিত্র ও নির্ম্মল বিধাতার মহাদান এই যে দয়া প্রবৃত্তি—ইহার সদ্ব্যবহার ও বিকাশ হয়, তাহাই পরম তীর্থধাম নয় কি? এই প্রেম তীর্থেই প্রেমের দেবতা প্রেমস্বরূপের প্রকাশ অনুভব করা যায় না কি?

ঠিক আমার মনে নাই, একটি বালিকা কবি এই ভাবে গাহিয়াছেন—

"যখনই হে প্রভো, ব্যথিতের দুঃখে
ফেলিয়াছি দীর্ঘশ্বাস,
তখনই দেখেছি তোমার মুখের
বিমল মধুর হাস।"

কি সুন্দর সত্য কথা! উৎসব বা সভা সমিতিতে মানবের প্রাণ সহজে না গলিতে পারে, কিন্তু এরূপ

* সপ্তম বার্ষিক "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন" উপলক্ষে রচিত।

একটি হৃদয়-প্লাবিনী পুণ্যক্ষেত্রে সহানুভূতি পূর্ণ সকরুণ প্রাণখানি লইয়া উপস্থিত হইলে সহজেই অধিক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কল্পনায়—মানস নয়নে সেই ক্ষুধার্ত্ত আর্ত্তদের নিদারুণ শোক ও যাতনার মর্ম্মন্তুদ চিত্র তাহাদের দুর্দ্দশার ভীষণ ছবি অঙ্কিত করিতে না করিতে যতই কঠোর হোক কাহার প্রাণ না বিগলিত হয়, কাহার প্রাণ না বিচলিত হয়। মানুষ জানুন আর না জানুন, ভাবুন আর না ভাবুন সেই বিচলিত বিগলিত প্রাণেই ভগবানের আসন সহজেই রচিত হয়।

আমাদের কঠোর প্রাণ যে সহজে গলে না, আমাদের কঠিন মন সহজে কোমল হয় না, তাই ত রাজার রাজা সেই ত্রিভুবনেশ্বর যিনি তাঁহার আসন হৃদয়-মন্দিরে রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াও আমরা কৃতকার্য্য হই না। এই নশ্বর ধরার এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোন নরপতিকে যদি গৃহে আনিতে হয়, আমরা বিবিধ প্রকারে কতরূপ না আয়োজন করি, আমরা যতদূর সাধ্য কোমল ও শোভন আসন তাঁর জন্য রচনা করি, আর রাজাধিরাজ বিশ্বরাজ যিনি—ব্রহ্মাণ্ড-রাজ যিনি তাঁহাকে প্রাণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে হৃদয়াসনখানিকে কতদূর শোভন প্রাণটিকে কতদূর নির্ম্মল ও মনটিকে কত কুসুম কোমল করা আবশ্যক, তাহা বর্ণনার বিষয় নয়, তাহা অনুভব সাপেক্ষ।

আহা, সেই দারুণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী, কল্পনায়ও যাহাদের করুণ-ক্লিষ্ট বিষণ্ণ মুখচ্ছবিগুলি ক্ষণেকের তরেও আমাদের কঠোর হৃদয়ক্ষেত্রে করুণার সুধা-বিন্দু সিঞ্চন করে, ভগবৎ পূজার প্রধান উপাদান যে কোমলতা ও প্রেম তাহারই বিমল আভায় মনটিকে কিয়ৎক্ষণের জন্যও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, তাহারা কি প্রকৃত পক্ষে আমাদের প্রত্যেকের ধন্যবাদার্হ নয়? জননী যখন অপগণ্ড শিশুকে লালন পালন করেন, তারই সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তিনি কি শিশুরই শুধু উপকার করেন? শিশু সে ঋণ সারাটি জীবনেও শোধ করিতে পারিবে না সত্য, কিন্তু জননী নিজেও কি তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে উপকৃত হন না? আত্মোৎসর্গের যে সব স্বর্গীয় ভূষণে তিনি বিভূষিত হন, সে সব কি শিশুরই কল্যাণে নয়?

বিদ্যা যাঁহাকে দান করা হয়, তিনিই কি শুধু উপকৃত হন, যিনি দান করেন, তিনি কি লাভবান হন না? তা ছাড়া মানুষের একটা প্রধান সাধনা, বিশ্ব-মানবের সঙ্গে একাত্মা হওয়া। ভক্ত সাধক বলিয়াছেন, "আনের অন্তরে আনের পরাণে তুমি যে আমারই প্রাণ" অর্থাৎ সকলেরই প্রাণে সকলেরই অন্তরে সেই আমারই প্রিয়তম, সেই আমারই হৃদয়-রাজ বিশ্বরাজ ভগবান বিরাজিত, সুতরাং সকলেই আমার আপনার হইতে আপনার, কেউ ত আমার পর নয়, সকলেই আমার পরমাত্মীয়—আমার হৃদয়ের জিনিস। কিন্তু এটি বড়ই কঠিন কার্য্য, এটি একটি মহাসাধনার বিষয়। এই আদান প্রদানে, এই পুণ্য সম্মিলনে এই শুভকার্য্যে সেই অতি দুর্লভ বস্তুও কেমন সহজেই সফলতা লাভ করে দেখুন। আপ... নারা সকলে বিশ্বেশ্বরের প্রদত্ত একই নারী হৃদয় লইয়া তাঁহারই প্রদত্ত একই প্রাণ মন ও স্নেহ মমতা লইয়া প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া বিশ্বের কোনখানে কোন দূরে সুদূরে কাহারা পীড়িত ব্যথিত আর্ত্ত—তাহাদেরই ক্লিষ্ট করুণ বিষণ্ণ মুখচ্ছবি উদ্দেশে হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য উপ-স্থিত হইয়াছেন—একি স্বর্গের দৃশ্য! একি পবিত্র চিত্র! ইহার অপেক্ষা একাত্ম হওয়ার স্নিগ্ধ মধুময় ভাব আর কোথায় পাওয়া যায়?

আজ কবির কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া বলি—

"সুদূর প্রান্তরে কুলী নারী সেও
ভগিনীর বোন মায়ের মেয়ে,
ভাব তার দশা আপন ভগিনী
দুহিতার মুখ বারেক চেয়ে।"

আহা জননীগণ, আজ সেই ক্ষুধিত মাতৃগণের ক্ষুধিত সন্তানদের কথা চিন্তা করিয়া দেখুন, আজ ভগিনীগণ ক্ষুধার্ত্ত ভগ্নীর ক্ষুধার্ত্ত ভাই বোনের কথা ভাবিয়া দেখুন, আজ স্নেহের কন্যাগণ আপনারা সেই ক্ষুধায় কাতর অবসন্ন কন্যাদের ক্ষুধিত আর্ত্ত চিন্তা... দুর্ভাগা পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া দেখুন, তাঁহাদের যেটুকু সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারেন, তাহার জন্য ব্যাকুল ভাবে চেষ্টা করুন। আমাদের এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, ধূলিরেণুর মত ক্ষুদ্র শক্তিতে কতটুকু উপকার বা আমরা করিতে পারিব, কিন্তু উপকৃত হইব ঢের বেশী। দানের পরিমাণে যে আমরা উপকার লাভ করিব, পুণ্য অর্জ্জন করিব এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি যেরূপ হৃদয় লইয়া আসিবেন, উপরোধ অনুরোধ নয়, কিন্তু সহানুভূতি ভরা করুণাপূর্ণ প্রসন্ন অন্তরে যিনি প্রেমধারা ঢালিয়া দিবেন, তিনিই সমধিক উপকৃত হইবেন। তিনিই প্রকৃত কল্যাণ কর্ম্মের ...নয়িত্রী হইবেন। চাই প্রাণ, চাই প্রেম, চাই হৃদয়-ভরা সহানুভূতি। যদি কেহ কিছু নাও দিতে পারেন, করুণাপূর্ণ প্রাণ, সহানুভূতি পূর্ণ হৃদয়খানি আর অশ্রুসজল নেত্র দুটি লইয়া তিনি উপস্থিত হউন, প্রাণে প্রাণে একাত্ম হইয়া সম্মিলিত হউন, তাহাই পরম লাভ।

আসুন এই শুভকার্য্যকে আমরা সকলে মিলিয়া একাত্ম হইয়া পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলি। শুভ যা তার চারিদিক হইতেই শুভ ঝরিয়া পড়ুক। আত্মপ্রসাদ, প্রসন্নতা ও মমতা এই শুভকার্য্যের নিয়ামক হোক। কেবলই করুণা, কেবলই স্নেহ, কেবলই প্রেম, কেবলই সহানুভূতি আমাদের এই শুভকার্য্যকে পূর্ণ মঙ্গলময় করিয়া তুলুক, মঙ্গলালয় প্রভুর চরণে এই মিনতি। *

শ্রীক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

* উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের সাহায্যার্থে সমবেত গিরিডিস্থ মহিলা সভায় পঠিত।

বরপণ।

আমাদের দেশে যখন কোনও নূতন হুজুগ উঠে, তখন সভা সমিতির ও বাক্যের স্রোত বহিয়া যায়। যেন সহসা বরষার বন্যায় নদীর দুই কূল প্লাবিত হইয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে ভাব আর বেশী দিন থাকে না। বন্যাও যেমন স্থায়ী নয়, আমাদের দেশের প্রতিজ্ঞাও তেমনি থাকে না। কত প্রকার ঘটনায় আমাদের দেশে এক একবার বক্তৃতা সমিতি সভা হয় কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না এই যা দুঃখ। এই সে দিনের কথা বিদেশী বর্জ্জনের জন্য ঘরে ঘরে কত উৎসাহ, কত প্রতিজ্ঞা ক্রমে তাহা জলবিম্ববৎ কোথায় মিলাইয়া গেল। দেশের পুরুষেরা যাহা করিবার তাহা করিতে থাকুন। আমি সবিনয়ে আমাদের দেশস্থ মহিলাদিগকে জানাইতেছি যে, আমাদের মধ্যে কি এমন সময় এখনো আসে নাই, যাহাতে আমরা কোনও বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ়তৎপর হই? আমাদের এই বাংলা দেশের মেয়েরা কত প্রকার ব্রত নিয়মাদি পালন করিতেছেন, অনশনে কত কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন, ক্ষুধা তৃষ্ণাকে সবলে দমন করিতেছেন। যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ তাহা প্রাণান্তে কখনো করেন না। তাঁহারা এই পণ গ্রহণ প্রথা দূর করিতে চেষ্টা করিবেন না? এই যে কদর্য্য প্রথায় আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সর্ব্বনাশ হইতেছে, যাহার গৃহে দু চারিটি কন্যা, তাহাদের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ হইতেছে; ঋণদায় ও চিন্তায় অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছেন, এ বিষয়ে কি হিন্দু নারীগণের একবার চিন্তা করা উচিত নহে? আজকাল আমাদের দেশে কন্যার বিবাহ যে প্রকার চিন্তার বিষয় হইয়াছে, তাহাতে দুঃখে যাতনায় মনে হয়, আমাদের দেশে রাজপুতেরা যেমন পূর্ব্বে কন্যা হইলেই সূতিকাগারে বিনষ্ট করিতেন, তেমনি করিলে যেন ভাল হয়। আজকাল ভাল বংশ নাই, সুন্দরী বা শিক্ষিতা নাই, পাস করা পাত্রের জন্য আবশ্যক হইলেই নগদ টাকা চাই। যদি দরিদ্র কন্যার জন্য পাস করা পাত্র

আবশ্যক হইল—হইলই বা সে সুন্দরী সুশিক্ষিতা কন্যা—নগদ হাজার পাঁচ শত না হইলে বিবাহ হইবে না। এক কথা বলি, বরের জননী মেষের মত পুত্র বিক্রয় করিয়া ফেলেম কেন? তাই ত পরে সেই পুত্র মেষের মত বধূর অনুগত হইয়া পড়ে। চিরকাল যাহাকে স্নেহে বর্দ্ধিত করিলাম, তাহার বিবাহের সময় তাহাকে মেষশাবকের মত কন্যার পিতাকে বিক্রয় করা কি উচিত হইল? কন্যার পিতা প্রাণান্ত করিয়া কন্যার বর ক্রয় করিয়া কন্যাকে সুখী করিলেন। সেই বিক্রীত পুত্রের উপর মায়ের আর দাবী কোথায়? হইলামই বা দরিদ্র, নাই বা পুত্রের বিবাহে রশনচৌকি ও বাদ্যের ঘটা করিলাম, কেন অন্যের অর্থে গৌরব দেখাইতে যাইব? নিজের যাহা আছে, তাহাতেই কি সুখী হওয়া যায় না? আজকালকার ছেলেরা সুশিক্ষিত হইয়াও কি করিতেছেন? পিতামাতাকে এ বিষয় বুঝাইবার কি সাধ্য নাই? বরপণ গ্রহণ করিলে বিবাহ করিব না, এ প্রতিজ্ঞা কি তাঁহারা করিতে পারেন না? যদি মায়েরা ও পুত্রেরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন, সাধ্য কি পিতা পণ গ্রহণ করেন।

সকলে মিলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দেশের এ কালিমা দূর করিতে সচেষ্ট হউন। কি ধনী কি দরিদ্র সকলে এক মতে পণ গ্রহণ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করুন। দেখিবেন তাহা হইলে আমাদের দেশের এ কলঙ্ক শীঘ্রই দূর হইবে। মায়েরা পুত্রের মঙ্গলার্থে এই স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করুন। 'পণ' লইয়া পুত্র বিক্রয় প্রথা তুলিয়া দিয়া যথার্থ মায়ের কার্য্য করুন।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

নারীর কার্য্য।

ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

গত ২৮এ চৈত্র মেরী কার্পেণ্টার হলে ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের চতুর্থ বর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। লাখুটিয়ার জমিদার পরলোকগত রাখালচন্দ্র রায়ের পত্নী শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্ত্রী-মহামণ্ডলের একনিষ্ঠা, অক্লান্তকর্ম্মী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী দাস মহাশয়ার কার্য্য বিবরণী পাঠে জানা গেল, গত বৎসরে মহামণ্ডলের যে তের শত টাকা ঋণ হইয়াছিল, এ বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের বার্ষিক সাহায্য ৬০০ শত টাকা প্রাপ্ত হইয়া এবং গত বৎসরের বাকি চাঁদার মধ্যে ২০০ শত টাকা আদায় হইয়া তাহা বহু পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে এই সাহায্য পাইয়া মহামণ্ডল বিশেষ উপকৃত হইয়াছে। সভাস্থলে পণপ্রথা সম্বন্ধে সভানেত্রী এবং আর একটি মহিলা প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভানেত্রী পণপ্রথার ইতিহাস প্রদান করিয়া এবং নানারূপ সুযুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইহার অপকারিতা সকলকে বুঝাইয়া দেন। সমগ্র দেশ হইতে এই বিষময় প্রথার সমূলে উচ্ছেদ সাধন করা যে একমাত্র নারীর হস্তেই ন্যস্ত, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। দেশের নারী সমাজ যদি সমাজ বক্ষের এই কলঙ্ক ভার দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তবে অচিরে তাহা বিলুপ্ত হইবেই। নারী যদি নারীর দুঃখ দূর করিতে অগ্রসর না হন, তাঁহার মর্ম্ম বেদনা উপলব্ধি করিতে না পারেন, তবে কাহার মুখের দিকে তিনি চাহিবেন? তবে নারীর পরদুঃখকাতরতা, কোমলতা, ত্যাগের মূল্য কোথায়? বঙ্গের সমগ্র নারী সমাজ নারীর দুঃখ দূর করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করুন। এই পাপ দূর করিতে দেশের পুরুষেরা যে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে নারীগণ তাঁহাদিগের সহায় হউন।

সম্বলপুর ক্রফোর্ড বালিকা বিদ্যালয়।

এই বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। প্রাণে পরের হিতসাধন করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে নারী একাকী কি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, তাহার সাক্ষ্য এই বিদ্যালয় প্রদান করিতেছে। সাধু সঙ্কল্পের সহায় যে ভগবান, তাহা চির সত্য কথা। একমাত্র শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর ঐকান্তিক চেষ্টায় বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিয়াছে। তাঁহারই যত্নে বিদ্যালয়টি গবর্ণমেণ্ট হইতে ২৪০ টাকা এবং ডিষ্ট্রীক্ট কাউন্সিল হইতে ১৮০ টাকা এক বৎসরের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ড্রিল, কিণ্ডারগার্টেন এবং চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী একটি সুন্দর জমি পাইয়াছেন এবং এক সহস্র টাকাও সংগ্রহ করিয়াছেন। গত ২রা মার্চ্চ বেহার ও উড়িষ্যার ইনিস্পেক্ট্রেস্ স্কুল পরিদর্শন করিয়া সন্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সমালোচনা।

পুষ্পহার—শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবী প্রণীত। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য কাগজে বাঁধাই ১৲ টাকা। ভাল এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা—ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১৪১ পৃষ্ঠা।

এখানি গল্পের বই। সাতটি পুষ্প চয়ন করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী এই মনোরম হার রচনা করিয়াছেন। হার গাঁথায় নারীই সিদ্ধহস্তা। এই "পুষ্পহার" রচনায় লেখিকার যে নৈপুণ্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। সরল, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখিকা গল্প কয়টি লিখিয়াছেন। যে কয়টি বৈদেশিক গল্প দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া লেখা হইয়াছে, সেগুলি সবই সুন্দর। তন্মধ্যে "সঞ্চিত ধন" শীর্ষক গল্পটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী। মাতৃস্নেহের এমন করুণ চিত্র মানসপটে প্রতিফলিত হইলে দুর্ব্বৃত্ত সন্তানের হৃদয়ও করুণায় ভরিয়া উঠিবে। লেখিকার নিজের গল্প কয়টির ভিতর "কল্যাণী" অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়। যে লেখিকার তুলিকায় এমন সুন্দর আলেখ্য চিত্রিত হইতে পারে, তিনি যে সাহিত্য-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন, তাহা আশা করা যাইতে পারে। মোটের উপর আলোচ্য গ্রন্থখানি আদৃত হইবার যোগ্য। তবে এরূপ ছয়টি সুরভি পুষ্পের মধ্যে "অবগুণ্ঠনবতীর" ন্যায় একটি নির্গন্ধ কুসুম গ্রথিত না করিলেই ভাল হইত। "অবগুণ্ঠনবতী" গল্পটি আর্টের হিসাবে কিছুই না; তবে উদ্দেশ্য ভাল বটে। কিন্তু তাহাও পরিস্ফুট হয় নাই। ইহা ব্যতীত গ্রন্থ মধ্যে কয়টি মোটা ভুল দেখিলাম। "ফরাসী বিপ্লবের একটি চিত্র" নামক গল্পের (পৃঃ ৩) এক স্থলে লিখিত আছে—"সম্রাট সপ্তদশ লুইএর বিচার এবং প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে।" "সপ্তদশ" না হইয়া "ষোড়শ" হইবে। আর এক স্থলে আছে—"স্বয়ং সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য মারকুইস পর্য্যন্ত।" ইউরোপের ইতিহাসে আভিজাত্যে বা পদগৌরবে "মারকুইস" সামান্য ব্যক্তি নহেন। বৈদেশিক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক গল্পে এরূপ ভুল মার্জ্জনীয় নহে বলিয়াই উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। আলোচ্য গ্রন্থে কয়েকখানি ছবি আছে। সব ছবিগুলিই "বাজারে" ছবি। কেবল ৫৩ পৃষ্ঠার ছবিখানি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক।

বিবেক-পন্থী।

তপোবন—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত, ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট হইতে সান্যাল এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ৸০ আনা।

কবি নবীনচন্দ্রের জন্মভূমি, প্রকৃতি দেবীর লীলা-নিকেতন—চট্টলের ভক্ত কবি জীবেন্দ্রকুমার কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গবাণীর চরণ কমলে "অঞ্জলি" দিয়াছিলেন। মা সে ভক্তির অর্ঘ্য সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, মা কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া কবির রচিত মনোরম "তপোবনে" অধিষ্ঠান করিবেন। "তপোবনের" অধিকাংশ কবিতাই সরস, মধুর ও পবিত্র ভাব-দ্যোতক। প্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে কবি যে বিশ্ব-শিল্পীর অপার অনন্ত সৌন্দর্য্য রসে ডুবিয়া গিয়াছেন, "তপোবনে" তাহার নিদর্শন আছে। "উদ্দেশে," "প্রার্থনা," "আবাহন" "নিবেদন" প্রভৃতি কবিতায় কবির ভগবদ্ভক্তি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কবি এক স্থলে লিখিয়াছেন—

"যাহা করি, যাহা ভাবি, যাহা গাই গান—
সকলি উদ্দেশে তব হে দেব মহান্।"

এরূপ সুন্দর সুন্দর ভাব অনেক কবিতায়ই আছে। কবির "তপোবনে" যেমন ভগবৎ প্রেমের অনাবিল উৎস আছে, তেমনি আবার মাতৃভক্তির অমৃত প্রবাহও আছে। মাতৃভক্ত কবি "তপোবনে" "মাতৃভূমি"কে "স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী" জ্ঞানে আহ্বান করিয়াছেন–দুঃখিনী "পল্লীমাতা"কেও ভক্তির সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা প্রকৃত স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক বটে। মোট কথা, কবির "তপোবনে" গঙ্গা-যমুনার সম্মিলন হইয়াছে। "তপোবনের" গঙ্গা—ভগবৎ প্রেম, আর যমুনা—স্বদেশ-ভক্তি। মাতৃভক্ত কবি "পূজার লগ্ন" নিরূপণ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"মায়ের ক্ষুধা মিট্‌বে না যে
শুধু কথার ছলে!
চাই হৃদয় চাইরে প্রাণ,
চাই কর্ম্মীর আত্মদান,
চাইরে সাধন অটল পণ—
ভক্ত দলে দলে—
অর্চ্চনা মার হবে না আর
কেবল ফুলে ফলে।"

সব চেয়ে বিশেষত্ব এই যে, হতাশ হৃদয়ে "দীর্ঘশ্বাস" ও বিরহ-বিধুর প্রেমিকের "হা হুতাশে" "তপোবনের" স্নিগ্ধ-শীতল সমীরণ উত্তপ্ত হয় নাই। কবির গুণের কথা বলিলাম। এখন দোষের কথাও একটু বলিতে হইবে। জীবেন্দ্র বাবু কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। অনেক স্থলে ভাবে, ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ ছায়া বড় বেশী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর এমন নিপুণ কবির "আশৈশব হ'তে" "আত্মা"কে "মুগ্ধা" দেখিয়া আমাদের "মনোপ্রাণে" ও "বক্ষেঃ" বড়ই আঘাত লাগিয়াছে।

সাধনা—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম,এ প্রণীত। ১৫নং কলেজ-স্কোয়ার হইতে চক্রবর্ত্তী চাটার্জী কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ১৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পনরটি সন্দর্ভের সমাবেশ। ইতিপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মাসিক পত্রিকায় সন্দর্ভগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সমুদয় সন্দর্ভ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া বিনয় বাবু দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধিত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি হইল। বিনয় বাবু পণ্ডিত, ত্যাগী, চিন্তাশীল ও স্বদেশপ্রেমিক। নবযুগের সূচনায় যে সকল স্বদেশপ্রাণ কর্ম্মী মায়ের পূজা মন্দিরে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, বিনয় বাবু তাঁদেরই একজন। তাই বিনয় বাবুর রচনায় ত্যাগের কথা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। নিবেদনে লিখিত আছে :—"পণ্ডিত হইয়া সকলে নিজেকেই বড় করিতে শিখিয়াছেন। সেরূপ পাণ্ডিত্য বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন দরিদ্রের বন্ধু, অশিক্ষিতের সহায়, নিম্ন শ্রেণীর উপদেষ্টা লোকহিতৈষী 'মানুষের' সৃষ্টি করা যায় কি না দূরদর্শী ব্যক্তিগণের তাহাই ভাবিবার বিষয়।" এমন কথা বিনয় বাবুর ন্যায় ত্যাগীর পক্ষেই শোভনীয় বটে। গ্রন্থের অনেক স্থলেই লেখকের চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বত্র লেখকের স্বীয় মতের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইল না। "বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" হইতে আরম্ভ করিয়া "ভাবুকতা" পর্য্যন্ত এই নয়টি প্রবন্ধে লেখকের যেরূপ ভাব, চিন্তা ও রচনা-পদ্ধতি দেখিলাম, পরবর্ত্তী ছয়টীতে তাহার একটু বিভিন্নতা আছে। স্থানে স্থানে তিনি এমন মত ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহা অনেকে নির্ব্বিরোধে মানিয়া লইতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। "সাহিত্য-সেবী" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থলে (পৃঃ ১৩৬) বিনয় বাবু লিখিয়াছেন :—"এমন কি, সম্প্রতি আমাদের সমাজে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, পরোপকার, লোকহিত, মানবসেবা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্যগুলিকে জীবনে উপলব্ধি করিবার যে সকল প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রসূত।" আমরা এ কথা স্বীকার করিয়া লইতে পারিলাম না। বিনয় বাবুর ভাষায় বলিতে গেলে তিনি "বিদেশীয় সভ্যতার মাপ কাঠিতে মেপে আমাদের দেশকে" বিচার করিয়াছেন, অথবা এরূপ উক্তি "আত্মবিস্মৃতি এবং চিত্ত-সম্মোহনের ফল।" নতুবা যে দেশে বুদ্ধদেবের ন্যায় ত্যাগী ও সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছে, প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের মত মহাপুরুষ বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, আর রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রভৃতির ন্যায় পরোপকারী, লোকহিত-ব্রত ও মানব-সেবা-পরায়ণ মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশে বা সে সমাজে "বৈরাগ্য" "সন্ন্যাস" "মানব সেবা" প্রভৃতি "আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্যগুলিকে জীবনে উপলব্ধি করিবার প্রয়াস যে পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রসূত" তাহা কেহ স্বীকার করিবেন কি না বলিতে পারি না। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা এখনও "বৈরাগ্য" ও "সন্ন্যাসের" আদর্শ নিজেরাই ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। তবে আমেরিকায় ঐ দুইটি আধ্যাত্মিক ভাব উপলব্ধি করিবার যে প্রয়াস চলিতেছে, তাও ভারতীয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের প্রচারের ফলে ও তাঁহার অলোকসামান্য জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রভাবে। বিনয় বাবু ৮৭ পৃষ্ঠায় "আমাদের জাতীয় চরিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"আমরা কেবল ল্যাঙ্কাসিয়ারের তাঁতীদের দাস নই, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ প্রভৃতি স্থানের সাহিত্য-সেবী এবং লেখকেরাও লেখাপড়ার নিয়ম কানুন, বিদ্যাদানের প্রণালী ইত্যাদি সকল বিষয়েই আমাদের প্রভু। সেই কারণেই আমাদের ধর্ম্মের উপর আস্থা ও ভক্তি কমে গিয়ে একটু আসক্তি ও সংশয়বাদের ভাব ঢুকেছে। আবার সেই জন্যেই বিলাসিতা, সুখ-প্রিয়তা, ভোগাকাঙ্ক্ষা। গ্রামের শান্তি-কুটীর পরিত্যাগ ক'রে, গার্হস্থ্যের সুন্দর নিয়মগুলি যে ক্রমশঃ শিথিল করে ফেল্‌ছি, তাও এই নূতন অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল।" বিনয় বাবুর নিজের এই উক্তি দ্বারাই পূর্ব্বোক্ত উক্তি কি খণ্ডন করা যাইতে পারে না? এই দুইটীতে পরস্পর কিরূপ সামঞ্জস্যের অভাব তাহা সহজেই বোধগম্য। স্থানে স্থানে এইরূপ আরও আছে। আমরা বিনয় বাবুর গুণগ্রাহী—তাঁর পাণ্ডিত্য ও ত্যাগে শ্রদ্ধাবান্। তাই ঐ ত্রুটিগুলি না দেখাইয়া পারিলাম না। তথাপি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, এরূপ চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সন্দর্ভ লিখিতে পারেন, এমন লেখক আজকালকার এই "গল্প উপন্যাসের" বাজারে অতি অল্পই। এরূপ সুলিখিত ও সুচিন্তিত গ্রন্থের আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিবেক-পন্থী।

সমাজ বা দেশাচার—'হেমলতা' রচয়িত্রী প্রণীত ও প্রকাশিত। এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ছয় আনা। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

এখানি নাটক। ইহার পরিকল্পনাটুকু বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের বাল্য-বিবাহ ও তাহার অবশ্যম্ভাবী হৃদয়ভেদী ফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাল্য-বিবাহের বিষময় ফল ইহাতে অতি সুন্দর, সুস্পষ্ট ও সকরুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাব উচ্চ, ভাষাও তাহার অনুসরণ করিয়াছে; পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের একখানি নিখুঁৎ ছবি লেখিকার সহানুভূতি ও আন্তরিকতা পূর্ণ

তুলিকা স্পর্শে অতি উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "নিষ্ঠুর সমাজের নিষ্ঠুরাচারে কত শত গৃহের সুখ আনন্দ শেষ হ'য়ে গেছে, তারা তার জন্য কি করুছে? কেবল ধৈর্য্য ধরে সহ্য করে আছে। কিন্তু রীতির দোহাই দিয়ে আর কত দিন সমাজ এমনই করে শিশু হত্যা, বালিকা হত্যা, নারী হত্যা করবে? দেশে দুর্নীতি দুশ্চরিত্রতার সহায়তা করবে? দেশের সমাজহিতৈষীরা বালবিধবার বিবাহ দিবার জন্য বক্তৃতা করেন, কিন্তু সেই বাল-বৈধব্যের মূল, অশেষ অনিষ্টের মূল বাল্য-বিবাহ নিবারণের কি কেউ চেষ্টা করেন? এই যে বালিকা, বৈধব্য কি জান্‌বার পূর্ব্বে বিধবা হয়েছে, কত শত ঘরে এমন বিধবা আছে, কত শত ঘরে ছোট ছোট বালিকারা প্রসব হ'তে না পেরে মারা যাচ্ছে, সেই সঙ্গে তাদের শিশুরাও মারা যাচ্ছে; কত শত ঘরে বালিকারা অল্প বয়স থেকে সন্তান হ'য়ে হ'য়ে দুর্ব্বল হ'য়ে কতকগুলি দুর্ব্বল সন্তান রেখে মারা যাচ্ছে, কই অন্ততঃ তাদের পিতারা ত প্রতিজ্ঞা করেন না যে, তাঁদের অন্য মেয়েদের আর ছোট বেলায় বিবাহ দিবেন না।" আমাদের সমাজের অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয়, তাহা বোধ হয় শিক্ষিত বাঙ্গালীদের কেহই অস্বীকার করেন না। যদি কাহারও সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে, তবে তিনি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিলে নিশ্চয়ই মর্ম্মাহত হইবেন। লেখিকা নিজে দারুণ মর্ম্মাহত হইয়া যে তীব্র ভৎর্সনা করিয়াছেন, ইহা পড়িয়া আমাদের মনে ঘৃণা ও লজ্জার উদয় হয়। এ বিষয়ে আমাদের কি কোনো কর্ত্তব্য নাই? এ মহা অকল্যাণকর দেশাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য সকলেরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য! "আজ যদি সমস্ত কন্যার পিতারা প্রতিজ্ঞা করেন যে, অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিব না, তা হ'লে সমাজ কি করুতে পারে? সমস্ত কন্যার পিতাদের ঠেলে রেখে কি সমাজ চল্‌তে পারে? কেবল যদি তাঁরা এই ভীরুতা এই হৃদয়হীনতা ত্যাগ করে প্রতিজ্ঞা করেন, 'ছোট বেলায় মেয়ের বিবাহ দিব না,' আর আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা দেশের সমাজের ও নিজেদের সকলের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন, 'বালিকা বিবাহ করব না' তা হলেই এই প্রতিদিনের নারী-হত্যা, শিশু-হত্যা, বালিকা-হত্যা নিবারণ হয়।" লেখিকার কথাগুলি অতি সত্য। আমরা অন্তরের সহিত লেখিকাকে ধন্যবাদ দিতেছি। দেশের ও সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রকেই আমরা এই পুস্তকখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বাংলার ঘরে ঘরে এই পুস্তক বিরাজ করুক।

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ।—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ রায় প্রণীত, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার চক্রবর্ত্তী চাটার্যি কোম্পানী হইতে প্রকাশিত। ছাপা এবং কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র। অল্প কথায় গ্রন্থকার এই মহৎ জীবনের কাহিনী অতি ওজস্বিনী এবং সুললিত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। স্বামিজীর অমৃতময় জীবন কাহিনীর ভিতর প্রবেশ করিতে এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। স্বামী শুদ্ধানন্দ সত্যই ভূমিকায় বলিয়াছেন: "স্বামি বিবেকানন্দের নাম আজ জগতের সর্ব্বত্র পরিচিত। তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ সমূহের পাঠক সংখ্যাও দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে" কিন্তু এমন আবার অনেকে আছেন, যাঁহাদের ঐ সকল বেদান্ত দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ নাই, ঐ সকল গভীর ভাব সমূহ বর্ত্তমান গ্রন্থে গ্রন্থকার অতি সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। স্বামিজীর উদার ধর্ম্ম মত ও ত্যাগ, সেবাধর্ম্মে বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দও পতিত জাতি, বিবেকানন্দ ও নারীজাতি, স্বামিজীর প্রতিভা ও কর্ম্ম-তৎপরতা, স্বামীজির স্বদেশ প্রেম এই ছয়টী অধ্যায়ে গ্রন্থকার এই মহৎ জীবন আলোচনা করিয়াছেন। তাহার কর্ম্মময় জীবন আরও বিশদরূপে আলোচিত হইলেই এই গ্রন্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। তাঁহার সেই আশার ও প্রেমের বাণী এখনও ভারতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে:—"হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই", এই জগদ্বরেণ্য মহাপুরুষের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া গ্রন্থকার একটী খাঁটি জিনিষ উপহার দিয়াছেন, গ্রন্থকারের ভাষায় আমরা অনুভব করি "এ মাতৃভক্ত পুরুষ সিংহের অকপট পরিচর্য্যায় পরিতুষ্টা হইয়া জন্ম ভূমি যেন হাস্যময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অযুত সন্তানের নয়ন সমক্ষে আবির্ভূতা হইয়াছেন," আর তাঁহার প্রেমিক বৈরাগী সেবক বিবেকানন্দ প্রেমালিঙ্গনে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—"তোমরা উঠ জাগ, ভগবৎ প্রেম ও আত্মত্যাগ বিশ্ব বিজয় করিতে সমর্থ হয়—আমি আমার নিজ জীবনে তাহা অনুভব করিয়াছি।"

উত্তর ভারত ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন।—শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ডবল ক্রাউম ষোড়শাংশিত ১৮৩—৪২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৷৷০ টাকা। বাঁধাই ছাপা ও কাগজ বেশ পরিষ্কার। এই পুস্তকে লেখক তাঁহার বাটী হইতে হরিদ্বার ও অমৃতসর হইয়া কাশ্মীর পর্য্যন্ত পথের বর্ণনা ও হৃদয়ের ভাব বেশ সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। পর্য্যটকগণ এই পুস্তকে তাঁহাদের গন্তব্য পথের বিশেষ পরিচয় পাইবেন; এবং তাঁহাদের কৌতূহল বৃদ্ধি হইবে। যদিও ইহাতে স্থানের বর্ণনা বিশেষ কিছুই নাই, তথাপি আমরা পথের বর্ণনা পড়িয়া সুখী হইয়াছি। এই পুস্তকে বর্ণিত পথের চিত্র থাকিলে অতি সুন্দর হইত। ভবিষ্যৎ সংস্করণে 'শাখে,' 'দ্বিযোজন,' 'শ্রুত হইয়া,' 'দৈববশাৎ,' 'বন্ধুসহকারে,' 'পর্ণপত্র,' 'ভাগ্যবশাৎ' প্রভৃতি শব্দগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচলিত সহজ বাংলা শব্দ দিলেও ৯৬ পৃষ্ঠার দ্বাদশ পংক্তি হইতে কয়েকটী লাইন পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভাপতি
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন।

ইতিহাস শাখার সভাপতি
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র।

Presented to the K. P. L. by
Shiva Prashad Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের
জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ } ১১শ সংখ্যা।

সিরিয়া পরিভ্রমণ।

২৮-এ মে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ দার্দ্দানেলিসের হাঁসপাতালে চা খাইয়া প্রাচীন ট্রয়নগরী এবং আজিনার ধ্বংসাবশেষ দেখিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইলাম। বেলা প্রায় ৮টার সময় কয়েকখানি অশ্বশকট এবং কয়েকটী উৎকৃষ্ট অশ্বে আমরা ১০।১২ জন ভারত এবং ৪।৫ জন তুর্কী সোওয়ার এবং দার্দ্দানেলিস নিবাসী তুর্কী হেলাল আহমর বা রেডক্রেসেট হাঁসপাতালের ম্যানেজার কালান বে, আমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য সঙ্গে গমন করেন। দার্দ্দানেলিস সহর অতিক্রম করিয়া একটী সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম অবলম্বন করতঃ আমরা চলিতে লাগিলাম। রাস্তাটীর দুই পার্শ্বে নানাজাতীয় বিচিত্র পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল। বসন্তের উজ্জ্বল প্রভাতে এবং মৃদুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে বেশ প্রফুল্লতা বোধ করিতে লাগিলাম! নিদারুণ শীত ঋতুর অবসাদ ও জড়তার পরে সূর্য্যকরোজ্জ্বল নব প্রভাতের দৃশ্য মর্ম্মের স্তরে স্তরে এক নব আনন্দ ও নব স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিতেছিল। হয়দ্রাবাদনিবাসী মৌলবী আব্দুল কইয়ূম সাহেব আমার গাড়ীতেই ছিলেন। তিনি আমাকে কয়েকটী বাংলা গান করিতে বলায় আমি "বিশ্বধন্যা জগৎমান্যা" "মা আমার সোণার বাঙ্গলা" এবং "দেশ ভকতের ভস্মের ভিতে" প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের অশ্বযান দার্দ্দানেলিস সমুদ্রের তীরের রাস্তা দিয়া অক্র-বক্র গতিতে দ্রুত চলিতে লাগিল। শকট হইতে দার্দ্দানেলিসের নিস্তরঙ্গ শান্ত জলরাশির নীলিমার শোভায় চক্ষু তৃপ্ত হইতে লাগিল। শান্ত বালিকার সাঁঝের আকাশের প্রথম তারকা দর্শন কালের অপলক আঁখির কৃষ্ণতারা যেমন স্থিরতার মধ্যে মধুরতা ফুটাইয়া তোলে, দার্দ্দানেলিস প্রণালীর জলরাশিও যেন তেমনি উন্নত সৌধমালিনী তুঙ্গ মসজিদ গম্বুজ কিরীটিনী কনষ্টান্টিনোপল মহানগরীর সৌন্দর্য্য সন্দ-

র্শন মানসে মুগ্ধ আঁখিতে চাহিয়া রহিয়াছে। দুই উন্নত ভূখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী দার্দ্দানেলিসের শোভা সত্য সত্যই এমনি কবিচিত্তমোহিনী!

বেলা ১২ টার সময় সমুদ্র তীরবর্ত্তী এক ক্রমোচ্চ ভূভাগে উপস্থিত হই। এখানে একদিকে অসংখ্য চীর বৃক্ষের শ্যাম-শোভা এবং তাহার নিম্নে সমুদ্রের নীল শোভায় কবিত্বের ভাবে হৃদয় উচ্ছাসিত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল জনৈক কবি সহচর সহ এখানে বাস করিতে পারিলে জীবনের সার্থকতা হইত। চীর-বৃক্ষের শীতল ছায়ায় কম্বল পাতিয়া সহচরদের সহিত ডিম্ব .পনির এবং রুটী খাইয়া জঠর জ্বালা নিবারণ করি। ২৫ মিনিট কাল বিশ্রাম করিবার পরে আবার আমরা গন্তব্য পথে অগ্রসর হই। গাড়ী ক্রমে সমুদ্র-তট হইতে কিছু দূর দিয়া চলিতে লাগিল। রাস্তাটী অতীব সুন্দর, পরিষ্কৃত এবং সমতল। উচ্চ নীচ ভূমি এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাহাড়ের উপর দিয়া সর্পগতিতে এই রাস্তা দার্দ্দানেলিস হইতে শামদেশ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

পথের দুই পার্শ্বে কত জাতীয় অগণিত বন্য ফুল ফুটিয়াছে, তাহা লিখিবার নহে, কেবল দেখিবার জিনিস। ক্রমে আমরা আরও কিছু অগ্রসর হইলে, উদ্যানবৎ, সুশোভন বিশাল ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া গাড়ী যাইতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর পর্য্যন্ত চীর, আঞ্জীর ও জয়তুনের অগণন সুবিন্যস্ত বৃক্ষ শ্রেণী দেখিতে পাইলাম। উচ্চ নীচ ভূমির উপরে শ্যাম তরুশ্রেণীর একটানা শোভা বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হইতেছিল। শস্য শ্যামল পুষ্পিত ভূমি, তৃণগুল্ম সমাচ্ছন্ন উন্নত পাহাড়, কলনাদিনী বক্রগতি বিশিষ্টা স্রোতস্বতী এবং সুপরিষ্কৃত পরিপাটী রাস্তার দৃশ্যে আঁখি জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। "চাহে মন্দারস্" নামক পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নদীর বাঁকে বাঁকে এক এক জায়গায় সমতল ভূমিতে সবুজ গোধূম শস্যের শোভায় এবং নানা জাতীয় বন্য ফুলের সম্মিলিত সৌন্দর্য্যে চক্ষু মুগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। সত্যই জীবনে এমন মনোহর প্রদেশ আর দেখি নাই। আনন্দ-আবেশে সকলেই "কোদ্রতী-বাগ" অর্থাৎ প্রাকৃতিক উদ্যান বলিয়া শাম বা সিরিয়া দেশের বর্ণনা করিলেন। "চাহেমন্দারস" নদীর স্রোতে অসংখ্য রেলওয়ে স্লিপার ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, দেখিতে পাইলাম। উজানের কোনও বন হইতে কাষ্ঠ কাটিয়া এই সমস্ত স্লিপার প্রস্তুত করতঃ নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, আর নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্লিপারগুলি ধরিয়া তুলিয়া লওয়া হইতেছে। এইরূপ মনোহর দৃশ্যপূর্ণ দেশের ভিতর দিয়া অনূন ৩০ মাইল অগ্রসর হইয়া একটী বৃহৎ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রামে খৃষ্টানের সংখ্যাই খুব বেশী। লোক সংখ্যা প্রায় ৫০০০ হাজার। গ্রামে কয়েকটী স্কুল এবং মিউনিসিপ্যালিটী আছে। গ্রামটী সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বলিয়া গ্রীকদিগের আক্রমণ ভয়ে সমুদ্রের তীরে একটী সামরিক আড্ডা বসিয়াছে। কর্ণেল মোহাম্মদ আলী ৭০০ শত সৈন্য লইয়া সর্ব্বদা সমুদ্র তীর পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সমগ্র দার্দ্দানেলিস এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী বহু শত মাইল উপকূল-সীমান্তে গ্রীক এবং ইটালীয় রণ-তরীর আক্রমণ ভয়ে তুর্কীকে অন্ততঃ তিন লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত বিপদের জন্যই তুর্কী গবর্ণমেণ্ট ভীষণ বলকান সমরে শত্রুদের সম্মিলিত দশ লক্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র তিন লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নৌশক্তির অভাবই তুরস্কের সমূহ বিপদ এবং সর্ব্বনাশের কারণ। যে সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত উপকূলের পরিমাণ ১৮ শত মাইলেরও উপর এবং ভূমধ্যসাগরের বহু দ্বীপাবলী যাহার করতলগত, সে সাম্রাজ্যের পক্ষে তিনখানি রণতরী এবং দুইখানি মাত্র ক্রুজার লইয়া নৌশক্তির গর্ব্ব কত সামান্য এবং উপহাসজনক! সোলতান আব্দুল হামিদ খানের ৩০ বৎসর রাজত্বে প্রতি বৎসর এক একখানি করিয়া রণতরী নির্ম্মিত হইলেও আজ তুর্কীর নৌশক্তি কত প্রবল হইত। কিন্তু সোলতান আব্দুল হামিদ ৩০ বৎসরকাল কেবল বিলাস-ব্যসনে ও জাতীয় অভ্যুত্থানকামী অন্ধ রাজশক্তির সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের বিরোধী নব্য তুর্কীদলের মস্তক চর্ব্বন অভিলাষেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। সোলতান আব্দুল হামিদের অদূরদর্শিতা মূর্খতা এবং স্বার্থপরতাই আজ চির গৌরবোন্নত পরাক্রান্ত তুর্কীর বিজয় পতাকাকে ভূলুণ্ঠিত করিয়াছে! ফলতঃ সোলতান আব্দুল হামিদ স্বেচ্ছাচারী বিলাসী এবং জাতীয় দলের বিরোধী না হইলে, আজ তুরস্কের গৌরবও বিক্রমে সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ হইয়া যাইত।

আমরা এখানে কর্ণেল মোহাম্মদ আলী বের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা এবং সমাদর করেন। অতঃপর এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকি। পথের দুই পার্শ্বে একজাতীয় অত্যুজ্জ্বল রক্তবর্ণ ফুলের বহু সন্নিবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হই। এই রমণীয় ভূখণ্ডের কমনীয় সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত দৃশ্যাবলীর মধ্যবর্ত্তী অতি পরিষ্কৃত পথে চলিবার সময় পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছিল, যেন আমরা স্বর্গরাজ্যের উদ্যান ভূমিতে বিচরণ করিতেছি। কয়েক মাইল যাইয়া "চীনারনীক" নামক এক ময়দানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেখানে বহু শত সৈন্যের তাম্বু পড়িয়াছে। কর্ণেল আমাদিগের আগমন দর্শন করিয়াই শশব্যস্তে উঠিয়া পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। কর্ণেলের সৈন্যবৃন্দ সারি বাঁধিয়া আমাদিগকে সামরিক কায়দায় সালাম জানাইলেন। আমরা কিয়ৎক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিবার পরে আবার অশ্ব ও শকটারোহণে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বিদায়ের সময় কর্ণেল এবং তাঁহার সহকারিগণ প্রাণের আবেগপূর্ণ ভাষায় আমাদিগকে ধন্যবাদ ও প্রীতি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন! তুর্কীদিগের সৌজন্য এবং ভদ্রতা বাস্তবিকই অতুলনীয়।

পথের মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় অতিক্রম করা গেল। পাহাড়ের গাত্র বেষ্টন করিয়া স্তরে স্তরে পাথর কাটিয়া চক্রাকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পাহাড়ের উপর দিয়া অতি সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। স্থানে স্থানে পাহাড়ের গায়ে রাস্তার পার্শ্বে নানাজাতীয় পার্ব্বত্য লতা বিচিত্র কুসুম বিকাশ করিয়া বায়ুভরে দোল খাইতেছিল। কয়েক স্থানে জয়তুন বৃক্ষের বাগানে বাঙ্গলার চির পরিচিত ঘুঘু দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

চামওবা হাঁসপাতাল।

এইরূপ নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদের গন্তব্য স্থান "চামওবা" নামক হাঁসপাতালের নিকটবর্ত্তী হইলাম। এই অস্থায়ী হাঁসপাতালটী একটী স্বাস্থ্যকর উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গে অবস্থিত। পাহাড়ের পাদমূলে আমরা শকট হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে পাহাড়ের উপরে উঠিতে লাগিলাম। এখানের বায়ু শুষ্ক এবং লঘু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরের গায়ে যথেষ্ট লৌহ আছে দেখিতে পাইলাম। আমরা পাহাড়ের উপরে উঠামাত্রই বহু ভাষাবিদ প্রসিদ্ধ ডাক্তার হাসানবে আমাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করেন। এই চামওবা পর্ব্বতের হাঁসপাতালে বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত তুর্কী কর্ম্মচারী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। একজন পাশা এবং একজন সেনাপতির সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ পাশা আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে "হিন্দীকারদাস" অর্থাৎ হিন্দুস্থানের ভ্রাতাদিগকে দেখিয়া পাশার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। এই দারুণ দুর্দ্দিনে মনে হইতে লাগিল যেন কত যুগযুগান্তের আজ আমরা "ভাই-হারা" ভাই সকল একত্র সম্মিলিত হইতেছি। সেই মুক্ত সান্ধ্য-গগনের নীচে উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি চীর-বৃক্ষতলে লম্বা লম্বা টেবিল এবং চেয়ার পাতিয়া ভোজের বন্দোবস্ত করা হইল! এক একজন তুর্কী এবং এক একজন হিন্দুস্থানী পাশাপাশি বসিয়া আহার করিতে লাগিলাম। ভোজে আমাদের উদর পূর্ণ হইতে লাগিল বটে, কিন্তু এদিকে ভ্রাতৃপ্রেমের পীযূষধারায় আমাদের হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। অস্ফুট চন্দ্রালোকে সেই পর্ব্বত শৃঙ্গে বসিয়া মনে হইতে লাগিল যেন, যেন আজ জাতীয় জীবনের এই দারুণ দুর্দ্দিনে যুগান্তের অন্ধতমসা ভেদ করিয়া ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্ম্মিতার তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা সমগ্র মুসলমান জগৎ হইতে তুরস্ক ভূমে ছুটিয়া আসিতেছে। সে বিদ্যুৎ-শিখা কি তীব্র জ্বালা এবং তেজোময়! সে বিদ্যুৎ-শিখায় চকিত হইয়া অদূরে ইস্লামের যে

কর্ম্ম-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে, সমস্ত বিশ্ব তাহাতে কম্পিত হইয়া যাইবে। ফলতঃ আত্মবিস্মৃত কর্ম্ম বিমুখ নিদ্রাতুর মুসলমানের মস্তকে ভীষণ বজ্রপাত করিয়া বিধাতা কি পরম দয়ারই পরিচয় দিয়াছেন! এ বজ্রপাতে মরক্কো হইতে মালয় পর্য্যন্ত কোটি কোটি বিচ্ছিন্ন আত্মার মধ্যে এক মহা ঐক্যের উচ্ছ্বাস, উত্তাল-তরঙ্গ-রঙ্গে প্রবাহিত হইতেছে। বিধাতার করুণা এবং কৌশলের কথা স্মরণ করিয়া হৃদয় শ্রদ্ধাভরে তাঁহার নিখিল-শরণ মঙ্গল চরণে নত হইয়া পড়িল। আহারান্তে কিছুক্ষণ তুর্কী বন্ধুদিগের সহিত আলাপাদি করিয়া বস্ত্রাবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্লান্ত শরীর শয্যায় ঢালিয়া দিলাম।

পর দিবস (২৯এ মে) ঊষার কনকচাঁপা কিরণ-করস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই জাগরিত হইয়া পার্ব্বত্য প্রকৃতির মুক্ত দৃশ্য দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলাম। এই মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজের হৃদয়কেও যেন মুক্ত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতের অরণ্য সমূহের শ্যাম রেখার শীর্ষে এবং কোনও কোনও উচ্চ শৃঙ্গস্থ বরফ স্তূপের উপরে ঊষার আলোক পড়ায় বড়ই শোভা হইয়াছিল। এই নিরাবিল পার্ব্বত্য নিকেতন, আমার নিকট রাজপ্রাসাদ অপেক্ষাও কত উন্নত এবং শোভনীয় বলিয়া বোধ হইতেছিল। চীর বৃক্ষের ডাল কাটিয়া তুর্কীরা এক কৃত্রিম কুঞ্জ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আমাদের উপাসনার জায়গা সেই স্থানেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি সেইখানে কম্বল পাতিয়া উপাসনা এবং প্রার্থনা করিলাম। মনে হইতে লাগিল প্রাসাদবাসী রাজা অপেক্ষা পর্ব্বতবাসী ফকিরের সুখ ও আনন্দ কত বেশী!

উপাসনা শেষে পাহাড়ের নীচে ছাগ ও মেষপাল দেখিতে গেলাম! পাহাড়ের পাদমূলে শ্যামল ঘাস ছিল, সেখানে চারণের জন্য কতকগুলি রাখাল বালক মেষ ও ছাগযূথ লইয়া আসিয়াছে। ছাগল ও মেষগুলি আমাদের দেশের ছাগল ও মেষ হইতে অনেক বৃহৎ এবং বলিষ্ঠ। এখানে ছাগলের দুগ্ধও বেশ প্রচুর হয়।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করি। একটী 'চীর' বৃক্ষের শাখায় একটী দোল্না বাঁধা ছিল। একটী আরব বালক সেই দোল্নায় বসিয়া দোল খাইতেছিল। আমি এবং আমার কতিপয় সহকারী বন্ধুও পর্য্যায়ক্রমে সেই দোল্নায় বসিয়া দোল খাইতেছিলাম। দোল্নায় দোল খাইবার অভ্যাস থাকিলে, সামুদ্রিক পীড়া আক্রমণ করিতে পারে না। এজন্য তুর্কী প্রবীণ পুরুষগণও দোল খাইতে ভালবাসেন।

গ্রাম পরিদর্শন।

অপরাহ্নে আমরা প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী আককুই নামক একটী প্রসিদ্ধ গ্রামে অশ্বারোহণে যাত্রা করি। আমি যে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সে ঘোড়া আমার পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ হওয়ায় দুইবার আমাকে ঘোড়া পরিবর্ত্তন করিতে হয়। একে ত আমি অশ্বারোহণে তখনও সম্পূর্ণ পটুতা লাভ করিতে পারি নাই, তাহার উপর অনবরত পাহাড়ের চড়াই এবং উৎরাই দ্রুতবেগে অতিক্রম করিয়া ছুটিতে হইতেছিল। সুতরাং আমি একটু হয়রাণ হইয়া পড়িলাম। এক স্থানে উপত্যকার সমতল ভূমিতে অতি সুন্দর গমের ক্ষেত্র দেখিতে পাইলাম। গমের গাছগুলি আমাদের দেশের গাছ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। আমাদের সমুচ্চ তুর্কী অশ্বগুলি ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া যাইবার সময় প্রায় ডুবিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। গ্রামের বালকেরা আমাদিগকে দেখিয়া পরমানন্দে দৌড়াইয়া আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আমাদিগকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে সাহায্য করিল। বালকদিগের অযাচিত সাহায্য এবং সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কয়েকজন বালক আমাদিগের জন্য তৎক্ষণাৎ শীতল জল এবং কাফি লইয়া আসিল। আমাদের আগমনে তাহারা যে অত্যন্ত সুখী এবং আনন্দিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের চোখ মুখের ভাব ভঙ্গী হইতে খুবই প্রকাশ পাইতেছিল। গ্রামের মক্তবা বা পাঠশালার

ৌলবী এবং প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (ইমাম) ত্রস্তপদে আসিয়া আমাদিগকে সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। পক্ক শ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ ইমাম সাহেব, আমরা সুদূর হিন্দুস্থান হইতে যে এই জাতীয় ভীষণ দুর্দ্দিনে বল্কানের রণক্ষেত্রে আগমন করিয়াছি, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ ব্যাকুলান্তরে আমাদিগকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আমাদের সহিত তিনি নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমিও গ্রামের সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। গ্রামে ১২০ ঘর লোকের বাস। এই গ্রাম হইতে ৭০ জন যুবক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন। এইজন্য আমরা গ্রামে প্রায় কোনও যুবককে দেখিতে পাইলাম না। গ্রামের সমস্ত লোকই কৃষিজীবী। গ্রামের এক পার্শ্বে মধ্যস্থলে সর্ব্বসাধারণের জন্য বৈঠকখানা। আমাদের দেশে সন্ধ্যার পরে যেমন আমরা নিজ নিজ বাড়ীতে নিজের আত্মীয়স্বজন কিম্বা দুই চারিজন অনুগত ব্যক্তি লইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব ও মহিমা এবং অপর সকলের কুৎসা কীর্ত্তন করিতে থাকি; এখানকার নিয়ম সেরূপ নয়। এখানে সন্ধ্যার পরে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই একত্র হয়। কাজেই ব্যক্তিগত কুৎসা বা কোনও প্রকারের নীচ স্বার্থমূলক আলোচনা করিবার সুবিধা হয় না। সুতরাং গ্রামে দল পাকাইয়া দলাদলি করিবার সম্ভাবনা নিতান্ত বিরল।

গ্রামের বিচার ব্যবস্থা।

তুরস্কের প্রত্যেক গ্রামেই এক একজন গ্রাম্য কাজী নিযুক্ত আছেন। গ্রামের সর্ব্ব প্রকারের মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, তিনিই সম্পন্ন করেন। নালিস করিতে এখানের সহরেও কোনও পয়সা খরচ হয় না। ভারতের ইংরাজ আদালতের কোর্ট ফি দিবার নিয়ম এখনও এখানে অজ্ঞাত। গ্রামের বিচার গ্রামে হয় বলিয়া তুরস্কে আমাদের দেশের ন্যায় বিচার-বিভ্রাট খুব কমই ঘটিয়া থাকে। গ্রামের জনগণগুলী কর্ত্তৃকই কাজী সাহেব নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ এবং সর্ব্বাপেক্ষা চরিত্রবান ব্যক্তিই কাজীর পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। গ্রাম্য বিচারে কোনও উকীল মোক্তারের আবশ্যক নাই। গ্রামস্থ সাক্ষী প্রমাণ লইয়াই বিচার কার্য্যের নিষ্পত্তি হয়। এই গ্রামে বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য দুইটি নিম্ন বিদ্যালয় আছে।

গ্রাম্য পোষাক পরিচ্ছদ।

এসিয়া বা তুরস্কের পরিচ্ছদ ইউরোপ হইতে অনেকটা পৃথক। কৃষকদিগের পরিধানে কতকটা কাবুলী ধরণের পায়জামা এবং মেরজাই ধরণের কোট দেখিতে পাইলাম। কোট এবং পায়জামা উভয়ই নীলবর্ণে রঞ্জিত। পা এবং পায়ের নলা অনেকেরই খোলা দেখিলাম। প্রত্যেক তুর্কী গ্রামের মধ্যস্থলে উপাসনার জন্য একটী করিয়া মস্‌জিদ আছে। গ্রাম যতই বৃহৎ হউক না কেন, একটীর অধিক মস্‌জিদ কখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এদেশে প্রত্যেক মস্‌জিদেই অন্ততঃ পক্ষে একটী সমুচ্চ মিনার থাকে। মিনার শূন্য মস্‌জিদ কখনও হয় না। মহামান্য সোলতানের আদেশ ব্যতীত কোনও জামে মস্‌জিদ কি সহরে কি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমাদের দেশে যেমন স্বার্থান্ধ কাঠমোল্লার দল এক জুম্মার ঘর ভাঙ্গিয়া দুই তিন চারিখানির পত্তন পূর্ব্বক ভীষণ দলাদলি এবং হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতেছে, তুরস্কে তাহা একেবারেই অজ্ঞাত।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া আমরা "চামওবা" গিরিশৃঙ্গস্থ বস্ত্রাবাসে ফিরিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলে বৃদ্ধ ইমাম সাহেব এবং বালকের দল আমাদিগকে অন্ততঃ রাত্রির জন্য সেই গ্রামে অবস্থান করিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং বহু বিনয় ও মিনতি প্রকাশ পূর্ব্বক আতিথ্য স্বীকারের দায় এড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানাভিমুখে অশ্ব ধাবিত করিলাম। রাত্রি ৯৷৷টার সময় আমরা চামওবায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আজিনা গ্রাম পরিদর্শন।

অদ্য ৩০এ মে, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ সকালে চা-পান

করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। আজিনা নামক বিখ্যাত গ্রামের দিকে অশ্ব ছুটাইলাম। আজিনা, চামওবা হাস্পাতাল হইতে অনূন ৬৬ মাইল দূরবর্ত্তী হইবে। প্রসিদ্ধ ডাক্তার হাসান বে এবং কানান বে অত্র আমাদের পথপ্রদর্শক। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত এবং উপত্যকা অতিক্রম করিয়া আজিনায় উপস্থিত হইলাম। আমরা রাজস্ব সংগ্রাহক বা তহশীলদারের আফিসে যাইয়া সোজা উপস্থিত হইলাম। তহশীলদার সাহেব আমাদিগকে দেখিয়া পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমাদিগকে যথাযোগ্য আসনে বসাইয়া তহশীলদার সাহেব তৎক্ষণাৎ টেলিফোঁ যোগে গ্রামের কাজী সাহেব এবং অন্যান্য খৃষ্টান ও মুসলমান প্রধান ব্যক্তিদিগকে আমাদিগের শুভাগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ১৫ মিনিট অতীত না হইতে হইতেই গ্রামের কাজী সাহেব এবং আরও ৫ জন গ্রীক ও মুসলমান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ত্রস্তপদে আসিয়া আমাদিগের গভীর সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিনয় ও সৌজন্যে আমরা নিতান্ত প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

আজিনা গ্রামের লোক সংখ্যা ৩০০০ তিন সহস্র। ইহার মধ্যে ২০০০ মুসলমান এবং ১০০০ খৃষ্টান। মুসলমান বালকদের জন্য তিনটী এবং বালিকাদের জন্য একটী স্কুল আছে। খৃষ্টানদিগের একটী স্কুল আছে। গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। গ্রামের বাজারটী বেশ বৃহৎ এবং পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। কয়েকটী কাফিখানা, মসজিদ এবং অনেকগুলি দোকান আছে। আমাদিগের সংবাদ শুনিয়া গ্রামের বহু ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হন এবং আমাদিগের আদর অভ্যর্থনা করেন। এখানে চা বিস্কুট খাইয়া বেলা প্রায় ১২টার সময় বর্গাস নামক প্রসিদ্ধ পল্লী দেখিবার জন্য এখান হইতে রওয়ানা হই। প্রায় ১॥ দেড় ঘণ্টা অশ্বচালনার পরে আমরা বর্গাস গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হই। এখানের কাজী সাহেব এবং এমাম সাহেব আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। শীতল জলপান এবং কাফী সেবন করিয়া আমরা এখান হইতে শীঘ্রই বিদায় গ্রহণ করি। এই গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়া আমি এবং মৌলবী আব্দর রহমান পেশোয়ারী খুব বেগে ঘোড়া হাঁকাই। ঘোড়া বেগে ছুটিতে থাকে। ছুটিতে ছুটিতে আমার সম্মুখের দলবদ্ধ সহকারীদিগের অশ্ব শ্রেণীতে বাধা পাইয়া আমার তেজস্বী অশ্ব সহসা লাফাইয়া উঠে এবং তাহার ফলে আমি সজোরে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হই। পশ্চাৎ হইতে দুইটী ঘোড়া আমার উপর দিয়া বেগে চলিয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় আমি কোনও আঘাত প্রাপ্ত হই নাই। আমার সাংঘাতিক পতনে আমার সতীর্থগণ আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন! তুর্কী এবং হিন্দুস্থানী সকলেই ছুটিয়া আসেন। কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ অক্ষত অবস্থায় ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করায় সকলেই 'সাবাস' 'সাবাস' করিতে লাগিলেন। সকলে আমাকে সেই তেজস্বী অশ্ব ত্যাগ করিয়া একটী ঠাণ্ডা ঘোড়ায় চড়িবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি দৃঢ়তার সহিত বলিলাম যে, "যখন এই ঘোড়া হইতে ভূপতিত হইয়াছি, তখন ইহাতেই চড়িব।"

অতঃপর আমরা "কোটা আলী" নামক গ্রামে উপস্থিত হই। এইখানের গ্রামের বহির্ভাগস্থ এক মাঠের মধ্যে উপস্থিত হইয়া এক প্রকাণ্ড 'চানার' বৃক্ষের ছায়ায় আমাদের বনভোজনের আয়োজন হয়। পাঁউরুটী, মাখন, পনির, মাংস একপ্রকার পায়স, দধি এবং প্রচুর ফলমূল দ্বারা গ্রামবাসিগণ আমাদিগকে পরিতৃপ্তরূপে ভোজন করান। বালকেরা গ্রাম হইতে অনেক কার্পেট এবং বালিস আনিয়া আমাদিগের বিশ্রামের বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। আমরা যেমন রৌদ্রে গলদঘর্ম্ম তেমনি ক্ষুধায়ও নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। সুতরাং বৃক্ষতলে মুক্তপ্রান্তরে আহার ও বিশ্রাম করিয়া পরম সুখানুভব করিতে লাগিলাম। প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং আমার অকৃত্রিম বন্ধু হাসান বে পূর্ব্বেই এই বনভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। খাদ্যদ্রব্যের কতকাংশ চামওবা হাঁসপাতাল হইতে অশ্বপৃষ্ঠে আনীত হইয়াছিল। সুদূর দেশের তুর্কী ও ভারতবাসী

এই প্রীতিকর বনভোজনের মধুর স্মৃতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে!

অনন্তর আমরা পুনরায় অশ্বারোহণে বহু পর্ব্বত এবং আরণ্যভূমি অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী 'আনিচা' নামক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হই। 'আনিচায়' যাইবার সময় পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ এক অতি সূক্ষ্ম-পথ অতি সন্তর্পণে আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তে এখানে অশ্বের পদস্খলনের আশঙ্কা হইতেছিল।

আনিচা একটী সুন্দর গ্রাম। গ্রামের নিম্নদেশ দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত। এখানে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। এই প্রস্রবণের জল কয়েকটী চৌবাচ্চায় ধরিয়া অতি সুন্দর কয়েকটী স্নানাগার প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই জলে স্নান করিলে নানাপ্রকার ব্যাধি বিশেষতঃ গেঁটেবাতের উপশম হয় বলিয়া বহু লোক এখানে স্নান করিতে আসে। এই সমস্ত স্নানযাত্রীর সুবিধা এবং আরামের জন্য এখানে একটী রমণীয় বৃহৎ হোটেলও প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু গ্রামটী সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া গ্রীক এবং ইটালীদিগের রণতরীর গোলাবর্ষণের ভয়ে গ্রামবাসীদিগকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। গ্রামটী এক্ষণে উপকূলরক্ষাকারী তুর্কীসৈন্যদিগের অধিকারের মধ্যে পড়িয়াছে। আমরা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্নানাগার পরিদর্শনের জন্য গমন করিলাম। প্রস্রবণটী বেশ বৃহৎ। জল অত্যন্ত উষ্ণ। জলে গন্ধকের তীব্র গন্ধ অনুভূত হইল। স্নানাগারটী কাষ্ঠ দ্বারা উত্তমরূপে নির্ম্মিত এবং বহু কুঠরীতে বিভক্ত। তুর্কী স্নানাগার বাস্তবিকপক্ষে এক বিলাসের উপকরণ। "আনিচা" গ্রাম হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা অশ্বারোহণে দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর সাহের স্থাপিত দ্বিতীয় ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ দর্শন মানসে গমন করি। পথিমধ্যে জনৈক তুর্কী কর্ণেল সমস্ত সৈন্যসহ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। এখানে আমরা অশ্বপৃষ্ঠেই জলপান করিয়া ট্রয়ের দিকে বেগে অশ্ব পরিচালনা করি। চানার চাম ও জয়তুন বৃক্ষের বনের ভিতর দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত অশ্বপরিচালনা করিয়া আমরা ভূমধ্য বা ভূমধ্যের অংশ লিবাঁত (লিবাণ্ট) সাগরের তীরদেশে উপস্থিত হই। এক দিকে শ্যামায়মান বনরাজির একটানা সবুজ দৃশ্য আর অন্য দিকে মহাবিস্তৃত সমুদ্রের শান্ত স্নিগ্ধ নীলিমার কি মনোহর সমাবেশ! এশিয়ার শ্যাম-তীর রেখা হইতে যখন প্রাচীন বীরগণ ইউরোপের দিকে দৃক্‌পাত করিতেন, তখন ইউরোপ বিজয়ের বাসনা স্বভাবতঃই যে, তাঁহাদের মনে বলবতী হইয়া উঠিত, তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইতে লাগিল।

অনন্তর আমরা একপ্রকার অতি সুগন্ধি তৃণপূর্ণ ভূমির মধ্য দিয়া অশ্ব চালনা করিলাম। এই তৃণগুলি মখমলের ন্যায় কোমল। কস্তুরী মৃগের ইহা অতি প্রিয় খাদ্য। ডাক্তার হাসান বে বলিলেন যে, "এই ময়দানে এই সুগন্ধি তৃণ ভক্ষণের জন্য দলে দলে হরিণ বিচরণ করিতে আসে।" অতঃপর আমরা আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষের নিকটবর্ত্তী হইলাম। একটী ক্ষুদ্র নগর এবং বহুসংখ্যক প্রাসাদের ধ্বংস আমাদের গোচরীভূত হইল। কয়েকটী মার্ব্বেল পাথরের অখণ্ড স্তম্ভ দেখা গেল। অধিকাংশ স্তম্ভই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে আমরা রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলাম। রাজপ্রাসাদের সামান্য অংশই দণ্ডায়মান আছে। একটী বুরুজের কিয়দংশ এখনও বিদ্যমান আছে। বুরুজ অপেক্ষা তোরণ দ্বারই বেশী উচ্চ। আমি অশ্বসহ তোরণের আশ্রয়স্তম্ভের উপর আরোহণ করিলাম। এখান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্র বনরাজি এবং গিরিমালা দেখা যাইতে লাগিল। তোরণের উপরে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ইউরোপ দর্শন করিতে করিতে আমার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল হায়! যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া তুরস্কে জন্মগ্রহণ করিতাম, তবে আজ আর বোধ হয় শুধু অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া অলীক কল্পনায় অভিভূত হইতে হইত না। বর্ত্তমানে জাতীয় শোচনীয় দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার আঁখি ছলছল্ করিয়া উঠিল! হায়! বলকান

রাজগণ! আজ তোমরা যেমন করি য়া মুসলমানের প্রভুত্ব ও গৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহা-দিগকে বিদলিত ও বিতাড়িত করিতেছ, তাহা নিতান্তই মর্ম্মবিদারক এবং একান্ত অসহনীয়।

সিরাজী।

পুরাতন পল্লীচিত্র।

(২)

ব্রত পূজা।

সে কালে পল্লীগ্রামে কত প্রকার পূজা পার্ব্বন ছিল, তাহার ব্যাখ্যা করা দুরূহ; এখন এই সমস্ত পূজা পার্ব্বন অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে—নব্যারা তাহার নাম পর্য্যন্ত জানেন না। বার মাসে তের পার্ব্বন একটা ধরা কথা ছিল, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে পার্ব্বন যে কত তের ছিল, তাহা বলা দুরূহ। তা'ছাড়া কত দেবতার পূজা,—চণ্ডী পূজা, সূর্য্যের পূজা, গঙ্গা পূজা, মনসার পূজা, ক্ষেত্রদেবতার পূজা, বাস্তুদেবতার পূজা। ইহা ছাড়া আবার কতগুলি ব্রত ছিল,—ভীম একাদশী, অক্ষয় তৃতীয়া, জন্মাষ্টমী, নিরম্বু উপবাস, শিবরাত্রির ব্রত, এ গুলির পরও আবার কতগুলি বড় উৎসব ছিল,—যেমন দুর্গোৎসব, কালীপূজা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, বাসন্তী উৎসব, কোজাগর পূর্ণিমা, তার পর ছোট ছোট কতগুলি ব্রত ছিল, সে গুলির যখন তখনই আবির্ভাব হইত,—দিনক্ষণ বড় বিশেষ মানিত না।

পূজা পার্ব্বনের সংখ্যাধিক্যের কথা মনে করিয়া নব্যারা আজকাল পুরুত ঠাকুরের অর্থোপার্জ্জনের ফন্দি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তৎকালে অনেক পূজার উপদেষ্টার ও মন্ত্রপাঠের কার্য্য বৃদ্ধাগণ দ্বারাই সম্পন্ন হইত এবং অনেক পূজার মন্ত্র সংস্কৃতেও ছিল না।

বৃদ্ধাদের গ্রাম্য ভাষায় রচিত ছড়াই মন্ত্রের কাজ করিত। ভাই ফোঁটা, জামাই ষষ্ঠী প্রভৃতি উৎসবে পুরুত ঠাকুরের কোন আবশ্যকই ছিল না।

ছোট ছোট বালিকাদের অনেক রকম ব্রত ছিল। সেই ব্রতগুলিতে বালিকারা ভবিষ্যতে গৃহিণী হইয়া কি প্রকার কার্য্য করিবে, তাহারই পূর্ব্বাভা[স] সূচিত হইত; বালিকারা তাহাতে ভক্তিমতী [...] অনির্দ্দিষ্ট স্বামীদেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া উঠিত।

বড় বড় উৎসব গুলিতে গ্রামবাসীদের আনন্দ উছলিয়া পড়িত; উৎসব আনন্দে তৎকালে ছোট বড় জ্ঞান ছিল না; ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই উৎসবে আনন্দের সমান অংশ লইত।

গ্রাম্য বৃদ্ধেরা

সন্ধ্যাকালে প্রায় সকলে একত্রিত হইত, এবং সকলে মিলিয়া নানা প্রকার বৈঠকী গাল গ[ল্প] করিত। গাল গল্পে কেহ কেহ এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিত যে সর্ব্বত্রই তাহাদের সম্মান ছিল, অদ্ভুত অদ্ভুত গ[ল্প] বানাইয়া তাহারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সেই সমস্ত গাল গল্পকারীদের নাম এখনও বৃদ্ধাদের মুখে শোনা যায়! এই গাল গল্পের মধ্যে উত্তর প্রত্যুত্তরও চলিত। কেহ কেহ অত্যদ্ভুত গ[ল্প] শোনাইয়া শ্রোতাদের নিকট হইতে রসিকতাও উপ[...]হার পাইত। এক বৃদ্ধ বলিলেন—একদিন আমি অনেক দূরে এক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা বনের মধ্যে একা পড়ি; সেই বনে মস্ত মস্ত ব[...] কি বল্‌বো দাদা, সত্য সত্যই দেখি আমার সম্মুখে হাতীর মত, প্রকাণ্ড একটা বাঘ!—কি করি উপায়—সাম্‌নে দেখি প্রকাণ্ড একটা শরষে গাছ ৫০।৬০ হাত উঁচু হবে, আমি ত এক লাফে সে গাছের উপর চড়ে বস্‌লুম্। বাঘটা কিন্তু গা[ছ]তলায় থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না—কি করি উপায়, রাত্রিও হয়ে যাচ্ছে, তখন দেখি শরষে গাছে বেলের মত কি ফলেছে—শরষেই হবে, অগত্যা তাই দিয়ে বাঘকে ত ঢিল মার্‌তে লাগলুম.—এক ঢিল— দুই ঢিল—তিন ঢিলে বাঘটা ত 'অক্কা' পেলে। কেমন বাছা বাঘ! আমি মনে কর্‌লুম, কি বাহাদুর শরষে—বাঘ পর্য্যন্ত মারা চলে; দেখি ত এতে কত তেল হয়; হাতে নিয়ে একটা শরষে ঘসা দিতেই দেখি—কি বল্‌বো আর ভাই, কম পক্ষে ১০।১২ সের তেল ত বের হলই; কয়েকটা শরষে 'কোছে' নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। বাঘটা নিয়ে আস্‌লে তোমাদের দেখাতে পার্‌তুম্ কিন্তু সেটা রইল পড়ে সেই গাছতলায়।

ইহা শুনে একজন শ্রোতা বল্লেন,—তবে শুনুন্ আমার গল্পটা—সেও ভারি আশ্চর্য্যি!

"বলহে বল" সকলের মুখ থেকে এই কথা বেরুল।

সেই শ্রোতা বল্‌তে লাগলেন,—একদিন ত দুপুর রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে ১০।১২ জন অতিথ্ এসে উপস্থিত হল, ঘরে কিছুই ছিল না, অতিথ্‌কে ভাল করেই থাওয়াতে হয়—রাত্রি বেলা কার কাছেই বা যাই আমি ত 'ওছা' টা নিয়ে পুকুরে গেলাম একটা 'খেও' দিতেই দেখি ওছা ভরে কেবল পাঠা থাসি আ'র ভেড়া; এগুলি ত বাড়ী নিয়ে এলাম, এখন এত মাংস রাঁধিবার ঘি তেলই বা পাই কোথায়! জান্‌তুম্ বলরাম দাদার ঘরে 'রাজ্যের তৈল'—১০।১২ সেরী একটা শরষে মজুত!—ভাবনা কি? আমি ত ভাই, বাড়ী খুঁজে খুঁজে কোথাও শরষে দেখ্‌তে পেলাম না, তার পর দেখি, বিছানার ধারে কালো একটা কি পড়ে আছে, আমি ত ভাই সেটাকে শরষে বলে তুলে নিতেই ভায়া ত একেবারে "মাথা গেল" বলে চীৎকার করে উঠ্‌লে। তখনই আমি বুঝ্‌তে পার্‌লুম, ভায়ার মাথায়ই যত শরষে গাছের জন্ম।

ইহাতে পূর্ব্বের গল্প বক্তা একটু উষ্ণ হয়ে শ্রোতাদের বোঝার শক্তির অল্পতার জন্য ক্ষোভ করিয়া অতঃপর তিনি আর গল্প বলিবেন না, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও এক ছিলিম তাম্রকূট ধ্বংসের পর পুনরায় সানন্দচিত্তে আর এক অদ্ভুত গল্প সুরু করিলেন। এই সমস্ত গল্পের মধ্যে বাদ প্রতিবাদ এবং পরস্পরের প্রতি আক্রমণও চলিত, কিন্তু সেটা বিদ্বেষবুদ্ধি ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া নহে—তাহা অনন্দপূর্ণ সবল হৃদয়ের; কারণ এই প্রকার না হইলে গল্প ভাল করিয়া জমিয়া উঠিত না।

বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকে সঙ্গীতানুরাগীও ছিল; সঙ্গীতানুরাগী বৃদ্ধ মাত্রেই একটু বিশেষ ভক্ত ও ভাবুক হইত। তাহারা রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়ক গান ও নানা প্রকার মালসী গানই পছন্দ করিতেন, হাস্য কৌতুকের মধ্যে তাহাদের গতিবিধি বড় কম ছিল।

গ্রাম্য বালক।

তখনকার দিনের ছেলেরা খুব দুষ্ট ছিল, কিন্তু বিন্দুমাত্র হীন প্রকৃতির ছিল না। দুষ্টামির মধ্যে তাহাদের স্বভাবের উদারতা ও প্রশস্তচিত্ততাই প্রকাশ পাইত, তাহারা সবল হাস্যজনক আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিত। দুষ্টামি দ্বারা অধিকাংশ সময়ই তাহারা নিগৃহীতের অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছে। ঘরের বাহিরের ছিদ্র পথে নল প্রবিষ্ট করিয়া গৃহাভ্যন্তরের কড়াইর দুগ্ধ তাহারা উদরসাৎ করিয়াছে, আম চুরি করিয়াও তাহারা বৃক্ষাধিকারীর নিমন্ত্রণ লাভ করিয়াছে। তখনকার বালকেরা নানাপ্রকার খেলায় প্রমত্ত থাকিত, তাহার অনেকগুলিই এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কপাটি, গোল্লাছুট, মোম কাড়াকাড়ি, চোর পালান এ গুলিই বোধ হয় প্রসিদ্ধ।

ভাষাণ ও রামায়ণ গান।

ভাষাণ ও রামায়ণ গান সেই সমস্ত দিনে প্রতি পল্লীতেই হইত; অনেক পল্লীতেই রামায়ণ গান ও ভাষাণ ও যাত্রার দল ছিল। ভদ্রলোকেরাও এই সমস্ত গান ও যাত্রায় নায়ক সাজিত। ভাষাণ ও রামায়ণ গানে বহু সহস্র লোক একত্রিত হইত। রামায়ণ গান আরম্ভ হইলে শেষ হইতে ২।৩ মাস কাটিয়া যাইত। রামের জন্ম হইতে রামের মহাপ্রস্থান

পর্য্যন্ত না হইলে রামায়ণ গান শেষ হইত না। এই সমস্ত রামায়ণ গানে সম্পন্ন গৃহস্থেরা পালা উপলক্ষ্য করিয়া রামের অন্নপ্রাশন রামের বিবাহ, রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ইত্যাদি অভিনয়ের দিন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত।

কবির লড়াই।

কবির লড়াই তৎকালে আর একটী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল। দুই দল বাকযুদ্ধপ্রয়াসী সঙ্গীতদল একত্র হইয়া পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা কবির লড়াই সম্পন্ন করিত। কবির দলের যিনি 'সরকার' হইতেন তাঁহারই বিশেষ প্রতিভা আবশ্যক করিত, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অতি সত্বর কবিতা রচনার কৌশল তাঁহার বিশেষ আবশ্যক হইত। এক পক্ষের সঙ্গীত শেষ হইতেই প্রতিপক্ষ অগৌণে দ্বিতীয় একটী সঙ্গীত দ্বারা পূর্ব্ব পক্ষের যথা-যথ উত্তর না দিতে পারিলে সভাজন সমক্ষে লজ্জিত, তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া তাঁহাকে সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে হইত! দুই দলের মধ্যে এক দল রাধা, অপর দল শ্রীকৃষ্ণ সাজিত, এবং পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা একে অন্যকে পরাজয়ের চেষ্টা করিত। এমন করিয়া কেহ গঙ্গা, কেহ দুর্গা, কেহ শিব, কেহ কৃষ্ণ, কেহ ইন্দ্র, কেহ বরুণ সাজিত, পৌরাণিক সূত্র ধরিয়া একে অন্যের দোষ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিত, কখনো পৌরাণিক ব্যাখ্যাও চাহিয়া বসিত; কেহ বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার নানা প্রকার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিত। সমস্ত পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারত কণ্ঠস্থ না থাকিলে কবির দলের সরকার হইতে পারিত না। ইহাতে ভালমন্দ দুই থাকিত। কিন্তু শেষে গালাগালির প্রাচুর্য্যে কবির লড়াই অশ্লীলতায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

"যাত্রা শোনে 'ফাত্রা' লোকে
কবি শোনে ভদ্র লোকে।"

এই কথা আর শেষ পর্য্যন্ত রহিল না। পৌরাণিক সূক্ষ্মতত্ত্বসকল বিশ্লেষিত হইত বলিয়া ভদ্রলোক মাত্রেই "কবির গান" পছন্দ করিতেন। "কবির গান" যখন "কবির লড়াইএ" পরিণত হইল তখন ইতর লোকই তাহা পছন্দ করিতে লাগিল। যাত্রা গানে কোন তত্ত্ব বিশ্লেষিত হইত না—কেবলমাত্র কোন পৌরাণিক অংশটুকু গানে অভিনীত হইত, কাজেই তাহা 'ফাত্রা' বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের উপযুক্ত ছিল।

তীর্থযাত্রীর দল।

সেই সব দিনে তীর্থযাত্রা বড় সহজ সাধ্য ছিল না; প্রায়ই লোকে দল বাঁধিয়া তীর্থ যাত্রায় রওনা হইত; পথে দুর্ঘটনা ও বিপদ সর্ব্বদাই ঘটিত; কাজেই তীর্থযাত্রীরা প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট অন্তিম বিদায় লইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইত। চোর ডাকাতের ভয় ও তখন দেশে প্রবল ছিল। যদি তীর্থযাত্রীরা মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া কোনক্রমে আসিয়া দেশে পৌঁছাইতে পারিত, তবে তাহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দূরান্তর হইতে বহু লোকের সমাগম হইত; দর্শকবর্গের নিকট তাহাদের তীর্থ ভ্রমণের অদ্ভুত কাহিনী বলিতে বলিতে তাহাদের বার্দ্ধক্য জীবন অন্তিম প্রান্তে অবসর গ্রহণ করিত।

গো-পালন ও দেশের স্বাস্থ্য।

গো-পালন তৎকালে পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত; গো-হীন পরিবারে লক্ষ্মী বসতি করে না,—লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল। পল্লিগ্রামের লোক ঘি, মাখন, দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে আহার করিত; তাহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন ও দেহ বলশালী ছিল। নির্ম্মল পানীয় কোন গ্রামেই দুর্লভ ছিল না; কাজেই দেশের স্বাস্থ্য বড় সুন্দর ছিল। কলেরা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগও তৎকালে অজ্ঞাত ছিল। অধিকাংশ লোকই অক্ষুন্ন স্বাস্থ্য লইয়া বৃদ্ধ বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইত; তখনকার দিনে যত অধিক সংখ্যক বৃদ্ধ দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন তাহার এক শতাংশও দেখা যায় না। শতাধিকবর্ষজীবি লোক গ্রামে গ্রামেই পাওয়া যাইত; এখন সহস্রে—এমন কি লক্ষে একটী পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। সে সময়কার মত দীর্ঘ, প্রশস্ত বলবান লোক আজ কাল দেখাই যায় না।

জাতীয় সমাজ বন্ধন, গ্রাম্য বন্ধন, হরিসভা ও হরিসংকীর্ত্তন।

সে দিনে জাতীয় সমাজ বন্ধন বড় সুদৃঢ় ছিল,

অন্যায় কার্য্য সমাজে অতি অল্পই ঘটিত। সামাজিক শাসন সকলেই মানিয়া চলিত, নবদ্বীপ ব্রাহ্মণ সমাজের চক্রবর্ত্তীত্ব সকল সমাজই মানিয়া লইত। সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজে আপিল চলিত। গ্রামে গ্রামে হরিসভা ও হরিসংকীর্ত্তনের দল ছিল। হরিসভায় ব্রাহ্মণ শূদ্র চণ্ডাল সকলেই সম্মিলিত হইতে পারিত। হরিসভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় বিচার বিতর্ক চলিত। হরিসংকীর্ত্তনে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই এক সঙ্গে নাচিয়া গাইয়া ভাবে মত্ত হইত। কোন বাড়ীতে দুইটী সংকীর্ত্তনের দল নিমন্ত্রিত হইলে 'পালা' গাইয়া একে অন্যপেক্ষা উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা করিয়া ও গাইয়া প্রশংসা অর্জ্জনের চেষ্টা করিত; এই জন্য সংকীর্ত্তনকারীদের গানের ভাণ্ডার নানা প্রকার উৎকৃষ্ট সঙ্গীতে পূর্ণ থাকিত। হরিসভায় ভাগবত পাঠ হইত এবং সকলে অতি মনোনিবেশ সহকারে তাহা শ্রবণ করিত। হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণী এই হরিসভা ও হরিসংকীর্ত্তন দ্বারা উচ্চ সমাজের ভাব অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

পল্লী-মাধুর্য্য।

পল্লীর মাধুর্য্য সব বিষয়েই পূর্ণ ছিল,—দৃশ্যে, গানে, ছন্দে। পল্লী প্রকৃতি শ্যামল তরুলতা জালে সুশোভিত, শস্যস্তবকভারাবগুণ্ঠিত হরিৎ প্রান্তরে বেষ্টিত; নির্ম্মল কাকচক্ষু জলপূরিত দীর্ঘিকার স্ফটিক দর্পণে নীল আকাশ ও বৃক্ষের ছায়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া কেমন সুন্দর রহস্যালোক সৃষ্টি করে। পুষ্প-ফসলের ও বন-পল্লবের আঘ্রাণ-মুগ্ধ পবন চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। বনছায়া পল্লবের কোন নির্জ্জন গুহা হইতে ঘুঘু করুণ ক্লান্ত সুরে ক্ষণে ক্ষণে ডাকিয়া ওঠে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দয়েল গৃহ চালে কিম্বা গৃহ সন্নিকটবর্ত্তী উচ্চতম বৃক্ষ শিরে বসিয়া কি সুন্দর শিষ দেয়; "বৌ কথা কও" পাখী সময় অসময়ে ডাকিয়া উঠিয়া বধূদের অজ্ঞাত হৃদয় রহস্য জানিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। বসন্ত দিনে আম্রমঞ্জরী বিকশিত হইয়া তাহার সুধারসের অন্তঃস্থলটী যখন দৃঢ় করিতে প্রথম প্রয়াস পায়, তখনই কোকিল নিজের কণ্ঠে বাকবাদিনীকে জাগাইয়া তোলে,—কু-উ কু-উ স্বরে পল্লী প্রান্তর একাকার করিয়া যেন নব জীবনের চেতনা আনয়ন করে। শরতে শিশির স্নাত দূর্ব্বাদল ও বৃক্ষপত্র পত্রে নবীন ভানুকিরণে অনুরঞ্জিত হইয়া কি দিব্য শ্রী বিকশিত করে! আনন্দের একটা মধুময় ছন্দ পল্লীর সমস্ত দেহেই যেন ঝলসিত হয়—একটা মধুময় প্রীতিরস স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় প্রতিবেশী সকলের মধ্য হইতে উৎসারিত হইয়া পল্লীকে আনন্দের ধারায় মগ্ন রাখে। আত্মীয়, অনাত্মীয়, অতিথি আগন্তুক সকলের মধ্যেই সহানুভূতি প্রীতি ও জীবনের একটা নিগূঢ় বন্ধন পরিলক্ষিত হয়।

সুখ দুঃখ।

তৎকালের সুখ দুঃখের কথা আলোচনা করিতে গেলে বলিতে হয়, তৎকালে দুঃখের অত্যধিক তীব্রতা ছিল না; পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনাই তাহার একমাত্র কারণ। একজনের দুঃখ দেখিয়া ১০ জন সমবেদনা প্রকাশ করিলে তাহার দুঃখের তীব্রতা বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এখানকার লোক পরস্পরের প্রতি যতই সহানুভূতি শূন্য হইতেছে, লোকের দুঃখ কষ্ট নৈরাশ্য ততোধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। লোকের স্বার্থ ও আত্মতুষ্টির ভাব যতই বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে, লোকের মনে সহানুভূতির ভাব ততই কম হইয়া আসিতেছে। সুখে ও পল্লীগ্রামে আনন্দের লহরী ছুটিত—একজনের সুখে দশজন আনন্দিত হইত।

সমালোচনা।

প্রাচীনকালের সহিত বর্ত্তমান কালের সমালোচনা করিতে গেলে স্পষ্টই দেখা যায়, লোক ক্রমেই সহানুভূতি শূন্য হইয়া পড়িতেছে, ইহাতে হৃদয়বান লোকের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে মনে হয়। তখনকার লোক বর্ত্তমান সভ্যতার ওজন হিসাবে অনেক পশ্চাতে থাকিলেও তাঁহারা বড় সরল ও উদার অন্তঃকরণের লোক ছিলেন।

তাঁহারা যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা প্রাণ দিয়া সম্পন্ন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। নিজের সুখ স্বচ্ছন্দের প্রতি তাঁহাদের আদৌ দৃষ্টি ছিল না। পরের জন্য খাটিতে তাঁহারা কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হইতেন না। বর্ত্তমান কালে সে প্রকার লোকের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। মহৎ কার্য্যে আত্ম-দান করিবার লোকের সংখ্যা বিরল বলিয়া বোধ হয়। তৎকালে লোকেরা নানাপ্রকার কুসংস্কার বা বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালে অধিকাংশ লোককেই কোন মহৎ বিষয়ে আস্থা প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। বর্ত্তমান কালের সহরগুলির আর একটী কুফল এই যে এক পাড়া প্রতিবেশী, এমন কি এক বাড়ীর দুই অংশবাসী পরিবারের মধ্যে দেখা শোনা বা সৌহৃদ্য স্থাপনের কোন আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন না; নিজ নিজ সুখ লইয়াই সকলে ব্যস্ত; দুঃখের সময়ও কেহ কাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসে না। যদিচ পল্লীগ্রামে এই ভয়ঙ্কর ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই, কিন্তু একালের লোক প্রকৃতই আন্তরিক সহানুভূতিশূন্য। সেই সব দিনে এক জনের বিপদে ১০ জনে স্বতঃই প্রাণ দিতে অগ্রসর হইত, আজ কাল সেরূপ ঘটনা কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

জাতীয় অনৈক্য।

মানুষ মানুষের প্রতি যতই সহানুভূতি শূন্য হইতেছে, জাতীয় অনৈক্যও তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতীয় ঐক্যের সমৃদ্ধি কল্পে সহানুভূতি ও পরার্থপরতা যে একান্ত আবশ্যকীয় উপাদান তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন! পরার্থপর বুদ্ধি দ্বারা জাতীয় অভাব সহজে উপলব্ধি করা যায় এবং তৎসঙ্গে জাতীয় সদ্ভাব বা অভাব দূরীকরণার্থ আত্মত্যাগের ইচ্ছাও হৃদয়ে বলবতী হয়। একদেশবাসী কিম্বা এক ধর্ম্মাবলম্বী ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার ঐক্যের ধারা আমাদের দেশে অত্যন্ত সজীব বলিয়া বোধ হয় না। পাশ্চাত্য দেশে একদেশবাসী বলিয়া জাতীয় ঐক্যের মূলে সুদৃঢ় শক্তি লুক্কায়িত আছে, এবং সেই শক্তির সাহায্যে তাহারা এত প্রবল প্রতাপান্বিত ও নানা বিষয়ে জাতীয় সমৃদ্ধি স্থাপনে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের দেশেও এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া একটা বিরাট ঐক্যের ভাব ছিল। বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ, গুজরাট ও রাজপুতানা এক ঐক্য বন্ধনে বদ্ধ ছিল। হিন্দু-দিগের দেশব্যাপী তীর্থই বোধ হয় ইহার অন্যতম কারণ। একজন মহারাষ্ট্রবাসী সুদূর পশ্চিম প্রান্তে থাকিয়াও বারাণসী, পুরী কিংবা কুরুক্ষেত্রকে স্বীয় জন্মভূমি অপেক্ষা অধিক প্রিয় ও পবিত্র মনে করে; একজন বঙ্গদেশবাসী সুদূর পশ্চিম প্রান্তের দ্বারকা ও নাসিক তীর্থকে প্রিয় বিবেচনা করে; কাজেই তদ্দ্বারা দূরকেও আপনার বলিয়া উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা জন্মে।

আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে যে সহানুভূতি-শূন্যতা পরিলক্ষিত হয়, তাহা ঘোরতর জাতীয় অমঙ্গলের কারণ।

স্বার্থ ও সমাজের বিশৃঙ্খলা।

প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থ লইয়া লিপ্ত আছে বলিয়া জীবন সংগ্রামের কঠোরতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। লোক নৈরাশ্য ও সহানুভূতির অভাবে ঘোর জীবন যুদ্ধে দুর্দ্দম বন্য পশুর তুল্য হইয়া উঠে! ইহা অপেক্ষা জাতীয় জীবনের ঘোর অধঃপাত আর কি হইতে পারে! স্বার্থপরতা দ্বারা সৌহৃদ্যপূর্ণ সমাজের ঐক্যবন্ধন বিলুপ্ত হইয়া ঘোর বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিয়াছে।

সমাজের হিত প্রবৃত্তির ইচ্ছাও অধিকাংশ লোকের মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সমাজ এখন ক্ষমতাপন্নের পেষণ-চক্রের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

সমস্ত ব্যাপারে "গ্রামের ভাল দশ জনই কর্ত্তা," এই সুবুদ্ধিও বিলুপ্ত হইয়াছে। স্বার্থপর ও ক্ষমতাপন্নেরাই সমাজের উচ্চ আসনগুলি অধিকার করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সমাজ দেশ জাতি সমস্তই ঘোর বিশৃঙ্খলাময়। এ সময় আমাদের কর্ত্তব্য কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

এই পল্লীসমাজগুলির পুনঃপ্রবর্ত্তন দ্বারা জাতীয় মেরুদণ্ড সুদৃঢ় করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে নিঃস্বার্থ পঞ্চায়েত প্রথা স্থাপন করা উচিত; যাহা দ্বারা পল্লী-

গঠন, শিক্ষা, উন্নতি, স্বাস্থ্য সমস্ত বিষয়ে যথোচিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এই

আমাদের কর্ত্তব্য।

প্রকার পল্লীসমাজগুলির প্রতিষ্ঠা দ্বারা জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি সুদৃঢ় করা হইবে এবং ইহাতে দেশের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সমস্ত প্রকারের কল্যাণের সূত্রপাত হইবে। এই পল্লী সমাজের সঙ্গে পল্লীভাণ্ডার সংস্থাপিত হইলে তদ্বারা পল্লীগ্রামের বহু মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে।

দরিদ্রতম পল্লীতেও দেখা গিয়াছে একমাত্র মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া যে অর্থ সঞ্চিত হয় তদ্বারা পল্লীর পাঠশালার ব্যয় ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন হইতে পারে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। পল্লীগুলিকে আর দুর্দ্দশার করে কবলিত না রাখিয়া দেশের নিঃস্বার্থ ব্যক্তিরা এই শুভকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে দুর্দ্দশাগ্রস্থ দেশের যথার্থ উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

দেশের কয়েক সহস্র পরার্থপর যুবক প্রত্যেকে এক একটী পল্লীকে আদর্শ পল্লীরূপে গঠন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে স্বীয় জন্মভূমির দুর্দ্দশা মোচনে প্রথম তীর্থযাত্রীর পথানুসরণে জাতীয় জীবনের পথ মুক্ত করিতে আরো বহু সহস্র যুবক অগ্রসর হইবেন। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন আর ঘোর তমসাচ্ছন্ন মনে হইবে না।

সমাজের উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের কার্য্য—সমাজের অহিত দূরীকরণের চেষ্টা, সমাজের পুনর্গঠন ও পল্লীসমাজ স্থাপনের চেষ্টা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

দেশনায়ক।

(গল্প)

আমি পাড়াগেঁয়ে ছেলে। পূর্ব্ববঙ্গে আমার নিবাস। গরীবের ঘরে আমার জন্ম। সাহেব বাড়ীতে ডালি দিবার মত বাঁধাকপির ন্যায় বড় একটা মাথা, আর ম্যালেরিয়া দেবীর প্রসঙ্গলব্ধ ক্ষুদ্রাকৃতি ঢাকের ন্যায় উদর একটা—এই দুই সম্পত্তি শৈশব পার হইয়া কৈশোরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই অর্জ্জন করিয়াছি। আমার অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধনীর দ্বারে ঋণগ্রস্থ দরিদ্র প্রতিভার ন্যায় উদর ও মাথার অন্তরালে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন সময়ে ভগবানের ডাক আসিল 'তুমি, কলিকাতায় যাও'।

একটী প্রসিদ্ধ বেসরকারী কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। পরিধেয় ধুতি ও একখানি গাত্রাবরণী কাফ্রীর দাঁতের ন্যায় শুভ্র লহরী তুলিয়া আমার অঙ্গে শোভা পাইতে লাগিল। সহাধ্যায়ীরা আমার শারীরিক সৌন্দর্য্যের মহিমা দেখিয়া গা টিপাটিপি করিলেন। কিন্তু এ' আর ক'দিন টিকে? আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছি, পদক পাইয়াছি, 'জলপানি' পাইয়াছি। দেখিতে দেখিতে বহুলোকের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহ আকর্ষণ করিলাম।

নাটকে দেখিয়াছি মদন মঞ্জরীর প্রেমে তাহার নায়কের বুদ্ধি খুলিয়া গিয়াছিল। অধ্যাপক ও কলিকাতাবাসী সহপাঠীদের স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া আমারো অন্তরে আনন্দ জাগিল। আমার কাল অঙ্গে কিরণের খেলা ফুটিয়া উঠিল। লোণা জলে উদর প্রকৃতিস্থ হইল। তখন বুঝিলাম স্নেহ ও কৃপা দু'টী ভিন্ন বস্তু। গ্রামে থাকিতে মানুষের ও সমাজের কাছে অজস্র অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি। কিন্তু শিশির কণার ন্যায় সযত্নসিঞ্চিত বিন্দু বিন্দু কৃপাতে ভিতরের দেবতার শুদ্ধিকার্য্য সম্পাদন হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম স্নেহ মানুষকে মহৎ করিয়া তুলিতে পারে। স্নেহ, শিকড়-সংগৃহীত রসের ন্যায় মানুষকে বাড়াইয়া দেয়। কৃপা তুষার কণার ন্যায় আতপ তাপে শুকাইয়া যায়। তখন বুঝিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যার ও প্রতিভার পূজার মন্দির। সারা বঙ্গের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক

অকাট্য বন্ধুত্বের সাড়া পাইয়া ভিতরের দেবতা জাগিয়া উঠিলেন। ভাবিলাম, অধ্যয়ন সমাপনান্তে বাংলার গৃহে গৃহে স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিব। পরিবারে যাহার একমাত্র বিধবা জননী, সমাজে যাহার স্থান হেয়, গ্রামে যে দরিদ্র সকলের কৃপাপাত্র, সমস্ত বঙ্গ তাহাকে আপনার জন করিবার জন্য ব্যস্ত, এই সুখে তখন বুক ভরিয়া উঠিল। ফাল্গুনের প্রথম ভাগে মুক্ত গবাক্ষের সম্মুখে বসিয়া এক জ্যোৎস্না রজনীতে এই চিন্তা করিতেছি। অদূরে একদল যুবক খোলা ছাদে বসিয়াছিল। জানি না—কেন তাহাদের এক জন "এসা দিন নেহি রহেগা" বলিয়া হঠাৎ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

* * * *

আজ সমস্ত সহর গড়ের মাঠে ভাঙিয়া আসিতেছে। বিলাতে আজ মহারাণীর মৃতদেহের সৎকার হইবে। কতিকাতার বিভিন্ন পল্লী হইতে কীর্ত্তনের দল মাঠে জড় হইতেছে। হঠাৎ দেখিলাম, আমার ছাত্রাবাসের জীর্ণ সিঁড়ি দিয়া কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনীর ছেলে উপরে উঠিতেছেন। তিনি আমার সহাধ্যায়ী, বয়সে আমার কনিষ্ঠ, অতি সুন্দর যুবক। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার পদ্মের মত মুখখানিতে যেন চিরস্ফুট হইয়া থাকিত। উপরে উঠিয়াই তিনি বলিলেন "চলুন আজ একবার মাঠ থেকে আসি।" আমি অবাক্ হইলাম। কই কখনও তো আমি উহার সহিত মিশি নাই, আজ আমার প্রতি এই অযাচিত অনুগ্রহ কেন? অগত্যা দু'জনে গড়ের মাঠে কেল্লার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম।

দেখিলাম পরিখার পরপারে ছয়টী কামান গর্জ্জন করিয়া মহারাণীর প্রেতাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে। প্রত্যেক কামানের মুখে দুই হাত দেড় হাত বিস্তৃত এক এক খানি ক্ষুদ্র আগুনের চাদর জ্বলিয়া উঠিতেছে, আর চকিতে মিশিয়া যাইতেছে, ও পরক্ষণে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাজি আকাশের গায়ে ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমরা একদৃষ্টে এই আগুনের খেলা দেখিলাম। ধনীর সন্তান আমাকে বলিলেন, "অমূল্য, আজ তোমার আমার একত্র ভ্রমণ... চাদরখানির মত, এর পরিণাম কি তবে ঐ ধোঁয়া..."

আমরা চাঁদপাল ঘাটে গিয়া বসিলাম। ... একখানি ডাক জাহাজ দেখা দিল। আমরা জাহা... জের পালগুলি দেখিয়া খুব সুখ অনুভব করিলাম। শিশির (সহাধ্যায়ীর নাম) বলিলেন, "অমূল্য, ... বৎসর পরে আমরা এইরূপ জাহাজে চড়িয়া পৃ... দেখিয়া আসিব, আমি তোমার সমস্ত ব্যয় ... করিব, আজ তোমাকে এই কথাটী বলিবার জন্য এই স্থানে লইয়া আসিয়াছি। তোমার প্রতিভা... আমার ধনবলে দেশ জাগিয়া উঠিবে।" চির... আমার বিশ্বগ্রাসী বাসনা, আমি প্রীত হইয়া ভা... লাম, 'শিশির কি শাপভ্রষ্ট দেবতা?'—না, 'পরজ... সহোদর ভ্রাতা?'

পরীক্ষা দিয়া মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিয়া... সপ্তাহে শিশির একখানি করিয়া আমাকে ... লিখেন। হঠাৎ একখানি পত্র আসিল—"অ... আজ আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছ, আমি 'ফেল্' হইয়াছি। ... সপ্তাহ পরে তড়িতবার্ত্তা এই স্বপ্নের সফলতা ঘো... করিয়া আমার হৃদয় মন্থন করিয়া দিল। শি... লিখিলেন, "এ যাত্রা আর চাঁদপাল ঘাটের ক... সার্থক হইল না, ভাই, ক্ষমা কর।"

ইতিমধ্যে শিশিরের বিবাহ হইয়াছে। আ... কলিকাতায় ফিরিয়াছি। গোলদিঘীতে, পথে ঘা... অপরিচিত ছেলের মুখে আমার সুখ্যাতি আর ... না। দূর গ্রামে মাকে এই প্রশংসার কথা লি... পাঠাইলাম। মা "ছেলে, আমার ডেপুটী হোক" বলিয়া শিবের মাথায় বিল্বপত্র অর্পণ করিলেন।

হঠাৎ একদিন খবর আসিল, শিশির সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া ডাক্তারের পরামর্শে জল... পরিবর্ত্তনের জন্য সেই দিনই পশ্চিমে যাইতেছে। ... ষ্টেশনে দেখা করিতে গেলাম। রোগজীর্ণ শি... কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "ভাই, ফিরিয়া আসিলে ... হ'বে—কিন্তু ভয় হচ্ছে শেষে কেল্লার কা... ধোঁয়া—।" বলিতে বলিতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

...ছ'মাস পরে ক্ষীণদেহে যষ্ঠি লইয়া শিশির ফিরিয়া ...সিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষত বিক্ষত। ...ক্তারেরা নির্ম্মম ভাবে তাঁহার কোমল অঙ্গে অস্ত্র ...হাযো কুইনাইন বিষ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। ...লিকাতায় আসিয়া তাঁহার পরিচারকের প্রয়োজন ...ল। আমি আহ্লাদের সহিত সেই "সম্মান" ...ণ করিলাম,—কারণ তখন বুঝিয়াছিলাম, যে বন্ধু ...র ইহ-জীবনে পথের আলোক দেখিতে পাই... ...বন না।

হঠাৎ একদিন ডাক্তার আসিয়া রঘুপতির মত ...র্কশ স্বরে বলিলেন, "রক্ত চাই।" মানুষের রক্ত ...বেশ করাইয়া যদি ক'দিন শিশিরের জীবনী শক্তি ...ক্ষ রাখিতে পারেন, ইহাই ডাক্তারের অভিপ্রায়। ...শিরের পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, অনাঘ্রাত কুসুম ...বকের মত বিমল শুভ্র নবপরিণীতা ভার্য্যা শয্যা... ...প্রান্তে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। আমি তখন ...রে ধীরে গায়ের জামা খুলিয়া সুগোল মাংসপেশীর ...প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ডাক্তারের সম্মুখে ...আসিয়া বলিলাম, "সাহেব, তুমি আমার শরীরের যে ...কোনও স্থান হইতে যত ইচ্ছা রক্ত গ্রহণ করিতে ...পার।" সাহেব আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ...করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Brave Lad!" এবং ...ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার হাতের ছোট একটা শিরা কাটিয়া শোষক যন্ত্রে রক্ত গ্রহণ করিলেন। তিন দিন ডাক্তারের অস্ত্র আমার শরীরে প্রয়োগ হইল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের রক্ত একত্র হইয়া মুমূর্ষুর দেহের কিঞ্চিৎ উপকার বিধান করিল। ইংরেজ ডাক্তার বলিলেন, "এমনি ভাবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম একত্র হইলে বাঙ্গালী জাগিয়া উঠিবে, পদ্মার বিস্তৃতি কমিয়া যাইবে, সাগর সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে।" বিস্ময়ে শিশিরের পিতার কণ্ঠ জড়ীভূত হইয়া আসিল। বৃদ্ধ কম্পিত হস্ত আমার মস্তকের উপর রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা, তুমি দেশনায়ক হও।" তখন সেই মুক্ত বাতায়নে ফাল্গুনের চাঁদের আলোকে সুখ স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। মনে মনে বলিয়া উঠিলাম, "সাহেব, তুমি দেবতা—বৃদ্ধ, তুমি পিতা, তোমাদের বাণী সার্থক হোক।" সপ্তাহের ভিতরে শিশিরের আত্মা মহাব্যোমে মিশিয়া গেল।

দুই বৎসর পরে পূর্ব্ব ও পশ্চিম একত্র হইয়া ভগবানের ইঙ্গিতে জোড়া বঙ্গের সৃষ্টি করিল, পদ্মার বিস্তৃতি কমিয়া গেল। দেশে নূতন প্রবাহ ছুটিল। সেই প্রবাহে প্লাবিত হইয়া বহু যুবক কামানের মুখে আগুনের চাদরের মত চকিতে জ্বলিয়া চকিতে নিবিয়া গেল। আমি দেশনায়ক হইব—আমার সম্মুখে আজিও কুণ্ডলীকৃত ধূমরাজি!!

শ্রী—

কেন?

মানব জীবন যদি কেবলি কুহেলি ময়
উদ্দাম বাসনা এত কেন বল তাতে রয়?
জগতের স্নেহ প্রেম জগতের ভালবাসা,
কেন লভিবারে শুধু মিছে হয় এত আশা?
যখন টুটিবে ঘুম এত সব কোথা রবে,
জীবন কুসুম বন যখন শুকায়ে যাবে!
ক্ষণিক চপলা সম ক্ষণস্থায়ী এ জীবন,
কেন তাই সাজাইতে এত করি আয়োজন?

এতই সুখের তৃষা কেন তবে দিলে প্রভু!
বিফল মানব প্রাণে, যদি না মিটিবে কভু?
শান্তি যদি মানবের দূরে, বহুদূরে রবে
বিফল পিপাসা প্রাণে এত কেন দিলে তবে
জীবনে শুধুই যদি অতৃপ্তি নিরাশা হেন,
ক্ষুদ্রতম প্রাণে নাথ? এত আশা দিলে - কেন?

শ্রীচারুহাসিনী দেবী।

হেমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা।

গৌরবের মুকুট পরিধান করিয়া যেদিন কবিবর হেমচন্দ্র এখান হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, সেই দিন স্মরণ করিয়াই আমাদের এই ক্ষুদ্র সভার অধিবেশন। আমরা আজ তাঁহাকে নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ করিতে আসি নাই। আমরা তাঁহার তর্পণ করিতে আসিয়াছি। আমরা তাঁহাকে গৌরব দান করিতে আসি নাই, গৌরবান্বিত হইতে আসিয়াছি। হেমচন্দ্রের সহিত আমাদের কেবলমাত্র স্মৃতিরক্ষার সম্বন্ধ নহে, আমরা যে তাঁহার অনেক পুত্র। হৃদয়ের স্তরগুলি একবার উদ্‌ঘাটন কর, কাব্যে সাহিত্যে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, একবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখ দেখি, বুঝিতে পারিবে কতটুকু তুমি মাইকেলের, কতটুকু তুমি হেমচন্দ্রের, কতটুকু তুমি নবীনচন্দ্রের, কতটুকু তুমি রবীন্দ্রনাথের এবং তোমার নিজস্বই বা কতটুকু। আমরা ত প্রচুর পরিমাণে ইংরাজী কাব্য শাস্ত্রের রসাস্বাদন করিয়াছি। কিন্তু এ যে স্বদেশীয় কবির কবিত্ব—এ যে মাতৃস্তনের রসধারা,—ইহা যে অন্তঃস্থলের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া উহাকে সুশীতল করিয়া তোলে। হেমচন্দ্রের পুত্র পৌত্রগণ দিন দিন বিরল হইয়া পড়িতে পারেন, কিন্তু যতদিন বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা চলিতে থাকিবে, তাঁহার বালক পুত্রগণের সংখ্যা ক্রমিকই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, ইহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পুত্র পিতার রক্ত লইয়া জন্মগ্রহণ করে। একই শোণিত পরস্পরের ধমনীতে প্রবাহিত। পিতার অযাচিত করুণা পুত্রকে শ্রী সম্পদে বিভূষিত করিয়া দেয়। আর যাঁহারা কবিত্বের ঝঙ্কারে অন্তরের ভিতরে আনন্দের তরঙ্গ ছুটাইয়া দেন, প্রেমের বিমল উৎস উৎসারিত করিয়া দেন, হৃদয়কে কোমল ও পবিত্র করিয়া তোলেন, সৌন্দর্য্য উপভোগ স্পৃহা মুখরিত করিয়া দিয়া আপনার কবিত্ব দিয়া সে পিপাসা শান্তি করেন, নূতন আলোক প্রদান করিয়া আমাদিগকে নবজীবনে দীক্ষিত করেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের কি পিতা পুত্রের গুরু শিষ্যের, কৃতজ্ঞ ও কৃতজ্ঞতাভাজনের সম্ব[illegible] বিদ্যমান নাই। মাইকেলের যুগ বা হেমচন্দ্রের যু[illegible] একবার স্মরণ করিয়া দেখ দেখি। বৈষ্ণব কবি[illegible] রচনা, কালীদাস কৃত্তিবাসের রচিত পয়ার ত্রিপদী কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া আড়ষ্ট ভাবে অবস্থান করিতেছিল। আর একদিকে পাশ্চাত্য কবিত্বে[illegible] অরুণালোক আমাদের দেশের উপর প্রতিফলি[illegible] হইয়া ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। শিক্ষিতমণ্ড[illegible] স্বদেশীয় প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের উপরে নির্ম্মম ভাবে ঘৃণার চক্ষু প্রসারিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা বিদেশীয় কবিত্বের একান্ত অনুরাগী হইয়া উঠিলেন। ঠি[illegible] এই সন্ধিক্ষণে মাইকেল ও পরে হেমচন্দ্রের আবির্ভাব[illegible] মাইকেলই বল আর হেমচন্দ্রই বল তাঁহারা উ[illegible] শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজী কাব্য সাহিত্য পা[illegible] করিবার এবং তাহার প্রকৃত রসাস্বাদন করিবার [illegible] অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে[illegible] অনেকের পক্ষে দুর্লভ। তাঁহারা নিশ্চেষ্ট ভা[illegible] ইংরাজী সাহিত্যের ভিতরে ডুবিয়া রহিলেন না[illegible] তাঁহারা পাশ্চাত্য কাব্যের বারিধির ভিতর হইতে র[illegible] রাজি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার কূলে আসিয়া ভাসি[illegible] উঠিলেন। মধুমক্ষিকা দূরদূরান্তরে প্রস্ফুটিত সুগ[illegible] কুসুমের মধুপান করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া সেখানে আত্মবিক্রয় বা আত্মবিসর্জ্জন করে না। মুখে ম[illegible] লইয়া নিজ আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেখানে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে।

মাইকেল মিল্টনের paradise lost হইতে অমৃতধারা সংগ্রহ করিয়া মেঘনাদ বধ কাব্যে তা[illegible] নিহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে মধুর অপূ[illegible] মধুচক্র বিনির্ম্মিত হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্রের জীব[illegible] ও কাব্যে তাহাই দেখি। বৃত্রাসুর বধই বল এ[illegible] তাঁহার অন্যান্য বিপুল রচনার কথাই বল, সকলে[illegible] রচনার জন্ম কথা ঠিক এই রকম।

বন্ধন যখনই নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে, তখনই তাহা হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা বিপুল আকার ধারণ করে। কাব্যের ভিতরে যে একটা সতেজ ও স্বাধীন ভাব আছে, তাহা বাধা মানিতে চায় না। কাব্যের অর্থ প্রকাশ (expression of every thing that is beautiful)। ছন্দ যতক্ষণ প্রকাশের অনুকূল, ততক্ষণ কাব্য তাহার অঙ্গ ছন্দকে আশ্রয় করে। কিন্তু অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই, ছন্দের কৃত্রিম বন্ধন এই প্রকাশকে অবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিতে চায় এবং তাহার পূর্ণ প্রকাশের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। মাইকেল যুগের পূর্ব্ব সময়ের কবিতা গ্রন্থের ভিতরে আমরা ছন্দের যে আঁটাআঁটি ভাব দেখিতে পাই, তাহাতে অনেক স্থলে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়, প্রতি চরণের শেষ অক্ষর মিলাইতে গিয়া কাব্যের প্রকাশাত্মক ভাবের খর্ব্বতা সাধিত হইয়াছে। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনে তাঁহার ভাষা ও ভাবকে মুক্তিদান করিলেন। হেমচন্দ্রও তাঁহার কোন কোন রচনায় ঐ পথেরই পথিক হইয়াছিলেন।

হেমচন্দ্রের প্রকৃত গৌরব আমরা বর্ত্তমান সময়ে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। একদিকে মাইকেল অন্য দিকে হেমচন্দ্র বঙ্গদেশকে তাঁহাদের নব ভাবের রচনা প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় যাহা এতদিন অসম্ভব ছিল, তাঁহারা তাঁহাদের দৈবশক্তি প্রভাবে সম্ভবপর করিয়া দাঁড় করাইলেন। বিলাতী কবিত্বের আদর্শে বঙ্গভাষায় তুলিকা সঞ্চালন করিয়া যে সজীব চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা তাঁহারা অসামান্য প্রতিভাবলে প্রতিপন্ন করিলেন। অথচ তাঁহাদের রচনা মৌলিকতা পূর্ণ, বিলাতী সাজ বিবর্জ্জিত। মাইকেল রামায়ণ হইতে বাছিয়া মেঘনাদ বধ লইয়া তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয়—ঐ মহাকাব্যে নিহিত করিয়া দিলেন। হেমচন্দ্র বেদোক্ত বৃত্রাসুর যুদ্ধ অবলম্বনে তাঁহার কাব্য গ্রন্থ ফুটাইয়া তুলিলেন। জনসাধারণের মনোযোগ যাহা বিদেশীয় কাব্যে এত দিন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, মাইকেল ও হেমচন্দ্র স্বীয় স্বীয় রচনা মাধুর্য্যে এবং আকর্ষণী শক্তিবলে সেই বিক্ষেপের ভাবকে স্বদেশীয় সাহিত্যের দিকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন। কেবল যে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা নহে, সম্ভোগ করিবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে প্রচুর সৌন্দর্য্য অনাবৃত করিয়া দিলেন। শিক্ষিত মণ্ডলীর চিন্তা ও ভাব বলিতে গেলে এই সময় হইতেই পূর্ণভাবে বঙ্গভাষার দিকে বঙ্গদেশের দিকে ও সুদূর অতীতের দিকে ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে।

স্বদেশানুরাগ লইয়া আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এদেশে আন্দোলন চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ঐ স্বদেশানুরাগের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বিগত শতাব্দীর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। তিনি স্বদেশীয় বিমল ধর্ম্মের আদর্শের দিকে সাধারণের মনোযোগ সর্ব্ব প্রথম আকর্ষণ করেন। এই স্বদেশানুরাগ ভাষা ও কাব্যের ভিতর দিয়া যদি কেহ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, তবে তাহা মধুসূদন ও হেমচন্দ্র ভিন্ন আর কেহই নহেন। নির্জীব বাঙ্গালী আমরা, আমাদের ভাষাও দুর্ব্বল, এ ধারণা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে সকলেরই মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। মাইকেল ও হেমচন্দ্র এ ধারণা একেবারেই দূর করিয়া দেন। মাইকেল ও হেমচন্দ্রের নিজ নিজ ওজস্বিনী শক্তি যে আমাদের বঙ্গভাষাকে সমধিক বল দান করিয়াছে, তাহার দুর্ব্বলতাকে খণ্ডিত করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। তাঁহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কেহ জানিত না যে এত তেজ এত শক্তি এই বঙ্গভাষার মধ্যে নিহিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের এবং পরবর্ত্তী সময়ের কত মহাত্মার প্রাণগত চেষ্টায় আমরা বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশক এমন এক স্বচ্ছ ভাষা পাইয়াছি, যে কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ এই ভাষাকে আরও সুমার্জ্জিত এবং ভাব প্রকাশের আরও উপযোগী করিয়া সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়া এই বঙ্গদেশকে ও বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

হেমচন্দ্রের কাব্য গ্রন্থ সমালোচনা করিবার এ ক্ষেত্র নহে। কিন্তু তাহা হইলেও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সুশ্রাব্য বাক্য বিন্যাসের কৌশল

যদি কাব্য গ্রন্থের একটি প্রধান অঙ্গ হয়, তাহা হইলে হেমচন্দ্রের সমকক্ষ অল্পই আছেন। তাঁহার কাব্য গ্রন্থের ভিতরে ওজস্বিতা অনন্যসাধারণ, তাঁহার পর-দুঃখকাতরতা রচনার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কবিতার অন্যান্য উপাদান তাঁহার রচনার ভিতরে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য রচনার কাল হইতে ৩০।৩৫ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের চিন্তা ও ভাব প্রকাশের কত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্বেও হেমচন্দ্রের রচনায় বিন্দুমাত্র কলঙ্কপাত হয় নাই বা তাহাতে অসামঞ্জস্যের কোন লক্ষণ বিশেষ ভাবে বাহির হইয়া পড়ে নাই।

হইতে পারে তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের কোন কোন লেখক তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমরা সে কথা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে যে, অতীত বর্ত্তমানের জগত। অতীতের ভাব লইয়া তাহাকেই সুমার্জ্জিত করিয়া, বর্ত্তমান শোভনতর হইয়া দীপ্তি পায়। অতীতের ঋণ আমাদের দুষ্পরিশোধ্য। অতীতের নিকটে আমরা যে শিক্ষা পাইয়াছি, যে ভাব সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান তা[ইহার] সুশোভন মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে পা[রি]য়াছে। ভবিষ্যৎ আবার এই বর্ত্তমানের উপর তা[হার] ভিত্তি স্থাপন করিয়া আরও সুশোভন হইয়া দী[প্তি] পাইবে। কিন্তু সকল প্রকার অতীতের সমালোচনা[র] সময় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অতীতে[র] মহাজনগণই আমাদের পথ প্রদর্শক, আমাদের ... ও নেতা। অতীতের হেমচন্দ্র ও মধুসূদনকে আ[মরা] গুরুর ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করিব। তাঁহারা ... বিধ প্রতিবন্ধকের মধ্যে সংগ্রাম করিয়া তবেই ... যুক্ত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদে[র] জন্য পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প[র]লোকগত হইলেও তাঁহারা যে আলোকধারা রাখি[য়া] গিয়াছেন, তাহারই সম্পদে আমাদের গম্য পথ এখন[ও] উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা যেখানেই থাকু[ন] আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি গ্রহণ করুন। তাঁহারা আ[শ্বস্ত] হউন যে, যদিও আমরা তাঁহাদের জীবদ্দশায় তাঁ[হা]দের সমুচিত সৎকার করিতে পারি নাই, আমরা ... বিভ্রান্ত হইব না। মানস পুত্র আমরা চিরজীব[ন] ধরিয়া প্রতিদিন তাঁহাদের তর্পণ করিব এবং তাঁ[হা]দের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিব।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

দেবডাঙ্গা।

বজ্রনাদে উনমত্ত হুঙ্কার দাপটে
আক্রমে' আক্রোশ-মুখে ঝঞ্ঝা পৃথিবীর—
অম্লানবদনে সহি হৃদয়-কবাটে
হিমাদ্রি-শিখর উর্দ্ধে তুলিয়াছে শির।

যাতনার বরপুত্র হিমাদ্রি মহান্
অনল-অদৃষ্ট ধরা' ধরা জননীর !
ঊষা সন্ধ্যা আগুনের কিরীট সমান
শিরোদেশে জ্বলে যার তুষার তূণীর।

উপরে ধেয়ানী শান্ত জাগ্রত আকাশ
নিশ্চল নীলিমা নেত্রে আছে নিরখিয়া !

'অরে পুত্র, ভয় নাহি'—অনাহুত ভাষ
অনাদি কালের কণ্ঠে কহিছে ডাকিয়া !

'অরে বৎস, রহ স্থির ! হৃদয়ে আমার
শীতল মন্দিরে শির ধর লুকাইয়া !
সহ' এ নীচের জ্বালা ! নীচের বিকার
নিম্নদেশে চিরকাল থাক না মাতিয়া !

এ মম হৃদয় মথি,' নিস্তব্ধ গহনা
ধরিয়াছি বুকে তোর দেবের সান্ত্বনা !
ঢালিয়াছি শিরে তোর, সঘন সম্ভার
অনন্ত সম্ভবা শান্তি মন্দাকিনী ধার !

শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

ধর্ম্মের জয়।

(২১)

সন্ধ্যার পর মিসেস্ ব্যানার্জ্জিরা আহারে বসিয়া-[ছে]ন। মিঃ ব্যানার্জ্জি মিসেস ব্যানার্জ্জি দুই কন্যা, তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিলাতে, মধ্যম পুত্র অসুস্থ বলিয়া বিলাত হইতে প্রত্যাগত। অসুস্থ নামে, [...]দেনার ভয়েই চলিয়া আসিয়াছে। কন্যাদের জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী আছেন, তিনি আপনার ঘরেই আহার করিতেন।

আহারে বসিবার পর, খানসামা প্লেটের নিকট ডিস আনিয়া ধরিল, মাছ আনিয়াছে। সমুদ্রের মাছ নয়, মধ্যম পুত্র কিরণচন্দ্র সে মাছ খায় না। মাছ দেখিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বলিল—

"আজও এই মাছ ? মা তুমি ত জান আমি [...]ওসব খাই না। সমুদ্রের মাছ কেন আন্‌তে দাও নি ?"

মিসেস ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"আমি ত বাবুর্চ্চিকে বলেছিলাম, তুমি ও মাছ খাও না, সে জানে নিশ্চয়ই, তোমার জন্য অন্য কিছু পাঠাবে।"

অনিল বলিল—"মা রোজ এক রকম সস, তোমায় বলেছিলাম এণ্টোভি সস ফুরিয়ে গেছে, তোমার আজকাল কিছু মনে থাকে না।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি খানিকটা সস প্লেটে ঢালিয়া বলি-লেন—"কেন এত বেশ সস, এটা কি বাড়ীর তৈরি ?"

মিসেস ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"হাঁ বাবুর্চ্চি করে-ছিল। এই মাস কাবারের সময় আবার সব আনাব।" তারপর খানসামাকে বলিলেন—

"কিরণ বাবাকে ওয়াস্তে দুসরা ডিস লে আও।" খানসামা ছুটিয়া গিয়া ডিমের পোচ ও রুটি আনিয়া কিরণের নিকট ধরিল। তাহা দেখিয়া সলিল ও অনিল রাগিয়া গেল, সলিল বলিল—

"বারে মেজদা খালি ডিম খাবে, আর আমরা বুঝি এই পচা মাছগুলা খাব।" বলিয়া প্লেট ঠেলিয়া সরাইয়া দিল।

মিঃ ব্যানার্জ্জি ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন—"তোমরা এমন করত, কাল থেকে আলাদা খেও।"

তাহারাও রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার আহার্য্য আসিতে লাগিল। একবার একজন বলিয়া উঠে এটা খাব না, এটা ভাল নয়, অন্য জন বলে আরো দাও, আরো চাই। কেউ বলে জল দাও, কেউ চায় সোডা, কেউ চায় লেমনেড। কিরণচন্দ্রের আহার সেদিন মনঃপূত হইল না। সে যে সকল দ্রব্য খায় না, সেই দিন সেই সকল দ্রব্যাদি রন্ধন হইয়াছে। অবশেষে জ্যাম রুটি মাখনে সে দিনের ক্ষুধা নিবারিত হইল। সলিল ও অনিল আহারাদির পর বাহিরে চলিয়া গেল। রমলা ও চপলা তাহাদের শিক্ষয়িত্রীর নিকট উঠিয়া গেল।

আহারাদির পর বিশ্রাম কক্ষে মিঃ ব্যানার্জ্জি বসিয়া ধূমপান করিতেছেন, মিসেস ব্যানার্জ্জি আরাম চেয়ারে শয়ান আছেন, তন্দ্রা আসিতেছে। কিরণ-চন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল—

"বাবা আমায় ২০৲ টাকা দিতে হ'বে, আমি একটা মাছ ধরবার ছিপ কিনিব।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বিরক্ত ভাবে বলিলেন—

"আর সর্ব্বদা জ্বালাতন করো না। বিলাতে যা ধার করে এসেছ, তাই শোধ দিতে দিতে প্রাণান্ত হয়েছে। আর যে সেখানে যাবে, তা মনেও হয় না। কি কাজ কর্ব্বে তা কি একবারও ভাবছ ?"

কিরণ বলিল—"আমি দিন রাত বসে বসে কি কর্‌ব ? ছিপ হ'লে আমি তবু মাছ ধরতে যাব। বিলাত থেকে আমার দু তিনজন বন্ধু এখানে এসে-ছেন, তাঁরাও মাছ ধর্‌তে যাবেন।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"কেন, তোমার ঘরে ত আমি ছিপ দেখেছি।"

কিরণ বলিল—"সেটা একটা জঘন্য, সেটাতে আর হবে না।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"আমার হাতে এখন টাকা নাই। আমি এখন পারব না।" এই বলিয়া তিনি গৃহান্তরে গমন করিলেন।

কিরণ মায়ের নিকট গিয়া ক্রুদ্ধ ভাবে বলিল—

"পারবেন না; আমি দোকানে যাচ্ছি ধার করে কিন্‌ব, বাবার নামে বিল পাঠাতে বল্‌ব।"

মিসেস ব্যানার্জ্জির নিদ্রা আসিয়াছিল, চুপ করিয়া রহিলেন। সলিল ও অনিল আহারাদির পর বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তাহাদের বাটীর অপর প্রান্তে একজন হিন্দুস্থানী বাস করিতেন, তাঁহার একটি ক্ষুদ্র বাংলা ছিল। অনিল ও সলিল ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে সেই দিকে গেল। কখনো একটা উড্ডীয়মান পক্ষীর প্রতি লক্ষ্য করিতে থাকে, কখনো বা কোন পুষ্পভারে অবনত বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ফেলে, ফুটন্ত ফুলরাশি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ঝরিয়া পড়ে। অবশেষে তাহারা সেই হিন্দুস্থানী ব্যক্তির বাটীর দিকে কাঁচের জানালা লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুঁড়িল। কাচের শার্সীতে ঢিল ঝনঝন করিয়া পড়িল, কাচ সশব্দে ভাঙ্গিয়া চারিদিকে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। সেই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকটী সেই স্থানেই দণ্ডায়মান ছিলেন, মিঃ ব্যানার্জ্জির পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া তিনি তাহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনিল ও সলিল তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া ড্রইং রুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহাদের জননী নিদ্রিতা রহিয়াছেন। তাহাদের দ্রুত পদশব্দে ও দু একখান চেয়ার পড়িয়া যাওয়ায় মিসেস ব্যানার্জ্জি চক্ষু মেলিয়া বলিলেন—"কিরে, কি হয়েছে?"

"কিছু না" বলিয়া সশব্দে তাহারা পাঠ গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

রমলার শিক্ষয়িত্রী বলিলেন—"তোমরা বুঝি কিছু দুষ্টমী করে এসেছ?"

সলিল বলিল—"বড় মজা হয়েছে, ঐ হিন্দু-স্থানীর কাচের দরজা ভেঙ্গেছি, সে ছুটে ধরতে আস্‌ছে, ধর্‌তে পার্‌লে ত?"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন—"তোমাদের ভারি অন্যায়, কেন তোমরা এমন করে পরের জিনিস ভাঙ্গতে যাও? তোমাদের কাচের দাম দিয়ে দেওয়া উচিত।"

সলিল বলিল—"থাম, তোমায় আর লেক্‌চার দিতে হবে না। আমরা ভেঙ্গেছি আমরা বুঝ্‌ব, তোমার দরদ হ'য়ে থাকে তুমি দাম দাওগে যাও। দুষ্টু লোকের এমনি করাই ভাল, ওদের বাগানে এত পেয়ারা হয়, আমাদের একটিও খেতে দেয় না।"

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন—"সে কি কথা, পরের বাগানের জিনিস তোমরা কেন খাবে?"

এমন সময়ে দ্বারে আঘাত হইল, মিঃ ব্যানার্জ্জি ডাকিলেন—"সলিল, অনিল।"

তখন উভয়ে ভীত হইয়া ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিল।

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"তোমরা পাশের বাড়ীতে ঢিল ছুঁড়ে কাচ ভেঙ্গেছ কেন?"

সলিল বলিল—"কে বল্লে? কে দেখেছে?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন "যার বাড়ী সেই দেখেছে, আমার সঙ্গে চল, তোমরা যদি না ছুঁড়ে থাক ত ভালই, না হ'লে বুঝ্‌বে কি হয়।"

সলিল ও অনিল ভাবিল, হিন্দুস্থানী ব্যক্তি কখনো তাহাদের নাম করিতে সাহস করিবে না, হয়ত চিনিতেও পারিবে না।

মিঃ ব্যানার্জ্জিও বিশ্বাস করেন নাই, ও সেই হিন্দুস্থানী ব্যক্তির কথায় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। অনিল ও সলিলকে তাহার নিকট লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এই বাবা লোগন তুমারা ঘরকো ইঁটা ফেঁকা থা?"

হিন্দুস্থানী ব্যক্তি বলিলেন—"হাঁ হুজুর এই বাবা দুঠোন গিয়া থা, হাম দেখা হ্যায়।"

অনিল বলিয়া উঠিল—"তুম্ ঝুট্টা হ্যায়, ঝুটা বোল্‌তা হ্যায়।"

হিন্দুস্থানী ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন—"কেয়া হাম ঝুট্টা হ্যায়? তুম লোগন বড়া আদমী কো বাবা হোকর ঝুট বোলনেমে সরম নেই পায়া?"

তখন মিঃ ব্যানার্জ্জি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সলিলকে বলিলেন—

"তোমরা তাহ'লে কাচ ভেঙ্গেছ, কেমন?"

সলিল নিরীহ ভাল মানুষের মত বলিল—

"না, আমরা কেন ভাঙ্গব ও মিছা কথা বল্‌ছে।"

সেই স্থান দিয়া মালি যাইতেছিল, অনিল তাহাকে দেখিয়া বলিল—

"ঐ মালিকেই জিজ্ঞাসা করুন না কেন, আমরা কি বাগানে ছিলাম।"

সে জানিত না যে মালি বরাবরই বাগানে ছিল। তাহারা মালিকে দেখিতে পায় নাই, মালি তাহাদের সকল কীর্ত্তিই দেখিয়াছিল।

মিঃ ব্যানার্জ্জি মালিকে ডাকিবার পূর্ব্বেই সলিল তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"মালি হাম লোগ আভি ও মকানমে কাচ তোড়া?"

মালি ভীত ভাবে মিঃ ব্যানার্জ্জির দিকে চাহিল। মিঃ ব্যানার্জ্জি তাহাকে দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন—"সাচ বোলো।"

সে বলিল—"হুজুর বাবা লোগনকে হাতমে হাম আভি ইঁটা পাথল দেখা থা। বগাইচাকো ফুলঝাড় বহুত নাশ কর ডালা। ও মকান মে ভি ইঁটা ফেঁক্‌নে কো দেখা হ্যায়।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অনিল ও সলিলকে বলিলেন—

"মিথ্যা বল্‌তে লজ্জা করে না। শীঘ্র চলে যাও!" তাহারা রোষকষায়িত লোচনে মালির প্রতি চাহিয়া চলিয়া গেল। মালি বুঝিয়া লইল, তাহার সম্মুখে সমূহ বিপদ। মিঃ ব্যানার্জ্জি সেই হিন্দুস্থানী ব্যক্তিকে বলিলেন—

"কাল সুবেকো বড়াই বোলাকে তুমরা কাচ ঠিক কর দেগা, আভি ঘর যাও।"

সে ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

মিঃ ব্যানার্জ্জির সেই শীতকালেও ললাটে ঘর্ম্ম ছুটিয়াছে। মনে অব্যক্ত যন্ত্রণা। মিথ্যাবাদী সন্তান, একি কম কষ্টের কথা? হঠাৎ নিজের কথা মনে পড়িয়া গেল। সুরেশচন্দ্রের অর্থ নিজে ব্যয় করিয়াছেন, তাহার বিপদে রোগে তাহাকে সাহায্য না করিয়া পীড়ন করিয়াছেন। অনাথা বিধবাকে গৃহহীন করিবার জন্য প্রয়াস করিয়াছেন। আজ সেই মৃত সুরেশচন্দ্রের পুত্রেরা স্কুলে প্রশংসা পাইতেছে, অজিত মিঃ রায়ের সুনজরে পড়িয়াছে, তাহারা ক্রমশঃ উচ্চে উঠিতেছে। আর এই অর্থশালীর পুত্রেরা দিন দিন কোন নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতেছে। বিলাতে ঋণদায়ে মধ্যম পুত্র বিদ্যা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। আসিয়াও কোন লজ্জা নাই। দিব্য হাসিয়া খেলিয়া আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতেছে। ভবিষ্যতের চিন্তা একদিনের জন্যও হয় না। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিষয় যে প্রকার সংবাদ আসিতেছে, তাহাও আশাপ্রদ নহে। সলিল ও অনিলের তেমন লেখা পড়ায় মন নাই। মিঃ ব্যানার্জ্জি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, মিসেস ব্যানার্জ্জি কক্ষ দ্বারে দণ্ডায়মান ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—

"গোলমাল কিসের, কি হয়েছে?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"সলিল ও অনিল পাশের বাড়ীর কাচ ভেঙ্গে এসেছে।"

মিসেস ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"তা কি হয়েছে, ছেলে মানুষ ইঁট নিয়ে খেলছিল বুঝি?"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"ছেলে মানুষ বলে আর সব দোষ ছেড়ে দেওয়া যায় না। ইঁট যেন খেল্‌তে খেল্‌তে ছুঁড়েছিল, মিথ্যা কথা কইলে কেন?"

মিসেস ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"তোমার সব তাতেই বেশী করে নেওয়া অভ্যাস।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"তা নয় নীরজা, আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে। আমরা যেমন সুরেশচন্দ্রকে ফাঁকি দিয়াছি, তার ফল এইবার হাতে হাতে পাব। তোমার মামীর অভিশাপ এইবার পূর্ণ হবে।"

মিসেস ব্যানার্জ্জি আর কিছু উত্তর দিলেন না। তাঁহার হৃদয়েও যেন কেমন শীতল বায়ু প্রবাহ প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেহকে শিহরিয়া দিল। নিজেদের অন্যায় যেন তাঁহারা সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। হায়! তাঁহারা নিজ হস্তে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, তাহার ফল তাঁহারা ভিন্ন আর কে ভোগ করিবে?

(২৩)

কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইতি মধ্যে আর কোনও বিশেষ ঘটনা না ঘটিলেও সুশীলার অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুশীলা যদিও একেবারে ঐশ্বর্য্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন নাই, তবু তাঁহার দুঃখ দরিদ্রতার দিনের অবসান হইয়াছে। তিনি সংগ্রামে যে ধৈর্য্য দেখাইয়াছেন, অলক্ষ্যে থাকিয়া জগদীশ্বর তাহার পুরস্কার বিধান করিয়াছেন। এখন অজিত মিঃ রায়ের আফিসে কাজ করিয়া মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেছে। ললিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, মাসিক বৃত্তি পাইয়া বিসপস্ কলেজে প্রবেশ করিয়াছে। সুহৃদ প্রবেশিকার ক্লাসে উঠিয়াছে! ললিতের অত্যন্ত ইচ্ছা যে এইবার পরীক্ষা দিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি লইয়া বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবে।

অজিত মিঃ রায়ের আফিসের সকল প্রকার কার্য্যই শিক্ষা করিতেছে! মিঃ ব্যানার্জ্জির পুত্র সলিল কুমার ঐ আফিসে শিক্ষানবীশি করিতেছে। মিঃ ব্যানার্জ্জির ইচ্ছা সলিলকুমার মিঃ রায়ের কার্য্যের সহকারীর পদ পায়, সেই জন্য এপ্রেনটিসে কাজ শিখিতেছে। মিঃ রায় অজিতকেও সেই কার্য্য শিখাইতেছেন। আফিসের সকল কর্ম্মচারীর সহিতই অজিতের খুব সদ্ভাব।

মিসেস দাস আর সুশীলার বাটীতে নাই। তিনি আর অন্য গৃহে গমন করেন নাই। পরলোকে নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। বামা এখনো সুশীলার বাটীতেই আছে, ও সে এখন সুশীলার গৃহকর্ম্মে সাহায্য করে। মিসেস দাসের মৃত্যুর পর বামা কিছুদিন সুশীলাকে একটি ঘরের ভাড়া দিবে বলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে তাহার উপার্জ্জিত অর্থ যে স্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা লোকসান হইয়া যায়। মিসেস দাসের মৃত্যুর সহিত সে একেবারে অর্থ ও সম্বল বিহীন হইয়া, নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। অবশেষে সুশীলার নিকট গিয়া বলে—

"আপনার কাছে কি আমি থাকব? কাজ কর্ম্ম সব করে দেব।"

সুশীলা বলেন "বেশত থাক।" সেই অবধি বামা রহিয়া গেল। এখন আর সে ছেলেদের দেখিলে জ্বলিয়া উঠে না। তাহাদের প্রতি ক্রমশঃ তাহার মায়া জন্মিতে লাগিল।

মিঃ ব্যানার্জ্জির আজকাল আর পূর্ব্বের মত পশার নাই। সেজন্য তাঁহাদের সংসারে বিশেষ টানাটানি চলিয়াছে। এদিকে খরচ পত্র ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে! দুই পুত্রকে শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। বড়টি বিলাতে মেম বিবাহ করিবার সংবাদ দিয়া জানাইয়াছে যে, সেই স্থানেই কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। 'হোম' ছাড়িয়া আর নেটিভদের দেশে আসিবার ইচ্ছা নাই। পূর্ব্বেই মধ্যম পুত্র কিরণচন্দ্র দুইবার ব্যারিষ্টারীতে অকৃতকার্য্য হইয়া ঋণদায় জড়িত হইয়া, দেনাদারদিগের ভয়ে, বিলাত ছাড়িয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে। এখানে আসিয়া কাজ কর্ম্ম কিছু নাই। দিব্য নিরুপদ্রবে আহারাদি ও বিলাসিতা চলিতেছে। পিতার অর্থে বা ঋণে, রাশি রাশি সিগারেট কেস আসিতেছে, গন্ধ দ্রব্য আসিতেছে, বেশভূষার পারিপাট্য চলিতেছে। দুই পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া, বিফল মনোরথ হইয়া মিঃ ব্যানার্জ্জি সলিলকুমারকে মিঃ রায়ের আফিসে কার্য্য শিখিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। মিসেস রায়ের সহিত মিঃ ব্যানার্জ্জির দূরসম্পর্ক আছে, সেইজন্য আত্মীয়তাও আছে। সলিল কুমারের এই ছোট কার্য্য শিখিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মিঃ ব্যানার্জ্জির একান্ত ইচ্ছা যে কালে সলিল কুমারের সহিত মিঃ রায়ের একমাত্র কন্যা ইলার বিবাহ হইবে ও সলিলকুমার মিঃ রায়ের অবর্ত্তমানে সমস্ত কার্য্য

ভার দেখিবার অধিকার পাইবে। ইলা একমাত্র কন্যা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে।

শিশিরকুমার মিঃ রায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান, কিন্তু পক্ষাঘাতে তাহার একটি পদ নষ্ট হইবার মত হইয়াছে। সেজন্য সোজাভাবে চলাফেরা করা তাহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। শিশির অজিতকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। অজিতকে একদিন না দেখিলে তাহার মনে শান্তি থাকে না। সে পিতাকে বলিয়াছিল—

"বাবা অজিতকে আবার আফিসের কাজ দিলে কেন?"

মিঃ রায় বলিয়াছিলেন—

"অজিত যেমন এ কাজ পারবে তেমন কেউ পারবে না।"

অজিত স্কুল বা কলেজে পাঠাভ্যাস না করিলেও, রীতিমত সুশিক্ষিত হইয়াছিল। সে খুব সুন্দর ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিত। মিঃ রায় তাহাকে আফিসের অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অজিত মিসেস রায়কে অতিশয় সম্ভ্রম করিত, ও তাঁহার সম্মুখে বিশেষ যাইত না। ইলার সহিত তাহার প্রায়ই দেখা হইত, কিন্তু অজিত কখনো তাহার সহিত বেশী কথা বলিত না। বয়সের সহিত ইলা অপূর্ব্ব সুন্দরী হইয়াছিল, তাহার লজ্জা নম্র মুখের ছবি অজিতের হৃদয়পটে চিরাঙ্কিত হইয়াছিল। ইলাকে ইষ্টদেবীর মত জীবনের পটে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। দূর হইতে দেখিয়াই তৃপ্তি, ইহা অপেক্ষা অন্য কোনও উচ্চাশা সে এক মুহূর্ত্তের জন্য মনে আসিতে দেয় নাই।

"দূরে রও, ঊর্দ্ধে রও, দেবী হয়ে পূজা লও,
পূজিবার দেহ অধিকার।"

অজিতের ইহা ভিন্ন ইলাকে আর কিছু বলিবার ছিল না। অভয়াচরণের কন্যা বিভার ও বিবাহ হয় নাই। ইলার সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। সে সর্ব্বদা ইলার নিকট যাইত, এই জন্য শিশির কুমার সর্ব্বদা বিভাকে দেখিত ও বিভাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিল। বিভা তাহা কখনো লক্ষ্য করে নাই। শিশির জানিত তাহার মত রুগ্ন দুর্ব্বল অক্ষমকে বিভার মত সুন্দরী কখনো অন্য চক্ষে দেখিতে পারে না, তাই যেন তাহার হৃদয় কেমন শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল। কুসুম কীটের মত এই প্রণয় তাহার হৃদয়ে জাগিয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় অজিত তাহার লম্বা ওভারকোট গায়ে দিয়া আফিষের পথ হইতে আসিতেছিল। পথে অভয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল, অভয় বাবু বলিলেন—

"অজিত তুমি কাল রাত ৮ টার সময় এই কোট গায়ে দিয়া আমার বাড়ীর পাশে কি করছিলে?"

অজিত হাসিয়া বলিল—

"কই আমিত রাত ৮টার সময় কোথাও যাই নি, মায়ের কাছে ছিলাম। ললিত সুদহৃ পড়ছিল তাই শুন্‌ছিলাম।"

অভয় বাবু মস্তক দোলাইয়া বলিলেন—"সে কি কথা অজিত? আমি যে স্বচক্ষে তোমায় দেখেছি।"

অজিত হাসিয়া বলিল—"আপনি বোধ হয় ভুল দেখেছেন, কাকে দেখতে কাকে দেখেছেন!"

অভয় বাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অজিতকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সন্দেহ বদ্ধমূল হইল, তিনি বলিলেন—

"স্বচক্ষে দেখে কি করে অবিশ্বাস করি তা বল? তুমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিলে।"

অজিত বলিল—"কি আশ্চর্য্য! আপনি চলুন, আমি মার সম্মুখে প্রমাণ করে দিব যে আটটার সময় আমি ঘরে ছিলাম।"

অভয় বাবু কিছু বলিলেন না। তাঁর অজিতের কথায় পূর্ব্বে কখনো অবিশ্বাস হয় নাই, আজ কিন্তু সে বিশ্বাস রহিল না। তিনি মনে ভাবিলেন—

"কি আশ্চর্য্য! ওই কোট, ওই রকম সব, অজিতের ঠিক আকৃতি, আমার এত ভুল কি করে হবে?"

পর দিন যখন অভয় বাবু আফিসে আসিলেন, অজিতও সঙ্গে আসিল। তাঁহাদের আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরে সলিলকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল।

সলিলকুমার এপ্রেনটিসের কাজ শিখিতেছে অজিত ও সেই কাজ শিখিতেছে, তবে সে বেতন পায়! অভয় বাবু সলিলকে দেখিয়া বলিলেন—

"রোজই কি তোমার এই প্রকার বিলম্ব হবে, ঘড়ি দেখেছ কি?"

সলিলকুমার অবজ্ঞার সহিত বলিল—"ঘড়ি দেখে আর কি হবে? কাল ব্রিজ খেল্‌তে রাত বেশী হয়ে গিয়েছিল, আজ তাই উঠতে দেরী হয়ে গেল।"

অভয় বাবু বলিলেন—"কাজ কর্‌তে হলে, প্রত্যহ এ প্রকার দেরী চল্‌বে না" সলিলকুমার গিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। অভয় বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—

"কাজ দেখবার সময় বস্‌বার নিয়ম নাই, তাও কি জানা নাই?"

সলিল বলিল—"মিঃ রায় ত বসেন।"

অভয় বাবু বলিলেন—"মিঃ রায় আমাদের প্রভু! তিনি যা করেন, আমরা তা পারি না। এ বিষয় মনে রেখো, যাহা আফিসের নিয়ম আমাদের সকলকেই তাই মেনে চল্‌তে হবে।" এই বলিয়া একটা বিশেষ কাজে অভয় বাবু কক্ষান্তরে গেলেন।

মিঃ রায়ের আফিস কক্ষ হইতে একজন বেহারা অজিতকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

মিঃ রায় আপনার আফিস কক্ষে বসিয়া চিঠি পড়িতেছিলেন, অজিতকে দেখিয়া বলিলেন—

"অজিত তোমায় একটি কাজ কর্‌তে হবে। আমাদের বিলাতের এজেণ্ট এখানকার মোজার গেঞ্জির সব নমুনা চাহিয়াছেন, এই সকল দ্রব্যের জন্য এগ্রিমেণ্ট কর্‌বার পূর্ব্বে এ সকল দ্রব্য দেখতে চান। তদ্ভিন্ন কলের কাজের উন্নতির জন্য আমাদের একজন কর্ম্মচারীকে বিলাত পাঠাতে হবে। আমার ইচ্ছা তুমিই বিলাত যাও। এ বিষয়ে তোমার কি মত?"

আনন্দে অজিতের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তবু সে সংযত হইয়া বলিল—

"আপনি আমার জন্য কি না করছেন, কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব? আমার ইচ্ছা থাকলেও মাকে জিজ্ঞাসা না করে আমি কিছু বল্‌তে পারছি না।"

মিঃ রায় তাহার মাতৃভক্তি অতিশয় ভালবাসিতেন, তবু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তোমার মা কি এ বিষয়ে আপত্তি করবেন? বিলাত গেলে তোমার অন্য শিক্ষার বিষয়েও যাতে উন্নতি হয় তাই করব।"

অজিত বলিল—"আমার ত খুবই ইচ্ছা হচ্ছে যাব। তবু মাকে জিজ্ঞাসা না করে কিছু বল্‌তে পারি না।"

মিঃ রায় বলিলেন—"আচ্ছা কালই সংবাদ দিও। তুমি যদি যাও ত তোমায় খুবই শীঘ্র যেতে হবে। তোমার সেখানে যা আবশ্যক আমি সব ব্যবস্থা করে দিব।"

অজিত মায়ের কাছে গিয়া যখন বিলাত যাইবার কথা বলিল তখন সুশীলার চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তাঁহার সেই পুত্র অজিত যে আফিসে ছোকরা চাকরের কার্য্যে তিন টাকা বেতনে প্রবেশ করিয়াছিল, যে মায়ের জন্য নিজের সকল ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়াছিল, জগদীশ্বর যে তার ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য এমন বিধান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কি সুশীলা একদিনও জানিয়াছিলেন? দুঃখিনীর পুত্র শিক্ষার্থে বিলাত যাইবে, এ যে কল্পনাতীত আশা। সুশীলা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন—

"তুমি মিঃ রায়কে বলিও আমার কোনও অমত নাই। তোমার যাতে মঙ্গল হবে তিনি তাহা করবেন, আমি কি কখনো তাতে অমত করতে পারি।"

অজিত পরদিন আফিসে গিয়া মিঃ রায়কে মায়ের অনুমতি জানাইল। যখন আফিসে প্রচার হইল যে অজিত কল কারখানার কাজ শিখিতে বিলাতে যাইতেছে, তখন সলিলকুমার ব্যতীত অন্য সকলেই সুখী হইল।

সলিলকুমার সে দিন বাটীতে গিয়া পিতাকে বলিল—

"আমি আর মিঃ রায়ের আফিসে কাজ করব না।"

মিঃ ব্যানার্জি বলিলেন—"কেন কি হইয়াছে?"

সলিল বলিল—"মিঃ রায় কলকারখানার কাজ শিখতে অজিতকে নিজের টাকা দিয়ে বিলাত পাঠাচ্ছেন। আমার আর ওখানে থেকে কি হবে?"

মিঃ ব্যানার্জি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। সলিলকে না পাঠাইয়া অজিতকে কেন পাঠান হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য মিঃ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—

"শুনছি আপনার আফিস হতে কাজকর্ম্ম শিখবার জন্য অজিতকে বিলাত পাঠাচ্ছেন। সলিল থাকতে আপনি অজিতকে মনোনীত করলেন? সলিল কত ভাল ইংরাজী জানে—"

মিঃ রায় হাসিয়া বলিলেন—"আমার কাজ কি আমি ভাল বুঝি না? এ বিষয়ে পরামর্শ অনাবশ্যক।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলিলেন—"না, আমি তা কিছু বলছি না, তবে সলিল হচ্ছে আপনার আত্মীয়। আর অজিতদের অবস্থাত জানেন"—

মিঃ রায় বলিলেন—"অজিতকে আমি যেমন জানি তেমন কেউ জানে না। শিশিরকেও যেমন জানি, অজিতকেও তেমনি জানি। আমার এত বড় কারবার আমার নিজের বুদ্ধির দ্বারাই এতদিন পরিচালিত হচ্ছে। আমার কাকে পাঠান উচিত বা অনুচিত আমি তা বিশেষভাবে জানি। আপনি এ বিষয়ে আর কিছু বলবেন না, আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারব না।"

মিঃ ব্যানার্জ্জি আর বেশী কথা কহিতে সাহস করিলেন না। বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন—

"আমাদের অদৃষ্টে দেখছি ছেলেগুলোর কারোরই সুবিধে হবে না। সলিলের প্রতিওত মিঃ রায় সন্তুষ্ট নন। অজিত বিলাত গেলে সেই হয় ত ওর প্রধান কর্ম্মচারী হবে। এখন দেখছি তোমার মামার সেই টাকা গুলো—"

মিসেস ব্যানার্জ্জি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন—"সে কথায় আর কাজ নাই।"

উভয়ের অন্তর যেন বিষাদের ঘন অন্ধকারে আবৃত হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ঐতিহাসিক প্রসাদ পদাবলী।

১। বঙ্গভূমি কবিপ্রসূতি——জয়দেব হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত শত শত কবি যুগে যুগে বঙ্গের সারস্বত কুঞ্জ মুখরিত করিতেছেন। বঙ্গের অমর-কবি দাশরথীর (দাশুরায়) নাম অবগত নহেন, এরূপ বঙ্গবাসী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি দাশরথী যখন জীবিত ছিলেন তখন সমগ্র বঙ্গ তাঁহার নামে মুগ্ধ হইয়া উঠিত। সাধক কবি রামপ্রসাদও এই প্রকার যশলাভ করিয়াছিলেন; সমগ্র বঙ্গভুমি তাঁহার গীত শ্রবণ করিবার মানসে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত—ভক্তকবি রামপ্রসাদ তাঁহার যুগের দাশরথি ছিলেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'প্রসাদকবি'র সমগ্র রচনা হইতে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য সমুদয়ের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব!

২। সকল লেখকের রচনামালা হইতে তাঁহাদিগের জন্মস্থান এবং জীবনের বহু বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; রামপ্রসাদের সম্বন্ধেও ইহার বৈপরীত্য ঘটে নাই। বঙ্গের যে অঞ্চল বঙ্গীয় নাট্যের জন্মদাতা এবং সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমগুরু ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভুমি সেই প্রদেশের জাহ্নবী-সলিল-বিধৌত কুমারহট্ট কবির জন্মক্ষেত্র। কবি যে বেদীতে বসিয়া

সাধনা করিতেন, সেই "সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ" বেদী আজিও গ্রামবাসী কর্ত্তৃক চিহ্নিত হইয়া থাকে; কবি বলিতেছেন——

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম ॥"
(রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর)

কবি স্বরচিত 'বিদ্যাসুন্দরে"র স্থানে স্থানে আপন পুত্র কন্যা এবং আত্মীয়গণের উল্লেখ করিয়াছেন। এই বিবরণ এবং তাঁহার প্রাপ্ত বংশলতার ভিতর কিছু অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। রামপ্রসাদের বংশলতাতে 'রামমোহন' নামক কবির জনৈক পুত্রের উল্লেখ রহিয়াছে এবং অদ্যাপি এই রামমোহনের বংশধরও রহিয়াছেন, কিন্তু কবি আপন পদাবলীর কুত্রাপি তাঁহার কথা লিখিয়া যান নাই। যিনি আপন ভগ্নী এবং তাঁহার পতির বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কি আপন তনয়ের নামোল্লেখ না করা বিস্মৃতির কার্য্য হইতে পারে? এইরূপ প্রবাদ আছে যে কবির সত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে রামমোহনের জন্ম হয়; ইহা সঙ্গত এবং এই নিমিত্তই তাঁহার নাম লিখিত হয় নাই, কারণ তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই রামপ্রসাদ তাঁহার রচনা সমাপন করেন। ৺ কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় তৎসঙ্কলিত 'প্রসাদ-পদাবলী'তে কবির যে বংশলতা দিয়াছেন, তাহাতে প্রথমে 'রামমোহন' এবং তৎপরে কবিসুতা 'জগদীশ্বরীর' নাম লিখিয়াছেন, কিন্তু কবির স্বরচিত বংশতালিকাতে জগদীশ্বরীর নাম পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং তিনি রামমোহনের কনিষ্ঠা হইতে পারেন না, 'বিশ্বকোষে'র মতে অগ্রে জগদীশ্বরী, তৎপরে রামমোহন (বিশ্বকোষ, পত্রাঙ্ক ৩৪১)। ইহাই সঙ্গত. কালীপ্রসন্নের বংশলতা ভ্রমপ্রসূত।

৩। কবির জন্মকাল এতাবৎ সুনিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই, অনুমানে স্থির হইয়াছে যে তাঁহার জন্মবৎসর ১৬৪০—৪৫ শকের ভিতর, কিন্তু কবির রচনা হইতে এইমাত্র জ্ঞাত হওয়া যায় যে 'গণ্ডযোগে' তাঁহার জন্ম——

"তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার ॥"
('এবার কালী তোমায় খাব' ইঃ)

রামপ্রসাদের বাল্যকালেই পিতৃবিয়োগ হয়, এবং পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যাহা কিছু ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা চাতুর্য্য সহকারে অপরে অধিকার করিয়া লয়——

"শিশুকালে পিতা মলো মাগো রাজ্য নিল পরে।"
('আমার কপাল গো তারা' ইঃ)

কবি পুনর্ব্বার আর এক স্থলে এই কথার আংশিক অবতারণা করিয়াছেন——

"ধনহেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল" ইঃ
(বিদ্যাসুন্দর)

এই 'রাজ্য এবং 'ধনহেতু মহাকুল' দেখিয়া অনেকে অনুমান করিতে পারেন যে কবি কোনও ধনী ভূম্যধিকারীর বংশধর, কিন্তু এরূপ অনুমান ভ্রান্ত। কবি কোনও ধনবান ভূম্যধিকারিবংশের হইলে তাঁহার গ্রামে ঐ প্রকার কথার প্রচলন থাকিত, কিন্তু রামপ্রসাদের জন্মভূমি হইতে অবগত হইয়া আসিয়াছি, যে রামপ্রসাদের বংশ কিঞ্চিৎ অর্থশালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বংশ; 'রাজ্য' শব্দের অর্থ সামান্য ভূ-সম্পত্তি এবং ভূম্যধিকারীর ন্যায় কবির পূর্ব্বপুরুষদিগের কখনও যে বৃহৎ বাটী ছিল, তাহার চিহ্নও নাই। এই সম্পত্তি হরণ নিমিত্ত রামপ্রসাদকে কিছু দিনের জন্য চাকুরী করিতে হইয়াছিল—

"যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আমার বশে।"
('আমি কাজ হারালাম কালের বশে' ইঃ)

৪। মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি সকল প্রাচীন বঙ্গীয় কবি কাহার আশ্রয়ে থাকিয়া এবং কাহার আজ্ঞায় স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন, তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু রামপ্রসাদ কুত্রাপি এরূপ করিয়া যান নাই। অথচ নবদ্বীপাধিপতি বিদ্বৎকুলপালক কৃষ্ণচন্দ্র যে কবির ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন এবং প্রসাদকবি তাঁহার নিকট হইতে এক শত বিঘা নিষ্করভূমি ও কবিরঞ্জন উপাধি প্রাপ্ত হন,

ইহা বঙ্গ-বিশ্রুত। রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন বিষয়ক কতিপয় গানে এই প্রকার ভণিতা আছে—

(১) "কল্পতরুতলে, শ্রীরাজকিশোর ভাবে,
বাঞ্ছা ফল ফল না।"
('জয়া বলে আমি সাধে সাজাইলাম,
বেশ বানাইলাম' ইঃ)

(২) "শ্রীরাজকিশোরে তুষ্টা রাজরাজেশ্বরী।"
('পশুপতি কান্তাকান্তি নেত্রে একবার' ইঃ)

(৩) "শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন ॥"
('রাণী বলে আমি সাধে সাজাইলাম' ইঃ)

এই কয়েকটি ভণিতা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে কবির আশ্রয়দাতার নামই 'রাজকিশোর'। এই ব্যক্তি কে তাহা সংশয় তিমিরাবৃত। সম্ভবতঃ এই আশ্রয়দাতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কারণ তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। 'রাজকিশোর' শব্দ ব্যবহারের সার্থকতা এই যে, 'কালী-কীর্ত্তন' লিখিবার সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র কৈশোরের সুখময়-উদ্যানবিহারী।

৫। অতি অল্প ব্যক্তি আপনার জীবিত কালেই খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন, যিনি পারেন তাঁহাকে ভাগ্যবান বলিতে হইবে, ভক্তকবি রামপ্রসাদ এই ভাগ্যে ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন—

"চাক্‌লা জুড়ে নাম রটেছে শ্রীরামপ্রসাদ
কালীর বেটা।
('কালী সব ঘুচালে লেঠা' ইঃ)

অনেকে এই ছত্রটি দেখিয়া সন্দেহ করিতে পারেন যে, কবি ভবিষ্যবংশীয়দিগের নিকট আপনাকে মহাসাধকরূপে পরিচিত করিবার নিমিত্তই ইহা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যিনি গার্হস্থ্যসুখ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, যিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছিলেন, সাধনাই যিনি জীবনের প্রধান সম্বল করিয়াছিলেন—

(১) "ছিলেম গৃহবাসী করিলি সন্নাসী।"
(২) "আমি ছিলেম গৃহবাসী কেলে সর্ব্বনাশী
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।"

তাঁহার আবার যশঃলাভের আকাঙ্ক্ষা কেন? ইহার জন্য মিথ্যা রচনারই বা প্রয়োজন কি? আশা করি সুধীমণ্ডলে এরূপ কোনও বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তি নাই যিনি এই কূট ব্যাখ্যাই লইবেন। রামপ্রসাদ আপন কঠিন সাধনার জন্যই দেশবিখ্যাত হন এবং সরল নিরহঙ্কার চিত্তে তাহাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

৬। রামপ্রসাদের পদাবলী পাঠ করিলে তাঁহার ধর্ম্মমতের কথা অবগত হওয়া যায়। কবি প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত কালীভক্ত ছিলেন এবং তন্ত্রমতানুসারে কালীর উপাসনা করিতেন—

(১) "বর্ণরূপা তুমি বট, ব, স, ব, ল, ড, ফ, ক, ঠ,
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।"
(২) "ত্রিকোণ মণিপুরে বহ্নি বীজ ধারিণী।"
ড, ফ, অন্তে দিগদলে, শিব ভৈরবী নাগিণী ॥"

যখন জীবনের বহুকাল ধরিয়া কালীর আরাধনা করিয়াও মনে শান্তি পাইলেন না, তখন সাধক প্রসাদ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তীর্থযাত্রা মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতির প্রতিবাদী হইয়া আপনাকে জড়োপাপাসক শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিয়া লইলেন—

(১) "নানা তীর্থ পর্য্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে।
পাবে ঘরে বসে চারি ফল বুঝনারে দুঃখ চেটে ॥"
(২) "ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন
তা জান না।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তাঁর কর্ত্তে চাওরে উপাসনা ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যিনি দিয়ে কত রত্ন সোণা।
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস্ তাঁরে দিয়ে ছার
ডাকের গহনা?
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তায়ে আলো
চাল আর বুট ভিজানা ॥
ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে তাঁর আছে কি পর ভাবনা।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি মেষ মহিষ আর
ছাগল ছানা ॥"
(৩) "ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কিরে
তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে ॥

আলো চাল আর পাকা কলা কাজ কিরে তোর
আয়োজনে।
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে ॥"

এতদিনে কবির মোহ ভাঙ্গিল, এতদিনে কবি বুঝিলেন তাঁহার পূর্ব্বকৃত কার্য্যকলাপ নিষ্ফল হইয়াছে। এখন হইতে কবি আর তাঁহার কালীকে দনুজদলনী নৃমুণ্ডমালিনী ষড়্‌ভুজা বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন না, এখন রামপ্রসাদ তাঁহার কালীকে 'ব্রহ্মময়ী' বলিয়া বুঝিলেন, কবি এতদূরে বুঝিলেন "ত্রিজগৎ মায়ের মূর্ত্তি"——এতদিনে সাধক প্রসাদ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবাদী হইলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নিরাকারবাদ ঘোষণা করিলেন—

(১) "ওরে ঋণী আছেন ব্রহ্মময়ী সুখে সাধ
সেই হল না।"

(২) "এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব
ছেড়েছি।"

(৩) "ওরে শত শত সত্য বেদ তারা
আমার নিরাকারা ॥"

৭। ভক্তকবি রামপ্রসাদের পদাবলী হইতে কবি যে সময়ে জীবিত ছিলেন, তদানীন্তন কালের কয়েকটি ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। ইদানীং বঙ্গদেশে ঘুড়ী উড়ান এবং ডাণ্ডাগুলি নামক খেলা দেখা যায়; প্রথম খেলাটির কথা আর পাঠককে জ্ঞাত করাইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু বোধ হয়, দ্বিতীয়টির বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। একটি একহস্ত এবং অপর একটি অর্দ্ধহস্ত পরিমিত কাষ্ঠদণ্ড লইয়া এই খেলা হইয়া থাকে, সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামেই ইহার সমধিক প্রচলন। আজ প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে রামপ্রসাদের সময়েও এই দুইটি খেলা বর্ত্তমান ছিল—

(১) "মন খেলাও রে ডাণ্ডাগুলি।
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥"

(২) "শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘুড়ী,
ভব সংসার বাজারের মাঝে।"

অনেকে এই প্রকার ইতিহাস-সংকলনে নাসিকা কুঞ্চন করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদিগের একবার ইংরাজ জাতির সুবৃহৎ ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তাঁহারা যদি ভাবিয়া থাকেন যে প্রধান প্রধান ঘটনা লইয়াই ঐ ইতিবৃত্ত রচিত তবে তাঁহাদিগকে একবার ইংরাজের ইতিহাস পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা অধ্যয়ন শেষে দেখিবেন যে, এই প্রকার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যে সুবৃহৎ ইংলণ্ড-ইতিহাস পরিপুষ্ট এবং এই সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্যও ইংরাজ বক্ষঃ গর্ব্বস্ফীত। তবে আমরা কেন এই ক্ষুদ্র বিষয় সমূহের মূল্য দিব না? বঙ্গবাসি, আর ক্ষুদ্র বিষয়কে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিও না, এই গুলি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে স্বল্পকাল মধ্যেই শত শত পুস্তকাধার বঙ্গের পূর্ণ-ইতিহাসে স্তরে স্তরে পূর্ণ হইবে। সহমরণ প্রথা যে কতদিন হইতে বঙ্গদেশে চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার এবং এ পর্য্যন্তও ইহার কোনও মীমাংসা হয় নাই, তবে উহা যে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রসাদ কবির কাব্য হইতেই সপ্রমাণ হয়—

"নহে শাস্ত্রসঙ্গত সসত্ত্বা সহমৃতা।
(বিদ্যাসুন্দর)।

৮। প্রসাদ পদাবলীর ভিতর "মাগো তারা ও শঙ্করী" বলিয়া একটি বিখ্যাত সঙ্গীত আছে, এই সঙ্গীত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে কবির জীবিতকালেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কোনও সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যায় এবং তাম্বুলবিক্রেতা রাণাঘাটের বর্ত্তমান পালচৌধুরীবংশের মূলপুরুষ কৃষ্ণপান্তি নামক জনৈক ব্যক্তি প্রভূত ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া ভূম্যধিকারী হইয়া উঠেন—

"প্যায়দার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামেতে নিলামজারী।
ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তি তারে দিলে জমীদারী॥"

এই ছত্র দুইটী কি বঙ্গের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে? আশা করি কোনও সুবিবেচক ব্যক্তি এই সঙ্গীতটি যে একটি অমূল্য তথ্যের আকর তদ্বিষয়ে সন্দিহানচিত্ত হইবেন না।

কিছুদিন পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে চৈত্র সংক্রান্তিতে পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করিয়া চড়কগাছে উঠিয়া ঘুরিবার প্রথা ছিল, এই কুপ্রথায় রক্তাক্ত কলেবরে বহুলোকের প্রাণবিয়োগ হইত। ইংরাজ বহু যত্ন সহকারে এবং কষ্ট স্বীকার করিয়া এই কুপ্রথাটি দূরীভূত করিয়াছেন। ইহা কত দিনের প্রথা তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় না, তবে প্রায় দুই শত বর্ষের প্রাচীন কবি রামপ্রসাদের একটী সঙ্গীতে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে—

দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ,
মনরে ওরে মায়া ডোরে বঁড়শী গাঁথা স্নেহ বলে যারে।
(ওরে মন চড়কী ভ্রমণ কর এ ঘোর সংসারে ইঃ)

৯। রামপ্রসাদের কবিতাবলীতে বর্ত্তমানকালে প্রচলিত কতকগুলি খাদ্য দ্রব্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারবস্তুর নাম দৃষ্ট হয়, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সকল বস্তুর প্রচলন আজ প্রায় দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল—

"খেয়েছি জিলিপি খাজা লুচি মণ্ডা সরভাজা।"
('ওমন তোর নামে কি নালিশ দিব'—ইঃ)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদচরিত বিদ্যাসুন্দরে বাজার বর্ণনাতে আমরা বর্দ্ধমান নগরের তদানীন্তন আপণসমূহে বর্ত্তমান কালেও প্রচলিত কতিপয় দ্রব্যের সম্ভার দেখিতে পাই—

"মণিমুক্তা প্রবাল আদির সীমা নাই॥
বনাত মখমল পট্টু ডুসনাই খাসা।
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা॥
মালদাই নূলাটি (?) চিকন সরবন্দ।" (?)

অনেকে বলিতে পারেন যে এই গুলি যে রামপ্রসাদের সময়ে বর্ত্তমান ছিল তাহার প্রমাণ কি। তদুত্তরে এই বলা যায় যে প্রসাদের সময়ে ইহাদিগের অস্তিত্ব না থাকিলে তিনি কেমন করিয়া ইহাদিগের সহিত পরিচিত হইলেন এবং পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কাব্যে ইহাদিগের স্থান হইয়াছে, নহিলে হইত না সুতরাং প্রসাদের সময়ে ইহারা বর্ত্তমান ছিল।

১০। আর একটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রসাদপদাবলীর ভিতর কতিপয় সঙ্গীত "দ্বিজ রামপ্রসাদ" বলিয়া ভণিতা আছে। এইগুলি সম্পূর্ণরূপে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের ভাবের হইলেও তাঁহার নহে; কারণ রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং তদানীন্তন বৈদ্যগণ বর্ত্তমানকালের বৈদ্যদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণত্বের অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রয়াস পান নাই; বরং তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর জাতির ন্যায় আপনাদিগের নামের শেষে মধ্যে মধ্যে 'দাস' লিখিতেন, বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়, স্বয়ং রামপ্রসাদও এই প্রকার লিখিয়া গিয়াছেন—

(২) "প্রসাদ দাসে ভাষে, ত্রাহি নিজ দাসে, চিত্তমে মত্ত বারণ।"
('ঢল ঢল জলদবরণী'—ইঃ)

(২) "কলয়তি প্রসাদ দাস, ঘোর তিমির পুঞ্জনাশ, হৃদকমলে সতত বাস শ্যামা দীর্ঘকেশী।"
('শ্যামা বামা গুণধামা'—ইঃ)

অধিক কি স্বীয় ভগ্নীপতির নামোল্লেখ করিবার সময়েও কবি রামপ্রসাদ বৈদ্যত্বের পরিচয়দাতা কোনও উপাধি না দিয়া শুদ্ধ 'দাস' উপাধি লিখিয়াছেন—

"ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।"
(বিদ্যাসুন্দর)

ইহা সুনিশ্চিত যে এই "দ্বিজ রামপ্রসাদ" কবিরঞ্জন বৈদ্য রামপ্রসাদ নহেন।

এই 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' সম্ভবতঃ কবিওয়ালা, রামপ্রসাদ ঠাকুর (ব্রাহ্মণ) কিংবা রামপ্রসাদ নামধেয় অপর কোনও অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ কবি।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন।

(আলোচনা)

বিগত ২৭এ, ২৮এ ও ২৯এ চৈত্র তারিখে এবার কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনে কয়েকটী বিশেষত্ব ছিল, এই বিশেষত্বগুলি সম্মিলনের উদ্দেশ্য সাধনে কতকটা সহায়তা করিয়াছে, সম্মিলনের হিতৈষী মাত্রের তাহা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রথম বিশেষত্ব, বঙ্গদেশের সর্ব্ব প্রধান শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল স্বয়ং সম্মিলন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমাদের মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের এ সৌভাগ্য ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই। আমাদের কবি-হৃদয়-স্পর্শে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে যে বঙ্গ-বাণীর বিজয়-শঙ্খ বাদিত হইয়াছে, ইহা তাহারই পরিচায়ক। এ ঘটনায় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতি রাজপুরুষগণের সম্ভ্রম দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব, সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় অতি অল্পক্ষণের জন্য প্রথম দিবসের অধিবেশনে মাত্র উপস্থিত ছিলেন, অপরাপর দিবসের কার্য্যাবলী শাখা-সভাপতি মহাশয়েরাই নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন. ইহা অনেকের নিকটে সুসঙ্গত বোধ হয় নাই। কেহ কেহ বলিলেন, ইহার পর সভাপতি মহাশয়েরা তাঁহাদিগের অভিভাষণখানাই পাঠাইয়া দিয়া সম্মিলনের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারেন। ভবিষ্যতে কি হইবে, বলিতে পারি না; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্র বাবুর জরাজীর্ণ শরীর দেখিয়া ও তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে, বোলপুরের সুনিভৃত "শান্তি-নিকেতন" হইতে এই ধ্যানপরায়ণ সুপ্রবীণ সাহিত্য সেবককে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য আহ্বান করিয়া "সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি" তাঁহার প্রতি অত্যাচারই করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বক্ষণ সভাতে উপস্থিতি সম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত অপর দুই দিবস সম্মিলন-ক্ষেত্রে তাঁহার যথোচিত স্থান ছিল কি না, তদ্বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমার এ সন্দেহের কারণ কি, সম্মিলনের তৃতীয় বিশেষত্ব পর্য্যালোচনা কালে ব্যক্ত হইবে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয় ভাবিবার আছে। সম্মিলন ক্ষেত্রে সভাপতির অভিভাষণ বিতরিত হয় নাই, ইহাতে শ্রোতৃবর্গের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণখানা সাধারণের সম্পত্তি, তাহা কোন মাসিক পত্রিকা বিশেষের সম্পত্তি করিয়া রাখা উচিত নহে। বিগত পূর্ব্ব বৎসরে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যে ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার সভাপতি সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ই এ সম্বন্ধে প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেবার "বঙ্গদর্শন" সভাপতির অভিভাষণ প্রকাশের গৌরব লাভ করিয়াছিল, এবার "ভারতী" সে গৌরবের অধিকারিণী হইয়াছে। তারপর বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের অপূর্ব্ব ইতিহাস সুপ্রবীণ দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার আত্ম-জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; শুধু ইহাই নহে, তিনি নিজেও এই ইতিহাসের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। যাঁহারা তাঁহার অভিভাষণে সে বিচিত্র কাহিনীর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। তত্ত্বান্বেষী দ্বিজেন্দ্রনাথের অভিভাষণে তত্ত্বজ্ঞানের কথাই বিশেষ ভাবে স্থান পাইয়াছে। বিগত পূর্ব্ব বৎসরে বয়োবৃদ্ধ অক্ষয়চন্দ্রও এ ভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে হতাশ করিয়াছিলেন,—তাঁহার অভিভাষণে সাহিত্য অপেক্ষা ম্যালেরিয়া তত্ত্বই সমধিক মহিমান্বিত

হইয়াছিল। এরূপে দুইজন সুপ্রবীণ সাহিত্যসেবী, একজন স্বাস্থ্য ও আর একজন পরমার্থের কথাই বেশী করিয়া ভাবিয়াছেন, প্রকৃত সাহিত্য-লক্ষ্মী তাঁহাদের অনুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থা হয়েন নাই—কেহই তাঁহার সন্ধান লয়েন নাই। ইহা বঙ্গভাষার সামান্য ক্ষতি নহে।

এক্ষণে কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বিশেষত্বের কথা আলোচনা করিতেছি। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর; ইহার ফলাফলের উপরেই সম্মিলনের সার্থকতা—এমন কি, সম্মিলনের স্থায়ীত্ব পর্য্যন্ত নির্ভর করিতেছে।

দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিনের প্রথমাংশে সাধারণ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস এই চারিটী বিষয়ের একই সময়ে চারিটী সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক অধিবেশন হইয়াছিল এবং এজন্য যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায়, শ্রীযুত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়গণ এই বিভক্ত সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বিহিত স্থান এ ক্ষেত্রে ছিল না। এই দুই দিবস তাঁহার অনুপস্থিতি অশোভন হইলেও অকারণ হয় নাই।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের এইরূপ শ্রেণীবিভাগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার এই মনে হইয়াছে, সম্মিলনে অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ পাঠের জন্যই এবম্বিধ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সাহিত্য-সম্মিলনের মুদ্রিত নিয়মাবলীর দ্বাদশ সংজ্ঞায় লিখিত আছে—"কার্য্যের সুবিধার্থ এই সম্মিলনের কার্য্য আলোচ্য বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারিবে। প্রয়োজন ও সুবিধা হইলে, একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে:—

(ক) সাহিত্য-শাখা (কাব্য, ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি)।

(খ) ইতিহাস-শাখা (ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি)।

(গ) গণিত ও বিজ্ঞান-শাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান, গণিত-বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, শিল্প, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি)।"

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা অবধি কেবলমাত্র পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষে চুঁচুড়া ও চট্টগ্রামে বিজ্ঞান শাখার পৃথক অধিবেশন ও পৃথক সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। চুঁচুড়ার কথা ঠিক বলিতে পারি না, চট্টগ্রামে সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত একই সময়ে বিজ্ঞান-শাখার অধিবেশন হয় নাই; উহার জন্য দ্বিতীয় দিবসের পূর্ব্বাহ্ণ সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এবার কলিকাতা টাউনহলের ন্যায় বিস্তৃত স্থান পাইয়া সম্মিলনের "একাধিক শাখার" পরিবর্ত্তে সকল শাখারই একই সময়ে অধিবেশন করিয়া কার্য্যকারিতার পরীক্ষা করা হইয়াছে। অধিকন্তু সম্মিলনের প্রাগুক্ত নিয়মাবলীতে উল্লিখিত তিনটী শাখার স্থলে সাহিত্য-শাখা হইতে দর্শনকে নিষ্কাশিত করিয়া লইয়া তাহাকে একটী পৃথক শাখাতে পরিণত করা গিয়াছে। এক্ষণে সাহিত্য-সম্মিলনের এই অভিনব কার্য্যপ্রণালী কতদূর সুফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহা বিচার ও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের চারিটী শাখা-সমিতির অধিবেশন দ্বারা এবার গত বৎসরাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ পাঠের সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে লেখক বা পাঠক, অথবা শ্রোতৃমণ্ডলী যে তদনুরূপ তৃপ্ত ও প্রীত হইয়াছেন, এমন কথা বলা যায় না। প্রথমতঃ এবারও অন্যান্য বর্ষের ন্যায় পঠিতব্য প্রবন্ধের জন্য পাঠ-সময় নির্দ্ধারিত ছিল, ফলে প্রায় অধিকাংশ প্রবন্ধই পাঠের সময়ে বহুলাংশ পরিত্যক্ত হওয়াতে প্রবন্ধগুলি কবন্ধাকারে পরিণত হইয়াছিল। ইহা পাঠক ও শ্রোতার পক্ষে কতদুর অসুবিধাজনক ভুক্তভোগী মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। ইহাতে অনেক প্রবন্ধেরই আলোচ্য বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যায় না; এমন কি, আমি যদি আমার প্রবন্ধের লেখক না হইয়া কেবলমাত্র শ্রোতা

হইতাম, তবে তাহারও বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারিতাম না। এমন অবস্থায় অপরাপর শ্রোতৃবৃন্দ যে কতদূর বুঝিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমানের ন্যায় অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ পাঠই বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রধানতম মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত থাকিবে, সেপর্য্যন্ত লেখক ও শ্রোতৃবর্গকে এ বিড়ম্বনা ভোগ করিতেই হইবে; ইহা ব্যতীত আর উপায় নাই।

তারপর সম্মিলনের এইরূপ শ্রেণীবিভাগে একমাত্র ইতিহাস-শাখা ভিন্ন অন্যান্য শাখায় সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এ সকল শাখায় সাধারণ শ্রোতা অপেক্ষা প্রবন্ধ পাঠকের সংখ্যাই অধিক ছিল, তাঁহারা আপনাদের খণ্ডিত প্রবন্ধাবলী আপনারাই শুনিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ রহস্য বড় মন্দ হয় নাই। সাধারণ সাহিত্য বিভাগের সভাপতি সরল প্রাণ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ মহোদয় তাঁহার সুন্দর অভিভাষণখানি পাঠকালে শ্রোতৃমণ্ডলীর এ অভাব নীরবে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

ইতিহাস-শাখায় জনবাহুল্য যদি আমাদের দেশের জনসাধারণের ইতিহাস-প্রিয়তা প্রমাণ করিত, তবে আমার ক্ষোভের কোন কারণ থাকিত না; বরং তাহাতে আমি গভীর আনন্দই লাভ করিতাম। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে তাহা নয়, তাহা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়দ্বয়ের বক্তৃতাতেও প্রকাশ পাইয়াছিল। ফলতঃ টাউনহলের সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রশস্ত ও সোফা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত কক্ষে এবং বৈদ্যুতিক পাথার নিম্নে ইতিহাস-শাখার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, দ্বিতীয় দিন এখানে সভারম্ভের সময় কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐক্যতানিক বাদ্যও বাজিয়াছিল, এ সমুদয় যে ঐতিহাসিক শাখায় সাধারণ প্রতিনিধি ও দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

অপরাপর শাখা বিভাগগুলিকে, বিশেষতঃ সাধারণ-সাহিত্য বিভাগকে টাউনহলের এক প্রান্তে এক নিভৃত কক্ষে একেবারে "কোণঠাসা" করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এখানে বসিবার বা বাতাস পাইবার তেমন কোন সুবিধা ছিল না। ফলে এখানে জনসংখ্যা অত্যল্পই হইয়াছিল, যাঁহারা এ বিভাগের নিতান্ত অনুরাগী, তাঁহাদিগকে এ স্থান অন্বেষণ করিয়া লইতে প্রথম দিন বিষম বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবস্থা দেখিয়া আমি বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক মাননীয় ডাঃ শ্রীযুত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয়কে বলিয়াছিলাম, এবার সাহিত্য-সম্মিলন কি ইতিহাস-সম্মিলন হইতেছে, আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। বাস্তবিক, আমার এরূপ সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল।

পক্ষান্তরে, বহুসংখ্যক সাধারণ প্রতিনিধি ও দর্শক সভার সময় অনবরত এ শাখা ও শাখা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, ইহাতে সম্মিলনের গাম্ভীর্য্য ও শৃঙ্খলা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সুসঙ্গের বিদ্যোৎসাহী মহারাজ বাহাদুর কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন, সাহিত্যের শ্মশানে যেন প্রবন্ধগুলি কবন্ধাকারে নৃত্য করিতেছে। এ দুঃখের ভিতরে সাধারণ সাহিত্য বিভাগের সভ্যগণের একটা আনন্দ ও গৌরবের বিষয় ছিল, কাশীমবাজার ও সুসঙ্গের মহারাজযুগল পুর্ব্বাপর এ শাখাতেই যোগ দিয়াছিলেন।

কলিকাতার সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় বিশেষত্বের কথা এতক্ষণ যথাযথ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সম্মিলনের শ্রেণীবিভাগে যে কিছুই লাভ হয় নাই, এমন নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহাতে অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ পাঠের সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও দেখাইয়াছি, তাহাতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও লেখক ও শ্রোতা কেহই তৃপ্তিলাভ করেন নাই, ইহার কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছি। অধিকন্তু সম্মিলনের শ্রেণীবিভাগের জন্য এই সমুদায় খণ্ডিত-প্রবন্ধের সকল গুলিও সমবেত সভ্যবৃন্দ শুনিবার সুযোগ নাই; তাঁহারা এক একজন কেবল, মাত্র এক একটী বিষয়ের রসজ্ঞ হইবেন, সাহিত্যরসজ্ঞ যে ইতিহাসরস অনুভব ও উপভোগ করিতে পারিবেন না, কিংবা বিজ্ঞান রসজ্ঞ যে দর্শন-রস

...নুভব ও উপভোগ করিতে পারিবেন না, এইরূপ ...নে করিবার কোন প্রকার সঙ্গত কারণ আছে, বোধ ...য় না। পক্ষান্তরে, সম্মিলনের শ্রেণী বিভাগের ফলে ...রিটী শাখার চারিজন বিশিষ্ট সভাপতির চারিটী ...ল্যবান বক্তৃতা সম্মিলনকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। ...হা সম্মিলনের পক্ষে পরম লাভ সন্দেহ নাই। সম্মি-...লনের এ লাভ ও গৌরব সম্মিলনকে শাখা-বিভক্ত না করিয়াও যাহাতে প্রতি বর্ষে অক্ষুন্ন রাখিতে পারা ...য়—সম্মিলন যাহাতে এবম্বিধ দেশ-মান্য মনীষিগণের

বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

...প্রবন্ধ ও সহায়তা লাভের উপযুক্ত হইতে পারে, ...ম্মিলন-পরিচালন-সমিতির তাহারই জন্য যত্নশীল ...ওয়া উচিত; কেননা সম্মিলন শাখা-বিভক্ত হইলে ...সম্মিলনের এ লাভ ও গৌরবে সমবেত সভ্যমণ্ডলী ...নভাবে অধিকারী ও উপকৃত হইতে পারেন না। ...সাহিত্য-সম্মিলন চারি শাখা কেন সহস্র শাখা হওয়াও ...অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু কোনও এক ব্যক্তির একই সময়ে সর্ব্বস্থানে উপস্থিতি সম্ভব নহে। ইহা বুঝিয়াই এবারে সুধীশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ হীরেন্দ্রনাথ শাখা সভাপতিগণের বক্তৃতাগুলি একটী সাধারণ সভায় পাঠ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। শাখা সমিতিতে সভাপতিগণের অভিভাষণ সমূহই আদ্যন্ত পাঠ হইয়াছিল; সুতরাং হীরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় উপস্থিত জনসঙ্ঘ এই চারিটী পূর্ণাঙ্গ-প্রবন্ধ শ্রবণেও বঞ্চিত হইয়াছেন। ফলে বিভক্ত-সম্মিলনের যে লাভ, তাহা শাখার সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ, অন্ততঃ একই সময়ে সকল শাখার অধিবেশন, আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্যদেশে যাহা আছে, তাহাই যে আমাদিগকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমাদের দেশে এখনও বিভিন্ন বিষয়ের "বিশেষজ্ঞ" লেখক ও শ্রোতার তেমন প্রাদুর্ভাব ঘটে নাই, যাহাতে এখন পৃথক পৃথক শাখার অধিবেশনের আবশ্যকতা হইতে পারে; এরূপ ক্ষেত্রে সম্মিলনের শাখা বিভাগ করিলে সম্মিলনের গৌরব খর্ব্ব হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে। এ প্রকার আশঙ্কা করিবার হেতু আছে। সম্মিলনক্ষেত্রে এবং কাশীমবাজারের সজ্জনবৎসল মহারাজ বাহাদুরের গৃহে প্রীতি-সম্মিলনে আমি যাঁহাদের সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে ইহাতে গভীর অসন্তোষের ভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। শুনিলাম, এই সুযোগে কতিপয় প্রতিনিধি একত্র হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সংশ্রবহীন পূর্ব্ব বাঙ্গলা সাহিত্য সম্মিলন প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য আমি এই কার্জ্জনী নীতি সমর্থন করি না। পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন যদি উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের ন্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অন্যতম শক্তিশালী শাখারূপে গঠিত হয়, তাহা হইলে উহার প্রতিষ্ঠায় আমার কোনরূপ আপত্তি নাই। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, চট্টগ্রামে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-

সম্মিলন যেমন আপন অধিবেশন ঘোষণা করিয়া নিজের স্বতন্ত্রতা প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন যেন তেমনটী করিয়া অনর্থক বিরোধের বা আত্মদ্রোহের সৃষ্টি না করেন। যাহা হউক, এবারকার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত সাহিত্য সেবকগণের পূর্ব্বোক্ত প্রকার মনোভাব, সম্মিলনের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুদ্রিত নিয়মাবলীর দ্বিতীয় সংজ্ঞায় আছে ঃ—

"সুধীগণের মধ্যে ভাব বিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রে আলোচনা ও প্রচার, বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান দ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্য নির্ণয় এবং জনগণের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।" উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী ও সাহিত্য সেবকগণের মধ্যে সম্মিলন ক্ষেত্রেই এবারের ন্যায় একটা বিচ্ছিন্ন ভাব থাকিলে সম্মিলনের এই মহৎ উদ্দেশ্য যথার্থ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতে পারিবে কি না, বিশেষজ্ঞগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

আমার মনে হয়, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের শ্রেণী বিভাগ একান্তই প্রয়োজন হইলে একই সময়ে সকল শ্রেণীর যুগপৎ অধিবেশন না করিয়া এক একটী বেলায় পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে এক একটী শাখার অধিবেশনের সময় নির্দ্দিষ্ট হইলেই সম্মিলনের কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পাদিত হইতে পারে। অবশ্য এ ব্যবস্থায় তেমন অধিক সংখ্যক প্রবন্ধ পাঠের সুবিধা পাওয়া যাইবে না; কিন্তু এখন যে ভাবে প্রবন্ধ পঠিত হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক মূল্যবান প্রবন্ধ সম্পূর্ণ পাঠ করিয়া বাকী প্রবন্ধগুলি সাহিত্য-সম্মিলনের চিরন্তন রীতি অনুসারে "পঠিত বলিয়া গৃহীত" হইলে সম্মিলনের কার্য্যে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বাঙ্গালার মাসিকপত্র সম্পাদক মহাশয়দের অনুগ্রহে সম্মিলনের অনেক প্রবন্ধ সম্মিলনের অধিবেশনের বহু পূর্ব্বেই যন্ত্রস্থ হইয়া যায়; এমন কি, এমনও প্রমাণ পাওয়া

গিয়াছে, স্থলবিশেষে কোন কোন প্রবন্ধ সম্মিলনে
বহু পূর্ব্বেই মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া লোক
চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করে এবং সম্মিলন-ক্ষেত্রে
ঐ প্রবন্ধগুলি "অমুক মাসিকপত্র হইতে পুনর্মুদ্রিত
ইতি সংজ্ঞায় বিভূষিত হইয়া বিতরিত হইয়া থাকে
সুতরাং লেখক ও পাঠককে, বক্তা ও শ্রোতাকে।
মনঃ ক্ষুণ্ণ হইতে হইবে না—কাহাকেও সম্মিলনের
প্রবন্ধ সমূহের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হইবে না
সম্মিলনে পঠিতব্য সকল প্রবন্ধই এ ভাবে মুদ্রিত
হইয়া সম্মিলনক্ষেত্রে বিতরিত হইলে আরও ভাল হ

গত বৎসর সাহিত্য সম্মিলনে পুরমহিলারা যোগ

দর্শন শাখার সভাপতি

ডাক্তার পি, কে, রায়।

দান করিয়াছিলেন। এবার প্রথম দিন মাত্র কয়েক
জন ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। টাউনহলের
গেলারীতে তাঁহাদের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তৎপর
দুই দিবস আর কেহই সম্মিলনে আসেন নাই। ই
এবারকার সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ বিশেষত্ব
উল্লেখ করিতে পারা যায়। কয়েক জন খ্যাতনা
সম্ভ্রান্ত মহিলার নিকটে শুনিলাম, এবার তাঁহাদি
সাহিত্য সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। এক

বিদুষী মহিলা আমাকে বলিলেন, ময়মন-
সাহিত্য-সম্মিলনে ললিত বাবুর প্রবন্ধ বিভ্রাটের
হইতে সম্মিলন কর্তৃপক্ষেরা ইচ্ছা করেন না আর
পুরমহিলা সম্মিলন ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন।
তাঁহার এ কথা আমি সমর্থন করিতে পারি

ময়মনসিংহের পরবর্ত্তী চুঁচুড়া-সম্মিলনের কথা
না; কিন্তু তৎপর-বৎসর চট্টগ্রাম-সম্মিলনে
নিজেই অনেককে নিমন্ত্রণপত্র দিয়াছিলাম এবং
ক্ষেত্রেও বহুতর পুরমহিলা উপস্থিত ছিলেন।
হয়ত তাঁহার সে ধারণা ঠিক নহে। এবার

চালিত মাসিক পত্রিকা তিনজন মহিলার সম্পাদনে সম্পাদিত হইতেছে, সভাসমিতির বক্তৃতামঞ্চেও সুবক্তৃতা-কারিণী রমণীগণ দেখা দিতেছেন। এমনি করিয়া ভাই-ভগিনী মিলিয়া মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সেবা করিবার একটা অদম্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা চারিদিকেই নূতন উৎসাহ, নূতন আশা, নূতন শক্তি, নূতন তেজঃ, নূতন প্রেরণা ও নূতন চেতনা সঞ্চার করিতেছে। এ দৃশ্য কত মহান্—কত মঙ্গল মধুর!! যাঁহারা এমত অবস্থায় মাতৃজাতিকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন হইতে কিংবা মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার পূজা-মন্দির হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করেন,

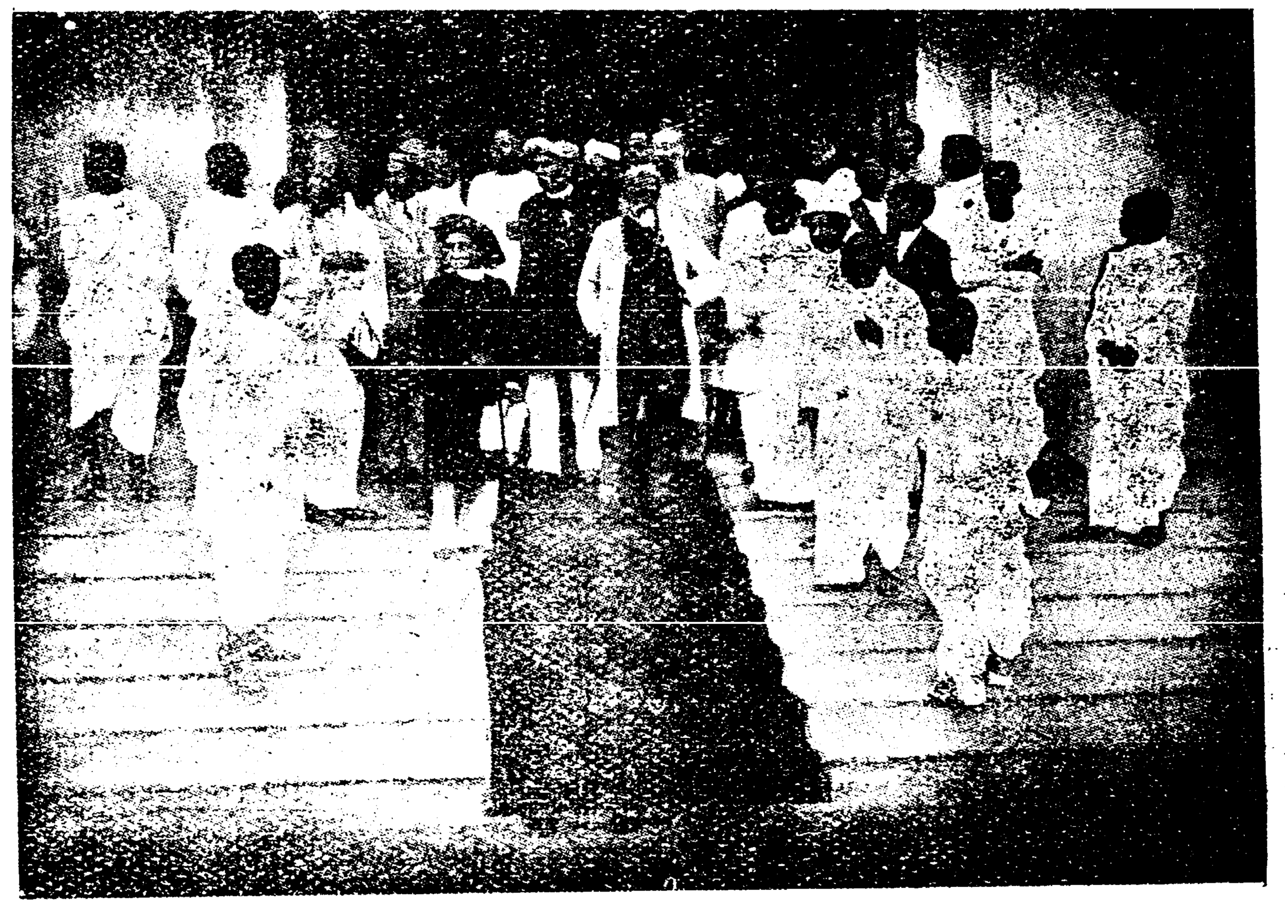

সাহিত্যিকদিগের সম্মিলন।

মহিলারা নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন কিনা, কর্ম্মকর্ত্তা-
নিকটে সে সংবাদ লইবার অবসর পাই নাই,
যদি যথার্থই তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা না হইয়া
, তবে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর
থাকিতে পারে না। এ অমার্জ্জনীয় ত্রুটি
পরামর্শে বা অনবধানতায় সংঘটিত হইয়াছে,
অনুসন্ধান করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে বহুতর
-লেখিকার রচনা সম্ভারে বঙ্গ সাহিত্য অলঙ্কৃত
ছে, কাব্য, উপন্যাস, দর্শন প্রভৃতি সাহিত্যের
বিভাগে তাঁহাদিগের কল্যাণকর স্পর্শের পরি-
পাওয়া যাইতেছে, বাঙ্গালায় তিনখানি সুপরি-

তাঁহাদিগকে কেহ কখনও স্বদেশের ও সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে না।

এবারকার সম্মিলনের পঞ্চম বিশেষত্ব তিন দিন ব্যাপী অধিবেশন। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সময় ও সুবিধা ঘটিলে তিন দিন কেন, সমস্ত বৎসর ধরিয়া নিত্য সম্মিলন হইলেও আমি আনন্দিত ভিন্ন নিরানন্দিত নহি। সাহিত্য-সুহৃদ্দিগকে প্রতিদিন বাহু-পাশে বাঁধিবার সুযোগ পাইলে, কে সেই সৌভাগ্য সুযোগ ছাড়িতে চায়?

উপরোক্ত বিশেষত্বগুলি ব্যতীত এবারকার সম্মিলনে আরও একটী বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি,

তাহা আগামী অষ্টম বার্ষিক সম্মিলন-নিমন্ত্রণে বিভিন্ন দেশবাসীর আগ্রহাতিশয্য; ইহা সম্মিলনের পক্ষে যেমন মঙ্গলজনক, তেমনি গৌরবজনক ব্যাপার; আশা ও আনন্দের কথাও বটে। তবে এতদুপলক্ষে নিমন্ত্রণ কর্ত্তাগণের ধৈর্য্যচ্যুতি বাঞ্ছনীয় নহে। যাহা হউক, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা অবধি আর এমন ঘটনা ঘটিয়াছে কি না জানি না। ময়মনসিংহে দেখিয়াছিলাম, কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুরকে সম্মিলনের নিমন্ত্রণ ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল, তৎপর বৎসর দেখিয়াছিলাম, চুঁচুড়া হইতে সম্মিলনের নিমন্ত্রণ যাচ্ঞা করিয়া চট্টগ্রামবাসীর কাছে সারদা বাবুর টেলিগ্রাম আসিয়াছিল; আর এবারে দেখিলাম, সেই কৃপার্থী সম্মিলনের নিমন্ত্রণ করিবার জন্য কেমন মাতামাতি! এ নিমন্ত্রণ সমরে বর্দ্ধমানবাসী জয়লাভ করিয়াছেন। আগামী অষ্টম বার্ষিক বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন বর্দ্ধমানে হইবে স্থির হইয়াছে। কিন্তু যদি সম্মিলনের উদ্যোক্তারা কলিকাতা-সম্মিলনের আলোচ্য বিশেষত্বগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া যথাবিহিত কার্য্য না করেন, তবে যে প্রসিদ্ধ কবি-বাক্য—

"একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন না হ'লে কোথা মিলয়ে রতন॥"

সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সহস্র যত্ন করিয়া বর্দ্ধমান গেলেও—প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধমানের বিখ্যাত মতিচূর ও সীতাভোগ ভোগ করিলেও রত্নান্বেষী সাহিত্য-সেবকগণের যথার্থ রত্নলাভ হইবে না।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

রাজ-পুতানী।*

তখনো বাজেনি সন্ধ্যার সুর শান্ত পূরবী সুরে,
তখনো ঘণ্টা বাজিয়া ওঠেনি দেবতার মন্দিরে।
সন্ধ্যাদেবীর কোমল চরণে অলক্ত রাগ শোভা
তখনো প্রতীচি-সীমান্ত-কোণে অঙ্কিত মনলোভা।
তখনো নদীতে শেষ খেয়া-পার হয়নি'ক দেয়া শেষ,
তখনো স্নানেতে রমণী চলিছে রচনা করিয়া কেশ।
তখনো রাখাল আসে নাই গোঠে, ফিরে নাই নীড়ে পাখী
তখনো পবন বহিছে সাঁঝের স্নিগ্ধ-তৃপ্তি মাখি'!
চিতোর-প্রাসাদে বাজি' নহবৎ এই শুধু গেছে থামি'!
পুরীর ভিতরে-বাহিরে আসিছে সন্ধ্যা-আঁধার নামি!
উঠিল চন্দ্র,—শুভ্র কমল ফুটিল আকাশ-আলো,
দিগ্‌দিগন্তে রজত-জ্যোতি ভাতিল নাশিয়া কালো।
চিতোরের রাণী দাস-দাসী আজি' ফেলিয়া বিলাস রাশি.
প্রাসাদ-শিখরে চিন্তামগ্ন নাহি আর মুখে হাসি।
নিম্নে দৃশ্য, ছায়া ও আলোকে বিরাজিত ভূমি' পরে,
একে একে জ্বলি' উঠেছে প্রদীপ নগরের ঘরে ঘরে!
আকাশের পটে বিকশিয়া উঠে তারকা কম্পহীন,
চন্দ্র-কিরণ-সুধায় সিক্ত নির্ম্মল সুনবীন
সুস্নাত নবযৌবন-দ্যুতি-মণ্ডিত তনু তাঁর,
চিতোরের রাণী পদ্মিনী আজ, চন্দ্রে মানায় হার!
ফুটেছে পদ্ম আকাশ সাগরে রাজার প্রাসাদ পরে;
পদ্মিনী ফুটি' আলোক বিলাল, চন্দ্রকিরণ হারে!
সরসীর জলে পদ্ম ফুটিয়া আলো করে ধরাতল,
রাজপুত-রাণী রাজার পুরীতে ততোধিক উজ্জ্বল!
বাম করতল রাখিয়া আপন বাম গণ্ডের' পরে
রাজপুতানার মহারাণী আজি চিন্তিতা কার তরে?—

* * * *

"এই যে চিতোর নীরব, নিথর আজি সুন্দর সাঁঝে,
প্রদীপ মালায় চন্দ্র কিরণে যার গৃহে গৃহে রাজে
রাজপুতানার বিজয়ী জাতির স্বাধীন সবল প্রাণ,
যার নদী আর প্রান্তরে যার কম্পিত সুমহান
মুক্তকণ্ঠে মুক্তির গাথা; মরুতে যাদের তালু
হয়নি শুষ্ক, অশ্বের খুরে উড়াইয়া দিয়া বালু
যাহারা ছুটেছে দিকেদিগন্তে সুস্থ সবল দেহ;
যাদের রমণী গ্রহণ করেনি শুধু প্রেম, শুধু স্নেহ
শুধু দান, শুধু ব্যর্থ বিলাস আপন পতির কাছে;
রাজপুতানার রাজপুতানীরা এই শুধু মনে যাচে;—
তাহাদের পতি নাচিয়া ছুটিবে বিজয়-কেতন হাতে,
রাজপুত-নারী দিবে হুলুরব সমর-যাত্রা-সাথে!
চিতোরের তরে চিরজয়ী বীর তারা রমণীর পতি,
এই বীরগণ তাই বরিয়াছে, রাজপুতানার সতী!
সিঁথার সিঁদূর পতিকে পরায় বিজয় রক্ত-টীকা,
নহে সে কেবল সিন্দূর-শোভা; যেন সে বহ্নি-শিখা
রাজপুতানীর মাথায় জ্বলিছে; অক্ষয় চিরদিন
সুখে ও দুঃখে সঙ্কটে ভয় অম্লান, অক্ষীণ!
চিতোরের নারী সঁপিয়া পরাণ, তবুও মানিবে পতি;
সিঁথার সিঁদূর বিকাইবে না'ক নিভাইয়া নিজ-জ্যোতি!
চিতোরের বীর সঁপিবে জীবন চিতোরের তরে রণে,
তবু সে কখনো ফিরিয়া আসিয়া পত্নীর কাণে কাণে
শুনাতে পারে না বলহীন সম অরির বিজয়-বাণী!"

* * * *

এই সব কথা আপনার মনে চিন্তিয়া মহারাণী
ভাবিলা, "আলাউদ্দীন যদি আসে এ চিতোর-দ্বারে
প্রণয়-লোলুপ আমার জন্য; আমি শুধু দিব তারে
চিতোরের চিতা-ভস্ম-গঠিত নশ্বর তনু-রাগ;
বিশ্বজয়ীর বাসনা-বিলাস তৃপ্ত হইয়া যাক্!
রাজপুতানীর পূতঃ এ দেহের ভস্ম-তিলক নিয়া
চিতোরেশ্বরী বিশ্বজয়ীরে দিন জয়-টীকা দিয়া!"

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

* চিতোরের মহারাণা ভীমসিংহ আলাউদ্দীনের নিকট বন্দী। আলাউদ্দীন চিতোরে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন, যদি ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীকে অবিলম্বে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হয়, তবেই ভীমসিংহ মুক্তি পাইবেন। অন্যথা তাঁহাকে নানা প্রকারে অপমানিত করা হইবে। পদ্মিনী পাঠান আলাউদ্দীনের এই ঘৃণ্য এবং চিতোর রমণীর অপমানকর প্রস্তাব শুনিয়া সেদিন সন্ধ্যায় নানা প্রকারের চিন্তা করিতেছিলেন। সেই দিনকার সন্ধ্যার চিত্র ও চিন্তা-মগ্না পদ্মিনীর মনোভাব লইয়া কবিতাটী রচিত হইল। রচয়িতা।

ওমরাহের কন্যা।

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার পৌত্র দাহির বক্সকে দিল্লীর সিংহাসন প্রদত্ত হয়। দাহির বক্স সুলতান খসরুর পুত্র ছিলেন। জাহাঙ্গীরের জীবিতকালেই সাজাহানের চক্রান্তে খসরু হত হন। সুতরাং জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ন্যায়ানুসারে দিল্লীর সিংহাসন দাহির বক্সেরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তিনিও সাজাহানের আদেশে হত হন এবং ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে সাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দাহির বক্স যখন কিছুকালের জন্য দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, তখন খাঁ লোদি বুরহানপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময় সাজাহান দাক্ষিণাত্যে থাকিয়া রাজধানী অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইবার কালে সাজাহান খাঁ লোদীর রাজ্যের ভিতর দিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি খাঁ লোদীর নিকট তাঁহার পুত্র মোরাদকে দূত প্রেরণ করেন।

সুসজ্জিত বিশ্রামাগারে বসিয়া খাঁ লোদী যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন। খাঁ লোদী তাঁহাকে ভিতরে লইয়া আসিতে অনুমতি দিলেন। অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া যখন খাঁ লোদীর সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন তিনি তাহার বীরোচিত আকৃতি এবং মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। সেই বীরত্বে মণ্ডিত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া যুবকটি কে তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না।

সেলাম করিয়া যুবক বলিলেন, "খাঁ লোদী, আপনি অবগত আছেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর এক্ষণে স্বর্গে অবস্থিতি করিতেছেন। দিল্লীর সিংহাসন এখন এক রাজ্যলোভী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু সুলতান সাজাহানই প্রকৃত পক্ষে মোগলের সম্রাট। তিনি তাঁহার যথার্থ অধিকার লাভের জন্য রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। আপনার রাজ্যের ভিতর দিয়া গমন করিতে তিনি ইচ্ছুক হইয়াছেন। এজন্য তিনি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহাকে কি উত্তর দিব?"

খাঁ লোদীর ললাটদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন "যুবক, তোমার প্রভুকে গিয়া বল, আমার রাজ্যের ভিতর দিয়া রাজদ্রোহীর যাইবার পথ নাই। পিতৃবিদ্রোহী পুত্র কখনো ন্যায়বান

রাজা হইতে পারেন না। আমার রাজ্য বরং শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হউক, তথাপি সাজাহানকে মোগলের সম্রাটরূপে বরণ করিব না।"

ক্রোধকম্পিতস্বরে যুবক বলিলেন, "এমন এক সময় আসিবে যখন খাঁ লোদী তাঁহার সম্রাটকে যে অপমান করিয়াছেন, একথা ভুলিতে পারিলেই আনন্দিত হইবেন।" উত্তর শুনিয়া খাঁ লোদীর চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। সুলতান সাজাহানের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞার নিদর্শনস্বরূপ তিনি যুবককে একটি ভৃত্যের পরিচ্ছদ, একটা রুগ্ন অশ্ব এবং একটি ছোট থলিপূর্ণ রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমার প্রভুকে এই উপহার প্রদান করিও।"

অপমানিত যুবক তৎক্ষণাৎ খাঁ লোদীর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রাসাদ হইতে কিয়দ্দূরে এক রাখালের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় যুবক তাহাকে উপহারের দ্রব্যগুলি অর্পণ করিয়া বলিলেন, "যাও, তোমাদের প্রভুকে গিয়া বল যে সম্রাট সাজাহানের পুত্র যুবরাজ মোরাদ তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যগুলি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে দুঃখের দিনে এগুলি তাঁহারই প্রয়োজনে আসিবে। উদ্ধত কর্ম্মচারী এবং অসন্তুষ্ট প্রজার ভাগ্যে চিরকালই দুঃখ লেখা আছে।"

এই বলিয়া মোরাদ রোষে অপমানে জ্বলিতে জ্বলিতে পিতার শিবিরের অভিমুখে গমন করিলেন। এক গভীর অরণ্য অতিক্রম করিয়া এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পড়িয়া তিনি দেখিলেন, অনুচরবৃন্দ পরিবৃত একটি পাল্কী অরণ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে। পাল্কীর সহিত বহু লোকজন এবং ইহা বহু মূল্যবান বস্ত্রে আবৃত দেখিয়া মোরাদ বুঝিলেন, পাল্কীর ভিতর কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা আছেন। পাল্কী অরণ্যের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র এক ক্ষিপ্ত হস্তী হঠাৎ অরণ্য হইতে নির্গত হইয়া পাল্কীর দিকে সবেগে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। অনুচরগণ এই ভীষণ শত্রুকে দেখিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। বাহকগণও পাল্কী ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। দূর হইতে এই ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া: মোরাদ তীরবেগে আসিয়া পাল্কীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং হস্তী নিকটে আসিবামাত্র তরবারীর এক আঘাতে তাহার পশ্চাতের এক পদ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অনুচরদিগের নিকট হইতে বন্দুক চাহিয়া লইয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলেন। সে আঘাতে হস্তী এক ভীষণ চীৎকার করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

পাল্কীর ভিতরে যে মহিলা ছিলেন, তিনি বাহিরে দাঁড়াইয়া এই ব্যাপার দর্শন করিলেন। তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যময় বদনমণ্ডল কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার তেজোদৃপ্ত আকৃতিতে ভয়ের কোন চিহ্ন ছিল না। তিনি মোরাদকে শ্রদ্ধার সহিত অভিবাদন করিয়া তাঁহার পিতৃগৃহে আগমন করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। মোরাদ অনুচরদিগের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, মহিলাটি খাঁ লোদীর কন্যা জাহানারা।

তিনি সসম্মানে প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়া, আমি সাহাজানের পুত্র মোরাদ। আপনার পিতা তাঁহার রাজ্যের ভিতর দিয়া সাজাহানকে যাইবার অনুমতি দেন নাই। সুতরাং আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অক্ষম।"

তেজস্বিনী জাহানারা দৃপ্তস্বরে বলিলেন—

"তবে আমাদের পরিচয় এইখানেই শেষ হউক। আমার জীবনের জন্য পিতার শত্রুর নিকট যে ঋণী থাকিতে হইল, ইহাই আমার পরম দুঃখ রহিল। তবে আশা আছে একদিন এ ঋণ পরিশোধ করিব।" এই বলিয়া সুন্দরী জাহানারা পাল্কীতে আরোহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নানাভাবে আন্দোলিত হইয়া মোরাদ পিতৃ সমীপে গিয়া খাঁ লোদীর বক্তব্য নিবেদন করিলেন। সাজাহান ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভিন্ন পথে যাইবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং অচিরে আগ্রা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে খাঁ লোদী অবগত হইলেন, সাজাহান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। খাঁ লোদী বিশেষ শক্তিশালী ওমরাহ

ছিলেন। সম্রাট সাজাহান তাঁহাকে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি খাঁ লোদীর সহিত সখ্য স্থাপনের জন্য তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। খাঁ লোদীর অকুণ্ঠ সাহস এবং বীর্য্যের জন্য রাজ্যের সমুদয় আমীর ওমরাহগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি আপনার বীরত্ব এবং আমীরদিগের বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করিয়া সপরিবারে আগ্রায় আগমন করিলেন। উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত এক প্রাসাদে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। আগ্রায় পৌছিবার কয়েক দিন পরে খাঁ লোদী তাঁহার দুই পুত্রসহ সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইলেন। খাঁ লোদী যে একবার সাজাহানকে অপমান করিয়াছিলেন, সে কথা সম্রাট বিস্মৃত হন নাই। খাঁ লোদী যখন সম্রাটকে অভিবাদন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন সম্রাটের ইঙ্গিতে দ্বারপাল আসিয়া খাঁ লোদী দ্বারা কতকগুলি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাইয়া লইল, যাহা তাঁহার পক্ষে একান্ত অপমানজনক। তিনি বাধ্য হইয়া সে সমুদয় নিষ্পন্ন করিলেন কিন্তু অন্তরে বুঝিলেন যে, ইহা তাঁহারই আচরণের প্রতিশোধ। খাঁ লোদীর পরে তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র আজমত সম্রাটকে অভিবাদন করিতে আসিলেন। সম্রাটকে কুর্ণিশ করিবার সময় সাধারণতঃ যতক্ষণ ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া থাকিতে হয়, দ্বারপাল আজমতকে তদপেক্ষা অধিক সময় ভূমিতে প্রণত করিয়া রাখিল। তেজস্বী বালক তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া উঠিয়া দীপ্ত তেজে খাপ হইতে তরবারী নিষ্কাসিত করিয়া দ্বারপালের মস্তকে আঘাত করিল। প্রহরীগণ ধরিয়া না ফেলিলে সেই আঘাতেই দ্বারপালের মস্তক দেহ হইতে চ্যুত হইত। গোলমাল দেখিয়া খাঁ লোদী তাঁহার জীবন নাশের আশঙ্কা সন্দেহ করিয়া তরবারী দৃঢ় হস্তে ধরিলেন। তাঁহার দুই পুত্র উন্মুক্ত তরবারী হস্তে পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকের আমীর ওমরাহগণও তরবারী খুলিয়া দাঁড়াইলেন। উন্মুক্ত অসির ঝনঝনায়, আমীর ওমরাহদিগের উত্তেজনাপূর্ণ চীৎকারে দরবার গৃহে একটা মহা কোলাহলের সৃষ্টি হইল। ক্রোধে কম্পিত কলেবর সম্রাট সাজাহান সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "খাঁ লোদীকে পুত্রসহ এখনি বন্দী কর।" যাহারা তাঁহাদিগকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন, তাহাদিগকে আহত করিয়া খাঁ লোদী পুত্রদিগকে লইয়া প্রাসাদে প্রস্থান করিলেন এবং প্রহরীদিগকে প্রাসাদের দ্বার বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন। সম্রাট খাঁ লোদীকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাসাদ সুদৃঢ়রূপে গড়বন্দী ছিল বলিয়া তাঁহাকে তখনি বন্দী করা গেল না। সম্রাট মোরাদকে তাঁহার প্রাসাদ অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন। মোরাদ খাঁ লোদীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যদি আত্মসমর্পণ করেন তবে অবরোধের এই দুর্ব্বিসহ ক্লেশ হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারিবেন। ইহার উত্তরে খাঁ লোদী পুত্র কন্যাসহ প্রাসাদের প্রাচীরের উপর উঠিয়া বলিলেন—

"তোমার প্রস্তাবের উত্তর স্ত্রীলোকের মুখ হইতে পাইবে।" এই বলিয়া তিনি কন্যা জাহানারাকে দেখাইয়া দিলেন। জাহানারা বলিলেন—

"রাজকুমার মোরাদ, বীরেরা অত্যাচারে ভীত হয় না। স্বাধীন জীবন যাপনই মানবের শ্রেষ্ঠ সুখ। কিন্তু অত্যাচারীরা মানবকে স্বাধীনতা হইতে সর্ব্ব প্রকারে বঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করে। জানিয়া রাখিবেন, আমরা সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও কখনো আত্মসমর্পণ করিব না।"

এই তেজোপূর্ণ উত্তর পাইয়া মোরাদ সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া গেল, সে ভীষণ অবরোধের দৃঢ়তা একটুও শিথিল হইল না। ক্রমে প্রাসাদের ভিতরে অন্নাভাবে, জলাভাবে হাহাকার উত্থিত হইল; সকলেই বুঝিল আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। খাঁ লোদী মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া মাল্য দেশে পলায়ন করিলে আত্ম সমর্পণের নিদারুণ অপমান হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে কার্য্য নিতান্ত দুঃসাহসিক হইবে! প্রবল পরাক্রান্ত অগণ্য শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া যাইবার চেষ্টা

করার অর্থ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু আত্মসমর্পণ অপেক্ষা মৃত্যু যে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিনি পরদিন প্রত্যূষেই শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। দুই পুত্র ও কন্যা জাহানারাকে ডাকিয়া এই অটল সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। তাঁহারা উৎসাহের সহিত ইহাতে সম্মতি দান করিলেন। পুত্র কন্যারাও একবাক্যে বলিলেন, অপমান অপেক্ষা মৃত্যু যে পরম গৌরবের জিনিষ।

পরদিন প্রত্যূষেই খাঁ লোদী কয়েকজন সুসজ্জিত বিশ্বস্ত অনুচরসহ প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয় এবং কন্যাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তখনো চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সম্রাটের সৈন্যগণ সহসা এই বিপদ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। যাহারা খাঁ লোদীকে বাধা দিতে অগ্রসর হইল তাহারা সকলেই এই কয়েকটী তেজস্বী আত্মবিসর্জ্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বীরের অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী হইল। খাঁ লোদী এবং তাঁহার পুত্রগণ শীঘ্রই নগরের বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অগণ্য শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়া জাহানারাও অশ্বারোহণে পিতার অনুসরণ করিতেছিলেন। তাঁহার হস্তের তরবারী রক্তধারায় রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। খাঁ লোদী নগরের বাহিরে চলিয়া গেলে তিনি যখন সিংহদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন মোরাদ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনার পলায়নের আর পথ নাই। আপনি এখন আমাদের বন্দিনী।" তৎক্ষণাৎ একজন সৈন্য জাহানারার অশ্বের লাগাম ধরিতে গেলে তিনি তরবারীর এক আঘাতে তাহার হস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন "দ্বার খুলিয়া দিন আমি চলিয়া যাই। মনে রাখিবেন, আমার জীবন থাকিতে আমাকে কখনও বন্দী করিতে পারিবেন না।" এই বলিয়া জাহানারা মোরাদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারী দ্বারা আঘাত করিলেন। মোরাদ মস্তক হেলাইয়া সে আঘাত এড়াইলে তাহা তাঁহার অশ্বের উপর পতিত হইল। সে আঘাতে অশ্ব ভূপতিত হইল। মোরাদ তাঁহার এই অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং নগরদ্বার খুলিয়া দিলেন। জাহানারা বিদ্যুদ্বেগে নগর হইতে বহির্গত হইয়া পিতা এবং ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

খাঁ লোদীর পলায়নের সংবাদে সম্রাট সাজাহান অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

খাঁ লোদী পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সম্রাটের সৈন্য দুষ্ট গ্রহের ন্যায় মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুসরণ করিবে। তিনি সারাদিন অশ্বারোহণে ছুটিয়া দিবসের শেষে এক খরস্রোতা নদীর তটে উপস্থিত হইলেন। সে নদীতে তখন বিপুল তরঙ্গের ভীষণ নৃত্য। তাহা ঠেলিয়া যাইবার সাধ্য মানবের ছিল না। অনন্যোপায় হইয়া খাঁ লোদী উদ্বেগাকুল হৃদয়ে পুত্রকন্যাসহ সেই স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া রাত্রি যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। গভীর রজনীতে গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল, সম্রাটের বিপুল সৈন্য নিকটবর্ত্তী, এই মুহূর্ত্তে আত্মরক্ষার উপায় না করিলে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নদী পার হইবার কোন উপায় না দেখিয়া খাঁ লোদী অনুচরবৃন্দসহ নিকটস্থ গিরিবর্ত্ম্য অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কন্যা জাহানারা এবং পুত্র দুইটি অশ্বারোহণে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। প্রভাতে সম্রাটের আট সহস্র সৈন্যের সহিত খাঁ লোদীর সাড়ে চারি শত সৈন্যের বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা সমাগমে খাঁ লোদীর তিন শত সৈন্য রণক্ষেত্রে অন্তিম শয্যা গ্রহণ করিল। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া খাঁ লোদীর পুত্রগণ তাঁহাকে নদী পার হইয়া মাল্য দেশে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। সে দিনের সংগ্রামে তিনি বিশেষরূপে আহত হইয়াছিলেন। শত্রুহস্তে অনর্থক আত্মদান অপেক্ষা জীবিত থাকিয়া এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লওয়া অধিকতর সমীচীন বিবেচিত হওয়ায় ইহাই স্থির হইল যে খাঁ লোদী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হোসেন এবং কন্যা জাহানারাকে লইয়া রজনীর অন্ধকারে

নদী পার হইবেন। জ্যেষ্ঠপুত্র আজমত অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া শত্রুসৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য সেই গিরিবর্ত্মে অবস্থান করিবেন। গভীর রজনীতে খাঁ লোদী পুত্রসহ নদী পার হইয়া অপর পারে উঠিয়া দেখিলেন, জাহানারা তাঁহার অনুসরণ করেন নাই। ইহাতে পিতা মহা চিন্তিত হইলেন। কিন্তু তেজস্বিনী কন্যার বীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বেদনাকুল হৃদয়ে তাঁহার নিরাপদ আগমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। প্রভাতের প্রারম্ভ হইতেই পুনরায় তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। খাঁ লোদীর সৈন্যগণ একে একে ধরাপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। আজমত অতুলনীয় পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমেই পরাজয় এবং মৃত্যুর করাল ছায়া তাঁহাদের ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল। আজমত যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রু পক্ষের সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তরবারি উন্মুক্ত করিয়া আজমতের মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন! সেই অব্যর্থ আঘাতে আজমতের জীবনলীলা তখনই শেষ হইত, কিন্তু হঠাৎ কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে এক তীর আসিয়া সেনাপতির বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। সে অব্যর্থ শরের আঘাত বিফল হইল না। সেনাপতি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বিস্ময়াকুল চিত্তে আজমত পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, জাহানারা তীর ধনুক হস্তে, অশ্বারূঢ় হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তিতে রণক্ষেত্র আলোকিত করিতেছেন। আজমত সেই দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অচিরেই শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। জাহানারার আর একটী তীর তাঁহার ভ্রাতার হত্যাকারীর প্রাণনাশ করিল। সকল আশা নির্ম্মূল হইল দেখিয়া জাহানারা তরঙ্গ সমাকুল নদীর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য একদল সৈন্য তাঁহার পশ্চাদনুগমন করিল। কিন্তু জাহানারা নির্ভয়ে অপূর্ব্ব নিপুণতার সহিত ভীষণ তরঙ্গ ঠেলিয়া পরপারে গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার এই অপরাজিত বীর্য্য দেখিয়া শত্রুকুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহার অনুসরণ করিতে বিস্মৃত হইয়া গেল। কন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া খাঁ লোদী পুত্রের গৌরবময় মৃত্যুর মর্ম্মভেদী কাহিনী শ্রবণ করিলেন। পুত্র যে বীরোচিত শয্যায় শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে খাঁ লোদীর বদনমণ্ডল হর্ষোচ্ছাসে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার নয়ন হইতে এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল সিক্ত করিল। খাঁ লোদী কন্যা ও পুত্রকে লইয়া মাল্যদেশে গমন করিলেন।

সাজাহান খাঁ লোদীর ধ্বংস সাধন করিতে না পারিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি মাল্য প্রদেশে পুনরায় একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহাদের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব দেখিয়া খাঁ লোদী নিজামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে তাঁহার রাজ্যে গমন করিলেন। সম্রাটের সৈন্য এখানেও তাঁহার অনুগমন করিল। খাঁ লোদী নিজামের সৈন্যের সাহায্যে বহুদিন পর্য্যন্ত সম্রাটের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সকল সংগ্রামে জাহানারা পিতার সহিত থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। সাজাহানের পুত্র মোরাদ জাহানারার অপূর্ব্ব বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই তেজস্বিনী নারী শত্রুর পুত্রকে বিবাহ করিয়া রাজপ্রাসাদে সুখের জীবন যাপন করা অপেক্ষা পিতার সহকারিণীরূপে রণক্ষেত্রের রক্তমাখা প্রাঙ্গণে অসি হস্তে লীলা করিয়া বেড়ানই অধিকতর কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। পরিশেষে এইরূপ এক ভীষণ সংগ্রামের দিনে শত্রুর গোলার আঘাতে বীরাঙ্গনা জাহানারার মর জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। কন্যার মৃত্যুর পর খাঁ লোদীও রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একাকী অসি হস্তে শত্রুদলের ছয়জন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণ সংহার করেন।

বশিষ্ঠাশ্রম।

সুদূর প্রবাসের বৈচিত্র্য-বিহীন ছাত্রাবাসে প্রতিদিন অধ্যয়ন ভোজন এবং খোস গল্পের ভিতর দিয়া কাটাইয়া কাটাইয়া চিত্ত বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল এবং জীবন নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। স্থির করিলাম, কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে অদূরস্থিত বহু প্রশংসিত কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব্ব বশিষ্ঠাশ্রম দেখিয়া আসিব, তাহা হইলে অধ্যয়ন পরিশ্রান্ত মস্তক বিশ্রাম লাভ করিয়া কথঞ্চিৎ সজীব হইবে এবং চিত্তও নূতন দৃশ্য অবলোকন করিয়া আনন্দ লাভ করিবে।

আমরা যাইবার জন্য পাঁচজন বন্ধু জুটিলাম। পরদিন অতি প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বে রওনা হইতে হইবে। পূর্ব্ব দিন বিকাল বেলা হইতেই যাইবার জন্য আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলাম। নিকটস্থিত গোয়ালবাড়ী হইতে কিছু মাখম, রুটী, কমলা প্রভৃতি আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্যাদি একটি পুটুলিতে বিশেষ যত্ন সহকারে বাঁধিয়া নগ্নপদে রাত্রি শেষে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। আমাদের একজন অতি স্থূলকায় রহস্যপ্রিয় বন্ধুও যাইবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বশিষ্ঠাশ্রম প্রায় আট মাইল। বন্ধুবরের বিশাল 'ভুঁড়ি' এবং অসম্পূর্ণ গুরুভার স্থূল পদদ্বয় তাঁহার যাইবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং যদিও তিনি এতদ্‌সত্ত্বেও যাইতে সাহসী হইয়াছিলেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে পরমেশ্বরের অন্যায় সৃষ্টির বিষয় ভাবিবার অবসর দিয়া চলিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিলাম।

আমরা যখন সহরের গণ্ডী ছাড়াইয়া আসিয়াছি, তখন অরুণরাগরঞ্জিত পূর্ব্বাকাশে সূর্য্যোদয়ের আভাস পাইতেছিলাম। প্রাতঃসমীরণে দুই পার্শ্বস্থিত ধানগাছগুলি হেলিয়া দুলিয়া সড়্ সড়্ শব্দ করিতেছিল। আমরা বন্ধু কয়েকটি ব্যতীত নিকটে আর কোনও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র ছিল না। পথ প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন। শুধু আমাদের জুতাবিহীন পদের ক্ষীণ শব্দ বায়ু হিল্লোলায়িত ধান গাছের আন্দোলন শব্দের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। সেই প্রশান্ত সূর্য্যোদয় এবং স্নিগ্ধ প্রাতঃসমীরণ আমাকে যেন স্বপ্নাবিষ্ট করিয়া তুলিল। আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত ছিল না। পূর্ব্ব গগনের স্বর্ণ-আভা মেঘপ্রান্তে চিক্কণ রেখা অঙ্কিত করিয়া নভোমণ্ডলকে পরম দর্শনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় আপনিই পুলকিত হইয়া যেন রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গাহিয়া উঠিল—

তোমায় মোরা করব বরণ
মুখের ঢাকা কর হরণ
ঐ টুকু ঐ মেঘাবরণ
দু' হাত দিয়ে ফেল ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে!

সেই স্মরণীয় প্রত্যূষকালের খণ্ডমেঘের অন্তরালে সত্য সত্যই যেন কাহার স্নিগ্ধ মুখচ্ছবির আভাস পাইয়াছিলাম,—আমি আবিষ্ট হইয়াছিলাম, পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।

যখন আমরা জনমানবশূন্য স্থান সকল অতিক্রম করিয়া বেলতলা নামক গ্রামস্থ হাটে পৌঁছিয়াছি, তখন বেলা সাতটা। খিচুড়ী রন্ধনের সরঞ্জাম ক্রয় করিবার নিমিত্ত আমরা হাটে প্রবেশ করিলাম। হাটটি অতি ক্ষুদ্র, কৃষক প্রভৃতি দ্বারাই পরিপুষ্ট এবং পোষিত। সুতরাং আমরা প্রবেশ করিতেই প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। তাহারা আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ব্যবধানজনিত এরূপ সবিস্ময় দৃষ্টি আমাকে গৌরবান্বিত না করিয়া বেদনা দিতে লাগিল। ইহাদের সরলতা পরিপূর্ণ চিন্তাশূন্য অন্তরের সম্মুখে আমার অন্যায় জ্ঞানাভিমান, কুটিলতা এবং অহঙ্কার যেন আমাকে সহস্র দংশনে বিঁধিতে লাগিল। অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য নগ্নশোভাসমাকীর্ণ পর্ব্বতগাত্রসংলগ্ন ক্ষুদ্র কুটীরে উহাদের শান্তিপূর্ণ জীবন আমাদের সুসভ্য

সমাজ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

কয়েকটি হাঁড়ি, চাউল, ডাইল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আমরা পুনরায় রওনা হইলাম। ক্রমে বন্ধুর পথ সকল অতিক্রম করিয়া আমরা বশিষ্ঠাশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। বহুদূর হইতে যেন কি এক বিপুল শব্দ আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। বুঝিলাম উহা বশিষ্ঠাশ্রমস্থিত জলপ্রপাতের শব্দ।

মধ্যে মধ্যে ঐ সকল স্থানে ব্যাঘ্রাদির সমাগম হইয়া থাকে বলিয়া শুনিয়াছিলাম। সুতরাং যদিও বুকের ভিতর স্পন্দনটা মাঝে মাঝে দ্রুত হইয়াছিল, তথাপি উজ্জ্বল দিবালোক এবং পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত পথ দেখিয়া ভয়টা তত বেশী হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ সেই নির্জ্জন স্তব্ধ গিরি পথটিকে আমরা বন্ধু কয়জনে মিলিয়া হাস্যালাপ এবং স্ফূর্ত্তি দ্বারা সজীব করিয়া তুলিয়াছিলাম।

যখন আমরা গম্যস্থানের অর্দ্ধ মাইল দূরে রহিয়াছি এবং এক নিবিড় ঔৎসুক্য আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, তখন আমাদের মস্তকের উপরে দুই পার্শ্বস্থিত সমুন্নত বৃক্ষের শাখাগুলি হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে কাঁপিয়া উঠিল। আমরা সকলেই সচকিত হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। যদিও এই সভ্যতা আলোকিত বিংশ শতাব্দীতে শিশুলোকবিশ্রুত মহাভীতিপ্রদ ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি কিম্ভুতকিমাকার জানোয়ারের অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করা নিতান্তই স্থূলবুদ্ধি এবং কুসংস্কারের পরিচায়ক, তথাপি স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি যে, সে অপ্রত্যাশিত কম্পন শব্দে একটু বেশী রকমেই চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহাতে বিস্ময়, ভয় এবং আনন্দ মানব-হৃদয়ের এই তিনটি প্রধান বৃত্তি—

"আমার হৃদয়-বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি!"

ভয় হইতেছে পাঠকের ধৈর্য্য আর থাকিতেছে না। সুতরাং 'চট্ করিয়া' বলিয়া ফেলি। দেখিলাম, বহুসংখ্যক হনুমান আমাদের দিকে তাকাইয়া সমুজ্জ্বল দশনপংক্তি সহযোগে মুখমণ্ডলকে বিচিত্র প্রকারে বাঁকাইয়া তাহাদের ভঙ্গী-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। উহাদিগের দর্শনে প্রথম বৃত্তিদ্বয়ের আবির্ভাব যে সহজেই হইতে পারে, তাহা নিশ্চয়ই আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। শুধু শেষোক্ত বৃত্তিটি সম্বন্ধে একটু কৈফিয়ৎ প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা দারবিনের বিখ্যাত "থিওরি অব্ ইভলিউসনে" (Theory of Evolution) অটল বিশ্বাসী, তাঁহাদিগের নিকট সম্ভবতঃ বহুদিন পরে পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষ সন্দর্শনজাত আনন্দ যে নিতান্তই স্বাভাবিক তাহা আর যুক্তি দ্বারা দেখাইতে হইবে না।

দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উচ্চ-ভূমি অতিক্রম করিয়া আমরা অবশেষে বশিষ্ঠাশ্রমের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছিলাম। দ্বারেই একটি পরিচ্ছন্ন আশ্রম প্রাঙ্গণে একজন ভস্মবিভূষিত জটাধারী সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন! এই জনহীন স্থানে তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তির মাত্রাটা মাত্র চড়াইয়া উঠাইতেছি, এমন সময় সন্ন্যাসী মহাশয়ের সন্ধানালোক সদৃশ (search light) ঊর্দ্ধমুখী ভক্তির ধারাটা নিম্নগামী করিয়া আমাদের পকেটের দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। আমিও তাহাকে দুইটি পয়সা দিয়া আমার বহির্মুখী ভক্তিকে একেবারে নিরুদ্ধ করিয়া ফেলিলাম এবং দুঃখিতচিত্তে বর্ত্তমান যুগকে ধিক্কার দিতে দিতে একেবারে জলপ্রপাতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

সে কি দৃশ্য! সম্মুখে উদার উদাস নিস্তব্ধ গিরিশ্রেণী, বিশাল অম্বরচুম্বী অরণ্য, মধ্যস্থলে জলপ্রপাত! সে সুগম্ভীর দৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আমি অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের মধ্য দিয়া তিনটি স্নিগ্ধ নির্ম্মল ধারা ছল ছল শব্দে বহিয়া বহিয়া কিছুদূরে যাইয়াই পুনরায় এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছে এবং এক বিপুল ধারায় পরিণত হইয়া প্রবল স্রোতে এবং প্রচণ্ড বেগে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চলিয়া যাইতেছে। ধারাত্রয়ের নাম—সন্ধ্যা, ললিতা এবং কান্তা। উহাদের একটি ধারার মধ্যে নাকি বশিষ্ঠ মুনির যোগাসন নিমজ্জিত।

আশ্রমস্থিত পাণ্ডা সে আসনটি দেখাইয়া দিল এবং আমাদিগকে মন্ত্র পড়িয়া দুইটি করিয়া পয়সা তাহাকে দক্ষিণাস্বরূপ দিবার জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমরা সকলেই নিরতিশয় কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম সুতরাং আগ্রহ সহকারেই পাণ্ডার অভিলাষ পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। সেই হিমশীতল নির্ম্মল প্রবাহে আকণ্ঠ অবগাহন :করিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল সেই মহামুনির যোগাসন ধৌত পবিত্র বারিরাশি আমার শরীরের ময়লার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়স্থিত বহু দিনের রাশিকৃত আবর্জ্জনা ধুইয়া ফেলিয়া আমাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিল। মন্ত্রের একস্থানে ছিল, "পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" কিন্তু আমাদের একজন আমোদপ্রিয় বন্ধু কিছুতেই এ কথা বলিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "পুনর্জ্জন্ম চ বিদ্যতে।" বন্ধুর এতাদৃশী সংসার-ভক্তি দেখিয়া আমরা আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মন্ত্র পাঠান্তর পাণ্ডা ঐ আসনের উপর তাহার হস্ত বুলাইয়া আমাদের ললাটে এবং সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিল। আমি নতমস্তকে এবং নম্রহৃদয়ে তাহার স্পর্শ সমস্ত অঙ্গ ভরিয়া গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলাম। জলপতনের শব্দ এতই প্রচণ্ড ছিল যে কেহই কাহারো মৃদু কথা শুনিতে পাইতেছিলাম না। সুতরাং প্রতি কথাই আমাদিগকে অত্যন্ত চেঁচাইয়া বলিতে হইয়াছিল। কয়েক জন রন্ধন-পরিপক্ক বন্ধু খিচুড়ি রন্ধনের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা নিকটস্থিত বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ এবং খাদ্যোপযোগী কিছু ফল সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। ভোজনাবসানে লতাগুল্ম পরিবেষ্টিত সেই বিশাল প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর আমরা প্রাণ ভরিয়া বিশ্রাম করিলাম এবং দু-একটি বন্ধুর সুমধুর সঙ্গীত আমাদের আনন্দকে সম্পূর্ণতা প্রদান করিল।

প্রত্যাগমন কালে ধারাত্রয়ের উৎপত্তি নির্ণয়ে নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে দুই পার্শ্বস্থিত ছোট ছোট পাহাড়ে উঠিয়া আমাদের কৌতুহল নিবৃত্তি করিয়াছিলাম। কিন্তু একটি দুর্ঘটনা হওয়াতে যে অসীম আনন্দ লইয়া আমরা গৃহে ফিরিতেছিলাম সে আনন্দ অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। একজন বন্ধু একটী খাড়া পাহাড় হইতে দ্রুত নামিতে চেষ্টা করিতে যাইয়া তাহার গতির বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না এবং পাহাড়ের পাদদেশে পড়িয়া তাঁহার দক্ষিণহস্তখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সে যাহা হউক, এতৎসত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে আরামে গৃহে বহন করিয়া আনিতে পারিয়াছিলাম এবং কিছু বেশী দিন ভুগিবার পর মঙ্গলময় পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়-জীবন এখন সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিব, বশিষ্ঠাশ্রমের সুমধুর স্মৃতি মানসপটে মুদ্রিত থাকিবে। *

মধুসূদন দত্ত।

কাব্যকুঞ্জে বাঁশরীই বাজিত সতত,
অনুকারী বাঙ্গালীর নারী কণ্ঠ ক্ষীণ,
তুমি সেথা ঝঙ্কারিয়া দিলে রুদ্র বীণ,
দেখাইতে বীণা তন্ত্রী শক্তি ধরে কত।
গম্ভীরে অম্বরে যেন মেঘনাদ শত
গর্জ্জিয়া উঠিল বীণ মধুরে কঠিন
জানাইল বঙ্গবাসী নহে কভু হীন,
প্রাণে তার আছে বজ্র শব্দ অনাহত।
তোমার সে মেঘ রাগ তানে মূর্চ্ছনায়
কণ্ঠে দিল ভাষা, যাহে স্বদেশ জীবন,
সম্মিলিত গৌড়জন হৃদয়ে আত্মায়,
ঘোষণা করিল তার নব জাগরণ।
তোমার সে রুদ্র বীণা বাজেনি বৃথায়
হে বরেণ্য মহাকবি শ্রীমধুসূদন।

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

* বশিষ্ঠাশ্রম গৌহাটী হইতে প্রায় ৮ মাইল। কতকদূর শিলং রোড ধরিয়া যাইতেহয়। লেখক।

দেশী ও বিদেশী সমাজ।

হঠাৎ একদিন যদি করবী ফুল বলিয়া উঠে, "আমি গোপাল ফুল হইব।" তাহা হইলে তাহাকে অনেক দিক দিয়া বদল হইতে হয়। প্রথমতঃ গন্ধের দিক দিয়া, দ্বিতীয়তঃ আকারের দিক দিয়া এবং তৃতীয়তঃ তাহার সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া। এই ত্রিবিধ বিষয়ে যদি সে গোলাপের সহিত সমান হইতে পারে, তবেই সে গোলাপ ফুলে পরিণত হইতে পারিল, নচেৎ একমাত্র গোলাপী বর্ণ লইয়াই লাল-করবীফুল কখনো গোলাপফুল হইতে পারে না। আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ এবং চালচলন দোরস্ত করিলেই যেন পশ্চিমের সহিত সমান ধাপে উঠিয়া গেলাম। তাঁহাদের উচ্চতার বোধ কেবলমাত্র কোন মতে বাহিরটাকে বেশ জমকালো দেখানো, কিন্তু ভিতরে তার যে সকল দুর্গতির জীর্ণতা পঞ্জরের অস্থির মত বাহির হইয়া আছে, সেদিকে দৃষ্টি নাই। আমাদের সমাজ যদি সত্যই পাশ্চাত্য জাতিগণের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করে, তবে তাহার জন্য যে পরিশ্রম দরকার হয়, তাহা আমাদের কই ?

পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে আমাদের ন্যায় এইরূপ বিসদৃশ জাতীয়তার ভাব নাই। তাহাদের সমাজের স্ত্রীপুরুষগণ আমাদের দেশ হইতে শতকরা বহু পরিমাণে শিক্ষিত এবং কর্ম্মঠ। উহাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা যে পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় আমাদের স্ত্রীশিক্ষা নগণ্য। আমাদের এদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই, অথচ মনে করিতেছি যে, হ্যাট-কোট পরিধান করিলেই বুঝি আমরা পাশ্চাত্য জাতির সহিত সমান হইলাম। কিন্তু তাহারা মনুষ্যত্বের যে সকল মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও তাহাদের সমাজ যে সকল উচ্চ জীবনীশক্তি দ্বারা সঞ্জীবিত আমাদের মোটেই সেগুলি নাই। আমাদের সমাজে যে সকল আচার মানবকে দিনে দিনে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে, তাহাদের উচ্ছেদ সাধন কে করিবে ? তাই দেখিতে পাই, পুরুষ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলে বিবাহ করিল, পুরুষ হ্যাটকোট পরিধান করিয়া সাহেবদের সহিত নিমন্ত্রণ খাইতেছেন ও নানা বিষয়ে সদালাপ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী অন্ধকার পাকশালে অন্নপাক করিতে ব্যস্ত এবং বাংলা লিখিতে পড়িতে পারে বলিয়াই তাহার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করা হয় না। কারণ আমরা জানি, নারীজাতির সৃষ্টিই পতিসেবার জন্য এবং পুরুষজাতির সৃষ্টি তাহাদের অশিক্ষিত রাখিয়া পৃথিবীর সমস্ত আনন্দ হইতে বঞ্চিত করা। আমরা জানিয়াও যেন জানি না, বুঝিয়াও যেন বুঝি না, এমন ভান্ করি। যে সমাজে স্ত্রীজাতি আপনাদের কল্যাণকে জাগ্রত করিয়া পুরুষদিগের কঠিন পরিশ্রমের সহিত আপনাদের শুভ ও মঙ্গল ইচ্ছা বহন না করে, সে জাতি উন্নত হইবে কেমন করিয়া ? আমরা চাই, ইংরাজের সমান হইতে ? কিন্তু আমাদের ঘরে-বাহিরে যে সকল অশিক্ষার অন্ধকার, অজ্ঞানের ভীতি জাতিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই প্রাচীন নাগপাশ হইতে মুক্তি দিবার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে জাতির সহিত সমান আসনে বসিতে চাই, জানি তাহাদের দোষ অনেক আছে, কিন্তু যে সকল গুণে তাহারা গুণবান্ আমরা তাহা অনুকরণ না করিয়া তাহাদের সমান হইব কিরূপে ? যাহাকে যাহার সহিত মিলিতে হয়, তাহাকে কতকটা অপরের অনুরূপ হইতে হয়-ই। বন্ধুর সহিত বন্ধুর মনের মিল হয় বলিয়াই বন্ধুত্ব সার্থক। আমাদের সমাজে যে সকল শত শত কুসংস্কার, কুদৃষ্টান্ত আপনাদের ভীষণ মুখব্যাদান করিয়া যুগের পর যুগ মানুষকে হজম করিয়া ফেলিয়া আসিতেছে, আমাদের সমাজের নেতা, আমাদের দেশের বীর (Hero) গণকে যে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। অন্যথা দেশ দিনে দিনে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুণ্ঠিত হইয়া নিজের জাতিকে, সমাজকে হীন হইতে হীনতর করিয়া ফেলিবে।

নারীজাতিকে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া তাহাকে স্বাধীনভাবে পৃথিবীতে নিজের স্থান করিয়া লইতে হইবে। দেশের মঙ্গল বহু পরিমাণে নারীজাতির উপর নির্ভর করিতেছে। সদনুষ্ঠান হাজার সৎ হউক না কেন, সংস্কার চেষ্টা হাজার সংস্কৃত হউক না কেন, নারীর মঙ্গল কামনা যেখানে মিলিতে না পারে, সেখানে সমস্তই পণ্ড। শিব যে স্থানে সতীহীন থাকেন, সমস্ত বিপদ সেই স্থানেই বাধে। সতীহীন শঙ্কর যেমন ভীষণ রুদ্র—নারীহীন কর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান তদ্রূপ কেবলমাত্র কর্ম্মের মত্ততায়, উদ্দেশ-হীন প্রবল গতিপথে পরিসমাপ্ত হয়। আমাদের দেশে কি ইহার বহু বহু দৃষ্টান্ত পাঠক পাঠিকাগণ প্রত্যক্ষ করেন নাই?

আমাদের সমাজের আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইতেছে, রমণীগণকে শিক্ষিত ও সকল কর্ম্মে উপ-যুক্ত করানো। আমাদের নিজের শিক্ষা যদি এই কথা না শিখাইল, তবে আমরা স্কুল কলেজে কি শিক্ষা পাইলাম? শুধু কি তোতাপাখীর মত মুখস্থ করিয়া একজামিন্ পাশ করা? হায়, আমরা নিজেরা হ্যাটকোট পরিধান করিয়া সাহেব সাজিতেছি এবং মনে করিতেছি, কেন আমরা পাশ্চাত্য জাতির সহিত সমান অধিকার পাইব না? কিন্তু নিজের গৃহে স্ত্রী ও কন্যাগণকে নির্ব্বিবাদে অশিক্ষিত মূর্খ করিয়া রাখিতেছি। যাহাদের সহিত সমান হইতে চাই, আমরা কি তাহাদের সমস্ত গুণে গুণবান্ হইয়াছি? আমাদের গৃহে দৈন্য, সমাজে দৈন্য, জাতির মনে দৈন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তবুও আমরা চাই দৈন্যহীন স্বাধীন হইতে? আমরা যে চারিদিক দিয়া নিজেকেই অধীন করিয়া রাখিয়াছি। নিজের হাত নিজের চারি পাশে বন্ধনের পর বন্ধনের গ্রন্থি দিয়া যে পাশের সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা মুক্ত করিলাম না, কিন্তু আমরা অমনি বন্ধনহীন হইতে চাই? চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিছুতেই চোখ মেলিতেছি না, অথচ মনে করিতেছি, জগতে বুঝি উষার অস্তিত্ব নাই। এই মনে করিয়া কেবল নিজের উপর নিজে রাগ করিয়া ছটফট করিতেছি।

ভগবান আমাদের সমাজে, ব্যক্তিকে এই স্বরচিত বন্ধন হইতে মুক্তিদান করুন। ভারতবর্ষ যে বিষয়ে চিরদিন বিমুক্ত হইয়া আসিয়াছে, আজ সে অজ্ঞান অন্ধকারে কারারুদ্ধ। জ্ঞানের আলোকে, পবিত্রতার জ্যোতিতে ভারত আবার মুক্ত হউক। আমাদের দেশবাসী যেন তাহাকে মিথ্যা দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাকে ভুল না বুঝেন। ভারতবর্ষের মুক্তি বাহিরে নয় আত্মাতে। তাহার মুক্তি বন্ধনে নয়, বন্ধন-মোচনে।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

ভয়ের আক্ষেপ।

সাগর মাঝে যখন তরী
ভাসাতে হবে ভাই
অকূল পানে চেয়ে কেন
মিথ্যা ভয় পাই।
জানি ত আছে অনেক ঝড়
ঢেউয়ের মাতামাতি,
আঁধারে ঢাকা অনেক দিন
প্রলয় ঘন রাতি।
জীবন মনেই এমনি চলা
সবারি একই তর
নি—র মাঝে লভিতে হবে
নিজের নির্ভর।

তবুও জানি দুঃখ এলে
ফেলিব আঁখি জল
বিপদ এলে পালাতে হবে
না পেয়ে সম্বল!
পালাব কোথায়! টানিয়া মোরে
আনিবে মাঝে তার—
সাগরে মোরে ভাসিতে হবে
পাবনা কোন পার।
হায়রে ভীরু তবুও ভয়
সঙ্গে তোর কিরে?
শুকায় মুখ, হাসির রেখা
মিলায় আঁখি নীরে?

শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী।

নারীর কার্য্য।

মহিলা-শিল্প-বাজার।

নিত্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য নারীগণ যাহাতে নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া কিনিতে পারেন, তজ্জন্য ৮৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে এই মহিলা শিল্প-বাজার স্থাপিত হইয়াছে। এখানে নারীগণের হস্তের শিল্প দ্রব্যাদিও বিক্রয় হয়। সুপ্রভাতের পাঠিকাগণ ইতঃপুর্ব্বেই সুপ্রভাতে এই বাজারের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। মহিলা শিল্প-বাজারের সভ্যাদিগকে তাঁহাদের গৃহ হইতে আনিবার জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত হইয়াছে। অবরোধ-পীড়িত বাংলা দেশে নারীকে এক পয়সার জিনিসের জন্যও পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। গাড়ী পাল্কী ব্যতীত কোথাও যাইবার উপায় নাই। এই গুরুতর অভাব দূর করিবার জন্য মহিলা শিল্প বাজার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বাৎসরিক এক টাকা দিলেই ইহার সভ্য হওয়া যায়। সভ্যগণ কোন জিনিস ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে পূর্ব্বে লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাদের গৃহে গাড়ী পাঠান হয়। গাড়ীর মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দূরত্ব অনুসারে সভ্যাদিগের নিকট হইতে সামান্য মূল্য লওয়া হয়। কলিকাতা সহরের কতদূরে কত মূল্য লওয়া হয়, তাহা নিম্ন-লিখিত মানচিত্র হইতে অবগত হওয়া যাইবে।

ভাগলপুর মহিলা সমিতি।

১৯১১ সালে শ্রীমতী সরোজবালা দেবী কর্ত্তৃক এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। সমিতির উদ্দেশ্য শিল্প ও সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা নারীদিগের জ্ঞানোন্নতির চেষ্টা করা। এই সকল উপায়ে যতদূর সাধ্য এখান-কার মহিলাদিগের মধ্যে, শিল্প, সৎশিক্ষা, সৎকার্য্যে উৎসাহ, সৎ-আলোচনা বৃথা সময় নষ্ট না করা, এই সব ভাব তাঁহাদের মধ্যে আসে, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। ভগবানের বিশেষ কৃপায় এই সমিতি তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। সমিতির হিতৈষিণী মহিলাদিগের আন্তরিক চেষ্টা ও উৎসাহে আমাদিগের আশা হয় যে ভবিষ্যতে আমরা বিশেষ ফললাভ করিব।

মহিলারা নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়া অধিবেশনের দিন পাঠ করেন ও পঠিত প্রবন্ধের বিষয় আলোচনা করেন। কতকগুলি বালিকা ও রমণী নানারূপ বুনানি, ও কাট ছাঁট সেলাই প্রভৃতি শিক্ষা করিতেছেন। সমিতির কতকগুলি সভ্য আছেন, তাঁহারা অবস্থানুসারে চাঁদা দেন।

এই সমিতি হইতে সাধ্যমত দান প্রভৃতি সৎকার্য্য করা হয়। গত ভাদ্রমাসে বন্যা-প্রপীড়িত ব্যক্তি-

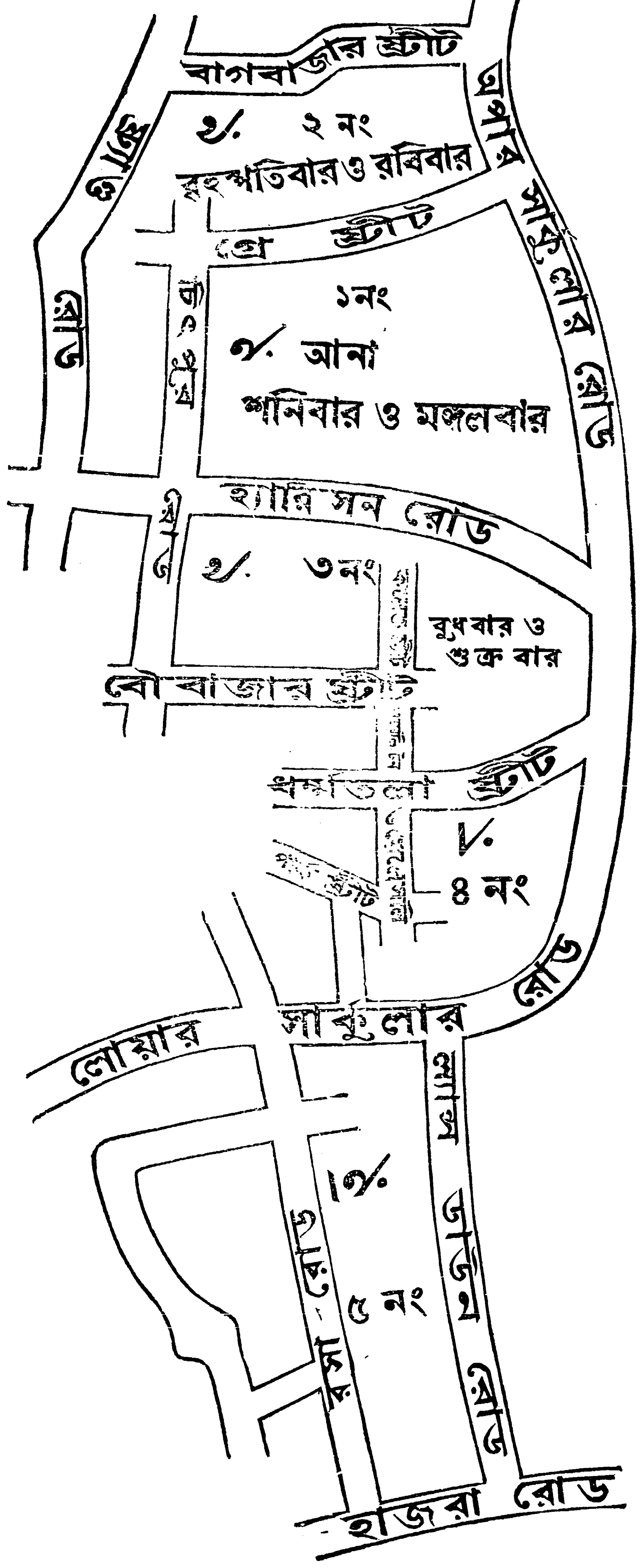

দিগের সাহায্যের জন্য মহিলাদিগের নিকট হইতে অতিরিক্ত চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠান হইয়াছিল। ৫টি ভদ্রঘরের অবস্থাহীন মহিলাকে মাসিক মাসহারা দেওয়া হয়। প্রয়োজন মত বিশেষ সাহায্যও করা হয়।

সম্পাদিকা,

শ্রীচারুহাসিনী দেবী।

মধু-প্রশস্তি।

শোকের দিনে মিলেছি আজ আমরা কটি ভক্ত তব ;
হেথায় তব কবর পাশে তোমার কথা কয়টি কব !
নয়নপাতে অশ্রু গলে,—বিষাদ মাখা বয়ান খানি ;—
বুকের মাঝে দারুণ ব্যথা,—অধর পুটে শোকের বাণী !

হৃদয়-তারে আঘাত লাগি' উঠেছে যে গো মুর্চ্ছনা,
হোক তা' রূঢ়, হোক তা' সরল, সে সুর বড় তুচ্ছ না !
মর্ম্ম হ'তে বাহির হ'য়ে উঠ্‌লো বেজে যে ঝঙ্কার,
শোনাব সুধু সে তান খানি,—নয়কো আমার অহঙ্কার !

নাইকো গানে আগমনীর সাগর-ছেঁচা সুধার তান ; —
বিসর্জ্জনের বাজনা এ যে, ভাসান দিনের করুণ গান !
ঝরে না এতে অমিয়াধারা, নয় এ বীণা হাজার-তার ;
আমার সাধের একতারাটি,—দেব-প্রসাদী ফুলের হার !

*   *   *   *

সোণার ভূমি বঙ্গদেশে সোণার ফসল ফল্‌তো গো ;
সোণার বরণ আকাশ হ'তে সোণার তুফান ঝরতো গো
সোণার বীণা সোণার সুরে বাজতো দিবা শর্ব্বরী ;
ঝঙ্কারিত মর্ম্ম মৃদু,—উঠতো হিয়া মর্ম্মরি' !

বিক্রমেরি সভার মত বঙ্গ রাণীর রত্নসভা ;—
কেউ বা মাণিক, কেউ বা হীরা, কেউ জহরৎ হৃদয়লোভা
কেউ বা বাণীর কণ্ঠমালা, কেউ বা ছিল কাণের দুল ;
কেউ বা ছিল পায়ের নূপুর, কেউ বা ছিল মাথার ফুল !

কাহারো ছিল মধুর ধ্বনি,—কাহারো ছিল জলদ-নাদ ;
হুঙ্কারে কার স্তব্ধ সমাজ,—কারো বচন আশীর্ব্বাদ ;
কেউ বা ছিল রাজার রাজা, কেউ বা ছিল সমাজপতি ;
অঙ্কে কারো লক্ষ্মী শোভে, কণ্ঠে কারো সরস্বতী !

"বঙ্কিম" সে বঙ্গ বাণীর কণ্ঠে পরায় হীরার হার ;
ভাষার ইন্দ্রজালিক যে সে,—বিদ্রূপে তার ছুরীর ধার !
সমাজ প্রেতের মূর্ত্তি দেখায় "দীন" ভাষার দর্পণে ;
"ভূদেব" করে দেশের গতি শাস্ত্র জ্ঞানের অর্পণে !

এমন দিনে, এমন সভায় তুমি গো ছিলে রত্নবর ;
বাণীর বরপুত্র তুমি,—ছিল না কেহ শ্রেষ্ঠতর ;
কবির মণি-সিংহাসনে থাক্‌তে বসে রাজার মত ;
মায়াপুরীর অপ্সরীরা তোমার সেবা করতো কত !

ছন্দ রাণীর নিগড়খানি ভাঙ্‌লে তুমি অসীম জোরে ;
ভাবের রাশি বিষম বাঁধা থাক্‌বে না আর মিলের ডোরে !
বন্ধনেরি বিরুদ্ধেতে তুল্‌লে মহা বিদ্রোহ ;—
স্তব্ধ হোল প্রাজ্ঞসমাজ সাহস দেখি' দুঃসহ !

বিদেশ হ'তে আন্‌লে 'সনেট,'—চৌদ্দপদী যাহার নাম,—
সাজিয়ে তারে ভাষার হারে কর্‌লে তারে চিত্তারাম !
উপমা-ফুলে সাজালে ভাষা,—সুরভি কত ফুলের দলে,
বাণীর পূজা কর্‌লে, কবি, আকাশ-ভেদি শঙ্খরোলে !

ইংরাজীতে লায়েক যারা, দেশের যারা শক্রদল ;—
তাদের তুমি দেখায়েছিলে বঙ্গভাষাচর্চ্চা ফল !
হইতো পূজা বঙ্গবাণীর সুরভি ফুল চন্দনে ;
কর্‌লে তুমি নূতন পূজা রক্ত-শোণিত-তর্পণে !

সুরের খেলা, গানের মেলা,—আঁখির পাতে ঝর্‌তো জল ;
কখনো হাসি উঠ্‌তো ফুটি,'—নয়ন দুটী সমুজ্জ্বল !
কখনো হিয়া কাঁপ্‌তো ঘন,—উঠ্‌তো ফেঁপে রুদ্ধ ক্রোধ ;
কখনো ঘৃণা, লজ্জা কভু,—উদ্বেগেতে হৃদয় রোধ !

ভাষায় কভু ডাক্‌তো দেয়া,—গর্জ্জাতো গো নীলাম্বর ;
কখনো হ'ত করুণতম, বইতো যেন সুনির্ঝর !
দৈত্যবালা যুদ্ধ ঘোষে,—চিতায় তারি স্বয়ম্বর ;
রাবণ কাঁদে পুত্রশোকে,—পাগল হোল ক্ষত্রবর !

ব্রজাঙ্গনার দুঃখ দেখি' ঝর্‌তো মধু-প্রস্রবণ ;
বীরাঙ্গনার পত্র পড়ি' রুধ্‌তে নারি দুনয়ন !
সুরের যাদু জান্‌তে তুমি, খুলে দিতে হিয়ার বাঁধ !
পড়্‌তো ঝরি' নয়নধারা ; উঠ্‌তো ভিজে আঁখির পাত !

সরল ছিল চিত্ত তব, দুঃখ দেখি' কাঁদ্‌তো প্রাণ ;
জীবন' পরে উদাস ছিলে,—ক্ষ্যাপার মত গাইতে গান !
তোমার দুখ দেখ্‌লো না কেউ, হা অভাগ্য বাংলাদেশ ;
দারিদ্র্যেরি আগুণ তাতে জ্বলে পুড়ে হইলে শেষ !

বঙ্গবাণীর আপন হয়ে পরের মত কর্‌তে বাস ;
চিনেও কেহ চিন্‌লো না গো, এদেশের আর নাইকো আশ !
হাঁসপাতালে কবির মরণ এমন কথা শুনেছে কে ?
হাস্‌বে জগৎ চিরটা কাল, বাড়িয়ে আঙুল মোদের দিকে !

*   *   *   *

বঙ্গবাণীর অর্চ্চনা আর হয় না, কবি, শঙ্খরোলে ;
ক্ষুদ্র বাঁশীর সুরটী বাজে, তাতে কি আর পরাণ ভোলে ?
প্রেমের গানে বাংলা ডোবে, দেশের তো আর রক্ষা নাই !
প্রাণ-মাতানো সে তান কোথা, এখন মোরা তাই যে চাই !

আঁখির কোলে অশ্রু আসে, তোমার কথা যখন ভাবি !
বুকের মাঝে দারুণ ব্যথা,—কে দেয় যেন পাষাণ চাপি'।
দুঃখশোকে পিষ্ট করি শান্তি-শয়ান মহীর কোলে ;
নয়ন তবু যায় না বাঁধা, বিষাদভরে হৃদয় দোলে। *

শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল।

* কবিবর মধুসূদন দত্তের একচত্বারিংশত্তম মৃত্যু দিন উপলক্ষে পঠিত।

Presented to the K-P.L.
By Shama Prasad Ghosh

সুপ্রভাত

"প্রীতি অধ্যাত্ম যোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্য্যের
জীবন, প্রীতি ধর্ম্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।"

৭ম বর্ষ। { আষাঢ়, ১৩২১। } ১২শ সংখ্যা।

প্রেমের ধর্ম্ম

আমরা ধর্ম্মলাভ ঈশ্বরলাভের জন্য মধ্যে মধ্যে এই ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হই। শুদ্ধ এই সমাজ বলি কেন, যেখানে ঈশ্বরের মহিমা বিঘোষিত হয়, যেখানে নিত্য নিয়মে ভগবৎতত্ত্বের আলোচনা হয়, তাহাই পুণ্যক্ষেত্র ; ভাবপরম্পরাজনিত তাহার একটি বিশেষত্ব আছে। সেখানকার পবিত্র বায়ু সমাগত সাধুসজ্জনের অন্তরে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করে। ষাট বৎসর অতীত হইতে চলিল, প্রতি সপ্তাহে ঈশ্বরের নামে এখানে আমরা মিলিত হইয়াছি। যাঁহারা ইহার প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা একে একে সকলেই বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন শুভ ইচ্ছা—পবিত্র কামনা। যাঁহারা দ্বারে দ্বারে গিয়া অর্থভিক্ষা করিয়া ইষ্টকের উপর ইষ্টক স্থাপন করিয়া এই পবিত্র উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সকলকে সাদরে আহ্বান করিয়া একেশ্বরবাদের মঙ্গল বারতা শ্রবণ করাইলেন, তাঁহারা আজ নির্ব্বাক—মৃত্যুর করালগ্রাসে নিপতিত। কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহাদের সংগঠিত এই দেবমন্দির নির্ব্বাক নহে। এই মন্দিরের প্রতি প্রমুক্ত প্রবেশ দ্বার আজ সকলের নিকট করুণ বেদনা জানাইতেছে, ব্যাকুলতা সহকারে সকলকে আহ্বান করিতেছে, সকলেরই অন্তরে নবজাগরণ নবচেতনার সঞ্চার করিতেছে।

আমরা ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াই। অনেক সময়ে ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করি না। যাহা ধরিয়া থাকে, তাহাই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। এই যে পরিদৃশ্যমান সৌরজগৎ, এত অযুত অগণ্য গ্রহতারা, কে তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে, কেই বা তাহাদিগকে কক্ষপথে বিঘূর্ণিত করিতেছে। কোন্ রজ্জুদ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়া তাহারা অবস্থান করিতেছে। উত্তরে বলিতে হইবে, আকর্ষণ! সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে জড়জগতের বা

সৌরজগতের ধর্ম্ম আকর্ষণ। উদ্ভিদ্‌জগতের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শাখা প্রশাখা প্রসারিত করিয়া বৃক্ষরাজি মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। ভূপৃষ্ঠ তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিয়াছে। রস দানে বৃক্ষকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষ ছায়া দান করিয়া মৃত্তিকাকে সরস করিয়া রাখিয়াছে। উহাকে নীরস বা মরুময় হইতে দিতেছ না। পরস্পরের মধ্যে কেমন একটি আশ্রয় আশ্রিতের সম্বন্ধ বিরাজমান, উহাই তাহাদের ধর্ম্ম। জীবজগতের মধ্যে একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, পক্ষীমিথুন একত্রে বিহার করিতেছে, অন্যান্য জীবজন্তু তাহাদের শাবকগণকে কেমন স্নেহের সহিত লালন পালন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অপত্যস্নেহের কেমন সুন্দর বিকাশ। তাহারা সংস্কার বশে আহার বিহার লইয়া এখানে অবস্থান করিতেছে, একভাবে উহাই তাহাদের ধর্ম্ম।

মনুষ্যের দিকে একবার চাহিয়া দেখ। আমরা এখানে পরিবারবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছি। স্ত্রীপুত্রকন্যায় পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি। কে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। উত্তরে বলিতে হইবে প্রেম, উহা আকর্ষণের নামান্তর মাত্র। প্রেম সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আমার প্রেমে পরিবার গঠিত হয় না বা উহার শৃঙ্খলা রক্ষা পায় না। আমি যেমন প্রেম দান করিতেছি, তাহার বিনিময়ে সন্তানসন্ততি যদি আমাকেও সেই ভাবে ভক্তিকৃতজ্ঞতার ডোরে বাঁধিতে পারে, তবেই এই ক্ষুদ্র পরিবার তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু এই প্রেমের ধারা যখন পিতামাতার হৃদয় হইতে বিনির্গত হইয়া সন্তানসন্ততিকে স্পর্শ করে এবং অন্য দিকে পুত্র কন্যা সেই অযাচিত করুণা লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার ডোরে পিতামাতাকে বন্ধন করিতে শিথিলপ্রযত্ন হয় এবং উন্মার্গগামী হইয়া উঠে, তখনই তাহারা উচ্ছিন্ন দশা প্রাপ্ত হয়, পরিবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। উহা যতক্ষণ সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পরিভ্রমণ করে, ততক্ষণ তাহার ভয় নাই। যে মুহূর্ত্তে সূর্য্যের বা অন্য কোন গ্রহের আকর্ষণ হারাইয়া ফেলে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সে সকল শক্তি হারাইয়া এই ধরাপৃষ্ঠে বা অন্য কোন গ্রহ উপগ্রহের উপরে আসিয়া সবেগে নিপতিত হয়।

অন্যান্য জীবের মধ্যে প্রেমের আদান প্রদান সেরূপ পরিস্ফুট নহে, যেরূপ মনুষ্যের মধ্যে। যে প্রেম লইয়া আমাদের এই পরিবার পত্তন, আমাদের সেই ক্ষুদ্র প্রেম কেবলমাত্র এই ক্ষুদ্র সংসারের ভিতরে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। সে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইতে চায়। সেই উচ্ছ্বসিত প্রেম আমরা কয়েকটি ক্ষুদ্র পরিবার লইয়া সমাজ গঠন করি। একটি পরিবারের প্রেম আর একটি পরিবারের প্রেমের সহিত মিলিত হইতে চায়। এইরূপ কতকগুলি পরিবারের প্রেমের আদান প্রদানে সমাজ গঠিত হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এই প্রেমেরই বিকাশে ও যুগপৎ মিলনে স্বজাতি ও স্বদেশের অস্তিত্ব সম্ভবপর হইয়া উঠে। প্রেমেই সকলের উৎপত্তি এবং এই প্রেমেই সকলের স্থিতি। আবার এই প্রেম বিশ্বমানবের দিকে ছুটিয়া যাইতে চায় এবং বিশ্বপরিবারের সৃষ্টি করে। কোথায় ভারতে দুর্ভিক্ষ হইতেছে, আমেরিকার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কোথায় তুরস্ক-ইটালীর মহাসমরে ক্ষত বিক্ষত সৈনিকবর্গের সংখ্যা বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, ইউরোপের অসংখ্য নরনারী তাহাদিগের সেবার জন্য, পিতার স্নেহ, বন্ধুর প্রীতি, মাতার করুণা লইয়া সেখানে ব্যাকুলভাবে উপস্থিত হইলেন। প্রেম সত্য সত্যই বিশ্বব্যাপী, উহাই তাহার প্রকৃতি। সকল প্রকার স্বার্থত্যাগে, আত্মপ্রসারণে এবং পরার্থপরতায় এই প্রেমের পরিসমাপ্তি। এই প্রেমই মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দান করে। এই প্রেমই তাহাকে দেবতা করিয়া তোলে। এই প্রেমই মনুষ্যের ধর্ম্ম। এই প্রেমের অনুশীলনই তাহাকে সর্ব্বপ্রকার সার্থকতা দান করে। এই প্রেমের বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন-ভাবের নাম মৃত্যু।

সেই অনাদি আদিম যুগের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে অসভ্য মনুষ্যেরা মৃগয়া দ্বারা

দিনপাত করিতেছে। বিবাহাদি নিয়ম-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। অন্যান্য জীবজন্তুর সহিত মনুষ্যের কোন পার্থক্য নাই। ক্রমে প্রেম আসিয়া দেখা দিল। প্রেম অঙ্কুরিত হইল। বিবাহ-প্রণালী প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিল। এই প্রেমই নর নারীকে পরিবারবদ্ধ হইয়া থাকিবার আদেশ দিল। মনুষ্য প্রেমের এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এই প্রেমের বিকাশের সঙ্গে পরিবার গঠিত হইল, কালক্রমে সমাজ স্থাপিত হইল। অবসর পাইয়া মনুষ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের অবকাশ লাভ করিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইল। ধর্ম্ম বিকশিত হইতে আরম্ভ করিল। মনুষ্য স্বদেশ স্বজাতি বলিয়া আপনার দেশকে আপনার প্রতিবাসীবর্গকে চিনিয়া লইতে আরম্ভ করিল। প্রেমদানে এবং প্রেম লাভে মানুষ দিন দিন আত্ম-পুষ্টিলাভ করিতে আরম্ভ করিল।

মানুষ যখন কোন সত্য লাভ করে, তখন সে একাকী তাহা সম্ভোগ করিয়া আত্মতৃপ্ত হইয়া থাকিতে পারে না। জনসাধারণের মধ্যে সেই সত্য পরিবেষন জন্য প্রেম তাহাকে আদেশ করে। মানুষ যখনই ঈশ্বরের প্রেমের পরিচয় পায়, তখনই তাহা প্রচার করিতে আরম্ভ করে। প্রেম যেমন একদিকে বিশ্বব্যাপী, তেমনি আর একদিকে তাহার প্রসার ঈশ্বরের চরণতল পর্য্যন্ত। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার অতুলা প্রেম দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন, আমরা যখন আমাদের প্রীতিকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাকে আমাদের ক্ষুদ্র প্রেম দিয়া ধরিতে যাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা যখন তাঁহার করুণাকে স্পর্শ করিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হয়।

উপনিষদের ঋষিরা ঈশ্বরের প্রেমের সন্ধান পাইলেন এবং সমগ্র মানবজাতির সহিত নিজেদের প্রেমের বন্ধন উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন "ওঁ পিতা নোঽসি," "তুমি আমাদের পিতা" আমরা সকলে তোমার সন্তান। একদিকে ঈশ্বরের পিতৃত্ব বোধ, আর এক দিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের সহিত ভ্রাতৃত্ব বোধ। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেম উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রেমে আত্মহারা হইয়া বলিয়া গিয়াছেন, "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যৎ অয়ম্ আত্মা" এই যে পরমাত্মা তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর সকল হইতে তিনি প্রিয়তর। তাঁহারা প্রেমের ধর্ম্ম সাধনা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেবও প্রেমের সাধক, প্রেমের উপাসক। তিনি আপনার প্রেমে ক্ষুদ্র কীট কীটাণু সমগ্র জীবজন্তুকে বাঁধিয়া তুলিলেন। তাঁহার উচ্ছ্বসিত প্রেম ইতর জীবজন্তুর উপরে প্রসারিত হইয়া পড়িল। গৌরাঙ্গদেব প্রেমের সাধনায় বিপুল সিদ্ধিলাভ করিয়া কত লোককে উদ্ধার করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রেমের তরঙ্গ কত পাপী কত তাপীকে আকুল করিয়া তুলিয়া আনন্দধামের পবিত্র উপকূলে পৌঁছাইয়া দিল। খৃষ্টই বল, আর মহম্মদই বল, সকলেই প্রেমের সাধক। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেমের বার্ত্তা জগৎময় প্রচার করিয়া চলিয়া গেলেন।

উপনিষদের ঋষিরা যখন হৃদয়ের এই প্রেম লইয়া সত্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত সাধক কত ভক্ত তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কৃতজ্ঞতার বিমল উপহার তাঁহাদের চরণে অর্পণ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সত্য গ্রহণ করিয়া জীবনে তাহা পরিণত করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইলেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের সম্বন্ধেও ঠিক সেই একই কথা। গৌরাঙ্গদেব যখন প্রেমে মাতোয়ারা, কত শিষ্য-সেবক তাঁহার চরণ-প্রান্তে বসিয়া তাঁহার বিতরিত প্রেমসুধা হৃদয় ভরিয়া পান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই যে আনুগত্যস্বীকার, ইহাই গৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম-বিস্তারের মর্ম্ম-কথা। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, বেদ বেদান্তের কীট-নিষ্কুষিত পুঁথি হইতে যে সত্যের সন্ধান দিলেন, আমরা যদি কৃতজ্ঞতাভরে তেমনই আন্তরিকতার সহিত তাঁহার প্রদর্শিত সত্য গ্রহণ করিতে পারিতাম, আমাদের ব্রাহ্মসমাজ অন্যরূপ শ্রী ধারণ করিত। আমরা জ্ঞানে

যাহা পাইতেছি, সাধনায় নিজ জীবনে যদি তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তবেই আমরা জয়যুক্ত হইতে পারিব।

প্রেমই সকল ধর্ম্মের মূলমন্ত্র। প্রেমের উপরেই সকল ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। এই প্রেম আবার পবিত্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। পতিপত্নীর মধ্যে যে প্রেম, পবিত্রতা ও একনিষ্ঠা তাহার মূলে। যেখানে ব্যভিচার, প্রেম সেখানে তিষ্ঠিতে পারে না। প্রেম যে ধর্ম্মের অস্থিমজ্জা, তাহাই মানবজাতির প্রকৃত ধর্ম্ম। যখনই এই প্রেমের ভাব অন্তর্দ্ধান করে, তখনই ধর্ম্মের নামে নরহত্যা, রক্তপাত ধর্ম্মের নামান্তর হইয়া দাঁড়ায়। প্রেম সকলকে আকৃষ্ট করে। অকারণ নিন্দাবাদ ও অপ্রেম অশান্তি বিস্তার করে। আপনার জীবনের সৌগন্ধে সকলকে আকর্ষণ করিতে হইবে। প্রেমভরে সকলকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। কোন ভ্রাতাই আমাদের পরিত্যাজ্য নহেন। আমরা যে ঈশ্বরের সন্তান, প্রেমের ডোরে সকলেই যে আবদ্ধ। আমরা কাহাকেও উপেক্ষা করিতে বা ছাড়িয়া যাইতে পারি না। কর্ত্তব্য রাশি রাশি আমাদের সম্মুখে, পথ অতি বন্ধুর। আমাদের শক্তি ক্ষীণাৎ ক্ষীণতর। অসত্যের উপর প্রেম প্রতিষ্ঠিত নহে। সত্যের সঙ্গে প্রেমের চির সম্বন্ধ; এ কথা স্মরণে রাখিয়া ধীরে ধীরে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। পর্ব্বত সমান বাধা অতিক্রম করিতে হইবে। কত দায়ীত্ব আমাদিগকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সমবেত চেষ্টা চাই। সম্মুখে প্রকাণ্ড রথ; তাহাকে টানিয়া লইবার জন্য যেমন বালক বৃদ্ধ যুবা, ক্ষীণা রমণী সকলে সমান ভাবে হস্ত প্রসারণ করে, নিজের দুর্ব্বলতা বা সবলতার দিকে একবারও চাহিয়া দেখে না, এবং কেহ কাহাকেও নিরস্ত করে না, সেইরূপ সকলকে মর্য্যাদা দান করিয়া সকলের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া সকল প্রকার বিচ্ছেদ বিস্মৃত হইয়া জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে ধর্ম্মজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সচেষ্ট হও, যে, ঈশ্বরের অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া সফলকাম হইবে। স্মরণে রাখিও স্বদেশ ও স্বজাতির সহিত প্রেমের অচ্ছেদ্য-যোগে তুমি আবদ্ধ। অতীতের সহিতও তোমার প্রেমের বন্ধন রহিয়াছে। প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর প্রেম দিয়া যেমন আমাদিগের সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন, আমাদের ক্ষুদ্র প্রেম দিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া সাধন করিতে হইবে। স্বদেশ ও স্বজাতিকে এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীকে প্রেম দিয়া ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে এবং সত্যকে ও পবিত্রতাকে সহচর করিয়া লইয়া সকলকে লইয়া সমুন্নত হইতে হইবে, প্রেমকে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। স সেতুর্বিধৃতি রেষাং লোকানাম্ অসন্তেদায়, লোক ভঙ্গ নিবারণার্থ তিনি সকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন। তিনি সম্পদে বিপদে রোগে শোকে আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ আশ্রয় দান করিতেছেন। সেই পরমমাতার প্রেম অঞ্চলের মধ্যে আমরা যে নিয়তকাল অবস্থান করিতেছি তাহা জানিয়া আপনার শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি-কৃতজ্ঞতাকে জাগ্রত উদ্বোধিত করিয়া সকল অবস্থায় তাঁহাকে হৃদয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার জন্য সচেষ্ট হও। তিনি ও আমি আমাদের পরস্পরে মধ্যে যে প্রেমের বন্ধন; তিনি যে আমাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, আমি যে তাঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছি; সকলের সঙ্গে যে আমার সম্বন্ধ, আমাদের জীবন যখন তারস্বরে তাহার সাক্ষ্য দান করিতে পারিবে তখনই আমরা প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব। তখনই ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম আমাদের হৃদ্গত হইবে। আমরা যেন ধর্ম্মের এই প্রকৃত তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে সচেষ্ট হই, ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।

আধুনিক উচ্চশিক্ষা ও প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা

(রাজনীতি)

মহিলাদিগকে যে সুশিক্ষা দেওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আজি আর নাই। মুসলমান রাজশাসনের ফলে আমাদের কুসংস্কার চরমে উঠিয়াছিল; তাই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন-কালে উহার বিরুদ্ধে কত কথাই না উঠিয়াছিল! মহামতি বীটন সাহেবের নামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে কে প্রথমে বালিকা প্রেরণ করিবেন,—তাহা এক কঠিন সামাজিক সমস্যারূপে প্রতিভাত হইয়াছিল! সেকালের সামাজিকগণ প্রাচীন ভারতের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়াছিলেন, বুঝিবা সে আদর্শ বিস্মৃতও হইয়াছিলেন! মহিলাগণ যে প্রত্যেক বিদ্যায় সম্পূর্ণ অধিকারী, তাঁহারা যে উপনীত হইয়া রীতিমত বেদাধ্যয়ন করিতেন,—সকল প্রকার পরা এবং অপরা বিদ্যায় বিমণ্ডিত হইয়া সমাজকে সুখময় স্বর্গে পরিণত করিতেন,—নারী যে বেদমন্ত্রের দ্রষ্ট্রী হইয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইতেন, —তিনি যে প্রকাশ্য সভায় ভারত-বিখ্যাত মহর্ষি প্রবরকেও ব্রহ্মবিদ্যা-বিচারে পরাস্ত করিতেন,—সে সকল কথাই বিস্মৃতি-সলিলে ডুবিয়া গিয়াছিল! প্রাচীন কালে এই কর্ম্মভূমি ভারতে কি ব্রহ্মবিদ্যা, কি জ্যোতির্বিদ্যা, কি যুদ্ধবিদ্যা রাজনীতি বিদ্যা কোন বিদ্যাতেই ভারত-মহিলা বঞ্চিত কি বিমুখ ছিলেন না। সুখের বিষয় এখন, অনেক দেশভক্ত সাহিত্যিকের কৃপায় সেই সকল পুরাতন কথা জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষাণীয়াতি যত্নতঃ" মহানির্ব্বাণের এই মহাবাক্য শিরে ধরিয়া "বামাবোধিনী" আজি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল স্ত্রীশিক্ষার জয় ঘোষণা করিতেছেন। স্ত্রীশিক্ষা যে নিতান্ত আবশ্যক, অধুনা ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে।

কিন্তু এখনও সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয় নাই। এই স্ত্রীশিক্ষা কিরূপ আদর্শে এদেশে প্রচলিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে এখনও আলোচনা চলিতেছে। আমাদের বালকবৃন্দ যেরূপ উচ্চশিক্ষা পাইতেছেন, বালিকাদিগকে ও কি সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, অথবা তাঁহারা কেবলমাত্র যৎসামান্য "লেখাপড়া," ধোপা নাপিত গোয়ালার হিসাব রাখা, এবং গৃহস্থালীর কার্য্য শিখিবেন? কিছুদিন হয় হয় কোন সংবাদ পত্রে এ সম্বন্ধে একটী প্যারাগ্রাফ বাহির হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবের পরিগ্রহণকালে মান্যবর শ্রীযুক্ত রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এই সংবাদ পত্র সেই বক্তৃতার মর্ম্ম-প্রকাশস্থলে বলিয়াছেন "তিনি (রায় বাহাদুর) বলেন,'বালিকাগণ উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, ইহা হিন্দু-সমাজের প্রকৃত নায়কগণের ও বালিকাগণের অভিভাবকগণের অভিপ্রেত নহে; কারণ হিন্দু বালিকাগণ হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থানুসারে ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সুশিক্ষা লাভ করিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণা পত্নী ও সুগৃহিণী হয় ইহাই সামাজিকদিগের অভিপ্রেত।"

ইহার পর সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে। সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন যে "শিক্ষার প্রভাবে নারী মাতৃত্বের মহিমা বিস্মৃত হইয়া রাজনীতির উপাসক হন, পুণ্যময় গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মকঠোর সংসারে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে উদ্যত হন, হিন্দুগণ কখনই সেরূপ স্ত্রীশিক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। নারীগণ সুশিক্ষা লাভ করিয়া গৃহে গৃহে দেবীরূপে লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করুন, কুলের কল্যাণ

সাধন করিয়া সেবাধর্ম্ম ও ত্যাগধর্ম্মের আচরণ করুন, ইহা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু মাত্রেরই কামনা।"

মান্যবর রায় বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য, সুতরাং তাঁহার কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করা উচিত। তথাপি, আমরা সত্যানুরোধে বলিতে বাধ্য যে তাঁহার কথাগুলি বেশ চিন্তা করিয়া যেন বলা হয় নাই। হিন্দু সমাজের নায়কগণের ও বালিকাদিগের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তিনি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নাই। তিনি বলিয়াছেন যে হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থানুসারে ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিলে বালিকাগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থা কোনও শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা কি না তাহা তিনি বলেন নাই। সম্ভবতঃ ইহা প্রচলিত দেশাচার। এই দেশাচার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, তাহা অনেকেই জানেন এবং ইহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না ;—বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের যুগে এই আচারও ত্বরিত বেগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিছু দিন পরে যে হিন্দু বালিকাগণ আরও দুই এক বৎসর বিদ্যালয়ে থাকিতে পারিবেন না তাহা কে বলিল ?—সুতরাং তাঁহার কথিত এই সমাজ ব্যবস্থার উপর নিতান্ত নির্ভর করা যায় না, এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ কালের স্ত্রীশিক্ষাকে নিয়মিত করিতে যাওয়াও বোধ হয় সুসঙ্গত নহে। আর তিনি বালিকাগণকে "হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সুশিক্ষা লাভ করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী ও সুগৃহিনী" দেখিতে চাহেন। আমরা যতদূর হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি যে আর্য্য সাহিত্যের সমস্ত বিষয়ই, অথবা আর্য্যদিগের সকল বিদ্যাই নারীদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া গণিত, জ্যোতিষ, নৃত্যগীত, কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা ও পাক-প্রণালী প্রভৃতি অর্থাৎ বেদ, উপবেদ এবং চতুঃষষ্ঠি কলা বিদ্যা সমস্তই মহিলাদিগের শিক্ষণীয়। আবশ্যক হইলে শাস্ত্রের অধ্যায় এবং শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমাদের উক্তি সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি। হিন্দু শাস্ত্রের বিশ্বাস, নারী সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইলেই তবে "কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী" এবং "সুগৃহিণী" হইতে পারেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে রায় বাহাদুরের এরূপ প্রতিকূল মত কেন ? প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে শিক্ষণীয় সকল বিষয়েই শিক্ষাদান কার্য্য নির্ব্বাহ হইত,—আর অধুনা রাজভাষা দ্বারা সেই কার্য্য হইতেছে,—এই মাত্র বিশেষ। যদি মাননীয় রায় বাহাদুর মাতৃভাষার সাহায্যে মহিলাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার পক্ষপাতী হইতেন,—তাহা হইলে সানন্দে আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতাম। তথাপি আধুনিক যুগে রাজভাষাকে কদাপি পরিত্যাগ করা যায় না। জাপানাদি সভ্যদেশে ইংরাজী ভাষার যেরূপ আদর—তাহাতে কি বুঝায় ? ইংরাজী ভাষার সাহায্যে একজন লোক অনায়াসে পৃথিবীর সমস্ত দেশের আচার, ব্যবহার, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের—এক কথায় সভ্যতার, সহিত পরিচিত হইতে পারেন। আর আমাদের পক্ষে ইংরাজী ভাষা যে নিতান্তই আবশ্যক, তাহা কি রায় বাহাদুর অস্বীকার করিতে পারেন ?

উপরোক্ত সংবাদ পত্রের মন্তব্যের উপর কোন কথা বলিতে চাই না সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা নির্ব্বাক্ থাকিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা এই মাত্র বুঝি যে নর অথবা নারী,—উভয়ের পক্ষেই বিদ্যা তুল্যরূপে আবশ্যক পদার্থ। বাল্যে কৈশোরে ও যৌবনের প্রারম্ভে বিদ্যা সঞ্চয় না করিলে কেহই জীবন সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। পর-জীবনে যে কোন কার্য্যই কেন করিতে হউক না, শিক্ষা তাহার পক্ষে অবশ্যই সাহায্য করিবে। উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত দুই চারিজন মহিলাকে দেখিবার এবং তাঁহাদের চরিত্র অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে। তাঁহাদিগকে প্রকৃত পক্ষেই "কর্ত্তব্য পরায়ণা পত্নী ও সুগৃহিণী" দেখিয়াছি। অশিক্ষিতা মহিলা ও "কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী ও সুগৃহিণী" হন,—কিন্তু উভয়ের তুলনা করিলে যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়,—তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। নারী উচ্চশিক্ষা পাইলে ...টার্যিনী বিবিদের অনুকরণ করিবেন বলিয়া ...হারা আশঙ্কিত হইতেছেন,—তাঁহারা বালক-...গের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া দেন না কেন ? বালক-...গও তো উচ্চশিক্ষা পাইয়া বিলাতের রাজনীতি ...পুণ সাহেবদিগের অনুকরণ করিতেছেন,—Agita-...ion বা আন্দোলন করিয়া দেশ মাথায় করিতে-...ছেন। রায় বাহাদুরের মত বিবেচক ব্যক্তি ...ই কার্য্য কারণের এরূপ অদ্ভুত ধারা আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইবেন না। বিলাতের নারীগণ ভোট প্রার্থনা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে ...ষই বা কেন দেন ? আইরিশদিগের হোমরুল প্রার্থনা এবং ভারতবাসীদিগের স্বায়ত্ত শাসন প্রার্থনা ...দি অপরাধজনক কার্য্য না হয়,—তাহা হইলে ইউ-রোপীয় রমণীদের ভোটের প্রার্থনাই বা পাপজনক কেন হইবে ? পাছে আমাদের কুলমহিলাগণ রাজ-নীতির উপাসক হন, বিজ্ঞ-সম্পাদক সেই ভাবনায় ...স্থির হইয়াছেন,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—রাজ-নীতি কি "হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সুশিক্ষার" অন্তর্ভুক্ত ...হে ? আমরা অদ্যকার প্রাচীন যুগের একটি আদর্শ মহিলার, প্রকৃতরূপে "হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত ...শিক্ষায়" সুশিক্ষিতা নারী-রত্নের জীবনের কিঞ্চিৎ ...হিনী পাঠক-পাঠিকাবর্গের নিকটে উপস্থিত করিতেছি।

পূর্ব্বে এই "সুপ্রভাতে" আমরা রাজ্ঞী মদালসার ...খ্যানের প্রথমাংশ বিবৃত করিয়াছিলাম,—জানি না ...হা পাঠকগণের স্মরণে আছে কি না। যাহাই ...উক,—এই মদালসা ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত ...াট্ শত্রুজিতের পুত্রবধূ এবং সম্রাট্ ঋতধ্বজ ...বলয়াশ্বের মহিষী। তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় দিবার নিমিত্ত আমরা ইচ্ছা করিতেছি। সেই নারীরত্নের চরিত্র নানাগুণে, নানা বিদ্যায় একান্ত অলঙ্কৃত। অন্য কথা না তুলিয়া ...দ্য আমরা তাঁহার রাজনীতি-জ্ঞানেরই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ককে রাজনীতি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন,—তাহাই আমাদের অবলম্বন।

রাজ্ঞী মদালসা বলিলেন—"বৎস, রাজপদে অভি-ষিক্ত হইয়া রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কি ?—রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, প্রজারঞ্জন। কিন্তু অন্ধ ভাবে প্রজার সন্তোষ সাধন রাজার কর্ত্তব্য নহে,—পরন্তু নিজ ধর্ম্ম এবং প্রজার ধর্ম্ম যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে,—তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া প্রজার সন্তোষ সাধনই রাজার প্রথম কর্ত্তব্য। মৃগয়াতে অত্যানুরক্তি, পণ রাখিয়া পাশা ক্রীড়া, কর্ত্তব্য কাজ ফেলিয়া রাখিয়া দিবানিদ্রা, পরস্ত্রীতে অনুরাগ প্রভৃতিকে ব্যসন বলে,—যে রাজা এই সকল ব্যসনের ফাঁশে বাঁধা পড়েন, তাঁহার রাজ্যের মূল নষ্ট হইয়া যায়। আর যাঁহার রাজ্য-রক্ষার মন্ত্রণাগুলি কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া না যায়, তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হওয়াও রাজার নিতান্ত কর্ত্তব্য। দ্রুতবেগে ধাবিত সুন্দর চক্রবিশিষ্ট রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলে আরোহী যেমন শরীরের নানাস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হন,—তদ্রূপ মন্ত্রণা বাহির হইয়া গেলে রাজাও বিপদ্‌গ্রস্ত হন। শত্রুবর্গ উৎকোচাদি দ্বারা নিজ অমাত্যাদি কর্ম্মচারিদিগকে লুব্ধ বা বশীভূত করিতেছে কি না, অতি যত্নে, অতি গোপনে তাহা জানিতে হইবে। বিশ্বাসী চরদ্বারা অরাতিদিগের চরের গতিবিধির সংবাদ লইতে হইবে। রাজা সময়ের দাস,—তিনি সময় বুঝিয়া লোককে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিবেন। এমন সময় আসিতে পারে যখন শত্রুকেও বিশ্বাস করিতে হইবে,—আবার তিনি নিতান্ত আত্মীয় বন্ধুকেও অতিমাত্র বিশ্বাস করিবেন না। কাম রাজার বিশেষ শত্রু,—তিনি কদাপি তাহার বশীভূত হইবেন না। স্থান, কাল, পাত্র, বৃদ্ধি, ক্ষয়, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন ইত্যাদি বিষয় নিজে ভাল করিয়া বুঝিবেন। যদি কোন শত্রুর সহিত বিরোধ করিতে হয়, তাহা হইলে অতি সাব-ধানে প্রথমতঃ নিজমনকে বশীভূত করিবেন, কোন খামখেয়ালি কি রাগ দ্বেষ চালিত হইয়া কদাপি কার্য্য

করিবেন না। তাহার পর মন্ত্রিবর্গকে, তদনন্তর ভৃত্যগণকে এবং সর্ব্ব পরে প্রজাসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া তবে কাহারও সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইবেন। যিনি প্রথমে ইহাদিগকে স্ববশে না আনিয়া শত্রুর সহিত বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিজেই অমাত্যাদির কুচক্রে পড়িয়া পরাভূত হন। হে পুত্র, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান ও হর্ষ ইহারাই প্রকৃত শত্রু, ইহাদিগের দ্বারাই প্রধানতঃ রাজা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পাণ্ডু নরপতি কামের বশীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন,—অনুহ্রাদ ক্রোধ বশতঃই পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ঐল লোভ বশতঃ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বেণ অবিনয় বা মদ জন্যই ব্রাহ্মণগণের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিলেন বলিরাজা মানের জন্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং পুরঞ্জয় হর্ষ জন্যই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;—আর ঐ সমস্ত রিপুকে জয় করিয়াই সম্রাট্ মরুত্ত পৃথিবীকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (১)। রাজা এই সকল দৃষ্টান্ত সতত স্মরণ করিয়া সমুদায় দোষ পরিত্যাগ করিবেন। কাক, কোকিল, ভ্রমর, মৃগ, সর্প, ময়ূর, হংস, কুক্কুট এবং লৌহ—ইহাদিগের নিকট নরপতি চরিত্র শিক্ষা করিবেন। রাজা শত্রুর প্রতি কীটের ন্যায় ব্যবহার করিবেন,—অর্থাৎ কীট যেমন নিঃশব্দে, বিনাড়ম্বরে বস্ত্রাদি আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগের ধ্বংস সাধন করে,—রাজাও তদ্রূপ করিবেন। পিপীলিকা যেমন যথাকালে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত করে, রাজাও তদ্রূপ আপৎকালের নিমিত্ত দুর্গ-মধ্যে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য ও অস্ত্রাদি সঞ্চিত রাখিবেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং শালমলী বীজের ন্যায় রাজা বহুদূর পর্য্যন্ত নিজ প্রতাপ বিস্তীর্ণ বা বর্দ্ধিত করিবেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়—সর্ব্বত্র, অপক্ষপাতে, কখনও মৃদুভাষা কখনও বা তীক্ষ্ণভাবে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন। পদ্ম, শরভ, শূলিকা, গর্ভিনীস্তন ও গোপাঙ্গনার নিকট বুদ্ধি শিক্ষা করিবেন। (২) রাজা রাজ্য পালন নিমিত্ত ইন্দ্র, সূর্য্য, যম ও চন্দ্রের অনুরূপ আচরণ করিবেন। ইন্দ্র যেমন চারিমাস বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন আবার অবশিষ্ট আট মাস সেইজল শোষণ করেন, রাজাও তদ্রূপ সময়ে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন ও যথাকালে উপযুক্ত দান দ্বারা তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। যম যেরূপ প্রিয়াপ্রিয়, আপন পর বিবেচনা করেন না পরন্তু কাল প্রাপ্ত হইলে সকলকেই সংহার করেন, রাজাও তদ্রূপ অপক্ষপাতী ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন। চন্দ্রের ন্যায় রাজাকে দেখিয়া প্রকৃতিপুঞ্জ যাহাতে হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তদনুরূপ ব্যবহার রাজার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। বায়ু যেমন গুপ্ত ভাবে সর্ব্বভূতের সর্ব্বত্রই বিচরণ করিয়া থাকেন, রাজাও তদ্রূপ চর সহায়ে অমাত্য, মিত্র, বান্ধব, পৌর ও জানপদ সকলেরই চরিত্রাদি অবগত হইবেন। কাম, লোভ, অর্থবশে অথবা অন্য কোনও কারণে যাঁহার মন লুব্ধ বা আকৃষ্ট না হয়, সেই রাজাই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। হে বৎস, যে রাজার বর্ণ ধর্ম্ম বা আশ্রম ধর্ম্ম কোন প্রকার ক্ষয় কি অবসাদ প্রাপ্ত না হয়, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে শাশ্বত সুখভোগ করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান মন্ত্রিবর্গের পরামর্শে নিরন্তর কার্য্য করা এবং সকলকে নিজ ধর্ম্মে স্থাপন করাই রাজার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য এবং ইহাই তাঁহার সিদ্ধিলাভের কারণ। নরপতি প্রকৃত ধর্ম্মানুগতরূপে প্রজাপালন করিলে যেরূপ কৃতকৃত্য এবং সফলমনোরথ হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাহাদিগের অর্জ্জিত পুণ্যের অংশও প্রাপ্ত হন। যে রাজা চতুর্ব্বর্ণের রক্ষণ জন্য এবম্বিধ নিয়মে অবস্থিতি করেন, তিনি ইহলোকে পরমসুখে কালযাপন করিয়া অন্তিমে পরলোকে ইন্দ্রের সমান স্থান লাভ করিয়া থাকেন।”

অতি সংক্ষেপে, কয়েকটি মাত্র শ্লোকে রাজ্ঞীর

(১) রাজ্ঞীর প্রাচীন ইতিহাস (Ancient History) শাস্ত্রে জ্ঞান কিরূপ গভীর, তাহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

(২) তিনি পদ্মের ন্যায় লোকের প্রীতিকর হইবেন। শরভ নামধেয় অষ্টপাদ ভয়ানক জন্তুর ন্যায় (Fabulous animal) তিনি বিক্রমশীল হইবেন। শূলাস্ত্র যেমন শত্রুকে একেবারে ধ্বংস করে, তিনিও সেইরূপ অমোঘশক্তি হইবেন। গর্ভিনীস্তন ভাবী সন্তানের জন্য দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখে, রাজাও তদ্রূপ সঞ্চয়ী হইবেন। গোপাঙ্গনা যেমন একমাত্র দুগ্ধ হইতে দধি, নবনীত, ছানা, ক্ষীরাদি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করে, রাজাও তদ্রূপ নানাবিধ উপায়ে প্রজারঞ্জন করিবেন।

উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীভগবানোক্ত ধর্ম্মোপদেশ যে ঋষি-শ্রেষ্ঠের লেখনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, এই উপদেশও তাঁহারই দ্বারা লিখিত, সুতরাং শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুর ইহা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। যাঁহারা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই রাজ্ঞীর রাজনীতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ইনি নিজপুত্রকে রাজনীতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, সদাচার, ভক্ষ্যাভক্ষ, প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন। অবশেষে তিনি পুত্রের প্রতি আত্মজ্ঞানোপদেশ বিষয়ক সদুপদেশ-ক্ষোদিত একটি সুবর্ণাঙ্গুরীয় প্রিয় পুত্রকে প্রদান করতঃ স্বামীর সহিত বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কঠিন হইতেও কঠিনতর আত্ম-বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যায় কিরূপ পারদর্শিনী ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রদান করিবার এই স্থল নহে। বারান্তরে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার অভিলাষ রহিল।

মহারাণী দ্রৌপদী দেবীও রাজনীতিতত্ত্বে কিরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, মহাভারত-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। বনপর্ব্বে এবং শান্তিপর্ব্বে মহারাজ চক্রবর্ত্তী সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে দেবী যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলারই উপযুক্ত বটে! রামায়ণে রাজ্ঞী মন্দোদরী এবং তারাদেবীর যেরূপ রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পৃথিবীর অন্যত্র দুর্লভ, সন্দেহ নাই। এই সকল প্রাতঃস্মরণীয়া বিদুষী ভারত-মহিলা যে “হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সুশিক্ষায়” শিক্ষিতা হইয়া “কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী ও সুগৃহিণী”র আদর্শ-স্থানীয়া হইয়া গিয়াছেন,—তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু শাস্ত্র এরূপ অনুদার বা সঙ্কীর্ণ নহে যে ইহা মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষায় বাধা প্রদান করিবে! আমরা নিজেই অকর্ম্মণ্য,—অধম, তাই আমরা নিজের সংকীর্ণতা হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে উৎসুক। হায়! ইহা যে মহতী আত্মবঞ্চনা, কে আমাদিগকে তাহা শিখাইবে? কে আমাদিগের এই ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিবে?

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

ভারতের প্রাচীন অধিবাসী ও ভাষা

ইতিহাস জগতে ভারতবর্ষের আজি এরূপ প্রাধান্য দেখিয়া বোধ হয়, ভারতবর্ষের অদ্ভুত সভ্যতার চিত্ত-চমৎকারিণী শক্তি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের চিত্ত সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত এরূপ কোনভাব তাঁহাদিগের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। জার্ম্মান ভাষায় লিখিত কোন প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় ইহা সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে স্লশার (Schlosser) লিখিত ইতিহাসে ভারতবর্ষের ইতিহাস মাত্র দ্বাদশ পৃষ্ঠাব্যাপী ছিল; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণ সমগ্র গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যদ্বয়ের সম্পূর্ণ সম্মিলিত ইতিহাসের সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষের বিবরণ তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতের বিবরণ প্রাগুক্ত দেশদ্বয়ের সম্মিলিত ইতিহাস অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা অল্প আশাপ্রদ নহে। উক্ত বিবরণ হইতে আশা করা যাইতে পারা যায় যে ইতিহাস-জগতে এমন কোন সময় আসিবে যখন আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণ (যাহারা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপৃত থাকিবেন) নীচ একদেশদর্শীতা ও পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সমদর্শীতা ও ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনও প্রণয়ন করিবেন। তাঁহাদিগের এই কার্য্যে

সাধন করিয়া সেবাধর্ম্ম ও ত্যাগধর্ম্মের আচরণ করুন, ইহা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু মাত্রেরই কামনা।”

মান্যবর রায় বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য, সুতরাং তাঁহার কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করা উচিত। তথাপি, আমরা সত্যানুরোধে বলিতে বাধ্য যে তাঁহার কথাগুলি বেশ চিন্তা করিয়া যেন বলা হয় নাই। হিন্দু সমাজের নায়কগণের ও বালিকাদিগের অভিপ্রায় জানিবার জন্য তিনি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নাই। তিনি বলিয়াছেন যে হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থানুসারে ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিলে বালিকাগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই ব্যবস্থা কোনও শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা কি না তাহা তিনি বলেন নাই। সম্ভবতঃ ইহা প্রচলিত দেশাচার। এই দেশাচার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, তাহা অনেকেই জানেন এবং ইহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না;—বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের যুগে এই আচারও ত্বরিত বেগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিছু দিন পরে যে হিন্দু বালিকাগণ আরও দুই এক বৎসর বিদ্যালয়ে থাকিতে পারিবেন না তাহা কে বলিল?—সুতরাং তাঁহার কথিত এই সমাজ ব্যবস্থার উপর নিতান্ত নির্ভর করা যায় না, এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ কালের স্ত্রীশিক্ষাকে নিয়মিত করিতে যাওয়াও বোধ হয় সুসঙ্গত নহে। আর তিনি বালিকাগণকে “হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সুশিক্ষা লাভ করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী ও সুগৃহিনী” দেখিতে চাহেন। আমরা যতদূর হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি যে আর্য্য সাহিত্যের সমস্ত বিষয়ই, অথবা আর্য্যদিগের সকল বিদ্যাই নারীদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া গণিত, জ্যোতিষ, নৃত্যগীত, কাব্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা ও পাক-প্রণালী প্রভৃতি অর্থাৎ বেদ, উপবেদ এবং চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা সমস্তই মহিলাদিগের শিক্ষণীয়। আবশ্যক হইলে শাস্ত্রের অধ্যায় এবং শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমাদের উক্তি সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি। হিন্দু শাস্ত্রের বিশ্বাস, নারী সর্ব্ববিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইলেই তবে “কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী” এবং “সুগৃহিণী” হইতে পারেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে রায় বাহাদুরের এরূপ প্রতিকূল মত কেন? প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে শিক্ষণীয় সকল বিষয়েই শিক্ষাদান কার্য্য নির্ব্বাহ হইত,—আর অধুনা রাজভাষা দ্বারা সেই কার্য্য হইতেছে,—এই মাত্র বিশেষ। যদি মাননীয় রায় বাহাদুর মাতৃভাষার সাহায্যে মহিলাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার পক্ষপাতী হইতেন,—তাহা হইলে সানন্দে আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিতাম। তথাপি আধুনিক যুগে রাজভাষাকে কদাপি পরিত্যাগ করা যায় না। জাপানাদি সভ্যদেশে ইংরাজী ভাষার যেরূপ আদর—তাহাতে কি বুঝায়? ইংরাজী ভাষার সাহায্যে একজন লোক অনায়াসে পৃথিবীর সমস্ত দেশের আচার, ব্যবহার, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের——এক কথায় সভ্যতার, সহিত পরিচিত হইতে পারেন। আর আমাদের পক্ষে ইংরাজী ভাষা যে নিতান্তই আবশ্যক, তাহা কি রায় বাহাদুর অস্বীকার করিতে পারেন?

উপরোক্ত সংবাদ পত্রের মন্তব্যের উপর কোন কথা বলিতে চাই না সুতরাং সে সম্বন্ধে আমরা নির্ব্বাক্ থাকিলাম। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা এই মাত্র বুঝি যে নর অথবা নারী,—উভয়ের পক্ষেই বিদ্যা তুল্যরূপে আবশ্যক পদার্থ। বাল্যে কৈশোরে ও যৌবনের প্রা[illegible] বিদ্যা সঞ্চয় না করিলে কেহই জীবন সংগ্রামে [illegible]কার্য্য হইতে পারেন না। পর-জীবনে যে কোন কার্য্যই কেন করিতে হউক না, শিক্ষা তাহার পক্ষে অবশ্যই সাহায্য করিবে। উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত দুই চারিজন মহিলাকে দেখিবার এবং তাঁহাদের চরিত্র অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে। তাঁহাদিগকে প্রকৃত পক্ষেই “কর্ত্তব্য পরায়ণা পত্নী ও সুগৃহিণী” দেখিয়াছি। অশিক্ষিতা মহিলা ও “কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী ও সুগৃহিণী” হন,—কিন্তু উভয়ের তুলনা করিলে যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়,—তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। নারী উচ্চশিক্ষা পাইলে ভোটার্থিনী বিবিদের অনুকরণ করিবেন বলিয়া তাহারা আশঙ্কিত হইতেছেন,—তাহারা বালকদিগের উচ্চশিক্ষা বন্ধ করিয়া দেন না কেন? বালকগণও তো উচ্চশিক্ষা পাইয়া বিলাতের রাজনীতি নিপুণ সাহেবদিগের অনুকরণ করিতেছেন,—Agitation বা আন্দোলন করিয়া দেশ মাথায় করিতেছেন। রায় বাহাদুরের মত বিবেচক ব্যক্তি অবশ্যই কার্য্য কারণের এরূপ অদ্ভুত ধারা আবিষ্কার করিতে অগ্রসর হইবেন না। বিলাতের নারীগণ ভোট প্রার্থনা করিতেছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে দোষই বা কেন দেন? আইরিশদিগের হোমরুল প্রার্থনা এবং ভারতবাসীদিগের স্বায়ত্ত শাসন প্রার্থনা যদি অপরাধজনক কার্য্য না হয়,—তাহা হইলে ইউরোপীয় রমণীদের ভোটের প্রার্থনাই বা পাপজনক কেন হইবে? পাছে আমাদের কুলমহিলাগণ রাজনীতির উপাসক হন, বিজ্ঞ-সম্পাদক সেই ভাবনায় অস্থির হইয়াছেন,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—রাজনীতি কি “হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সুশিক্ষার” অন্তর্ভুক্ত নহে? আমরা অদ্যকার প্রাচীন যুগের একটি আদর্শ মহিলার, প্রকৃতরূপে “হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সুশিক্ষায়” সুশিক্ষিতা নারী-রত্নের জীবনের কিঞ্চিৎ কাহিনী পাঠক-পাঠিকাবর্গের নিকটে উপস্থিত করিতেছি।

পূর্ব্বে এই “সুপ্রভাতে” আমরা রাজ্ঞী মদালসার উপাখ্যানের প্রথমাংশ বিবৃত করিয়াছিলাম,—জানি না তাহা পাঠকগণের স্মরণে আছে কি না। যাহাই হউক,—এই মদালসা ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ শত্রুজিতের পুত্রবধূ এবং সম্রাট্ ঋতধ্বজ কুবলয়াশ্বের মহিষী। তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় দিবার নিমিত্ত আমরা ইচ্ছা করিতেছি। সেই নারীরত্নের চরিত্র নানাগুণে, নানা বিদ্যায় একান্ত অলঙ্কৃত। অন্য কথা না তুলিয়া আজি আমরা তাঁহার রাজনীতি-জ্ঞানেরই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ককে রাজনীতি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন,—তাহাই আমাদের অবলম্বন।

রাজ্ঞী মদালসা বলিলেন—“বৎস, রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজার প্রধান কর্ত্তব্য কি?—রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, প্রজারঞ্জন। কিন্তু অন্ধ ভাবে প্রজার সন্তোষ সাধন রাজার কর্ত্তব্য নহে,—পরন্তু নিজ ধর্ম্ম এবং প্রজার ধর্ম্ম যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে,—তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া প্রজার সন্তোষ সাধনই রাজার প্রথম কর্ত্তব্য। মৃগয়াতে অত্যনুরক্তি, পণ রাখিয়া পাশা ক্রীড়া, কর্ত্তব্য কাজ ফেলিয়া রাখিয়া দিবানিদ্রা, পরস্ত্রীতে অনুরাগ প্রভৃতিকে ব্যসন বলে,—যে রাজা এই সকল ব্যসনের ফাঁশে বাঁধা পড়েন, তাঁহার রাজ্যের মূল নষ্ট হইয়া যায়। আর যাঁহার রাজ্য-রক্ষার মন্ত্রণাগুলি কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া না যায়, তজ্জন্য বিশেষ সাবধান হওয়াও রাজার নিতান্ত কর্ত্তব্য। দ্রুতবেগে ধাবিত সুন্দর চক্রবিশিষ্ট রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলে আরোহী যেমন শরীরের নানাস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হন,—তদ্রূপ মন্ত্রণা বাহির হইয়া গেলে রাজাও বিপদ্‌গ্রস্ত হন। শত্রুবর্গ উৎকোচাদি দ্বারা নিজ অমাত্যাদি কর্ম্মচারিদিগকে লুব্ধ বা বশীভূত করিতেছে কি না, অতি যত্নে, অতি গোপনে তাহা জানিতে হইবে। বিশ্বাসী চরদ্বারা অরাতিদিগের চরের গতিবিধির সংবাদ লইতে হইবে। রাজা সময়ের দাস,—তিনি সময় বুঝিয়া লোককে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিবেন। এমন সময় আসিতে পারে যখন শত্রুকেও বিশ্বাস করিতে হইবে,—আবার তিনি নিতান্ত আত্মীয় বন্ধুকেও অতিমাত্র বিশ্বাস করিবেন না। কাম রাজার বিশেষ শত্রু,—তিনি কদাপি তাহার বশীভূত হইবেন না। স্থান, কাল, পাত্র, বৃদ্ধি, ক্ষয়, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন ইত্যাদি বিষয় নিজে ভাল করিয়া বুঝিবেন। যদি কোন শত্রুর সহিত বিরোধ করিতে হয়, তাহা হইলে অতি সাবধানে প্রথমতঃ নিজমনকে বশীভূত করিবেন, কোন খামখেয়ালি কি রাগ দ্বেষ চালিত হইয়া কদাপি কার্য্য

করিবেন না। তাহার পর মন্ত্রিবর্গকে, তদনন্তর ভৃত্যগণকে এবং সর্ব্ব পরে প্রজাসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া তবে কাহারও সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইবেন। যিনি প্রথমে ইহাদিগকে স্ববশে না আনিযা শত্রুর সহিত বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হন, তিনি নিজেই অমাত্যাদির কুচক্রে পড়িয়া পরাভূত হন। হে পুত্র, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান ও হর্ষ ইহারাই প্রকৃত শত্রু, ইহাদিগের দ্বারাই প্রধানতঃ রাজা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পাণ্ডু নরপতি কামের বশীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন,—অনুহ্লাদ ক্রোধ বশতঃই পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ঐল লোভ বশতঃ ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বেণ অবিনয় বা মদ জন্যই ব্রাহ্মণগণের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছিলেন বলিরাজা মানের জন্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিলেন এবং পুরঞ্জয় হর্ষ জন্যই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ;—আর ঐ সমস্ত রিপুকে জয় করিয়াই সম্রাট্ মরুত্ত পৃথিবীকে জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (১)। রাজা এই সকল দৃষ্টান্ত সতত স্মরণ করিয়া সমুদায় দোষ পরিত্যাগ করিবেন। কাক, কোকিল, ভ্রমর, মৃগ, সর্প, ময়ূর, হংস, কুক্কুট এবং লৌহ—ইহাদিগের নিকট নরপতি চরিত্র শিক্ষা করিবেন। রাজা শত্রুর প্রতি কীটের ন্যায় ব্যবহার করিবেন,—অর্থাৎ কীট যেমন নিঃশব্দে, বিনাড়ম্বরে বস্ত্রাদি আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগের ধ্বংস সাধন করে,—রাজাও তদ্রূপ করিবেন। পিপীলিকা যেমন যথাকালে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত করে, রাজাও তদ্রূপ আপৎকালের নিমিত্ত দুর্গ-মধ্যে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য ও অস্ত্রাদি সঞ্চিত রাখিবেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং শালমলী বীজের ন্যায় রাজা বহুদূর পর্য্যন্ত নিজ প্রতাপ বিস্তীর্ণ বা বর্দ্ধিত করিবেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়—সর্ব্বত্র, অপক্ষপাতে, কখনও মৃদুভাষা কখনও বা তীক্ষ্ণভাবে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন। পদ্ম, শরভ, শূলিকা, গর্ভিনীস্তন ও গোপাঙ্গনার নিকট বুদ্ধি শিক্ষা করিবেন। (২) রাজা রাজ্য পালন নিমিত্ত ইন্দ্র, সূর্য্য, যম ও চন্দ্রের অনুরূপ আচরণ করিবেন। ইন্দ্র যেমন চারিমাস বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবীকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন আবার অবশিষ্ট আট মাস সেইজন শোষণ করেন, রাজাও তদ্রূপ সময়ে প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন ও যথাকালে উপযুক্ত দান দ্বারা তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। যম যেরূপ প্রিয়াপ্রিয়, আপন পর বিবেচনা করেন না পরন্তু কাল প্রাপ্ত হইলে সকলকেই সংহার করেন, রাজাও তদ্রূপ অপক্ষপাতী ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন। চন্দ্রের ন্যায় রাজাকে দেখিয়া প্রকৃতিপুঞ্জ যাহাতে হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তদনুরূপ ব্যবহার রাজার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। বায়ু যেমন গুপ্ত ভাবে সর্ব্বভূতের সর্ব্বত্রই বিচরণ করিয়া থাকেন, রাজাও তদ্রূপ চর সহায়ে অমাত্য, মিত্র, বান্ধব, পৌর ও জানপদ সকলেরই চরিত্রাদি অবগত হইবেন। কাম, লোভ, অর্থবশে অথবা অন্য কোনও কারণে যাঁহার মন লুব্ধ বা আকৃষ্ট না হয়, সেই রাজাই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। হে বৎস, যে রাজার বর্ণ ধর্ম্ম বা আশ্রম ধর্ম্ম কোন প্রকার ক্ষয় কি অবসাদ প্রাপ্ত না হয়, তিনি ইহলোকে এবং পরলোকে শাশ্বত সুখভোগ করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান মন্ত্রিবর্গের পরামর্শে নিরন্তর কার্য্য করা এবং সকলকে নিজ ধর্ম্মে স্থাপন করাই রাজার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য এবং ইহাই তাঁহার সিদ্ধিলাভের কারণ। নরপতি প্রকৃত ধর্ম্মানুগতরূপে প্রজাপালন করিলে যেরূপ কৃতকৃত্য এবং সফলমনোরথ হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাহাদিগের অর্জ্জিত পুণ্যের অংশও প্রাপ্ত হন। যে রাজা চতুর্ব্বর্ণের রক্ষণ জন্য এবম্বিধ নিয়মে অবস্থিতি করেন, তিনি ইহলোকে পরমসুখে কালযাপন করিয়া অন্তিমে পরলোকে ইন্দ্রের সমান স্থান লাভ করিয়া থাকেন।"

অতি সংক্ষেপে, কয়েকটি মাত্র শ্লোকে রাজ্ঞীর

(১) রাজ্ঞীর প্রাচীন ইতিহাস (Ancient History) শাস্ত্রে জ্ঞান কিরূপ গভীর, তাহা ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

(২) তিনি পদ্মের ন্যায় লোকের প্রীতিকর হইবেন। শরভ নামধেয় অষ্টপাদ ভয়ানক জন্তুর ন্যায় (Fabulous animal) তিনি বিক্রমশীল হইবেন। শূলাস্ত্র যেমন শত্রুকে একেবারে ধ্বংস করে, তিনিও সেইরূপ অমোঘশক্তি হইবেন। গর্ভিনীস্তন ভাবী সন্তানের জন্য দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখে, রাজাও তদ্রূপ সঞ্চয়ী হইবেন। গোপাঙ্গনা যেমন একমাত্র দুগ্ধ হইতে দধি, নবনীত, ছানা, ক্ষীরাদি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করে, রাজাও তদ্রূপ নানাবিধ উপায়ে প্রজারঞ্জন করিবেন।

উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীভগবানোক্ত ধর্ম্মোপদেশ যে ঋষি-শ্রেষ্ঠের লেখনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিল, এই উপদেশও তাঁহারই দ্বারা লিখিত, সুতরাং শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দুর ইহা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। যাঁহারা মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই রাজ্ঞীর রাজনীতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। ইনি নিজপুত্রকে রাজনীতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, সদাচার, ভক্ষ্যাভক্ষ, প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ দিয়াছেন। অবশেষে তিনি পুত্রের প্রতি আত্মজ্ঞানোপদেশ বিষয়ক সদুপদেশ-ক্ষোদিত একটি সুবর্ণাঙ্গুরীয় প্রিয় পুত্রকে প্রদান করতঃ স্বামীর সহিত বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কঠিন হইতেও কঠিনতর আত্ম-বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যায় কিরূপ পারদর্শিনী ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রদান করিবার এই স্থল নহে। বারান্তরে তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার অভিলাষ রহিল।

মহারাণী দ্রৌপদী দেবীও রাজনীতিতত্ত্বে কিরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, মহাভারত-পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। বনপর্ব্বে এবং শান্তিপর্ব্বে মহারাজ চক্রবর্ত্তী সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে দেবী যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলারই উপযুক্ত বটে! রামায়ণে রাজ্ঞী মন্দোদরী এবং তারাদেবীর যেরূপ রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা পৃথিবীর অন্যত্র দুর্লভ, সন্দেহ নাই। এই সকল প্রাতঃস্মরণীয়া বিদুষী ভারত-মহিলা যে "হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত সুশিক্ষায়" শিক্ষিতা হইয়া "কর্ত্তব্যপরায়ণা পত্নী ও সুগৃহিণী"র আদর্শ-স্থানীয়া হইয়া গিয়াছেন,—তাহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু শাস্ত্র এরূপ অনুদার বা সঙ্কীর্ণ নহে যে ইহা মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষায় বাধা প্রদান করিবে! আমরা নিজেই অকর্ম্মণ্য,—অধম, তাই আমরা নিজের সংকীর্ণতা হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে উৎসুক। হায়! ইহা যে মহতী আত্মবঞ্চনা, কে আমাদিগকে তাহা শিখাইবে? কে আমাদিগের এই ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিবে?

শ্রীসত্যবন্ধু দাস।

ভারতের প্রাচীন অধিবাসী ও ভাষা

ইতিহাস জগতে ভারতবর্ষের আজি এরূপ প্রাধান্য দেখিয়া বোধ হয়, ভারতবর্ষের অদ্ভুত সভ্যতার চিত্ত-চমৎকারিণী শক্তি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের চিত্ত সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত এরূপ কোনভাব তাঁহাদিগের মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। জার্ম্মান ভাষায় লিখিত কোন প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় ইহা সম্যক রূপে অবগত হওয়া যায়। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে স্লশার (Schlosser) লিখিত ইতিহাসে ভারতবর্ষের ইতিহাস মাত্র দ্বাদশ পৃষ্ঠাব্যাপী ছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণ সমগ্র গ্রীস ও রোম সাম্রাজ্যদ্বয়ের সম্পূর্ণ সম্মিলিত ইতিহাসের সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষের বিবরণ তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতের বিবরণ প্রাগুক্ত দেশদ্বয়ের সম্মিলিত ইতিহাস অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা অল্প আশাপ্রদ নহে। উক্ত বিবরণ হইতে আশা করা যাইতে পারা যায় যে ইতিহাস-জগতে এমন কোন সময় আসিবে যখন আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণ (যাহারা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়নে ব্যাপৃত থাকিবেন) নীচ একদেশদর্শীতা ও পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিয়া সমদর্শীতা ও ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভারতের ইতিহাস সঙ্কলনও প্রণয়ন করিবেন। তাঁহাদিগের এই কার্য্যে

বিশ্বজগত বুঝিতে পারিবে যে প্রাচীন যুগের শ্রেষ্ঠ মানবজাতি যাঁহারা সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ্য লাভ করিয়া অসামান্য বিজ্ঞতা-লব্ধ বৈচিত্র্যময় সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি এবং দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র সমূহের জন্ম প্রদান ও উক্ত বিষয় সমূহে অদ্ভুত উন্নতি সাধন করিয়া যশোদেবীর অকলঙ্ক সুশুভ্র জয়মাল্য ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বা ভিন্ন সভ্যতা সম্পন্ন বলিয়া ঘৃণার পাত্র ও অসভ্য বর্ব্বরাখ্যার যোগ্য নহেন। বিভিন্ন জাতিগত বিভিন্ন সভ্যতা সম্পন্ন হইলেও তাঁহারা যে অলোকসামান্য কীর্ত্তি ও অদ্ভুত কার্য্য সমূহের অধিকারী হইয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহারা যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র এবং প্রতীচ্য জাতি সমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহত্তর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না বা এ কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতের যথার্থ ইতিহাস প্রণয়ন-পথে যে সকল বাধাবিঘ্ন আছে তাহা গুরুতর। প্রথমতঃ ইহার সীমা অতি বৃহৎ। দ্বিতীয়তঃ দেশবাসীর সংখ্যা বহু তৃতীয়তঃ অধিবাসীগণের জাতীয় ভিন্নতা ও চতুর্থতঃ এই জাতির উৎপত্তি-বিবরণের অস্পষ্টতা। সুতরাং এবম্প্রকার মহাদেশ-তুল্য নানা জাতি-বিভূষিত কোনও দেশের সমগ্র সম্পূর্ণ ইতিহাস সংগ্রহ ও সঙ্কলন দুষ্কর ও ক্লেশ-সাপেক্ষ। সম্ভবতঃ এই সব কারণেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ঐতিহাসিকগণ ভারতের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রণয়ন বা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহারা ইতিহাসের প্রারম্ভেই ভারতের আদিম নিবাসীগণের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া বিজেতা আর্য্য জাতির ইতিহাস লইয়া ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আদিম নিবাসীগণের কিছু বিস্তৃত আলোচনা ও তাহাদিগের ভাষা সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

ভারতের জনসংখ্যা প্রায় সমগ্র পৃথিবীর এক চতুর্থ অংশ। বিন্ধ্য পর্ব্বতে মন্দা (munda) জাতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা এখনও সেই পূর্ব্বতন তথাকল্পিত সভ্যতাসম্পন্ন; ধাতু ইত্যাদির ব্যবহার তাহাদিগের অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ তাহারা দক্ষিণ ভারতবাসী অপর কোন জাতি-বিশেষের শাখা। কারণ তত্রত্য আদিম নিবাসীগণের সহিত তাহাদিগের বর্ণ, রীতি প্রভৃতির সাদৃশ্য আছে। বোধ হয় উত্তরকালীন বিজেতা জাতিগণ কর্ত্তৃক বিজিত ও নিগৃহীত হইয়া তাহারা পার্ব্বত্য বনারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই মন্দাজাতি পিশাচ-ধর্ম্মাবলম্বী ও ইহাদিগের বেশভূষা যৎসামান্য। প্রয়োজনাতিরিক্ত বেশভূষা ও বস্ত্রাদি পরিধান ইহাদিগের মধ্যে অতি বিরল। দক্ষিণ বিহার প্রাচীন কলিকাতা ও ছোটনাগপুরবাসী কোলগণ এই মন্দা জাতির অন্তর্গত ও ইহার শাখা বিশেষ। কোলগণ নানা সমাজ সম্প্রদায়ে বিভক্ত। সাওঁতাল, লর্ক কোল (সিংহভূমবাসী) ভূমজ কোল, রাঁচির দক্ষিণ প্রদেশস্থ কহুন ও অপরাপর প্রদেশবাসী মন্দা কোল প্রভৃতি সম্প্রদায়গণ এই বিরাট কোল সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এই জাতির অপর একটি শাখা কামতি উত্তর ভারতে অবস্থান করিতেছে।

অপর একটি জাতি রামশিব, বাসভূমি পুণা ও কোলাপুরের মধ্যগত স্থান, কোলাপুর, বরালি, মুম্বাই ও সুরত প্রদেশান্তর্গত দমায়ুন। এই জাতির ভাষা মহারাষ্ট্রীয়গণ-কথিত সংস্কৃত। গুর্জ্জর ও নর্ম্মদা তাপ্তী নদীদ্বয়ের তীরভূমে ও অরণ্যে ভীল-গণের বাস। ইহারা আর্য্য সভ্যতা ও তাঁহাদিগের ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। আরাবল্লী পর্ব্বত ও যমুনা তীরবর্ত্তী মুনার দক্ষিণ প্রদেশস্থ মিরাগণও বিশাল মন্দাজাতি-ভুক্ত।

দক্ষিণভারতের দ্রাবিড়গণের ভাষা উক্ত মন্দা ও সংস্কৃত উভয় ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই দ্রাবিড়জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অধিবাসীগণকে পরাজয় ও তথায় উপনিবেশ স্থাপন করে; কিন্তু উত্তরকালীন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়া দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ ও তথায় বসবাস করে। এই দ্রাবিড়গণের বর্ণ মন্দাদিগের ন্যায় কৃষ্ণ, কিন্তু কয়েকটি পার্ব্বত্যজাতি

ব্যতীত এই সম্প্রদায়স্থ সকলেই সভ্যতা প্রাপ্ত ও ইহাদিগের সভ্যতার পরিচয়-রূপে নানা বৃহৎ পুস্তক আছে। এই সম্প্রদায়স্থ লোকেরা শেষনামক নাগ দেবতাকে পূজা করে। আর্য্যগণ ইহাদিগের নিকট এই সর্প পূজা (মনসা) গ্রহণ করেন।

দক্ষিণ ভারতের প্রান্তস্থ তামিল জাতি এই দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাহারা পুলিকত, কুমারিকা অন্তরীপের নিকটস্থ স্থান, পূর্ব্ব দেশস্থ বঙ্গলোর ও কম্বতয়বে বাস করে। তেলিঙ্গ বা তেলেগু (যাহারা আর্য্যগণের নিকট অন্ধ্র নামে খ্যাত) পুলিকত হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত স্থান সমূহে ও মহারাষ্ট্র দেশে বাস করে! তাহারাও দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। অনুশাসন ও প্রস্তর লিপি হইতে ৫ম শতাব্দীর অন্ধ্র রাজগণের যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা হইতে ও বঙ্গসাগর-তটবর্ত্তী নানা নগর নগরীর তেলেগু ভাষা-কথিত নাম হইতে বুঝা যায় যে তেলিঙ্গ বা অন্ধ্রগণের রাজ্য সীমা বহুদূরব্যাপী ছিল; এমন কি উত্তর ভারতের মগধ অঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রদেশ তাহাদিগের শাসনাধীন ছিল। তামিলের ন্যায় এই সম্প্রদায়েরও নিজস্ব ভাষা ও জাতীয় সাহিত্য ছিল। অপর একটি জাতি তুলু (ইহাদের বাসস্থান ছিল মঙ্গলবাওয়ে—এখন যাহার নাম মালবর) অতি প্রাচীন-কালেই পারস্যের নিকট খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহারা সিরিয় ভাষার অনুকরণে উক্ত দেশীয় কর্শনিস অক্ষর লিপি ব্যবহার করিত।

কনবিস নামে আর একটি জাতি আছে। তাহাদিগের বাস ছিল সমুদ্রতটে ও মাহশূর রাজ্যের মধ্যে। এই জাতীয় লোকদিগের সহিত পার্ব্বত্য কোট, বদগ ও খতুগ জাতির সংশ্রব আছে। ইহাদিগের ভাষায় অক্ষর লিপির প্রচলন নাই এবং সে ভাষা অপর কোন জাতীয় লোক বুঝিতে পারে না।

কম্বতয়রের উত্তর প্রান্তস্থ নীলগিরি পর্ব্বত-বাসী তোদ জাতি এখনও তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে নাই এবং তাহাদিগের সহিত অপর কোন জাতির সংমিশ্রণ হয় নাই। এই জাতীয় রমণীরা বহু ভর্ত্তৃ গ্রহণ দোষ মনে করে না; কিন্তু অসতীগণের স্থান এই জাতীয় রমণী সমাজে নাই—সতীত্বের অবমাননা বা সতীর প্রতি অত্যাচার মহাপাপ বলিয়া রমণী ও পুরুষগণের বিশ্বাস। ইহাদিগের ধর্ম্মে ভূত প্রেতাদির প্রভাব বিশেষ-রূপে ব্যক্ত ও এই প্রকার অশরীরি প্রভাব হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার কোন ব্যবস্থা ইহাদিগের ধর্ম্মে নাই বা থাকিলেও তাহা সামান্য ও নিষ্ফল এইরূপ ইহাদিগের বিশ্বাস। যাদুমন্ত্রে ইহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ও ইহাদিগের সম্প্রদায়ে যাদুকরের অসীম প্রতাপ। অপরাপর সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাদিগের সম্প্রদায়েও পুরোহিত আছে। সেই পুরোহিতের প্রধান কার্য্য গোদোহন। আর্য্যগণের ন্যায় গো ইহাদিগের শ্রেষ্ঠ ধন। উরাও কোল ও রাজমহল কোলগণের সাধারণ সামাজিক নাম পারিয়া। ইহারাও দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের শাখা-বিশেষ। গণ্ড নামে আর একটি সম্প্রদায় আছে তাহারা সংস্কৃতের ন্যায় এক প্রকার ভাষায় (হিন্দি) কথা কহিয়া থাকে ও পারসিক ধর্ম্মের ন্যায় তাহাদিগের ধর্ম্মে দুইটি দেবতা;—একটি সর্ব্ব প্রকার সুখ সৌন্দর্য্যের আকর ও অপরটি সকল প্রকার দুঃখ শোকের নিদান বলিয়া কীর্ত্তিত। এই দেবতা-দ্বয় ভিন্ন অপর কোন দেবতার অস্তিত্ব ইহারা স্বীকার করে না।

বিশাল দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের অপরাপর শাখা সমূহের মধ্যে উড়িষ্যার কুবা কন্দ জাতি, বেলুচিস্থান ও ইরান দেশের ব্রহিস জাতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই ব্রহিস জাতি সুদূর গ্রীস দেশস্থ গ্রীকগণের নিকট ঈথিয়পিয় বলিয়া পরিচিত ছিল। এই পরিচয় হইতে তাহাদিগের বিস্তৃতির সীমা এক প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সম্ভবতঃ তাহারা আসিয়ার উপত্যকা ভূমি হইতে তথায় গমন করিয়াছিল।

আর একটি প্রাচীন জাতির বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাদিগের বাস ছিল সিংহলে ও আর্য্যগণের নিকট ইহারা নিষাদ বা ব্যাধ নামে পরিচিত ছিল। জাতি-

তত্ত্বের যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলিতে পারেন ইহাদিগের সহিত দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের কি সম্পর্ক কিন্তু ইহাদিগের ভাষা হইতে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহাদিগের ভাষা ইলুর সহিত তৎকালীন অপর কোন ভাষার সম্বন্ধ নাই। এ সম্বন্ধে কোন ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত লিখিয়াছেন "Quite peculiar to themselves." অনুমান প্রায় দুই সহস্র পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ হয় এবং ১৫০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সিন্ধুনদ তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে আর্য্যেরা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু গাঙ্গেয় স্থান সমূহ জয় করিতে তাঁহাদিগের প্রায় ৫০০ বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল। উক্ত নদী-তীরস্থ প্রদেশ সমূহ জয় কালীন অনার্য্যগণের সহিত যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা উত্তরকালে ব্রাহ্মণ-কৃত গ্রন্থ সমূহে স্থান লাভ করিয়া গ্রন্থের পুষ্টি বিধান করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকারগণ এই সকল ঘটনার সাহায্যে তাঁহাদিগের পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন। বোধ হয় এই কারণেই প্রাচীন ভারতের যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না।

আর্য্যগণের ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের পরে যে সমস্ত জাতি স্ব স্ব স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল সিন বা জিন জাতি তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। এই সিনজাতির বাসভূমি গিলগিট্ ও তাহাদিগের ভাষা প্রায় সংস্কৃতের ন্যায় এবং তাহাতে কাশ্মীরি ও হিন্দি ভাষার নানা কথা মিশ্রিত আছে। সিনগণের ভাষায় অক্ষর লিপি নানা প্রকার। তাহারা বিভিন্ন নামে কীর্ত্তিত বল্‌তিস্থানে তাহাকে "রোম" বলে।

আর একটি জাতিরও পরিচয় পাওয়া যায়, এই জাতি কিন্তু নামবিহীন। ইহারা আদিম নিবাসী নহে এবং আর্য্যগণের ন্যায় ইহারা ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় ভুক্ত। বাত নামক নগর হইতে ইহাদিগের আগমন হয় ও ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃত। কিন্তু সিনগণের অনুকরণে ইহাদিগের ভাষাও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আখ্যা। গোঘারো, নরিসতি, ও সিঘাপোষ এই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা।

উপরে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল তাহা প্রাচীন ভারতবাসীর সমগ্র সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে। ইহাতে কেবলমাত্র কয়েকটি আদিম জাতির বিবরণ সঙ্কলিত হইল তাহাও সামান্যরূপে। প্রাচীন ভারতের প্রাচীন জাতিগণের বিশেষ বিবরণ সঙ্কলন দুঃসাধ্য। প্রথমতঃ আদিম জাতিগণের স্বরচিত কোন ইতিহাস নাই। তাহার কারণ সকলেই বুঝিতে পারেন, এস্থলে আর পুনরুল্লেখ করিয়া বিরক্তিভাজন হইব না। দ্বিতীয়তঃ যদিও থাকে তাহা অপ্রাপ্য না এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তৃতীয়তঃ প্রাচীন ভারতে জাতির সংখ্যা প্রায় ১৮০। এই ১৮০টি জাতির বিবরণ সঙ্কলন কিরূপ ভয়ানক ও দুঃসাধ্য তাহা সকলেই জানেন। অপরঞ্চ তাহাদিগের মধ্যে এমন অনেক জাতি আছে যাহার নাম কখনও শ্রুত হয় নাই। সুতরাং সে সকল জাতির বিবরণ সংগ্রহ অসাধ্য। এ সকল কারণে যে সকল জাতির নাম লোক পরিজ্ঞাত ও যাহাদিগের বিবরণ জানিতে পারিয়াছি তাহাদিগের অধিকাংশেরই কিছু কিছু বিবরণ দিলাম। বারান্তরে উহাদিগের ভাষা সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিবার আশা রহিল।

শ্রীঅনাদিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

পদ্মাতীরে

(গল্প)

মদন মাঝি বৃদ্ধ হইয়াছে। ১৫ বৎসর বয়স হইতে আজ ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত পদ্মার পারে মাঝিগিরি করিয়া তাহার দেহের সমস্ত কেশ পাকিয়া গিয়াছে। পদ্মায় যখন ভীষণ ঝড় তুফান উঠিত তখন মদন ছাড়া সেই পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ-রাশির ভিতর নৌকা দেয় কাহার সাধ্য? তাহার ন্যায় নির্ভীক স্থিরবুদ্ধি মাঝি পদ্মার কোন নৌকায় ছিল কিনা সন্দেহ। মদন বলিত,—"জীবনে কত সহস্র যাত্রী উদ্ধার করিয়াছি, শত শত নৌকা পদ্মার কবল হইতে রক্ষা করিয়াছি।" কিন্তু প্রাণরক্ষা করিয়া কখনও তৎপরিবর্ত্তে পুরস্কার গ্রহণ করে নাই, করিলে, আজ সে লক্ষপতি হইতে পারিত। তাহার স্ত্রী চন্দনা কতবার মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছে "বুড়া হইলে, এখন বাড়ীতে থাক, একটু হাড়ে বাতাস লাগুক্; এমন করিয়া আর ঝড় বৃষ্টি রৌদ্রে কতকাল থাকিবে?" বুড়া শুনিত না বলিত—"জানিস্ না বুড়ী আমি একবৎসর বর্ষাকালে পদ্মা ছাড়িয়া থাকিলে কত লোক অসহায় অবস্থায় মরিবে, কত লোকের কার্য্য নষ্ট হইবে, আমার প্রাণটা বড়ই কাঁদিয়া উঠে।" চন্দনা কত বুঝাইত, কত হাতে পায়ে ধরিত, বুড়া কিন্তু কিছুতেই রাজি হইত না। এবার বুড়ী বড় কাঁদিল বৃদ্ধের শরীরের অবস্থা দেখাইয়া কহিল "আমাকে মারিয়া ফেল তার পরে যাও, নহিলে কোন মতে যাইতে দিব না।" মদন হাসিয়া বলিল "এখনও কিঞ্চিৎ সামর্থ্য শরীরে আছে;—এ শক্তিটুকু থাকিতেও আমি দাঁড়াইয়া লোকের সর্ব্বনাশ দেখিব? আচ্ছা চন্দনা, আমাকে আর এক বৎসরের জন্য বিদায় দে, তারপর নৌকাখানা ভাঙ্গিয়া বাড়ী আসিয়া বসিব, তোর পাকাচুলে সিন্দূর পরাইব।" মদন যাইবার সময় বুড়ীর কাছে শপথ করিয়া গেল—সপ্তমী পূজার দিন বাড়ী আসিয়া পূজা দিবে। চন্দনা অশ্রুপূর্ণ চোখে স্বামীকে বিদায় দিল, যতদূর দৃষ্টি চলে চাহিয়া রহিল, শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল, মনে মনে কহিল "মা ভগবতি! প্রত্যেক বৎসর যেমন ভিক্ষা দিয়া আসিয়াছ, এবারও যেন দাসীকে ভুলিও না, বুড়াকে আবার নিরাপদে আমার কাছে আনিও।"

নৌকাখানি বহু পুরাতন; কতলোক, তাহার নৌকায় থাকিয়া কাজ শিখিয়া চলিয়া গিয়াছে—আর দেখা হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর এরূপ কত আসিত—শেষে চলিয়া যাইত। যাইবার সময় মদন আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিত--"বেঁচে থাক ভাই,সুখে থাক। মনে রাখিও—এই পদ্মা বড় ভীষণ নদী, কত নৌকা ডুবিয়া যায়—কতলোকের সর্ব্বনাশ হয়। বিপদের সময় কাহাকেও পরিত্যাগ করিও না।" এইরূপে দলের পর দল তাহার পদধূলি লইয়া চলিয়া যাইত; প্রত্যেক বৎসর বিদায়ের পূর্ব্বে মদন তাহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় করিত।

মদনের স্বচ্ছল অবস্থা না থাকিলেও তাহার বেশ ভালভাবেই দিন যাইত। সাহসী, সচ্চরিত্র বলিয়া কোন দিন তাহাকে বসিয়া থাকিতে হয় নাই, বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত তাহার যথেষ্ট লাভ হইত—কেননা সে সময় লোকে শুধু মদনমাঝিরই অন্বেষণ করিত। ভাদ্র মাসের শেষে মদন বিদায় ভোজ দিত, সে দিনটি তাহার বড় আনন্দের। নৌকায় আহার করিতে বসিয়া বৃদ্ধ তাহার নবীন চেলাদের কত সদুপদেশ দিত, শ্রোতারা কেহ শুনিত, কেহ শুনিত না। কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে সকলেরই সম্পূর্ণ মনোনিবেশ ছিল।

আজ কয়েক বৎসর আর তেমন ভোজ হয় নাই, তেমন শিষ্যও বেশী হয় না, আর মদনেরও

বার্দ্ধক্য হেতু আয় কমিয়া আসিয়াছে। এ দুঃখে বৃদ্ধের কপোল বাহিয়া দু' এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িত। এই যে দলের পর দল প্রতি বৎসর মাঝিগিরি পাশ করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিয়া লইত, আর বৃদ্ধ মদন কেমন আছে কেহ কোন দিন খোঁজ করে নাই—তাহাতে মদনের দুঃখ নাই, বলিত "আহা সকলেই দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনপাত করে, জীবনই দুঃখের বোঝা, অপরের সন্ধান লওয়ার সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে কই?"

ছোকরার দল লইয়া মদনের জীবনটা বেশ সুখেই কাটিয়া যাইত, কিন্তু এখন আর এই বৃদ্ধ বয়সে তেমন আনন্দ নাই। বহুযুগ বর্ষিয়সী তরণী-খানি শতস্থানে মেরামত হইয়াছে, কাষ্ঠ পাটাতন মসী বর্ণ ধারণ করিয়াছে, হালটি মধুচাকের ন্যায় সচ্ছিদ্র, বৃদ্ধের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে যেন সীমান্তে উপনীত হইতেছে। তাহাকে অনেকে বলিয়াছিল "মদন, তুমি একখানি ভাল নৌকা খরিদ কর, আমরা সাহায্য করিব।" মদন বলিত "ই নৌকা খানির প্রত্যেক পরমাণু আমার শরীরের রক্তে পোষিত; ইহার প্রত্যেক কাষ্ঠখণ্ডের সহিত আমার জীবনের কত সুখ দুঃখ জড়িত আছে;—আমি অন্য নৌকা চাহি না। ঐ যে দেখিতেছ সম্মুখের কাষ্ঠখণ্ড ক্ষয়িত হইয়া গিয়াছে—কেন জান?—কত মৃত কত অর্দ্ধমৃত নরদেহ ঐ স্থান হইতে নৌকায় তুলিয়াছি;—কত বাঁচিয়াছে কত বা মরিয়া গিয়াছে। ঐ যে তৃতীয় জানালাটা ভাঙ্গা দেখিতেছ, কেন জান? একদিন একটি স্ত্রীলোকের অর্দ্ধমৃত দেহ উঠাইয়া ছিলাম, অনেক কষ্টে বাঁচাইয়া-ছিলাম, কিন্তু হতভাগিনী পতি পুত্র হারাইয়া পাগলিনীর মত হইয়াছিল, ক্রমাগত ওখান হইতে ঝাঁপ দিতে চাহিত; একটি স্ত্রীলোক তাহার শুশ্রূষায় রাখিয়াছিলাম। সে এবং চেলারা কতবার তাহাকে বাধা দিয়াছে, কিন্তু তাহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে-ছিলাম, কিন্তু একদিন শেষ রাত্রে অতর্কিত অবস্থায়, ওখান হইতে পদ্মায় ঝাঁপ দিয়া মরিয়াছে। এমন কত সহস্র ঘটনা এই নৌকাখানার প্রতি রন্ধ্রে গাঁথা রহিয়াছে,—এখানা আমার বুকের পাঁজর।"

শারদীয়া পূজা সমাগত, আর মাত্র সাত দিন বাকী আছে। মদন ভাল একটি যাত্রীদল পাইল—বহুদূর যাইতে হইবে, তিন দিন পদ্মা বহিয়া প্রায় সমুদ্রের কাছাকাছি যাইবে। মদন ভাবিল, তাহা হইলেও সে প্রতিজ্ঞানুযায়ী সপ্তমীর পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতে পারিবে। মধু ও নবা দাঁড়ি আপত্তি করিল কিন্তু মদন যাত্রীদের সাগ্রহ অনুরোধে সে-দিকে কাণ দিল না। তৃতীয় দিবস যাত্রীদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া সে রাত্রে তাহারা ঘাটেই রহিল এবং তৎপর দিবস প্রাতঃকালে গৃহাভিমুখে রওনা হইল। সে দিন অপরাহ্নে দক্ষিণ দিকে বড় মেঘ উঠিল, সমস্ত রাত্রি আকাশ দারুণ মেঘাচ্ছন্ন। ঘন ঘন বিদ্যুত চমকিতেছিল। পর দিন প্রভাতে আকাশে মেঘে আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল। মদন বলিল "মধু, গতিক বড় ভাল বোধ হইতেছে না, ওরূপ মেঘ প্রায়ই ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হয়।" মধু বলিল—"আজ্ঞে আমি ত পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়া ছিলাম।"

দ্বিপ্রহরের পর অল্প অল্প বাতাস বহিল সঙ্গে সঙ্গে অবিরল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। অপরাহ্নে বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল, এবং রাত্রি হইলে, দিক্‌মণ্ডল ভয়ঙ্কর দৃশ্য ধারণ করিল। উপরে ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশিতে রাত্রির অন্ধকার শতগুণ বর্দ্ধিত হইল; চারিদিকে অপার জলরাশি প্রচণ্ড তরঙ্গে খেলিতেছে, কূল কতদূরে তাহার স্থিরতা নাই, তাহাও সুন্দর বনের জঙ্গলরাশিতে পরিপূর্ণ। কতকগুলি বড় বড় ঢেউ আসিয়া নৌকাখানির উপর সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। তরণীখানি অনেক দিন ধরিয়া এই উত্তাল তরঙ্গমালার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে, এক্ষণে জরাজীর্ণ শ্লথকলেবর; এক একটা দারুণ আঘাতে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে; যেদিন তাহার যৌবন ছিল, কর্ণধার সবল ছিল, তখন সে এ তরঙ্গকে ভয় করিত না; অবহেলা করিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিত। আজি সে বল নাই, সে চক্ষু দৃষ্টি নাই; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সকলি ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। তাহাতে ভীষণ অন্ধকার চারি-দিকে। দাঁড়ি দুজন ভয়ে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে; মধু "কি হবে গো" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। বাত্যার প্রকোপ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল—যেন দারুণ প্রলয় উপস্থিত। মেঘ ও তরঙ্গ গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া গেল, তাহার উপরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি।

একটা দমকা বাতাসে পাল ছিঁড়িয়া গেল—নৌকাখানা ডুবিতে ডুবিতে বাঁচিল। বিকালে তরঙ্গের আঘাত ক্রমশঃ তীব্রতর হইতে লাগিল—একটা আঘাতে পার্শ্বের ভিত্তি-কাষ্ঠ চূর্ণ হইয়া গেল। আর একটা আঘাত হালের দড়ি সশব্দে ছিন্ন করিল। নৌকায় জল উঠিতে আরম্ভ হইল। মদন নবা ও মধুকে আদেশ করিল "আমি নৌকা স্থির রাখিতেছি—তোমরা ক্রমাগত জলসেচন কর।" তাহারা তিন ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত সেচন করিয়া একেবারে নিস্তেজ ও হতচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল। মদন গম্ভীর স্বরে গর্জ্জন করিয়া বলিল "জল উঠাও, নির্ব্বোধ,—প্রাণের মমতা থাকে ত জল উঠাও।" কিন্তু কে শুনিবে? মদন বিস্তর অনুনয়, ভর্ৎসনা, ক্রোধ, তিরস্কার করিয়াও তাহাদের জাগাইতে পারিল না। তখন মদন হাল ছাড়িয়া জলসেচন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার পক্ষে একাকী জল ফেলিয়া নৌকা বাঁচান অসম্ভব বোধ হইল। ক্রমে তাহার শক্তি ক্ষীণতর ও ক্ষয়িত হইতে চলিল। নির্ব্বা-ণোন্মুখ দীপশিখার আলোকের ন্যায় মদনের পূর্ব্ব শক্তি আসিয়াছিল বটে কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রবল বাত্যা নৌকার ছাদখানা সম্পূর্ণ উড়াইয়া লইয়া বহুদূরে নিক্ষেপ করিল। এখন নৌকায় স্থির হইয়া থাকা সুকঠিন। আর তিল তিল করিয়া নৌকাখানা অতল জলে ডুবিতেছে। মদন দেখিল সঙ্গীদ্বয় সংজ্ঞাহীন তখন সেচনী ফেলিয়া তাহাদিগকে দৃঢ় রূপে একখানা তক্তার সঙ্গে বাঁধিল এবং নিজেকেও অন্য তক্তার সহিত বাঁধিয়া পুনরায় জল উঠাইতে লাগিল, যতক্ষণ পারা যায় বাঁচিবার উপায় করিতে হইবে। সে বৃদ্ধ, তাহার জীবন প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু সঙ্গীরা এখনও যৌবনে পদার্পণ করে নাই, তাহাদের পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া মদন অস্থির হইল অবিশ্রান্ত সেচনী চালাইতে লাগিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা, হস্তপদ শিথিল হইয়া আসিতেছে তবু প্রাণপণে জল ফেলিতেছিল। একবার অতিদূরে একটি ক্ষীণ দীপা-লোক জ্বলিতে দেখা গেল—মদন প্রাণপণে চীৎকার করিয়া কহিল "কে আছ—বাঁচাও—আমরা মরিলাম" কিন্তু সে আলো পুনরায় নিভিয়া গেল। যখন তাহার শক্তি সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হইল—মদন সেচনী দূরে নিক্ষেপ করিল—নৌকাখানা একটি প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। সেই কাষ্ঠ খণ্ডের উপরে বদ্ধাবস্থায় মদন ভাসিতে লাগিল;—তাহার কোমল হৃদয় বুঝি চন্দনাকে স্মরণ করিয়া ব্যাকুল ভাবে ক্রন্দন করিতেছিল, তাই বৃদ্ধের শ্মশ্রু বহিয়া অবিরল জল পড়িতেছিল। মদন করযোড়ে ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করিল—পরে সংজ্ঞাহীন হইল।

বেদনার সীমা আছে, ইহা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের দয়ার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবের এত যন্ত্রণা কখনও হইতে পারে না। যাহা সে সহ্য করিতে অক্ষম। নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে সে সংজ্ঞাশূন্য হইবে, তখন বেদনা অনুভব করিতে অসমর্থ।

আলোকটি আবার জ্বলিল, এবার অতি নিকটে; একজন বলিল—"এই যে এইদিকে কি ভাসিতেছে শীঘ্র চল—" তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে, আকাশ প্রায় পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। বায়ু সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ করিয়া নিস্তেজ হইয়াছে। ছোট একখানি ডিঙ্গিতে তাহারা মদনের দেহ উঠাইল, অদূরে মধু ও নবা ভাসিতেছিল তাহাদেরও উঠাইল। একজন বলিল "এই দেখ আমি ঠিক বলিয়াছি কি না। কণ্ঠস্বর শুনিয়াই আমি বুঝিয়াছিলাম।" আর একজন পরীক্ষা করিয়া দেখিল, জীবন আছে—বলিল "এমন ভাল মানুষের কি কখন অপমৃত্যু হইতে পারে? গুরু মহাশয়—বড় আনন্দ বোধ হইতেছে, যে তোমার পূর্ব্বঋণের কথঞ্চিৎ শোধ দিতে পরিলাম।"

মদন সপ্তমীর দিন উষার প্রাক্কালে বাড়ী পৌঁছিল।

শ্রী—

ঠাকুর কাশীনাথ

(সত্য ঘটনার ছায়ায় লিখিত)

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। নীলতোয়া নবগঙ্গা তখন রুদ্ধস্রোতাগত-প্রাণা ধারায় পরিণত হয় নাই। ইহার শ্যামসৈকত তখন বেতসরাজি ও কণ্টকলতা সমাকুল ছিল না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বহরের নৌকা তখন গর্ব্বে পাল তুলিয়া ইহার বক্ষে সলিলরাশি আলোড়নে তরঙ্গ-হিল্লোল সৃজন করিয়া চলিয়া যাইত। কূলে কূলে দেব অর্ঘ্যের পুষ্পরাজি কুড়াইয়া নীলকান্তমণির ন্যায় স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া নবগঙ্গা তখন ভরা যৌবনে ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইত। নবগঙ্গার উভয় কূলেই অনেকগুলি বিশিষ্ট গণ্ডগ্রাম। ইহারই কোন গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে ঠাকুর কাশীনাথের জন্ম। কথিত আছে ইঁহাদের আদিম বাসস্থান কুমারনদের তীরে ছিল। ইঁহার পিতা শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কার্য্যোপলক্ষে নবগঙ্গাকূলে এই গ্রামে আসিয়া এক ব্রাহ্মণগৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণের একটি বিবাহযোগ্যা অসীম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিল, তিনি তাঁহার রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়া পিতা ভ্রাতাদিগের মত জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ মোহিনী কন্যাকে বিবাহ করেন। সে কালে স্বমতে বিবাহ সমাজের পিনালকোডে গুরুতর দণ্ডাই ছিল। তিনি নবপরিণীতা বধূকে লইয়া স্বগ্রামে গেলে সকলে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া কুমারনদী পার করিয়া দেন, তাই পূতঃতোয়া নবগঙ্গাতীরে তিনি স্থায়ী বাসগৃহ স্থাপন করেন। তাঁহার নামে শুষ্কপ্রায়া নবগঙ্গা এখনও গৌরবতোয়া। ঐ বিবাহের অতুল্য ফলস্বরূপ মনীষি কাশীনাথ নবগঙ্গাকূল আলোকিত করেন। তিনি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া স্বীয় যশ চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করেন কিন্তু অর্থাগমের দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। তিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় সংসারে থাকিয়াও সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সংসারের অস্থায়িত্ব ইহার প্রপঞ্চ, ইহার মাদকতা তাঁহার প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত করিত। এই ভববন্ধন হইতে কিসে মুক্তি লাভ হয়, কিসে সেই সত্যসনাতন চিন্ময়পুরুষে আত্মলীন হয়, কাশীনাথের তন্ময়চিত্তে কেবল সেই চিন্তা। তিনি বিশ্বেশ্বরকে মহাশক্তিরূপে চিন্তা করিয়া শক্তির উপাসক ছিলেন। "একৈ বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কামমপরা" এই উক্তিবাদিনী বিশ্বশক্তিকে দশভুজা মূর্ত্তিরূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার বিশ্বাস মত উপাসনা করিতেন। তাঁহার জীবনের একটি মাত্র ঘটনার আমরা উল্লেখ করিব। তাঁহার ধর্ম্মের সহিত অসত্য মিশ্রিত ছিল বলিয়া সকলের সহানুভূতি না থাকিতে পারে কিন্তু তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া ভক্তিপ্রণতচিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল; যে অমূল্য বিশ্বাস হৃদয়ে পাইয়াছে সে পরম রত্ন পাওয়ার অধিকারী হইয়াছে।

কাশীনাথ প্রতিবৎসর শারদীয়া দুর্গা পূজা করিতেন। স্বীয় হস্তে মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা করিতেন। সাধারণ তণ্ডুলের অন্ন ও বনজখাদ্যদ্রব্যে ভোগ নিবেদিত হইত। কাশীনাথের পর্ণ-কুটীরের সম্মুখে বিশালসলিলা খরস্রোতা নব-গঙ্গা। শত সহস্র নৌকা পূজার আনন্দে যাত্রীবক্ষে লইয়া ছুটিত। নিকটস্থ গ্রামে ধনী-গৃহে মহাসমারোহে শারদীয়া মহাপূজা হইত। নৃত্য-গীতাদিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত। শরতের সুবিমল আকাশছবি নবগঙ্গার নীলজলে পড়িয়াছে; ভুবনমোহন শশাঙ্ক সেই কালো জলে মুখ লুকাইয়া জগতে শক্তিপূজা দেখিতেছেন, পাছে তাঁহার কোমল মুখের দিকে চাহিয়া শক্তি সন্তান অশক্ত হইয়া পড়ে। শত সহস্র ছাগ মহিষরক্তে নবগঙ্গার নীলজল রক্তবারিতে পরিণত হইয়া জয়মাল্য স্বরূপ রক্তজবা পরিয়া ছুটিতেছে। পশুরক্তে বসুন্ধরা সিক্ত। মহাশাক্ত উচ্চরবে ডাকিতেছেন, "দংষ্ট্রা করালবদনে শিরোমালা বিভূষণে চামুণ্ডে মুণ্ড মথনে নারায়ণি নমস্তুতে"। সেই শারদীয় পূজাকালে শক্তিপুরের স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী শূরনারায়ণ দেব নৌ-বিহারে বহির্গত হইয়া এই গ্রামে আইসেন ও ঘণ্টাবাদ্যে দুর্গোৎসব হইতেছে শুনিয়া কাশীনাথের পর্ণকুটীরে সমাগত হন। বিশিষ্ট অতিথির আগমনও কাশীনাথের ধ্যান ভাঙ্গিতে পারিল না। তিনি তখন হৃদয়ের নিভৃতরাজ্যে "অতসী পুষ্প বর্ণভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং" মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছিলেন। অতিথিশ্রেষ্ঠ নির্নিমেষনেত্রে পরম ভক্তের ভক্তি দেখিয়া বিমোহিত। পূজান্তে ঠাকুর কাশীনাথের সমীপস্থ হইয়া প্রথমে ও পরে ব্রাহ্মণের পদে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রার্থনা করিলেন "আপনি উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি দেবোত্তর গ্রহণ করিয়া মায়ের অর্চ্চনা করুন।" তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণ ঘৃণার সহিত প্রার্থনা উপেক্ষা করিলেন। পরে রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে একটি করিয়া মহিষ বার্ষিক লইতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু রাজার সহিত এই সর্ত্ত করিলেন যে নবমী পূজার দিন যথাসময়ে তিনি "মহিষ" পাঠাইয়া দিবেন।

কয়েক বৎসর গত হইল। এবারে নবমী পূজার তিথি বড় অল্প, ৯ দণ্ডের মধ্যে পূজা সমাপন করিতে হইবে। কাশীনাথ দেবীর উদ্বোধনান্তে মহিষ বলির সঙ্কল্প করিয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু নবমী গতপ্রায়, "মহিষ" আসিল কোথায়? অশিক্ষিত মহিষ রক্ষক তিথির মূল্য বোঝে কি? সে আপনার সুবিধামত মহিষ আনিতেছে, এদিকে বেলা ৮ দণ্ড অতীত। হায়! হায়! কাশীনাথের সঙ্কল্প ভঙ্গ হইবার উপক্রম। কাশীনাথ কাঁদিয়া বলিলেন "শিবশক্তি সংহারিণি! এ আবার কি পরীক্ষা? কুশাসন হইতে উঠিয়া ধর্ম্মপত্নীর নিকট গেলেন, তিনি ভোগ রন্ধন করিতেছিলেন। কাশীনাথ কাতর কণ্ঠে বলিলেন "সর্ব্বনাশ হইল! আমার সঙ্কল্প ভঙ্গ হইল। এতদিনে মহামায়া সত্যভ্রষ্ট করিলেন! মহিষের ত সংবাদ নাই, এখন উপায়?" ব্রাহ্মণী সগর্ব্বে উত্তর দিলেন, "ইহার অন্য ব্যবস্থা কি?" কাশীনাথ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন "মহিষের পরিবর্ত্তে নরবলি।" তখন দৃঢ়তার সহিত গৃহিণী বলিলেন, "তোমার ত ৪টি পুত্র আছে, একটি বলি দাও। জ্যেষ্ঠ অবধ্য; মধ্যম পুত্র নবকুমারকে তখন নবগঙ্গাসলিলে স্নাত করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আনয়ন করা হইল। সমস্ত গ্রাম এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে টলটল! আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটিয়া আসিল। কাশীনাথ জবা-মাল্য গলে পরাইয়া রক্ত চন্দন অনুলেপন করিয়া সন্তানকে দেবী-সম্মুখে আনয়ন করিলেন। সন্তান দেবী-চরণে উৎসর্গ করিলেন। শাণিত খড়্গ উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "অসির্ব্বিবসনো খড়্গ তীক্ষ্ণধার দূরা সদঃ। স্ত্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপালো নমস্তুতে।" তপ্ত কাঞ্চন-নিভ সুকুমার সন্তানের কণ্ঠ সর্ব্বসংহারী হাড়কাষ্ঠে দিলেন। শাণিত খড়্গ পুনরায় উত্তোলিত। কোথায় নবকুমার! হায়! হায়! নবকুমারের কমনীয় দেহ দ্বিখণ্ডিত! শোণিত-ধারে বসুধা সিক্ত। ছিন্ন শির হইতে মহাতেজে রক্তবাণ ছুটিতেছে! অপর পার হইতে চীৎকার শোনা গেল, "মহিষ পার করিয়া লও।" আর মহিষ! করালিণী মহাবলি গ্রহণ করিয়াছেন, মহিষ লইলেন না—

"বনের মহিষ অজা মায়ের বাছা
মা সে বলি লন্ না।
যদি বলি দিতে আশ স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিষয়-বাসনা।"

শূরনারায়ণ মহিষ বন্ধ করিয়া দিলেন।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীন কুসান বংশীয়ের সময় নিরূপণ

যাঁহারা ইতিহাসাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস একপ্রকার নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। আমাদের প্রাচীন পিতামহেরা চিরদিন ধর্ম্মশাস্ত্রের ও দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। ঐহিকের কথা ভাবিবার বা লিখিবার তাঁহাদের বড় একটা অবসর ছিল না। চিরদিন পরলোকের ভাবনা ভাবিয়াই কাটাইতেন। কিন্তু পরলোকের ব্যাপারটা বরাবরই ভগবান নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন; চিরকালই উহা দুর্জ্জেয় রহস্যে পরিপূর্ণ। সেই জন্য যে ঋষির যতটা কল্পনা-শক্তির প্রাচুর্য্য, তিনি উহাকে সেই ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। এই-রূপে 'নানা মুনির নানা মত' হওয়াতে আমাদের হিন্দু ধর্ম্ম সহস্র সহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়া লোক সংখ্যা অপেক্ষা উপধর্ম্মের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। এরূপ অবস্থায় চিরদিন যাহা হইয়া থাকে, ভারতে তাহাই হইয়াছিল। একতার মূলে নিদারুণ কুঠারা-ঘাত হইল। ভারতের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইল।

আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁহারা প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার প্রশংসার কথা শতমুখেও শেষ করিতে পারেন না। তাঁহাদের এই স্বদেশ-প্রীতি বিশেষ প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, কি জন্য যে আমাদের প্রাচীন আর্য্য পিতামহগণ প্রশংসনীয় তাহা তাঁহারা আদৌ জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা মনে করেন, আমাদের পিতামহেরা যখন ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহারা মহাপুরুষ ছিলেন। এপ্রকার অন্ধ ভাবকে কি বলিব তাহা বলিতে পারি না।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতা কি প্রকার ছিল, ঐ সভ্যতার জন্য ভারত অপর দেশের নিকট কতদূর ঋণী, অন্য কোন ও প্রাচীন জাতি ভারতের নিকট কোনও বিষয়ে ঋণী কিনা, প্রভৃতি কথার অনুসন্ধান এদেশের লোক কোনও দিন বড় একটা করেন নাই। 'আমরা প্রাচীন সভ্য জাতি' এই কথাটি বেশ আঁটিয়া ধরিয়া আমরা বরাবর খুব আরামের সহিত বিশ্রাম করিয়া আসিতেছি। আমরা যে প্রাচীন কালে কেন বড় হইয়াছিলাম, বড় হইবার জন্য আমাদের পিতামহেরা কি ভাবে কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার পর কিজন্য আমাদের পতন হইল, প্রভৃতি বিষয় আমরা কোনও দিন আলোচনা করি নাই। আবার জাগিতে হইলে এই সব কথা যে প্রথমেই জানিতে হইবে তাহা আমরা প্রায় ভাবি না। জাতীয় উত্থানের প্রথম সোপান যে ইতিহাস তাহা আমরা কোনও দিন শিখি নাই। 'আমরা বড় ছিলাম' ইহা জানিয়াই আমরা বেশ আরাম অনুভব করিতেছি। এবং আমরাও যে বড় তাহাই দশমুখে প্রমাণ করিতেছি। লক্ষপতির দরিদ্র পুত্র পিতার অবস্থার কথা ভাবিয়া যদি লক্ষপতির চালে চলিতে যায় তাহা হইলে লোকে তাহাকে বাতুল ভিন্ন আর কিছু মনে করিবে না। আমাদের অবস্থাও অনেকটা সেই রকম।

আমাদের দেশে অনেক ভদ্র লোক আছেন, যাঁহারা কথায় কথায় প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ইংরাজ হইতে ভারতের বিন্দুমাত্র উপকার হয় নাই। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে আবার এ প্রকার গোঁড়া যে; তাঁহাদের ভ্রম নিরাকরণের আশায় প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গেলে প্রায়ই গালাগালি খাইতে হয়। এই জন্য আমি ইহাঁদিগকে অতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, "হে সর্ব্বজ্ঞ; আমরা যে একদিন বাস্তবিকই বড় ছিলাম, জগতের অনেকেই যে একদিন আমাদের পিতামহ-গণের চরণতলে বসিয়া ধর্ম্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন, তাহা আপনাকে কে বলিয়া দিল? যে বেদের উপর আপনার হিন্দুধর্ম্ম দণ্ডায়মান সেই বেদকে বিস্মৃতির অতল সমুদ্র হইতে কে উদ্ধার

করিল? ইংরাজ নয় কি? আপনার দেশের মৃত্তিকা-স্তূপ, ভগ্ন শিলা খণ্ড, বিস্মৃতপ্রায় গহ্বর হইতে আপনার পূর্ব্ব-পুরুষ-দিগের কাহিনী কে বাহির করিল? আপনার দেশের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিবার জন্য কে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে জঙ্গলে জঙ্গলে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বেড়াইয়াছেন? আপনি কি এজন্য কখনও গৃহিণীর আঁচল ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইয়াছেন? কিন্তু ধন্য আপনার কৃতজ্ঞতাকে! এই ইংরাজ আপনার দেশের প্রাচীন ইতিহাসের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, এই যে আপনার লুপ্তপ্রায় দুর্ল্লভ গ্রন্থাদি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে আপনার সুকোমল করে অর্পণ করিতেছেন, তাহার জন্য কি আপনি কখনও ইংরাজকে বিন্দুমাত্র প্রশংসা করিয়াছেন? বরং দশজনের কাছে হাত মুখ নাড়িয়া বলিয়া বেড়াইয়াছেন যে, আর হিন্দুধর্ম্ম রহিল না। ম্লেচ্ছগুলা পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থসকল স্পর্শ করিয়া এক-বারে সর্ব্বনাশ করিয়া দিল।

এইবার আসল কথা। আজ দুইচারি বৎসর হইতে আমাদের দেশের স্রোত যেন অনেকটা সুপথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। গভীর নিদ্রার পর এখন যেন জাগরণের চিহ্নসকল ক্রমে ক্রমে অনুভূত হইতেছে। আমরা বাজে কথা ছাড়িয়া এখন কাজের কথায় মনোনিবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। নবেল, উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে আজ কাল দুই চারিখানি ইতিহাস দেখা গিয়াছে। যোগেন্দ্র-নাথ, নিখিলনাথ, অক্ষয়কুমার, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গমাতার সুসন্তান প্রভূত অর্থব্যয় ও বিষম কায়িক শ্রম অগ্রাহ্য করিয়া কয়েকখানি অমূল্য রত্ন দ্বারা জননী বঙ্গসাহিত্যের নিরাভরণ অঙ্গকে ক্রমে ক্রমে সুশোভিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তবে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে আজ পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যে কেহই প্রাচীন ভারত ও বঙ্গ ইতিহাসের প্রতি মনোযোগ করেন নাই। এসম্বন্ধে য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কয়েক বৎসর হইতে যে প্রকার অমানুষিক পরিশ্রম করিতেছেন তাহা দেখিয়া তাঁহা-দিগকে শত মুখে প্রশংসা করিলেও অত্যুক্তি হয় না। এসম্বন্ধে তাঁহারা যখন এতদূর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিতেছেন, তখন আমাদিগের আর নীরব থাকা কি ভাল দেখায়? প্রাচীন ভারতের কয়েকটি অজ্ঞাত কাহিনী যাহাতে আমাদের জনসমাজে প্রচারিত হয় সেই উদ্দেশেই আজ এই অধম লেখক উপস্থিত হইয়াছেন। যদি ভবিষ্যতের কোনও প্রতিভাবান লেখক প্রাচীন ভারত-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার সময় আমার এই প্রবন্ধ হইতে সামান্য মাত্রও সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে লেখক নিজকে নিতান্ত সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিবেন। সকলেই জানেন, কোনও সময়ে সামান্য কাঠবিড়ালী সমুদ্রকে বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সামান্য তৃণ একত্র সম্মিলিত হইলে মত্ত হস্তীকে আবদ্ধ করিতে পারে! এই ভরসাতেই মাদৃশ লেখকের আসরে অবতীর্ণ হওয়া।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অতি নিবিড় অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা ভারতের প্রাচীন সভ্যতায় মুগ্ধ হইয়া আমাদের ইতিহাসকে বিস্মৃতির সুগভীর কবর হইতে উদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন। তাঁহাদের অদ্ভুত অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে এখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য বুদ্ধির সুতীব্র রশ্মিতে ভারতের অন্ধকারময় হিন্দুযুগের ইতিহাস এখন ধীরে ধীরে আমাদের চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। আজ আমরা য়ুরোপীয় পণ্ডিত-গণের অধ্যবসায়-প্রসূত কয়েকটি ফল পাঠক-বর্গকে সাদরে উপহার দিতে অগ্রসর হইলাম।

বিশেষ অনুসন্ধানের পর স্থির হইয়াছে যে প্রাচীন ভারত ইতিহাসকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—ঃ (১) মৌর্য্য-বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্ব কাল। (২) কুসান-বংশীয় ভূপতিগণের রাজত্ব কাল। (৩) গুপ্ত বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্ব কাল। (৪) রাজপুত জাতীয় হর্ষবর্দ্ধন ও তদ্-বংশীয় রাজাগণের রাজত্ব কাল।

মৌর্য্য-বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল সম্বন্ধে

এক প্রকার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ সার উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones) সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ঐ বংশ সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এখনও পর্য্যন্ত তাহাই প্রবল আছে। গুপ্ত রাজাগণের সময় নির্দ্ধারণ লইয়া এক সময়ে য়ুরোপীয় ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পর্য্যন্ত সবিশেষ বাদানুবাদ চলিয়াছিল। অবশেষে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতবর ফ্লীট্ সাহেব এই প্রশ্নের শেষ মীমাংসা করেন। ঠিক ঐ সময়ে সিসিল বেন্ডেল (Cecil Bendell) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ হর্ষবর্দ্ধন ও তাঁহার প্রচলিত অব্দের সময় নিরূপণ করিয়া প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের আর এক পরিচ্ছেদ যোজনা করেন। ভারতের এই অন্ধকার যুগ আবিষ্কারকার্য্যে য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। যতদিন ভারতের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের এই নিঃস্বার্থ কার্য্যের কথা সুবর্ণাক্ষরে ভারতের প্রত্যেক নিরপেক্ষ অধিবাসীর হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবে।

ভারতের তিন যুগের সময় এক প্রকার নিঃসন্দেহ ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একটি যুগের, কথা আজ পর্য্যন্ত নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। য়ুরোপের কয়েকজন পুরাতত্ত্ববিদ্ অনেক দিন হইতে কুসান বংশীয় ভূপতিগণের সময়-নির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে যৎপরোনাস্তি যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সুনিশ্চিত ভাবে কোন কথার মীমাংসা হয় নাই। একজন আজ যাহা স্থির বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিতেছেন, কাল তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। এ সম্বন্ধে যতই তর্ক-বিতর্ক চলুক না কেন, ইহা স্থির ভাবে মীমাংসীত হইয়াছে যে, কুসান ভূপতিরা মৌর্য্যদিগের পতনের পর ও গুপ্ত বংশীয়গণের আবির্ভাবের পূর্ব্বে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মৌর্য্যেরা খৃষ্টের জন্মের প্রায় দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল ছিলেন। গুপ্ত রাজাগণের প্রথম ভূপতি ৩২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাহা হইলে কুসানেরা এই পাঁচশত বৎসরের কোনও সময়ে যে ভারতে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রাচীন মুদ্রা, তাম্র ও শিলালিপি, ও প্রাচীন পুরাণসকল অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় যে, এই বংশে অন্যূন পাঁচ জন নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে এই পাঁচ জনের মধ্যে কনিষ্ক সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ক কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী নৃপতিগণের নাম ও সময় সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস নীরব। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ইতিহাস লেখকেরা এ পর্য্যন্ত যে সকল কথা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, আমরা বারান্তরে তাহা আমাদের পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিব।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

ধর্ম্মের জয়

(২৪)

অজিত একদা শনিবার সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে গৃহে ফিরিবার সময় সোজা পথে না গিয়া রায়-বস্তির মধ্য দিয়া যাইতেছিল। মিঃ রায় একটা স্থান কিনিয়া তাহার 'রায়-বস্তি' বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। সেই স্থানের দুই পার্শ্বে বড় বড় একতালা দোতালা ব্যারাকের মত গৃহ-শ্রেণী করিয়াছিলেন। তাহাতেই তাঁহার কারখানার কুলিরা পরিবার লইয়া বাস করিত। অনেক নিম্ন শ্রেণীর ও উচ্চ শ্রেণীর কারখানার কর্ম্মচারীও সপরিবারে সেই স্থানে বাস করিত। সেই স্থানে সকল প্রকার জাতিই বাস করিত। হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী মান্দ্রাজী পার্শি সকল সম্প্রদায়ই ছিল। তাহারই নিকট কয়েকখানি ক্ষুদ্র দোকান ছিল। একটি দোকানে চাল, ডাল, লবণ ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি; ভেজাল তৈল ও ঘৃতের অভাব ছিল না। পাশেই অন্য দোকানে পান বিড়ি সিগারেট তামাক দোক্তা ইত্যাদি বিক্রয় হইত। একটি বস্ত্রের দোকানও ছিল। তদ্ভিন্ন সেই রায় বস্তির সীমার ঠিক বাহিরেই একটি সুরার বিপণী ছিল। অজিত শুনিয়াছিল কুলিরা প্রত্যেক শনিবারে বেতন পাইয়াই প্রথম সেই সুরার দোকানে প্রবেশ করে, তারপর যাহা পারে ব্যয় করিয়া, পূর্ব্বের ঋণ পরিশোধ করিয়া বাকি সামান্য যা থাকে তাহাতেই সংসার খরচ চালাইবার জন্য গৃহে লইয়া যায়। বাকি কয়েক দিন তাহাদের অতি কষ্টে চলে। অজিত তাই আজ শনিবার দিন সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবে বলিয়াই আসিয়াছিল।

অজিত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে নিকটবর্ত্তী গৃহসমূহ হইতে নানাপ্রকার কণ্ঠধ্বনি, চীৎকার ক্রন্দন শ্রুত হইতে লাগিল। সে যে গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহা একজন সর্দ্দার কুলির; সে সপ্তাহে চারি টাকা বেতন পায়। তাহার স্ত্রী ও কন্যা সেই কলে সুতা পাকাইবার কাজ করে। বৃহৎ কল, তাহাতে নানাপ্রকার কার্য্য হয়। সুতা হয়, বস্ত্র হয়, মোজা গেঞ্জি হয়, নানা বিভাগ আছে। অজিত দেখিল যে রামু সর্দ্দারের স্ত্রী তাহার কন্যার কেশ ধরিয়া টানিতেছে ও বলিতেছে,

"কেয়া তেরা পয়সা কিধার গিয়া? বদমাস ছোকরি পয়সা নিকাল, নোকরি করকে হামরা জান নিকাল গিয়া আর তু পয়সা পাতি আর উড়ায় দেতি! নিকাল পয়সা।" কন্যা বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে। "পয়সা হামরা পাস নেহি হ্যায়, খরচা হো গিয়া।"

মাতা "কাহে খরচা করা বোল" বলিতে বলিতে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করায় কন্যা হাত ছিনাইয়া দূরে পলাইয়া গিয়া একখণ্ড বস্ত্র দেখাইয়া বলিল, "যা দেখ তু অন্ধি হ্যায়, চোলি না হোনে সে কেয়সা কারখানা পর যায়েগি? তুভিত কামাই করি, তু পয়সা কেয়া করি?"

মাতা "আজ তোকো এক মুঠা খানেকে লিয়ে নেই দেঙ্গে। ও বুড্ডা ভি সরাপ পিকে কি ধার গিয়া পড়া হ্যায়। আজতো দুনো কো হাম খানেকে নেই দেগা, ও যে বুড্ডা আতা হ্যায়।" রামু সর্দ্দার সুরা পানে বিহ্বল হইয়া সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল;—

"কেয়া বিবিজী এত্তা গলাবাজী কাহে কো করতি হ্যায়? দিল খুস হ্যায়?"

তাহার স্ত্রী উন্মত্তের মত তাহার দিকে ছুটিয়া আসিয়া এক ধাক্কা দিয়া বলিল, "কেয়া হামকো বিবিজী বানায়া? তেরা মা বহিন বিবিজী হোয়। যো পয়সা কেটড়ি কি ধার রাখিয়া!—নিকাল!" রামু সর্দ্দার ভীত ভাবে জামার পকেটে হাত দিল,

একটি আটআনা তুইটি চারআনা ও কয়েকটি পয়সা বাহির হইল। সে হপ্তায় ৪৲ টাকা পায়, বাকী সব সুরার দোকানে গিয়াছে। তাহার স্ত্রী সেই পয়সা-গুলি লইয়া তাহাকে এমন সজোরে পুনরায় ধাক্কা মারিল যে সে প্রথমে টলিতে টলিতে শেষে মুখ থুবড়াইয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। আর উঠিল না; সে খানিকটা হাত পা নাড়িয়া অচেতনের মত শুইয়া রহিল।

অজিত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, এই দরিদ্রদিগকে ভাল করিবার কি কোনও উপায় নাই? সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে ভীষণ চীৎকার শুনিল।

"আরে মার ডালা হো, জান গিয়ারে, বাপরে মারে।" সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া দেখিল তাহাদের কলের কালু চর্ম্মকার তাহার স্ত্রীকে ভীষণভাবে প্রহার করিতেছে ও বলিতেছে;—

"রূপেয়া নিকাল, নেইতো তেরা জান লেগা।" তাহার চীৎকারে চারিদিকের লোক ছুটিয়া আসিয়াছে। অজিতকে দেখিবামাত্র সকলে একটু সরিয়া গেল, ভীষণমূর্ত্তি কালুও স্ত্রীকে ছাড়িয়া দূরে দাঁড়াইল। কালুর স্ত্রীর কি মূর্ত্তি! চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানায় চারিদিকে চুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নাসিকা দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে ও বলিতেছে "আরে বাপরে সয়তান মেরা জান লিয়ারে" ইত্যাদি। অজিত কালুকে বলিল;—

"তুম কাহে এইসা কাম করা? তুমতো আফিস মে কভি কুছ নেহি করতা। আপন আওরাতকো কাহে মারো? কাল হাম সাহেবকো বোলেগা।" কালু ভীতভাবে বলিল "নেই হুজুর নেই বোলো। এ বহুত খারাপ হ্যায়। যেতনা পয়সা কৌড়ি রোজগার হোতা সব পিয়ামে যাতা হ্যায়, এয়সা হোনেসে গরিবকো জান ক্যায়সা জিয়েগা?" শুনিয়া অজিত স্তম্ভিত হইল। স্ত্রীলোকের সুরাপানের জন্য এত দুর্দ্দশা! এই প্রকার প্রহারে জর্জ্জরীভূত হইতেছে, তবু অভ্যাস ছাড়িবে না, আশ্চর্য্য! আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিল একটি ছয় সাত বৎসরের বালিকা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া একটি দুই বৎসরের নগ্ন বালকের হস্ত ধরিয়া ও অপর হস্তে একটি বোতল ধরিয়া সুরা বিপণীর দিকে যাইতেছে। অজিত তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাইতেছ?" বালিকা ভীতভাবে ছিন্ন-বস্ত্রে বোতল ঢাকিয়া বলিল, "মা দোকানে পাঠাচ্ছে, মদ আনতে যাচ্ছি।"

অজিত বলিল, "তোমার মা নিজে কেন গেল না?"

বালিকা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "আজ মা সারাদিন পড়ে আছে, আর কেবল এইটে খাচ্ছে, আজ আরও অনেকবার এনেছি।'

অজিত বলিল, "তুমি ভাত খাওনি?"

বালিকা বলিল, "আজ রান্না হয়নি; কে রাঁধবে? বাবা আজ বাড়ীই আসেনি, মা পড়ে আছে। দুটি বাসি ভাত ছিল তাই আমরা খেয়েছি।" ছোট বালকটি কাঁদিয়া উঠিল, বালিকা তাহাকে থামাইতে থামাইতে বলিল, "দুখুরে ক্ষিদে পেয়েছে। দুখু কাঁদিসনে, আমি গিয়ে যেমন করে পারি রাঁধবো, চল।" অজিত বালিকার হস্তে কয়েকটি পয়সা দিয়া বলিল, "তোমরা এতে কিছু কিনে খেয়ো।" তারা দুজনে পয়সা ক'টি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেল। এমন সময় সম্মুখে দুইটি অষ্টম বর্ষীয় বালক একটা বোতল লইয়া কাড়া-কাড়ি করিতেছে দেখিয়া অজিত সেই দিকে গেল। অজিত তাহাদের নিকট গিয়া জানিল যে তাহারা সেই বোতলের পানীয় খানিকটা পান করিবে তাই এত কাড়াকাড়ি! প্রশ্ন করিয়া জানিল যে তাহারা তাহাদের পিতার জন্য ইহা লইয়া যায় ও প্রত্যহই পান করে। অজিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেদিক হইতে ফিরিয়া যেদিকে অপেক্ষাকৃত ভদ্র পরিবার বাস করে সেই দিকে গেল। কিয়দ্দূর যাইবার পর সম্মুখে একটি সুপরিস্কৃত আটচালার সম্মুখে স্যামুয়েল দাস বলিয়া একজন কর্ম্মচারীকে দেখিয়া দাঁড়াইল। স্যামুয়েল দাস খৃষ্টান। মিঃ রায়ের আফিসে কেরাণীর কাজ করিয়া মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পায়। তাহারা দুই ভাই ও একটি দাসী সেই গৃহে বাস করে। গৃহটি সুন্দর সুপরিস্কৃত। বাটীর সম্মুখের জমিতে কয়েকটি ফুল গাছে ফুল ফুটিয়াছে। গৃহের প্রাঙ্গণ সুমার্জ্জিত। বারান্দায় দুচারিটি বেত্রাসন রহিয়াছে, একটি টিপাইয়ার উপরে কয়েক খানি পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা রহিয়াছে। অজিতকে দেখিয়া স্যামুয়েল নমস্কার করিয়া বলিল "আসুন আপনি এধারে যে।" অজিত বারান্দায় উঠিয়া একটি বেত্রাসনে বসিয়া বলিল,—

"একবার শনিবারের অবস্থা দেখ্তে এলাম। স্যামুয়েল তোমাদের পাড়ার বড়ই শোচনীয় অবস্থা"।

স্যামুয়েল। কি কর্‌ব বলুন? কোনও উপায় নাই। শনিবার সন্ধ্যার সময় যে কি ভীষণ গোল হয় তাহা বলে জানাবার নয়। মিঃ রায় যদি কোনও উপায়ে ঐ সুরা বিপণী দূর করে দিতেন।

অজিত। সুরা-বিপণী মিঃ রায়ের অধীনে নয় তিনি কি কর্‌বেন? যদিও সুরা-বিপণী দূরে যায়, তবে এইটেই ত একমাত্র দোকান নহে যারা সুরা না হলে থাকে না তারা অন্যত্র যাবে। এমন কোনও উপায় কি নাই যাতে ওদের এই দোষ ছাড়ান যায়?

স্যামুয়েল। কি করা যায় বলুন।

অজিত। আমি আস্‌তে আস্‌তে ভাব্‌ছিলাম, এই অশিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন কর্‌লে কেমন হয়?

স্যামুয়েল। বেশ হয়, কিন্তু পড়ায় কে?

অজিত। এই ধর তুমি ও আমি দুজনে মিলে করি। তোমার ভগিনী সারাওত শুনেছি বেশ শিক্ষিতা, তিনি যদি মেয়েদের জন্য কিছু করেন।

স্যামুয়েল। সারাকে ডাক্‌ব?

অজিত। ক্ষতি কি? একবার জিজ্ঞাসা করে দেখি, তারপর মিঃ রায়কে আমি এ বিষয় বল্‌ব। কাল পরশু হইতেই কার্য্যারম্ভ কর্‌ব। এতগুলি জীবন নষ্ট হচ্ছে একি দেখা যায়?

স্যামুয়েল ধর্ম্মবিশ্বাসী খৃষ্টান-তনয়, তাহার পতিত উদ্ধারের বাসনা জাগিয়া উঠিল; সে ডাকিল—

"সারা সারা শুনে যাও।" সারা স্যামুয়েলের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এখনো অবিবাহিতা। তাহার বিবাহ স্থির হইয়া আছে, সেই স্থানেরই আর একজন খৃষ্টান যুবকের সহিত স্থির আছে, কিন্তু কোনো কারণে সারার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় এ পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। সারা আসিয়া অজিতকে নমস্কার করিল, স্যামুয়েল বলিল,—

"সারা, অজিত বাবুর নাম শুনেছ, ইনি আমাদের কারখানার বাবু। আজ এধারে এসে এখানকার দুর্দ্দশা দেখে এঁর মন বড় বিচলিত হয়েছে। ইনি বল্‌ছেন এ পাড়ার পুরুষদের জন্য ইনি একটি নৈশ বিদ্যালয় কর্‌বেন। তুমি কি স্ত্রীলোকদিগের জন্য কোনও উপায় করতে পার্‌বে"?

সারা কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "আমি চেষ্টা করে দেখ্‌ব, যদি পারি ত কাল উত্তর দিব"।

স্যামুয়েল। "অজিত বাবু কাল হতে এখান-কার পুরুষদিগের শিক্ষার উপায় কর্‌বেন। আমাদের বাটীতে স্থান বেশী নাই তবে কাল হতে এখানেই আরম্ভ হবে, পরে সুবিধামত অন্য ব্যবস্থা করে নিতে হবে। তবে কেহ যোগ দিবে তাহা ত আমার মনে হচ্ছে না! কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি?" অজিত বিদায় লইবার সময় বলিয়া গেল "আচ্ছা কাল আমি ঠিক সময়ে আস্‌ব, তুমি অন্ততঃ দুচার জন লোকও ঠিক করিয়া রেখ।"

তার পরদিন সন্ধ্যার সময় অজিত আসিয়া দেখিল, স্যামুয়েল বারান্দায় একটি মাদুর বিছাইয়া রাখিয়াছে, ও দুতিন জন লোক সেখানে বসিয়া আছে, অদূরে রামু সর্দ্দার বসিয়া ঢুলিতেছে। অজিত সেদিন কয়েকখানি গল্পের বই ও একখানি ছবির বই আনিয়াছিল। সেই গল্পের বই হইতে তাহাদের গল্প বলিতে লাগিল, তাহারা একমনে সেই গল্প শুনিতে লাগিল, ও ছবি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইল। সে দিন প্রায় ঘণ্টা খানেক সে স্থানে থাকিয়া অজিত

তাহাদিগকে বলিল, "তোমরা নিজেরা যদি পড়তে শেখ এই সব বই পড়িয়া কত আমোদ পাবে, এতে কত ভাল ভাল গল্প, কত ভাল কথা আছে।" এ এক ব্যক্তি বলিল, "কে আমাদের পড়াবে বাবু, গরিব মানুষ দিনভর খাটতে হয়, পড়বার সময় কই?"

অজিত। তোমরা যদি পড় ত আমি এসে পড়াব, আর এই স্যামুয়েল বাবুও পড়াবেন। তাহারা সকলেই উৎসাহের সহিত বলিল, "হাঁ বাবু আমরা পড়ব, কিন্তু বই কোথায় পাব?"

অজিত। আমি বই, শ্লেট সব এনে দেব, তোমাদের ছোট ছোট ছেলেদেরও এনো। তোমরা যদি সকলেই শেখো, ক্রমে ক্রমে আমি একটি স্কুল করবার চেষ্টা করব।

এক ব্যক্তি বলিল, "আচ্ছা বাবু আমরা কাল আরও লোক ডেকে আনবো।"

অজিত। কাল আমি তোমাদের তামাসা দেখাব। নানা রকমের ছবি দেখাব, মস্ত বড় বড় ছবি। কাল যত লোক পার এনো। অজিত চলিয়া যাইবার পর, তাহারা গৃহাভিমুখে ফিরিবার সময় বলাবলি করিতে লাগিল,—

"লেখা পড়া না শিখলে কিছু জ্ঞান হয় না? অজিত বাবু কত ভাল।"

অজিত পরদিন সকালে শিশিরের নিকট গিয়া বলিল, "আমায় একটা জিনিস দিতে হবে।"

শিশির হাসিয়া বলিল "তোমায় আমার কি অদেয় আছে?"

অজিত বলিল, "তোমার ম্যাজিক লণ্ঠনটা দিতে হবে, কাল কারখানার সব লোকদের দেখাব।"

শিশির। কোথায় দেখাবে?

অজিত। বস্তিতে। আমি আজ কাল সন্ধ্যাবেলা সেখানে যাব স্থির করেছি। লোকগুলা শুধু নেশা করে, আর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অত্যাচার করে।

শিশির। রোজ যাবে তাহলে আমার দশা কি হবে?

অজিত। এখন দিনকত যাই, গিয়া যা হয় একটা-কিছু ব্যবস্থা করব। যদি সুবিধা করতে পারি মিঃ রায়কে বলে একটা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করব।

শিশির। অজিত তোমার মাথায় এতও আসে।

অজিত। আমাদের দ্বারা যদি কারো উপকার হয়, তাকি করা উচিত নয়?"

শিশির। যদি পার ত কেন করবে না? সকলেই কি পারে? সবাই একটা না একটা আপত্তি উত্থাপন করে বসবে।

এমন সময় ইলা সেই স্থানে আসিল। অজিতকে সেখানে দেখিয়া লজ্জায় তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে চলিয়া যাইতেছিল, শিশির তাহাকে ডাকিয়া বলিল;—

"ইলা শুনে যা অজিত কি করবে। যত ছোট লোকদের নিয়ে রাত্রে স্কুল করবে। তারা মদ খায় মারপিট করে, অজিত তাদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করবে।"

ইলা মৃদু কণ্ঠে বলিল, "বেশত।"

শিশির বলিল, "তাহলে তুইও যা না বেশ শেখাতে পার্ব্বি, গান বাজনা কত কি শেখাবি।"

ইলা বলিল, "আমি আর কি জানি যে শেখাব। তবে বাবা যদি গরিবদের জন্য একটি স্কুল করে দেনত বেশ হয়।"

শিশির হাসিয়া বলিল, "এই দেখ অজিত তোমার দল ভারি হল! ইলা তোমার দিকে।"

অজিত একবার চকিতের মত দৃষ্টিতে ইলার প্রতি চাহিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিল।

"তোমার ম্যাজিক লণ্ঠনটা লোক দিয়ে আজ স্যামুয়েলের বাড়ী পাঠিয়ে দিও।"

অজিত বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। ইলার সহানুভূতিতে তাহার হৃদয়ে নবীন বলের সঞ্চার হইল।

সন্ধ্যার সময় স্যামুয়েলের বাটীতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তামাসা হইবে, আর তাহাদের কে ঘরে আটকাইয়া রাখে। যাহার ঘরে যেমন নূতন পরিবার বস্ত্র আছে তাহাই পরিধান করিয়া

সকলে আসিয়া উপস্থিত। স্থানাভাবের জন্য বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। অজিত আসিয়া ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাইতে ব্যস্ত হইল। সকলেই প্রফুল্লহৃদয়ে দেখিতেছে, কৌতুহলী হইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছে। অজিত সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, প্রত্যেক ছবির বিষয় বিচক্ষণতার সহিত বুঝাইতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল দেখাইয়া অজিত দেখানো বন্ধ করিয়া বলিল, "আগামী শনিবার দিন আবার দেখাবো, তোমরা দেখতে এসো।" সকলেই আগ্রহের সহিত দেখিতে আসিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল।

(২৫)

শনিবার দিন মিঃ রায়ের আফিসে খুব ভিড়। সমস্ত কর্ম্মচারী, কুলি, মজুর; তদ্ভিন্ন মোজা গেঞ্জি যাহারা বাটী হইতে তৈয়ার করিয়া আনে তাহাদিগকেও টাকা দিবার দিন। সকলকার মুখেই ব্যস্ততার ভাব। মিঃ রায় ও অভয় বাবু সেদিন ব্যস্ত থাকেন। অভয় বাবু ব্যতীত গণপত রাও বলিয়া একজন মারহাট্টা কর্ম্মচারী আছেন তিনি সেদিন যাহারা বাটীতে সেলাই করে, তাহাদিগকে সূতার নমুনা ইত্যাদি দিতে ব্যস্ত। তদ্ভিন্ন বিদেশ হইতে যে সকল অর্ডার আসে সেই সকল দ্রব্যাদিও সেই দিন প্যাক করিতে হয়।

মিঃ রায় আপনার আফিস-কক্ষে বসিয়া আছেন। টেবিলের সম্মুখে তোড়া-বাঁধা টাকা, কাগজের প্যাকেটে আট আনা চার আনা ও ব্রাউন কাগজে মোড়া ব্যাঙ্ক হইতে ভাঙাইয়া আনা পয়সা। কুলি মজুর কর্ম্মচারী যে যেমন টাকা পাবে তাহাকে প্রতি সপ্তাহে তেমনি দেওয়া হয়। অজিত ও সলিল সেই স্থানে ছিল। অজিত কতকগুলি প্যাকেটে টিকিট বসাইতেছিল, সলিল দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় অন্য দোকানের একজন লোক একখানি ১০০৲ টাকার চেক আনিয়া অভয় বাবুকে ভাঙ্গাইয়া দিতে বলিল। অভয় বাবু সেই চেকটি লইয়া মিঃ রায়কে বলিলেন "ইহা ভাঙাইতে আসিয়াছে, আপনার কি বেশী টাকা আছে?" মিঃ রায় কথা না বলিয়া চেকটি লইয়া সম্মুখস্থ ড্রয়ারে রাখিয়া অভয় বাবুর হস্তে ৬টি গিনি ও ১০৲ টাকার নোট দিলেন। অভয় বাবু তাহা লইয়া সলিলকে বলিলেন;—

"তোমার ত এখন কিছু কাজ নেই, এস এই পয়সাগুলি নিয়ে ওঘরে গুণে ঠিক করে রাখবে। কুলিদের প্রত্যেককে ৷৵০ করে দিতে হবে।" সলিলের পয়সা গণিবার ইচ্ছা ছিল না। মিঃ রায়ের সম্মুখে না বলিতে সাহস নাই। দুজনে মিলিয়া সেই রাশীকৃত পয়সা লইয়া অন্য ঘরে গেলেন। সলিল অনিচ্ছার সহিত সেই কার্য্যে হাত দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিঃ রায় হস্তে একখণ্ড কাগজ লইয়া গণপত রাও যে স্থানে লোকদিগকে সূতা ইত্যাদি দিতেছিলেন, ও প্রত্যেকের নাম লিখিয়া রাখিতেছিলেন সেইখানে আসিলেন। সূতা দেওয়া শেষ হইয়া গেলে, বিলাতে পাঠাইবার জন্য একটা বৃহৎ পার্সেল কাগজে মোড়া হইতেছিল, কাগজে বাঁধিবার সূতা কম পড়িল। যাহারা দুইজনে বাঁধিতেছিল তাহাদের তাহা ছাড়িয়া যাইবার উপায় ছিল না। মিঃ রায় অজিতকে ডাকিয়া বলিলেন, "অজিত, সূতার ঘর থেকে সূতা নিয়ে এসো।" অজিত আলো হাতে লইয়া সূতা আনিতে উপরে গেল। মিঃ রায়ের কক্ষে জন-প্রাণী নাই। সেই মুহূর্ত্তে সলিল পয়সা গণনা শেষ করিয়া মিঃ রায়ের আফিস কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—টেবিল খোলা, উৎসুকভাবে সে টেবিলে কি আছে দেখিল। যখন সে গৃহের মধ্যে আসিয়াছিল, কিছু মনে করিয়া আসে নাই। টেবিল খোলা না দেখিলে হয়ত কিছু মনে হইত না। কিন্তু টেবিল খোলা দেখিয়া কেমন আগ্রহ হইল, সম্মুখে ১০০৲ টাকার চেকটি দেখিয়া হাত বাড়াইয়া লইবার ইচ্ছা হইল। একবার মনের ভিতর বিবেক আঘাত দিল, সে ভাবিল "না না লইবার কি দরকার? চুরি করা হইবে।" কিন্তু প্রলোভন দমন করিবার শক্তি নাই, তৎক্ষণাৎ মনে হইল 'লইলেই বা কে জানিবে'। দুর্ভাগা সলিল হাত বাড়াইয়া চেকটি

পকেটে ফেলিয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যে স্থানে পয়সা গণিতেছিল, সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। অভয় বাবু মুখ ফিরাইয়া যে কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, তাহাই করিতেছিলেন, সলিল গিয়া ২।১টি প্যাকেট নাড়া-চাড়া করিয়া বলিল ;—

"পয়সা গোণা শেষ হয়ে গেছে আর কি করব ?" অভয় বাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"সব ঠিক আছে ত ?"

সলিল বলিল, "ঠিক আছে।"

অভয় বাবু বলিলেন, "তোমার অন্য যা কাজ আছে কর।"

সলিল সরিয়া আসিয়া অভয় বাবুর নিকটে দাঁড়াইল। তাহার বুক-পকেটে সেই চেকখানি অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল।

অজিত সূতা আনিয়া দিবার পর সে পার্সেল বাঁধা হইল। সিল মোহর দিয়া তাহা আফিসের কক্ষে রাখা হইল। মিঃ রায় আপনার টেবিলের কাছে আসিয়া বসিলেন। এই সময় সলিল আসিয়া অজিতকে বলিল ;—

"সকলে বেতন পাইয়াছে, অভয় বাবু তোমায় ডাকিতেছেন।"

মিঃ রায় বলিলেন, "এই চিঠিখানা তুমি নিজের হাতে ডাকে দিয়ো।"

অজিত বলিল, "আমি বেতন লইয়া আসিতেছি।"

সে গিয়া আপনার প্রাপ্য বেতন লইয়া আসিল। তাহার পর আপনার টেবিল ইত্যাদি সব গুছাইয়া রাখিল। অবশেষে মিঃ রায়ের নিকট হইতে পত্র লইল। চিঠি পত্রের সমস্ত কাজ অজিত ভিন্ন আর কেহ করে না। অজিত আর বাল্যকালের মত চিঠি ফেলিতে ভুলিয়া যায় না। সে পত্র লইয়া আপনার সেই ওভারকোটটি গায় দিয়া পোষ্টাফিস অভিমুখে চলিল। সলিল তাহার সঙ্গে সেই পর্য্যন্ত গিয়া নিজের গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। অজিতও চিঠি ফেলিয়া গৃহে ফিরিবে স্থির করিল। সেদিন ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাইবার ভার স্যামুয়েল দাসের উপর ছিল।

আফিসের প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। শুধু মিঃ রায় ও অভয় বাবু তথনো কাজ শেষ করেন নাই। মিঃ রায় যখন সমস্ত কাজ শেষ করিয়া টেবিল বন্ধ করিবেন, সেই চেকটা লইতে গিয়া বলিলেন, "সেই চেকটা কোথায় ?"

অভয় বাবু বিস্মিতভাবে বলিলেন, "চেক, কোন চেক ?"

মিঃ রায় বলিলেন, "কেন, সেই ব্যাঙ্কের চেকটা, যা আপনি আমায় এনে দিয়ে গিনি ও টাকা নিলেন।"

অভয় বাবু বলিলেন, "আপনি বোধ হয় সেটা নিজের দেরাজে রেখেছেন, একবার দেখুন।" মিঃ রায় একটী স্থান দেখাইয়া বলিলেন,

"আমি এইখানে রেখেছিলাম, এ যে আশ্চর্য্য "কথা হ'ল, এ ঘরে ত অজিত ছাড়া আর কেউ আসে নি, কি করা যায় ?"

অভয় বাবু বলিলেন, "অজিত আপনার টেবিলে কখনো হাত দেবে না।"

মিঃ রায় বলিলেন, "তাতো নয়ই, আমি কি তাহলে ভুলে ছিঁড়ে ফেললাম।" তারপর উভয়ে উঠিয়া সে টেবিলের দ্রব্য সামগ্রী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন, টেবিলের চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন। ছিন্ন কাগজের ঝুড়ি তুলিয়া সব দেখিলেন, কোথাও পাওয়া গেল না। মিঃ রায় বলিলেন, "এ ঘরে অজিত ছিল তাকে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌ব। সে পোষ্টাফিসে গেছে এই পথেই ফিরবে।"

অভয় বাবু একজন লোককে গেটের কাছে অপেক্ষা করিতে বলিলেন, ও অজিত আসিবামাত্রই যেন আফিস-কক্ষেই পাঠাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া রাখিলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই অজিত সেই পথ দিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল, সে অভর বাবুর সংবাদ পাইয়া অনতিবিলম্বে আফিস-কক্ষে প্রবেশ করিল। চেকের কথা শুনিয়া সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মিঃ রায়কে বলিল, "তাহলে আপনি নিশ্চয়ই ছিঁড়ে ফেলেছেন।"

এই বলিয়া সে পুনরায় ছিন্ন পত্রের ঝুড়ি

অন্বেষণ করিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু চেকের চিহ্নও দেখা গেল না। তখন সে উঠিয়া বলিল ;—

"এ যেন ঠিক ইন্দ্রজালের মত হয়েছে। আপনি ছাড়া আর কেহ ত এ ঘরে আসে নাই। অভয়বাবু বা সলিলকুমার পর্য্যন্ত আসেন নাই।"

অভয়বাবু। সলিলকুমার বারাবর আমার নিকটেই ছিল।

তিনজনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিলেন। সে রাত্রে আর কোনো উপায়ও ছিল না, মিঃ রায়ের হৃদয়ে কেমন বিষাদের ছায়া পতিত হইল। কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যে একজন অবিশ্বাসী সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না। কিন্তু সে কে ? অজিত ও অভয়বাবুকে অবিশ্বাস করা অসম্ভব, সে কথা মনেই আসিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে আপন আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অজিত গৃহে ফিরিয়া দেখিল, ললিত তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। ললিত তাহাকে দেখিবা-মাত্র বলিল, "দাদা তোমার যে আজ এত দেরি। আমি যে আজ তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ কর্‌ব বলে বসে আছি, আর আজই তুমি দেরি করে এলে !"

অজিত। কি পরামর্শ শুনি, সেই বিলাত যাওয়ার কথা ত ?

ললিত। এবার একজামিনে অনার বি-এ পাশ হলে বিলাত পাঠাবে বলেছিলে মনে আছে ত ? আমাদের ত বিলাত যাবার অবস্থা নয়, কিন্তু আমার যে যাবার একান্ত ইচ্ছা, ব্যারিষ্টার হব। আমি এই একজামিন দিয়েই যাব স্থির করেছি। আমার বন্ধু সুধীর যাবে, সে আমায় টাকা দিয়ে সাহায্য কর্‌বে বলেছে। আমাদের প্রিন্সিপাল বলেছেন যে আমায় স্পেশাল স্কলারশিপটা পাইয়ে দেবেন। তাঁহার জানিত কোনো জাহাজ-কোম্পানীর অধ্যক্ষকে বলে ফ্রি প্যাসেজে পাঠাবেন। সুধীর বলেছে, সে কেম্‌ব্রিজে যেখানে থাকবে সেইখানেই তার বাবা আমার থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন। তাঁর খুব ইচ্ছা যে আমি যাই।

সুধীরের পিতা বোম্বাই কোর্টের জজ, তাঁহার অবস্থা খুব ভাল। কন্যাও অনেকগুলি। ললিতের প্রতি বরাবরই তাঁহার দৃষ্টি আছে। সুধীর বাল্যকাল হইতেই ললিতের বন্ধু।

অজিত। আচ্ছা তার ত এখন দেরি আছে। আগে আমিই বিলাতটা দেখে আসি, তার পর তোমার যাবার ব্যবস্থা হবে।

ললিত। এই ত তোমার দোষ দাদা, তুমি বিলাত যাবার কথায় একটুও উৎসাহ দাও না। তাই আমিও থেকে থেকে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ি।

অজিত। আমার খুব ইচ্ছে তুমি যাও, আর যাতে তোমার ভাল হয় তাই আমার ইচ্ছে। তাড়াতাড়ি কর্‌লে কি করে হবে বল ?

ললিত। তোমাদের কিছু খরচ দিতে হবে। যাবার সময় কাপড় ইত্যাদি। সুধীরের বাবার টাকা এলে শোধ করে দেব।

অজিত। সব হয়ে যাবে ভাই। এতদিন যেমন করে কাটল, এখন আবার যেমন ভাবে দিন যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও যেমন হবে সব ব্যবস্থাই তিনি অলক্ষ্য হতে ঠিক করে দেবেন। তুমি বেশী ব্যস্ত হয়ো না।

ললিত। আমার ত যাবার ইচ্ছে, কি হয় তাত বলা যায় না। তবে আমার মত অবস্থাপন্ন লোকের এই রকম ইচ্ছা হওয়া উচিত নয়। আমার ত মনে হয় দাদা ব্যারিষ্টার হলে আমার ভালই হবে। কত লোক কত বিপদগ্রস্ত হয় আইনের হাতে পড়ে তাদের কত প্রকার যন্ত্রণায় পড়তে হয়। যদি ভাল ভাবে লোকের উপকার কর্ব্ব মনে করা যায়, এতে যেমন উপায় আছে এমন কিছুতেই নেই।

অজিত হাসিয়া বলিল, "উপকার ইচ্ছা কর্‌লে অনেক ভাবেই করা যায়।"

ললিত একটু অপ্রস্তুতভাবে বলিল, "তা ত নিশ্চয়ই।"

অজিত। আজ মিঃ রায়ের দেরাজ থেকে ১০০৲ টাকার একখানি চেক কে না বলে নিয়ে বেশ উপকার করে গেছে।

ললিত। সেকি?

অজিত তাহাকে সব বলিবার পর সে বিস্মিত হইল ও উভয়ে মিলিয়া জননীর নিকট গিয়া সব কথা জানাইল। সুশীলাও চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। আফিস হইতে টাকা যাওয়া বড় সহজ কথা নহে। সকলকার মনেই বিষাদের ছায়া পতিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

গুজরাত কৃষক পল্লীচিত্র

গুজরাতের অনবরত তরঙ্গায়িত নির্জ্জন প্রশস্ত মাঠের উপর দিয়া গোশকট-চক্র-রেখাঙ্কিত আঁকু বাঁকু ধূলিপূর্ণ ক্ষুদ্র রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে প্রান্তরের কোন দিকে বংশীধ্বনির ন্যায় করুণ মর্ম্মস্পর্শী একটা আর্ত্তনিনাদ আপনার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারিবেন পল্লী ২।৩ মাইল ব্যবধান মাত্র। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রসকল নয়নগোচর হইবে, এবং কৃষকবৃন্দকে ক্ষেত্র-সন্নিহিত বিভিন্ন কূপ হইতে দড়ি ও চাক সংযোগে বলদ বা মহিষ দ্বারা জল উত্তোলন করিয়া শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিতে দেখিবেন।

কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এই জল উত্তোলনের শব্দই আপনাকে উৎকর্ণ করিয়া দিয়াছিল :—আমার কোন বন্ধু ইহাকে "কূয়া পাখীর ডাক" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেস্থান হইতে পল্লী-অভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সারস, ময়ূর, টিয়া, তিত্তির প্রভৃতি নানা জাতীয় পাখীর সুধাপ্লাবী কাকলীকলাপ আপনার কর্ণকে অধীর করিয়া তুলিবে এবং বৃক্ষ-ছায়া বহুল স্নেহ-সমাচ্ছন্ন অবগুণ্ঠিতা পল্লীমাতার চিত্রখানি অদূরে নয়ন রঞ্জিয়া উঠিবে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভরিয়া কোথাও এলাচি বন গুল্মের হরিদ্রাবর্ণ কুসুমের সমাচ্ছাদন, কোথাও শুষ্ক ঘাষাচ্ছাদন, কোথাও ঘন সমাচ্ছন্ন শ্যামল পত্র-বহুল বাবলা গাছের কণ্টকাকীর্ণ শাখারাজি ভরিয়া হরিদ্রাবর্ণ কুসুম হরষে ছাইয়া আছে। নিম অশথ, আম প্রভৃতি বৃক্ষরাজিও দগ্ধ প্রান্তরের স্থানে স্থানে স্নেহকোল পাতিয়া দিয়াছে; কতকগুলি অজ্ঞাতনামা শীর্ষ কুসুমশোভী গুল্ম নানা শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। তাহার মাঝখানে নত নম্রা পল্লীজননী। পল্লীর অতি সন্নিকট স্থানে আসিলে সরোবর বা জলাশয়ের আকারের একটা কিছু দেখিতে পাইবেন;—এই জলাশয়ই পল্লীর জীবন। সমস্ত প্রাচীন পল্লীগুলিই এইরূপ একটি জলাশয়-উপযোগী স্থান ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী উর্ব্বর ভূমি দেখিয়া অতীত কালে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। পল্লী-প্রান্ত পথে পৌছিয়া আপনি পথধূলি পরে বিবিধ বিহগ-রচিত চরণ-চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। একখানি সুচিত্রিত হারের মত শ্রেণীবদ্ধাকারের ধূলিলাঞ্ছিত চিহ্নগুলি কোন চিত্রকরের সুনিপুণ তুলিকাস্পর্শে অঙ্কিত সজীব চারুচিত্রের বিভ্রম জন্মাইবে। প্রভাতে এই চরণ-চিহ্নগুলি দেখিয়া মনে হয়—বনদেবী বুঝি যামিনীতে পল্লীর এই ধূলিময় পথে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন; অগণিত পাখী পল্লীর চিরমুগ্ধ সহচর। পল্লীর চারিদিকে অনেক ময়ূর অসঙ্কোচে পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক পুলক-রোমাঞ্চে ললিত নৃত্য করিতেছে, আর কেকারবে দিক্‌মণ্ডল পূর্ণ হইতেছে।

পল্লীর ঘনসন্নিবিষ্ট খোলার ঘরগুলি আপনার চক্ষে অভিনব বোধ হইবে। পল্লীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া আপনি থমকিয়া দাঁড়াইবেন— কোন পথে আপনি চলিবেন?—পল্লীর প্রতি গৃহস্থের বাড়ীর উপর দিয়াই পথ, বহির্বাটী ও অন্তঃপুর কিছুই নাই!

পল্লীর একটি লোককে সঙ্গে করিয়া আপনি পল্লীর সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। এই পল্লীতে কতগুলি পরিবার তাহা আপনার পক্ষে নির্ণয় করা দুরূহ, কারণ বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে আঙ্গিনার কোন ব্যবধান নাই, সকলই এক পরিবারের অন্তর্ভূক্ত মনে হয়।

পল্লীর প্রতি চালে চালে অসংখ্য ময়ূর ময়ূরী দেখিতে পাইবেন; নর নারী সকলকেই সমভাবে চলাফেরা করিতে দেখিবেন। পুরুষগণের সকলেরই মস্তক পাগড়ী বা টুপিদ্বারা আবৃত, আত্মীয়ের মৃত্যুর শ্মশানবান্ধব হইবার সময় কেবলমাত্র তাহারা টুপি পাগড়ী পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হয়; স্ত্রীলোকগণের পরিধানে নানা বিচিত্র বর্ণের ঘাগ্‌রী, তদুপরি বিচিত্র রঙিন সাড়ী, ও হস্তে বালা, কর্ণে মাকৃড়ী, পদে ঘুঙরী মল। স্ত্রীলোকগণ সৌষ্ঠবময়ী, সবল ও বিবিধ গৃহকর্ম্মপরায়ণা। পল্লীর মধ্যে একটি দোকান পল্লীর সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে; এই বিলাস-স্রোতে ভাসমান জগতে তাহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ কি?—ডাল, চাল, গুড়, বাজরী ও তেল, নূন, কাপড়,—ইহাই তাহাদের জীবন রক্ষা করে ও সৌষ্ঠবের সকল উপাদান ও উপকরণ। পল্লীতে হিন্দু, জৈন ও মুসলমানগণ একত্র অবস্থান করে; ইহাদিগের মধ্যে বন্ধুত্বের কোন ব্যাতিক্রম দেখা যায় না। এই পল্লীগুলির উপর দিয়া কালের কত ঝঞ্ঝাবাত গিয়াছে, তবুও ঠিক একভাবে চলিতেছে।

প্রায় অধিকাংশ পল্লীতেই জৈন চৈত্য, হিন্দু মন্দির বা মুসলমান মসজিদ দেখিতে পাইবেন। সন্ধ্যায় মন্দির-প্রাঙ্গণে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নারী সকলকে সমবেত দেখিতে পাইবেন। সেখানে ক্ষুদ্র পল্লীর সকল কথা, প্রাচীন ইতিহাসের জীর্ণ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি চলিতেছে; এখানে নূতন উত্তেজনার কিছুই নাই, পুরাতন কথাগুলিই এক মাত্র সম্বল। মঠের কথা, ফসলের কথা, সম্বৎসরের অবস্থার কথা তাহাদের নিত্য আলোচনার বিষয়।

কৃষকের সম্পত্তির মধ্যে তাহার জীর্ণ কুটীর, লাঙ্গল এবং কয়েকটি মহিষ বা বলদ; কোন কোন স্থলে গোরুর বা মহিষের গাড়ীও দেখিতে পাইবেন। কন্‌বীগণই সাধারণতঃ গ্রামের কৃষিজীবি; তাহারা তিনভাগে বিভক্ত—লেবা, করুয়া ও আঞ্জন। তাহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়; কালের পরিবর্ত্তনে এমন হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। গুজরাটের কোন কোন অংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণও ও কৃষি কার্য্যে রত আছে। বানিয়াগণ গ্রামোৎপন্ন দ্রব্যে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অর্থশালী হয়।

গ্রামের "পেটেল" বা পঞ্চায়েত গ্রামের সর্ব্বে সর্ব্বা। তিনি গ্রামের সমস্ত বিচার নির্ব্বাহ করেন, পল্লী রক্ষার্থ চৌকিদার নিযুক্ত করেন; গ্রামের যাবতীয় শান্তিরক্ষার সুবন্দোবস্ত ও কৃষিজীবিদিগের সর্ব্বপ্রকার বিবাদ বিসম্বাদ নিস্পত্তি করিয়া থাকেন।

গ্রামে আদিম অসভ্য জাতি ভীল, কুলি, মীন প্রভৃতি কৃষি কার্য্য বা অন্যান্য বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

গ্রামে শৈবায়িত, বৈষ্ণায়িত ও শ্রাবক (জৈন) এই তিন শ্রেণীর ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখা যায়।

জাতিচ্যুত ভীল, মীন, কুলি প্রভৃতি অনেক স্থলে কবীর পন্থী।

পেটেল গ্রামের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। তাহা দ্বারাই গ্রামের যাবতীয় বিষয় নিরূপিত হয়। প্রতি গ্রামে রজক, নাপিত, কুম্ভকার, তৈলকার চৌকিদার মেথর সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। প্রতি গ্রামে গ্রামের উন্নতি বিধান জন্য একটি ধন-ভাণ্ডার আছে। শস্যের সময় প্রতি-বাড়ী হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়া এই ধন-ভাণ্ডারটি পূর্ণ হয়। এই অর্থ হইতে গ্রামের কর্ম্মচারী সকলকে বেতন দিয়াও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকে। আজকাল তদ্দ্বারা সহরের পুলিস দারগা প্রভৃতির ক্ষুধা নিবৃত্তি করা হয়। এইরূপে গ্রামে কত অর্থ যে ব্যয়িত হইতেছে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই অর্থে গ্রামের কত মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারিত।

অর্থ-দাতাগণের কিন্তু পরিধানে এক ধূতি ও হস্তে এক লাঙ্গল সম্বল; তাহাদের এই কষ্ট

সঞ্চিত অর্থগুলি তাহাদের কোন কাজেই আসিতেছে না।

পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা আছে, তাহাতে ধূলি-ধূসরিত বালকবৃন্দ শিক্ষালাভ করিতেছে। এই বালকবৃন্দের কোন মাহিনা নাই, পাঠাশালার পণ্ডিত মহাশয় মাসে একদিন মাত্র ঝুলি স্কন্ধে ছাত্রবৃন্দকে সঙ্গে করিয়া প্রতি-বাড়ী হইতে এক মুষ্টি চাউল সংগ্রহ করেন। ছাত্রগণ "একরে একরে এক, একরে বেকৃরে বে একরে তেকৃরে ত্রান" করিতে করিতে মাষ্টারের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে।

কৃষকগণ অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু কনবীগণ বিশেষ সাহসী বলিয়া পরিচিত; কৃষকগণ অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বলদগুলিকে কিছু আহার্য্য প্রদান করে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে পরিবারের কিছু কার্য্য সমাপন করিয়া বলদগুলিকে লইয়া মাঠে চলিয়া যায়। বেলা ১টার সময় কৃষকরমণীগণ তাহাদের আহার্য্য লইয়া মাঠে গমন করে। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্নান আহারাদির পর কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বৈকালিক কার্য্যে নিযুক্ত হয় ও সন্ধ্যার আহার্য্যাদি প্রস্তুত করে। একবার রন্ধনশালার দৃশ্যটা দেখুন ঃ—তথায় তৈজসপত্রাদি কিছুই নাই, গোময়লিপ্ত ঘরের এক কোনে উনানে একটি কাষ্ঠ মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, তাহার উপর "তাওয়া"। কৃষক-পত্নী কিছু বাজরীর আটা হাতে মর্দ্দিত করিয়া তৎপর অগ্নি-তপ্ত করত রোটলা প্রস্তুত করিতেছে;—মুখে রূপা কন্‌বী বা দলপত রামের ভজন চলিতেছে।

শরতে সন্ধ্যার পর কৃষকপত্নীগণ একটি প্রদীপের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া হেলিয়া দুলিয়া করতালী দিতে দিতে কি গান গাহিতেছে, শুনুন;—

গরবী

ও ঈশ্বর আরজী উরধারো,
দুনিয়ানা দুঃখ নিবারো রাজ,
দয়া করো হবে দিন বন্ধু।
সারা জন সঙ্কটমা পড়িয়া,
নরসানা ছাণ্টা নড়িয়া রাজ।
দয়া করো হবে দিন বন্ধু।
জে পরোপকারী ছে পুরা,
এ পণ নথি রক্ষা অধুরা রাজ।
দয়া করো হবে দিন বন্ধু।
জো থম্ভ অড়গ ডগশে জ্যারে,
জগ রেহেশে শা আধারে রাজ।
দয়া করো হবে দিন বন্ধু।
ফরিথি মনমা কোই নহি ফুলে,
ভবমা আ দুঃখ নহী ভলে রাজ।
দয়া করো হবে দিন বন্ধু।
সুখ পামো সৌ গামো গামে,
দিধি আশিষ দলপত রামে রাজ।
দয়া করো হবে দিন বন্ধু।

অর্থাৎ

(১)

হে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর, জগতের দুঃখ নিবারণ কর; হে দীনবন্ধু এখন দয়া কর।

(২)

অসৎ লোকের সংসর্গে পড়িয়া ভাল লোক সঙ্কটে পড়িতেছে; হে দীনবন্ধু এখন দয়া কর।

(৩)

যে পূর্ণ পরোপকারী ব্যক্তি তাঁহারও এখন রক্ষা নাই; হে দীনবন্ধু এখন দয়া কর।

(৪)

যে স্তম্ভের উপর জগত স্থিত তাহা ভাঙ্গিলে জগত কিসের উপর দাঁড়াইবে; হে দীনবন্ধু এখন দয়া কর।

(৫)

এখন হইতে কেহই অহঙ্কার করিবে না, সে এই পৃথিবীতে দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না; হে দীনবন্ধু এখন দয়া কর।

(৬)

প্রতি পল্লীতে পল্লীতে সুখ প্রদান কর, দলপত রাম এই আশীর্ব্বাদ করিতেছে; হে দীনবন্ধু এখন দয়া কর।

কৃষাণকবি রূপাকনবী-বিরচিত "কনবীর দুঃখ" নামক গান হইতে তাহাদের সম্বৎসরের সকল সুখ দুঃখের কথা জানিতে পারিবেন। সমস্ত গুজরাটেই কৃষকপত্নীগণ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এই গানটী গাহিয়া থাকে। এই গানটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সামল রে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি;
কনবী কেরা দুঃখণী কহু কথায় জো।
দে দুঃখ ঢালী অবনীনা আধার তু;
অমথী রাখো তমে রাম রেহেবায় জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

ঢড়ে বাদলা মাস আষাঢ়ো আওতা;
মেঘতনু তো পড়বা মাড়ে নীর জো;
রাস পরোনো কনবী কেরা হাথমা;
ভীজী জায়ছে কনবী কেরু শবীর জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

শ্রাবণ মাসে মেহুলো বরসে শরবড়ে;
লদবদ পললী জায়ে নরনে নার জো;
দীকরাণী বহু সসরা পাগে জই কহে,
সসরাজী কাই বাবো ডাঙ্গর জার জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

ভলে আবিয়ো ভাদরবো মহিনো হবে;
কনবী কেরী নারী লদবদ থায় জো.
চার তণো ভারো মাথে জে নীগলে,
ছৈয়া কেড়ে রড়তা পললী জায় জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

আসোমা আশা তো রাখী অতি ঘণী,
বাট জোয়লো মেঘ বরসবা কাজ জো;
জার বাজরী ডুণ্ডে আবী বেসবা,
ডাঙ্গর পাণীবিনা সুকায়ে আজ জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

কার্ত্তিক মা ওঘরাতদার তে আবিয়ো;
করে আঙ্কড়ো সীমমাহ তৈয়ার জো,
"এক সিঙ্গকে কণ লব কাই উপাড়শো,"
এবী বায়তণী আজ্ঞানো সার জো
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

মাগশর মহিনো আব্যো রুড়ী রীতথী,
পেহেলো হপতো উঘরাবা মণ্ডায় জো;
মুখী তলাটি চোরে বেসে জঙ্গ চড়ী,
কনবী বিচারো বহুরীতে কুটায় জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

পোষে বীজো পাক রবীনো থায়ছে,
রুণা কালা ফাটী থায় সমাজ জো;
জুণী বন্ধী দুর করীছে আসমে,
পণতে মাত্রজ নবী চলাবা কাজ জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

আব্যো মাঘ মহিনো রুভী রীতথী;
লীলা কচ সৌ খেতর তো দেখায় জো,
রাজানো জে কর তে সঘলো আপিয়ো,
পণ মাথাপর হীমতণু ভয় থায় জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

ফাগণ মহিনো আব্যো রুড়ী রীতথী,
হীমে ঘহুনো কীধো পুরো নাশ জো;
"চালো আপন সটিয়ে" পণ শা কামনু।
মুখিয়ে মুকী চোকী চারে পাস জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

চোরে তো সৌ থায় একঠা চৈএ মা?
মাগে "লাবো কর জে তম পর থায় জো,"
কান্তনারী বিধবাণী মজুরি লে লুন্টী,
সর্বে জোর জুলমথী লুন্টী জায় জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

জমীনদার বৈশাখে আবিনে লুটে,
গায় ভেষনা দুধ দহীনু জে কায় জো;
ছায় বিনা ছৈয়া সৌ ঢলবল বাহ করে,
পণ পাপিয়ো চালু লুট মায় জো।
সামলরে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

জেঠ মহিনো আব্যো রুড়ী রীতথী,
চীড়াই গয়লো কনবী খণ্ডো থায় জো;
সম খাতানে আশা তেনে আপত,
খেতর মা ঘাতরতে পুরবা জায় জো।
সামলোর শ্রীকৃষ্ণ অমারি বিনতি।

বারে মহিনা রূপামা পুরা থয়া,
তেমা কনবী কেরা কথী কথায় জো ;
জে কোই গায় অনে শীখে নে সামলে'
বাস স্বর্গ মা তেনো ঝট থই জায় জো
সামলয়ে শ্রীকৃষ্ণ অমারী বিনতি।

অর্থাৎ।

হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর
কনবী কেরার দুঃখ বর্ণনা করিতেছি ;
আমাদের দুঃখ দূর কর' তুমিই অবনীর আধার
রাম! তুমিই আমাদিগকে এখানে রাখিয়াছ, তাই
আছি ; হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

(২)

আষাঢ় মাস আসিতেই মেঘ দেখা দেয়,
এবং তাহা হইতে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়
কনবী কেরা হস্তে রাশ ও পাচন গ্রহণ করে
কনবী কেরুর শরীর ভিজিয়া যায়
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কয়।

(৩)

শ্রাবণ মাসে মেঘ হইতে বৃষ্টি মাঝে মাঝে হয় ;
নর নারী পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যায় ;
পুত্রবধূ শ্বশুরের নিকট যাইয়া বলে—
শ্বশুর মহাশয়, কিছু শস্য বপন করুন।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

(৪)

ভাদ্রমাসে খুব ভালরূপ বৃষ্টি হয় ;
কনবী কেরার নারী—ভিজিয়া যায় ;
তৃন সমষ্টি ভেদ করিয়া জল
ক্রন্দনরত বালকের মাথার উপর পড়িয়া
ভিজাইয়া দেয়।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

(৫)

আশ্বিন মাসে অত্যন্ত আশা করি
যে, মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইবে।
জোয়ার এবং বাজরী মাথায় করিয়া লওয়া হয়,
জল বিহীন বশতঃ ধান্য শুষ্ক হয়।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।

(৬)

কার্ত্তিক মাসে রাজ-কর্ম্মচারী আসিয়া
উপস্থিত হইল,
গ্রাম প্রান্তে বসিয়া হিসাব তৈয়ার করিল ;
"এককণা শস্য কেহ উত্তোলন করিও না"
এই প্রকার রাজ আজ্ঞা শ্রবণ কর।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।
অগ্রহায়ণ মাস ভালরূপই আসিল,
খাজনার প্রথমবারের টাকা পরিশোধ করা হইতেছে ;
প্রধান ও তহসিলদার গাড়ীতে সহরে গমন করিল,
কনবীর অনেক প্রকার কষ্ট সহিতে হইল।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।
পৌষ মাসে দ্বিতীয়বার শস্য বপন করা হয়,
কার্পাসের গুটি ফুটিতে আরম্ভ করে,
এই সময় পুরাতন সমুদয় দূর করা হইয়াছে,
কেবল মাত্র নূতনের জন্য কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।
মাঘ মাস ভালরূপেই আসিল ;
ক্ষেত্র সকল শ্যামল দেখাইতে লাগিল ;
রাজার কর সকলই দেওয়া হইয়াছে,
কিন্তু মাথার উপর হিম কণা ভয় দেখাইতেছে।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।
ফাল্গুন মাস ভালরূপেই আসিল ;
হিমে শস্য সমুদয় নষ্ট করিয়া দিয়াছে ;
"চল পলায়ন করি" কিন্তু কেমনে ;
মোড়ল চারিদিকে পাহারা বসাইয়াছে।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।
চৈত্র মাসে সকলে সহরে একত্রিত হয় ;
চায় "তোমার উপর যা কর হইয়াছে আন"
নিরাশ্রয়া বিধবা নারীর উপার্জ্জন লুটিয়া লয় ;
সবই জোর করিয়া লুটিয়া লইয়া যায়।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।
বৈশাখ মাসে জমীদার আসিয়া গরু মহিষের
দই দুধ সব লুটিয়া লইয়া যায়।
দুধ মাখন বিনা সন্তানগণ খুব ক্রন্দন করে
কিন্তু পাপীরা লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া চলিয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাস ভাল রূপেই আসিল ;
ক্রুদ্ধ কনবী শান্ত হইয়া যায় ;
তাহারা বিধাতার নিকট প্রতিজ্ঞা এবং এবং সংকল্প করে
এবং ক্ষেত্রে চাষ করিতে গমন করে।
হে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ কর।
বার মাস রূপা দ্বারা পূর্ণ হইল,
ইহাতে কনবী কেরার কথা বর্ণিত হইল ;
যে কেহ ইহা গায়, শিক্ষা করে বা শোনে
তাহার অতি শীঘ্র স্বর্গবাস ঘটিয়া থাকে।

বৈশাখ মাসে গ্রামের কৃষকদিগকে লইয়া পরবর্ত্তী বৎসরের সুখ দুঃখের আলোচনা এবং বর্ত্তমান বর্ষে কৃষি কর্ম্মের কি নূতন বন্দোবস্ত হইবে তাহা ঠিক করিবার জন্য ভূম্যধিকারী বা তদীয় কর্ম্মচারী সমবেত হন।

কৃষকগণ গত বৎসরের দুঃখ জ্ঞাপন করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইলে ভূম্যধিকারী বা তদীয় কর্ম্মচারী তাহাদিগকে নানা প্রকার মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া গ্রামের মোড়লকে একটী পাগড়ী উপহার দিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করেন। তৎপর পুনরায় তাহারা এ বৎসরের কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

ক্ষেত্রে শস্য পাকিয়া উঠিলে রাজা, ভূম্যধিকারী বা তাহাদের কর্ম্মচারী গ্রামের পেটেলকে সঙ্গে করিয়া ক্ষেত্রে গমন করে। পেটেল কোন ক্ষেত্রে কত শস্য জন্মিয়াছে তাহা নিরূপণ করেন; কৃষকগণ তৎসম্বন্ধে অনেক অনুরোধ অনুনয়ের পর একটা হিসাব স্থিরীকৃত হয়। কৃষক শস্য কর্ত্তনের পূর্ব্বে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক জমিদারের অংশ তাহাকে প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়।

গুজরাতে বিভিন্ন অংশে এই বণ্টনের প্রথা বিভিন্ন রূপ। ঝালাওয়ারের কোনও অংশে অর্দ্ধেক, কোনও অংশে এক তৃতীয়াংশ, কোনও স্থলে দুই তৃতায়াংশ জমাদারের প্রাপ্ত।

সাধারণতঃ ধান প্রভৃতি শয্য যাহার জলসিঞ্চন কূপ প্রভৃতি স্থান হইতে করিতে হয়,—তাহার প্রায়ই এক তৃতীয়াংশ জমীদারের প্রাপ্য। হৈমন্তিক শয্য যব বারলী প্রভৃতি, যেখানে জল সিঞ্চনের বন্দোবস্ত আছে তথায় জমীদার এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করেন।

কোথাও কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যের অতি সামান্য মাত্র প্রদান করিতে হয়, কিন্তু বলদ ও কৃষি কর্ম্মক্ষম লোক প্রতি একটা খাজনা নির্দ্ধারিত আছে।

গুজরাতের যে সমস্ত স্থানে জলের বন্দোবস্ত অতি সামান্য সেই সকল স্থানে চুড়াসমা রাজপুত ভূম্যধিকারীগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের ভিন্ন প্রণালী স্থির করিয়াছে। সমস্ত জমি উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, তার পর সমস্ত উৎপন্য শষ্য একত্র করিয়া যতমণ হয় তাহা কর্ষিত জমির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিয়া জমি প্রতি একটা আন্দাজ হিসাব ধরা হয়। তৎপর প্রতি একার জমিতে একমণ শষ্য বীজের জন্য বাদ দিয়া, উৎপন্ন শষ্যের এক দশমাংশ কৃষকের পারিশ্রমিক ধরিয়া বক্রি অংশ জমিদার ও কৃষক সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লয়।

বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই শস্য ব্যতিরেকে অর্থ খাজনা স্বরূপ প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় কৃষকের দৈন্য দশা ঘোরতর রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শস্য বণ্টন সম্বন্ধে পল্লীর পুরাতন প্রথা।

কৃষকদিগের সমুদয় শস্য পল্লীর সর্ব্বসাধারণের গোলাবাড়ীতে মই দ্বারা ছড়াইয়া বিভিন্ন স্থানে স্তূপিকৃত হইত। তৎপর নির্দ্দিষ্ট একদিনে জমিদার গ্রামের মোড়ল, ব্যবসায়ী লোক, ভাগ করিবার জন্য দাঁড়ী পাল্লা সহ গ্রামের চৌকিদার ও কৃষকবৃন্দ গোলাবাড়ীতে সমবেত হইত। শস্যের একবিংশতিভাগ রাজার জন্য থাকিত ; তাহা হইতে কিছু কম গ্রামের মোড়ল, তহসিলদার, গ্রাম্য চিকিৎসক, রাজপুত্রের খরচ জন্য, গ্রামের চৌকিদার, গ্রামের দেবায়তন পুষ্করিনী সংস্কার, কুকুর প্রভৃতির জন্য অংশানুযায়ী বণ্টন করিয়া লইত। তৎপর বাকি অংশ জমিদার ও কৃষক সমানভাগে ভাগ করিয়া লইত।

বর্ত্তমান সময়ে রাজা প্রজার মাঝখানে "মামলাদার" নামে একটী পদের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি রাজার প্রতিনিধি হইয়া প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করেন। বিচার ক্ষমতা ও কর আদায় উভয় ক্ষমতা তাহার হস্তে থাকায় তদ্দ্বারা গুজরাতের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে।

বোম্বাই প্রদেশে বৎসর বৎসরই রাজস্ব বাড়িয়া চলিয়াছে, এই ৫০ বৎসরে রাজস্ব বাড়িয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরন্ন প্রজা কর ভারে প্রপীড়িত হইয়া প্লেগ দুর্ভিক্ষের সুশাসনে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন।

অনলে আহুতি

এ কি বলিদান! নিষ্পাপ কোমল সরল হৃদয়গুলি কি তাপে মাতৃবক্ষে ঢলিয়া পড়িতেছে? মাতার অঙ্কে এ কি শোণিতপাত!

যেদেশে রাজসভায় উচ্চাসনে নারীর অধিকার ছিল, যে পবিত্র ভূমিতে নারী বেদ-সূক্তের রচয়িত্রী ছিলেন, নারীর পৌরহিত্যে দেশ ধন্য হইয়াছিল, যে দেশের স্বয়ম্বর-সভায় রাজচক্রবর্ত্তীরা নারীর গৌরবে গৌরবান্বিত হইতেন, যেখানে মৈত্রেয়ীর মত নারী পার্থিব ধনের অসারতা জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন, আজ সেখানে নারীর অপমান! যিনি চিরদিনের আপনার জন হইবেন, তিনি সামান্য অর্থের সঙ্গে নারীর মর্য্যাদা তৌল করিতেছেন। বৎসর বৎসর বঙ্গের ভাবী নেতা সহস্র যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব মণ্ডিত উপাধি লইয়া বাহির হইতেছেন। তাঁহাদের কি ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা নাই? বিশ্বহিতে অনুরাগ, নারীর প্রতি সম্মান, হৃদয়ে করুণা থাকা উচিত। ত্যাগ ও বৈরাগ্যকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া কি তাঁহারা সাধু হইতে পারিবেন? তোমার ভিটায় ঘুঘু চরুক, আমি তোমার কন্যাকে যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন তোমার চৌদ্দ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়াছি, এইরূপ ভাব যদি তাহারা প্রাণে পোষণ করে তবে দেশের মঙ্গল কোথায়? ইহারা উর্ণনাভের মত নিজেদের জালে নিজেরা জড়িত হইতেছে। শিক্ষিতদের বিবেক এত মলিন হইল কেন? পাপ দেখিয়াও দেখেন না। পাপ দমনে প্রবৃত্তি হইতেছে না। পাপ দমনে যে গৌরব তাহা কোথায়?

এ দেশে নারীজাতি গৃহের শ্রী ও কল্যাণী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, বিবাহ মন্ত্রে নারীকে সম্রাজ্ঞী শশুরো ভব ইত্যাদি বলিয়া অভিনন্দিত করা হইয়াছে! এ স্থলে বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকটি ঋক ও সাম্য মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই প্রজা-সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে তোমার ধর্ম্ম-সম্পদও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। তুমি এ গৃহে যথাযোগ্য অতিথিসৎকার কর। তুমি সর্ব্বকাজের স্বামিনী, রাজ্ঞী। আমার হৃদয় ও তোমার হৃদয় এক হউক। হে বধূ, তোমার ও আমার মধ্যে যে ভাব-বন্ধন তাহা আজীবন অব্যাহত থাকুক। তোমার হৃদয় অমৃতপূর্ণ হউক। তোমার দৃষ্টি হইতে কল্যাণ-জ্যোতি ক্ষরিত হউক। তুমি দেবগণের উপাসনা কর। তোমার খ্যাতি দিগ্ব্যাপিনী হউক। তুমি আমার প্রিয় পরিজনের, এবং বিশ্বের সমস্ত জীবের আনন্দদায়িনী হও। আমরা উভয়ে অনুরাগের সঙ্গে সপ্তপদ গমন করিতেছি। তুমি আমার সখা হও; চল আমরা সখা হই। আমি যেন সর্ব্বদা তোমার সহায় ও সাহচর্য্য লাভ করিতে পারি। আমি যেন তোমা হইতে বিযুক্ত না হই। তুমি যেন আমা হইতে বিযুক্ত না হও। আমরা যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিবিড় অনুরাগের সহিত উভয়ে উভয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারি। ঈশ্বর লাভের জন্য আমরা এখন পদ নিক্ষেপকরি। এবং উভয়ে উভয়ের অনুবৃত্ত হইয়া এই যুগবন্ধন আমাদিগকে শিবতর করুক।" ইত্যাদি।

এই সকল ঋক সাম যজুর্ব্বেদীয় বিবাহ সম্বন্ধীয় মন্ত্রে কত উচ্চ ভাব, কত উন্নত শোভা নির্ম্মল আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল পবিত্র ভাবের দ্বারা কামনাকে ভোগ সুখের কত উর্দ্ধে তুলিয়াছে। ঋষিরা ভোগকে দেবত্বের দিকে লইয়া গিয়া সৃষ্টি-প্রবাহকে, কি সুন্দর পবিত্র দীপ্তিমান করিয়া রাখিয়াছেন। তপসো নির্ম্মিতোহসি। ভোগের পথকে তাঁহারা যোগের পথে লইয়াছেন। ভোগকে তপস্যার পদ্মাসন দিয়াছিলেন। তাই গৃহধর্ম্মে প্রথম পদ নিক্ষেপের সময় সেই বিশ্বদেবকে স্মরণ করিয়া ধর্ম্ম-সংযুক্ত মন্ত্রের রচনা হইয়াছে। বিবাহের কি চমৎকার পবিত্র স্বর্গীয় মধুময় শোভন-তম উচ্চ ভাব। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় নারী জাতিকে কেমন উন্নত পবিত্র শ্রদ্ধা ও গৌরবের চক্ষে তাঁহারা দেখিতেন।

বর্ত্তমান কালে বিবাহরূপ পবিত্র শুভযোগকে শিক্ষিত উপাধিমণ্ডিতেরা ক্রমে হীন চক্ষে দেখিতেছেন। শিক্ষিতেরা এ পণ-প্রথারূপ রক্ত শোষণকারী পণ উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন না। এখনও পণ-প্রথা-জনিত অনেক বালিকা বলি হইতেছে। এবং দেখা যাইতেছে আরও হইবে। এ পাপ দমনে পুরুষদের প্রবৃত্তি হইতেছে না। যখন পুরুষ পৌরুষ হারাইয়াছে, তখন নারী শক্তির প্রয়োজন হইয়াছে। বাংলার নারীগণ! জানি তোমরা জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিশ্বহিতকর কার্য্য ও সত্যানুসন্ধান হইতে অধিকারচ্যুত হইয়া রহিয়াছ। ঐ শুন ভারতের মনস্বী সন্তান তোমাদের অভিনন্দিত করিয়া তোমাদেরই কবে কোন যুগ হইতে ডাকিতেছেন;—

"আর কারে ডাকি উঠগো ভগিনী।
উঠ মা আমার কারার বন্দিনী॥
তোরা না জাগিলে দেশ যে জাগে না।
এক পায়ে দেশ কভু দাঁড়াবে না॥
তোরা না করিলে মঙ্গল সাধনা।
এ ভারত আর জাগে না জাগে না॥"

পশু পক্ষীরও হৃদয় আছে। তাহারা তাহাদের জাতীয় দুর্গতি দেখিলে সহিতে পারে না। তোমরা তাহা অপেক্ষা অধম হইয়াছ কি? এই এত গুলি শুভ্র পবিত্রহৃদয়া কন্যা পুরুষদের হৃদয়হীনতার জন্য অকালে সংসার হইতে বিদায় লইতেছে। তোমাদের নিজ কন্যাদের পুণ্যময় মুখগুলি দেখিয়া তাহাদের জন্য কি প্রাণ কাঁদে না? এই অনলে আহুতি হইতে প্রস্ফুটিত গোলাপগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। বালিকারা দেহত্যাগ করিতেছে। অগ্নিকে বররূপে গ্রহণ করিতেছে। পুরুষদের হৃদয়-হীনতারূপ দাহিকা শক্তি কি এতই প্রচণ্ড যে জগতের অগ্নিকে ইহারা শীতল মনে করিতেছে?

ওগো শিক্ষিত উপাধিধারীগণ! তোমাদের হৃদয় যদি থাকে তবে অনুভব কর। তোমরা নারীকে যে সামান্য কীটের ন্যায় মনে কর, অগ্নির দাহিকা অপেক্ষা সেই জ্বালাই বেশী। এ তাপ হইতে বালিকা-মণ্ডলীদের রক্ষা করিবে, না ইহার উপরে তাহাদের অভিসম্পাত করিতেছ। ইহা হৃদয়হীনতার পরিচয়। জগতের সমক্ষে বড়ই লজ্জার কথা হইয়াছে। সমস্ত জগতে এক প্রেরণা আসিয়াছে। তাহা নারীর প্রাণেও ঝঙ্কার তুলিয়াছে। নারীজাতি কি এতই অধম যে টাকা দিয়া পূজা না করিলে কেহ তাহাদের বিবাহ করিবে না। যাহারা টাকাকে বিবাহ করে তাহাদের সঙ্গে নারীর আত্মার যোগ হওয়া অসম্ভব। তাহার প্রমাণ দিনাজপুরের উকিল বাবু নিত্যদাচরণ সেন, তিনি সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি। পণ দিতেও পারিতেন। তাঁহার কন্যাও আত্মত্যাগ করিয়াছে। সমাজের কি শোচনীয় অবস্থা। অন্য দেশের রমণীরা বাঁচিতে জানে। বাংলার নারীরা মরিয়া তো রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য নারীর আত্মবোধের কথা সমাজ বুঝিবে না। তাহাকে অনলে আহুতি দিতে হইতেছে। ভারতের সামাজিক শত শত অত্যাচর দেখিয়া জগত

হাসিতেছে। সময়ের প্রেরণায় জগতের নিকট বাঙ্গালী বলিয়া তোমাদের পরিচয় হইয়া গিয়াছে। সেই তোমাদের ঘরে ঘরে পণ-প্রথারূপ সামাজিক পাপ জগতের সমক্ষে প্রচার হইতেছে। শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গালী এমন লোভী স্বার্থপর, ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানশূন্য বিবেকহীনতার পরিচয় দিতেছে। আবার তাহারাই ঋষি-বংশধর বলিয়া কিরূপে গৌরব করে!

যখন এত দিনে দেখা গেল যে শিক্ষিতেরা পণ-প্রথারূপ পাপ উচ্ছেদের জন্য সকলে এক বাক্যে বদ্ধপরিকর হইলেন না, এখনও পণের জন্য অনেক বালিকা বলি হইতেছে এবং দেখা যাইতেছে আরো হইবে, তখন মাতৃভূমির জননীগণ! তোমরা এ প্রথা দূর কবিবার জন্য বদ্ধপরিকর হও। গার্গী মৈত্রেয়ী তোমাদের দেশে জন্মিয়াছিলেন। তোমরা নিয়ত পলে পলে কত ভোগ ত্যাগ কত দৈন্য পদদ্বারা দলিত করিতেছ। তোমরা কি পণ-প্রথারূপ প্রলোভনকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না? মাতৃভূমি তোমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞা কর যে এ পণ-প্রথারূপ পাপ আমরা উচ্ছেদ করিব। পুরুষ যাহা পারিবে না, বাংলার কুললক্ষ্মীরা তাহার পাশ ছেদন করিবে। বাংলা কি সকল বিষয়ে মরিতেই জানে, সামাজিক দুর্নীতি হইতে আপনাদের বাঁচাইতে শক্তি নাই? নারীগণ! ধর্ম্মই তোমাদের একমাত্র সম্বল। তোমরা কি এ দুর্নীতি দূর করিতে পারিবে না? সমস্ত সভ্য দেশে সামাজিক কুরীতিসকল অধিকাংশ সময় নারীগণ বদ্ধপরিকর হইয়া দূর করিতে সমর্থ হন। বাংলা দেশ কি চিরদিনই সামাজিক কুপ্রথার চরণে মরিয়া থাকিবে। তোমরা শক্তির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমাদের শক্তি আছে, জগত দেখুক, তোমরা সকলে যদি বদ্ধপরিকর হইয়া অর্থ-গৃধ্নু-ব্যক্তিদের নিকট নিজ নিজ কন্যাদান না করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা, ধর্ম্ম, পরার্থে আত্মোৎসর্গের ব্রত অবলম্বন করিতে শিখাও, তবেই পুরুষদের প্রকৃত শিক্ষা হয়। তখন পণ-প্রথা উঠিয়া যাইতে পথ পাইবে না।

আর মাতৃভূমির কন্যাগণ! তোমরা সকলে প্রতিজ্ঞা কর আত্মহত্যা রূপ ভীষণ পাপ করিব না। আত্মাকে ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন। তিনি নিজে যখন গ্রহণ করিবেন, তাহাই ধর্ম্ম। জীবন আর কাহারো নয়, সেই জীবনদাতারই। কিন্তু উপযুক্ত ন্যায়বান সত্যানিষ্ঠ পাত্র যদি জীবনে না মিলে তবে তোমরা শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বাক্যের ন্যায় সেই মন্ত্রই সার করিয়া কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে, বিশ্বহিতে আপনাকে দীক্ষিত করিয়া লও। দেখাও, তোমরা মহাসতীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমাদের জন্য তোমাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের এত ভয় কেন? কেন এত অবিশ্বাস যে বিবাহ না দিলে তোমরা থাকিতে পারিবে না? বিবাহ না হইলে নারী অসদ্গামী হইবে! এ ভ্রম ভাঙ্গিয়া দাও। তোমরা পবিত্র পুণ্যময় কৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া আপন আপন পবিত্র জীবন দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া জগৎকে দেখাও যে তোমরা মহাসতীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

বাংলার জননী ও কন্যাগণ! সকলে প্রতিজ্ঞা কর, পণপ্রথারূপ পাপ উচ্ছেদ করিব। আর জননীগণ, তোমরা কন্যাগণের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উৎসাহ দাও, বিশ্বহিতকর কার্য্যে জনপদকল্যাণীরূপে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া জীবনকে সার্থক করিয়া ইতিহাসে নাম রাখিয়া সবাই সার্থক হও। কেন অমূল্য জীবনগুলি অর্থগৃধ্নু পুরুষ-পশুদের জন্য অনলে আহুতি দিবে? ইহাতে তাহাদের কি ক্ষতি? যদি জননী ও কন্যাগণ সকলে ভগবানকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে আমরা এই অর্থগৃধ্নুদের বিবাহ দিব না ও করিব না; চিরকুমারী হইয়া থাকিব তাহাও শ্রেয়ঃ; তবেই পণ-প্রথা উঠিয়া যাইবে। তোমরা সকলের সমক্ষে বল,—

স্নেহলতা নিভাননী,
সরলা যে কমলিনী,
সে যে গো আমারি নয়নমণি,
তারা যে যাইছে চলে পণের জ্বালায়,
এস গো প্রতিজ্ঞা করি,
এ কুপ্রথা পরিহরি,
সমাজের পাপ যাহা দলি দুই পায়।

আর—

নারী জন্ম লয়ে যদি আসিয়াছ ভবে,
দেখাও গৌরবে,
অক্ষয় অমূল্য ধন, ন্যায় ধর্ম্ম-তরে,
নারী কি না পারে।

শ্রীলীলাবতী মিত্র।

মক্কাযাত্রী

জগতে যুদ্ধ আছে অনেক প্রকার। বন্দুক ছুড়িলেই যে যুদ্ধ হয় তাহা নহে। অন্যায়, অত্যাচার, কুসংস্কার, মুঢ়তা, দুঃখ, দৈন্য প্রভৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন ও মোচনের চেষ্টাও যুদ্ধ। সে যুদ্ধও যেরূপ বিপদ-সঙ্কুল ও কষ্টসাধ্য এ সব যুদ্ধও তদপেক্ষা কোনও অংশে কম নহে। প্রকৃতির দুর্ভেদ্য রহস্য উদ্‌ঘাটনে মানব আজন্ম চেষ্টা করিয়া আসিতেছে ও কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছে। সেইরূপ প্রত্যেক প্রাচীন ধর্ম্মের সংস্কাররূপ কতকগুলি রহস্য আছে সে গুলি জানিতে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর কৌতুহল হয়। যেমন উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার অন্যের কাছে রুদ্ধ সেইরূপ মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ মক্কার মন্দির-দ্বারও অন্যের নিকট চিররুদ্ধ। এই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে বিশিষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা তাহাদের ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করিবার জন্য চারিদিকের সঙ্গে লড়াই করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যতই বজ্র আঁটুনি দিতেছেন ততই যে ফস্কা গেরো হইয়া যাইতেছে একথা অনেকেই ভাবেন না। তাঁহারা ভাবের দুর্গে দুর্গম হইয়া বসিয়া আছেন। সার রিচার্ড বারটন নামক জনৈক ইংরাজ একবার মক্কার এই দুর্গম তীর্থক্ষেত্র দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন কিন্তু সেখানে যাইবেন কিরূপে?—পথ ঘাট ক্রিয়া কলাপ সবই অজ্ঞাত চুপে চুপে; সহজে যাইবার উপায় নাই। বারটনের পূর্ব্বে আর একজন মাত্র ইংরাজ সেখানে যাইতে সক্ষম হয়েন। ছদ্মবেশ ব্যতীত উপায় নাই কিন্তু তাহাতে সমূহ বিপদ; এমন কি ধরা পড়িলে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে হইবে। কিন্তু বীরহৃদয় কিছুতেই বিচলিত হয় না।—অন্তরের উদগ্র আগ্রহ তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়, বীর-শোণিত তাহাকে উত্তেজিত করে। কিন্তু আরবী ভাষায় প্রচুর জ্ঞান না থাকিলে ছদ্মবেশ পরিয়াও যাইবার উপায় নাই। বারটনের আরবী ভাষায় প্রচুর বুৎপত্তি ছিল, তিনি এমন সুন্দর ভাবে আরবী বলিতেন এবং রহস্যালাপ করিতে পারিতেন যে আরবগণও বুঝিতে পারিত না যে, তিনি আরব নন। তিনি আরবীয় কামারের কার্য্য এমন কি ঘোড়ার নাল পর্য্যন্ত তৈয়ারী করিতে শিখিয়াছিলেন। তিনি আরবদিগের আচার ব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইলেন এবং এমন কি তাহাদের গুপ্ত password ও কোনও প্রকারে জানিয়া লইলেন।

পিঙ্গলবর্ণে দেহ অনুরঞ্জিত হইল, দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রু রক্ষিত হইল, উপযুক্ত পোষাকও লওয়া হইল এবং তিনি যাত্রা করিলেন। সঙ্গে একখানি বর্শা লইলেন। হজ যাত্রীরা কোনওরূপ সন্দেহ না করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইল। তিনি বলেন "আমি দুইটি উষ্ট্র ভাড়া লইলাম, একটায় বোঁচকা, পুটলী ইত্যাদি দিয়া সেই দেশের একজন ছোকরা চাকরকে চড়াইয়া দিলাম, আমি অপরটীতে চড়িয়া রওনা হইলাম। সুয়েজ মরুভূমির মধ্যে আমাকে কাঠের জীনে চড়িয়া চল্লিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইল। কি সে উত্তাপ! সূচের মত আগুণের হল্কা আসিয়া গায়ে বিঁধিত। বালি তাতিয়া যখন উড়িত তখন টেঁকা দায় হইয়া উঠিত।"

"সুয়েজে আসিয়া আমরা জাহাজে আরোহণ করিলাম। ৯৭ জন নগ্নপদমস্তক, নোংরা, ভীষণাকৃতি যাত্রীও জাহাজে উঠিল। আফ্রিকাও আরবের দুর্দ্দান্ত লোকগণও এই দুরন্ত গরমে বিশেষ কষ্ট অনুভব করিতেছে দেখিলাম। চৌদ্দ দিন পরে আমরা জাহাজ হইতে নামিলাম, দিনে ভীষণ গরম, রাত্রিতে অপর্য্যাপ্ত শিশির পড়িত ও নীচু ডেকবিশিষ্ট জাহাজের উপর দিয়া জল গড়াইত তাহাতে পা প্রায়শঃই ভিজিয়া যাইত। পায়ের এমন শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে আমি অতি কষ্টে দাঁড়াইতে পারিতাম।"

"আমরা অবশেষে এলহামরা গ্রামে পৌছিলাম। ইহার চারিঘণ্টা পরেই হজযাত্রীর বড়দলের সহিত

মিশিলাম। সেই দিনই একদল দুরন্ত আরবদস্যু আমাদিগকে আক্রমণ করিল—প্রায় সমস্ত রাত্রিই এই দস্যুদলের সহিত লড়াই চলিল। আমাদের বার জন লোক, দুইটি উষ্ট্র, কয়েকটি ভারবাহী পশু নিহত হইল। আমি প্রথমেই যে সহর পাইব তাহাতে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া পরবর্ত্তী দ্রুতগামী দলের সহিত যাইব মনস্থ করিলাম কিন্তু গুজব উঠিল পরের দল যাইবে না।"

"পরদিন সকালে আমার চাকর হামিদ আসিয়া আমাকে প্রস্তত হইতে কহিল। সে কহিল 'শীঘ্রই প্রস্তত হইয়া, লউন, দলের অন্যান্য লোকেরা এখনই যাত্রা করিবে। এবার এমন পথ দিয়া যাইতে হইবে যে, তিন দিন জলের মুখদর্শন করিতে পারিবেন না—এমন বিশ্রী এই পথ। আপনি চামড়ার মশকে জল ভরিয়া লউন।'

"দেখিলাম হামিদ একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছে, আমার কিন্তু একটু আমোদ বোধ হইল কারণ আমিই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় যে এই মরুভূমি প্রথম অতিক্রম করিবে। আমি এই গৌরবে একটু উৎসাহিত হইয়া পড়িলাম। আমরা যাত্রা করিলাম। প্রায় একঘণ্টা হাঁটার পর দল সহরের নিকট বিদায় লইতে দাঁড়াইল। সহরের উচ্চ স্তম্ভ ও প্রেরিত পুরুষের সমাধি ইত্যাদি নয়নগোচর হইতেছিল, গরমও পড়িয়াছিল ভয়ানক, বাতাস বহিতেছিল না; আমার সহযাত্রীদের অনেকের পশু মারা যাইতে লাগিল। আমরা প্রায়ই রাত্রিতে পথ চলিতাম। উষ্ট্রগুলিকে ছাগলের কাজ করিতে হইত। তাহারা সর্ব্বদা কাতরধ্বনি করিত।"

আমরা জলের অভাবেই বেশী কষ্ট পাইতাম, বেশী কথা কহিলেই পিপাসা বাড়িয়া যাইত, চুপ করিয়া থাকাই ছিল পিপাসার ঔষধ। ঘণ্টা দুই জল পান না করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে আর বিশেষ কষ্ট হইত না কিন্তু একবার জল খাইলে আর রক্ষা নাই।"

"মক্কা পৌঁছিতে যখন ৪৭ মাইল বাকী তখন আমাদিগকে হজযাত্রীর পোষাক পরিতে হইল। এক জন নাপিত আমাদিগকে কামাইয়া দিয়া গেল; আমরা সকলেই স্নান করিয়া সুগন্ধি মাখিলাম। তার পর একখানা সরু লালপেড়ে একখানা ছয় ফিট লম্বা সাড়ে তিন ফিট চওড়া কাপড় পরিয়া বাঁ কাঁধের উপর দিয়া জড়াইয়া বাঁধিলাম। মাথা ইত্যাদি উন্মুক্ত রহিল।"

"মক্কায় পৌছিবার পূর্ব্বে আর একবার আমাদিগকে দস্যুরা আক্রমণ করে। আমার ঠিক সামনের একটি উষ্ট্র গুলি খাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আমাদের দলের সর্দ্দার খুব পাকা সাহসী ছিলেন তিনি দস্যুদলকে হটাইয়া দিয়া আসিলেন।"

"১০ই সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল একটার সময় হজযাত্রীদের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখিলাম, সকলে "মক্কা, মক্কা" রব করিতে লাগিল। অনেকের মুখে মক্কার মহত্ত্ব বর্ণনা আর ধরে না। কেহ কেহ ভাবাবেশে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমরা তার পর দিন সকাল বেলায় এতদিনের বাঞ্ছিত মক্কায় পৌঁছিলাম। রাত্রি দিন করিয়া এই দশদিন মরুর মধ্যে ভ্রমণ কি কষ্টকর! আমাকে এখন মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত কতকগুলি ক্রিয়া কলাপ করিতে হইল।"

"সেই বিশ্ববিশ্রুত কালো পাথরের চারিদিক সাতবার পরিক্রমণ করিতে হইল এবং সেই বিশাল জনসঙ্ঘ ঠেলিয়া সেইটীকে চুম্বন করিতে হইল। চুম্বন প্রভৃতি করিবার সময় আমি পাথরখানিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। দেখিয়া বোধ হইল পাথরখানি উল্কাপাতকালে পতিত পাথর। যখন এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড চলিতেছিল হজযাত্রীদিগকে প্রখর সূর্য্যের তাপে খালি মাথায় দাঁড়াইয়া পুড়িতে হইতেছিল।"

"এইবার আমরা যাত্রীর পোষাক খুলিবার অনুমতি পাইলাম। ইতিমধ্যে আমার ডাক পড়িল। একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। কি জানি কি কপালে ঘটে! দেখিলাম সংক্ষুব্ধ জন সমুদ্র গর্জ্জিতেছে। আমাকে দুইজন বলবান লোক তুলিয়া ধরিল, আর একজন টানিয়া লইয়া চলিল। দরওয়াজায় কএকজন গভীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন কর্ম্ম-

চারী বাড়ীঘর ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন আমি ঠিক ঠিক উত্তর দিলে তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন হইল। তখন একজন ছোকরা অনুমতি অনুসারে আমাকে ঘরের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করাইয়া পবিত্র প্রার্থনা আবৃত্তি করিতে দিল। খুব পরিশ্রান্ত ভাবে ঘরে ফিরিলাম। সমুদ্র পর্য্যন্ত যাত্রীদের সঙ্গে আসিলাম তারপর ইংরাজ কনসালের বাড়ীতে আসিলাম কিন্তু তাহারা আমাকে তদ্দেশবাসী নোঙরা আরবীয় মনে করিয়া বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিল; অবশেষে কনসাল দেখা করিলেন। তাঁহাকে আমি লিখিয়া দিলাম যে, আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন, কিছু দিতে হইবে, আমি যে বারটন তাহা প্রকাশ করিবেন না তাহা হইলে সমূহ বিপদ। লণ্ডনে ফিরিয়া টাকা পাঠাইয়া দিব। কনসালতো একেবারে অবাক ও হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহার সাহায্যে আমি ইংরাজ জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে ফিরিলাম।" ইহার পরও বারটন আরও ৪০ বৎসর বাঁচিয়া আরও নানা অভিযান করিয়াছিলেন। *

শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী।

রাখীবন্ধন

মোগল রাজত্বের সময় একদিন রাজপুতানার প্রান্তসীমায় পর্ব্বাতোপরি একটি সুদৃঢ় দুর্গে কয়েকটি বীর এবং রাজনীতিজ্ঞ চিন্তাকুল-হৃদয়ে কোনো, গুরুতর বিষয়-সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন। সুসজ্জিত গৃহের মধ্যস্থলে নাগরের বৃদ্ধ রাজা মানসিংহ বিষণ্ণবদনে বসিয়াছিলেন। রাজার পুত্রেরা তখন দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই অবসরে গুজরাটের মুসলমান রাজা নাগর রাজ্য আক্রমণ করেন। মুসলমানের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ এমন বীর তখন নাগর রাজ্যে অধিক ছিল না। এই কারণে রাজা এবং রাজমন্ত্রীগণ সাতিশয় চিন্তান্বিত হইয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। নাগর রাজ্যে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য এবং যথেষ্ঠ পানীয় ছিল। মুসলমান রাজা রাজ্য অবরোধ করা সত্ত্বেও তাহা বহুদিন রক্ষা করা যাইত, কিন্তু সৈন্য-সংখ্যা অল্প বলিয়া তাহা করা সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। গুজরাটের বিপুল সৈন্য যেরূপ দ্রুতগতিতে নাগর বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছিল, তাহাতে আত্মসমর্পণ অথবা মৃত্যু ভিন্ন দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না। রাজ্য হইতে বাহির হইতে হইলে সমূলে ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা। এই বিপদসঙ্কুল অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য নিকটবর্ত্তী কোনো রাজার সাহায্য পাইবার সম্ভাবনাও ছিল না।

বহুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হইল যে, তাঁহারা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া যুদ্ধ স্থগিত রাখিবেন। কিন্তু এই প্রস্তাবের সর্ত্ত ইত্যাদি স্থির করিতে বিলম্ব করিবেন। তাহা হইলে যে সময় পাওয়া যাইবে তাহার মধ্যে রাজার পুত্রেরা আসিয়া পৌঁছিতে পারেন, কিংবা অন্য কোনো স্থান হইতে সাহায্যও পাওয়া যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যেও রাজ্যরক্ষা অসম্ভব হইলে রাজ্যের মহিলাগণ "জহর" ব্রত পালন করিবেন এবং বীরগণ উন্মুক্ত তরবারি-হস্তে শত্রুর সম্মুখীন হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিবেন। এই সঙ্কল্প করিয়া রাজা মন্ত্রীগণ ও বীরগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজার প্রাসাদে তাঁহার রাণী এবং কন্যাগণ সাতিশয় উদ্বেগাকুলচিত্তে তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাজার নিকট হইতে তাঁহাদের

---

* ইংরাজী হইতে।

সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া রাণী এবং কন্যাগণ নীরব হইলেন। রাজা মানসিংহের মাতা তৎক্ষণাৎ জহর ব্রত পালন করিতে উদ্যত হইলেন। প্রকৃত রাজপুতানীর ন্যায় এই মৃত্যু তাঁহাদের সকলেরই নিকট নিতান্ত লোভনীয় ছিল। মানসিংহের কনিষ্ঠা কন্যার নাম পান্না। রূপে, গুণে তিনি প্রকৃতই মণির ন্যায় রাজার হৃদয় এবং রাজ অন্তঃপুর আলোকিত করিয়াছিলেন। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া তিনি আপন শয়ন-প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। সে ক্ষুদ্র গৃহের মর্ম্মর-মণ্ডিত জানালার ভিতর দিয়া তিনি সুদূর প্রান্তরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। দিগন্তের শেষে একটি অভ্রভেদী পর্ব্বত ছিল। প্রান্তরের দিকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার দৃষ্টি এই পর্ব্বতের উপর আসিয়া নিবদ্ধ হইল। বাল্যকালে এই জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া এই পাহাড়ের উপর কত মায়ালোক সৃজন করিতেন, কত পরীর রাজ্যের কল্পনা করিতেন, কত অপ্সরীদের নৃত্য দর্শন করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পাহাড়টি অধিকতর মনোরমভাবে জড়িত হইয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। একদিন যাহাকে কল্পনায় সুখের রাজ্য বলিয়া মনে করিতেন তখন তাহা বাস্তব হইয়া উঠিল। এই পর্ব্বতের উপর সুদৃশ্য প্রাসাদে রাজপুতবীর রাজকুমার উমেদসিংহ বাস করিতেন। বাল্যকালে পান্না একবার পিতার পার্শ্বে অশ্বারোহণে উমেদ সিংহকে যাইতে দেখিয়াছিলেন। উমেদ সিংহ তখন ভীলদের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া উন্মুক্ত উজ্জ্বল তরবারি হস্তে ফিরিতেছিলেন। সে যুদ্ধে তিনি রাজা মানসিংহের প্রধান মিত্র ছিলেন। তরুণ বীরের সে বীরত্ব-ব্যঞ্জক বদন-মণ্ডল প্রতিভা-দীপ্ত বিশাল নয়ন, বিজয়োৎফুল্ল ললাট পান্নার হৃদয়ের সব স্নেহটুকু হরণ করিয়া লইয়াছিল। তাহার পর ঘটনা-চক্রে রাজ্যের সীমানা লইয়া রাজা মানসিংহের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিয়া যায়। সেই হইতে তিনি এক্ষণে রাজার শত্রুর মধ্যে পরিগণিত। পান্না দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাই ভাবিতে ভাবিতে পর্ব্বতের দিকে দেখিতে লাগিলেন। অতীতের সে মধুর স্মৃতি তাঁহার ক্ষুদ্র অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিতে লাগিল। হঠাৎ একটি চিন্তা তাঁহার আকুল হৃদয়ে উদিত হইল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য সেই তরুণ বীরের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলে হয় না? এই সঙ্কটকালে তিনি কি সাহায্যদানে বিমুখ হইবেন? রাজা মানসিংহ তাঁহারই স্বজাতীয়। মুসলমানের এই আক্রমণ তাঁহারও কি বিপদ নহে?

পান্না তাঁহাকে "রাখী বন্ধ ভাই" রূপে গ্রহণ করিয়া এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। উমেদসিংহের নিকট কঙ্কন প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য রক্ষার্থ আহ্বান করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। একবার সে বন্ধনে আবদ্ধ হইলে কোনো রাজপুত বীরই, তাহা উপেক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এই সঙ্কল্প লইয়া পান্না পিতার নিকট গমন করিলেন। রাজা মানসিংহ পান্নার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। নিরাশার মধ্যেও তাঁহার তেজ ফুটিয়া উঠিল। বিপদ কি তাঁহাদিগকে এতই হীন করিয়াছে যে, অবশেষে শত্রুর সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে? বিনয়-নম্র মধুর বচনে পান্না তাঁহার পিতাকে শান্ত করিলেন। অনেক সাধ্য-সাধনার পর অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া মানসিংহ রাখী পাঠাইতে পান্নাকে অনুমতি দিলেন। পান্না একটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা মণিমুক্তা-খচিত কঙ্কন উমেদসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। গভীর নিশীথে অন্ধকারে লুক্কায়িত হইয়া উষ্ণীষের মধ্যে কঙ্কনটি রাখিয়া ভৃত্য শত্রুশ্রেণী ভেদ করিয়া চলিল। অতি কষ্টে শত্রু ছাউনী অতিক্রম করিয়া প্রভাতে সে পর্ব্বতের উপরিস্থিত প্রাসাদে উপস্থিত হইল। উমেদসিংহ তখন শিকারীর বেশে সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার বন্ধু জালিমসিংহ ছিলেন। তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে বহু সংখ্যক কর্ম্মচারী ও সৈনিকবৃন্দ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়াছিল। পান্নার ভৃত্য উমেদসিংহের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

উষ্ণীষ হইতে কঙ্কনটি খুলিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া সকল কথা নিবেদন করিল। উমেদসিংহের উন্নত ললাট আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বিপক্ষতা সত্ত্বেও অতুলনীয়া পান্না যে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাতে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত বোধ করিলেন। তিনি বন্ধুর দিকে ফিরিয়া সগর্ব্বে বলিলেন, "শিকারের অপেক্ষা আমি অধিকতর উন্নত কার্য্যে গমন করিতেছি। গুজরাটের মুসলমান রাজা, রাজা মানসিংহের রাজ্য গদওয়ার অবরোধ করিয়াছে। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার কন্যা এই কঙ্কন প্রেরণ করিয়া আমাকে রাখী বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের রাজ্যে আহ্বান করিয়াছেন। আমি সসৈন্যে সেখানেই গমন করিব।" জালিম সিংহ বলিলেন, "বন্ধু, আমি কি এই মহৎ কার্য্যে যোগ দিবার অধিকারী নই? আমার সৈন্য সামন্ত লইয়া আমিও তোমার অনুসরণ করিব।" উমেদ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ৫০০০ সৈন্য সুসজ্জিত করিয়া মানসিংহের রাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গুজরাটের রাজা ফেরোজ সাহা রাজ্য অবরোধ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বৃহৎ বৃহৎ কামান লইয়া বহু সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থ আগমন করিতেছিল। বহু দিন অবরোধ করিয়া থাকাতে ফেরোজ সাহের সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি আশায় উৎফুল্ল এই সাহায্যের দিকে চাহিয়াছিলেন। উমেদ সিংহ এই সৈন্যের আগমন সংবাদ পাইয়া তাহার মধ্যস্থলে উপনীত হইয়া ফেরোজ সাহের সৈন্যের সহিত তাহাদের সম্মিলনের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই সহস্র সৈন্য লইয়া অতর্কিত ভাবে এই সৈন্যদলের উপর পড়িয়া তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দূরীভূত করিয়া দিলেন। ফেরোজ সাহ সাহায্য লাভে হতাশ হইয়া অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া উমেদ সিংহের সৈন্যদলের উপর আসিয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন উমেদ সিংহকে পরাজিত না করিলে রাজা মানসিংহের রাজ্য অধিকার করিবার কোন আশা নাই। উমেদসিংহ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। ফেরোজ সাহ যতবার তাঁহাকে আক্রমণ করেন তিনি ততবার পশ্চাতে হাটিয়া যান। এইরূপে যখন ফেরোজ সাহ গদওয়ার হইতে বহুদূরে এক মরুময় প্রান্তরে গিয়া পড়িলেন তখন উমেদ সিংহ হঠাৎ ফিরিয়া তাঁহাদের আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর সংগ্রাম যখন চলিতেছিল তখন উমেদ সিংহ এক সহস্র সৈন্য লইয়া গদওয়ার অভিমুখে ধাবিত হইলেন।। রাজা মানসিংহ এবং পান্না দুর্গের শিখরে বসিয়া শঙ্কিত চিত্তে যুদ্ধের ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন! হঠাৎ ধূলি উড়াইয়া একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে গদওয়ার অভিমুখে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা মনে করিলেন বিজয়ী মুসলমান সৈন্য নগর অধিকার করিতে আসিতেছে! কিন্তু সে উদ্বেগ ও সন্দেহের মধ্যেও পান্নার হৃদয় বলিতেছিল, উমেদসিংহ অকৃতজ্ঞ হইবার লোক নহেন।

নগরের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে কতিপয় মুসলমান সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া যখন বিজয় গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উমেদসিংহ নগরে প্রবেশ করিলেন তখন নগরবাসিগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার পদচুম্বন করিতে লাগিল। রাজ্যের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া বৃদ্ধগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। যুদ্ধের অবসানে ফেরোজ সাহ প্রান্তর হইতে ছাউনিতে ফিরিয়া দেখিলেন গদওয়ার রাজ্য রাজপুতের অধিকারে গিয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে রাজপুত সৈন্য উমেদসিংহের সহিত মিলিত হইতে আসিতেছিল। জয়ের আশা নাই দেখিয়া তিনি উমেদসিংহের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মুসলমান রাজাকে রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া চারিদিকে আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল। উমেদসিংহ গৌরবে মণ্ডিত হইয়া নত নেত্রে রাজা মানসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মানসিংহ কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, "এ ঋণ শোধের জন্য তোমাকে কি দিয়া তৃপ্ত করি জানিনা। উমেদসিংহ, বল, রাজভাণ্ডারের কোন্ রত্ন দিলে তুমি সন্তুষ্ট হইবে?"

হাস্যোজ্জ্বল মুখ তুলিয়া উমেদসিংহ বলিলেন, "মহারাজ আপনার ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্নটী আমি চাই।"

মানসিংহ রাজমুকুটের শ্রেষ্ঠ হীরক খণ্ড খুলিয়া উমেদসিংহকে প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। উমেদসিংহ তখন নম্র বচনে বলিলেন, "মহারাজ যদি কৃপা করিয়া রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন পান্নাকে প্রদান করেন তাহা হইলে অধীন চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে।"

রাজা মানসিংহ আনন্দে সম্মতি প্রদান করিলেন। সমগ্র রাজ্যময় আনন্দোৎসবের মধ্যে প্রজাবৃন্দের শুভাশীর্ব্বাদ লইয়া উমেদসিংহ পান্নাকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিলেন। বীরাঙ্গনার ব্রত উদযাপিত হইল।

লোকান্তরিতা লেডি হার্ডিং।

"জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে।"

অমর ভাষায় কবি এই গান গাহিয়াছেন। জন্ম-গ্রহণ করিবামাত্র মৃত্যু ছায়ার ন্যায় মানবের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়; কাহার কখন ডাক পড়ে তাহার কোনও স্থিরতা নাই—মৃত্যুর ন্যায় এমন হৃদয়হীন বিচারকও পৃথিবীতে আর নাই। দুধের শিশু মায়ের কোল জুড়িয়া শুইয়া আছে—তাহার মুখে কি সুষমা, দেহে কি লাবণ্য—ঘর যেন আলো করিয়া আছে!—কোথা হইতে মৃত্যুর শীতলস্পর্শ তাহার দেহে লাগিল আর দেখিতে দেখিতে সোণার শিশু ঢলিয়া পড়িল! সে কেন আসিল আবার কেন বা গেল, কে তাহার কৈফিয়ৎ চায়?—আদরিণী স্ত্রী ফুটন্ত ফুলের ন্যায় স্বামীর গৃহ আলোকিত করিয়া আছেন—তাঁহার শোভা এবং সৌন্দর্য্যে সমুদয় গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে পরিবারস্থ সকলে মুগ্ধ হইয়া আছেন—চারিদিকে শুধু শোভা এবং আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, এমন সময়ে গাঢ় যবনিকার মত কোথা হইতে মৃত্যুর করাল ছায়া আসিয়া সেই পরিবারে পড়িল আর দেখিতে দেখিতে সাজান বাগান শুকাইয়া গেল!—কেন এমন হইল? পূর্ণিমার চাঁদকে কেন আসিয়া রাহুতে গ্রাস করিল কে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে এবং কাহার কাছেই বা কৈফিয়ৎ চায়?—এমনি করিয়া প্রতিদিন পৃথিবীর বক্ষ হইতে কত মানব অনন্তধামে চলিয়া যাইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করে?

যায় ত সকলেই, কিন্তু ইহাদের মধ্যে এক একজন আবার এমন করিয়া যায় যে তাহাদের জন্য বিশ্বের নর-নারীর প্রাণ হায় হায় করিয়া ওঠে। আজ আমরা যে মানবাত্মার জন্য শোক করিতেছি তিনিও এই শ্রেণীর একজন মহাপ্রাণা রমণী। ভারতে অনেক বড়লাট আসিয়াছেন, গিয়াছেন—অনেক লাট-মহিষীও এ দেশের নারীজাতির কল্যাণ কামনায় পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কাহারও জন্য সমগ্র ভারতের নারী-জাতির প্রাণ এমন করিয়া কাঁদিয়া ওঠে নাই। এই যে একটা তন্ত্রীতে আঘাত করিলে সমুদয় তন্ত্রীগুলি এক সুরে বাজিয়া উঠে—তা সে মোটাই হউক আর সরুই হউক, যে যেমন সুরে পারে তেমনি সুরেই বাজিয়া উঠে, এইখানেই বিধাতার বিচিত্র বিধান—এইখানেই মানুষের বুদ্ধি হার খাইয়া যায় এবং আর পারিলাম না বলিয়া বিধাতার চরণে লুটাইয়া পড়ে। লেডি হার্ডিংর সহিত এ দেশের নারীজাতির কোনও প্রকার সৌসাদৃশ্য ছিল না এবং এখনও নাই; আকার, প্রকার, বর্ণ, ভাষা, জাতীয়তা, পদমর্য্যাদা ইত্যাদি কোনও প্রকারে আমাদের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য ছিল না অথচ এই বিদেশিনীর জন্য এককালে সমগ্র ভারতের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে; মানবপ্রকৃতির এই গূঢ় রহস্যের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গেলে দেখা যায় যে বাহিরের পর্ব্বত প্রমাণ ভেদ-বুদ্ধির অন্তরালে বিধাতা এমন একটা মিলনের ক্ষেত্র রচনা করিয়া রাখিয়াছেন যেখানে সাদায় কালোয় কোনও ভেদ নাই, বেদে, বাইবেলে কোনও দ্বন্দ্ব নাই—যেখানে বিশ্বাত্মার সহিত মানবাত্মার যোগ উপলব্ধি করা যায়। বিধাতা যে সমগ্র মানবের প্রাণ একই উপাদানে রচনা করিয়াছেন এবং সকল হৃদয়ের তন্ত্রী যে একই সুরে বাঁধিয়া দিয়াছেন সে এইখানটাতেই ঘা দিলে বুঝিতে পারা যায়। তখন সকল বন্ধন টুটিয়া যায়। তমান্ধ মানব প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে দাঁড়ি টানিয়া রাখিয়াছে—সাদা এবং কালোর মধ্যে যে পাষাণ প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছে, সে সকলই তখন নিমেষে টুটিয়া যায়। লেডী হার্ডিংর মৃত্যুতে এদেশে ঠিক এমনি ভাবই দেখা যাইতেছে; এ ভাবটা খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল কিন্তু এমন সময়ে ইউরোপে সমরানল জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় ভারতের শোক-গীতি ডুবিয়া গেল। কিন্তু তবুও এই রণ-কোলাহল এবং উদ্বেগ অশান্তির মধ্যে যাঁহারা বিয়োগবিধুর লর্ড হার্ডিং এবং তাঁহার সাধ্বী পত্নীর কথা চিন্তা করিতেছেন তাঁহাদিগেরই প্রাণ কাতর হইয়া উঠিতেছে।

একজন খুব বড় লোকের স্ত্রী মারা গিয়াছেন বলিয়া কেহ শোক করিতেছে না; কারণ তাঁহার পূর্ব্বে অনেক ভাইসরয়ের স্ত্রী মারা গিয়াছেন অথচ কেহ একবার ফিরিয়াও সে কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। কিন্তু লেডি হার্ডিংর মৃত্যুতে এ দেশের রমণী হৃদয় যে এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রধান তত্ত্ব এই যে তাঁহার মধ্যে জগতের সকল নারী নারীত্ব দেখিতে পাইয়াছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেডী হার্ডিংর কোনও জীবন-চরিত লিখিবার প্রয়াস পাইব না—এবং তাহা

লিখিবারও বোধ হয় কিছু নাই; কারণ নারীর জীবন সব দেশেই প্রায় একরূপ, সে প্রাচ্যই হউক আর প্রতীচ্যই হউক। সেই একঘেয়ে জন্ম, বিবাহ এবং শেষে স্বামীর গৃহে যাইয়া সংসার পাতানো, এই লইয়াই সব দেশের নারী জীবনের আরম্ভ এবং শেষ। এরই মধ্যে অবশ্য কোন কোন রমণী স্বামী এবং সংসারের গণ্ডি এড়াইয়া জগতের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাদিগকে দান করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন, কিন্তু সেই দুই একজন লইয়াইত আর এই বিশাল সংসার নহে—এখানে লক্ষ লক্ষ নারীর জীবনের আরম্ভ এবং অবসান যেমন করিয়া হয় তাহারই কথা বলিতেছি। আর এই যে সংসার ধর্ম্ম পালন করা এ কি কম দায়ীত্বের কাজ? এইখানকার জয় পরাজয়ের

লেডি হার্ডিং।

উপরেই নারী জীবনের সকল শিক্ষা, সফলতা এবং নিষ্ফলতা নির্ভর করিতেছে। সুন্দর রূপে সংসার ধর্ম্ম পালন করা এবং সুখে দুঃখে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া থাকাই নারীর বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র; এইখানে যিনি পরাস্ত হইবেন তাঁহার সকল শিক্ষা এবং সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং এইখানে যিনি আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইবেন জগতের নারী সমাজ তাঁহার ললাটে জয়মাল্য পরাইয়া দিবে। যে নারী একদিন জননী হইয়া সন্তান পালন করিবেন—যে সন্তানের দ্বারা একদিন সংসার সমাজ এবং দেশের মুখোজ্জ্বল হইবে সে নারীর কি কম দায়ীত্ব! এই দায়ীত্বের বোঝা ভাল করিয়া বহন করিতে পারা কি কম গৌরবের কাজ।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে "The hand that rocks the cradle sways the world." যে হাত সন্তানের দোলা নাড়াইতেছে, সেই হাতই জগত শাসন করিতেছে! এর চেয়ে সত্য কথা আর নাই। যাক, আ লাচ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অন্যান্য রমণীর জীবনের ন্যায় লেডী হার্ডিংর জীবন কথাও খুব বেশী নহে—সে হয়ত দু' কথাতেই ফুরাইয়া যাইবে, কিন্তু মৃগনাভি রত্তি প্রমাণ হইলেও তাহার গন্ধ যেমন দিগন্তব্যাপী হইয়া পড়ে, তেমনি লেডী হার্ডিংর জীবনকথা এক রত্তি হইলেও তাহা এমন করিয়া জগতের নারী হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে যে, তাহা অক্ষয় অমর হইয়া গিয়াছে। এইখানে সেই দুই একটি কথার আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রমণী হৃদয়ের নিভৃত কথা জানিবার কোনও উপায় নাই। সে সকল কথা অতি সঙ্গোপনে শুধু প্রেমাস্পদের কর্ণেই মধু বর্ষণ করিয়া থাকে—কিন্তু একবার রমণী হৃদয়ের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠের এই যবনিকা উত্তোলন করিলে দেখা যায়, সেখানে কত সীতা সাবিত্রী গান্ধারী অরুন্ধতী সংসারকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন। সতীত্ব এবং নারীত্ব শুধু ভারতের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে—ইহা বিশ্বের নারী জাতির নিজস্ব ধন। টাইটানিক ধ্বংসের সময় তাই কত রমণী স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া আটলান্টিকের অতল গর্ভে সমাহিত হইলেন—কেহ তাঁহাদিগকে স্বামীর বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইতে পারিল না। তবে অন্যান্য দেশ হইতে ভারতের বিশেষত্ব এই যে, এদেশে যেমন ঘরে ঘরে নারীত্বের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়—সতীত্বের স্বর্ণ রেণু দ্বারা ভারতের বন উপবন যেমন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া আছে, এমন আর পৃথিবীর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না; তাই বিদেশী নারী চরিত্রে সতীত্ব এবং নারীত্বের মহিমা দেখিতে পাইলেই এদেশের রমণী হৃদয় শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া পড়ে। লেডী হার্ডিংর জন্য এ দেশের রমণী হৃদয় যে ব্যথিত হইয়াছে তাহার প্রধান রহস্য এইখানে।

দিল্লীর রাজপথে এ দেশের লোক তাঁহার প্রথম পরিচয় পাইল এবং সেই হইতেই তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করিল। আজ সেই রাজসূয় যজ্ঞের কথা মনে পড়িতেছে—কি বিপুল আনন্দের মধ্যে কি গভীর শোকের রেখা!—এবং সেই আকস্মিক বিপদের মধ্যে নারী হৃদয়ের কি অপূর্ব্ব মহিমাই

দেখা গিয়াছিল। সেই উচ্ছ্বসিত জনতার মধ্যে লর্ড হার্ডিং যখন আততায়ীর গোলায় আহত হইলেন কেহই সে কথা জানে না। চারিদিকে ইন্দ্রপুরীর শোভা, আর মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি; জন সমুদ্রের লহরী দেখিতে দেখিতে চক্ষে ধাঁধা লাগিয়া যায়—এবং সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় সেই জন কোলাহলের মধ্যে নিকটস্থ লোকের কথাও শোনা যায় না। চারিদিকের এই আনন্দোচ্ছাসের মধ্যে গুপ্ত ঘাতকের গোলা অলক্ষিতে হাতীর উপর আসিয়া পড়িল; বড় লাটের হাতী চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। জলস্রোতের ন্যায় সেই বিশাল জনতার এক প্রান্ত থামিয়া গেলে সমস্ত প্রোশেসনই হঠাৎ থামিয়া গেল—বড় লাট তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি গুপ্ত ঘাতকের গোলায় কি সাংঘাতিক আহত হইয়াছেন!—চমকিয়া উঠিয়া তিনি মাহুতকে বলিলেন "Go on! Go on! চালাও চালাও!" লেডী হার্ডিং তখন স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখেন ক্ষতস্থান হইতে তীর বেগে শোণিত ধারা ছুটিয়াছে, পশ্চাতে ছত্রধারী সিপাহীর রক্তাক্ত দেহ লুটাপুটি যাইতেছে; প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া লইতে তাঁহার তিল মাত্র বিলম্ব হইল না। বড় লাটের আদেশে মাহুত হাতীকে চালাইয়া দিয়াছিল, কিন্তু লেডী হার্ডিং তৎক্ষণাৎ হাওদার উপর দাঁড়াইয়া মাহুতকে হুকুম দিলেন—Stop, থামাও, থামাও। হার্ডিং বলিলেন না, না,

লর্ড হার্ডিং।

চালাও। পতিপ্রাণা স্ত্রী তখন একহাতে স্বামীর ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "No no, the procession cannot go; you are wounded. না না প্রোশেসন আর যাইতে পারে না তুমি যে আহত হইয়াছ" ইঙ্গিতে প্রোশেসন বন্ধ হইয়া গেল—দিল্লীর রাজসূয় যজ্ঞে বাধা পড়িল। লেডী হার্ডিং তখন ধীরে ধীরে আহত স্বামীকে হাওদা হইতে নামাইলেন, এবং তখনই ক্ষতস্থান বাঁধিবার ব্যবস্থা করিয়া লর্ড হার্ডিংকে নিকটস্থ সার্কিট্ হাউসে লইয়া গেলেন এবং সেই যে স্বামীর পার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিলেন, সেখান হইতে আর এক চুলও নড়িলেন না। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কাটিয়া গেল। যতদিন লর্ড হার্ডিংর একবিন্দুও জীবনের আশঙ্কা ছিল ততদিন এই সাধ্বী স্ত্রীকে কেহ তাঁহার শয্যাপার্শ্ব হইতে নড়িতে দেখে নাই। এই সময়কার ঘটনা উল্লেখ করিয়া লেডী হার্ডিংর পরিবারস্থ কেহ লিখিয়াছিলেন, "সকলের জন্যই তাঁহার সমান যত্ন কেবল নিজের শরীরের কথাটাই একবারও ভাবেন না।" Mr. Fin এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "The fortitude shown by her Excellency was admirable in the extreme. and I never felt more proud of an Englishwoman than I did of Her Excellency in those terrible moments immediately after the outrage. She set an example and inspired confidence in every one on the scene. অর্থাৎ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই লেডী হার্ডিং যেরূপ সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে ইংরাজ রমণীর প্রতি শ্রদ্ধায় এবং সম্মানে মস্তক অবনত হয়। সে সময় সকলের প্রাণেই তিনি সাহস দিয়াছিলেন।

তার পর যতদিন পর্য্যন্ত লর্ড হার্ডিং সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হইয়াছিলেন ততদিন সিমলার গৃহে আর কেহ আনন্দ কোলাহল শুনিতে পায় নাই। এমনি করিয়া ভীষণ বিপদের মধ্য দিয়া ভারতের লোক এই রমণী হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল। গুণের এমন আকর্ষণী শক্তি আছে যে সে অপর হৃদয়কে টানিবেই, তা সে সাদাই হউক আর কালাই হউক। লেডী হার্ডিংর নারীত্বের পরিচয় পাইয়া ভারতের কোমল প্রাণ গলিয়া গেল এবং দিকে দিকে এই কাহিনী বিদ্যুৎগতিতে রটিয়া গেল; তারপর সমগ্র ভারতের নারী সমাজ হইতে এই রমণীরত্নের গুণের আদর করিবার জন্য বিপুল আয়োজন হইল—দেখিতে দেখিতে লক্ষ লক্ষ টাকা উঠিয়া গেল এবং সেই টাকা দিয়া যখন লেডী হার্ডিংকে একটা

casket এবং অভিনন্দন উপহার দিবার প্রস্তাব পাঠান হইল তখন তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনারা যদি আমাকে সুখী করিতে চান তবে এই টাকা দ্বারা আমি আমার স্বামীর জন্মদিনে উৎসব অনুষ্ঠান করিতে চাই, তাহাতে আপনারা সম্মতি দিন—সে উৎসবের আবার প্রকরণ ভেদ আছে। এই সংগৃহীত টাকার এক অংশ হাঁসপাতালের রোগীদিগের শুশ্রূষার জন্য ব্যয় হইবে এবং আর এক অংশ দ্বারা সমগ্র ভারতের স্কুল সমূহের বালক-বালিকাদিগকে মিষ্টান্ন এবং খেলনা বিতরণ করা হইবে; আমার স্বামীর জন্মদিনে আমার গৃহের বালক-বালিকাগণ যেমন মিষ্টান্ন এবং খেলনা পাইয়া আমোদ করে, তেমনি সন্তানসম ভারতের বালক বালিকাগণও আমাদিগের গৃহের আনন্দে যোগদান

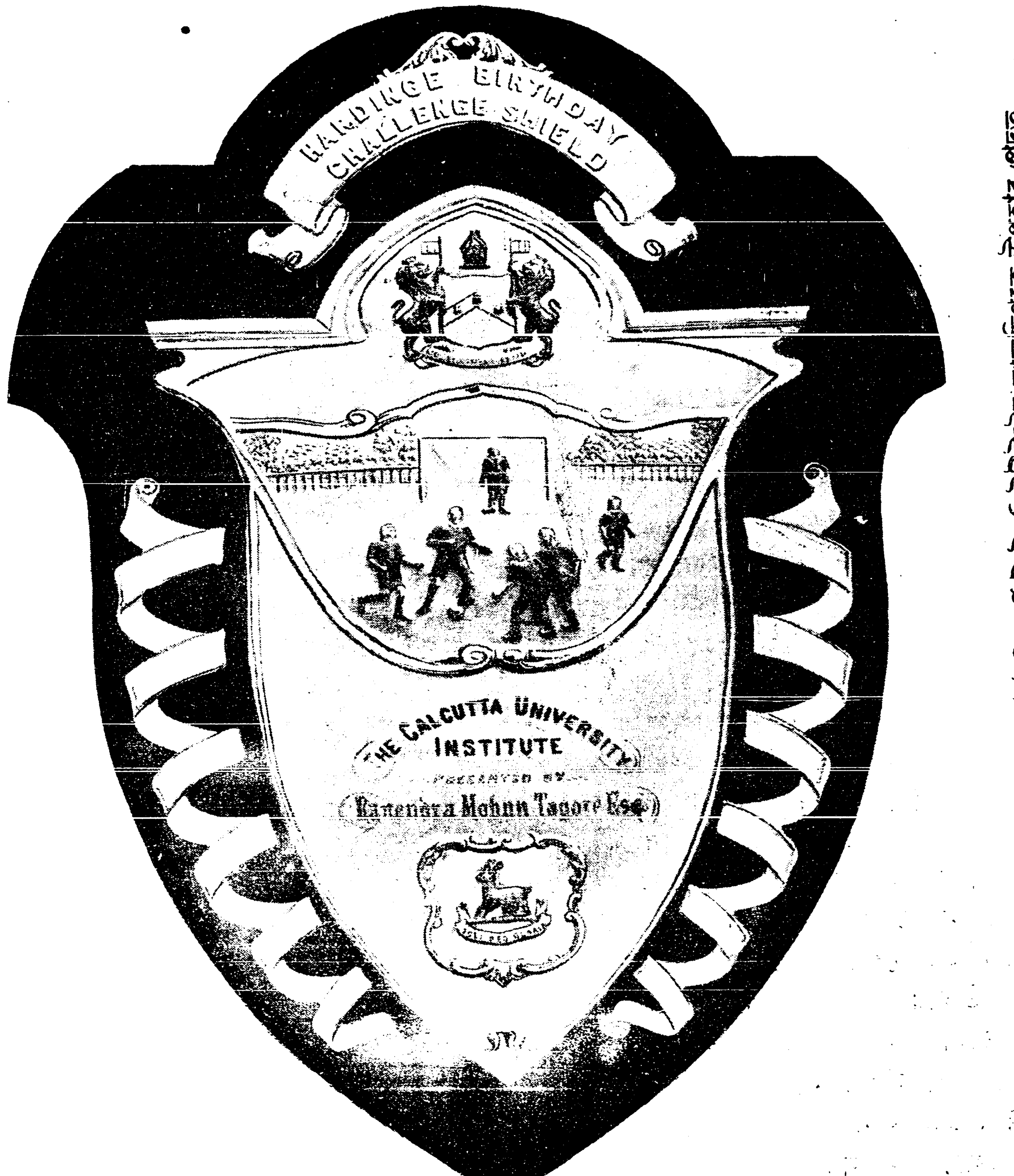

লর্ড হার্ডিংর জন্ম দিনে এই সিল্ড ইউনিভার্সিটি ইনসিউটিউটের ছাত্রদিগকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল।

করিবে, এর চেয়ে সুখ আর নাই।" কি সুন্দর প্রস্তাব!—নারী হৃদয়ের কি মধুর অভিব্যক্তি! আহত স্বামীকে দিন রাত্রি সেবা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার জন্মদিনের অনুষ্ঠান করিতে পারা কি কম ভাগ্যের কথা। স্বামীকে যমের মুখ হইতে কাড়িয়া আনিয়া এই যে জন্মদিনের অনুষ্ঠান করিলেন, ইহাতে ভারতের রমণী হৃদয় একেবারে গলিয়া গেল—ভারতের আপামর সাধারণ সিমলার লাট গৃহে এই সতী রমণীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া দূর হইতেই শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিল, এবং সেই হইতে লেডী হার্ডিংকে এ দেশের লোক ভারতের পুণ্যশ্লোক রমণীদিগের মধ্যে আসন দিয়াছে। লেডী হার্ডিংর এই দাবীর কথা বুঝাইবার জন্য কাহাকেও সভা সমিতি ডাকিতে হয় নাই।—

অথবা কাহারও দ্বারে ভোট ভিক্ষা করিতে হয় নাই ;— তাঁহার কার্য্যই তাঁহাকে সে অধিকার দান করিয়াছে এবং সেই অধিকার বলেই তিনি সতী রমণীদিগের নিৰ্দ্দিষ্ট আসনে স্থান পাইয়াছেন। এই যে লেডী-হার্ডিংর অন্তরের সহিত এদেশের জন-সাধারণের পরিচয় হইয়া গেল ; সেই হইতে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য এদেশের লোকের গোচরীভূত হইয়াছে। হাঁসপাতালের রোগীদিগের সেবা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রোগশয্যায় স্বামীর সেবা করিয়া বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যাতনাক্লিষ্ট রোগীর সেবা করার চেয়ে অধিকতর পুণ্য কার্য্য আর নাই, তাই স্বামী সুস্থ হইলে সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া তিনি এই কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শুশ্রূষাকারিনী-দিগের ইনষ্টিটিউট ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পদমর্য্যাদায় যাহারা বড় তাহাদের নিকট সহজে কেহ অগ্রসর হইতে চায় না ; যাহারা অশিক্ষিত তাহারাত ভয়েই অগ্রসর হয় না আর যাঁহারা শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত তাঁহারাও পাছে সম্মান রক্ষা না হয় এই আশঙ্কায় কাছে ঘেঁসিতে চান না। কারণ উচ্চপদ এবং সম্মানের এমন একটা মাদকতা আছে যাহাতে সহজেই মত্ততা আনয়ন করে এবং লোক স্বভাবতঃই তমান্ধ হইয়া উঠে। এই জন্য বড় লোকের একটা লক্ষণই এই যে তাহার বন্ধুর সংখ্যা অস্বাভাবিক রূপে কমিয়া যায়, কিন্তু ইহারই মধ্যে কেমন আবার এক একটা লোক বাহির হইয়া পড়েন যাঁহারা একেবারেই দল ছাড়া। ইঁহারা পদমর্য্যাদায় আকাশের মত উঁচু কিন্তু বিনয়ে আবার লতার মত নত ; তাঁহাদের নম্র স্বভাব এবং স্নেহপ্রবণ হৃদয় দেখিলেই লোকে বলাবলি করে "এলোকটা দল ছাড়া।" লেডী হার্ডিং ঠিক এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। কত লোক যে তাঁহার অপরিসীম দয়ার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্বা নাই। লর্ড হার্ডিং এখন ভারতের গভর্নর জেনারল সুতরাং সে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার এখনও সময় হয় নাই। ভবিষ্যতে লোকে সে সকল কাহিনী শুনিবে এবং দুই হাত তুলিয়া লেডী হার্ডিংর অমরাত্মার উদ্দেশে কল্যাণ কামনা করিবে।

কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্ হইতে এদেশের কোনও রাণীর প্রতি দারুণ অত্যাচার করা হইতেছিল, রাণী কোথাও তাহার প্রতিকার পাইতেছিলেন না। শেষে অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে তাঁহার কোলের ছেলেকে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের লোকে কাড়িয়া লইয়া গেল। রাণী তখন দিশাহারা হইয়া লেডী হার্ডিংর নিকট যাইয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, এবং বলিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে আমার কোল হইতে আমার ছেলে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, আপনি সন্তানের জননী, আপনি ইহার প্রতিকার করুন। লোকে অবাক হইয়া দেখিল দুই ঘণ্টার মধ্যে রাণীর ছেলে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাঁহার সকল দুঃখ কষ্ট দূর হইয়া গিয়াছে। আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। রাজনৈতিক কারণের অজুহাত দিয়া পুলিসের গুপ্তচর কোনও সম্ভ্রান্ত লোককে অত্যন্ত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। লেডী হার্ডিং বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতেন যে তিনি নিরপরাধ। নিরপরাধীর এইরূপ দুর্গতি হইতেছে একথা তাঁহার কাণে যাইবার কিছুকাল পরেই দেখা গেল যে গুপ্তচরের উৎপাত সেখান হইতে দূর হইয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া যেখানে যে দুঃখ তিনি দেখিতে পাইতেন সম্ভব হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিতেন ; অবশ্য বেশী কথা তাঁহার কাণে পৌছাইতে পারিতনা ; কারণ বড়লোকদিগের চারিপাশে বেড়ার উপর বেড়া দেওয়া থাকে। এই সকল বেড়া ভেদ করিয়া যাহারা লেডী হার্ডিংর নিকট পৌছাইয়াছে তাহারা কেহই বিফল মনোরথ হইয়া ফেরে নাই।

তার পর পারিবারিক পবিত্রতার কথা। কোনও বিখ্যাত পাদ্রীর মুখে শুনিয়াছি লেডী হার্ডিংর পরিবারের মধ্যে এমন পবিত্রতা এবং ধর্ম্মভাব ছিল যে সেখানে হাল্কা কথা বা হাল্কা মানুষের আদৌ স্থান ছিল না। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সামাজিক রীতি নীতি এবং আদব কায়দার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ ; কিন্তু পাপ এবং নৈতিক পবিত্রতা সম্বন্ধে সব দেশের মূল সূত্রই এক ; এই দিক দিয়া বিচার করিলে লেডী হার্ডিংর পারিবারিক ধর্ম্মজীবন এদেশের পক্ষেও আদর্শ ছিল। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানি কোনও পদস্থ রাজ কর্ম্মচারীর স্ত্রী অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় লেডী হার্ডিংর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া লেডী হার্ডিং তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান এবং ভবিষ্যতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে অস্বীকার করেন। এমন ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক ঘটনা আছে যাহা ভবিষ্যতে সকল লোকই জানিতে পারিবে এবং লেডী হার্ডিংর মৃতাত্মার প্রতি আরও শ্রদ্ধান্বিত হইবে।

কোনও বিখ্যাত ইংরাজ বলিয়াছেন, ভারতের কোনও বড়লাটের পরিবারে এমন নৈতিক পবিত্রতা এবং অদ্ভুত ধর্ম্মভাব দেখা যায় নাই। এই পবিত্রতার হাওয়ায় সিমলার সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহে নূতন ভাব দেখা গিয়াছিল।